ছোটদের প্রিয় পত্রিকা আনন্দমেলা যেন জাদু জানে। ছেলেমেয়েদের মনের খোরাক জোগাতে তার জুড়ি নেই। প্রায় চার দশক জুড়ে আনন্দমেলা বাঙালির ছোটবেলার সঙ্গে এক হয়ে আছে। যেমন তার সাধারণ সংখ্যা, তেমনই তার পূজাবার্ষিকী। একসময়ে অল্পবয়সে যারা এই পত্রিকার নিয়মিত পাঠক ছিল, আজ তাঁরা হয়তো অনেক বড়। কিন্তু হারানো ছোটবেলাকে খুঁজে পেতে তাঁদেরও সমান আকর্ষণ আনন্দমেলার পাতায়। এত বছর ধরে কত বিচিত্র স্বাদের গল্প প্রকাশিত হয়েছে এই পত্রিকায়। ছোটদের মন জয় করা সেই সব অজস্র গল্পের নির্বাচিত সংকলন ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। 'পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা গল্পসংকলন' এবং 'আনন্দমেলা গল্পসংকলন' প্রকাশ-মাত্র তুমুল জনপ্রিয়। এবার প্রকাশিত হল রোমাঞ্চকর 'আনন্দমেলা ভূতের গল্পসংকলন'।

১৩৭৮ বঙ্গাব্দে (ইংরেজি ১৯৭১) প্রথমবার প্রকাশিত হয় পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা। কয়েকবছর কেবলমাত্র শরৎকালেই প্রকাশিত হওয়ার পর ১৯৭৫ সাল থেকে পাক্ষিক-সাপ্তাহিক-মাসিক নানা পর্যায়ে আনন্দমেলা তার জয়যাত্রা অব্যাহত রেখেছে। বাচ্চাদের মন জয় করেছে কত না দুষ্টু ভূত, বন্ধু ভূত, ভয়-দেখানো ভূত, খোনা গলার ভূত, বর দেওয়া রাজা ভূত বা কালোয়াতি গান গাওয়া ভূত। সমস্ত ভূতের গল্প কোনও একটি সংকলনে প্রকাশ করা অসম্ভব। তাই ১৯৭১ থেকে ২০০৯-এর মধ্যে প্রকাশিত অজস্র গল্প থেকে নির্বাচিত কিছু গল্প রাখা হয়েছে এই 'আনন্দমেলা ভূতের গল্পসংকলন'-এ।
সুবিখ্যাত প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমল মিত্র, মনোজ বসু, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, সুকুমার সেন, সত্যজিৎ রায়, বিমল কর থেকে শুরু করে একালের জনপ্রিয় লেখকদের মনমাতানো গল্প হাজির করেছে বিচিত্র সব ভূত। আনন্দমেলার বরে এবার জবর-জবর ভূতের ঠিকানা ছোটদের হাতের মুঠোয়।

ছোটদের প্রিয় পত্রিকা আনন্দমেলা যেন জাদু জানে। ছেলেমেয়েদের মনের খোরাক জোগাতে তার জুড়ি নেই। এত বছর ধরে কত বিচিত্র স্বাদের গল্প প্রকাশিত হয়েছে এই পত্রিকায়। ছোটদের মন জয় করা সেই সব অজস্র গল্প নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে—'পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা গল্পসংকলন' এবং 'আনন্দমেলা গল্পসংকলন'। এবার প্রকাশিত হল রোমাঞ্চকর 'আনন্দমেলা ভূতের গল্পসংকলন'। জনপ্রিয় লেখকদের মনমাতানো গল্প হাজির করেছে বিচিত্র সব ভূত। আনন্দমেলার বরে এবার জবর-জবর ভূতের ঠিকানা ছোটদের হাতের মুঠোয়।

ভূমিকা

ভূত থাকুক বা না থাকুক, ভূতের গল্প যে বহাল তবিয়তে আমাদের মধ্যে বেঁচেবর্তে রয়েছে, তাতে একেবারেই সন্দেহ নেই। দুষ্টু ভূত, বন্ধু ভূত, ভয়-দেখানো ভূত, খোনা গলার ভূত, বর দেওয়া রাজা ভূত বা কালোয়াতি গান গাওয়া ভূত..... আমাদের গল্পের দুনিয়ায় ভূতেরা অজস্র রূপে, বহু আকারে উপস্থিত। সংস্কৃত ভাষায় অস্ ধাতুতে লিট্ অ প্রয়োগে 'ভূত' হয়। অর্থাৎ কিনা অতীত। যা আর নেই, যা হয়ে গিয়েছে, তাকেই বলব ভূত। সে তো গেল ব্যাকরণের কথা। গল্পের দুনিয়া ব্যাকরণের থেকে একেবারেই আলাদা কিনা, তাই ভূতের গল্প অতীত ছাড়িয়ে বর্তমান হয়ে টিকে রয়েছে আমাদের মধ্যে। তাই ভূতের গল্প এখনও লেখা হচ্ছে, পড়া হচ্ছে, পড়ে ভয় পেয়ে লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে...

আনন্দমেলা পত্রিকার ইতিহাসে অনেক-অনেক ভূতের গল্প রয়েছে। কোনও একটি সংকলনে সবক'টি প্রকাশ করা অসম্ভব। ১৯৭১ থেকে ২০০৯-এর মধ্যে প্রকাশিত গল্প থেকে আমাদের বেছে-বেছে কয়েকটি প্রকাশ করতে হল। শীতের দুপুরে এর মধ্যে কোনও গল্প হয়তো তোমাদের শিরশিরানি বাড়িয়ে দিতে পারে। লেখাপড়া ফাঁকি দিয়ে যদি কখনও এই বইটি পড়তে যাও, দেখবে হয়তো চোখ রাঙিয়ে দিল কোনও ভারিক্কি ভূত। বর্ষার রাতে টিপটিপ করে বৃষ্টি যখন এসে পড়বে জানলার কাচে, তখন হয়তো কোনও বন্ধু ভূতের দেখা মিলবে এ বইয়ের পাতায়। খুব গরমে ঘাম জুড়িয়ে দেবে মজাদার কোনও ভূত। এক মলাটে এমন সত্তরটি ভূতের গল্প হাতে পাওয়া কি সোজা কথা?

তবে এ-ও হতে পারে যে, কোনও-কোনও ভূত অভিযোগ জানাল তোমার কাছে। তোমার বাবা-মা যখন আনন্দমেলা পড়তেন, তখন তাঁদের চেনা কোনও ভূত হয়তো তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারল না.... হয়তো তার জায়গা হয়নি এই বইয়ে। তাদের বুঝিয়ে বোলো, যতই সুজন হও, তেঁতুলপাতায় সকলের জায়গা হওয়া তো সম্ভব নয়। সেইসব ভূতেরা কিন্তু অস্ ধাতুতে লিট্ অ হয়ে যাচ্ছে না। তাদেরই তো ভাইবোনেরা জায়গা পেয়েছে এই বইয়ে। তোমরা এসব গল্প পড়লে ধীরে ধীরে অন্য সব ভূতকে পছন্দ করবে, চিনবে। আনন্দমেলা-র বরে এবার জবর-জবর ভূতের ঠিকানা তোমাদের হাতের মুঠোয়।

পৌলোমী সেনগুপ্ত

সূচি

আধিভৌতিক

সন্তোষকুমার ঘোষ

আধিভৌতিক মানে জানো? না জানলে লজ্জা নেই, আমিও জানি না। তবু লেখাটার এই নাম রেখেছি কেন? এই জন্যে যে, এর আধখানার বক্তা ভূত, বাকি অর্ধেক এখনও জ্যান্ত এই আমি। ডিকশনারিতে দাঁতভাঙা অন্য কোনও মানে লিখে থাকবে।

দিনের বেলায় লিখছি, কারণ নিশাকালে বিশেষত ভূতদের বিষয়ে রচনা নাস্তি নাস্তি, শাস্তরে লেখা আছে। কোন শাস্তরে? বোধহয় পুরাণে কি মনুতে; কিংবা জরথুখুরে কোনও পুঁথিতে। অথবা মথিলিখিত সুসমাচারেও "মা-লিখ" বলে থাকতে পারে। ঠিক কোনটায় জানি না, আমি কোনওটাই পড়িনি, তবে আছে বিশ্বাস করি, মানি। একালে আমরা তো কোনও-কিছু পড়ি না, দরকারই হয় না। না পড়েও কোনটায় কী আছে বলে ফেলতে পারি। স্রেফ শুনে। আজকাল এই নিয়মটাই চলছে।

লিখছি, ঘাড়ের উপর কার নিশ্বাস, টের পেলাম। গরম—টাটকা-ভাজা লুচি থেকে যে-ধোঁয়া বেরোয়, সেইরকম।

"দেখি, কী লিখছ", কেউ বলল, বিকালবেলার পাতারা যে-গলায় কথা বলে, অবিকল সেই গলা। তার ফড়ফড় করে কাগজ ছেঁড়ার মতো হাসিও শুনলাম।

"হাসছ যে?"

"দিনের বেলা আলো জ্বেলে রাখতে দেখে। যে-জন দিবসে মনের হরষে, পড়োনি?"

কাঁচুমাচু মুখে বললাম, "হরষে তো নয়, ভয়ে।"

"ভয়?" সেই গলা আবার বলল, "পাও কেন?"

প্রশ্নটা কঠিন বলেই উত্তরটা চট করে দিতে পারলাম।—"পাই বলেই পাই। হঠাৎ এসে যায়, তুমি যেমন এসেছ। ওটা কেড়ে নিয়ো না কিন্তু, পারলে বরং আর খানিক দিয়ে যাও। ছেলেবেলায় মাসিমা যাবার সময়ে হাতে যেমন একটা কি দুটো টাকা গুঁজে দিয়ে যেতেন। সবই তো যাচ্ছে, যা নিয়ে জন্মেছিলাম, বড় হচ্ছিলাম, তার সব। বন্ধুবান্ধব, দ্বিতীয় পক্ষের দাঁত, টো-টো করে ঘোরা, মিঠাইমণ্ডার লোভ, মায় চুলসুদ্ধ উঠে যাচ্ছে। যা আছে তা-ও কাঁচা রাখতে পারছি না।"

"আমার যে সব গেছে?" সে বলল, "অল্প অল্প যাচ্ছে বলেই লাগছে। যেদিন সব যাবে, দেখবে সব ফিরে পেয়ে গেছ।"

"ওরে ব্যস", আমি বললাম, "তুমি যে ফিলজফার ভূত!"

"উঁহু," সে বলল, "ভূতেদের মধ্যে ফিলজফার মোটে পাঁচটি। রবিবাবু যে পঞ্চভূতের কথা লিখেছেন। যাক, তোমার কী-কী সব যাচ্ছে বলছিলে?"

খেইটা ফের ধরে নিয়ে বললাম, "আগে যা-যা ভালবাসতাম, এখন তার অনেক কিছুই ঘেন্না করি। যেমন বেড়াল। রাতে বিছানায় পাশে নিয়ে শোবার কথা ভাবতেও পারি না। কোনও কিছু ভাল লাগাই ক্রমে শক্ত হয়ে উঠছে। দোহাই, ভয়টাও যেন না যায়। অন্তত ওটা যেমন পাচ্ছি, তেমনি পেতে দাও।"

সে বলল, "মিথ্যে কথা। তোমরা ভয় পাও না। বানাও।"

"ভয় বানাই!"

"তা-ই তো। ভয় বানাও, জয় বানাও।"

অবাক, আমি বললাম, "জয় বানানো ব্যাপারটা কী?"

"মানুষ মাত্রেই অল্পস্বল্প যা বানায়। বিশেষ করে যা বানাতেন রথী-মহারথী, ডাকসাইটে দিগ্বিজয়ী সব বীরেরা।"

"চেঙ্গিস, তৈমুর, নাদির?"

সে গলগল করে যোগ করল, "সিজার, আলেকজান্ডার, নেপোলিয়ন, হিটলার। নাম শোনোনি?"

বাধা দিয়ে বললাম, "বানাতেন না তো, ওঁরা জয় করতেন।"

ধমক দিয়ে সে বলল, "না। বানাতেন। লোকে গেলাসে সিদ্ধি ঘুঁটে যেরকম বানায়, যুদ্ধে সিদ্ধিও তাই। খেয়ে বুঁদ হয়ে যেতেন। খাঁটি হলে তো টিকত, থাকত। থাকেনি। ওদের ব্যাপারগুলো না সত্যি, না স্থায়ী।"

আবার যে লেকচার ঝাড়ে! হাতজোড় করে বললাম, "প্লিজ! অন্য কথা বলো। লেকচার নয়। ওটা আমাদের অঢেল আছে। মাস্টারমশায়রা ক্লাসে ক্লাসে, নেতারা মাঠে মাঠে, এমনকী ঘরে আমার যিনি—"

সে বলল, "চুপ! ওসব কথা একদম নয়। এটা ছেলেদের গল্প, তায় ভূতের, ওসব চলবে না।"

চুপসে গেলাম। ওর কথা মান্য করাই ঠিক। সত্যিই তো, বুড়ো বয়সে এই সাবজেক্টে দিচ্ছি হাতেখড়ি।

তখন তার বুঝি দয়া হল। বলল, "বেশ, জয়-টয়ের খটোমটো কথা বাদ দিচ্ছি। ভয় দিয়ে শুরু হয়েছিল, তাই চলুক। আলো জ্বেলে লিখছ তবে ভয়ে?"

ঘাড় কাত করলাম। বললাম, "নিরুপায়, নাচার। আলো নেবালেই ঘরে, দেয়ালে, স্কাইলাইটের নীচে সব নানা আকারের ছায়া তরতর করে নেমে আসে। চলাফেরা করে কিংবা আঁকা থাকে।"

"বলো তো সেগুলো কী?"

"কী আবার! কোনওটা ঝাঁকড়াচুল বটগাছ, কোনওটা বনমানুষের মাথা, কিংবা বাবুই-বাসা খোঁপা। তা ছাড়া আইসল্যান্ড, আলাস্কা, আফ্রিকা—সেইসব দেশ-মহাদেশের ম্যাপ, যেখানে কখনও যাব না, যাইনি।"

"তবেই দেখো, ছায়ার কী বিরাট ব্যাপার। একসঙ্গে বটানি, বায়োলজি, জিয়োগ্রাফি আর কত কী জ্ঞান পাচ্ছ।"

চট করে বলে বসলাম, "সেই ছায়ারা তো আসলে তোমরা, তুমি!"

সে রেগে গেল।—"আমরা ছায়া?"

"শুনেছি তা-ই তো।"

"না। আমরা দেখতে ছায়ার মতো, এই পর্যন্ত। ছায়ার আকার ধরি। তোমরা যেমন তোমাদের যার-যার চেহারার আকার ধরে আছ। কিন্তু তোমরা কি শুধুই তোমাদের চেহারা নাকি?"

অপমান বলে ঠেকল, জোর দিয়ে বলে উঠলাম, "না, আমরা মানুষ।"

সঙ্গে সঙ্গে সে হাততালির মতো আওয়াজ করে বলে উঠল, "তেমনি, আমরা ভূত।"

টেরচা চোখে চেয়ে বললাম, "সবাই?"

সে কী যেন বিবেচনা করল।—"উঁহু, না, সবাই না। সবাই একবারেই ভূত হতে পারে না, কিছুদিন অপেক্ষা করে থাকতে হয়। যারা অল্প-অল্প ভূত তারা হল অদ্ভুত। মাঝখানে শুধু ভূত। আর যারা ভূতের চেয়েও ভূত, তাদের বলে সম্ভূত।"

"আমাদের যেমন বামুন, কায়েত, বদ্যি?"

"কতকটা তা-ই। তবে আমরা তো জাত-টাত বলি না, আমরা বলি শ্রেণি।"

"আজকাল আমরাও বলি," কতকটা গর্বের সঙ্গে বললাম। ভূতটা যে খালি আমাদের উপর টেক্কা দিতে চাইছে সেটা বরদাস্ত হচ্ছিল না। তাকে কায়দা করে বাগে পেতে বললাম, "শ্রেণিহীন সমাজ-টমাজের কথা তোমরা ভাবো না?"

সে একটু ভেবে নিয়ে বলল, "আজকাল

একটু-আধটু উঠছে। নতুন যারা আসছে, খুব তেরিয়া ধরনের, তারা তুলছে। আমাদের ভুতনাথ এসব একদম বরদাস্ত করেন না। মাঝে মাঝে বম-ভোলা হয়ে বেহুঁশ হয়ে থাকেন, নইলে তাঁর শাসন খুব কড়া।''

''ভূতনাথ? তোমাদের তল্লাট ভগবান বুঝি শাসন করেন না?''

সে বলল, ''দূর! তাঁর দৌড় জানা আছে। ভগবানেরও পরিণতি ভূত। তা-ও সবসময়ে হতে পারেন না, হন খালি মাঝে মাঝে। দশচক্রে পড়লে। নইলে মনে হয় এখনও মাঝের স্তরেই ঠেকে আছেন। তোমরাও তো তাঁর রীতি-নীতিকে বলো অদ্ভুত। বলো না?''

আমার মুখে কথা সরছিল না। সে ফটফট ফটাস করে আঙুল মটকানোর শব্দ করে বলল, ''আচ্ছা, আরও সোজা করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমরা তো ভূত? 'ভূ' মানে কী, বলো দেখি?''

বললাম, ''ভূ-ধাতুর মানে তো হওয়া।''

''তা হলেই দেখো, আমরা তোমাদের ওপরে। আমরা ভূত মানে হয়ে গেছি। তোমরা এখনও হচ্ছ, হয়ে যেতে পারোনি।''

সন্দেহের গলায় বললাম, ''ভূত কথাটার একটা অর্থ তো পৃথিবী।''

টিকটিকির মতো করে সে বলল, ''ঠিক ঠিক। অর্থাৎ পৃথিবীটাও আমাদেরই। তোমরা দখল করে বসে আছ।''

অজান্তেই আমার বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গেল। বললাম, ''আর বেশিদিন না। তোমাদের দখলেই বোধহয় চলে যাচ্ছে বা চলে যাবে। দেরি নেই দেখতে পাচ্ছি।''

ভবিষ্যৎ ভূতেদেরই, এই ইঙ্গিতে সে বোধহয় উৎফুল্ল হল।

''তা হলে আমাদের শক্তি স্বীকার করছ?''

যেন কোনও ম্যাজিশিয়ানের প্রশ্ন— প্রশ্ন তো নয়, আদেশ। আমি আর নিজের কর্তৃত্বে নেই, তাই নিজেকেই বলতে শুনলাম ''করছি।''

সে বলল, ''না করে উপায় কী? তোমাদের

মন্তরেও তো করেছ। যা দেবী সর্বভূতেষু—সব **ভূতের যিনি দেবী**, তিনি তোমাদেরও শক্তি।''

ততক্ষণে খানিকটা সামলে নিয়েছি। ঘাড় বেঁকিয়ে বললাম, ''কী এমন শক্তি তোমাদের আছে শুনি? থাকো তো অন্ধকারে—''

বিড়বিড় করে সে বলল, ''কথাটা ঠিক নয়, ঠিক নয়। তবু তা-ও যদি হয়, আলো আর অন্ধকারের মধ্যে কোনটা বড়, বলো দেখি?''

না ভেবেই বললাম, ''আলো। আলোয় সব দেখি, আলোর কত গতি। এমনকী, আকাশের তারা কত দূরে, আমরা তা-ও আলোকবর্ষ দিয়ে মাপি।''

চুপ করে একটু শুনেই সে বলল, ''তা হলেই দেখো! আলোকবর্ষ! মানে, আলোককে তবু মাপা যায়, অন্ধকারের কোনও বর্ষ নেই। অন্ধকার আসে না, থাকে। তারই মধ্যে আলো এখানে ওখানে একটু চকের গুঁড়ো ছড়িয়ে রাখে।''

''তাই তোমরা শুধু রাত্তিরবেলা থাকো?''

''ও হরি'', সে হেসে উঠল, ''তা-ই ভেবে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে দিনের বেলা লিখতে বসেছ, আলো জ্বেলে? উঁহু। আমরা দিনেও আছি, রাতেও আছি। সকালে আছি, বিকালেও। উঠতে বসতে, পাশ ফিরতে। সর্বদা যদি না-ই থাকব, তবে লিখেছে কেন যে, ঠিক দুক্কুর বেলা, ভূতে মারে ঢেলা? যে-লোকটা লিখেছে সে জানত। মারি, একটা ঢিল মারি?'' বলে সে সত্যিই যেন মুঠোটা পাকিয়ে ধরল।

মাথা বাঁচালাম, আন্দাজে সরে গিয়ে। আমার রাগ হল।—''দেখো, তুমি অন্যায় সুযোগ নিচ্ছ, মেঘনাদ যে-সুযোগ নিত। তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ, অথচ আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। এ কি একটা খেলার নিয়ম হল?''

''হল না বুঝি?''—সে হালকা গলায় বলল, ''তা হলে মোগল হারেমে বাদশাজাদিদের সঙ্গে সেনাপতিদের জমত কী করে?''

বলেই সে কেমন-গলায় বলল, ''ছি-ছি। এই **গল্পে এসব চলবে না। খেলার আইনটা আমিই ভঙ্গ করলুম? ছি-ছি। জিভ কাটতে সাধ যাচ্ছে।''**

ফস করে বললাম, ''জিভ থাকলে তো কাটবে!''

সে যেন ক্ষুণ্ণ হল। ''ভাবছ নেই?''

জবাব দিলাম না। ততক্ষণে আমার সাহস পানাপুকুরে চান করে আসার পরদিনে জ্বরের মতো চড়চড় করে বেড়ে যাচ্ছিল। যেন আমি আর ও সমান-সমান, এমনি কায়দায় বললাম, ''নেই। জিভ, কান, নাক, চোখ— কিচ্ছু নেই!''

''কান আছে,'' সে বলল, ''নইলে শুনছি কী করে? আছে, তবে ফট করে দেখাতে পারি না।''

''তার মানে নেই।'' ঠাট্টার সুরে বললাম। সে রীতিমতো রেগে বলল, ''তোমার বুদ্ধি নেই?''

''আছে বলেই তো মনে করি।''

''তা হলে পরীক্ষায় টায়ে-টুয়ে পাস করেছিলে কেন? কিংবা ষাঁড়ে তাড়া করলে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাও কেন? তার মানে যার যা আছে তার দরকারমতো তা হাজির হয় না। দেখানো যায় না। নইলে দেখো, আমার নাক আছে, এই তো ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছি। প্রকাণ্ড নাক, পাটাটা ফুলে উঠে উঠে তোমার এই গোটা ঘরটা ভরে ফেলছে, টের পাচ্ছ? চোখ নয়, কিন্তু চাউনিও দেখাতে পারি। ভাটার মতো ধক্‌ধক্ জ্বলে, কখনও দেখোনি? সাপের মণি? তার কাছে চন্দ্রসূয্যি হার মেনে যায়, তো সাপের মণি মাঝরাতে মাঠের মধ্যিখানে সেই চোখ চেয়ে থাকে। কখনও বাঁশঝাড়ের মাথায়, কখনও ঝাউবনের কোণে, কখনও—''

''থাক, থাক,'' আমি বলে উঠলুম, ''ব্যাখ্যানা করে শোনাতে হবে না।''

সে তবু বলে গেল, ''শুনছ তো আমরা কথাও বলি। আমাদের কত যে রকমারি আওয়াজ, তুমি ভাবতেও পারবে না। শোঁ-শোঁ— মনে হবে হাওয়া বইছে। ঠক-ঠক, মনে হবে কেউ কিছু ঠুকছে। ছপ ছপ— যেন জল ঠেলে কেউ হাঁটছে। এমনি হাজারও রকম, রাত্তিরে ঘুম না এলে যেসব শব্দ তোমরা শুনেও শোনো না, কিংবা **বাজে বলে ঝেড়ে ফেলে দাও, আমরা সেইসবই কুড়িয়ে গলায় তুলে রাখি। খসখস, গুমগাম, দুটো**

পাহাড়ের মাঝখানে ছোটাছুটি করা প্রতিধ্বনি—আরও কত কী!''

''তবে যে,'' ঘাড়ের যে-জায়গায় নিশ্বাস লাগছিল সেখানটা চুলকে বললাম, ''শুনেছিলাম, তোমাদের গলা খোনা?''

সে বলল, ''আসলে ওটা তোমাদের ত্রৈলক্য মুকুজ্জে আর হেমেন রায়দেরই মগজে বোনা। আমাদের আদালতে ওদের নামে এখন অনেকগুলো মানহানির মামলা ঝুলছে।''

''মরার পরেও মামলা?''

''বা-রে, মামলা যে! মামলার নিয়মই তো ওই। মামলা মানুষকে মারে, মারার পরেও ছাড়ে না। পেট ফাঁসিয়ে দেবার পরও বুকে-মুখে আরও ছুরি চালায়, মড়াকে একেবারে সারা করে ছাড়ে।''

অনেকক্ষণ কোনও সাড়াশব্দ নেই। লেখা মাথায় উঠে গিয়েছিল। শেষে আমিই তাকে ডাকলাম। ''কই? আছ?''

কোথা থেকে সে টোয়েন্টিনাইন খেলার ডাকের মতো গলায় বলল, ''আছি।''

''একটা কিছু বলো। তোমাদের কী-কী শক্তি আছে যেন বলছিলে— সেসব কী। গাছ থেকে হড়াৎ করে নামা, লম্ফঝম্ফ, ভূমিকম্প, ঘাড় মটকানো, এসব বিস্তর শুনেছি। আরও ভাল কিছু করতে পারো?''

''ভাল বলতে কী বোঝো আগে তা-ই বলো।''

''ধরো, যেমন গান?''

''খু-উব'', সে বলল, ''তোমাদের চেয়ে ঢের ভাল পারি। তোমাদের গলায় তো মোটে একটা কি দুটো সুর লাগে—''

"না," তীব্র প্রতিবাদ করলাম, "সাতটা। আমরা সপ্তসুর বলি।"

"আমরা বলি সংশপ্তক। আমাদের গান আরও গ্রাম্ভারী।"

"সংশপ্তক?" অবিশ্বাসের সুরে বললাম, "কথাটার কি ওই মানে?"

একদম আমল না দিয়ে সে বলে গেল, "আমরা ওই মানেতেই বলি! তা হলেই হল। আমাদের মানেতে।"

ওর এত লম্বাই-চওড়াই আর বরদাস্ত হচ্ছিল না। বললাম, "তোমার মুখেই শুধু বড়াই। এতই যদি পারো, তবে দেখা দিচ্ছ না কেন? ওইটেই তোমার চালাকি, বুঝেছি। ধরা-পড়ার ভয়। আসলে তুমি হয়তো টিংটিঙে এক তালপাতার সেপাই—"

সে বলল, "উঁহু, তালগাছের। কিন্তু দেখা দেব কী! তুমি তো ভিতু!"

"দিয়েই দেখো না। দেখতে পেলেই হয়তো আমার ভয় ভেঙে যাবে।"

"দেব তা হলে?"

"দাও না," বললাম চ্যালেঞ্জের সুরে। বললাম, আর মনে মনে ভাবতে লাগলাম, না-জানি এক্ষুনি কী ঘটে যাবে। হয়তো হল্‌কা হাওয়ার ঝড় উঠবে, আলোটা দপ্‌ দপ্‌ জ্বলবে-নিববে, দূর থেকে কোনও প্যাঁচার ডাক, কিংবা ককিয়ে ককিয়ে একটা কুকুরের কান্না—আমি তবু বলতে থাকলাম, "দাও, দেখা দাও, দাও, দাও," কিন্তু চোখ বুজে।

"এই দেখো, আমার নাক, এই আমার চোখ, আর এই—"

সে সত্যিই দেখাচ্ছিল কি না জানি না, আমি তো পিটপিট করে তাকাচ্ছি, আর চোখ বন্ধ করে ফেলছি। না দেখেই ফরমাশ করে বসলাম, "এ তো সব আলাদা আলাদা। সব মিলিয়ে তুমি একসঙ্গে, মানে গোটাটা কেমন, একবার সেটা দেখিয়ে দাও দিকি।"

তৎক্ষণাৎ সে যে কেমন হয়ে গেল। ভূতের নিশ্বাস এমনিতেই বেশ দীর্ঘ, দীর্ঘতর শ্বাস পড়ল, হাতি যেন শুঁড় দিয়ে জল ঢেলে দিচ্ছে, সেই ধরনে। শুনতে পেলাম মিইয়ে-যাওয়া সেই ভূত বলছে, "ওইটেই যে পারি না! আমরা আলাদা করে অনায়াসে কখনও নাক, কখনও মুখ, হাত কিংবা ঠ্যাং হতে পারি, হয়ে যাই, কিন্তু আস্ত চেহারাটা আর কখনও ফিরে পাই না। পুরোটার মতো দেখতে হয়ে যদিই বা কখনও দাঁড়াই জেনো, সে ওই দেখতেই— বড়জোর গোটা একটা কঙ্কাল। আমাদের রক্তমাংস দেওয়া হবে বলে কবে থেকে কত কথা শুনে আসছি; কত প্রস্তাব পাস হল, বাজেটের পর বাজেটে কত বরাদ্দ, কত প্ল্যান, কিন্তু যা ছিলাম, তাই আছি— অস্থিসার; ঠকঠক করে বাজে এমন কয়েকটা হাড়। এর বেশি কোথায় পাচ্ছি?"

যে-চোখ কারণে-অকারণে ধক্‌ধক্‌ জ্বলে, সে-চোখে কি জলও জমে? জানি না। কিন্তু টের পেলাম ভূতের গলা যেন ভিজে। সে যখন কাতর হয়ে বলছিল, "আমরা কখনও পুরো চেহারার ভূত হতে পারি না", তখন গলে গিয়ে আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "আমরাই কি কেউ পুরো মানুষ কখনও হয়েছি, হতে পারি? যাক, ভূত তুমি এ নিয়ে দুঃখ কোরো না।"

ওর যে-পিঠ নেই, সেই পিঠে আমি আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে থাকলাম।

ও কি সুখ পাচ্ছিল? ওর কি সুড়সুড়ি লাগছিল? ভূতের কি সুখ-সুড়সুড়ি এইসব থাকে? বলতে পারব না। ও কি ঘুমিয়ে পড়েছিল? ভূতেদের ঘুম থাকে কি না, তা-ও ঠিক জানি না। ও আছে এই ঘরের মধ্যেই, কিন্তু ছোঁয়াছুঁয়ির বাইরে; তাই গা ছমছম করছিল। ওকে সেটা বুঝতে দিলাম না।

সেই নিশ্বাসটাও আর পড়ছিল না। তবু ও চলে যায়নি, এটা ঠিক। গেলে, গল্পে যেমন পড়েছি, কোথাও কোনও ডাল মড়াৎ করে ভেঙে পড়ার শব্দ হত।

কাঁটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রেডিয়োতে যেমন ঠিক মিটারব্যান্ডটা ধরে, আমিও তেমনই ওর গলা তখন খুঁজে মরছি। যেন ফোন করছি নম্বরের পর নম্বরে, ডায়াল ঘুরিয়ে। খটখট, খটখট আওয়াজ। কেটে যাচ্ছে। পাচ্ছি না। অনেক পরে, হয়রান হয়ে, আমি

যখন কপালের ঘাম মুছছি, তখনই যেন ফিসফাস গলা ফের শুনতে পেলাম, ‘‘হ্যা—লো!’’

ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল। বললাম, ‘‘এই! এতক্ষণ তোমার সাড়াশব্দ পাইনি কেন?’’

‘‘ঠিক নম্বরটা ডায়াল করতে পারোনি বলে।’’

বললাম, ‘‘ভূত! তোমার টেলিফোন নম্বর কত?’’

‘‘টেলিফোন?’’ সে বলল, ‘‘আমাদের তো টেলিফোন নেই, খালি টেলিপ্যাথি আছে। খু- প্যাথেটিকভাবে আমাদের মৃত্যু হয়েছিল কিনা, তাই পরে আলাপ-সালাপ যা, তা টেলিপ্যাথেটিক কায়দাতেই হয়ে থাকে।’’

‘‘সে আবার কী?’’

‘‘বুকের শিরে-শিরে অনুভব,’’ সে হেসে বলল, ‘‘আর কিছু না।’’

এই কথা শুনে আমার বুকটাও শিরশির করে উঠল। বললাম, ‘‘ভূত, তুমি ছেলে, না মেয়ে?’’

টের পেলাম সে আবার হাসল।—‘‘মেয়ে হলেই জানি তোমার জমত বেশি। কিন্তু এটা তো ছোটদের গল্প, তাই ছেলে হলেও ক্ষতি নেই। চলবে।’’

বাইরে কার পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। তক্ষুণি ভূত উসখুস করে উঠল।—‘‘কে আসছে, আমি চলি।’’

‘‘থাকোই না,’’ আমি যেন তার হাত ধরে টানতে গেলাম, ‘‘কেউ এলেই তোমাকে বুঝি যেতে হবে? কেন?’’

সে বলল, ‘‘তা-ই নিয়ম। যতক্ষণ কোথাও একজন, আমরাও ততক্ষণ। যেই আর-একজন এল, ওমনি আমরা নেই। দু’জনে মিলে একসঙ্গে ভূত দেখেছে, শুনেছ কোথাও? কক্ষনও শুনবে না। এমনকী একটা বাড়িতে একই রাতে দু’জনই হয়তো দেখতে পেল এমন হয়েছে, কিন্তু আলাদা সময়ে, আলাদা ভাবে।’’

ভেবে দেখলুম, কথাটা ঠিক বটে। বললাম, ‘‘ভয়ও তো তা-ই।’’

সে বলল, ‘‘একই নিয়মে বাঁধা যে, যত ভয় আর যত ভূত, আমরা সব্বাই।’’

চিন্তিত সুরে বললাম, ‘‘তুমি বলছ তা হলে একা হলেই ভূত?’’

‘‘একা হলেই।’’

বিমর্ষ বোধ করছিলাম। আকুল হয়ে বলে উঠলাম, ‘‘ভূত, আমার তা হলে বোধহয় আর উপায় নেই। দু’জন কেন, দশজনের মাঝখানে থাকলেও আজকাল আমি কেমন একা হয়ে যাই, ভয় লাগে, মনে হয় পাশে কেউ নেই।’’

"তা হলে তুমি মরেছ," সে নিষ্ঠুর করে বলল আর তৎক্ষণাৎ আমি জবাব দিলাম, "যেমন তুমি?"

সে কথাটা গায়ে না মেখে আবার বলল, "তুমিও। তুমি এখন রোজ যা পড়ো, যা নিত্য দেখো, কানে শোনো, মানুষের মুখে যেসব শুনে চমকে ওঠো, তার কি মানে বোঝো? না। তার মানে, তুমি আর এখন নেই, এখানে নেই, বর্তমান নও, অতীত হয়ে গেছ। অতীত কথাটার একটা মানে তো ভূত? তুমিও তা-ই—"

"বলতে চাইছ তুমি যে, আমিও সে?"

অনেক রাত্রের হাওয়া-পাওয়া নদীর মতো ছলছল গলায় সে বলল, "অবিকল।"

চিমটি কাটলাম নিজেকে, হাতের নাড়ি ধরে পরখ করলাম। কাঁপা কাঁপা গলায় বলতে থাকলাম, "ভূত, আমি জানি না, তুমি আগের জন্মে কী ছিলে—"

"কী মনে হয়?"

"ভাষা শুনে কখনও মনে হয় কবি-টবি কিছু। ইতিহাস থেকে মাঝে মাঝে যেমন বুকনি ঝাড়ো, মনে হয় তুমি ছিলে হিস্টারিয়ান। আবার যে-রকম ধোঁয়াটে তোমার কথাবার্তা, তুমি দার্শনিকও হতে পারো।"

সে বলল, "না, শুধু ড্যাবডেবে চোখে চেয়ে থাকি— আমরা তাই দর্শন। আকারই যখন ধোঁয়াক্কার, তখন কথা তো একটু ধোঁয়াটে হবেই— হবে না? আমরা মরে গেছি, তাই বলতে পারো আমরা মামুলি ঐতিহাসিক নই, এক অর্থে নিজেরাই এক-একটা ইতিহাস। সৃষ্টির গোড়া থেকে আজ অবধি কত জন, ভেবে দেখো। সত্যি বলতে কী আমরাই তো মেজরিটি, সংখ্যায় তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি। যারা দলে ভারী, তারা একটু দাপট দেখাবে না?"

বললাম, "কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। বলো তো আসলে তুমি কী?"

তৎক্ষণাৎ কাঁচুমাচু হয়ে গিয়ে সে বলল, "আসলে আমি ছিলাম সামান্য একজন মাস্টার।"

"পাত্তা পাও? মানে ওখানে?"

সে বলল, "আগে পেতাম একটু-আধটু। লোকে মান্যিগণ্যি করত। হালে যারা আসছে, শুনছি কেউ বিপ্লবী, কেউ শহিদ, কেউ জওয়ান— কোণঠাসা হয়ে আছি, কোথাও কলকে পাচ্ছি না। এই ভাগ্যটাই মেনে নিয়েছি, ওদের জুলুম-জবরদস্তি মুখ বুজে মেনে যাওয়া। ওদের জোর বেশি। জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে কে বিবাদ করে?"

বললাম, "ভূত, তোমার তো তবে বড় দুঃখ! মরেও শান্তি পাচ্ছ না?"

ঘাড় নেড়ে নেড়ে সে বলল, "না।"

"মরার পরেও যদি এই," মাথা চুলকে চুলকে বললাম, "আচ্ছা ভূত, তোমাদের মড়াদের তল্লাটে জ্যান্ত কেউ নেই? সত্যিই নেই? কখনও হয়ে ওঠে না?"

সে বলল, "একদম না। সব্বাই যা আছে, তা-ই থাকে, নিয়মে-হুকুমে টিকিতে টিকিতে বাঁধা—"

বাধা দিয়ে বললাম, "একবারও কি কেউ—"

সে বলল, "একবার, হ্যাঁ, একবার। একবারই জ্যান্ত ছানা একজনের হয়েছিল— পান্ত ভূতের। তা তৎক্ষণাৎ সকলে মিলে তাকে পরাভূত করে দিল।"

"সে আবার কী?"

"একঘরে, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে নির্বাসিত আর কী। যারা হয়, ভূতেদের ভাষায় আমরা তাকে পরাভূত বলি।"

সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। বললাম, "তুমি খালি হেঁয়ালি করো। এই যে এতক্ষণ কথা বললে, সত্যি বলছি, আমি তার সবটা বুঝতে পারিনি।"

"চেষ্টা করলেই পারব। মানে হল উঁচু ডালে ফলে-থাকা ফলের মতো। আঁকশি দিয়ে পেড়ে আনতে হয়।"

"পারব" আমি তার সুরে সুর মিলিয়ে বললাম, "আমিও যেদিন মরব। সেদিন হয়তো। মরে গিয়ে তোমাদের ভাষা পাব, সমান হব।"

সে চুপ করে শুনল। টের পেলাম, আবার তার বুক থেকে বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে। বললাম, "কী [illegible]নিশ্বাস ছাড়ছ যে?"

সে বলল, ‘‘কিছু না। তোমার কথা শুনছিলাম। তুমি বললে, মরে গিয়ে আমাদের সমান হবে। কত সহজে বললে। জ্যান্ত কিনা, তাই পারো। তোমরা বড় অহংকারী। অথচ কই, আমি তো বলতে পারলাম না যে, বেঁচে উঠে তোমাদের সমান হব?’’

‘‘তার মানে বলছ বাঁচা কঠিন, মরার চেয়ে?’’

সে বলল, ‘‘অনেক। পারলাম না, পারিনি। তাই তো সরে পড়লাম, এলাম পালিয়ে।’’

সে হাসছিল, না কাঁদছিল, বোঝা গেল না। যখন হাসে, তখন সে হায়েনা, কিন্তু যখন শুধু তার কান্না?

ইনিয়ে বিনিয়ে সে বলছিল, ‘‘যেদিন মরেছিলাম সেদিন ভেবেছিলাম বাঁচলাম। তখন কি জানতাম, ভূত হয়ে আরও অনন্তকাল বাঁচতে হবে, মরার পরও বাঁচা আছে? এই জন্মেও সেই মিনমিনে মাস্টারির জের টানছি, একমাত্র ভূতনাথই জানেন আমার মুক্তি কবে।’’

তাকে সান্ত্বনা দিতে বললাম, ‘‘ভূত, আমাদের হিংসে কোরো না। আমাদেরও অনেক যন্ত্রণা, দেখতে পাও না? আমাদের ভয় কথায় কথায়, ভয় পদে পদে। তোমরা অন্তত ভয় থেকে মুক্ত যে!’’

সে বলল, ‘‘বরং কাণ্ডকারখানা দেখে এখন আমরাই তোমাদের ভয় পাই।’’

এই যে অদ্ভুত ভূত, যে হয়তো দুঃখী, বুঝি দার্শনিকও, একে নিয়ে আমি করব কী? এ যে খালি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে! কোথায় ভেবেছিলাম, ওর কাছ থেকে দু’-চারটে রোমহর্ষক কাহিনি শুনে নেব, ধরা যাক, ওরই কোনও কীর্তিকথা, কাঁচা মাছ চুরি করে আনার ব্যাপার-ট্যাপার, ও বলে যাচ্ছে আমি লিখে যাচ্ছি, সাংকেতিক কোনও নাম কিংবা আসন্ন কোনও ভয়ংকর ঘটনার আভাস, প্ল্যানচেটে যেমন লিখে থাকে, লিখতে লিখতে গায়ে কাঁটা, পড়তে পড়তে তোমাদের— তা নয়, এ যে একেবারে একটা ভেতো ভূত, খালি ফোঁসফোঁস দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে! ফল হল এই, লেখাটা বড়রা ছুঁয়েও দেখবে না, আমার কোনও লেখাই দেখে না— ছোটরাও ভয়ে এড়িয়ে যাবে।

তার চেয়ে তোমাদের বরং নামকরা দু’-চারটে ভৌতিক গল্প থেকে কিছু পড়ে শোনাই, এই ভেবে ‘‘গল্পগুচ্ছ’’খানা তাক থেকে টেনে নামালাম।

‘‘রাত্রে বাতাসে তাহার হাড়গুলা খটখট শব্দ

করিয়া নড়িত... একটি চেতন পদার্থ অন্ধকারে ঘরের দেয়াল হাতড়াইয়া আমার মশারির চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—"

পাতা উলটে তারপর:

"যেন বহুদিবসের লুপ্তাবশিষ্ট মাথাঘষা ও আতরের মৃদুগন্ধ আমার নাসার মধ্যে... আমি সেই দীপহীন জনহীন প্রকাণ্ড ঘরের প্রাচীন প্রস্তরস্তম্ভশ্রেণীর মাঝখানে ...ঠুন ঠুন ধ্বনি, বারান্দা হইতে খাঁচার বুলবুলের গান, বাগান হইতে পোষা সারসের ডাক আমার চতুর্দিকে একটা প্রেতলোকের রাগিণী সৃষ্টি করিতে লাগিল..."

আর-একটা গল্পে:

"সেই কঙ্কালের আট আঙুলে আংটি, করতলে রতন-চক্র, প্রকোষ্ঠে বালা... তাহার আপাদমস্তক অস্থিতে অস্থিতে এক-একটি আভরণ..."

আবার:

"অন্ধকারে ময়দানের গাছগুলো ভূতের নিস্তব্ধ পার্লামেন্টের মতো পরস্পর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া রহিল, এবং গ্যাসের খুঁটিগুলো যেন সমস্তই জানে অথচ কিছুই যেন বলিবে না..."

এইরকম বাছাই কয়েকটা লাইন টুকে রাখছিলাম।

"নকল করছ?" সে যেন ঝুঁকে পড়ে বিদ্রূপ করল। টের পেলাম, সে আবার এসেছে।

তাকে বললাম, "শোনো, শোনো। তোমাদেরই গল্প। মাস্টারমশাই, মণিহারা, কঙ্কাল, ক্ষুধিত পাষাণ—পড়েছ, নাম শুনেছ?"

ঠোঁট উলটে সে বলল, "দূর দূর, সব বানানো, সব কাব্যি। দুরাশা নামে একটা গল্প আছে না? সেটাও পড়েছি।" বলেই সে একটা খিলখিল হাসি যেন চাপতে চেষ্টা করছিল। গল্পগুচ্ছের মলাটে-লেখা নামটা দেখিয়ে দিয়ে সে বলল, "তোমাদের ওই রবিঠাকুরেরও কী শাস্তি হয়েছে মরে গেলে দেখতে পেতে। বদ্রাওনের ওই নবাবপুত্রী, কেশরলালকে যে ভালবেসে ঠকেছিল? ভালই তো শুধু বেসেছিল, পায়নি তো। কেশরলালকে না পেয়ে সে এখন পাকড়াও করেছে খোদ লেখককে। 'বিয়ে করো, বিয়ে করো' বলে তাঁর দাড়ি ধরে ঝুলোঝুলি করছে। সে দৃশ্য যদি দেখতে!"

"কবির কী অবস্থা?" জিজ্ঞাসা করে বাতাসে কান খাড়া করে রাখলাম। ভূতের গলা ভেসে এল, "কেমন অবস্থা আবার! খুব করুণ, এর বেশি আর কী বলব। ভদ্রলোক লুকিয়ে থাকেন, পালিয়ে বেড়ান— ঠিক তাঁর গানে যেমনটি লিখেছেন— পাছে নবাবপুত্রীর খপ্পরে পড়ে যান সেই ভয়ে। সামাজিকতা, নেমন্তন্ন রাখা, সব বন্ধ। গল্প লেখার কী শাস্তি বলো তো! গোলাম কাদের খাঁর বেটি এখন শোধ তুলছে।"

আমার মনে রবি বর্মার আঁকা বিশ্বামিত্র-মেনকার ছবিটা এসেছিল, দৃশ্যটা অবশ্যই হাস্যকর, কিন্তু তোমাদের জন্যে সেকথা সবিস্তারে লেখা তো যাবে না।

"তাই বলছি," ভূত বলে গেল, "আজেবাজে, বানানো কথা একদম লিখবে না। যা জানো তা-ই লিখবে, নইলে— শুনলে, কী? তোমরা লেখো ভুল, সব মিথ্যে, আর দোষ চাপাও ছাপাখানার ভূতেদের কাঁধে। ওরা এমন কিছু ক্ষতি করে না, বরং ভুলভাল ব্যাপারগুলো আরও ভুলে ভর্তি করে ঝাপসা করে দিয়ে উপকারই করে। মাইনাসে মাইনাসে প্লাস— বুঝেছ?"

"মাস্টার মশাই!" আমি মনে মনে ভাবলাম। মুখে বললাম, "স্বভাব যায় না মলে এই কথাটার আপনি দেখছি একটা আস্ত উদাহরণ।"

কেমন অবাক হয়ে সে বলল, "হঠাৎ এত সমীহ যে!"

"সমীহ কোথায় আবার?"

"হঠাৎ খুব খাতির, একেবারে আপনি-টাপনি বলতে শুরু করেছ—"

"আপনি মাস্টার ছিলেন শুনলাম কিনা, তাই।"

"ওঃ, তাই!" সে খুব করে ভাবল, "দেখো, সম্মান-সমীহ ভূতেদের ওসব দেখিয়ো না। সম্মানের ভান বুকে অপমানের মতো বাজে, মড়ার ঘাড়ে খাঁড়ার মতো পড়ে। অশ্রদ্ধা-অবহেলা, হাসি-তামাশা এইসবই বরং সয়ে গেছে। ভূতেরা যেমন আছে থাকতে দাও, তোমাদের যত পুজার ফুলটুল, তা

[illegible] স্বখপ্ত করেছ, তাঁদের পায়ে ঢেলে দিলে [illegible] ওতে তুষ্ট হন, আমরা হই না। আমাদের যা প্রণামী দিচ্ছ, সেইটুকু দিয়ে যেয়ো, তা হলেই যেখানে আছি, যেভাবে আছি, সেইভাবেই বহাল থাকতে পারি।''

মেঘ কেটে গেছে, রাস্তায় লোকজনের সাড়া মিলছিল। মনে হল, উনি এবার সরে যাবেন, যাওয়ার উদ্যোগ করছেন। লম্বা হাই তোলার মতো শব্দ করে বললেন, "যা—ই।"

কেউ গেলেই আজকাল বাঁচি, তবু মিষ্টি কথা বলে বিদায় দিতে হয়, তাই বললাম, ''যাবেন নেহাতই? যান। আসবেন কিন্তু আবার।''

তিনি বললেন, ''আসব। কোনও উপলক্ষে ডাকলেই দেখবে হাজির।''

বললাম, ''বলছেন বটে কিন্তু ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না। ধরা যাক, কোনও বিয়ে পইতে কি শ্রাদ্ধ উপলক্ষে— কিন্তু আপনি লৌকিকতা, সামাজিকতা এসবের ধার ধারেন কি? আপনি তো অলৌকিক।''

তিনি ভরসা দিলেন, ''তবু আসব। খালি শ্রাদ্ধ বাদে। শ্রাদ্ধে আমরা আসি না, যার ব্যাপার তাকে হাতের মধ্যেই পেয়ে যাই কিনা।''

বললাম, ''বুঝলাম। কিন্তু মাস্টারমশায়, আপনার ঠিকানা কী, আপনাকে পাব কোথায়?''

''জানো না, সত্যি জানো না?''

আমতা আমতা করে বললাম, ''শুনেছি আপনারা থাকেন শ্মশানে-মশানে, শ্যাওড়া গাছে কি পোড়োবাড়িতে, কিন্তু ভূত মশাই, যা-ই বলুন সেসব জায়গায় যেতে সাহস হবে না।''

শ্মশানে মশানে শুনেই তিনি অট্টঅট্ট হাসতে থাকলেন। —''কে বলেছে? যত্তো সব গাঁজাখুরি।''

''থাকেন না?''

''থাকতাম।'' তিনি বললেন, ''আজকাল আর থাকি না। আমাদের ওখানে আজকাল ভারী স্পেস শরটেজ যে! তোমাদের এই ঘিঞ্জি শহরের চেয়ে ঢের বেশি। চারধারে নিত্যি ডজন ডজন অপঘাত, ভূতের দেশে জনসংখ্যা ভীষণ বেড়ে গেছে, পরিবার পরিকল্পনা করেও থই পাচ্ছি না।''

''রিফিউজির ঢেউয়ের মতন?''

তিনি বললেন, ''তার চেয়েও বেশি। শ্মশান-মশান, পোড়োবাড়ি সব ভরে গেছে, আমরা তাই ঠেলে এসেছি লোকালয়ে। সর্বত্র আমাদের পাবে—হাটে বাজারে, ইস্টিশনে, রেলের কামরায়, আফিসে, কলেজে, হরেক পার্টির আস্তানায়, দপ্তরে, রাস্তাঘাটের কোণের ছায়ায় ছায়ায়— কোথায় নয়? এমনকী'' তিনি একটু থেমে বললেন, ''সরষের মধ্যেও আমরা ছেয়ে গেছি।''

হতভম্ব আমার মাথায় আলগা একটা টোকা দিয়ে তিনি বললেন, ''সরষে কথাটার মানে বুঝলে না? যে-কোনওদিন লালবাজারে উঁকি দিয়ে দেখো, কিংবা তোমাদের ওই মহাকরণ না কী বলে সেখানে, তাহলেই টের পাবে।''

তখন টের পেলাম, মাস্টার নয়, ফিলজফারও নয়, ইনি আসলে এক পলিটিক্যাল ভূত।

১৩৭৮
অলংকরণ: পূর্ণেন্দু পত্রী
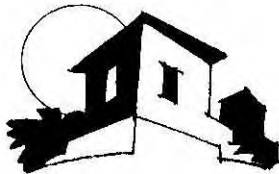
পালোয়ান ভূত

মনোজ বসু

মাতঙ্গী ঠাকরুনের দোর্দণ্ড প্রতাপ। বিধবা, খাটো খাটো চুল, বয়স হয়েছে, দেহে কিন্তু তাগত খুব। আপন কেউ নেই, মরে হেজে গেছে। ঘুরতে ঘুরতে নটবর তাঁর কাছে এসে পড়ল। খায়-দায়, সংসারের এটা-ওটা করে— মাস মাইনে তিন টাকা। ভাঙাচুরো সেকেলে বাড়িতে ঠাকরুন একলাটি থাকতেন, এখন আর-একটি এসে জুটল— নটবর।

রকমারি রাঁধাবাড়া ও খাবার-দাবার বানানোয় ঠাকরুনের জুড়ি নেই। ঘোষেদের জামাই আসবে— বিকাল থেকে তিনি জলখাবার বানাতে লেগে গেছেন। চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের ছাঁচ, নারকেলের চিঁড়া-জিরা— ঝঞ্ঝাটের কাজকর্ম, বড্ড সময় লাগে। শেষ হতে বেশ খানিকটা রাত হয়ে গেল।

রান্নাঘরের দরজায় শিকল তুলে দিয়ে নটবরকে বললেন, রইল সব। গরম লাগছে, চানটা সেরে আসি। এসে তুলে পেড়ে রাখব। নজর রাখিস, বেড়াল-টেড়াল না ঢুকে পড়ে।

বলে পুকুরঘাটে চললেন। খানিকটা গিয়ে মনে হল, খাবার জল কমে গেছে— কলসিটা নিয়ে এলে হয়, ঘাট থেকে অমনি কলসি ভরে আনা যাবে।

এসে অবাক। রান্নাঘরের দরজা হাঁ হাঁ করছে— বেড়াল ঢোকেনি, ঢুকে গেছে নটবর। নটবরের সব ভাল, খাবার জিনিস দেখলে মাথার ঠিক থাকে না। রান্নাঘরের ভিতর সে সদ্য-তৈরি খাবারগুলো পরখ করতে লেগে গেছে। সময় কম বলে যত রকম পদ আছে, একসঙ্গে মুখে ঢোকাচ্ছে। পায়ের শব্দে পিছনে তাকাল—

ওরে বাবা, ওরে বাবা, আর করব না এমন কাজ—

দৌড়, দৌড়। বাঁশের চেলা নিয়ে মাতঙ্গী ঠাকরুন তাড়া করেছেন। ধরতে পারলে আস্ত রাখবেন না আজ। বাড়ির পিছনে কসাড় জঙ্গল, বাঁশবন। অন্ধকার এমন ঘন, নিজের হাত-পাগুলো অবধি নজরে আসে না। তিরের বেগে নটবর ছুটছে। জঙ্গলটা পার হয়ে ঘোষেদের গোয়াল। গোয়ালা ঘোষ— দুধের ব্যাবসা, বিস্তর গোরু। গোয়ালে ঢুকে গোরুর পালের মধ্যে নটবর গুটিসুটি হয়ে রইল।

মাঝরাত্রে চাঁদ উঠেছে। নির্মল জ্যোৎস্না, ঠিক যেন দিনমান। গোরুর শিঙের গুঁতো ও পায়ের লাথি খেয়ে গোবর ও চোনার মধ্যে এমনভাবে আর থাকা যায় না। ঠাকরুনের রাগ এতক্ষণে ঠিক পড়ে গেছে। গুটিগুটি সে বাড়ির দিকে চলল।

বাড়িতে কেউ নেই, শোবার ঘর রান্নাঘর খোলা। মাতঙ্গী ঠাকরুন ফেরেননি। এমন তো হয় না। ভাবনা হল। রাগের বশে অন্ধকারের মধ্যে তাড়া করেছিলেন— কোনও বিপদ-আপদ ঘটল না তো? যে দিক দিয়ে তারা ছুটছিল, খুব সতর্কভাবে অন্ধিসন্ধি দেখতে দেখতে সে চলল। ভাঙাচোরা পরিত্যক্ত ইঁদারা— জলটল থাকে না কখনও, জঙ্গলে ঢেকে আছে— ক্ষীণ আওয়াজ আসে যেন সেখান থেকে। তবে কি ইঁদারায় পড়ে গেছেন ঠাকরুন?

ছুটে গেল নটবর, গিয়ে কান পাতল। হাঁ, পাতালতলে ছুটোপুটি। ঠাকরুনের গলাও অস্পষ্ট যেন পাওয়া যায়। মাতঙ্গী ঠাকরুনই— সন্দেহমাত্র নেই।

ছুটতে ছুটতে অন্ধকারে ঠাহর পাননি, ইঁদারায় পড়ে গেছেন। প্রাণের তাগিদে চেঁচামেচি লাগিয়েছেন।

মুহূর্তে নটবর মতলব ঠিক করে ফেলল। গেল চলে আবার ওই ঘোষেদের গোয়ালে। চারটে গোরুর গলার দড়ি খুলে একসঙ্গে মজবুত করে বাঁধল। এক প্রান্তে ইট বেঁধে নিল সহজে, যাতে ইঁদারার তলায় দড়ির মাথা গিয়ে পড়ে। নামিয়ে দিল দড়ি। গর্তের দিকে মুখ করে চেঁচাচ্ছে: শক্ত করে দড়ি ধরুন— টেনে তুলব। ধরেছেনও তাই— আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে। টানছে নটবর প্রাণপণ শক্তিতে— উঃ, বিষম ভার। টানতে টানতে অবশেষে উঠে এল— মাতঙ্গী ঠাকরুন নন, কালো-কালো দৈত্যাকার একজন। হাতে বাঁশের চেলা— মাতঙ্গী ঠাকরুনের হাতে যে বস্তু ছিল। দড়ি কড়কড় করছিল— ওই ওজন টেনে তুলতে কেন যে ছেঁড়েনি, তাই আশ্চর্য।

ফোঁত ফোঁত করে কাঁদছে সেই প্রকাণ্ড পুরুষ। উপরে উঠে বাঁশের চেলা ছুড়ে দিল, চোখের জল মুছল। বলে, কে ভাই আমায় বাঁচালে? আমি তোমার কেনা হয়ে রইলাম।

নটবর বলে, কে আপনি? অত কাঁদছিলেন কেন?

পালোয়ান-দারোগার নাম শুনেছ নিশ্চয়—

নটবর বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনেছি বই কী। সদর থানায় ছিলেন তিনি। ডনবৈঠক করে করে প্রকাণ্ড গতর বানিয়েছিলেন। পালোয়ান দারোগার নামে চোর-ডাকাত থরহরি কাঁপত। শ্রাবণ মাসে হঠাৎ তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন।

আমিই সেই পালোয়ান দারোগা, এখন পালোয়ান ভূত। নিরুদ্দেশ হইনি রে ভাই, স্রেফ পটল তুলেছি। ডাকাতেরা গুম করে রেখে শেষটা এই ইঁদারায় ফেলে দিল। বাতিল ইঁদারা দেখতে পাচ্ছ। ওঠা-নামার জন্য গাঁথনির গায়ে লোহা পোঁতা থাকে— মরচে ধরে সেসব লোহার চিহ্নমাত্র নেই। উপরে উঠতে পারিনি, চাইওনি উঠতে। ইঁদারার মধ্যে তোফা ছিলাম এই আট মাস। উপরে এত গরম, ওখানে দিব্যি ঠান্ডা— এয়ার-কনডিশনড। কিন্তু কাল রাত্তির থেকে সমস্ত সুখ বরবাদ। পালোয়ান বলে লোকে আমায় ডরায়— আরে সর্বনাশ! পালোয়ানের উপরেও চামুণ্ডা পালোয়ানি রয়েছে—

বলছে পালোয়ান ভূত, আর শিউরে শিউরে উঠছে। বলে, বড্ড বাঁচান বাঁচিয়েছ। একটু জল খাওয়াতে পারো ভাই?

নটবর ডাকে, চলে এসো।

মাতঙ্গী ঠাকরুনের বাড়ি গিয়ে জলের কলসি দেখিয়ে দিল। চকচক করে পুরো কলসি জল গলায় ঢেলে ভূত একটু আরামের নিশ্বাস ফেলে বলে, আঃ!

বলছে, তোফা ছিলাম ভাই। আজকেই সন্ধ্যারাত্রে উপর থেকে ধপাস করে এক মেয়েলোক পড়ল। পড়েই অক্কা— সঙ্গে সঙ্গে পেতনি। অবলা নারী জেনে সাহস দিতে কাছাকাছি গেছি। ভয় নেই, ইঁদারার তলায় খাসা থাকবে— এমনি সব বলতে না বলতে, হাতে ওই বাঁশের চেলা, চেলা বাঁশ নিয়েই উপর থেকে পড়েছে, মরে গিয়েও হাতের বাঁশ ছাড়েনি— আমার চুলের মুঠো না ধরে বাঁশের চেলায় দমাদম পিটুনি। বলে কেন খেয়েছিলি চন্দোরপুলি? খাইনি বলে দিব্যিদিলেশা করছি— কে বা শোনে কার কথা— পিটিয়েই যাচ্ছে। দুঁদে দারোগা ছিলাম আমি— ডাকাত-খুনি-দাঙ্গাবাজ নিয়ে কাজকারবার— কিন্তু এমন মারকুটে মেয়েলোক বাপের জন্মে দেখিনি ভাই।

নটবর বলে, আমার মনিব। তাঁরই এই ভিটে।

পালোয়ান ভূত সবিস্ময়ে বলে, ওর কাছে ছিলে?

তিন বচ্ছর—

বাহাদুর তুমি। আমায় তো তিন ঘণ্টাতেই সর্ষেফুল দেখিয়ে দিল। না-পেরে একটানে তখন হাতের বাঁশ কেড়ে নিলাম। পেতনি মহিলার তারপরে যেন খুন চেপে গেল। হাতে আর পায়ে যে ওজনের কিল-চড় লাথি ঝাড়তে লাগল— রক্ষে কোনওমতেই ছিল না— ভাগ্যিস এই সময়ে তোমার দড়ি গিয়ে পড়ল। দড়ি ধরে বেঁচে এসেছি।

গদগদকণ্ঠে পালোয়ান ভূত বলে, যা তুমি করেছ, তোমায় অদেয় কিছু নেই। মনিববাড়ি এখানেই

থাকো কয়েকটা দিন, আমি আবার আসব। অনেক টাকা পাইয়ে দেব তোমায়।

বলেই অদৃশ্য। কথা রেখেছে পালোয়ান ভূত। কয়েকটা দিন পরে আবার দেখা দিল।

শোনো, মতলব ঠাউরেছি। পগেয়াপটির হরিরাম সাউ কালোবাজারের রাজা। যেসব ভাল ভাল জিনিস চক্ষেও দেখতে পাও না সাউর বাড়ি সমস্ত গোপন মজুত রয়েছে। রাস্তায় রাস্তায় ফেরি করে বেড়াত, এখন নোটের গদি বানিয়ে তার উপরে শোয়। হরিরামের বউয়ের ঘাড়ে আমি চাপব। বড়লোক মানুষ— চিকিচ্ছেয় মেলা খরচপত্র করবে। ভূতের রোজা হয়ে চলে যাও তুমি সেখানে। মোটা টাকার চুক্তি করে নিয়ে চিকিচ্ছেয় নেমো। দরজা বন্ধ করে পালোয়ানভাই বলে ডেকো, বুঝব এসে গেছ তুমি। মন্তর হল— ক্রিং মি ফ্‌বট। মন্তর শুনলেই সরে পড়ব।

বলতে বলতে আবার কড়া সুরে সতর্ক করে দেয়, রোজাগিরি খাটিয়ো মাত্তোর এই একবার। বাইরে এসেছি, ভাল থাকা ভাল খাওয়া চাই এখন কিছুদিন। এর পরে আর আমার পিছনে লাগতে যেয়ো না।

মুন্ডু ছিঁড়ে নেব তা হলে— খবরদার।

পগেয়াপটির হরিরাম সাউর বাড়ি তুমুল হইচই। বউয়ের ঘাড়ে ভূত লেগেছে। ওঝা-বদ্যি কত এল, টাকার বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে, ভূত কিছুতে নামে না।

নটবর এসে বলল, আমি নামিয়ে দেব। একশোখানি টাকা চাই— চিকিচ্ছে হয়ে গেলে তারপর টাকা দেবেন, এক পয়সাও অগ্রিম চাই নে।

হরিরাম এককথায় রাজি। ঘর থেকে সকলকে সরিয়ে নটবর দরজা বন্ধ করল। ঘরে শুধু রোজা আর রোগী— নটবর ও হরিরামের বউ।

নটবর বলে, এসে গেছি পালোয়ানভাই।

হরিরামের বউয়ের মুখ দিয়ে পালোয়ান ভূত বলে, কতয় রফা হল?

একশো—

আরে ছ্যা ছ্যা, নজর বড্ড খাটো তোমার।

নটবরও বুঝছে সেটা এখন। বলে, তিন টাকা মাইনের চাকরি করে এসেছি— একশোর বেশি মুখ দিয়ে বেরুল না। বলে ফেলেছি, কী আর হবে! ক্রিং মিং ফ্বট—

হরিরামের বউ মুহূর্তে ভালমানুষ, কাপড়চোপড় সেরে সামলে লজ্জাশীলা হয়ে বসল। দরজা খুলে দিয়ে নটবর সকলকে ডাকল, চলে আসুন—

করকরে একশোখানা টাকা নিয়ে নটবর বাড়ি চলে গেল। বিষম স্ফূর্তি— এত টাকা একসঙ্গে কখনও দেখেনি। হপ্তাখানেক যেতে না যেতে হরিরামের ম্যানেজার খোঁজে খোঁজে এসে হাজির। বলে, রোজামশায়, পগেয়াপটি আর একবার যেতে হচ্ছে। সেই ভূত খেপে কর্তাবাবুকে ধরেছে।

সে কী?

বউঠাকরুনকে ধরেছিল, সে তবু মন্দের ভাল। ঘরের বউ মিনমিন করে কী বলল, বাইরের লোকে শুনতে যায় না। কর্তাবাবু হাটে হাঁড়ি ভাঙছেন, ভূতাবিষ্ট হয়ে কোথায় কী মাল সরানো আছে ফাঁস করে দিচ্ছেন। সবসুদ্ধ আমাদের জেলে যাবার গতিক। এক্ষুনি গিয়ে ভূত নামিয়ে আসুন। ডবল ফি, দুশো টাকা এবারে। অগ্রিম দিয়ে দিচ্ছি—

ব্যাগ খুলে ম্যানেজার দুটো একশো টাকার নোট মেলে ধরল। লোভ ঠেকানো কঠিন বটে। কিন্তু ভয়ও আছে, মুন্ডু ছিঁড়ে ফেলবে, পালোয়ান ভূত শাসিয়ে রেখেছে।

ম্যানেজার নাছোড়বান্দা। খপ করে নটবরের হাত জড়িয়ে ধরল, যেতেই হবে রোজামশায়। আরও একশো টাকা। মোটমাট তিনশো কবুল করছি।

ভাবছে নটবর। হাত ছেড়ে ম্যানেজার পা জড়িয়ে ধরতে যায়। যা থাকে কপালে— নটবর মনস্থির করে ফেলেছে। বলল, হাজারটি টাকা দেবেন, তবে বেরুব। দরাদরি করবেন তো পথ দেখুন। হাজারের অর্ধেক আগাম চাই। এক্ষুনি।

গুনে গুনে একশো টাকার পাঁচখানা নোট অগ্রিম
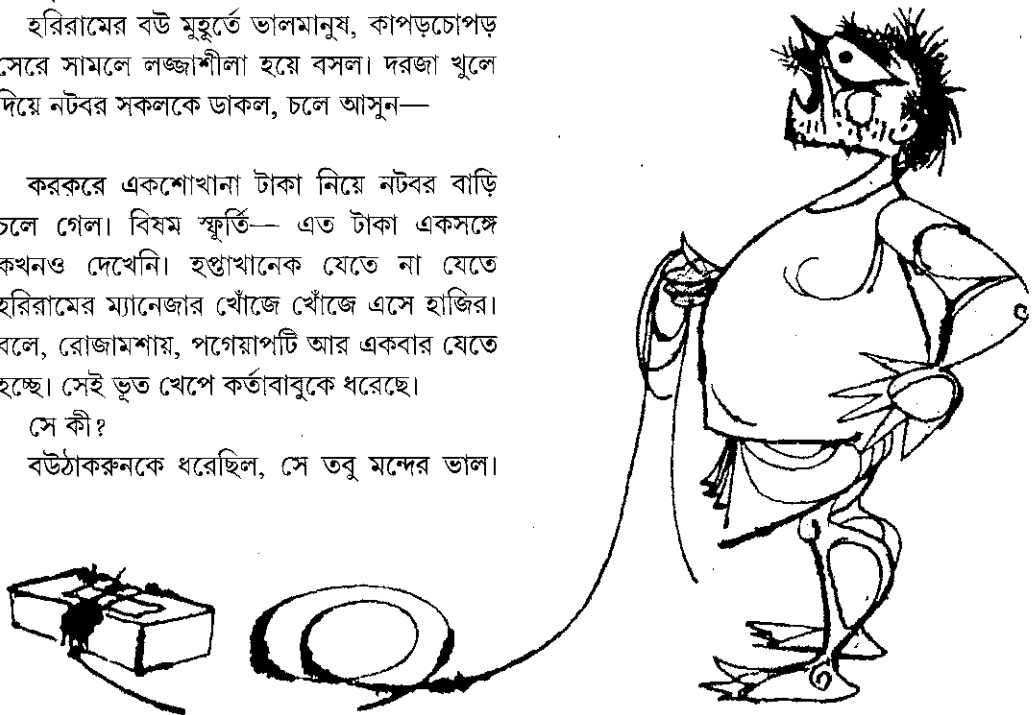
নিয়ে নটবর ভূত নামাতে চলল। হরিরাম সাউর সামনাসামনি হতে চোখ পাকিয়ে দাঁত-কিড়িমিড়ি করে উঠল সে, মানা করে দিয়েছি, তবু এসেছিস? মজা দেখাচ্ছি— ধড় থেকে মুন্ডুটা খটাস করে ভেঙে ছুড়ে দেব, হাওড়া ইস্টিশানে গিয়ে পড়বে।

তর্জন-গর্জন শুনে সবাই থরথর কাঁপছে। নটবর অবিচল, লোকজন সরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

গলা নামিয়ে অভিমানের সুরে বলল, রোজাগিরি করতে আসিনি পালোয়ান ভাই। থাকো না চিরকাল বড়লোকের ঘাড়ে চেপে— সাঙাৎ তুমি, তোমার সুখেই আমার সুখ। ওদিকে সাংঘাতিক বিপদ— তোমায় শুধু খবরটা দিতে এসেছি।

কী?

মাতঙ্গী ঠাকরুন ইঁদারা থেকে উঠে পড়েছেন।

চোখ বড় বড় হল হরিরামের। মানে ভূতই ভয়ে বিস্ময়ে চোখ বড় করল, বলো কী হে?

নটবর বলে, ঠাকরুনের অসাধ্য কাজ নেই। তিন বছর ছিলাম তো তার কাছে— দেখতাম আর চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যেত। তুমি বেটাছেলে, তায় পালোয়ান হয়েও আট মাস ইঁদারার গর্ভে বন্দিদশায় রইলে, আর উনি নিরামিষভোজী বিধবা হওয়া সত্ত্বেও দেয়াল বেয়ে বেয়ে উপরে উঠে পড়েছেন। বাঘিনীর মতন গজরাতে গজরাতে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছেন— হাত থেকে বাঁশের চেলা কেড়ে নিয়েছ, এত বড় আস্পর্ধা!

পালোয়ান ভূত কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, কী করব, ঠেঙানি খেয়ে কুলোতে পারি নে যে।

ঠাকরুন সেই কথাই আমায় বলছিলেন, সেবারে

তোর প্রাপ্য ঠেঙানি ভুল করে পালোয়ানের উপর ঝেড়েছিলাম, এবারে যা হবে ষোলোআনা তারই পাওনা। একবার পেলে হয়— আগা-পাস্তলা ধোলাই দিয়ে হাড়গোড় চূর্ণবিচূর্ণ করব।

আঁতকে উঠে পালোয়ান ভূত বলে, হদিশ বলে দাওনি তো ভাই?

ঘাড় নেড়ে নটবর না না করে ওঠে, খেপেছ? হলে হবে কী— ঠাকরুনের হাড়ে হাড়ে বুদ্ধি,

আন্দাজে ধরেছেন। বললেন, পগেয়াপটিতেই পেয়ে যাব মনে হচ্ছে। হরিরামের বউকে ভূতে পেয়েছিল, পিঠ-পিঠ আবার হরিরামকে। তোমার বেরুনোর পর থেকেই এই রকম কাণ্ডকারখানা— সেইজন্যে সন্দেহ এসেছে। বলছি তো— ডিটেকটিভের কান কেটে নেন আমাদের ঠাকরুন।

পালাই। উপায় কী?

পালোয়ান ভূত ফোঁস করে **প্রবল এক নিশ্বাস** ছাড়ল, অট্টালিকা আর শাঁসালো মক্কেল পেয়ে ভেবেছিলাম, ভাল খেয়ে ভাল থেকে সুখ করে নেব দিন কতক। হল না, কপাল খারাপ। দেশই ছাড়ব— তোমার ঠাকরুন যখন খোঁজাখুঁজি লাগিয়েছে।

নটবর প্রশ্ন করে, যাবে কোথায়?

আপাতত দমদম এরোড্রোমে। প্লেনের ছাতের উপর চেপে বসে পাহাড় সমুদ্দুর পেরিয়ে যত দূর পারি চলে যাব। দেশে থাকলে গন্ধে গন্ধে ঠিক ধরে ফেলবে।

ভূত নেমে গিয়ে হরিরাম সম্পূর্ণ সুস্থ। ভূতের রোজা বলে নটবরের খুব নাম পড়ে গেল।

১৩৮০

অলংকরণ। সুবোধ দাশগুপ্ত

কর্নেল মিত্র

বিমল মিত্র

ছোটবেলায় আমার বিশ্বাস ছিল না যে ভূত বলে কিছু আছে। বইতে ভূতের গল্প পড়েছি, দিদিমার কাছে কত রাত ভূতের গল্প শুনেছি। কিন্তু সে-গল্প পড়ে বা শুনে কখনও মনে ভয় পাইনি।

দিদিমাকে বলতুম, দিদিমা, একটা ভূতের গল্প বলো না—

দিদিমা বুড়ো মানুষ, সন্ধে হতে-না-হতেই ঘুমে তার চোখ ঢুলে আসত। তবু আমি বার বার গল্প শুনতে চাইতুম। বিশেষ করে ভূতের গল্প।

দিদিমা বিরক্ত হত।

বলত, না, রাত্তিরে ভূতের গল্প শুনতে নেই, ভূতে ঘাড় মটকাবে, তুই ঘুমো এখন, ঘুমিয়ে পড়—

কিন্তু তবু আমি ছাড়তুম না। ভূতের গল্প আমার শোনা চাই। ভূতের গল্প শুনে আমি ভয় পেতুম না বটে কিন্তু শুনতে বড় ভাল লাগত। গল্পের ভূতের হাঁউ মাঁউ-খাঁউ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমার কল্পনা অনেক দূরে গিয়ে পৌঁছুত। এই পৃথিবী থেকে অনেক দূরে যেখানে লেখাপড়া নেই, পরীক্ষায় পাশ করার ভয় নেই, বাবা-মা-মাস্টারমশাইয়ের চোখরাঙানি নেই, শুধু আছে একটা ভাঙা পোড়োবাড়ি আর তার ভেতরে কয়েকটা ভূত আর পেতনি। এই ভূত-পেতনিদের জগতের স্বপ্ন দেখতেই আমার ভাল লাগত।

তারপর একটু যখন বড় হলুম তখন ভূত-পেতনির জগৎ থেকে একেবারে বাস্তব জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এ বাস্তব জগতে মাস্টারমশাইয়ের বেত খেতে হয়, পড়া না-পারলে কানমলা খেতে হয়। আর তারপরে পরীক্ষায় ফেল করার দুঃখ-লজ্জা তো আছেই।

এখন যেমন পরীক্ষায় ফেল করলে লজ্জা হয় না তখন কিন্তু তা ছিল না। যেবার পরীক্ষায় ফেল করেছিলুম, বাবা সমস্ত দিন আমাকে একটা ঘরের মধ্যে তালা-চাবি বন্ধ করে রেখে দিয়েছিলেন। ভাত তো দূরের কথা, এক ফোঁটা জল পর্যন্ত খেতে পাইনি।

সন্ধেবেলা বাবা দরজা খুলে দিতেন। বলতেন, এবার ভাল করে লেখাপড়া করবি তো?

বলতুম, হ্যাঁ করব—

পরীক্ষায় আর ফেল করবি না তো?

বলতুম, না—

তবে নিজের হাতে দু'কান মোল—

আমি নিজের হাতে কান মলতুম। বাবার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব এই প্রতিজ্ঞাও করতুম। তবু সব বছরে প্রতিজ্ঞা রাখতে পারতুম না। কতবার যে আমি জীবনে ফেল করেছি তার ঠিক-ঠিকানা নেই। আমার ক্লাসের ছেলেরা আমার নাম দিয়েছিল ফেলু-মাস্টার, মানে ফেল-মাস্টার।

কিন্তু আমার বড়দা ছিল যাকে বলে সত্যিকারের ভাল ছেলে। প্রত্যেকবার বড়দা এগজামিনে ফার্স্ট হত। কতবার যে মেডেল পেয়েছে, প্রাইজ পেয়েছে বড়দা তার গোনাগুনতি নেই। বাবা-মা সেই মেডেলগুলো আর প্রাইজের বইগুলো একটা কাচের আলমারিতে সাজিয়ে রেখেছিল। আত্মীয়-স্বজন

পাড়া [illegible]
খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখানো হত।

তারা বড়দার ক্ষমতা দেখে তারিফ করত আর বড়দার সম্মানে আমার বাবা-মা'র বুক গর্বে দশ হাত হয়ে যেত।

তারপর আমার দিকে দেখিয়ে বলত, আর এটি? এটি লেখাপড়ায় কেমন?

বাবা বলতেন, এই এর কথা বলছেন? এর কিস্যু হবে না, এর মাথায় গোবর পোরা,

লজ্জায়-ধিক্কারে আমার মাথা হেঁট হয়ে আসত। কিন্তু আমি কী করব? আমার মাথায় যে গোবর পোরা তার জন্যে কি আমি দায়ী?

তা আমার কথা থাক। আমি বড়দার কথাই বলি। বড়দাকে নিয়েই আমার এই কাহিনি। বড়দাই ছিল বাবা-মা'র ভরসা, বড়দাই ছিল বাবা-মা'র একমাত্র নির্ভরস্থল। বড়দার মতো ছেলে যাঁদের তাঁদের আর ভাবনা কী?

বড়দা যখন কলকাতার কলেজ থেকে গরমের ছুটির সময় বাড়িতে আসত তখন তার জন্যে বাবা স্পেশাল খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। সেদিন ঝি-চাকর কেউ বাজারে গেলে চলবে না। বাবা নিজে বাজারে যাবেন।

কেউ যদি জিজ্ঞেস করত, এ কী মিত্তিরমশাই, আপনি যে বাজারে?

বাবা বলতেন, আজ যে নীলু আসছে, গরমের ছুটি হয়েছে তো—

সেদিন বাবা বড়দার জন্যে বেছে বেছে সেরা মাছ কিনবেন, সেরা আম, সেরা পটল, সেরা সব জিনিস। সকাল থেকেই বাড়িতে একেবারে রান্নার ধুম পড়ে যেত। বড়দা খেতে ভালবাসত বলে মা ভাল ভাল রান্না করত। বড়দা এলেই বাড়িতে আনন্দের বন্যা বয়ে যেত। আমরা দু'টি মাত্র ভাই। তার মধ্যে একজন বাপ-মায়ের আদরের দুলাল, আর আর-একজনের জন্যে একেবারে শূন্য। আমার ভাগে সত্যিই একেবারে শূন্য।

তা তার জন্যে কারওর দোষ নেই। কারণ আমার মাথায় যে গোবর পোরা।

বড়দা খেতে বসলেই মা সামনে বসত, মাথার ওপর পাখাটা জোরে খুলে দেওয়া হত।

বলত, ভাত ফেলে রাখলি কেন, ও-ভাত ক'টা খেয়ে নে—

বড়দা বলত, না মা, বিলুকে দাও, ওকে তোমরা মোটে দেখছ না, ওকে তো তোমরা কেউ খেতে বলছ না। আমি আর খেতে পারব না, আমার পেট ভরে গেছে—

বাবাও সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন। যেন তিনি নিজে দাঁড়িয়ে না থাকলে বড়দার অযত্ন হবে।
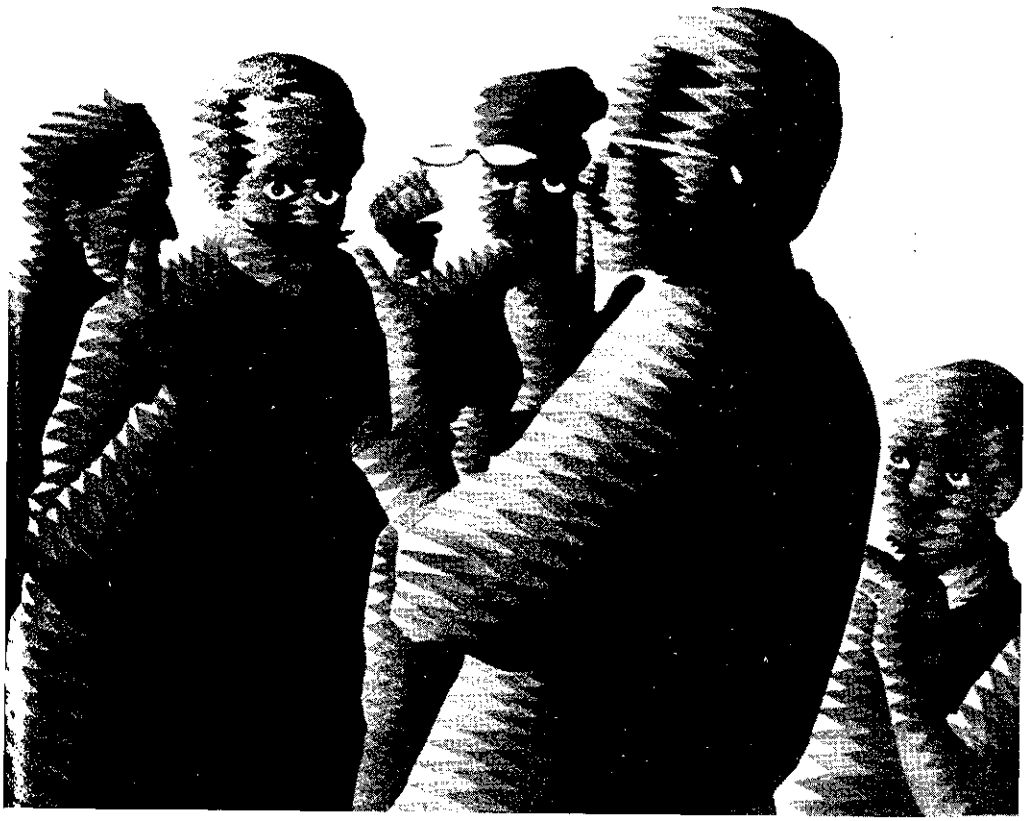
বাবা বলতেন, সে কী, ইলিশ মাছ আরও দুটো দাও ওকে—

বড়দা বলত, বা রে, আমার কি রবারের পেট, আমি তো চারটে ইলিশ মাছের পিস খেয়েছি, আর খেলে বমি হয়ে যাবে—

না বমি হবে না। কলেজের হোস্টেলে তোদের যা হাল, আধপেটা খেয়ে খেয়ে তোদের পেটের নাড়ি শুকিয়ে গিয়েছে। আরও দুটো খেতে হবে, আমি নিজে গিয়ে তোমার জন্যে বাজার করে নিয়ে এসেছি, একেবারে আসল গঙ্গার ইলিশ। খাও। তারপর ল্যাংড়া আম এনেছি, তাও দাও দুটো—

বড়দাকে এইরকম করে খাইয়ে-খাইয়েও যেন বাবা-মা'র তৃপ্তি হত না। আর শুধু কি খাওয়া? বড়দা যখন ঘুমোবে তখন কেউ শব্দ করতে পারবে না। বড়দা যখন পড়বে তখন কেউ কাছে যেতে পারবে না. বড়দার যদি একদিন একটু সর্দি-কাশি হয় তো তার জন্যে শহরের সবচেয়ে বড় ডাক্তার দেখতে আসবে। বড়দার পরীক্ষার আগে মা মা-কালীর কাছে জোড়া-পাঁঠা মানত করবে। আর বড়দাও তেমনি ছেলে। কখনও কি পরীক্ষায় সেকেন্ড হতে নেই রে! বরাবর কি ফার্স্টই হতে হয়! অথচ একই বাড়িতে আমরা একই বাবা-মায়ের দুই ছেলে।

আমি মনে মনে ভগবানকে অভিশাপ দিতুম ভগবান কেন এত একচোখো। দিতে হলে একজনকে কি এমন উজাড় করেই দিতে হয়?

তা তারপরে দাদা বি এসসি পাশ করলে অনার্স নিয়ে। একেবারে ফার্স্ট।

সেদিন আমাদের বাড়িতে একেবারে লোকে-লোকারণ্য! যেদিন পরীক্ষার ফলটা বেরোল সেদিন বড়দার ছবি ছাপা হল খবরের কাগজের পাতায়। বড়দার ছোট্ট জীবনী বেরোল। বাবার নামও তার সঙ্গে উল্লেখ করা হল। শহরের গণ্যমান্য সমস্ত

লোককে বাড়িতে নেমন্তন্ন করা হল। লুচি, পোলাও, মাছ, মাংস, চপ, কাটলেট, সন্দেশ, রসগোল্লা, রাজভোগ, চাটনি কিছুরই আর কমতি ছিল না। সবাই খেয়ে ধন্য ধন্য করতে লাগল বড়দাকে।

বড়দার বড় লজ্জা করতে লাগল কিন্তু গোড়া থেকেই।

বলতে লাগল, এ আর এমন কী করেছি, প্রত্যেক বছরই তো কেউ-না-কেউ একজন ফার্স্ট হয়ই, এবার যেমন আমি ফার্স্ট হয়েছি, আসছে বছরেও আর-একজন হবে—

ভদ্রলোকরা বলত, আসছে বছরে যারা ফার্স্ট হবে তাদের বাবা-মায়েরও এমনি আনন্দ হবে। আনন্দ করাটা কি দোষের?

বড়দা কিন্তু তাতেও খুশি হত না।

বলত, তার চেয়ে আপনারা আশীর্বাদ করুন যেন জীবনের শেষ পরীক্ষাতেও ফার্স্ট হতে পারি, সেই ফার্স্ট হওয়াটাই চরম ফার্স্ট হওয়া—

কিন্তু আশ্চর্য প্রতিভা বড়দার। এম এসসি দিলে কেমিস্ট্রিতে। তাতেও ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট।

বাবার আর মা'র আনন্দ তখন দেখে কে।

কিন্তু শুধু পাশ করলেই হবে না। ভাল করে পাশই করো আর ফেলই করো, আসল কথাটা তো বড় চাকরি করে বেশি টাকা মাইনে পাওয়া। তুমি এম এ পাশই করো আর রাস্তার বখাটে ছেলেই হও, কত টাকা তুমি মাসে উপায় করো সেইটে দিয়েই বিচার করব তুমি জীবনের পরীক্ষায় পাশ না ফেল!

তা ঠিক এই সময়েই যুদ্ধ বাধল। এমনভাবে যুদ্ধ বেধে যে সব কিছু ওলট-পালট বাধিয়ে দেবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। যুদ্ধ বেধে গেল ইংরেজ আর জার্মানদের মধ্যে। সে এক মহা যুদ্ধ। বলতে গেলে সমস্ত পৃথিবীই জড়িয়ে পড়ল সে-যুদ্ধতে।

হঠাৎ বড়দার চিঠি এল কলকাতা থেকে। বড়দা লিখেছে যে সে যুদ্ধে চাকরি পেয়েছে। প্রথমে দু'হাজার টাকা মাইনে। তারপরে চাকরিতে ভাল কাজ দেখাতে পারলে পরে মাইনে আরও বাড়বে। এমনকী পাঁচ হাজার ছ' হাজার টাকাও হতে পারে।

চিঠি পড়ে তো মা কেঁদে উঠল। বাবার মাথায় বজ্রাঘাত। শহরের গণ্যমান্য লোক যারা খবরটা শুনল সবাই এল।

তারা বললে, মিত্তিরমশাই, এরই জন্যে আপনি এত ভাবছেন? জানেন এই চাকরি পাবার জন্যে লক্ষ লক্ষ ছেলে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে। আর আপনার ছেলে সেই চাকরি পেয়েছে বলে আপনি ভয় পাচ্ছেন?

বাবা বললেন, না, তা নয়, যুদ্ধ বলে কথা, যদি কোনও বিপদ-আপদ হয় তাই ভাবছি। যুদ্ধ মানেই তো মারামারি, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মারামারি। কে কাদের কত লোক মারতে পারল তারই প্রতিযোগিতা—

ভদ্রলোকরা বললে, তাদের মধ্যে কি সবাই মারা পড়ে? বরং মারা পড়ে তারা যারা আমাদের মতো লোক যুদ্ধে যায় না। বোমা তো আমাদের মাথাতেই পড়ে। নিরীহ লোকরাই যুদ্ধে বেশি মারা যায়। কারণ তাদের হাতে বন্দুক থাকে না রাইফেল থাকে না, কিছু না। তাদের বিপদই তো সবচেয়ে বেশি—

আর একজন বললে, আর তা ছাড়া যুদ্ধ তো চিরকাল থাকবে না, বড়জোর এক বছর কি দু'বছর। তারপরে তো গভর্নমেন্ট আপনার ছেলেকে মোটা টাকার চাকরি দেবে, সেদিকটাও তো ভেবে দেখবেন আপনি—

যুদ্ধে যাবার আগে বড়দা একবার বাড়িতে এল। মা'কে-বাবাকে সব বুঝিয়ে বললে। বললে যে যুদ্ধ বেশিদিন চলবে না। যেই যুদ্ধটা থেমে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে মস্ত বড় চাকরি দেবে। এখন সরাসরি লেফটেন্যান্ট করে নিচ্ছে বড়দাকে, দু'দিন বাদেই ক্যাপ্টেন হবে, তারপরে মেজর, আর তারপরে কর্নেল।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, তা তোমাকে কি জার্মানদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে নাকি?

বড়দা আশ্বাস দিয়ে বললে, আমি যুদ্ধ করব না, যারা যুদ্ধ করবে আমি তাদের পেছনে পেছনে থাকব। ইঞ্জিনিয়ারিং স্টোর্স-এর ইনচার্জ হব আমি।

বড়দা সরাসরি যুদ্ধে যাবে না শুনে বাবা-মা একটু

আশ্বস্ত হল। আবার দু'হাজার টাকা মাইনে হবে শুনে খুব আনন্দও হল। বড়দা যাবার আগের দিন মা কালীমন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে এসে বড়দার কপালে পুজোর সিঁদুরের টিপ ছুঁইয়ে দিলে। আর মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল। কী প্রার্থনা করতে লাগল তা মা-ই জানে। হয়তো প্রত্যেক মা ছেলের ভালর জন্যে যে প্রার্থনা করে সেই একই প্রার্থনা করলে। আমি তা জানতে পারলুম না।

বড়দা যুদ্ধে গিয়ে বাড়িতে প্রত্যেক সপ্তাহেই চিঠি পাঠাত। বেশ ভাল আছে বড়দা, খুব আরামে আছে। কোনও কষ্ট হচ্ছে না। চিঠিটা পড়ে বাবা-মা খুশি হত।

আর প্রত্যেক মাসে বাবার নামে বড়দার মাইনের টাকাটা চলে আসত। একেবারে পুরো দু'হাজার টাকা। বাবা সে-টাকাটা বড়দার নামে ব্যাঙ্কে গিয়ে জমা রেখে দিয়ে আসতেন। আর পাড়ার প্রত্যেকটা লোককে জানিয়ে আসতেন ছেলের চিঠি আসার কথা। যারা বেশি আগ্রহী তারা আবার চিঠিটা পড়ত। পড়াত। অন্য লোকদের শোনাত।

কখনও চিঠি আসত ফ্রান্স থেকে, কখনও বা আবার লন্ডন। আন্দাজে বুঝে নিতে হত কোথায় বড়দা আছে। কারণ মিলিটারিতে ঠিকানা দেওয়া বারণ।

বাবাও চিঠির উত্তর দিতেন, আমরা সবাই ভাল আছি, তুমি নিজের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিবে, আর যদি কিছুদিনের ছুটি পাও তো একবার বাড়িতে আসিবে। তোমার মা তোমাকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল।...

এইরকম চিঠি কিছুদিন ধরে চলল। বাবা প্রত্যেকদিন খবরের কাগজ খুলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন। কাদের জয় হচ্ছে আর কারা হারছে এ নিয়ে গবেষণা করেন, মা'র সঙ্গে, পাড়ার লোকের সঙ্গে আলোচনা করেন। শহরের সবাই যখন চাইছে জার্মানি যুদ্ধে জিতুক, বাবা-মা তখন চাইছে ইংরেজ জিতুক। কারণ ছেলের চাকরি ইংরেজদের দলে।

আর শুধু খবরের কাগজ নয়, রেডিয়ো শোনাও তখন প্রায় বাতিকে দাঁড়িয়ে গেছে। যখন জার্মানদের জেতার খবর আসত তখন আমাদের খারাপ লাগত, আর ইংরেজদের জেতার খবর আসত তখন আমরা খুশি হতুম।

একদিন চিঠি এল বড়দা ক্যাপ্টেন হয়েছে। মাইনে আরও এক হাজার টাকা বেড়েছে।

এক-একবার বড়দার চাকরিতে উন্নতি হয় আর মা মা-কালীর মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে আসে। যেন ছেলের আরও উন্নতি হয় মা! ছেলে যেন আমাদের মুখোজ্জ্বল করে মা! ছেলে যেন সুস্থ শরীরে বাড়িতে ফিরে আসে!

তা মা-কালী মা'র সে প্রার্থনা শুনল কি না কে জানে। আমরা শুধু পুজোর প্রসাদ খেলুম।

এরপরে হঠাৎ খবর আসতে লাগল জার্মানি হারছে। ইটালি হারছে। জাপান হারছে। আমেরিকা ইংরেজদের দলে ভিড়ে পড়েছে।

বাবা তো আনন্দে একেবারে লাফাতে লাগলেন। ইংরেজদের জয় যেন তাঁর নিজের ছেলের জয়।

তখন জিনিসপত্রের দাম দিন দিন বাড়ছে, দেশে বোমা পড়ছে, কলকাতা শহর থেকে লোকে ভয়ে পালাচ্ছে। কত সব দুর্যোগ গেল সে ক'বছর। কিন্তু বড়দার দৌলতে আমাদের সংসারে তখন কোনও অভাব অভিযোগ নেই, বড়দার মাইনের অজস্র টাকা ব্যাঙ্কে জমে গেছে।

সেই যুদ্ধের শেষের দিকে যখন ইংরেজদের জয়-জয়কার, তখন একদিন বড়দার একখানা চিঠি এল। তাতে বড়দা লিখেছে, আমি পনেরো দিনের ছুটিতে দেশে যাচ্ছি। আসছে মাসের দশই সন্ধের ট্রেনে আমি বাড়িতে পৌঁছুব। স্টেশন থেকে আমাদের মিলিটারি গাড়িতে সোজা বাড়ি পৌঁছুব, ট্রেন যদি ঠিক সময়ে পৌঁছয় তো রাত ন'টার মধ্যেই আমি পৌঁছুব—

চিঠিটা পড়ে খানিকক্ষণ কারও মুখেই কোনও কথা বেরোল না। আনন্দে মানুষ অনেক সময় বোধহয় বোবাও হয়ে যায়। আমার বাবা-মা'র অবস্থাও বোধহয় সেইরকম হয়ে গিয়েছিল।

যখন অনেকক্ষণ সময় কেটে গেল তখন বাবা

বললেন, আজ হল সাতুই, আর নীলু আসবে দশুই, আর তিন দিন বাকি—

তিনটে দিন। তিনটে দিন যেন তখন আমাদের কল্পনায় তিন বছর মনে হল। সেই তিনটে দিন যেন আর কাটতে চায় না। বড়দা আসবে! বড়দা এত বছর পরে বাড়ি আসবে। এ যেন হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো ঘটনা। নীলু এলে বাবা যে কী করবেন তারই প্ল্যান করতে লাগলেন। নীলু যা যা খেতে ভালবাসে সেইসব জিনিসের তালিকা তৈরি হল।

তপসে মাছ ভাজা। তপসে মাছ ভাজা খেতে নীলু বড় ভালবাসত।

আর কী খেতে ভালবাসত গো?

মা বললে, ল্যাংড়া আম—

বাবা বললেন, ল্যাংড়া আম এখন কোথায় পাব?

মা বললে, সরভাজা, সরপুরিয়া—

কিন্তু সে-সব এখন কোথায় পাব?

ল্যাংড়া আম তখন বাজারে পাওয়া যায় না। আমের সময় চলে গিয়েছে। কিন্তু চেষ্টা করলে কী না পাওয়া যায়। এখনও তিন দিন সময় আছে।

এই তিন দিনের মধ্যে কলকাতায় চলে গেলে সবই পাওয়া যাবে। কলকাতা শহরে পয়সা ফেললে কী না পাওয়া যায়? চেষ্টা করলে সেখানে ঘোড়ার দুধও পাওয়া যায়।

তা বাবা আর দেরি করলেন না। ন' তারিখে সকালবেলার ট্রেনেই কলকাতায় চলে গেলেন। সেখানে একদিনে সব কেনাকাটা করে দশ তারিখে সকালবেলায় এসে পৌঁছলেন। ল্যাংড়া আম, তপসে মাছ, সরপুরিয়া, সরভাজা। আর তার সঙ্গে কিসমিস, পেস্তা, বাদাম, আঙুর, আপেল, কমলালেবু। সবগুলোই দামি জিনিস।

সকাল থেকেই রান্নার আয়োজন চলল। পাড়ার যার সঙ্গে দেখা হয় তাকেই বলেন, জানেন চাটুজ্জেমশাই, আমার নীলু আসছে আজ রাত্তিরে—

নীলু আসছে?

হ্যাঁ, এখন সে কর্নেল। কর্নেল নীলরতন মিত্র। আমার ছেলে কর্নেল হয়েছে। জানেন তো?

চাটুজ্জেমশাই, গাঙ্গুলিমশাই, বোসমশাই সবাইকেই বাবা খবরটা দিলেন। আমিও খবর দিলুম আমার সব বন্ধুদের। সবাইকেই বললুম, আমার বড়দা আসছে ছুটিতে, এখন কর্নেল হয়েছে—

নিজেদের ঐশ্বর্যের কথা যদি লোককে জানাতেই না পারলুম তো কীসের আনন্দ। আসলে পাড়ার লোকরা কিন্তু খবরটা শুনে খুব খুশিই হল। আমার বাবা ছিলেন সকলের প্রিয়। মিত্তিরমশাইয়ের কিছু ভাল হলে সবারই আনন্দ হত।

মা তো সেদিন সকাল থেকেই ব্যস্ত। বড়দা কোন ঘরে শোবে, কী খাবে, কীরকম দেখতে হয়েছে তাকে, এইসব কথাই হতে লাগল বাবা-মা'র মধ্যে। শুধু তো সাধারণ ছেলে নয় নীলু, কর্নেল ছেলে। সুতরাং তার খাতিরই আলাদা। খোকা এলে তাকে সকলের বাড়িতে বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে। চাটুজ্জেমশাইয়ের বাড়িতে আগে যেতে হবে। বাবা বলবেন, চাটুজ্জেমশাইকে প্রণাম করো, জ্যাঠামশাইয়ের আশীর্বাদেই তুমি এত বড় হয়েছ—

চাটুজ্জেমশাই জিজ্ঞেস করবেন, বেশ বেশ খুব ভাল, ভাল থাকো বাবা, আরও বড় হও, আশীর্বাদ করছি তুমি রাজা হও, আমাদের দেশের মুখোজ্জ্বল করো—

তারপর নিয়ে যাবেন মুখুজ্জেমশাইয়ের বাড়িতে। এমনি করে সব বাড়িতে গিয়ে বড়দাকে দিয়ে সকলের পায়ের ধুলো নেওয়াবেন।

কত পরিকল্পনা বাবার। মা রান্না করছিল আর বাবা তাঁর এইসব পরিকল্পনার কথা আলোচনা করছিলেন।

একবার বললেন, মাংসতে যেন ঝাল দিয়ো না বেশি বুঝলে, নীলু আবার ঝাল খেতে পারে না—

মা বললে, সে তোমাকে বলতে হবে না, সে আমি জানি—

আর দেখো একটা ভুল হয়ে গেল।

কী?

বাবা বললেন, খোকা যে আনারস খেতে ভালবাসে, আনারসের কথা তো একেবারেই মনে ছিল না।

বলে আবার বাজারে ছুটলেন। এইরকম এক-একটা জিনিসের কথা মনে পড়ে আর সেইটে আনতে ছোটেন। সারাদিন কেবল এই-ই চলল। বাবারও বিশ্রাম নেই, মা'রও বিশ্রাম নেই। যখন সব কাজ শেষ হল তখন ঘড়িতে সন্ধে সাতটা।

বাবা ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলেন, এইবার বোধহয় কলকাতায় এসে পৌঁছেছে,

তারপর ঘড়িতে আটটা বাজল। বাবা বললেন, এতক্ষণে বোধহয় রানাঘাট পৌঁছেছে, আর এক ঘণ্টার রাস্তা।

রানাঘাট থেকে বাজিতপুরে পৌঁছতে এক ঘণ্টা সময় লাগবে। পিচের রাস্তা। জিপ গাড়িতে করে আসবে লিখেছে একেবারে হু হু করে এসে পৌঁছুবে। রান্নাবান্না সব তৈরি। মুখুজ্জেমশাই, চাটুজ্জেমশাই, গাঙ্গুলিমশাই, সব বাবার বন্ধুরাও বাড়িতে এলেন। নীলুকে দেখবেন। নীলুকে আশীর্বাদ করবেন। সবাই ঘড়ি দেখছেন।

আটটা বাজল ঘড়িতে। ন'টা। এইবার আসার সময় হল। বাবা সদর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। মিলিটারি গাড়ি হু হু করে চলে আসবে। এ তো

ট্যাক্সি নয়, বাসও নয় যে থেমে থেমে আসবে। মিলিটারি গাড়িকে থামাবে এমন ক্ষমতা পুলিশেরও নেই। আর গাড়িতে যে আসছে সে-ও যে সে লোক নয়, কর্নেল। একেবারে মাথা! সকলের হেড।

কিন্তু কোথায় কী? চারদিকে অন্ধকার। ঝাঁ-ঝাঁ অন্ধকার। কোথাও কিছু দেখা যায় না।

চাটুজ্জেমশাই বললেন, অত ভাবছেন কেন মিত্তিরমশাই, ট্রেন হয়তো কলকাতায় দেরি করে পৌঁছেছে—

তা হবে। বাবা ভাবলেন, তা হবে। রেলের তো ব্যাপার সব। আজকাল যুদ্ধের সময় সব কাজ কি আর ঠিকমতো চলছে! হয়তো ট্রেনই দেরি করে আসছে!

শেষকালে রাত দশটাও বাজল। চাটুজ্জেমশাই, মুখুজ্জেমশাই, গাঙ্গুলিমশাই একে একে সবাই চলে গেলেন। আজ থাক। হয়তো মাঝরাত্রে এসে পৌঁছবে ছেলে। কাল সকালবেলাই আবার না-হয় আসব। তখন দেখে যাব নীলুকে। আশীর্বাদ করে যাব তাকে।

মা বললে, আরও কিছুক্ষণ দেখা যাক, এখনও আসবার সময় আছে, সে না এলে খাব না—

বাবা বললেন, তা হলে বিলুকে খেতে দাও, ওর ঘুম পাচ্ছে, ও খেয়ে নিয়ে ঘুমোতে যাক, নীলু এলে ওকে ডেকে তুলবোখন—

আমি বললুম, না, আমার ঘুম পাচ্ছে না, আমি এখন খাব না, বড়দা এলে তখন একসঙ্গে খাব—

তখন এগারোটা বাজল ঘড়িতে। সারা পাড়াটা নিঝুম হয়ে এল। আমরা তিনজন, আমি বাবা আর মা, তিনজনেই বড়দার আশায় জেগে বসে রইলুম। কোথায় হঠাৎ কিছু শব্দ হয় আর আমরা আনন্দে চমকে উঠি। ভাবি ওই বুঝি বড়দা এল।

কিন্তু না, একটা বেড়াল ছাদ থেকে ভাঁড়ার-ঘরের টিনের টালের ওপর লাফিয়ে পড়েছিল, ওটা তারই শব্দ।

কিন্তু আর কতক্ষণ বসে থাকব। বাবার মুখটা ক্রমেই গম্ভীর হয়ে আসছে। মা'র চোখ দুটো ছল ছল করতে শুরু করেছে।

বাবা মা'কে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন, তুমি অত ভাবছ কেন? নীলু আসবে ঠিক, তুমি ভেবো না। মিলিটারি না? হুট করে আসব বললেই কি আর আসতে পারে? কাজকর্ম সব অন্য লোকদের বুঝিয়ে তবে তো আসবে! আর এখনই তো তার ঘাড়ে বেশি দায়িত্ব। এখন তো জাপানিরা যুদ্ধে হেরে গেছে। তোমার ছেলে কি সোজা ছেলে ভেবেছ? ব্রিটিশ রাজত্বটাই তো এখন নীলুর ওপর নির্ভর করছে, বলতে গেলে সে-ই তো সব একলা চালাচ্ছে—

বলতে বলতে হঠাৎ কী একটা যেন শব্দ হল।

আমরা আবার চমকে উঠলাম। ভাবলাম আবার হয়তো আর একটা বেড়াল লাফিয়ে পড়েছে ভাঁড়ার-ঘরের টিনের চালের ওপর!

কিন্তু না, হঠাৎ দেখি বড়দা!

খোকা, তুই এলি? কী করে এলি? আমরা তো কই গাড়ির শব্দ পেলুম না।

বড়দা হো হো করে ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠল!

হাসি থামিয়ে বললে, আমি তো খিড়কির পাঁচিল লাফিয়ে ঢুকেছি—

কেন রে? সদর-দরজা তো খুলে রেখেছিলুম, খিড়কির পাঁচিল ডিঙিয়ে এলি কেন?

বড়দা বললে, তোমাদের চমকে দেবার জন্যে! যুদ্ধে গিয়ে আমাদের এরকম কত বাড়ির পাঁচিল ডিঙোতে হয়েছে, এসব অভ্যেস হয়ে গেছে আমার—

কিন্তু গাড়ির শব্দ শুনতে পেলুম না তো কই?

বড়দা বললে, গাড়িটা মোড়ের মাথায় ছেড়ে দিলুম। ওকে আবার এক্ষুনি কলকাতায় ফিরতে হবে, সেখানে অনেক জরুরি কাজ আছে আমাদের, আমি এটুকু হেঁটেই এলুম—

বাবা উঠলেন। বললেন, থাক থাক, এখন আর কথা নয়, তুমি জামাকাপড় বদলে নাও, চান করবার গরম জল তৈরি, তারপর খেতে খেতে গল্প করা যাবে—

মা'র দিকে চেয়ে বললেন, দাও আমাদের সকলকে খেতে দাও—

আমি বড়দার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দেখছিলুম।

কী চমৎকার দেখতে হয়েছে বড়দাকে। ফরসা রং ছিল গায়ের, এখন তামাটে হয়ে গেছে। কিন্তু কী মজবুত শরীর, কী স্বাস্থ্য। মাথার চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা। গায়ে খাকি পোশাক। বুকে কতগুলো মেডেল, দু'কাঁধে কতগুলো স্টার। বড়দাকে দেখে আমার খুব গর্ব হচ্ছিল। আমারই তো বড়দা। আপন মায়ের পেটের বড়ভাই।

বড়দা আমার দিকে চেয়ে হঠাৎ বললে, কী রে বিলু, তুই কত বড় হয়েছিস? লেখাপড়া করছিস তো মন দিয়ে? খুব মন দিয়ে লেখাপড়া করবি, আর ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করবি, শরীরটাকে ফিট রাখবি। এরকম রোগা কেন তুই?

বলে আমার বুকে একটা ঘুসি মারলে।

মা বললে, নাও, অনেক রাত হয়ে গেল, তুই চান করে নে, খেতে খেতে গল্প করবি, এখন ওঠ, উঠে পড়—

বড়দা বাথরুমে গিয়ে চান করতে ঢুকল। ততক্ষণে মা আমাদের সকলের খাবার দিয়ে দিয়েছে। আমরা সবাই একসঙ্গে বসে বসে খেতে লাগলুম। বড়দা কত গল্প করতে লাগল। কোথায় প্যারিস, কোথায় লন্ডন, কোথায় ইতালি, আফ্রিকা। সব জায়গায় কী কী ঘটেছে, সেখানে গিয়ে কী কী দেখেছে তার গল্প বলতে লাগল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কখন কবে কী বিপদের মধ্যে পড়েছে, কী করে হাজার হাজার জার্মানকে মেরেছে তারই গল্প। কী করে বর্মা মালয় সিঙ্গাপুর দখল করেছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব বলতে লাগল।

মা বললে, ওরে, গল্প এখন থাক, আগে খেয়ে নে। কাল সকালে উঠে যত খুশি গল্প করিস, শুনব। ওদিকে রাত বারোটা বেজে গেছে তা জানিস?

কিন্তু বড়দা কি আর থামে? এত বছর পরে বাড়িতে এসেছে, এত বছর পর ছুটি পেয়েছে। যত গল্প মনে জমে ছিল সব বলতে লাগল।

শেষকালে যখন রাত একটা তখন বাবা বললেন, না না, আর নয় খোকা। তুমি শুয়ে পড়ো গিয়ে। তোমার ঘরে বিছানা করা আছে, সারাদিন খাটুনি গেছে, এখন ঘুমোও গে যাও—

বড়দা ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর মা নিজেও খেয়ে নিলে। আমিও বাবার পাশে গিয়ে শুয়ে পড়লুম। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি আর আমার জ্ঞান নেই।

হঠাৎ সদর দরজার কড়া নাড়ার শব্দে আমরা সবাই ধড়মড় করে জেগে উঠেছি।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কে?

টেলিগ্রাম!

মা-ও অবাক হয়ে গেছে। মা-ও শুনতে পেয়েছে শব্দটা! বাবা মা আমি তিনজনেই জেগে উঠে সদর দরজায় গিয়ে হাজির হয়েছি। রাত তখন বোধহয় তিনটে। সেই অত রাত্রে কার টেলিগ্রাম? নিশ্চয়ই খোকার! হয়তো খোকার ছুটি বাতিল হয়ে গিয়েছে। হয়তো ওপরওয়ালা সাহেব খোকাকে জরুরি তলব দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছে। হয়তো যুদ্ধের কোনও জায়গায় জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

বাবার হাত কাঁপছিল। বাবা টেলিগ্রামের রসিদে সই করে খামটা নিয়ে খুলে ফেললেন।

না, এ তো বাবার নামেই টেলিগ্রাম। এসেছে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম থেকে। তাতে লেখা আছে, আপনার ছেলে কর্নেল মিত্র বর্মার রণক্ষেত্রে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যে যুদ্ধ করতে গিয়ে সম্মানের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছে—

মা পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। জিজ্ঞেস করলে, কীসের টেলিগ্রাম গো, কে পাঠিয়েছে?

বাবার গলা দিয়ে আর্তনাদের মতো যেন একটা আওয়াজ বেরোল, ওগো, খোকা নেই।

নেই মানে? নেই মানে কী? কী বলছ তুমি?

কিন্তু খোকা যে ও-ঘরে ঘুমোচ্ছে।

বাবা তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতরে এসে বড়দার শোবার ঘরে ঢুকলেন। তাঁর সঙ্গে মা-ও এল, আমিও এলুম।

কিন্তু কোথায় বড়দা? ঘরটা যে ফাঁকা, বড়দা যে আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ কথা বললে, আমরা যে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করলুম। তারপরে যে বড়দা ঘরে শুতে গেল। তা হলে কোথায় গেল সে?

তা হলে রাত্রে কে এসেছিল? কার সঙ্গে এত কথা বললুম? সবই কি ভৌতিক কাণ্ড?

বাবা আর মা তখন সেখানেই অজ্ঞান অবস্থায় মূর্ছা গেল।

এ সেই কতকাল আগেকার ঘটনা। তারপরে কত মাস কেটে গেছে, কত বছর কেটে গেছে। কত বইতে ভূতের গল্প পড়েছি, কত ভূতের গল্পও বন্ধুর মুখে শুনেছি। কখনও তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়নি। কিন্তু আমার নিজের জীবনের ছোটবেলাকার এই ঘটনাটার রহস্য আজও ভেদ করতে পারিনি, এখনও বুদ্ধি-যুক্তি-বিজ্ঞান দিয়ে এই অলৌকিক ঘটনার কোনও ব্যাখ্যা করতে পারিনি।

১৩৮১

অলংকরণ: মদন সরকার

রাত গভীর

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

দোষ আমারই। বন্ধুর বোনের বিয়ে। যাব আর খেয়ে চলে আসব, এই ঠিক ছিল। কিন্তু গিয়েই মুশকিলে পড়লাম।

বন্ধু একান্তে ডেকে হাত দুটো ধরে বলল, উদ্ধার করে দে ভাই, ভীষণ বিপদে পড়েছি।

কী আবার হল?

পাড়ার ছেলের দল পরিবেশন করবে ঠিক ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে একদল বেপাড়ার জলসা শুনতে চলে গেছে। লোক কম। তোদের হাত লাগাতে হবে।

ঠিক আছে।

পাঞ্জাবি খুলে ফেললাম। তারপর কোমরে গামছা বেঁধে লেগে গেলাম কাজে।

সব যখন শেষ হল, রাত বারোটা বেজে গেছে। নিজের আর কিছু মুখে দেবার ইচ্ছা ছিল না। একটু দই খেয়ে রাস্তায় যখন পা দিলাম তখন সাড়ে বারোটা।

বন্ধু বলেছিল নিমন্ত্রিতদের কারও মোটরে উঠিয়ে দেবে, কিন্তু রাস্তায় নেমে দেখা গেল, সবাই চলে গেছে। কোনও মোটর নেই।

বন্ধুকে আশ্বাস দিলাম, আমি বড় রাস্তা থেকে একটা ট্যাক্সি ধরে নেব। সাড়ে বারোটা কলকাতার পক্ষে আর এমন কী রাত।

রাস্তার মোড়ে গিয়ে দেখলাম, এদিকে ওদিক দু'দিক ফাঁকা। যানবাহন তো নেইই, রাস্তা জনমানবশূন্য।

বরাত। আচমকা ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হল। বিরক্তিকর। বৃষ্টির ফাঁকে রাস্তার আলোগুলো বেশ নির্জীব, নিষ্প্রভ। পিছিয়ে একটা দোকানের আড়ালে দাঁড়াতে গিয়েই বিপত্তি।

একটা কালো কুকুর শুয়ে ছিল। দেখতে না পেয়ে একেবারে তার পেটের ওপর পা চাপিয়ে দিতেই কুকুরটা বিকট স্বরে চিৎকার করে উঠল।

গেছি রে বাবা! লাফিয়ে রাস্তার কাছে আসতেই চোখে পড়ে গেল।

অনেক দূর থেকে একজোড়া আলো এগিয়ে আসছে।

মরিয়া হয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ালাম। বাস, লরি, ট্যাক্সি, প্রাইভেট গাড়ি যা-ই হোক না কেন, দু' হাত তুলে থামাব।

তা না হলে সারাটা রাত এইখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কিংবা পিছু হেঁটে নিমন্ত্রণবাড়ি গিয়ে বন্ধুকে ঘুম থেকে তুলে বিব্রত করতে হবে।

আলো দুটো খুব ধীরে এগোচ্ছে। মাঝে মাঝে সন্দেহ হল, বুঝি বা থেমেই আছে। আর এদিকে আসবেই না।

পকেট থেকে রুমাল বের করে সবে ভিজে মাথাটা মুছে নিচ্ছি, আচমকা কর্কশ কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলাম।

কী মশাই, রাস্তার মাঝখানে নটরাজনৃত্য দেখাচ্ছেন নাকি? তারপর চাপা দিলেই চটে যাবেন।

তাড়াতাড়ি রাস্তা থেকে সরে এসেই লক্ষ করলাম, একটা মিনিবাস। দূরের আলোজোড়া আর দেখা গেল না।

তার মানে দূরের আলো দুটো এই মিনিবাসেরই। হঠাৎ খুব দ্রুত এসে পড়েছে।

দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি উঠব।

মিনিবাস থামল। হাতল ধরে উঠে পড়লাম। মিনিবাস একেবারে ফাঁকা। অবশ্য এই মাঝরাতেরও পরে যাত্রী আর পাবে কোথায়। পিছনের সিটে বসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

মাথাটা ভাল করে মোছা হয়নি। কোঁচার খুঁট খুলে জোরে জোরে মুছে নিলাম। আমার আবার সর্দির ধাত। মাথায় জল বসলেই বেদম কাশি শুরু হবে।

উঃ। মনে হল, হাতের ওপর কে যেন বরফের টুকরো চেপে ধরেছে।

মুখ তুলে দেখলাম, একটা ছোকরা আমার হাতে টোকা দিচ্ছে।

দাদা, টিকেটটা করবেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, ঢাকুরিয়া যাবে তো?

হ্যাঁ যাবে। যেতেই হবে।

কত ভাড়া?

তিন টাকা।

তিন টাকা? নব্বই পয়সা করে যাই যে।

কথাটা বলেই বুঝতে পারলাম ঠিক বলিনি।
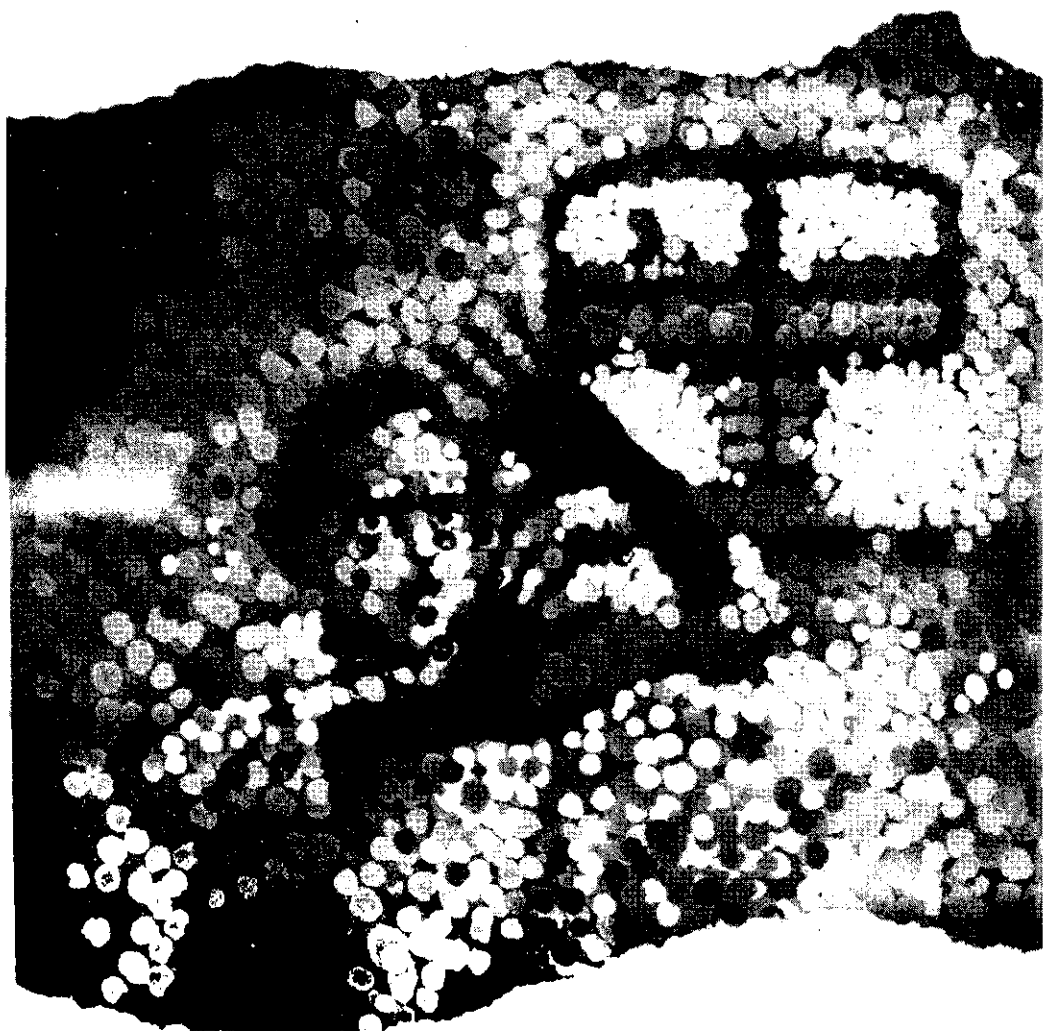
দিনের বেলা যা রেট, এই মাঝরাতে দুর্যোগে সে রেট কখনও হতে পারে! বাড়তি পয়সা বোধহয় ড্রাইভার-কন্ডাকটরের পকেটে যাবে।

কোনও কথা না বলে তিনটে টাকা এগিয়ে দিলাম।

টিকেট দিতে দিতে লোকটা বলল, এ মিনিবাসে যেখানে যাবেন এক ভাড়া। সামনের স্টপেজে নামলেও ওই তিন টাকা।

লোকটার সঙ্গে তর্ক করতে ইচ্ছা হল না। বলুক যা ইচ্ছা, মাঝরাতে যে পৌঁছে দিচ্ছে, এই আমার ভাগ্য।

সিটে হেলান দিয়ে বাইরের দিকে দেখলাম। সব ঝাপসা। কিছু দেখা যাচ্ছে না। মিনিবাস খুব জোর ছুটছে। এত রাতে পথিক নেই, ট্র্যাফিক সিগন্যালের বালাই নেই, তাই এই বেপরোয়া গতি।

কিছুক্ষণ পরে ঘুমে চোখ বুজে গেল। ঘুমিয়ে পড়লেও অসুবিধা নেই। লোকটা আমি কোথায় নামব জানে। ঢাকুরিয়া এলে ঠিক ডেকে দেবে।

এক সময়ে ঘুম ভাঙল। মিনিবাস একভাবে ছুটছে। চোখ হাতঘড়ির দিকে পড়তেই চমকে উঠলাম। রাত আড়াইটে।

যেভাবে মিনিবাস ছুটছে, এতক্ষণে কখন ঢাকুরিয়া পৌঁছে যাবার কথা।

জিজ্ঞাসা করবার জন্য এদিক ওদিক দেখেই অবাক হলাম। মিনিবাস খালি। কেউ কোথাও নেই।

অ মশাই, শুনছেন, ঠিক রুটে যাচ্ছেন তো? ঢাকুরিয়া পিছনে ফেলে এলেন না কি?

কোনও উত্তর নেই।

আশ্চর্য, গেল কোথায় লোকটা!

আমি যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তখন বোধহয় মিনিবাস থামিয়ে লোকটা নেমে গেছে। কিন্তু এভাবে মাঝপথে কি নেমে পড়তে পারে?

ঝড়ের বেগে মিনিবাস ছুটেছে। মনে হচ্ছে, মাঝে মাঝে চাকাগুলো যেন রাস্তাই ছুঁচ্ছে না।

ঢাকুরিয়া কখন পার হয়ে গেছে। নিচু হয়ে দেখলাম দু'পাশে ঝোপজঙ্গল। জোনাকির বাহার। শহর ছাড়িয়ে গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে কোথায় চলেছে মিনিবাস?

আমি এগিয়ে একেবারে সামনের সিটে গিয়ে বসলাম। ঝুঁকে পড়ে ড্রাইভারকে বললাম।

দাদা, কোথায় চলেছেন? জায়গাটার নাম কী?

ড্রাইভার পিছনে ফিরল না। গম্ভীর গলায় বলল, আমি বলব কী করে? কন্ডাকটর ঘণ্টা না দিলে আমি বাস থামাই কী করে?

কিন্তু ঘণ্টা দেবে কে? কন্ডাকটর তো কখন নেমে গেছে।

এবার ড্রাইভার পিছন ফিরল।

এই পেঁচি ভূতগুলোর কথা আর বলবেন না মশাই। এই আছে, এই নেই। এদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করাই ঝকমারি।

আমার মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল প্রবাহ। সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল থরথরিয়ে।

মানুষ নয়, নরকঙ্কাল। চোখের দুটো গর্তের মধ্যে লাল আলোর শিখা। কথা বলবার সময় দাঁতগুলো মড়মড় করে উঠল।

গলা দিয়ে ভয়ার্ত স্বর বের হল, আপনি?

আবার ড্রাইভার হেসে উঠল। দু' হাতে পাশা নাড়লে যেমন শব্দ হয়, তেমনই আওয়াজ।

আমি? এই দেখুন।

কঙ্কাল-হাত দিয়ে ড্রাইভার একটা পইতা তুলে ধরল, খানদানি ব্রহ্মদত্যি। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলাম। আমার সঙ্গে ওদের তুলনা? মরেওছি ব্রাহ্মণের হাতে।

ড্রাইভার মুখ ফিরিয়ে আবার স্টিয়ারিং-এর দিকে নজর দিল।

কী দাদা, লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন? টিকেট করেছেন?

পিছন থেকে কন্ডাকটরের কণ্ঠ।

লোকটা হঠাৎ এল কোথা থেকে?

কিন্তু কোথায় লোকটা! শার্ট প্যান্ট, কাঁধে ব্যাগ সব ঠিক আছে, শুধু লোকের চিহ্ন নেই।

আচ্ছা ভুতুড়ে মিনিবাসে উঠেছি তো! এখন প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারলে হয়।

পকেট থেকে টিকেট বের করে দেখালাম। গলায় সাহস এনে বললাম, কোথায় ছিলেন এতক্ষণ?

কোথায় থাকব? সিটের তলায় একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছিলাম। ঘুম হবার কি আর জো আছে!

তারপর লোকটা পাশে বসল। লোকটা বসল মানে তার জামাকাপড় বসবার ভঙ্গি করল।

আপনাকে কী বলছিল ভৈরব ভটচাজ?

আমি অবাক। দেহ অদৃশ্য, অথচ কণ্ঠস্বর কানে আসছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, ভৈরব ভটচাজ কে?

ওই যে বাস চালাচ্ছে। বামনাই দেখাচ্ছিল বুঝি? যে আসে তাকেই পইতা তুলে দেখায়। আজকাল আবার পইতার কোনও মান-সম্মান আছে নাকি? ওর জন্যই তো আমার এই অবস্থা।

কীরকম?

লোকটা ব্যাগটা কাঁধ থেকে কোলের ওপর রাখল। বেশ জুতসই হয়ে যেন বসল।

তারপর বলতে শুরু করল।

স্টিয়ারিং ধরলে ভৈরবের আর জ্ঞান থাকে না। তখন মিনিবাস না উড়োজাহাজ কী চালাচ্ছে, ভুলেই যায়। কতবার সাবধান করেছি, কিন্তু কে শোনে

কার কথা। পাঁচ-ছ বছরের বাচ্চা হাতে মুড়ির ঠোঙা, রাস্তা পার হচ্ছিল, দিলে তাকে চাপা। ব্যস, চারদিক থেকে লোক ঘিরে ফেলল। আধলা ইটের বৃষ্টি শুরু হল মিনিবাসের ওপর। চায়ের দোকান থেকে এক টিকিওলা বামুন বের হয়ে এল, হাতে লোহার রড, একেবারে সোজা ভৈরবের মাথায়। আর শব্দটি করতে হল না। স্টিয়ারিং-এর ওপর নেতিয়ে পড়ল। আমি দরজা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিলাম, থান ইট এসে লাগল আমার চোয়ালে। বাপ বলে ডিগবাজি খেয়ে রাস্তার ওপর পড়লাম। সেই থেকে এই অবস্থা। ভৈরব বামুনের হাতে গেছে, নিজে বামুন, তাই ব্রহ্মদত্যি। আর আমি—

কথা আর শেষ হল না।

ভৈরব ভটচাজ হুংকার দিয়ে উঠল, দেখ গুপে, প্যাসেঞ্জারকে যা তা বোঝাসনি। তুইই তো বললি, সব ঠিক আছে, চালাও জোরে। বাবুদের অফিসের দেরি হয়ে যাবে।

খবরদার! কপালের নীচে অমন ড্যাবডেবে একজোড়া চোখ রয়েছে কীসের জন্য? রাস্তার লোকজন দেখতে পাও না? আমি বলব, তবে থামবে?

এবারে ওদের চেহারা দেখা গেল। চেহারা মানে কঙ্কাল।

চেঁচামেচি, হইচই, শেষকালে হাতাহাতি।

সর্বনাশ, ভৈরব ভটচাজ স্টিয়ারিং ছেড়ে বাসের ভিতরে হাত বাড়াল।

আজ তোর একদিন কি আমার একদিন! একবার ইটের ঘায়ে কাবার হয়েছিস, এবার আমার হাতে মরবি।

গুপেও আস্তিন গুটিয়ে রুখে দাঁড়াল।

আঙুলের হাড়গুলো মড়মড় করে উঠল। ব্যাগটা ছুড়ে ফেলে দিল বাসের মেঝের ওপর।

বেশ, হয়ে যাক। দাদা বলে এতদিন কিছু বলিনি, কিন্তু আর মানুষ নই যে মিথ্যা কথা সহ্য করব, অপমান গায়ে মাখব না। দেখি, কার হাড়ে কত শক্তি।

আমি মহা মুশকিলে পড়লাম।

দুই কঙ্কালের মাঝখানে আমি। লড়াই হলে বেশিরভাগ চোট আমার ওপর দিয়েই যাবে।

স্টিয়ারিং ছেড়ে ভৈরব ভটচাজ ভিতরে চলে এসেছে।

স্টিয়ারিং-এ কেউ নেই, অথচ ভুতুড়ে বাস উদ্দামবেগে ছুটেছে। বুঝতে পারলাম, এখনই আশপাশের দোকানে সঙ্গে কলিশান হবে। মিনিবাস চুরমার, সেই সঙ্গে আমিও।

অনেকগুলো উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। কেউ ভৈরব ভটচাজের পক্ষ সমর্থন করছে, কেউ গুপীর।

কিন্তু বাস তো খালি ছিল, এতগুলো লোক এল কোথা থেকে!

মুখ ফিরিয়ে যা দেখলাম, তাতে আমার মাথার চুল সজারুর কাঁটার মতন খাড়া হয়ে উঠল। মনে হল, বুকের টুকটুক শব্দ বুঝি বন্ধ হয়ে গেল।

একেবারে সামনের সিটে, আমার পাশে তখন হালদারের দাদামশাই। মাস দুয়েক আগে যিনি বাজার থেকে আসবার সময় বাসের চাকার তলায় একেবারে থেঁতলে গিয়েছিলেন।

তাঁর পিছনের লোকটিও আমার খুব চেনা। আমার অফিসের দপ্তরি। যে ক'দিন আগে অফিসের সামনে ট্রাম থেকে নেমে রাস্তা পার হবার সময় বাসের তলায় গুঁড়িয়ে ছাতু হয়ে গিয়েছিল।

আর একজনকে চিনতে পারলাম। আমাদের ঝিয়ের সাত বছরের ছেলে রতন। সেও মারা গেছে বাসের চাকায়।

বাকি লোকগুলোকে ঠিক বুঝতে পারলাম না। তবে রক্তমাংসের মানুষ কেউ নয়, সবাই কঙ্কাল।

বিকট চিৎকার আর হাড়ের হাততালির কানে তালাধরা শব্দ।

লড়ে যা ভৈরব! গুপী, দেখি তোর মুরোদ!

আর একদল চেঁচাচ্ছে, সাবাস গুপী, একটা আপার কাট। ভৈরবকে ঠান্ডা করে দে।

একবার ভাবলাম, যা থাকে কপালে, বাস থেকে দিই এক লাফ।

কিন্তু ছুটন্ত এই বাস থেকে লাফ দিলে নির্ঘাৎ মৃত্যু। তা ছাড়া নামবার জায়গা আটকেই তো যত মারামারি।

হঠাৎ প্রচণ্ড একটা শব্দ। মনে হল, মিনিবাসটা দু' হাতে তুলে কে যেন আছড়ে ফেলল।

হাড়ের খটাখট, কলকবজার ঝনঝনাৎ, সব লোকগুলো বুঝি তালগোল পাকিয়ে গেল।

আমি বিদ্যুৎগতিতে ছিটকে বাইরে গিয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ পড়ে ছিলাম জানি না। জ্ঞান হতে ব্যাঙের কর্কশ ঐকতান কানে এল। বুঝতে পারলাম, পুকুরের ধারে পড়ে আছি।

নরম মাটিতে পড়েছি বলে তেমন আঘাত পাইনি। দেহের কোথায় চোট লেগেছে হাত বুলিয়ে দেখতে গিয়েই চমকে উঠলাম।

একতিল মাংস কোথাও নেই, কেবল হাড় আর হাড়। স্বপ্ন দেখছি নাকি! চোখে হাত দিতেই হাত ভিতরে ঢুকে গেল। চোখ নেই, বিরাট দু'টি গর্ত।

অনেক কষ্টে কঙ্কাল দেহটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

১৬ এপ্রিল ১৯৭৫
অলংকরণ: মদন সরকার

গন্ধটা খুব সন্দেহজনক

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সেবার আমার দিদিমা পড়লেন ভারী বিপদে।

দাদামশাই রেল কোম্পানিতে চাকরি করতেন, সে আজ পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। আমার মা তখনও ছোট্ট ইজের-পরা খুকি। তখন এত সব শহর নগর ছিল না, লোকজনও এত দেখা যেত না। চারধারে কিছু গাছগাছালি, জঙ্গল-টঙ্গল ছিল। সেই রকমই এক নির্জন জঙ্গুলে জায়গায় দাদামশাই বদলি হলেন। উত্তর বাংলার দোমোহানীতে। মালগাড়ির গার্ড ছিলেন, তাই প্রায় সময়েই তাঁকে বাড়ির বাইরে থাকতে হত। কখনও একনাগাড়ে তিন-চার কিংবা সাত দিন। তারপর ফিরে এসে হয়তো একদিন মাত্র বাসায় থাকতেন, ফের মালগাড়ি করে চলে যেতেন। আমার মায়েরা পাঁচ বোন আর চার ভাই। দিদিমা এই মোট ন'জন ছেলেমেয়ে নিয়ে বাসায় থাকতেন। ছেলেমেয়েরা সবাই তখন ছোট ছোট, কাজেই দিদিমার ঝামেলার অন্ত নেই।

এমনিতে দোমোহানী জায়গাটা ভারী সুন্দর আর নির্জন স্থান। বেঁটে বেঁটে লিচুগাছে ছাওয়া, পাথরকুচি ছড়ানো রাস্তা, সবুজ মাঠ, কিছু জঙ্গল ছিল। লোকজন বেশি নয়। এক ধারে রেলের সাহেবদের পাকা কোয়ার্টার, আর অন্যধারে রেলের বাবুদের জন্য আধপাকা কোয়ার্টার, একটা ইস্কুল ছিল ক্লাস এইট পর্যন্ত। একটা রেলের ইনস্টিটিউট ছিল, যেখানে প্রতি বছর দু'-তিনবার কেদার রায় বা টিপু সুলতান নাটক হত। রেলের বাবুরা দল বেঁধে গ্রীষ্মকালে ফুটবল খেলতেন, শীতকালে ক্রিকেট। বড় সাহেবরা সে খেলা দেখতে আসতেন। মাঝে মাঝে সবাই দল বেঁধে তিস্তা নদীর ধারে বা জয়ন্তিয়া পাহাড়ে চড়ুইভাতিতেও যাওয়া হত। ছোট আর নির্জন হলেও বেশ আমুদে জায়গা ছিল দোমোহানী।

দোমোহানীতে যাওয়ার পরই কিন্তু সেখানকার পুরনো লোকজনেরা এসে প্রায়ই দাদামশাই আর দিদিমাকে একটা বিষয়ে খুব হুঁশিয়ার করে দিয়ে যেতেন। কেউ কিছু ভেঙে বলতেন না। যেমন স্টোরকিপার অক্ষয় সরকার দাদামশাইকে একদিন বলেন, ''এ-জায়গাটা কিন্তু তেমন ভাল নয় চাটুজ্জে। লোকজন সব বাজিয়ে নেবেন। হুটহাট যাকে তাকে ঘরে দোরে ঢুকতে দেবেন না।''

কিংবা আর একদিন পাশের বাড়ির পালিত-গিন্নি এসে দিদিমাকে হেসে হেসে বলে গেলেন, ''নতুন এসেছেন, বুঝবেন সব আস্তে আস্তে। চোখ কান নাক সব খোলা রাখবেন কিন্তু। ছেলেপুলেদেরও সামলে রাখবেন। এখানে কারা সব আছে, তারা ভাল নয়।''

দিদিমা ভয় খেয়ে বলেন, ''কাদের কথা বলছেন দিদি?''

পালিত-গিন্নি শুধু বললেন, ''সে আছে বুঝবেনখন।''

তারপর থেকে দিদিমা একটু ভয়ে ভয়েই থাকতে লাগলেন।

একদিন হল কী, পুরনো ঝি সুখীয়ার দেশ থেকে চিঠি এল যে, তার ভাসুরপোর খুব বেমার হয়েছে, তাই তাকে যেতে হবে। এক মাসের ছুটি নিয়ে সুখীয়া চলে গেল। দিদিমা নতুন ঝি খুঁজছেন তা হঠাৎ করে

পরদিন সকালেই একটা আধবয়সি বউ এসে বলল, "ঝি রাখবেন?"

দিদিমা দোনোমোনো করে তাকে রাখলেন। সে দিব্যি কাজকর্ম করে, খায়-দায়, বাচ্চাদের গল্প বলে ভোলায়। দিন দুই পর পালিত-গিন্নি একদিন সকালে এসে বললেন, "নতুন ঝি রাখলেন নাকি দিদি? কই দেখি তাকে।"

দিদিমা ডাকতে গিয়ে দেখেন, কলতলায় এঁটো বাসন ফেলে রেখে ঝি কোথায় হাওয়া হয়েছে। অনেক ডাকাডাকিতেও পাওয়া গেল না। পালিত-গিন্নি মিচকি হাসি হেসে বললেন, "ওদের ওরকমই ধারা। ঝি-টার নাম কী বলুন তো?"

দিদিমা বললেন, "কমলা।"

পালিত-গিন্নি মাথা নেড়ে বললেন, "চিনি, হালদার-বাড়িতেও ওকে রেখেছিল।"

দিদিমা অতিষ্ঠ হয়ে বললেন, "কী ব্যাপার বলুন তো।"

পালিত-গিন্নি শুধু শ্বাস ফেলে বললেন, "সব কি খুলে বলা যায়? এখানে এই হচ্ছে ধারা। কোনটা মানুষ আর কোনটা মানুষ নয় তা চেনা

ভারী মুশকিল। এবার দেখেশুনে একটা মানুষ ঝি রাখুন।''

এই বলে চলে গেলেন পালিত-গিন্নি, আর দিদিমা আকাশপাতাল ভাবতে লাগলেন।

কমলা অবশ্য একটু বাদেই ফিরে এল। দিদিমা তাকে ধমক দিয়ে বললেন, ''কোথায় গিয়েছিলে?''

সে মাথা নিচু করে বলল, ''মা, লোকজন এলে আমাকে সামনে ডাকবেন না, আমি বড় লজ্জা পাই।''

কমলা থেকে গেল। কিন্তু দিদিমার মনের খটকা-ভাবটা গেল না।

ওদিকে দাদামশাইয়েরও এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল। একদিন লাইনে গেছেন। নিশুতরাতে মালগাড়ি যাচ্ছে ডুয়ার্সের গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। দাদামশাই ব্রেকভ্যানে বসে ঝিমোচ্ছেন। হঠাৎ গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। তা মালগাড়ি যেখানে-সেখানে দাঁড়ায়। স্টেশনের পয়েন্টসম্যান আর অ্যাসিসট্যান্ট স্টেশনমাস্টাররা অনেক সময়ে রাতবিরেতে ঘুমিয়ে পড়ে সিগন্যাল দিতে ভুলে যায়। সে-আমলে এরকম হামেশা হত। সেরকমই কিছু হয়েছে ভেবে দাদামশাই বাক্স থেকে পঞ্জিকা বের করে পড়তে লাগলেন, পঞ্জিকা পড়তে তিনি বড় ভালবাসতেন। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। হঠাৎ দাদামশাই শুনতে পেলেন, ব্রেকভ্যানের পিছনে লোহার সিঁড়ি বেয়ে কে যেন গাড়ির ছাদে উঠছে। দাদামশাই মুখ বার করে কাউকে দেখতে পেলেন না। ফের শুনলেন, একটু দূরে কে যেন ওয়াগনের পাল্লা খোলার চেষ্টা করছে। খুব চিন্তায় পড়লেন দাদামশাই। ডাকাতরা অনেক সময় সাঁট করে সিগন্যাল বিগড়ে দিয়ে গাড়ি থামায়, মালপত্র চুরি করে। তাই তিনি সরেজমিনে দেখার জন্য গাড়ি থেকে হাতবাতিটা নিয়ে নেমে পড়লেন। লম্বা ট্রেন, তার একদম ডগায় ইঞ্জিন। হাঁটতে হাঁটতে এসে দেখেন, লাল সিগন্যাল ইতিমধ্যে সবুজ হয়ে গেছে, কিন্তু ড্রাইভার আর ফায়ারম্যান কয়লার ঢিপির ওপর গামছা পেতে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ওদেরও দোষ নেই, অনেকক্ষণ নাগাড়ে ডিউটি দিচ্ছে, একটু ফাঁক পেয়েছে কি ঘুমিয়ে পড়েছে। বহু ঠেলাঠেলি করে তাদের তুললেন দাদামশাই। তারপর ফের লম্বা গাড়ি পার হয়ে ব্রেকভ্যানের দিকে ফিরে আসতে লাগলেন। মাঝামাঝি এসেছেন, হঠাৎ শোনেন ইঞ্জিন হুইশল দিল, গাড়িও ক্যাঁচ কোঁচ করে চলতে শুরু করল। তিনি তো অবাক। ব্রেকভ্যানে ফিরে গিয়ে তিনি সবুজ বাতি দেখালে তবে ট্রেন ছাড়বার কথা। তাই দাদামশাই হাঁ করে চেয়ে রইলেন। অবাক হয়ে দেখেন, ব্রেকভ্যান থেকে অবিকল গার্ডের পোশাক পরা একটা লোক হাতবাতি তুলে সবুজ আলো দেখাচ্ছে ড্রাইভারকে। ব্রেকভ্যানটা যখন দাদামশাইকে পার হয়ে যাচ্ছে তখন লোকটা তাঁর দিকে চেয়ে ফিক করে হেসে গেল।

বহু কষ্টে দাদামশাই সেবার ফিরে এসেছিলেন।

সেবার ম্যাজিশিয়ান প্রফেসার ভট্টাচার্য চা-বাগানগুলোতে ঘুরে ঘুরে ম্যাজিক দেখিয়ে দোমোহানীতে এসে পৌঁছোলেন। তিনি এলেবেলে খেলা দেখাতেন। দড়িকাটার খেলা, তাসের খেলা, আগুন খাওয়ার খেলা। তা দোমোহানীর মতো গঞ্জ জায়গায় সেই খেলা দেখতেই লোক ভেঙে পড়ল। ভট্টাচার্য স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে প্রথম দৃশ্যে একটু বক্তৃতা করছিলেন, হাতে ম্যাজিকের ছোট্ট কালো একটা লাঠি। বলছিলেন, ম্যাজিক মানেই হচ্ছে হাতের কৌশল, মন্ত্রতন্ত্র নয়, আপনারা যদি কৌশল ধরে ফেলেন তা হলে দয়া করে চুপ করে থাকবেন। কেউ যেন স্টেজে টর্চের আলো ফেলবেন না...ইত্যাদি। এইসব বলছেন, ম্যাজিক তখনও শুরু হয়নি, হঠাৎ দেখা গেল তাঁর হাতের লাঠিটা হঠাৎ হাত থেকে শূন্যে উঠে ডিগবাজি খেল, তারপর আবার আস্তে আস্তে ফিরে গেল ম্যাজিশিয়ানের হাতে। প্রথমেই এই আশ্চর্য খেলা দেখে সবাই প্রচণ্ড হাততালি দিল। কিন্তু প্রফেসর ভট্টাচার্য খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। এর পরের খেলা—ব্ল্যাকবোর্ডে দর্শকেরা চক দিয়ে যা খুশি লিখবেন, আর প্রফেসর ভট্টাচার্য চোখ-বাঁধা অবস্থায় তা বলে দেবেন। কিন্তু আশ্চর্য, প্রফেসার ভট্টাচার্যের এই খেলাটা মোটেই সেরকম হল না। দর্শকরা কে গিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখবেন এই নিয়ে

এ ওকে ঠেলছেন, প্রফেসার ভট্টাচার্য চোখের ওপর ময়দার নেচী আর কালো কাপড় বেঁধে দাঁড়িয়ে সবাইকে বলছেন—চলে আসুন, সংকোচের কিছু নেই, আমি বাঘভাল্লুক নই...ইত্যাদি। সে সময়ে হঠাৎ দেখা গেল কেউ যাওয়ার আগেই টেবিলের ওপর রাখা চকের টুকরোটা নিজে থেকেই লাফিয়ে উঠল, এবং শূন্যে ভেসে গিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর লিখতে লাগল, প্রফেসার ভট্টাচার্য ইজ দি বেস্ট ম্যাজিশিয়ান অফ দি ওয়ার্ল্ড। এই অসাধারণ খেলা দেখে দর্শকরা ফেটে পড়ল উল্লাসে, আর ভট্টাচার্য কাঁদো কাঁদো হয়ে চোখ-বাঁধা অবস্থায় বলতে লাগলেন, কী হয়েছে! অ্যাঁ কী হয়েছে। এবং তারপর তিনি আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। আগুন খাওয়ার খেলাতেও আশ্চর্য ঘটনা ঘটালেন তিনি। কথা ছিল, মশাল জ্বেলে সেই মশালটা মুখে পুরে আগুনটা খেয়ে ফেলবেন। তাই করলেন। কিন্তু তারপরই দেখা গেল ভট্টাচার্য হাঁ করতেই তার মুখ থেকে সাপের জিবের মতো আগুনের হলকা বেরিয়ে আসছে। পরের তাসের খেলা যখন দেখাচ্ছেন, তখনও দেখা গেল, কথা বলতে গেলেই আগুনের হলকা বেরোয়। দর্শকরা দাঁড়িয়ে উঠে সাধুবাদ দিতে লাগল। কিন্তু ভট্টাচার্য খুব কাঁদো কাঁদো মুখে চার পাঁচ সাত গ্লাস জল খেতে লাগলেন স্টেজে দাঁড়িয়েই। তবু হাঁ করলেই আগুনের হলকা বেরোয়।

তখনকার মফস্সল শহরের নিয়ম ছিল বাইরে থেকে কেউ এরকম খেলা-টেলা দেখাতে এলে তাঁকে কিংবা তাঁর দলকে বিভিন্ন বাসায় সবাই আশ্রয় দিতেন। প্রফেসার ভট্টাচার্য আমার মামাবাড়িতে উঠেছিলেন। রাতে খেতে বসে দাদামশাই তাঁকে বললেন, "আপনার খেলা গণপতির চেয়েও ভাল। অতি আশ্চর্য খেলা।"

ভট্টাচার্যও বললেন, "হ্যাঁ, অতি আশ্চর্য খেলা। আমিও এরকম আর দেখিনি।"

দাদামশাই অবাক হয়ে বললেন, "সে কী! এ তো আপনিই দেখালেন।"

ভট্টাচার্য আমতা আমতা করে বললেন, "তা বটে। আমিই তো দেখালাম। আশ্চর্য।"

তাঁকে খুবই বিস্মিত মনে হচ্ছিল।

দাদামশাইয়ের বাবা সেবার বেড়াতে এলেন দোমোহানীতে। বাসায় পা দিয়েই বললেন, "তোদের ঘরদোরে একটা আঁশটে গন্ধ কেন রে?"

সবাই বলল, "আঁশটে গন্ধ! কই, আমরা তো পাচ্ছি না।"

দাদামশাইয়ের বাবা ধার্মিক মানুষ, খুব পণ্ডিত লোক, মাথা নেড়ে বললেন, "আলবাত আঁশটে গন্ধ। সে শুধু তোদের বাসাতেই নয়, স্টেশনে নেমেও গন্ধটা পেয়েছিলাম। পুরা এলাকাতেই যেন আঁশটে-আঁশটে গন্ধ একটা।"

কমলা দাদামশাইয়ের বাবাকে দেখেই গা ঢাকা দিয়েছিল, অনেক ডাকাডাকিতেও সামনে এল না। দিদিমার তখন ভারী মুশকিল। একা হাতে সব করতে কম্মাতে হচ্ছে। দাদামশাইয়ের বাবা সব দেখেশুনে খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, "এসব ভাল কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক।"

সেদিনই বিকেলে স্টেশনমাস্টার হরেন সমাদ্দারের মা এসে দিদিমাকে আড়ালে ডেকে বললেন, "কমলা আমাদের বাড়িতে গিয়ে বসে আছে। তা বলি বাছা, তোমার শ্বশুর ধার্মিক লোক সে ভাল। কিন্তু উনি যদি জপতপ বেশি করেন, ঠাকুরদেবতার নাম ধরে ডাকাডাকি করেন, তা হলে কমলা এ বাড়িতে থাকে কী করে?"

দিদিমা অবাক হয়ে বলেন, "এসব কী কথা বলছেন মাসিমা? আমার শ্বশুর জপতপ করলে কমলার অসুবিধে কী?"

সমাদ্দারের মা তখন দিদিমার থুতনি নেড়ে দিয়ে বললেন, "ও হরি, তুমি বুঝি জানো না? তাই বলি! তা বলি বাছা, দোমোহানীর সবাই জানে যে, এ হচ্ছে ওই দলেরই রাজত্ব। ঘরে ঘরে ওরাই সব ঝি-চাকর খাটছে। বাইরে থেকে চেহারা দেখে কিছু বুঝবে না, তবে ওরা হচ্ছে সেই তারা।"

"কারা?" দিদিমা তবু অবাক।

"বুঝবে বাপু, রোসো।" বলে সমাদ্দারের মা চলে গেলেন।

তা কথাটা মিথ্যে নয়। দোমোহানীতে তখন

ঝি-চাকর কিংবা কাজের লোকের বড় অভাব। ডুয়ার্সের ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, মশা আর বাঘের ভয়ে কোনও লোক সেখানে যেতে চায় না। যাদের না গিয়ে উপায় নেই তারাই যায়। আর গিয়েই পালাই পালাই করে। তবু ঠিক দেখা যেত, কারও বাসায় ঝি চাকর বা কাজের লোকের অভাব হলেই ঠিক লোক জুটে যেত। স্টেশনমাস্টার সমাদ্দারের ঘরে একবার দাদামশাই বসে গল্প করছিলেন। সমাদ্দার একটা চিঠি লিখছিলেন, সেটা শেষ করেই ডাকলেন, "ওরে, কে আছিস?" বলামাত্র একটা ছোকরামতো লোক এসে হাজির। সমাদ্দার তার হাতে চিঠিটা দিয়ে বললেন, "যা এটা ডাকে দিয়ে আয়।" দাদামশাই তখন জিজ্ঞেস করলেন, "লোকটাকে নতুন রেখেছেন নাকি?"

সমাদ্দার মাথা নেড়ে বলেন, "না না, ফাইফরমাশ খেটে দিয়ে যায় আর কী। খুব ভাল ওরা, ডাকলেই আসে। লোক-টোক নয়, ওরা ওরাই।"

তো তাই। মামাদের বাড়িতে প্রাইভেট পড়াতেন ধর্মদাস নামে একজন বেঁটে আর ফর্সা ভদ্রলোক। তিনি থিয়েটারে মেয়ে সেজে এমন মিহি গলায় মেয়েলি পার্ট করতেন যে, বোঝাই যেত না তিনি মেয়ে না ছেলে। সেবার সিরাজদ্দৌলা নাটকে তিনি

লুৎফা। গিরিশ ঘোষের নাটক। কিন্তু নাটকের দিনই তাঁর ম্যালেরিয়া চাগিয়ে উঠল। লেপ-চাপা হয়ে কোঁ-কোঁ করছেন। নাটক প্রায় শিকেয় ওঠে। কিন্তু ঠিক দেখা গেল, নাটকের সময়ে লুৎফার অভাব হয়নি। একেবারে ধর্মদাস মাস্টারমশাই-ই যেন গোঁফ কামিয়ে আগাগোড়া নিখুঁত অভিনয় করে গেলেন। কেউ কিছু টের পেল না। কিন্তু ভিতরকার কয়েকজন ঠিকই জানত যে, সেদিন ধর্মদাস মাস্টারমশাই মোটেই স্টেজে নামেননি। নাটকের শেষে সমাদ্দার দাদামশাইয়ের সঙ্গে ফিরে আসছিলেন, বললেন, ''দেখলেন, কেমন কার্যোদ্ধার হয়ে গেল। একটু খোনাসুরও কেউ টের পায়নি।''

দাদামশাই তখন চেপে ধরলেন সমাদ্দারকে, ''মশাই, রহস্যটা কী একটু খুলে বলবেন?''

সমাদ্দার হেসে শতখান হয়ে বললেন, ''সবই তো বোঝেন মশাই। একটা নীতিকথা বলে রাখি, সদভাব রাখলে সকলের কাছ থেকেই কাজ পাওয়া যায়। কথাটা খেয়াল রাখবেন।''

মামাদের মধ্যে যারা একটু বড়, তারা বাইরে খেলে বেড়াত। মা আর বড়মাসি তখন কিছু বড় হয়েছে। অন্য মামা-মাসিরা নাবালক নাবালিকা। মা'র বড় লুডো খেলার নেশা ছিল। তো মা আর মাসি রোজ দুপুরে লুডো পেড়ে বসত, তারপর ডাক দিত, ''আয় রে?'' অমনি টুক করে কোথা থেকে মায়ের বয়সিই দুটো মেয়ে হাসিমুখে লুডো খেলতে বসে যেত। মামাদের মধ্যে যারা বড় হয়েছে, সেই বড় আর মেজোমামা যেত বল খেলতে। দুটো পার্টিতে প্রায়ই ছেলে কম পড়ত। ছোট জায়গা তো, বেশি লোকজন ছিল না। কিন্তু কম পড়লেই মামারা ডাক দিত, ''কে খেলবি আয়।'' অমনি চার-পাঁচজন এসে হাজির হত, মামাদের বয়সিই সব ছেলে। খুব খেলা জমিয়ে দিত।

এই খেলা নিয়েই আর একটা কাণ্ড হল একবার। দোমোহানীর ফুটবল টিমের সঙ্গে এক চা-বাগানের টিমের ম্যাচ। চা-বাগান থেকে সাঁওতাল আর আদিবাসী দুর্দান্ত চেহারার খেলোয়াড় সব এসেছে। দোমোহানীর বাঙালি টিম জুত করতে পারছে না, হঠাৎ দোমোহানীর টিম খুব ভাল খেলা শুরু করল, দুটো গোল শোধ দিয়ে আরও একখানা দিয়েছে। এমন সময়ে চা-বাগান টিমের ক্যাপ্টেন খেলা থামিয়ে রেফারিকে বলল, ''ওরা বারোজন খেলছে।'' রেফারি গুনে দেখলেন, না, এগারোজনই। ফের খেলা শুরু হতে একটু পরে রেফারিই খেলা থামিয়ে দোমোহানীর ক্যাপ্টেনকে ডেকে বললেন, ''তোমাদের টিমে চার-পাঁচজন একস্ট্রা লোক খেলছে।''

দুর্দান্ত সাহেব-রেফারি, সবাই ভয় পায়। দোমোহানীর ক্যাপ্টেন বুক ফুলিয়ে বলল, ''গুনে দেখুন।'' রেফারি গুনে দেখে আহাম্মক। এগারোজনই।

দোমোহানীর টিম আরও তিনটে গোল দিয়ে দিয়েছে। রেফারি আবার খেলা থামিয়ে ভীষণ রেগে চেঁচিয়ে বললেন, ''দেয়ার আর অ্যাট লিস্ট টেন একস্ট্রা মেন ইন দিস টিম।''

দর্শকদেরও তাই মনে হয়েছে। গুনে দেখা যায় এগারোজন, কিন্তু খেলা শুরু হতেই যেন ঘাসের বুকে লুকিয়ে থাকা, কিংবা বাতাসের মধ্যে মিলিয়ে থাকা সব খেলোয়াড় পিল পিল করে নেমে পড়ে মাঠের মধ্যে। রেফারি দোমোহানীর টিমকে লাইন আপ করিয়ে সকলের মুখ ভাল করে দেখে বললেন, ''শেষ তিনটে গোল যারা করেছে তারা কই? তাদের তো দেখছি না। একটা কালো ঢ্যাঙা ছেলে, একটা বেঁটে আর ফর্সা, আর একটা ষাঁড়ের মতো, তারা কই?''

দোমোহানীর ক্যাপ্টেন মিন মিন করে যে সাফাই গাইল, তাতে রেফারি আরও রেগে টং। চা-বাগানের টিমও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হাফ্‌সে পড়েছে। কিন্তু কেউ কিছু বুঝতে পারছে না।

খেলা অবশ্য বন্ধ হয়ে গেল। দাদামশাইয়ের বাবা লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে খেলার হালচাল দেখে বললেন, ''আবার সেই গন্ধ। এখানেও একটা রহস্য আছে, বুঝলে সমাদ্দার?''

স্টেশনমাস্টার সমাদ্দার পাশেই ছিলেন, বললেন, ''ব্যাটারা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।''

"কে? কাদের কথা বলছ?"

সমাদ্দার এড়িয়ে গেলেন। দাদামশাইয়ের বাবা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "গন্ধটা খুব সন্দেহজনক।"

দাদামশাইয়ের বাবা সবই লক্ষ করতেন, আর বলতেন, "এসব ভাল কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক। ও বউমা, এসব কী দেখছি তোমাদের এখানে? হুট বলতেই সব মানুষজন এসে পড়ে কোত্থেকে, আবার হুশ করে মিলিয়ে যায়। কাল মাঝরাতে উঠে একটু তামাক খাওয়ার ইচ্ছে হল, উঠে বসে কেবলমাত্র আপনমনে বলেছি একটু তামাক খাই। অমনি একটা কে যেন বলে উঠল, এই যে বাবামশাই, তামাক সেজে দিচ্ছি। অবাক হয়ে দেখি, সত্যিই একটা লোক কল্কে ধরিয়ে এনে হুঁকোয় বসিয়ে দিয়ে গেল। এরা সব কারা?"

দিদিমা আর কী উত্তর দেবেন? চুপ করে থাকেন। দাদামশাইও বেশি উচ্চবাচ্য করেন না। বোঝেন সবই। কিন্তু দাদামশাইয়ের বাবা কেবলই চারধারে

বাতাস শুঁকে শুঁকে বেড়ান, আর বলেন, "এ ভাল কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক।"

মা প্রায়ই তাঁর দাদুর সঙ্গে বেড়াতে বেরোতেন। রাস্তায়-ঘাটে লোকজন কারও সঙ্গে দেখা হলে তারা সব প্রণাম বা নমস্কার করে সম্মান দেখাত দাদামশাইয়ের বাবাকে, কুশলপ্রশ্ন করত। কিন্তু দাদামশাইয়ের বাবা বলতেন, "রোসো বাপু, আগে তোমাকে ছুঁয়ে দেখি, গায়ের গন্ধ শুঁকি, তারপর কথাবার্তা।" এই বলে তিনি যাদের সঙ্গে দেখা হত তাদের গা টিপে দেখতেন, শুঁকতেন, নিশ্চিন্ত হলে কথাবার্তা বলতেন। তা তাঁর দোষ দেওয়া যায় না। সেই সময়ে দোমোহানীতে রাস্তায় ঘাটে বা হাটেবাজারে যে-সব মানুষ দেখা যেত তাদের বারো আনাই নাকি সত্যিকারের মানুষ নয়। তা নিয়ে অবশ্য কেউ মাথা ঘামাত না। সকলেরই অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল।

অভ্যাস জিনিসটাই ভারী অদ্ভুত। যেমন বড়মামার কথা বলি। দোমোহানীতে আসবার অনেক আগে থেকেই তাঁর ভারী ভূতের ভয় ছিল। তাঁরও দোষ দেওয়া যায় না। ওই বয়সে ভূতের ভয় কারই বা না থাকে। তাঁর কিছু বেশি ছিল। সন্ধের পর ঘরের বার হতে হলেই তাঁর সঙ্গে কাউকে যেতে হত। দোমোহানীতে আসার অনেক পরেও সে অভ্যাস যায়নি। একদিন সন্ধেবেলা বসে ধর্মদাস মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়ছেন একা, বাড়ির সবাই পাড়া-বেড়াতে গেছে। ঠিক সেই সময়ে তাঁর বাথরুমে যাওয়ার দরকার হল। মাস্টারমশাইকে তো আর বলতে পারেন না—আপনি আমার সঙ্গে দাঁড়ান। তাই বাধ্য হয়ে ভিতরবাড়িতে এসে অন্ধকারকে উদ্দেশ করে বললেন, "এই শুনছিস?"

অমনি একটা সমবয়সি ছেলে এসে দাঁড়াল, "কী বলছ?"

"আমি একটু বাথরুমে যাব, আমার সঙ্গে একটু দাঁড়াবি চল তো।"

সেই শুনে ছেলেটা তো হেসে কুটিপাটি। বলল, "দাঁড়াব কেন? তোমার কীসের ভয়?"

বড়মামা ধমক দিয়ে বলেন, "ফ্যাচ ফ্যাচ করিস না। দাঁড়াতে বলছি দাঁড়াবি।"

ছেলেটা অবশ্য দাঁড়াল। বড়মামা বাথরুমে কাজ সেরে এলে ছেলেটা বলল, "কীসের ভয় বললে না?"

বড়মামা গম্ভীর হয়ে বললেন "ভূতের।"

ছেলেটা হাসতে হাসতেই বাতাসে মিলিয়ে গেল। বড়মামা রেগে গিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, "খুব ফাজিল হয়েছ তোমরা।"

তা এইরকম সব হত দোমোহানীতে। কেউ গা করত না। কেবল দাদামশাইয়ের বাবা বাতাস শুঁকতেন, লোকের গা শুঁকতেন। একদিন বাজার থেকে ফেরার পথে তাঁর হাতের মাছের ছোট্ট খালুই, তাতে শিঙি মাছ নিয়ে আসছিলেন, তো একটা মাছ মাঝপথে খালুই বেয়ে উঠে রাস্তায় পড়ে পালাচ্ছে। দাদামশাইয়ের বাবা সেই মাছ ধরতে হিমশিম খাচ্ছেন, ধরলেই কাঁটা দেয় যদি। এমন সময়ে একটা লোক খুব সহৃদয় ভাবে এসে মাছটাকে ধরে খালুইতে ভরে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। দাদামশাইয়ের বাবা তাকে থামিয়ে গা শুঁকেই বললেন, "এ তো ভাল কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক। তুমি কে হে! অ্যাঁ! কারা তোমরা?"

এই বলে দাদামশাইয়ের বাবা তার পথ আটকে দাঁড়ালেন। লোকটা কিন্তু ঘাবড়াল না। হঠাৎ একটু ঝুঁকে দাদামশাইয়ের বাবার গা শুঁকে সে-ও বলল, "এ তো ভাল কথা নয়। গন্ধটা বেশ সন্দেহজনক। আপনি কে বলুন তো! অ্যাঁ! কে?"

এই বলে লোকটা হাসতে হাসতে বাতাসে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দাদামশাইয়ের বাবা আর গন্ধের কথা বলতেন না। একটু গম্ভীর হয়ে থাকতেন ঠিকই, ভূতের অপমানটা তাঁর প্রেস্টিজে খুব লেগেছিল। একটা ভূত তাঁর গা শুঁকে ওই কথা বলে গেছে, ভাবা যায়?

১৩৮২

অলংকরণ। সুধীর মৈত্র

আমরা আছি

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

ছেলেবেলা থেকে আমার ভূত খোঁজার নেশা। যখনই পোড়োবাড়ির খোঁজ পেয়েছি, যেটা ভূতেদের আস্তানা, সব কাজ ফেলে সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছি। গুরুজনদের হাজার নিষেধ সত্ত্বেও রাত কাটিয়েছি সেখানে, কিন্তু ভূতের সন্ধান পাইনি।

কতবার যে শ্মশানে ঘুরেছি তার ঠিক-ঠিকানা নেই। অমাবস্যার রাতে কুকুর-শেয়ালদের আগুনজ্বলা চোখ দেখেছি। এলোমেলো বাতাসে মড়ার খুলি থেকে অদ্ভুত শব্দ বের হয়েছে, তাও শুনেছি, ভয় পাইনি।

সব দেখেশুনে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছি, ভূত নেই, ভূতের কাহিনি মানুষের কল্পনা। যাঁরা বলেছেন, স্বচক্ষে ভূত দেখেছেন, তাঁরা নিছক চোখের ভুলের শিকার হয়েছেন।

সভা-সমিতিতে, বন্ধুবান্ধবদের আসরে সরবে ঘোষণা করেছি, যে যাই বলুক, ভূত-টুত নেই। প্ল্যানচেট একটা নিছক ধাপ্পাবাজি।

ঠিক এমনই সময়ে চিঠি এল।

চিঠিটা লিখেছে শৈলেন। আমার কলেজের অন্তরঙ্গ বন্ধু শৈলেন দাস।

শৈলেনও আমার মতন বিশ্বাস করত, ভূত নেই। ভূতের নিবাস মানুষের অলস মস্তিষ্কের এক কোণে।

চিঠিটা খুব ছোট। মাত্র লাইন দুয়েকের।

যদি ভূত দেখতে চাও, অবিলম্বে ঘাটশিলায় আমার কাছে চলে এসো। —শৈলেন।

শৈলেনের সঙ্গে কলেজ ছাড়ার পর আর বিশেষ দেখা হয়নি। অন্য বন্ধুদের কাছে শুনেছিলাম, সে আমলকী আর হরতুকির ব্যাবসা করে। ঝাড়গ্রাম না ঘাটশিলা কোথায় রয়েছে।

চিঠি পেয়ে বুঝলাম, শৈলেন ঘাটশিলায় রয়েছে।

হয়তো ভূত-টুত সব বাজে কথা, আমাকে তার কাছে নিয়ে যাবার জন্য ভূতের অবতারণা করেছে। জানে, এমন করে লিখলে আমি না গিয়ে পারব না।

কলেজে অধ্যাপনার কাজ। বছরের মধ্যে ছুটিই বেশি। পূজাপার্বণ, গরমের ছুটি তো আছেই, এছাড়া অন্যান্য উপলক্ষে কলেজ প্রায়ই বন্ধ থাকে।

ঠিক করলাম, দিন সাতেকের ছুটি নিয়ে ঘাটশিলায় চলে যাব।

পূজা কেটে গেছে। বাতাসে শীতের মিশেল। এ সময়ে ঘাটশিলার জলবাতাস ভাল। কড়া শীত পড়েনি।

ভূতের সন্ধান না পাই, স্বাস্থ্যটা ফিরিয়ে আনতে পারব।

যে কথা, সেই কাজ।

সুটকেশ আর বিছানা নিয়ে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে হাজির হলাম।

ট্রেন ছাড়ার দেরি ছিল।

কামরার এক কোণে মালপত্র রেখে একটা পত্রিকা কিনে বেঞ্চের ওপর বসলাম।

একটা গল্পের লাইন দুয়েক পড়েছি, হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠে চমকে উঠলাম।

"আরে কী খবর?"

মুখ তুলে অবাক হলাম।

সামনে দাঁড়িয়ে শৈলেন। বগলে খবরের কাগজ। হাতে রঙিন ব্যাগ।

"খবর আর কী? ভূত দেখাবার জন্য তুইই তো নেমন্তন্ন করেছিস।"

ভূতের উল্লেখে শৈলেনের মুখটা ম্লান হয়ে গেল। দু'চোখে আতঙ্কের ছায়া।

সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

"কী রে, কথা বল?"

"কী বলব, ব্যাপারটা আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। তোর কথা মনে হল তাই তোকে চিঠি লিখলাম।"

"ভালই করেছিস। ভূত যদি নাই পাই, তোর ঘাড়ে চেপে সাতটা দিন তো খেয়ে আসি।"

শৈলেন বলল, "চল, এবার ট্রেন ছাড়বার সময় হয়েছে। তুই কোন কামরায় উঠেছিস?"

আঙুল দিয়ে কামরাটা দেখিয়ে দিলাম।

দু'জনে উঠে পাশাপাশি বসলাম।

ট্রেন ছাড়তে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী ব্যাপার বল তো? তুই তো সাতজন্মে ভূত বিশ্বাস করতিস না। ঠিক আমার মতন। কী দেখলি?"

স্পষ্ট দেখলাম শৈলেনের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল। গালের পেশীগুলো কেঁপে উঠল থরথরিয়ে।

সে মৃদুকণ্ঠে বলল, "হঠাৎ বাতি বন্ধ হয়ে যেত। এক তিল হাওয়া নেই, দরজা জানলাগুলো নিজেদের ইচ্ছামতো খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। পাশের ঘরে খুটখাট শব্দ, গিয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই।"

এক ব্যাপার। যারাই ভূতের উপদ্রবের কথা বলেছে, তারা সবাই ঠিক এক কাহিনি শুনিয়েছে। এই হঠাৎ বাতি নিভে যাওয়া, আচমকা জানলা-দরজা খুলে যাওয়া। সেসব ঘরে রাতের পর রাত কাটিয়েছি। কিছুই দেখতে পাইনি। পাশের ঘরের খুটখাট শব্দ ইঁদুরের জন্য। বেড়াল আমদানি করতেই সে শব্দ থেমে গেছে। লাইনের গোলমালের জন্য বাতি হঠাৎ ফিউজ হয়ে গেছে।

তাই হাসতে হাসতে বললাম, "এসব ব্যাপারে তুইও ভয় পেয়ে গেলি শৈলেন? এর মধ্যে ভূত এল কোথা থেকে?"

শৈলেন আমার একটা হাত চেপে ধরল। ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, "ওসব কথা থাক ভাই। অন্য কথা বল। যা দেখবার গিয়েই দেখবি।"

কাজেই অন্য কথা পাড়লাম। শৈলেনের ব্যাবসার কথা।

"তারপর তোর ব্যাবসা কেমন হচ্ছে বল?"

শৈলেন বলল, "প্রথম প্রথম তো বেশ ভালই চলছিল। আমলকী আর হরতুকি কোনওটাই কিনতে হত না। ট্রাক নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে স্রেফ পেড়ে নেওয়া। তারপর সেই ট্রাক বড়বাজারে নিয়ে আসা। ইদানীং মুশকিল হয়েছে।"

"কী মুশকিল?"

"যারা সব জঙ্গল ইজারা নিচ্ছে, তারা জঙ্গলে ঢুকতে দিচ্ছে না। আমলকী, হরতুকি চালান তারাই দিচ্ছে। কিনতে গেলে এমন দর হাঁকছে যে আমার পোষায় না।"

"তা হলে কী করবি?"

"ভাবছি অন্য ব্যাবসা ধরব।"

"কী ব্যাবসা?"

"ঠিক করিনি, তুই চল, দু'জনে বসে ঠিক করা যাবে। তবে ঘাটশিলায় আর নয়।"

"কেন?"

"না ভাই, ঘাটশিলায় আর থাকব না। থাকতে পারব না। অন্য কোথাও যেতে হবে।"

তারপর আর বিশেষ কথা হল না। দু'জনে দু'খানা পত্রিকা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

খেয়াল হল খড়্গপুর স্টেশনে আসতে। শৈলেন বলল, "তুই বোস। আমি খাবারের চেষ্টা দেখি।"

শৈলেন নেমে যেতে কামরার চারদিকে নজর দিলাম।

ভিড়ে আমার চিরকালের ভয়। এই ভিড়ের ভয়ে বাইরে বের হওয়া প্রায়ই ছেড়েই দিয়েছি। ঘাটশিলা চলেছি তাও প্রথম শ্রেণিতে। কিন্তু প্রথম শ্রেণি একেবারে খালি নয়। চারজনের জায়গায় ছ'জন

বসেছি। সকলের টিকেট আছে কি না কে জানে। আজকাল তো টিকেট না করাই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাইরে দৃষ্টি দিলাম। খড়গপুর স্টেশন বদলায়নি। খড়গপুরে এসেছিলাম বছর পাঁচেক আগে। খড়গপুরে ঠিক নয়, খড়গপুরে নেমে দিঘা গিয়েছিলাম বাসে। স্বাস্থ্যের কারণে নয়, ভূতের সন্ধানে। কে একজন খবর দিয়েছিল সমুদ্রের ধারে এক পরিত্যক্ত বাড়িতে ভূত থাকে। সন্ধ্যার অন্ধকার নামলেই নানা রঙের আলোর রেখা বাড়ির মধ্যে নাচতে থাকে। বাইরের সমুদ্রের গর্জন সেইসময় নিস্তব্ধ হয়ে যায়। সেইসব আলোর রেখা যার দেখবার দুর্ভাগ্য হয়, তার মাথার গোলমাল হয়। খবর সংগ্রহ করে জেনেছিলাম, কে একটা লোক সম্পত্তির লোভে কাকে যেন গলা টিপে এই বাড়িতে দম বন্ধ করে মেরে ফেলেছে। সেই লোকটিও আর ফিরতে পারেনি। যতবার বেরোতে গেছে, রঙিন আলোর রেখা তার পথ আটকে ধরেছে। শুধু আলোর রেখাই নয়, সঙ্গে করুণ একটা আর্তস্বর। লোকটির মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছিল। অজ্ঞান অবস্থায় অন্য লোকেরা তাকে বাইরে নিয়ে আসে। জ্ঞান হলে তার কথাবার্তা শুনে রাঁচির হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। সেখানেই কিছুদিন পর লোকটির মৃত্যু হয়। সন্দেহ নেই, খুব জমজমাট গল্প। আমি গিয়ে সাতদিন ছিলাম। রঙিন আলো তো দূরের কথা, কোনও আলোই দেখতে পাইনি। শুধু ভাঙা ছাদের মধ্যে দিয়ে সমুদ্রের ঝোড়ো হাওয়া হু হু শব্দে বইত। সেই হাওয়ায় জরাজীর্ণ বাড়ির পলেস্তারা ঝুপ ঝুপ করে খসে পড়ত।

দিঘার ভূতের ব্যাপারে নিমগ্ন ছিলাম, খেয়াল হল ট্রেন নড়ে উঠতে। তাই তো! ট্রেন ছেড়ে দিল, অথচ শৈলেন কোথায়?

শৈলেন না উঠতে পারলেই মুশকিল।

এই প্রথম মনে পড়ল, শৈলেনের চিঠিতে তার বাসার কোনও ঠিকানা ছিল না। অবশ্য তাতে খুব অসুবিধা হত না। ঘাটশিলা এমন কিছু বড় জায়গা নয়। সেখানে বাঙালিও কম নেই। তাদের কাছে শৈলেন দাসের আস্তানা পাওয়া দুরূহ হত না।

একটু পরেই শৈলেন এসে দাঁড়াল।

"কী রে, ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, কোথায় ছিলি?"

"একেবারে গরম ভাজিয়ে আনতে একটু দেরি হয়ে গেল। ছুটতে ছুটতে হাতল ধরেছি। নে খা।"

শৈলেন প্রচুর গরম লুচি এনেছে। লুচি আর তরকারি।

খাওয়ার পর ভরপেটে বেশ একটু ঢুলুনি এল। যখন চোখ খুললাম তখন ট্রেন ঘাটশিলা স্টেশনে ঢুকছে। বেশ লম্বা ঘুমিয়েছি। চোখ চেয়ে দেখলাম পাশে শৈলেন নেই। বগলে বিছানা, হাতে সুটকেস ঝুলিয়ে তৈরি হয়ে নিলাম।

একটু এগোতেই দেখলাম, শৈলেন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। স্টেশনে নামা গেল। বেশ কনকনে বাতাস বইছে। পাহাড়ি ঠান্ডা।

স্টেশনের বাইরে আসার পর শৈলেন বলল, "তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি একটা সাইকেল রিকশা ডেকে নিয়ে আসি। এখান থেকে বেশ দূর। রঙ্কিনী দেবীর মন্দিরের কাছে আমার ডেরা।"

শৈলেন সিঁড়ি দিয়ে বাইরে নেমে গেল।

আবছা অন্ধকার। তার মধ্য দিয়ে দেখলাম, প্রচুর সাইকেল-রিকশা গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে। গোটা তিনেক ট্যাক্সিও রয়েছে।

দশ মিনিট, পনেরো মিনিট, কুড়ি মিনিট কাটল। শৈলেনের দেখা নেই। আশ্চর্য, সাইকেল-রিকশা ডাকতে এত দেরি কেন হবে! আধ ঘণ্টা কাটাবার পর বিরক্ত হয়ে মালপত্র নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বাইরে তখনও গোটা দুয়েক সাইকেল-রিকশা দাঁড়িয়ে।

একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "দেবীর মন্দির চেনো?"

"হ্যাঁ, হুজুর, বৈঠিয়ে।"

সাইকেল-রিকশাচালক হাত থেকে বাক্স বিছানা নিয়ে পাদানিতে রাখল। দরদস্তুরও করতে দিল না।

উঠে বসলাম। শৈলেনের অদ্ভুত আচরণের কোনও অর্থ খুঁজে পেলাম না। এ ধরনের রসিকতা অভদ্রজনোচিত, দেখা হলে সেটা বলে দেব।

বেশ অনেকটা পথ। ঝাঁকুনিতে কোমরে ব্যথা হয়ে গেল।

সাইকেল-রিকশাওয়ালাকে যখনই জিজ্ঞাসা করি, ''আর কতদূর রে?'' সে বলে, ''আ গিয়া হুজুর।''

অবশেষে মন্দির নজরে এল।

তার কাছে একতলা একটা বাড়িও দেখতে পেলাম। কাছে যখন আর কোনও বাড়ি নেই, তখন এটাই শৈলেনের আস্তানা হবে।

সাইকেল-রিকশার ভাড়া মিটিয়ে বাক্স বিছানা নিয়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। হাত দিয়ে ঠেলতেই দরজা খুলে গেল। তার মানে দরজা ভেজানো ছিল। ভিতরে জমাট অন্ধকার। সুটকেস খুলে টর্চ বের করলাম। আমাকে ভয় দেখাবার জন্য শৈলেনের বদমায়েশি? আগেভাগে চলে এসে বাড়ির মধ্যে ঢুকে কোনও ফন্দি আঁটছে।

ঘরের কোণে টর্চের আলো পড়তেই চিৎকার করে উঠলাম। মেঝের ওপর শৈলেন পড়ে রয়েছে। চিত হয়ে। দু'টি চোখ বিস্ফারিত। মনে হয় খুব ভয় পেয়েছে। দু' কশ বেয়ে রক্তের স্রোত গড়িয়ে পড়ছে। তার দেহে যে প্রাণ নেই, এটা বোঝবার জন্য কাছে যাবার দরকার হল না। মনে হল, কেউ গলা টিপে তাকে হত্যা করেছে।

তখনও টর্চের আলো শৈলেনের দেহের ওপর। তার শরীর ঘুরে গেল। কে যেন ঘুরিয়ে দিল দেহটাকে। চোখ দুটো আরও বিস্ফারিত। গালের মাংসপেশীগুলো তির তির করে কাঁপছে।

আর দাঁড়িয়ে থাকার সাহস হল না। তিরবেগে রাস্তার ওপর এসে পড়লাম।

ঠিক সেই সময় রাস্তা দিয়ে একটা মোটর ছুটছিল। আর একটু হলে মোটরের তলায় পড়তাম। চালক ক্ষিপ্রহাতে মোটর থামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ''এ কী, পাগলের মতন ছুটছেন কেন? চাপা পড়তেন যে!''

জ্ঞানশূন্য হয়ে কেন ছুটছিলাম চালককে বললাম।

ভদ্রলোক বাঙালি। গলায় স্টেথসকোপ দেখে মনে হল ডাক্তার।

ডাক্তার সব শুনে বলল, ''কী বলছেন আপনি? শৈলেনবাবু তো আজ দিন দশেক হল মারা গেছেন। রহস্যজনকভাবে মৃত্যু। গলা টিপে কারা মেরে রেখে গেছে।''

''চোর-ডাকাত?''

ডাক্তার মাথা নাড়ল, ''না, না, পয়সাকড়ি সব ঠিক ছিল। জিনিসপত্র একটু এদিক ওদিক হয়নি। বাড়িটার খুব বদনাম আছে। এর আগেও দু'জন এভাবে মারা গেছেন। কিন্তু আপনি দেখলেন কী করে? পুলিশ থেকে তো দরজায় তালা দিয়ে গেছে।''

বললাম, ''কই না তো। দরজা তো খোলা।''

''চলুন তো দেখি।''

টর্চের আলো ফেলতেই চমকে উঠলাম। দরজায় বিরাট আকারের দুটো তালা।

ডাক্তার এ নিয়ে আর কিছু জিজ্ঞাসা করল না। শুধু বলল, ''স্টেশনে যাবেন তো চলুন। আমি ওইদিকে যাব।''

রাস্তায় একটি কথাও হল না। কোনও কথা বলবার মতন মনের অবস্থা আমার ছিল না। শৈলেনের বীভৎস দু'-চোখের দৃষ্টি আমাকে মূক করে ফেলেছিল।

প্ল্যাটফর্মে বেঞ্চের ওপর বসলাম। জানি, আমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। যে লোকটা দশ দিন আগে মারা গেছে, সে হাওড়া থেকে ঘাটশিলা পর্যন্ত আমার সঙ্গে এসেছে নিজের মৃতদেহ দেখাবার জন্য, এমন আজগুবি কথা কে বিশ্বাস করবে?

দরজায় তালা আটকানো, মৃতদেহ কবে স্থানান্তরিত হয়ে গেছে, অথচ টর্চের আলোয় শৈলেনের সেই বীভৎস রূপ কী করে দেখলাম?

ঠান্ডা কনকনে হাওয়া। কানের পাশে মৃদু কণ্ঠে কার গলা, "আমরা আছি, আমরা আছি। অবিশ্বাস কোরো না।"

অবিকল শৈলেনের গলা।

১৩৮২

অলংকরণ: পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

ভূতের মাছ-ধরা

মনোজ বসু

মাছের বড় আকাল। ঈশান জেলে যখন-তখন গাঙে গিয়ে পড়ে, নানান কায়দায় জাল ফেলে। ওঠে শেওলা-ঝাঁঝি, ওঠে শামুক-গুগলি। মাছের আঁশখানা অবধি ওঠে না।

গাঙের ধারে ঘর। চর ধু ধু করে। জাল শুকায় সেখানে পাড়ার ছেলেপুলে সব খেলা করে। পাইকার এসে শুধায়, মাছ-টাছ কী পড়ল গো?

ঈশান বুড়ো আঙুল নাড়ে। নিত্যিদিনের একই জবাব, কিছু না, লবডঙ্কা। গাঙ-খাল ছেড়ে সমস্ত মাছ দেশান্তরী হয়েছে কোথায়।

তা বলে হাত-পা কোলে করে বসে থাকাও যায় না। খাবে কী? সেদিন অমাবস্যা। রাত-দুপুরে ধড়মড় করে উঠে ঈশান বাইরে গেল। কোটালে গাঙের জল বেড়েছে, জল বাড়লে মাছও আসে। আর, গাঙ আজ পুকুরেরই মতন শান্ত। এমনটা কালেভদ্রে কদাচিৎ ঘটে। আশায় আশায় সে জাল বের করল। খানিকটা বেয়ে দেখবে। কপালে কী ওঠে, দেখা যাক।

জাল ঘুরিয়ে খেওন ফেলতে যাচ্ছে— আরে আরে, কী কাণ্ড! তারার আবছা আলোয় দেখা যাচ্ছে, তালগাছের মতন দীর্ঘ এক ছায়ামূর্তি ওপারের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে জলের উপরে হাঁটতে হাঁটতে মাঝগাঙে এসে দাঁড়াল। থ হয়ে গেছে ঈশান। মূর্তি হঠাৎ পাগলের মতন পা-দাপাদাপি শুরু করল। নিথর গাঙে সঙ্গে সঙ্গে তুমুল ঢেউ। ঢেউয়ের পর ঢেউ, ডাঙার উপর আছড়ে পড়ছে। খেওন ফেলবে কী, ঢেউয়ের ধাক্কায় ঈশান খাড়া হয়ে দাঁড়াতেই পারে না আর। ধনুক থেকে ছোড়া তিরের মতো মূর্তি এইবার গাঙের মাঝখান ধরে ছুটল। ছুটে যায়, পিছনে সঙ্গে সঙ্গে ঢেউয়ের তোলপাড়। কী সব প্রকাণ্ড ঢেউ— সমুদ্রের ঢেউ-ভাঙা কোথায় লাগে! মাছ মারার বারোটা বেজে গেল— যত মাছ তাড়িয়ে-তুড়িয়ে দরিয়ায় নিয়ে ফেলবে মনে হচ্ছে।

সকাল না-হতেই ঈশান দু'কড়ি-মাঝির কাছে ছুটল। দু'কড়ির বদলে অনেকে বলে তেমাথা-মাঝি। বুড়ো হয়ে গিয়ে মাথা বড্ড কাঁপে, সেজন্য দু' হাঁটুর মধ্যে মাথা চেপে দু'কড়ি বসে থাকে। দেখায় যেন পাশাপাশি তিনটে মাথা। সেই থেকে নাম ছড়িয়ে গেছে তেমাথা-মাঝি। বাদাবনের সকল খবরাখবর বুড়োর নখদর্পণে। ঈশান তার কাছে গিয়ে পড়ল। ''মাছ সব তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। উপায় কী হবে বলো মাঝি?''

বৃত্তান্ত শুনে দু'কড়ি চমক খেল। ''সর্বনাশ, মেছোভূত এসে জুটেছে। মাছ ধরতে গিয়ে যারা ডুবে মরে, তাদের মধ্যে ভূত হয় কেউ কেউ। মানুষের ঘেঁষ সইতে পারে না। সে-কালে বাদাবনে থাকত, প্রাচীন মুরুব্বিদের কাছে গল্প শুনেছি। এখন সুন্দরবন কেটেকুটে প্রায় তো শেষ করে আনল। মাঝি-মাল্লা বাউলে-কাঠুরে সরকারি বাবুরা— মানুষ সর্বক্ষণ কিলবিল করে। মেছোভূতরা তাই বাদাবন ছেড়ে দূর-দরিয়ায় সরে পড়েছে। একটা কী গতিকে এসেছে, বুঝতে পারছি।''

ঈশান সকাতরে বলে, ''ভূত তাড়ানোর ফিকির কিছু বলে দাও। নয়তো না-খেয়ে শুকিয়ে গুষ্টিসুদ্ধ মারা পড়ব।''

দু'কড়ি বলে, ''ভূতের ওঝা আমি নই। সে তোমাদের নটবর ওস্তাদ। তাগাতাবিজ বেঁধে ধুনেবাণ-সর্ষেবাণ ছেড়ে ভূতপেতনি নাজেহাল করে। তার কাছে চলে যাও।''

নটবর তো অঞ্চলছাড়া। তা হলে উপায়?

ঈশান খপ করে দু'কড়ির পা জড়িয়ে ধরল, ''পাদপদ্মে শরণ নিলাম মাঝিঠাকুর। বাঘ-কুমির সাপ-শুয়োর ভূতপেতনি দানো-পোড়ো— বাদাবনের সকলের সঙ্গে তোমার দহরম-মহরম। তাড়ানো না-ই হল— ভূতের সঙ্গে ভাবসাব জমিয়ে দাও, দু'বেলা পেটে খেয়ে যাতে বাঁচতে পারি।''

''বেশ, ভাব করে ফেলো মেছোভূত মশায়ের সঙ্গে। জমে যায় তো সুখের অন্ত থাকবে না।''

ভ্রু কুঁচকে দু'কড়ি ভাবছে। বলল, ''মাছ ভালবাসেন ওঁরা— আমাদের মতো ভাজা-মাছই ভাল খান। অথচ নিজেরা ভেজে নেবেন, সে উপায় নেই। অপদেবতা হয়ে আগুন-লোহা ছুঁতে পারেন না। আমি বলি কী, মেছোভূত মশায়কে যত্ন করে ভাজা-মাছের নেমন্তন্ন খাওয়াও। কী খুশি হবেন দেখো। সরষের তেলে নয় কিন্তু— সরষেবাণ মেরে ভূত তাড়ায়, সরষের নামে ওঁরা বেজার হন। নারকেল তেল কিম্বা তিলের তেলে ভাজা হবে।''

ঈশান বলে, ''মাছ খাওয়াব, কিন্তু জালে তো মাছই পড়ছে না।''

''দূর-দূরান্তরের হাটেঘাটে গিয়ে কেনো— যে-দাম লাগে লাগুক। কাজ হবে, আমি বলছি। দু'-চারখানা মাছে হবে না—ভরপেট খাওয়াতে হবে। দশ-বারো সের অন্ততপক্ষে।''

জাল-দড়ি বন্ধক দিয়ে ঈশান মাছ কিনে আনল। তা ছাড়া উপায় কী? ঝুড়ি-ভর্তি ভাজামাছ চরের কিনারে রেখে এসে ঘরের দরজায় খিল এঁটে দিল।

ভোরবেলা গিয়ে দেখে, বহুদর্শী দু'কড়ি ঠিক যেমনটা বলেছিল, ঝুড়ি শূন্য, কাঁটাগুলো পর্যন্ত ফেলে যাননি। দু'কড়ির কাছে ঈশান গিয়ে খবর বলল। শুনে সে মহাখুশি, ''ভূতমশায় পরিতুষ্ট হয়েছেন বোঝা গেল। আজ রাত্রেও খাইয়ে দাও। খরচার ভাবনা করতে গেলে হবে না। মাছের পরিমাণ আরও কিছু বাড়াও। কাল দশ সের ছিল, লাগাও আজ পনেরো সের।''
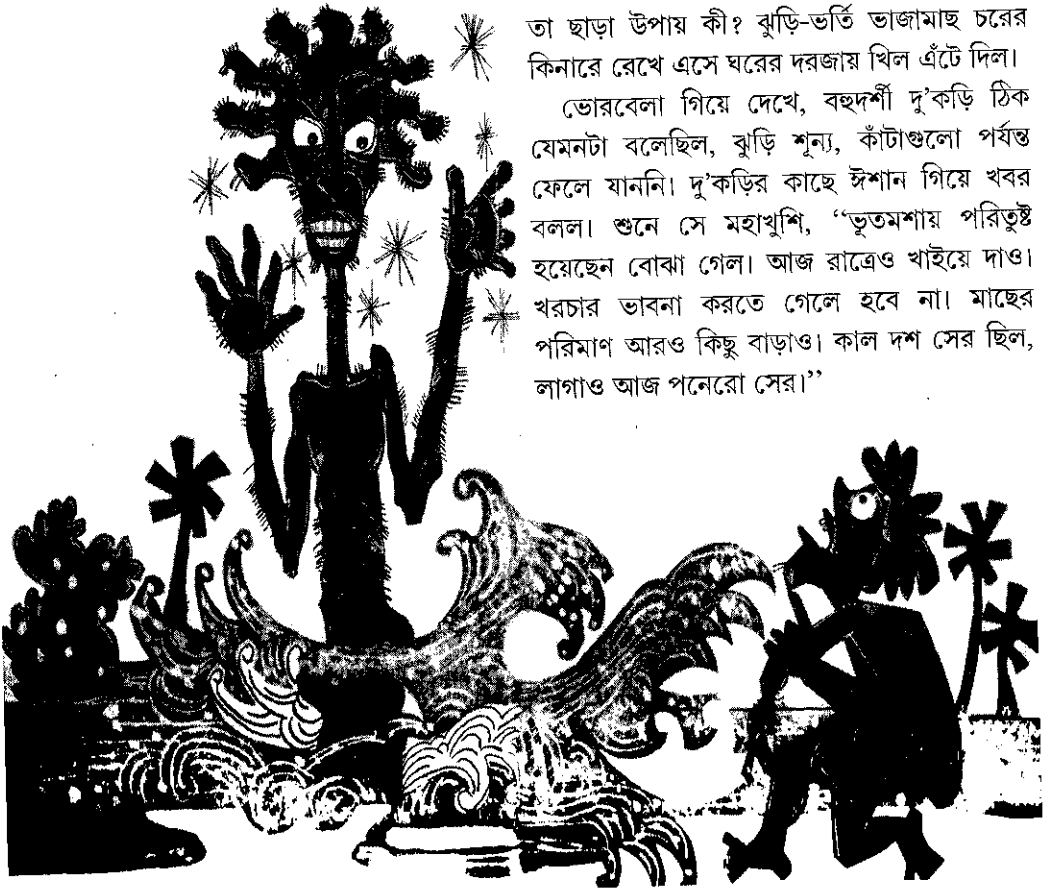
তা-ই হল। পনেরো সের মাছও মেছোভূত অবলীলাক্রমে শেষ করে গেছে। বুড়ো দু'কড়ি আহ্লাদে যেন টগবগ করে ফুটছে। বলে, ''আজকে আধমন ভেজে ফেলো। তারও এক টুকরো পড়ে থাকবে না দেখো।''

চক্ষু কপালে তুলে ঈশান বলে, ''সর্বনাশ! আমি এদিকে ফতুর হয়ে যাচ্ছি সেদিকটা একবার দেখো।''

দু'কড়ি হেসে ঈশানের পিঠে থাবা মেরে বলল, ''তিনদিন হয়ে যাচ্ছে। আর দিতে হয়ে না, মজা লুঠবে এইবার।''

তাজা মাছ খেয়ে খেয়ে মেছোভূতকে লোভে ধরেছে। নিশিরাত্রে দরজায় টোকা।

ঘরের ভিতর থেকে ঈশান বলে, ''কে?''

মেছোভূত বলে (নাকি সুরে বলছে, ওদের যা নিয়ম), ''মাছ দিঁলিনে আঁজ?''

দু'কড়ি যেমন-যেমন শিখিয়ে দিয়েছে—ঈশান সকাতরে বলল, ''গাঙের সমস্ত মাছ তাড়িয়ে বের করেছেন, নিত্যি নিত্যি মাছ কোথা পাব হুজুর? মাছ ধরে আমার ভাতের জোগাড় হয়, না-খেয়ে এবারে আমরাই বাড়িসুদ্ধ মারা পড়ব।''

মেছোভূত বলে, ''আমি মাছ ধরে দেব, আমায় তুই ভাজা-মাছ খাওয়াবি। রাজি?''

''হ্যাঁ, হুজুর।''

মাছ ধরে জেলেরা হাপরে রাখে। বড় হাপরটা তুলে নিয়ে মেছোভূত অদৃশ্য। অনতিপরে ফিরল, হাপর-বোঝাই মাছ। চরের উপর ঢেলে দিল। বলে, ''দাড়িপাল্লা বের কর। সমান দুটো ভাগ হবে, এক ভাগ তোর, এক ভাগ আমার। আমার ভাগ এক্ষুনি কড়াইতে চাপিয়ে দে। খিদে পেয়ে গেছে।''

চক্ষু কপালে তুলে ঈশান বলে, ''এত মাছ একলা খাবেন?''

খলখল করে হেসে ভূত বলে, ''ক'টাই বা? খাওয়ার সময়টা দেখিস না তোরা—কেমন করে খাই, কতক্ষণ লাগে।''

ঈশানের বউ রান্নাঘরে তাড়াতাড়ি মাছ চাপিয়ে দিল। ভাজা-মাছের গন্ধে চারিদিক আমোদ করেছে। কেওড়াগাছের ডালের উপর বসে ছায়ামূর্তি পা নাচাচ্ছে। পাইকার এসে ইতিমধ্যে ঈশানের ভাগের মাছ কিনে নিয়ে গেল।

চরের উপর আসন-পিঁড়ি হয়ে ভূত গদগদ করে খাচ্ছে। মাছের পাহাড় দেখতে দেখতে নিঃশেষ। সামনে দাঁড়িয়ে ঈশান তাজ্জব দেখছে। মেছোভূত মুখ তুলে দরদভরা সুরে বলল, ''সবই তো বেচে দিলি। এমন মাছ নিজেরা একটু মুখে দিলিনে?''

ঈশান নিশ্বাস ফেলে বলল, ''লোভ তো হয়—কিন্তু না-বেচলে চাল-নুন-তেল কিনি কী দিয়ে? হুজুরের একখানা মাত্র পেট, ছেলেপুলে নিয়ে মোটমাট আমার আড়াই গন্ডা।''

ভূত বলে, ''কাল মাছ ধরার সময় তুই সঙ্গে যাবি। হাপরে কতই বা মাছ ধরে— বড় জালা একটা সঙ্গে নিস। আমি জাল ফেলতে ফেলতে যাব, পিছনে থেকে তুই জাল ঝেড়ে ফেলবি। দুনো-তে দুনো ধরা যাবে দেখিস, জালা মাছে ভরে যাবে।''

জালাও জোটানো গেছে— খুব বড় আকারের। জালার মুখে দড়ি বেঁধে ঈশান গাঙের উপর খোঁটার সঙ্গে বেঁধে রাখল। স্রোতের টানে হেলছে-দুলছে জালা। রাতদুপুরে ভূতের ডাক পেয়ে ঈশান জালার কাছে চলে যায়, জালার দড়ি হাতে নিয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়ায়।

''আয়।'' বলে ছায়ামূর্তি জাল কাঁধে গাঙে নেমে পড়ল। জলের উপর দিয়ে পায়ের পর পা ফেলে যাচ্ছে, আমরা যেমন ডাঙার উপর দিয়ে হাঁটি। পায়ের পাতাটুকুও ডোবে না, আলগোছে কেমন গাঙে ভেসে রয়েছে।

খানিকটা গিয়ে পিছনে তাকিয়ে ভূত দেখে, ঈশান নেই! হাঁক দিল, ''ডাঙায় কেন রে— হল কী?''

''যাই কেমন করে হুজুর?''

''আমি যাচ্ছি দেখতে পাসনে? পিছু পিছু চলে আয়।''

ঈশান বলে, ''আপনি আর আমি! ওজন-টোজন নেই— আপনি তো একখানা ছায়া। গাঙে হাঁটতে গেলে আমি জলের নীচে তলিয়ে যাব।''

''তা বটে।'' মেছোভূত প্রণিধান করল,

"পোড়াকপাল তোমার। দিনরাত গুচ্ছের হাড়মাংসের বোঝা বয়ে বেড়াতে হয়। ইচ্ছে হল আমি জলে হাঁটলাম, ইচ্ছে হল আকাশে উড়লাম। তোমার সেসব হবার জো নেই, তোমার জন্যে চাই শক্ত মাটি।"

তরতর করে কাছে এসে ঈশানের আপাদমস্তক নজর করে দেখল। বলে, "খালি পা কেন? জুতো পরে আয়।"

ঈশান বলল, "পরনের একখানা কাপড়ই জোটাতে পারিনে তা পায়ে জুতো পরে নবাব-আমিরের মতন খটখট করে বেড়াব!"

ভূত শুধায়, "জুতো না থাক,পায়ে কী পরে বেড়াস তুই?"

"কিছু না। এমনি, খালি পায়ে—"

একটুখানি ভেবে মেছোভূত বলে, "হাঁড়ি-মালসা-সরা যা হোক কিছু নিয়ে আয় দিকি। এক জোড়া।"

রান্নাঘরে খুঁজে-পেতে সরা মিলল। দুটোই আছে। সরা হাতে নিয়ে মেছোভূত থুঃ থুঃ করে জলে ছুড়ে দিল। ডোবে না সরা— অবাক কাণ্ড! স্রোতের টানে ভেসেও যায় না। ডাঙার কাছে একটা জায়গায় স্থিরভাবে রয়েছে। ভূতের হুকুমে ঈশান পা দুটো দুই সরায় রাখল। সরার সঙ্গে পা সেঁটে গেল। মেছোভূতের পিছু পিছু চলল এবার ভাসন্ত-জালা কোমরে-বাঁধা অবস্থায়। কিছুমাত্র অসুবিধে নেই, ঠিক যেন জুতো পায়ে ডাঙার উপর দিয়ে হাঁটছে। দড়ির টানে জালাও ভেসে ভেসে আসছে।

হাঁটছে তো হাঁটছেই। হাঁটা বলা চলে না তাকে, দৌড়ানো। না, তারও বেশি। কী এক অলক্ষ আকর্ষণে ভূতের পিছু-পিছু নক্ষত্রবেগে সে ছুটেছে। এ কোথায় নিয়ে এল—মহাসমুদ্র, ঢেউ ভাঙছে। কোনওদিকে কিছু নজরে আসে না— খালি জল, জলের ঢেউ। ভূত দ্রুত হাতে খেওনের পর খেওন ফেলছে। জল থেকে জাল তুলে পিঠের দিকে ছুড়ে দিচ্ছে। সেখানে ঈশান— বাছাই ভাল মাছগুলো তাড়াতাড়ি জালের বার করে নিয়ে জালায় ফেলে।

জাল থেকে যেই মাত্র হাত সরাল, মেছোভূত সঙ্গে সঙ্গে আবার খেওন ফেলে। অত বড় প্রকাণ্ড জালা দেখতে-দেখতে বোঝাই।

ঈশান বলে, ''আর ধরছে না। ঘরে যাওয়া যাক এইবারে হুজুর।''

চরের উপর মাছ ঢেলে ফেলে ভাগাভাগি হল। ঈশানের ভাগ থেকে খাবার মাছ চাট্টি আলাদা রেখে বাদবাকি হাপরে তুলল। মেছোভূতের ভাগ বড় ঝুড়িতে। ঈশানের বউ কড়াইতে তেল চাপিয়ে এসেছে। ঈশান আর সে ঝুড়ি ধরাধরি করে কড়াইয়ের উপর উপুড় করে দিল। ভূত মশায়ের চোখের উপর। পাইকারে ইতিমধ্যে ঈশানের হাপর মাছির মতন ছেঁকে ধরল। মহানন্দে ঈশান দর হাঁকছে। মাছ ভাজার গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে মেছোভূত অদূরে কেওড়া গাছের ডালের উপর পা দোলাচ্ছে। আহার সাঙ্গ করে তবে গাঙ পার হয়ে যাবে।

সাত-আট দিন খাসা কাটল। মাছ ভেজে ঈশানের বউ পাহাড় বানিয়ে দেয়, মেছোভূত সেই পাহাড় নিমেষে উড়িয়ে দিয়ে হাসি-খুশিতে গাঙ পার হয়ে চলে যায়। আর নিজের ছেলেপুলের পাতে বউ এক টুকরোর বেশি দু'টুকরো দিতে পারে না। নিজ অংশের মাছ সবই প্রায় বেচে দিয়ে ঈশান গৃহস্থালির আর দশটা জিনিস কেনে। ঝুড়ির দুটো-চারটে মাছ যদি সরানো যায়, ভূতে তা কখনও টের পাবে না। বউ এই সমস্ত ভাবছে। ছেলেপুলেদের তা হলে কিছু বেশি করে মাছ খাওয়ানো যাবে।

চুপিসারে আজ বউ ঝুড়িতে কাঁঠাল আঠা মাখিয়ে রেখেছে। ভাগাভাগির পর ভূতের মাছ যথারীতি ঝুড়িতে তুলে নিয়ে তেলের কড়াইতে ঢালল। কেওড়া-ডালে বসে ভূত মশায় দেখে আর স্ফূর্তিতে পা দোলায়। সব মাছ কিন্তু কড়াইয়ে পড়েনি, কাঁঠাল আঠায় ঝুড়ির সঙ্গে কিছু আটকে আছে। ভূত চলে গেলে মাছগুলো খুঁটে নেওয়া যাবে।

খাওয়া শেষ করে ভূতের খুঁতখুঁতানি যায় না। পেটে একটু যেন খিদে রয়ে গেছে। অথচ পুরো ঝুড়ি মাছ— অন্য দিন যা থাকে আজকেও তা-ই। যাই হোক, গেল সে-রাত। পরের রাতেও আবার অমনি। রোগে ধরল নাকি ভূতমশায়কে— ঝুড়িভরা মাছে খিদে মরে না, বদ্যি দেখিয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে?

ঘরের ছাঁচতলায় ঝুড়িটা উপুড় করা রয়েছে। কী মনে হয়েছে— ভূত গিয়ে ঝুড়ি তুলে ধরল। বটে রে!

ছায়ামূর্তির মুখে-চোখে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ছুটে গেল সে গাঙে। মাঝগাঙে জলের উপর গিয়ে দাঁড়াল। পায়ে জল ছিটোচ্ছে ডাঙার দিক লক্ষ করে। ঈশানের ঘরের দিকে। একবার ডান পায়ে ছিটোচ্ছে, একবার বাঁ পায়ে।

কী কাণ্ড, জলতলে মেঘগর্জন। রক্ষে নেই কোনওমতে, চালাকির পরিণাম। জল উঠছে আকাশমুখো— উঁচু হতে হতে মনুমেন্টের মতো কুতুবমিনারের মতো হয়ে উঠল। জলের থাম দশ-বারোটা লাইনবন্দি। সেই থাম পেঁচিয়ে আরও জল উপরমুখো উঠছে। মোটা হতে হতে সবগুলো থাম হড়াস করে একসঙ্গে ভেঙে পড়ল ডাঙার উপর। যেখানটা চর ছিল, চরের কিনারে ঈশান জেলের ঘর ছিল, সেখানে আজ অকূল নদী। সুন্দরবনে যদি যাও, জায়গাটা আমি দেখিয়ে দিতে পারব।

১৩৮৩

অলংকরণ: শৈবাল ঘোষ

চেতলার কাছে

লীলা মজুমদার

চেতলা, কালীঘাট, আদি গঙ্গা ইত্যাদি যতই পবিত্র স্থান হোক না কেন, ওসব জায়গা মোটে ভাল না। আর লোকের মুখে মুখে কীসব অদ্ভুত গল্পই যে শোনা যায়, তার লেখাজোখা নেই। তা ছাড়া মশা-মাছি তো আছেই। চিলতে চিলতে সব গলি, তাতে মান্ধাতার আমলে তৈরি ঝুরঝুরে সব বাড়ি। তায় আবার প্রায় সব বাড়ি থেকে সব বাড়ির উঠোন দেখা যায়। এক ফালি উঠোনের মধ্যে এই বড় বড় সব গাছ— তালগাছ, আমগাছ, বটগাছ। তাদের ডালপালা বেয়ে, ঝুরি ধরে ঝুলে, যে-কোনও বাড়িতে চলে যাওয়া যায়। বিপদ বুঝলে একটা হাঁক দিলেই হল। সবাই সাত পুরুষ ধরে সবার চেনা। পুরনো সব ঝগড়াও আছে, তার কারণ নিজেরাই ভুলে গেছে, তবু এখনও কথাবার্তা বন্ধ। মুখ দেখা আর কী করে বন্ধ করে, নড়বড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেই, সব বাড়ি থেকে সব বাড়ির রান্নাঘরের ভিতর পর্যন্ত দেখা যায়, কার বাড়িতে কী রান্না হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সবাই জানতে পারে। একটা টিকটিকি লুকোবার কোথাও জায়গা নেই, চোর-ছ্যাঁচড় খুনে দুষ্কৃতকারীদের কথা তো ছেড়েই দিলাম। কার ঘরে চুরি করার মতো কী আছে এবং কোথায় আছে তাও সবাই জানে। নেই-ও অবিশ্যি কারও কিছু। সেদিক দিয়ে জায়গাটাকে চোরদের গোবি মরুভূমিও বলা যায়।

আমার বন্ধু বটুর বড়কাকা ওখানকার থানার মেজদারোগা। তা ছাড়া ওদের সাত পুরুষের বাড়িও ওখানে। নাকি বাড়ি হবার সময় ক্লাইব্ জন্মায়নি। বটু জায়গাটার নাম দিয়েছে মিসার হতাশা। শুনে বড়কাকা খুবই মুষড়ে পড়েছেন, দুষ্কৃতকারীরাই যদি একটু সুযোগ না পেল, তা হলে ওঁর হেড-আপিসে উন্নতি হয় কী করে? অবিশ্যি ওসব সাধারণ জিনিসের চাইতেও অন্য এবং আরও ভয়ের জিনিস আছে, ওই তিনটে পাড়াসুদ্ধ সবাই সন্ধে হতেই যার ভয়ে জুজু। অধিকাংশই ওপর-হাতে এক গোছা সংকটতারিণী মাদুলি বেঁধে নিরাপত্তা রক্ষা করেন। কারণ পুলিশে আর কী-ই বা করতে পারে?

বটুদের উঠোনের আম পাকলে বটু আমাকে তিন দিনের জন্য ধরে নিয়ে গেছিল। ওই তিন দিনে আমি যতগুলো সত্যিকার ভূতের গল্প শুনলাম, সারা জীবন ধরে অত শুনিনি। সবাই সবার পাশের বাড়িতে অশরীরীদের দেখে।

কী বড় বড় সবুজ রঙের চিংড়ি মাছ নিয়ে একটা লোক বিক্রি করতে এল। চিল-কোঠায় পুজো করতে বসে তাকে দেখেই বটুর ছোটঠাকুমা চ্যাঁচাতে লাগলেন, ‘‘না বাছা, এখানে ও মাছ কেউ খাবে না। তুমি অন্য জায়গায় দেখো।’’

বটু তো চটে কাঁই, কী ভাল ভাল চিংড়িমাছ।

ছোটঠাকুমা নেমে এসে বললেন, ‘‘ব্যস, মাছ দেখেছিস তো অমনি হয়ে গেল! আরে ও কি সত্যিকার মাছ? অত বড় চিংড়ি কখনও চার টাকায় দেয় কেউ? আবার বলছে পরে নেবে!’’

বটু বলল, ‘‘আহা, বলল যে, বিক্রি না-হলে পচে যাবে।’

কাষ্ঠ হেসে ছোটঠাকুমা বললেন, ‘‘তুইও যেমন!
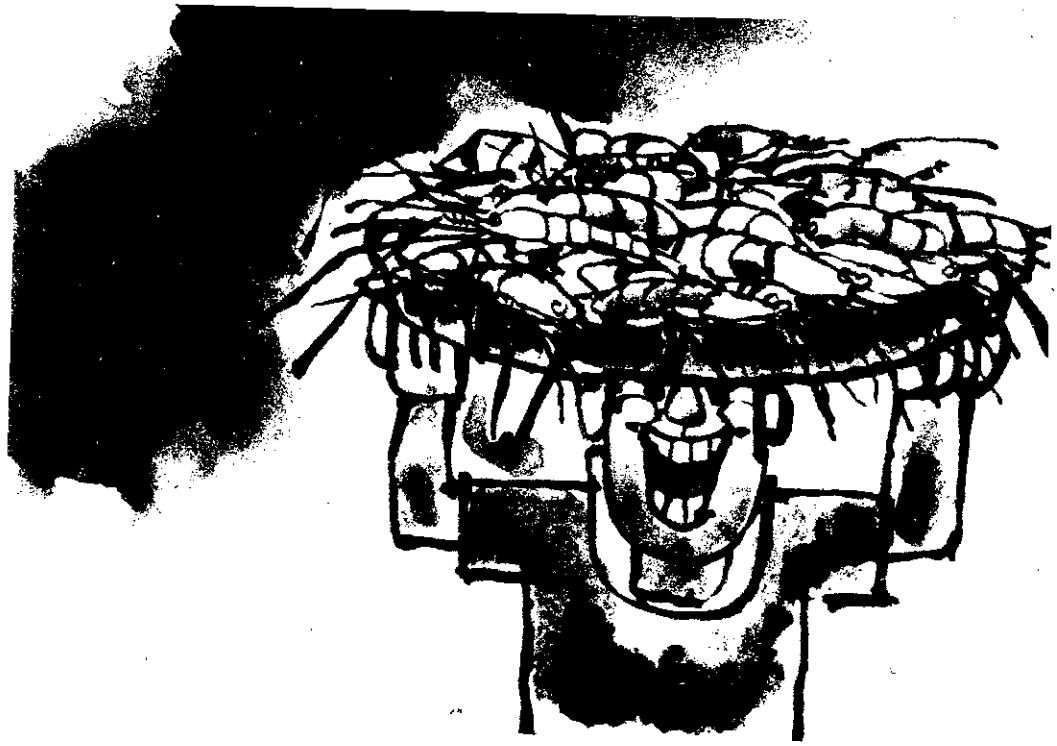
তা ছাড়া ওগুলো মাছও নয়, ওই জেলের পো-ও মানুষ নয়, সব ইয়ে।'' এই বলে ছোটঠাকুমা জল খেতে বসলেন।

বটুও বলল, ''তা সত্যিও হতে পারে, মুখটা কেমন মিচকে মতো দেখলি না?''

আমি বললাম, ''যাঃ! ভূতের হাঁটু উলটোদিকে থাকে আর ওদের ছায়া পড়ে না।''

ছোটঠাকুমা শুনতে পেয়ে ডেকে বললেন, ''ইদিকে এখনও রোদ আসেনি বাবা, ছায়া দেখবি কী করে? সে যাই হোক, আদিগঙ্গার বটগাছের তলায় যেন কখনও যাসনে। জায়গাটা ভাল নয়।''

গিজগিজে সব বাড়ি, বটগাছ তলায় যেতে হলে সারকাস করতে হয়। অথচ সেখানে নাকি কারা কাপড় কাচে, ঝগড়া করে, মাছ ধরে।

ততক্ষণে সূর্য ডুবে গেছে, সামনের দোতলার লটখটে বারান্দায় দু'জনে গল্প করছি। ছপ করে কী একটা পায়ের কাছে পড়ল। আর সে কী সুগন্ধ ভুরভুর করতে লাগল। তুলে দেখি কলাপাতায় মোড়া বড় বড় চিংড়িমাছ ভাজা। নীচের দিকে চেয়ে দেখি, সেই মিচকে লোকটা মিটমিট করে হাসছে। নোটা নোটা কান, নাকে মস্ত আঁচিল। একতলার বৈঠকখানা থেকে বটুর পিসেমশাই ডেকে বললেন, ''কে? কে ওখানে?'' সঙ্গে সঙ্গে কেউ কোথাও নেই। খেয়ে ফেললাম দু'জনে মিলে সব ক'টা চিংড়িমাছ। যদি ওগুলো চিংড়িমাছ না-ও হয়, তবু খেতে বেজায় ভাল।

ভিতর দিকের উঠোনে আমগাছের গায়ে লাগা বুড়ো তালগাছ। ছোটঠাকুমা সাদা পাথরের রেকাবি করে খোয়া ক্ষীর, চিঁড়ের মোয়া আর বড় বড় মনাক্কা নিয়ে, তালগাছের কোটরে রেখে, ভক্তিভরে গলায় কাপড় জড়িয়ে প্রণাম করলেন। ছোটঠাকুমা চলে যেতেই বটু বলল, ''ব্রহ্মদত্যিকে তোয়াজ করা হচ্ছে। তালগাছে সে বাস করে।''

আরও কী বলতে যাচ্ছিল বটু, ছোটঠাকুমা পিছন থেকে বললেন, ''অমন অছেদ্দা করিসনে, বটা। উনি আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের ছোট ভাই। চটিয়ে

দিলে সর্বোনাশ করবেন, খুশি রাখলে আমাদের জন্য না-করতে পারেন এমন জিনিস নেই। ওই বিদ্যেবুদ্ধি নিয়ে যে বছরে বছরে পাস করে যাচ্ছিস, সেটা কী করে সম্ভব সে-কথা কখনও ভেবেছিস? হুঁ!'' এই বলে ছোটঠাকুমা গীতা পড়তে ঘরে গেলেন। যাবার সময় আরও বলে গেলেন, ''তোরা বিশ্বাস না-করতে পারিস, কিন্তু রোজ উনি এই জিনিস গ্রহণ করেন, আর তার বদলে একটি পয়সা আশীর্বাদি—''

আর বলা হল না, কারণ সেই সময় বড়কাকা বাড়ি এলেন।

বড়কাকা খুব চটে ছিলেন। চা আর চিঁড়ের মোয়া খেতে খেতে বললেন, ''এক্ষুনি আবার বেরোতে হবে। বাজারের লোকদের নালিশের জ্বালায় আর টেকা যাচ্ছে না। গোলবাড়িতে রাতে তদন্তে যেতে হবে।''

তাই শুনে বড়কাকি এমনি চমকে গেলেন যে, হাতের দুধের হাতা থেকে অনেকখানি দুধ মাটিতে পড়ে গেল। চোখ গোলগোল করে ফ্যাক্‌সা মুখে বললেন, ''কিন্তু— কিন্তু—''

বড়কাকা কাষ্ঠ হাসলেন, ''কিছু কিন্তু-কিন্তু নয়।

এর ওপর আমার প্রমোশন নির্ভর করছে। কোনও ভয় নেই, ছ'টা ষণ্ডা লোক সঙ্গে থাকবে। হয়তো কিছু পাওয়া যেতে পারে।''

বটার কাছে শুনলাম যে, বাড়িটাতে একশো বছর কেউ থাকে না। বড়ই দুর্নাম। নাকি ওটা চোরাচালানকারীদের গুহ্য আড়ত। মাটির তলায় সুড়ঙ্গ আছে, বুড়িগঙ্গায় তার মুখ। অনেকে দেখেছে। সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে সোনাদানা বে-আইনি জিনিস বস্তা বস্তা পাচার করা খুব শক্ত নয়। বাজারে নাকি ওদের চর ঘুরে বেড়ায়, কখনও জেলে সেজে, কখনও পুরুতঠাকুর সেজে; এটা-ওটা কিনতে চায়, চা খেতে চায়, অচল পুরনো পয়সা দিয়ে দাম দিতে চায়। তা লোকে শুনবে কেন? দিয়েছে নালিশ করে।

বড়কাকা বলেছিলেন, ''লোকটাকে ধরা যায় না, ফুসফাস করে এখান দিয়ে ওখান দিয়ে গলে পালায়। কোনও দোকানদারের সঙ্গে ষড়ও থাকতে পারে। শুনেছি চেহারা দেখেই সন্দেহ হয়, কীরকম মিচকে মতো, নোটা নোটা কান, নাকের ডগায় আঁচিল।''

শুনে আঁতকে উঠেছিলাম, বটা কনুইয়ের গুঁতো মেরে থামিয়ে দিয়েছিল। আটটা বাজতেই মহা ঘটা করে আটজন সশস্ত্র লোকজন নিয়ে বড়কাকা তদন্তে চলে গেলেন। ছোটঠাকুমা তাঁর গলায় হলদে সুতো দিয়ে একটা বেলপাতা ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন, ''ব্যস, আর ভয় নেই। সেখানে গিয়ে কেউ কিছু দিলে খাসনে যেন। দুগ্গা! দুগ্গা!'' বড়কাকা চলে গেলে বললেন, ''কামান দেগে হাওয়া ধরা। হুঁঃ!''

আমরা ছাদে গিয়ে বুড়িগঙ্গায় জোয়ার আসা দেখতে লাগলাম। বটু বলল, ''ওই গোলবাড়িটা আমার ঠাকুরদার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের ছোট ভাই পেয়েছিল। ব্যাটা মহা লক্ষ্মীছাড়া ছিল, লেখাপড়া শেখেনি, কাজকর্ম করত না, খালি মাছ-ধরার বাই ছিল আর চিনে ব্যাবসাদারদের থেকে চায়ের নেশা ধরেছিল। দু'দিনে বাড়ির সব ঝাড়বাতি, আসবাবপত্র, রুপোর বাসন বেচেবুচে সাফ করে দিল। ওর বুড়ি মা নাকি খুচরো পয়সাকড়ি এমনি লুকিয়ে রেখে চোখ বুজেছিলেন যে, ব্যাটা সেসব খুঁজেই পায়নি। এখনও নাকি খুঁজে বেড়ায়। তাই ও বাড়িতে কেউ রাত কাটায় না। সেইখানে গেছে বড়কাকা তদন্ত করতে। খুচরো টাকাকড়ির বাক্সটা পেলে মন্দ হয় না। আমরাই তো ওর ওয়ারিশ। সে ব্যাটা তো বিয়েই করেনি। নাকি বিশ্রী দেখতে ছিল, শুঁটকো, কালো বড় বড় কান, চাকর-চাকর চেহারা। গেঞ্জি গায়ে ঘাটে বসে অষ্টপ্রহর বুড়িগঙ্গায় মাছ ধরত— কে? কে ওখানে?''

খচমচ করে তালগাছ থেকে আমগাছ, আমগাছ থেকে নড়বড়ে বারান্দা কাঁপিয়ে মিচকে লোকটা হাসি হাসি মুখ করে উঠে এসে, নাকের ফুটো ফুলিয়ে ফোঁসফোঁস করে নিশ্বাস নিয়ে বলল, ''চা-চা গন্ধ পাচ্চি মনে হচ্চে!''

সত্যিই ছিল চা। দোকানের কেতলিতে একটু চা আর একটা মাটির ভাঁড়, বটু লুকিয়ে এনেছিল সামনের দোকান থেকে। নীচে নামতেও হয়নি, ওদের ছোকরা তেঁতুলগাছে চড়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল রোজকার মতো।

চা পেয়ে লোকটা আহ্লাদে আটখানা, মিচকে মুখ যেন সাত ভাঁজ হয়ে গেল। বললাম, ''পেঁয়াজি খাবে নাকি?''

জিব কেটে বলল, ''অ্যাঁ, ছি ছি! ও নাম করবেন না। আমার বরাদ্দ রোজকার মতো খেয়েই এসেছি, চিঁড়ের মোয়া, খোয়া ক্ষীর, মেওয়া—''

বটা আর আমি এ ওর দিকে তাকালাম, কিছু বললাম না। খাক না বেচারি।

মিচকে লোকটি বলল, ''বড়কর্তা আমাদের ওখানে এমন হাঁকডাক লাগিয়েছেন যে, টিকতে না-পেরে ওনার এখানে গা-ঢাকা দিতে এসেছি। দেখো দাদা, তালগাছের মুড়োয় তোমাদের জন্য একটা দ্রব্যি রেখে গেলাম। আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি। সেখানে মা অমৃতি বানায়।''

বটু ব্যস্ত হয়ে বলল, ''কেন চলে যাবে? এখানে বুঝি খেতে পাও না?''

ফিক করে হেসে মিচকে লোকটা বলল, ''দু'বেলা নৈবিদ্যি পাই, আবার কষ্ট কীসের? ওই এল বলে। আমি উঠি।'' বলেই হাওয়া।

নীচে বড়কাকাদের রাগ রাগ গলায় হাঁক ডাক

শোনা গেল। নিশ্চয় কিছু দুষ্কৃতকারী-টারি ধরতে পারেননি। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে আদ্যিকালের তালগাছটা ভেঙে পড়ল। পোকা-ধরা, পুরনো গুঁড়ি ভেঙেচুরে একাকার। তার মধ্যে দেখা গেল বেশ বড় একটা কাঠের হাতবাক্স, পুরনো টাকাকড়িতে তার অর্ধেক ভর্তি। আর চাঁচাপোঁছা নৈবেদ্যের রেকাবিটা তিন টুকরো হয়ে পড়ে আছে। বড়কাকার রাগ ঠান্ডা।

পরদিন বড়কাকা বললেন, ''আশ্চর্যের বিষয়, সুড়ঙ্গের মধ্যে একটা খোপে ওই বাক্স রাখার পষ্ট দাগ দেখলাম। সেই বুড়ি ঠাকরুন তা হলে বাউন্ডুলে ছেলের হাত থেকে ওটাকে বাঁচাবার জন্য এইখানে লুকিয়ে রেখেছিলেন? এটাও তো তাঁদেরই বাড়ি।''

ছোটঠাকুমা শূন্যে নমস্কার করে বললেন, ''কত বাঁচিয়েছিলেন সে তো বোঝাই যাচ্ছে। ও বটা, নিজে পড়িস দাদু, সে তো গেল।'' ফোঁত ফোঁত করে একটু কেঁদেও নিলেন। বড়কাকা তো অবাক।

১৩৮৩

অলংকরণ: সুধীর মৈত্র
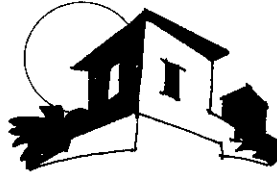
আগন্তুক

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

বাইরে প্রবল বৃষ্টি। এ বৃষ্টি হঠাৎ থামবে এমন আশা কম। ঘরের মধ্যে আমরা তিনজন। সমীর, পলাশ আর আমি। পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। হাতে কোনও কাজ নেই। আড্ডা দিয়েও সবাই ক্লান্ত।

বর্ষার বিকালে খবরের কাগজের ওপর তেলনুন-মাখা মুড়ি তেলেভাজা দিয়ে চিবোতে চিবোতে গল্প চলেছে। প্রথমে ক্রিকেটের গল্প, তারপর ফুটবল, কিছুক্ষণ সিনেমার কথা, শেষকালে এই আবহাওয়ার উপযুক্ত কাহিনি শুরু হল, ভূতের গল্প।

সমীর বলল, "ভূত আলবত আছে। পৃথিবীর বড় বড় লোক ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন।"

পলাশ মুখ-চোখের অদ্ভুত ভঙ্গি করে বলল, "আছে বই কী। আছে তোদের মতন নিষ্ক্রিয় লোকদের মগজে। ভূতের জন্মস্থান ভয়ের এলাকায়।"

দু'জনে আমাকে সাক্ষী মানল।

বিপদে পড়লাম। খুব সাহসী এমন অপবাদ কেউ দেবে না। ভূত অবশ্য দেখিনি, কিন্তু ভূত নেই একথা জোর গলায় বলি কী করে!

সারাক্ষণ দিনের আলো থাকবে না। এক সময়ে অন্ধকার হবে। চারদিক থেকে নানারকম শব্দ শোনা যাবে। তখন?

কাজেই কোনও পক্ষ সমর্থন না করে বললাম, "কী জানি ভাই, বলতে পারব না। ভবিষ্যৎ নিয়ে এই চিন্তা করছি যে, ভূতের কথা ভাববার সময়ই পাইনি।"

সমীর হাত গুটিয়ে টান হয়ে চেয়ারে বসল। বলল, "ভূত আছে কি না শোন। আমাদের রাঁচিতে একটা বাড়ি আছে জানিস তো। আমি সেখানে অনেক দিন ছিলাম।"

পলাশ এমন সুযোগ ছাড়ল না। সঙ্গে সঙ্গে বলল, "তুই যে রাঁচিফেরত, সেটা তোর হালচালেই মালুম হয়।"

সমীর খেপে লাল।

আমি বহুকষ্টে দু'জনকে থামালাম। সমীরকে বললাম, "নাও, তোমার গল্প চালাও।"

সমীর তবু ক্ষুণ্ণ। "গল্প?"

নিজেকে সংশোধন করে বললাম, "না হে, গল্প নয়, সত্য ঘটনা বলো।"

সমীর শুরু করল, "রাঁচির বাড়িতে ভূতের উপদ্রব। আমরা খেতে বসেছি, হঠাৎ ভাতের ওপর মাটির গুঁড়ো পড়ল, ডালের বাটি নিজের থেকেই কাত হয়ে গেল, হাত বাড়াতে দুধের বাটি সরে যেতে লাগল। অন্য সময় কিছু নয়, সব স্বাভাবিক। যত গোলমাল কেবল খাবার সময়। আমার ঠাকুরদা তখন বেঁচে। তিনি বললেন, এ নিশ্চয় অতৃপ্ত আত্মার ব্যাপার। গয়ায় পিণ্ড দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তা-ই স্থির হল। আমার এক কাকা রেলে চাকরি করতেন। তাঁকেই বলা হল পিণ্ড দিয়ে আসতে। কিন্তু গয়াতে পিণ্ড দিতে গিয়েই এক বিপত্তি।"

সমীরের বরাত। ভূতের গল্প কিছুতেই বেচারি শেষ করতে পারছে না। এই অবধি বলেই তাকে থামতে হল। বাইরে থেকে দারুণ একটা গোঙানির শব্দ আসছে। একটানা। থামবার লক্ষণ নেই। এই গোঙানির মধ্যে গল্প বলা অসম্ভব।

আমরা তিনজনেই বাইরে এসে দাঁড়ালাম। এক ফালি রোয়াক। বৃষ্টির জলে ভিজে গেছে। তারই এক কোণে একটি মানুষ। মানুষ না বলে কঙ্কাল বলাই সমীচীন। খালি গা। প্রত্যেকটি হাড় গোনা যায়। মাথা ন্যাড়া। পরনে জরাজীর্ণ ফুলপ্যান্ট, হাঁটুর ওপর গোটানো। শুধু কোমরবন্ধের বাহাদুরি আছে। লাল, প্রায়-নতুন একটা টাই কোমরে বাঁধা।

লোকটা ঠান্ডায় ঠক ঠক করে কাঁপছে আর দাঁতের ফাঁক দিয়ে গোঙানি বের হচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে সকলেরই দয়া হল।

আমিই বললাম, ''এই, তুমি ভিতরে এসো। এই বৃষ্টিতে ভিজলে নিমোনিয়া হবে।''

লোকটা কিছুক্ষণ একদৃষ্টে আমাদের দিকে দেখল। আমার কথাগুলো যেন বুঝতেই পারল না।

এবার সমীর চেঁচিয়ে বলল, ''উঠে ঘরের মধ্যে এসো, শুনছ?''

লোকটা আস্তে আস্তে দেয়াল ধরে দাঁড়াল। একটু দম নিল, তারপর আমাদের পিছন পিছন ঘরের মধ্যে এল।

''বসো ওই কোণে।'' পলাশ আঙুল দিয়ে ঘরের কোণ দেখিয়ে দিল।

লোকটা সসংকোচে বসল। দুটো হাঁটুর ওপর মুখ রেখে।

আমি ভিতরে গিয়ে একটা পুরনো শার্ট এনে লোকটার দিকে ছুড়ে দিলাম।

লোকটা কৃতজ্ঞতাভরা চোখে আমার দিকে দেখল, তারপর শার্টটা গায়ে দিয়ে নিল।

আমি সমীরের দিকে ফিরে বললাম, ''এবার নাও হে, তোমার গয়ায় পিণ্ডদানের কাহিনি বলো।''

সমীর ভ্রূ কোঁচকাল। ''আমার পিণ্ডদানের কাহিনি?''

অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, ''আহা, তোমার নয়, তোমার ভুতের।''

পলাশ ফোড়ন কাটল, ''ওই একই হল। ভূত আর সমীরে তফাত নেই। ভূত হচ্ছে গাঁজা, আর সমীর সেই গাঁজার আড়তদার।''

ঠিক এই সময় আমাদের তিনজনকে অবাক করে দিয়ে লোকটি কথা বলল।

''কে বললে বাবু, ভুত গাঁজা?''

পলাশ এবার লোকটির দিকে ফিরল।

''তুমিও ভূতের গল্প জানো নাকি হে?''

লোকটা দুটো হাত রগড়াতে রগড়াতে বলল, ''গল্প নয় বাবুরা, নিজের চোখে ভূত আমি দেখেছি।''

''সে কী হে? বলো শুনি।''

তিনজনই লোকটার কাছে এগিয়ে বসলাম।

লোকটা হাতদুটো দিয়ে নিজের শরীর ঘষে নিল, বোধহয় গরম করার চেষ্টায়, তারপর বলতে লাগল।

''এক সময়ে আমি ট্রেনের কামরায় কামরায় প্লাস্টিকের চিরুনি ফেরি করে বেড়াতাম। সকাল সাতটায় বের হতাম। দুপুরবেলা রাস্তার ধারে কিছু খেয়ে নিতাম, তারপর আবার রাত দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্ত চিরুনি বিক্রির চেষ্টা। রাত্রিবেলা কোনও স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের এক কোণে শুয়ে কাটাতাম।

''একদিন হয়েছে কী, ঠিক এমনই বাদলা। যাত্রীর সংখ্যা কম। যারা আছে তাদের চিরুনি কেনার দিকে দৃষ্টি নেই, কোনওরকমে বাড়ি পৌঁছতে পারলে বাঁচে। আমিও কোণের এক বেঞ্চে বসে ঢুলতে ঢুলতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

''যখন ঘুম ভাঙল, মনে হল অনেক রাত। বৃষ্টি থেমেছে। জানলা দিয়ে ম্লান জ্যোৎস্না গাড়ির মধ্যে এসে পড়েছে। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে বুঝতে পারলাম ট্রেন শেডের মধ্যে রয়েছে।

''ভালই হল। বেঞ্চের ওপর পা তুলে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। মনে হল কোথায় যেন খুটখাট আওয়াজ হচ্ছে।

''একবার ভাবলাম ইঁদুর। কিন্তু ইঁদুর মালগাড়ি ছেড়ে এ গাড়িতে আসবে কেন। এদিক ওদিক চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে দেখতে পেলাম, বাথরুমের হাতলটা নড়ছে। কে যেন খোলবার চেষ্টা করছে, পারছে না।

''একটু ভয় হল। চোর ডাকাত নয় তো?

''তারপর আবার মনে হল, চোর হোক, ডাকাত

"আমি চিৎকার করতেই মুন্ডুটা জিভ ভিতরে টেনে নিয়ে চাপা গলায় বলল, চুপ, ভয়ের কিছু নেই। আমিও তোমার মতন ট্রেনে লজেন্স, হজমিগুলি ফেরি করে বেড়াতাম। নিজে গান বেঁধে সুর করে গাইতাম। গানের গলা ছিল বলে বাবুরা খুশি হয়ে শুনত, তারপর আমার জিনিস কিনত। সেইজন্য অন্য ফেরিওয়ালারা আমায় হিংসা করত, বিশেষ করে তারক। সে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকত। আমার মতন গাইবার চেষ্টা করত, পারত না। এক সন্ধ্যায় টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। আমি গাড়ির পাদানিতে দাঁড়িয়ে। ট্রেনের গতি একটু কমলে পাশের গাড়িতে উঠব। তারক ঠিক আমার পিছনে। হঠাৎ সে সজোরে আমাকে ধাক্কা দিল। পাশের লাইন দিয়ে দার্জিলিং মেল আসছিল

হোক, আমার কী। আমার সম্বল দু'টাকার চিরুনি আর পকেটে দেড় টাকা।

"চোখ বন্ধ করে ফেললাম।

"হঠাৎ মুখের ওপর গরম নিশ্বাস পড়তে চমকে চোখ খুলেই আঁতকে উঠলাম।

"সামনে একজন লোক। লোকই বা বলি কী করে। মুন্ডুই নেই, মুন্ডুটা নিজের হাতে ধরা। দুটো চোখ বীভৎসভাবে বেরিয়ে আছে। দাঁতের ফাঁক দিয়ে জিভটা ঝুলে পড়েছে। সেই জিভ দিয়ে টপ টপ করে রক্তের ফোঁটা ঝরছে।

নক্ষত্রবেগে। ট্রেনের গতিবিধি আমাদের নখদর্পণে। সঙ্গে সঙ্গে আমি ছিটকে একেবারে লাইনের ওপর। তারপর দার্জিলিং মেলের চাকা—''

লোকটার কথা শোনা গেল না। চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুতের আলো, তারপরই খুব কাছে কোথাও বাজ পড়ল।

জানালার কাচ ঝনঝন করে উঠল। মেঝে কেঁপে উঠে মনে হল চেয়ারগুলো উলটে ফেলে দেবে।

আমরা সবাই প্রথমে ভাবলাম বুঝি ভূমিকম্প। তারপর বুঝতে পারলাম, না, বাজের শব্দ।

পলাশ বলল, ''খুব ভূতের গল্প ফেঁদেছ তো হে।''

কোনও উত্তর নেই।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে সুইচ টিপলাম। আলোয় ঘর ভরে গেল।

কী আশ্চর্য, কোণ খালি। লোকটা কোথাও নেই।

অথচ লোকটা ঘরের মধ্যে ঢোকবার পর দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। দরজা সেইরকমই বন্ধ আছে।

বাইরে একটা মোটরের শব্দ। অনেকগুলো লোকের চিৎকার।

দরজা খুলে আমরা বাইরে এলাম। বৃষ্টি কমে গেছে।

একটা অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে। গোটা চারেক পুলিশ রোয়াকের কাছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, ''কী হল?''

ইন্সপেক্টর বলল, ''আপনাদের পাশের বাড়ি থেকে থানায় ফোন করেছিল, এখানে একটা মড়া পড়ে আছে।''

মড়া!

আমরা উঁকি দিয়েই চমকে উঠলাম। সেই লোকটা পড়ে রয়েছে। চিত হয়ে। দুটো হাত বুকের ওপর জড়ো করা। দুটো চোখের তারা বিস্ফারিত।

''কখন মারা গেল?''

''ঠিক বলা মুশকিল। তবে ঘণ্টা দুয়েক তো নিশ্চয়। একেবারে কাঠ হয়ে গেছে।''

''কিন্তু'', বলতে গিয়েই সামলে নিলাম। আমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। লোকটার পরনে আমার দেওয়া পুরনো শার্ট, যেটা তাকে আধঘণ্টা আগে দেওয়া হয়েছিল।

ওদের মুখ দেখে বুঝতে পারলাম, সমীর আর পলাশ দু'জনেই সেটা লক্ষ করেছে।

১৩৮৩

অলংকরণ: শৈবাল ঘোষ

সেই আশ্চর্য লোকটি

বিমল কর

অনেকদিন আগেকার কথা, অন্তত বছর পঁয়ত্রিশ। আমার তখন পনেরো-ষোলো বছর বয়েস। ঠাকুমা আর ছোটকাকার সঙ্গে কাশী গিয়েছিলাম বেড়াতে। ফেরার সময় এমন একটা কাণ্ড ঘটেছিল যার কোনও অর্থ আমরা কেউই খুঁজে পাইনি। আজও পাই না।

কোন গাড়ি, কী তার নাম ছিল, আজ আমার কিছু মনে নেই। দুপুর নাগাদ আমরা কাশী থেকে মোগলসরাই স্টেশনে এসে রেলে চড়েছিলাম। তখন ওইদিককার রেলের নাম ছিল ই আই আর— মানে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে। এখনকার মতন মাত্র দুটো ক্লাসও তখন ছিল না, ছিল চারটে: ফার্স্ট, সেকেন্ড, ইন্টার, থার্ড। আজকাল রেলের কামরা মানেই যেন একটা ছোটখাটো মেলা, গিসগিস করে লোক। তখনকার দিনে এত ভিড়-টিড় কোনও গাড়িতেই থাকত না, মেল এক্সপ্রেস গাড়িতে তো নয়ই।

আমাদের গাড়িটা বোধহয় এক্সপ্রেস গাড়ি ছিল, কেননা সব স্টেশনে থামছিল না। দুপুরের শেষদিকে গাড়িতে উঠেছি। ইন্টার ক্লাস কামরা। জনা ছয় যাত্রী আমাদের কামরায়। দিন দুই পরে কালীপুজো। দুর্গাপুজোর পর গিয়েছিলাম কাশীতে, ফিরছি কালীপুজোর আগে। আসব ধানবাদ। বাবার কাছে, নিজেদের বাড়িতে।

সাসারাম এসে পৌঁছতেই সন্ধে হয়ে গেল। তখন ওদিকে শীত পড়তে শুরু করেছে সবে। ওসব দিকে পুজোর পরপরই শীত এসে পড়ে, হেমন্তকাল বুঝতে বুঝতেই কখন যেন জব্বর শীত এসে যায়। সাসারামে শেরশাহের সমাধি শুনেছি। গাড়ি যখন সাসারামে এসে পৌঁছল তখন এত অন্ধকার যে আমার চোখে বাইরের কিছুই ধরা পড়ল না। এমনকী স্টেশনটাও যেন টিমটিম করছে।

সাসারাম থেকে গাড়ি ছাড়ার সময় একজন ভদ্রলোক এসে গাড়িতে উঠলেন। গায়ে লম্বা রেলের কোট, ওভারকোট ধরনের, পরনে রেলের প্যান্ট। গলায় একটা রুমাল জড়ানো। মাথায় বারান্দা মার্কা রেলের টুপি। মাথায় বেশ লম্বা।

ভদ্রলোক যখন উঠলেন, গাড়িটা তখন ছাড়ছিল। উনি ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কামরার বাতিগুলো দপ করে নিবে গেল। অবশ্য কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার জ্বলে উঠল।

লোকটিকে ভাল করে দেখাই যাচ্ছিল না। টুপিটা এমন করে নামানো যে, চোখের তলায় গিয়ে ঠেকেছে। সঙ্গে কোনও মালপত্রও নেই। ঝাড়া হাত-পা। উনি কামরায় উঠেই এদিক সেদিক তাকিয়ে সোজা বাংকে উঠে শুয়ে পড়লেন। জুতো সমেত। শুয়ে পড়ে মাথার টুপিটা এমন করে মুখের ওপর চাপা দিলেন, মনে হল— কামরার আলো যেন চোখে না-লাগে সেই ব্যবস্থা করে নিলেন। যেটুকু দেখলাম ভদ্রলোককে, বুঝতে পারলাম রেলের লোক, আর অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। আমার বাবা রেলের চাকরে। ছেলেবেলা থেকে রেলের লোক দেখতে দেখতে কেমন একটা আন্দাজ হয়ে গিয়েছে, গোমো আর ধানবাদে অজস্র অ্যাংলো ইন্ডিয়ান দেখেছি যারা রেলেই কাজ করে। ভদ্রলোকের কত বয়েস তা ঠিক বুঝতে পারিনি, তবে আমার ছোটকাকার চেয়ে নিশ্চয় বড়।

গাড়ি চলতে শুরু করল। একটা বেঞ্চিতে আমরা— ঠাকুমা, ছোটকাকা আর আমি। আর-এক বেঞ্চিতে এক বেহারি ভদ্রলোক শুয়ে ছিলেন, তিনিও কাশী ফেরত, সঙ্গে বিস্তর মালপত্র। অন্য বেঞ্চিতে এক সাধুবাবা, সঙ্গে তাঁর কোনও মারোয়াড়ি শিষ্য। সাধুবাবার গায়ে গেরুয়া বস্ত্র, এইমাত্র— নয়তো তিনি একেবারে সাধারণ মানুষের মতন, হিন্দিতেই কথাবার্তা বলছিলেন। বিড়ি টানছিলেন।

আমার কাকা ট্রেনে উঠলেই ঢুলতে শুরু করেন। সন্ধে হয়েছে দেখে কাকাও মাথার ওপর বাংকে চড়ে বসলেন। গাড়ি চলতে লাগল। ঠাকুমা বোধহয় জপতপ শুরু করল মনে মনে। আমি চুপচাপ একা। বাইরে তাকালেই অন্ধকার আর অন্ধকার। মাঝে মাঝে এঞ্জিনের ধোঁয়া এসে যেন নাকে লাগছে, কয়লার গুঁড়ো উড়ছে; আর থেকে থেকে ধোঁয়ার সঙ্গে আগুনের ফুলকি জোনাকির মতন অন্ধকারে ছিটকে পড়ছে।

এইভাবে শোন নদী পেরিয়ে গেলাম। কী বড় ব্রিজ। ট্রেন ছুটছে, ছুটতে ছুটতে গয়াও এসে গেল, তখন রাত হয়ে গিয়েছে।

গয়া থেকে গাড়ি ছাড়ল। খাওয়া-দাওয়া শেষ আমাদের। কাকা আবার বাংকে উঠে ঘুম লাগালেন। বেহারি ভদ্রলোক খাওয়া শেষ করে ঢেকুর তুলতে

লাগলেন বড় বড়। সাধুবাবা শিষ্য সমেত গয়ায় নেমে গেছেন। নতুন কেউ চড়েনি।

সেই অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ভদ্রলোক কিন্তু একইভাবে শুয়ে আছেন। ঘুমোচ্ছেন নিশ্চয়। ট্রেনে রেলের বহুলোকই যাতায়াত করে এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশন। কাজকর্মে যায়, কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরে, কাজেই ভদ্রলোক সম্পর্কে আমার কোনও কৌতূহল হয়নি।

গয়া আর কোডারমার মধ্যে— কোডারমার আগে— মস্ত জঙ্গল। নামকরা জঙ্গল। বিহারে এত বড় জঙ্গল খুবই কম, লোকে বলে গুরপা গুঝান্ডির জঙ্গল। দিনের বেলাতেও এই জঙ্গলের অর্ধেক জায়গায় আলো রোদ ঢোকে না। রেল লাইন পাতার সময় এই জঙ্গলের আরও ভয়ংকর চেহারা ছিল। রেলের কুলি লাইনের অনেকেই নাকি বাঘ-টাঘের পেটে গিয়েছে এখানে।

রেলের দুটো স্টেশনই আছে, গুরপা আর গুঝান্ডি। এই পাহাড়ি জায়গাটুকুর চড়াই ভাঙতে বাড়তি একটা এঞ্জিন জুড়তে হয়, একটা এঞ্জিন গাড়ি টানতে পারে না।

আমার ঠিক মনে পড়ছে না কোডারমা থেকে গয়ার দিকে আসার সময়, না গয়া থেকে কোডারমার দিকে যাবার সময় দুটো এঞ্জিন লাগে। যখনই লাগুক তাতে এ গল্পের কোনও ক্ষতি নেই। কেননা, তখনকার দিনে বাড়তি এঞ্জিনটা একবার যেমন যেত অন্যবার ফিরে আসত। আবার যেত।

ডবল এঞ্জিন জুড়ে গাড়িটা ছাড়ল। রাতও হয়ে গিয়েছে। জঙ্গলের মুখে ঢুকে বেশ শীত শীত লাগছিল। কাচের জানলাটা বন্ধ করে দিলাম। চারদিকে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার; গাছপালা আর অন্ধকার মিশে সে এক এমন জগৎ যা চোখে সওয়া যায় না বেশিক্ষণ। তবু গুরপা গুঝান্ডির আসল জঙ্গল তখনও শুরু হয়নি, তেমন নিবিড় নয় গাছপালা।

যেতে যেতে গাড়িটা হঠাৎ থেমে গেল।

সব রেলগাড়িই মাঝে মাঝে বেজায়গায় থেমে যায়। হয় সিগন্যাল পায় না, না হয় অন্য কোনও গোলমাল হয়; কেন যে থামে যাত্রীরা তা বুঝতেও পারে না।

গাড়িটা থামার পর সামান্য সময় চুপচাপ কেটে গেল। ভাবছি, এই ছাড়বে। গাড়ি আর ছাড়ে না। হঠাৎ শুনি এঞ্জিনের হুইসল বাজছে তারস্বরে। বাজছে তো বাজছেই।

বেহারি ভদ্রলোক জেগে ছিলেন, বললেন, ‘‘লাইনের ওপর নিশ্চয় বাঘ বসে আছে। সরছে না।’’

রেল লাইনের ওপর বাঘ বসে থাকে, এঞ্জিনের অত জোরালো আলোয় নড়ে না, শব্দতেও নয়— এ আমার জানা ছিল না।

আমার কাকাও দেখি বাংক থেকে নেমে এলেন।

ব্যাপারটা কী হচ্ছে বোঝার জন্যে জানলা খুলে দিলাম। দেখি গার্ডসাহেব হাতের সেই লাল সবুজ লণ্ঠন ঝুলিয়ে সামনের এঞ্জিনের দিকে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর সঙ্গে আরও দু’-একজন খালাসি ধরনের লোক— বোধহয় পেছনের এঞ্জিনের। লাইনের পাশ দিয়েই যাচ্ছে সবাই।

আমাদের মতন আরও অনেকে গলা বাড়াচ্ছে কামরার মধ্যে থেকে। গাড়ির বাইরের দিকের আলো পড়েছে সামান্য, ভেতরের আলোও জানলা দিয়ে বাইরে পড়ছিল ঝাপসাভাবে।

আমার কাকা আর বেহারি ভদ্রলোক নানারকম কথা বলতে লাগলেন। ঠাকুমা একটু শুয়েছে। সেই অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ভদ্রলোক কিন্তু বাংকের ওপর পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছেন। টুপিতে মুখ ঢাকা।

গাড়ি আর ছাড়ে না।

ঠিক যে কতক্ষণ কাটল তাও বুঝতে পারলাম না। শেষে দেখি গাড়ির দরজা খুলে অনেকেই নামতে শুরু করেছে। নেমে যে যার কামরার পাদানির কাছে দাঁড়িয়ে। নানারকম গলা শোনা যাচ্ছে। জঙ্গলের মধ্যে কারও সাহস নেই দু’পা এগিয়ে কিছু জেনে আসবে।

আমার কাকাও দরজা খুলে নীচে নামলেন।

আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল। কী যে হচ্ছিল তাও বুঝতে পারছিলাম না।

শেষ পর্যন্ত বেশ শোরগোল পড়ে গেল। কেমন করে যেন দু’-চারটে টর্চও বেরিয়ে গেল। লাইনের পাশ দিয়ে আসা-যাওয়াও করতে লাগল কেউ কেউ।

গার্ড সাহেব শেষ পর্যন্ত ফিরতে লাগলেন। লোকে খোঁজখবর নিচ্ছে, হল কী?

কাকা একটু এগিয়ে গিয়েছিলেন। খবর নিয়ে ফিরে এসে শুকনো মুখে বললেন, ''সামনের এঞ্জিনের ড্রাইভার মারা গিয়েছে হঠাৎ। নাক মুখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছিল। ফায়ারম্যানদের একজন গাড়ি থামিয়ে দিয়েছে।''

শুনে আমি চমকে উঠলাম।

বেহারি ভদ্রলোক বললেন, ''হায় ভগবান!''

মানুষ হঠাৎ কেমন করে মারা যায়, সে-বয়সে বুঝতাম না। এখন বুঝি। তখন বুঝতে পারিনি ড্রাইভারের সেরিব্রাল স্ট্রোক হয়েছিল। তখন এসব রোগ-নিরোগের কথা শোনাও যেত না।

আগে রেল এঞ্জিনের মধ্যে ড্রাইভারের সঙ্গে কয়লা-দেওয়া জনা দুয়েক লোক ছাড়াও বোধহয় একজন সাকরেদ থাকত ড্রাইভারের। এদেরই কেউ গাড়ি থামিয়ে দিয়েছে। দিয়ে ঘন ঘন হুইসল মেরে বিপদটা জানাচ্ছিল গার্ডকে।

এখন কী হবে? ড্রাইভার তো মারা গেল। গাড়ি চালাবে কে? আমরা কি সারা রাত এই জঙ্গলে পড়ে থাকব?

ড্রাইভার মারা গেছে এটা কোনওরকমে সব কামরায় প্রচার হয়ে পড়ল। তারপরই একটা হইহই। বাইরে বড় কেউ নামছে না, পাদানির তলায় দাঁড়িয়ে আছে। গলা বাড়াচ্ছে সবাই।

এমন সময় শোনা গেল, মৃত ড্রাইভারকে নামিয়ে ব্রেকভ্যানে তোলা হচ্ছে। এঞ্জিনের মধ্যে তো ফেলে রাখা যায় না।

দেখতে দেখতে রাত বেড়েই চলল। আমরা অসহায়ের মতন গাড়িতে বসে আছি। ভাবছি, এই জঙ্গলে এইভাবেই সারাটা রাত কাটাতে হবে। না জানি কী হবে।

গার্ড সাহেবও বেশ চঞ্চল হয়ে পড়েছেন। কতবার যে সামনে দিয়ে আসা যাওয়া করলেন। তাঁরই তো যত ঝঞ্ঝাট ঝামেলা। এতগুলো যাত্রীর জীবন-মরণ যেন তাঁরই হাতে।

আরও খানিকটা পরে দেখি গার্ডসাহেব প্রত্যেকটি

কামরার সামনে দাঁড়িয়ে কী যেন বলে দিচ্ছেন। বোধহয় সাবধান করে দিচ্ছেন; বলছেন, যে যার কামরায় দরজা বন্ধ করে বসে থাকো, সকাল না হলে কিছু করার উপায় নেই।

আমাদের কামরার কাছে এলেন গার্ড সাহেব। আধখোলা দরজা দিয়ে উঠলেন ভেতরে। লম্বা-চওড়া চেহারা, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান গার্ড। বললেন, "আপনাদের সারারাত গাড়িতেই থাকতে হবে। সাবধানে থাকবেন। খুবই দুঃখের কথা, সামনের এঞ্জিনের ড্রাইভার হঠাৎ মারা গেছেন।"

গার্ড সাহেব নেমে যাবার একটু পরেই দেখি বাংক থেকে সেই অ্যাংলো ভদ্রলোক নেমে এলেন। টুপি পরলেন এমন করে যে মুখটা আড়াল হয়ে গেল। ভাল করে দেখতেও পেলাম না মুখটা।

ভদ্রলোক কামরা থেকেও নেমে গেলেন। তারপর দেখি পাশের কামরা থেকে গার্ডসাহেব নামামাত্র কী সব কথাবার্তা বলছেন।

সামান্য পরে দেখলাম গার্ডসাহেব আর সেই লোকটি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

কাকা বললেন, "যে মারা গেছে তার কেউ হবে।"

বেহারি ভদ্রলোক বললেন, "মালুম, দোস্ত...।"

ঠাকুমা বললেন, "দরজাটা বন্ধ করে দে।"

আমরা যখন দরজা বন্ধ করে, জানালার শার্শি ফেলে যে যার শোবার ব্যবস্থা করছি— তখন একেবারে আচমকা এঞ্জিনের হুইসল বেজে উঠল। বার তিন। টানা টানা। তারপরই গাড়ি আবার নড়ে উঠল।

সবাই অবাক।

কাকা বললেন, "লোকটা নিশ্চয়ই ড্রাইভার। এ লাইনে হরদম রেলের কত লোক আসা যাওয়া করে। যাক বাবা, বেঁচে গেলাম। কোডারমা তো পৌঁছাই। এই জঙ্গলে সারা রাত পড়ে থাকতে হলে মরে যেতুম।"

বেহারি ভদ্রলোক বললেন, "রামজি কি কৃপা, বাবু!"

গুরপা গুঝান্ডির জঙ্গল পেরিয়ে আমরা কোডারমা পৌঁছলাম যখন তখন প্রায় মাঝ রাত।

স্টেশনে গাড়ি থামল।

হঠাৎ শুনি প্লাটফর্মে হইহই।

জানলা দরজা খুলে নেমে গেল অনেকে। কাকাও নেমে গেলেন।

খানিকটা পরে ছুটতে ছুটতে এসে বললেন, "সাংঘাতিক কাণ্ড। ওই যে লোকটা আমাদের কামরা থেকে নেমে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এল, সেই লোকটা যখন গাড়ি চালিয়ে আনছিল, তখন ইঞ্জিনের ফায়ারম্যানরা বয়লারের আলোয় লোকটাকে পুরো দেখতে পেয়েছিল। এক্কেবারে মরা ড্রাইভারের মুখের মতন দেখতে। সেই মরা ড্রাইভারই। গাড়ি থামতেই দুটো ফায়ারম্যান এঞ্জিন থেকে নেমে পালিয়েছে। লোকটাকেও আর দেখা যাচ্ছে না।"

বেহারি ভদ্রলোক বললেন, "হায় রাম!" বলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

আমি বললুম, "আর গার্ড সাহেব?"

কাকা বললেন, "গার্ড সাহেব ব্রেক ভ্যান খুলে ডেডবডি নামাবার সময় মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন। বলছেন, মরা ড্রাইভার আর জ্যান্ত ড্রাইভারের কে যে সত্যি আর কে মিথ্যে— তিনি বুঝতে পারছেন না।"

আমার হাত-পা কাঁপছিল, গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে। আমি বললাম, "তা হলে কে গাড়ি চালিয়ে আনল?"

কাকা বললেন, "আমিও তো তাই ভাবছি। ভূতে তো আর গাড়ি চালাতে পারে না। কিন্তু ফায়ারম্যানরাই বা কেন পালাবে? লোকটাই বা কেন উধাও হবে? আশ্চর্য!"

আমার মনে পড়ল, সাসারাম স্টেশনে লোকটা ওঠামাত্র আমাদের আলো দপ করে নিবে গিয়েছিল।

কেন?

ডিসেম্বর ১৯৭৬

অশরীরী

লীলা মজুমদার

এখন আমি একটা সাধারণ খবরের কাগজের আপিসে কাজ করলেও, এক বছর আগেও একটা সাংঘাতিক গোপনীয় কাজ করতাম। সে কাউকে বলা বারণ। বললে আর দেখতে হত না, প্রাণটা তো বাঁচতই না, তার ওপর সব চাইতে খারাপ কথা হল যে, চাকরিটাও চলে যেত। তবে এটুকু বলতে দোষ নেই যে, কাজটা ছিল খবর সংগ্রহ করা, কোথায়, কেন, কার জন্য সে-সব তোমরাই ভেবে নিও।

আমার বয়স তখন ২২; নামটা আর বললাম না। আমাদের পাড়ার হরিশ খুড়ো চাকরিটা করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রথম দিনেই আমার বড় সায়েব— সায়েব হলেও তিনি কুচকুচে কালো— আমাকে বলেছিলেন, "দেখো, সর্বদা 'নেই' হয়ে থাকবে। তুমি আদৌ আছো সে-কথা টের পাওয়া গেলে চলবে না। তোমার আলাদা একটা চেহারা, কিংবা চলা-ফেরা, কিংবা কথা বলার ধরন গজালেই চাকরিটে যাবে। পানা-পুকুরে এক ফোঁটা ময়লা জল হয়ে থাকবে; সমুদ্রের ধারে এক কণা বালি হবে; এক কথায় স্রেফ অশরীরী হয়ে যাবে। কথা বললে কী বলছ বোঝা যাবে, কিন্তু আলাদা করে গলার আওয়াজ মালুম দেবে না। আর সব চাইতে বড় কথা হল যে, নিজের চেহারা বলে কিছু রাখতে পাবে না, যাতে তুমি মরে গেলেও তোমাকে সনাক্ত করা না যায়। ও-রকম করে তাকাচ্ছ কেন, এ কিচ্ছু শক্ত কাজ নয়, কিচ্ছু করতে হবে না, স্রেফ নেই হয়ে থাকতে হবে। বেশি লেখা-পড়া জানারও দরকার নেই, বলো পারবে তো?"

আমি বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার।"

বড়-সায়েব বেজায় রেগে গেলেন, "ফের কথার ওপর কথা! চুপ করে থাকতেও কি শেখাতে হবে নাকি? কী নাম তোমার?"

আমি কোনও উত্তর দিলাম না।

বড়-সায়েব খুশি হয়ে বললেন, "খুব ভাল। মাইনে নেবার সময় নাম লিখবে না, টিপ-সই দেবে না। নাম ভাঁড়ানো যায়, কিন্তু টিপ-সই দিয়ে সবাইকে চেনা যায়। দুনিয়ার কোনও দু'জন লোকের এক রকম আঙুলের ছাপ হয় না। পয়লা তারিখে আমার কাছ থেকে মাইনে নিয়ে যাবে, খাতায় লেখা হবে 'নষ্টামি বাবদ দুইশো টাকা'। আচ্ছা যেতে পারো।"

আমি হাতে রুমাল জড়িয়ে তিনটে আঙুল দেখালাম। বড়-সায়েব হেসে বললেন, "আচ্ছা, তিনশো টাকাই। কিন্তু মনে থাকে যেন, বিপদে পড়লে আমরা বলব তোমাকে চিনি না।"

ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। শুনলাম আমার নতুন নাম ইংরিজি হরপের 'কিউ'। যেখানে যত সন্দেহজনক খবর শোনা যেত, নিজে দেখে এসে আপিসের পাশের গলিতে ভাঙা টাইপ-রাইটার ভাড়া খাটত, তাতে টাইপ করে জমা দিতে হত। তারপরের ছয়মাসে কোথায় যে না গেলাম, কী যে না দেখলাম, তার ঠিক নেই, অথচ আমাকে কেউ দেখতে পেত না। রাস্তার ভিড়ের মধ্যে এক্কেবারে মিলিয়ে যেতাম। যেখানে ভিড় নেই, শুধু ভাঙা দেয়াল, সেই দেয়ালে একটা দাগ হয়ে মিশে থাকতাম। একবার একটা চোরাইগুদামে সারাদিন শ্রমিকদের একজন হয়ে

গিয়ে রাশি রাশি গোপন খবর এনে দিয়েছিলাম। বড়-সাহেব খুশি হওয়ায় মাইনে বেড়ে গেছিল। আরেকবার একটা বিদেশি মাল-জাহাজে সারাদিন একটা পিপে হয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার সোনা খুঁজিয়ে পাইয়ে দিলাম। সেই জন্য খবরের কাগজে বড়-সায়েবের সে কী প্রশংসা।

সে যা-ই হোক, শেষবারের কাজটার কাছে ওসব কিছু না। নাকি গড়িয়ার দিকে এতকাল কোনও বে-আইনি কাজ হয়নি, তাইতে সকলের সন্দেহ হল, নিশ্চয়ই কোনও গোপন ষড়যন্ত্র চলছে। তার ওপর সব বাংলা কাগজে যখন ছোট্ট একটা নোটিস বেরুল— টিপ বোতাম পরিষদের প্রথম সভা গ-শু-৭, তখন আমার বুঝতে বাকি রইল না যে গড়িয়াতে, শুক্রবার, সাতটায় গোপন সভা বসবে।

বড়-সায়েবের ঘর থেকে প্রায় অদৃশ্যভাবে বেরিয়ে যাচ্ছি, তাঁর পেয়ারের বেয়ারা বলল, "টিকিট ছাড়া ঢুকতে দেবে না।"

রুমাল জড়িয়ে হাত পাতলাম। সে এক কুচি লাল কাগজ বের করে বলল, "দু' টাকা।" একটা আঙুল দেখালাম। তাকে টাকা দিয়ে টিকিট পকেটে ফেলে চলে এলাম।

শুক্রবার পাঁচটায় যখন বাসে সবচাইতে ভিড় হয়, তখন বেছে বেছে সবচাইতে ভিড়ের বাসে উঠলাম। উঠে চারটে লোকের মধ্যিখানে এমন 'নেই' হয়ে রইলাম যে, কন্ডাক্টর টিকিট চাইল না। চাইবে কেন, আমার তো আর শরীর-টরীর নেই যে বাসের জায়গা জুড়ে থাকব।

গড়িয়াতে নেমেই একটা চায়ের দোকানে ভিড় দেখে, সটান সেখানে গেলাম। এক ভাঁড় বেজায় হালকা, বেজায় গুড়ের চা নিয়ে, তক্তার ওপর দশ পয়সা ফেলে দিলাম। সস্তা তো হবেই, শুকনো শালপাতা দিয়ে এসব চা বানাতে হয়, চা-পাতা দিলে আর ওই দামে দিতে হত না।

ভাঁড় নিয়ে একটা বাঁশের খুঁটির পিছনে গুম হয়ে গেলাম। ভিড়ের মধ্যে হাসাহাসি হচ্ছিল, ওই শুক্রবার নিয়ে নাকি চারদিন পকেট-মার হয়নি। চট করে বুঝে নিলাম সভা তাহলে পকেটমারদের। একটা চিমড়ে লোক চায়ের ভাঁড় শেষ করে সামনের বাঁশ বাগানের দিকে পা বাড়াতেই, বাকি সব হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল— "ও মশাই, অমন কাজও করবেন না। ওই বাঁশ বাগানের পথ দিয়ে একটি মাত্র জায়গায় যাওয়া যায়, সেটি হল গোরে-বাড়ির ভাঙা কেল্লা, ভূতদের থান! দিনের বেলাতেও ও-পথে কেউ যায় না। কাগ-চিল, কুকুর-বেড়ালও না।"

লোকটা ভয়ে-ভয়ে ইদিক-উদিক তাকিয়ে উলটো দিকে মাঠের পথ ধরল। সকলে হাঁফ ছেড়ে যে যার জায়গায় ফিরে গেল। আমিও সেই সুযোগে ওই লোকটির পিছন-পিছন চললাম। যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। মাঠ ভেঙে ঘুরে সে আবার বাঁশ বাগানের ওপারে সেই রাস্তাটাই ধরল। আমি তার পিছনে 'নেই' হয়ে চললাম। শুকনো পাতার ওপর এতটুকু পায়ের শব্দ হল না, নইলে এতদিন কী শিখলাম।

তার পরেই বুকটা ধড়াস করে উঠল। সামনেই একটা প্রকাণ্ড ভাঙা কেল্লা। সেখানে পৌঁছে পথটাও শেষ হয়ে গেছে। কেল্লার চুড়োটা শুধু দেখা যাচ্ছে, চারদিকে এমনি ঘন বন হয়ে গেছে যে তার বেশি কিছু ঠাওর হল না। লোকটা একটু দাঁড়াল না, সটান বনের মধ্যে দিয়ে সেঁধিয়ে গিয়ে, কেল্লার লোহা-বাঁধানো প্রকাণ্ড সদর-দরজায় দাঁড়িয়ে, পাশে ঝোলানো একটা দড়ি ধরে টানতেই দরজা খুলে গেল। আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে সেঁধিয়ে গেলাম, সে কিছু টেরই পেল না।

ঢুকেই একটা প্যাসেজ, তার ও-ধারেই মস্ত ঘরে সভা বসেছে। সে কী ভিড় আর কী ভয়ংকর তর্কাতর্কি! ঘরে একটা জানলা নেই, উঁচু ছাদে কয়েকটা ঘুলঘুলি দিয়ে বাতাস আসে, তাও এমন আড়াল করা যে, বাইরে একবিন্দু আলো যাচ্ছে না। যদিও ঘরে কয়েকটা ডে-লাইট বাতি জ্বলছে, তাতে ঘরের অন্ধকার কাটছে না, ঘুপচি-ঘুপচি ভাব, একটা সোঁদা গন্ধ, পায়রার নাকি বাদুড়ের বা অন্য বিকট কিছুর, কে বলতে পারে।

সেই অন্ধকারের সঙ্গে আমি মিশে যেতে যেতে বুঝলাম যে, কেউই আলো চায় না, কারও মুখ চেনা যাচ্ছে না; সকলের একরকম কাপড় চোপড়,
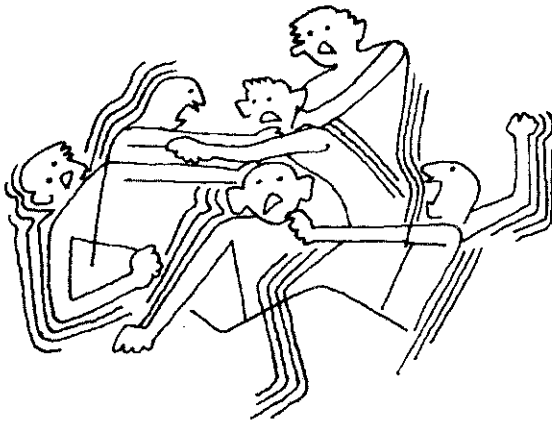
চেহারা, ঘাড় গুঁজে বসার আর আড়-চোখে চাওয়ার অভ্যাস। এদের সঙ্গে আমার এতটুকু তফাত নেই দেখে, নিশ্চিন্তে অদৃশ্যভাবে একটা থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম। দরজার কাছে। বেরুবার পথ ওই একটি, আর সব বন্ধ, হয়তো একশো বছর খোলা হয়নি, খোলা যায়ও না।

ফ্যাঁশফেঁশে বেড়ালে গলায় যা বলা হচ্ছিল তার কতক কতক বুঝতে পারলাম। এরা ইউনিয়ন করতে চায়, কিন্তু শত্তুরদের জ্বালায় কিছু হয়ে উঠছে না। আজকের ওই কুখ্যাত নির্জন জায়গায় কারও অনধিকার প্রবেশের কোনও সম্ভাবনাই নেই— হঠাৎ চমকে উঠলাম। একটা থামের পাশের সব চাইতে অন্ধকার কোণ দিয়ে সর-সর করে কেউ ছাদের অস্পষ্টতা থেকে নেমে এসে, আমার থামের ওপাশে দাঁড়াল। আমার গা শিউরে উঠল।

বক্তা তাঁর সরু সরু হাত-পা নেড়ে বলে চললেন, "সাধারণ নাগরিকদের অধিকার থেকে কেন আমাদের বঞ্চিত করা হবে? জনতা থেকে আমরা

অভিন্ন। আলাদা করে চিনুক তো কেউ। বলুক দেখি আমরা কেমন দেখতে, কেমন গলার আওয়াজ। আমাদের—''

আমার গা শিউরে উঠল। আরও গোটা দশেক ছায়া-ছায়া মতো এ-কোণ থেকে ও-কোণ থেকে বেরিয়ে এসে আবছায়াতে মিশে রইল।

বক্তা একটু ইতস্তত করে বললেন, ''আমাদের একটা আস্তানার দরকার ছিল, এর চাইতে ভাল আস্তানা কোথায় পাওয়া যাবে? আমরাই তো আসল অশরীরী, সকলের চোখের সামনে কাজ করি, কেউ আমাদের দেখতে পায় না। এই ছোট ইটের টুকরো ফেলে আজ এখানে আমাদের ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা—''

এই অবধি বলে ইটটা হাতে করে তুলেছে, অমনি ঘরে একটা শোরগোল উঠল, ''না, না, না, না—'' তারপরেই মনে হল ঘরের আনাচ-কানাচ থেকে পঁচিশ-ত্রিশটা ছায়া-মূর্তি বক্তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি অদৃশ্যভাবে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বক্তা একটা কোঁক শব্দ করে বসে পড়ল।

হঠাৎ বক্তার পাশে বসা ছুঁচোমুখো একটা লোক গর্জন করে উঠল, ''নটে! ভজা! কার্তিক! কী, কচ্ছিসটা কী? কই সমঝা!''

সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য ভাব ছেড়ে দিয়ে গোটা পঞ্চাশেক ছোকরা খালি হাতে মঞ্চের ওপর উঠে পড়ে, ওরে বাবারে, সেই ছায়া-মূর্তিগুলোকে পেল্লায় পেটাতে লাগল। সেই ফাঁকে বক্তা উঠে পড়ে দে দৌড়।

আমি এমন পেটনাই জন্মে দেখিনি। আগন্তুকদের আগা-পাশ-তলা ধাই-ধড়াক্কা মার! তার মধ্যে কে রব তুলল, ''ব্যাটারা সব পুলিশের চর, অশরীরী সেজে এয়েচেন। লাগা। লাগা। ভজা দেখছিস কী?''

ভজা বলল, ''পেছলে যাচ্ছে যে!''

শেষটা তাদের পৃষ্ঠভঙ্গ দিতেই হল। সুড়ুৎ সুড়ুৎ করে মঞ্চ থেকে নেমে, স্রেফ জলের স্রোতের মতো ভিড়ের মধ্যে দিয়ে গলে, ঘরের একটি মাত্র দরজা দিয়ে, সব নিমেষের মধ্যে বেড়িয়ে পড়ল। ধন্যি পুলিসের ট্রেনিং!

হয়তো একটু অসাবধান হয়ে পড়েছিলাম। ওই অদ্ভুত ব্যাপার দেখবার জন্য বোধহয় ভিড় থেকে কিঞ্চিৎ আলাদা হয়ে পড়েছিলাম। কারণ পালাতে-পালাতে শেষের লোকটা আমাকে দেখতে পেয়ে একরকম কোল-পাঁজা করে তুলে ধরে বাইরের জঙ্গলের মধ্যে এনে ফেলে বলল, ''চঁলে চঁল। চঁলে চঁল। দেঁখছিস কী!''

বলে একটা শ্যাওড়া গাছের ডাল বেয়ে উঠে পড়ল। ততক্ষণে ডে-লাইট হাতে নিয়ে নটে ভজারাও দোরগোড়ায় দেখা দিয়েছে। সেই আলোতে দেখলাম, যে লোকটা গাছে চড়ছে, তার গোড়ালি দুটো সামনের দিকে! তক্ষুনি গাছ-গাছড়ার সঙ্গে মিশে গিয়ে মুচ্ছো গেলাম। ওরা বোধহয় আমাকে খুঁজে পায়নি। অবিশ্যি আমি যে আছি, তাও ওরা জানত না। খুঁজবে কাকে?

বড়-সায়েবের কাছে আর যাইনি। আজকাল খবরের কাগজের জন্য সংবাদ সংগ্রহ করি। অবিশ্যি একেবারে 'নেই' হয়ে।

মে ১৯৭৭
অলংকরণ: অলক ধর

ভূত-শিকারী মেজকর্তা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বাইরের উঠোন বাগান পেরিয়ে বাড়িটায় ঢোকাই এক দায়। বাগান মানে তো এখন ঝোপঝাড়, বুনো লতা-পাতা আর আগাছার জঙ্গল। আর চারদিকের ধসে-পড়া দেওয়ালের নোনা-শ্যাওলা-ধরা ভাঙাচোরা ইটের টুকরো ছড়ানো উঠোনটা যেন ছোটখাটো ভূমিকম্পের সাক্ষী।

রীতিমতো লড়াই করে ঢুকতে হয়েছে বলা যায়। ভাগ্যে গুপ্তিটা সঙ্গে এনেছিলাম। তার ওপরের লাঠির খাপটা খুলে গুপ্তিটা বার করে কাঁটাঝোপ, লতা-পাতার জঙ্গল কেটে কেটে দোতলার সিঁড়ি পর্যন্ত এসে পৌঁছেছি।

সিঁড়িটা দোতলায় গিয়ে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু রেলিং ভাঙা নোনা আর শ্যাওলা-ধরা ধাপগুলোর যা অবস্থা, তাতে উঠতে গেলে আমার ভারেই ধসে পড়বে কি না কে জানে।

সাবধানে, বুঝেসুঝে পা ফেলে, ওপরে উঠতে উঠতে মনটা কিন্তু খুশিই হয়ে উঠছিল। না, বটকেষ্টকে এবার আর বাজে খবর দেবার জন্যে বকাবকি করতে হবে না। তার সেবারের সেই মাথায়-চন্দ্রবিন্দু মুল্লুকের মতো এবারের সুলুক-সন্ধানটাও মিছে হবে না বলেই মনে হচ্ছে। ঠিকানাটার হালচাল যা দেখছি তাতে যে আশায় আসা, তা এখানে না মিটলে আর মিটবে কোথায়! সবদিক দিয়ে এমন একটা জুতসই আস্তানা একেবারে বেদখল পড়ে থাকবে তা হতেই পারে না। কেউ না কেউ মৌরসি পাট্টা নিয়ে জুড়ে বসে আছেন নির্ঘাত, আর যিনি আছেন, তিনি আমার মতো শ্বাস-টানা বুক-ধুকধুক-করা খিদে-তেষ্টার গোলাম নিশ্চয়ই নন।

ধসে পড়োপড়ো নড়বড়ে সিঁড়িটা দিয়ে ওপরের দালানটায় উঠে কিন্তু অবাক হবার সঙ্গে মেজাজটা রীতিমতো খারাপ হয়ে গেল।

এ যে সাফসুফ সাজানো-গুছোনো গেরস্থালি বললেই হয়। মালপত্রের চেহারাটা নিতান্ত দুখিনী গোছের, কিন্তু গাড়ু, গামছা, ভাঙা তোবড়ানো তোরঙ্গ, খোলো হুঁকো, কলকে, টিকের মালসা, আর আগুনে পোড়া হাঁড়িকুড়ি দেখে তো আমারই মতো এপারের কেউ আস্তানা পেতেছে বলে মনে হয়। হাঘরের হদ্দ কেউ নিশ্চয়, নইলে ছুঁচো চামচিকেও যেখানে বাসা বাঁধতে ডরায়, তেমন জায়গায় এসে ডেরা পাতে।

কিন্তু এ হতভাগা এখানে জুড়ে বসে থাকলে আমার সব মতলব যে ভেস্তা।

লোকটা যে-ই হোক, তাকে তাড়াতেই হবে তাই!

"কেমন করে?"

চমকে উঠে এদিক-ওদিক তাকালাম। কে বললে কথাটা?

কই, কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না! আমার নিজের মনের কথাটাই নিজের কানে বেজে উঠল নাকি?

না, তা নয়। যে বলেছে, তাকে এবার চাক্ষুষই দেখা গেল। চিমসে খিটখিটে পাকানো চেহারার এক বুড়ো খাটো ধুতি পরে আদুড় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ গায়ে

ধবধবে এক গোছা পৈতে ঝুলিয়ে থোলো হুঁকো হাতে নিয়ে খড়ম খটখট করতে করতে কোথা থেকে হঠাৎ আবির্ভূত হল, ঠিক বুঝতে পারলাম না।

দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিষ মাখানো খ্যানখেনে গলার সে কী টিটকিরি! হাতের হুঁকোটাকেই যেন মোচড় দিয়ে নাড়তে নাড়তে বললে, ''আমায় তাড়াতে এসেছ, কেমন? আমায় তাড়িয়ে একেশ্বর হতে চাও এখানে?''

জবাব দেব কী, বুড়োর কাণ্ড দেখে আমি তখন অস্থির হয়ে উঠেছি। যেন আমাকেই কানমলা দিতে হুঁকোটাকে এমন মোচড় দিয়েছে যে, কলকেটা কাত হয়ে তার জ্বলন্ত টিকে-তামাক বুড়োর গায়ে আর কাপড়ের ওপরেই পড়ছে ঝপঝপ করে।

সেদিকে চেয়ে হাঁ হাঁ করে বলে উঠলাম, ''আরে করছেন কী? পুড়ে মরতে চান নাকি?''

আমার কথায় ভ্রুক্ষেপ না করে গায়ের আর কাপড়ের আঙরার টুকরোগুলো গায়েই ঘষে দিতে দিতে বুড়ো গা-জ্বালানো গলায় জিজ্ঞাসা করলে, ''বলি, ক'দিন খোলস ছেড়েছ শুনি? বেশি দিন তো হবে না। খোসাগুলো সব এখনও ভাল করে ছাড়েনি মনে হচ্ছে।''

বুড়ো বলছে কী! আমি তখন তার দিকে চেয়ে যেমন কাঠ, তেমনি আবার একেবারে হাঁ হয়ে গিয়েছি। বুড়ো যা বলছে তার তো একটাই মানে হয়। আর সে মানে তো তাহলে...

না, আগের লাইন পর্যন্ত যা লেখা হয়েছে তা আমার নিজের কথা নয়। সব সেই খেরোখাতা থেকে তোলা, মেজকর্তার সেই খেরোখাতা, কলকাতার সবচেয়ে লম্বা পাড়ির 'বাস'-এ দমদমের এয়ারপোর্টে যাবার পথে যা একটা খালি বেঞ্চির ওপর পুঁটলি-বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। পুঁটলিটা বেওয়ারিশ দেখে আর তার ভেতরের ছেঁড়াখোঁড়া একটা খেরোখাতার পাতাগুলো একটু নাড়তে-চাড়তে দু'-একটা কথা চোখে পড়ায় ভেতরে নাম-ঠিকানা কিছু পেলে যথাস্থানে ফেরত দেব বলে পুঁটলিটা চেয়ে নিয়েছিলাম। নেহাত একটা ছেঁড়াখোঁড়া হলদে-হয়ে-আসা বেরঙা কাগজের হাতে-লেখা খেরোখাতা বলেই কেউ আর আপত্তি করেনি।

খেরোখাতাটা ছোটখাটো নয়, বেশ ঢাউস। প্রায় মহাভারত-প্রমাণ। ছেঁড়াখোঁড়া পাতাগুলোয় অনেক ওলট-পালট হয়ে গেছে। যতটা সম্ভব সেসব পাতা গুছিয়ে এ পর্যন্ত যতখানি ঘাঁটাঘাঁটি করেছি তাতে কারুর নাম-ঠিকানা কিছু কিন্তু পাইনি। পেয়েছি শুধু মেজকর্তা বলে একটি নাম। তিনি কোথাকার, তা জানি না। কোন যুগের মানুষ, তারও হদিশ পাওয়া ভার।

কিন্তু মানুষটি একেবারে অদ্ভুত। অদ্ভুত তাঁর শখ বা বাতিকের দিক দিয়ে। লোকের কত রকম শখ আর বাতিকই তো থাকে। কারুর মাছ ধরার শখ, কারুর বাতিক দেশ-বিদেশের ডাকটিকিট জমানো, কারুর আবার শিকারের নেশা। এসব শখ আর বাতিকের জন্যে কী কষ্ট না করে মানুষ, আর কত না খরচ!

তাঁর খেরোখাতা-বৃত্তান্ত পড়ে বোঝা যায়, মেজকর্তাও তাই করেন। তবে তাঁর শখ বা নেশা বা বাতিক যা-ই বলি, সেটি একেবারে সৃষ্টিছাড়া। জলের মাছ কি বন-জঙ্গলের জানোয়ার নয়, তিনি শিকার করে বেড়ান যাদের নামেই গায়ে কাঁটা দেয় সেই ভূতপ্রেত। যেখানে এই রকম অশরীরীদের ঘুণাক্ষরে একটু খবর পান, সেখানেই তিনি ছুটে যান সরেজমিনে সন্ধান করতে। এসব ভুতুড়ে খবর আনবার জন্যে তিনি মাইনে-করা দালাল লাগিয়ে রেখেছেন সারা মুল্লুকে। দালালরা খাঁটি খবর আনলে মাইনের ওপর মোটা বখশিশ পায়।

ভূতের পেছনে এইসব ছোটাছুটির বিবরণ তিনি একটি মোটা খেরোখাতায় লিখে গেছেন। কবে যে লিখে গেছেন, তা সঠিকভাবে জানবার কোনও উপায় নেই, কিন্তু বর্ণনা-টর্ননা পড়ে ব্যাপারগুলো যে হালের নয়, এটুকু অন্তত বোঝা যায়।

এই খেরোখাতাটিই বেওয়ারিশ একটি পুঁটলির মধ্যে লম্বা পাড়ির একটা বাসের বেঞ্চিতে পাওয়ার পর সামান্য একটু নেড়েচেড়ে দেখবার সময়ই

'হানাবাড়ি', 'ভুতুড়ে গাঁ' গোছের কয়েকটা কথা পেয়েই আগ্রহভরে সেটা নিয়ে এসেছিলাম। কথা দিয়েছিলাম যে, খেরোখাতা থেকে মালিকের কোনও হদিশ পেলে তাঁকে খাতাটা পাঠিয়ে দেব। সঠিক হদিশ কিছু না পেলেও শুধু মেজকর্তা নামটুকু পেয়ে খেরোখাতার প্রথম একটা বৃত্তান্ত ছাপবার ব্যবস্থা করেছিলাম, আসল মালিক তা দেখে যদি নিজের হারানো খাতা দাবি করতে আসে।

দাবিদার কেউ কিন্তু আসেনি।

প্রথমের পর দ্বিতীয় বৃত্তান্ত ছাপাবার সময় আগেরবারের আশাটা কিন্তু ভয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ সত্যি আসুক, তা আর তখন চাইছি না।

মনের বাসনাই পূর্ণ হয়েছে শেষ পর্যন্ত। কেউ আর আসেনি।

কেউ আর আসবে না বলেই এখন আমার ধারণা। খেরোখাতার যিনি মালিক, কোনও কিছু দাবি করতে আসার অবস্থাই হয়তো তিনি পার হয়ে গেছেন। তিনি হয়তো আর নেই।

নিজের কৌতূহল মেটাবার সঙ্গে মেজকর্তার স্মৃতির মান রাখতে তাঁর খেরোখাতা থেকে যত দূর সাধ্য তাঁর বিচিত্র সব বিবরণ উদ্ধার করে তাই বার করবার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

কিন্তু উদ্ধার করা কি সোজা! একে ছেঁড়াখোড়া খেরোখাতার পাতাগুলোই সব মজুত আছে কি না সন্দেহ। যা আছে, তাও গিয়েছে ওলট-পালট হয়ে। এ ছাড়া মেজকর্তার লেখার ধারাটাই কেমন খামখেয়ালি। কোথাকার খেই কোথায় গিয়ে যে আবার ধরেছেন, তা খুঁজে পাওয়াই দায়।

যে বিবরণ দিয়ে এ কাহিনি আরম্ভ করেছি, তাও মাঝপথে অমন আচমকা ছেড়েছি কি প্যাঁচ কষবার জন্যে?

মোটেই না।

লেখাটা একটা পাতার শেষ লাইনে ওই পর্যন্তই

পৌঁছে থেমেছে। পরের পাতায় তার বাকি অংশটা পড়তে গিয়ে চক্ষুঃস্থির। পরের পাতাটাই সেখানে নেই।

গেল কোথায় সে পাতা? একেবারে হারিয়েই গেছে নাকি? না, মেজকর্তা তাঁর স্বভাব-মাফিক এ পাতার খেই এই মহাভারতপ্রমাণ পুঁথির তাড়ার আর কোনও পাতায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে বসে আছেন?

তা যদি তিনি না করে থাকেন, তাহলে তো মাঝপথে হঠাৎ অন্তর্ধান হওয়া এই বৃত্তান্তের শেষ না জানার যন্ত্রণা সহ্য করাই শক্ত হবে।

কী বললে খোলা হুঁকো হাতে সেই চিমসে বুড়ো? তার কী এমন দারুণ মানে বুঝলেন মেজকর্তা? আর কী হল তাঁদের সেই মোলাকাতের ফলাফল?

এসব কথা কি আর কোনওদিন জানা যাবে না?

অস্থির হয়ে তাই খেরোখাতার পাতার পর পাতা তন্নতন্ন করে খোঁজবার চেষ্টা করেছি।

সে চেষ্টা একেবারে বিফল হয়নি। আশাতীতভাবে সে বৃত্তান্তের ধারাটা আর এক জায়গায় খুঁজে পেয়েছি।

মাঝখানে কিছু বাদ পড়েছে কি না বলা শক্ত। তবে আসল খেইটা তাতে একেবারে ছিঁড়ে যায়নি।

মেজকর্তা লিখেছেন:

সমস্ত শরীরের ভেতরটা শিরশির করে উঠল। এমন ভাগ্য যে হয়েছে তা তো বিশ্বাস করতেই পারছি না। এতদিন যে সুযোগের স্বপ্নই শুধু দেখেছি, তা সত্যি সত্যি একেবারে হাতের মুঠোয়!

হুঁকো হাতে চিমসে বুড়ো যা বলছে তাতে তো একটা কথাই বোঝায়! না, একটা নয়, দুটো। সোনায় সোহাগা ছাড়া কিছু নয়। এখন শুধু একটু সামলে ঘুঁটি নাড়লেই আমি যা চাইছি সেই কিস্তি মাত।

বুড়ো নিজেই শুধু ধরা দিয়ে ফেলেনি, আমাকেও তার দলের বলে ধরে নিয়েছে। বেশ একটু বুঝেসুঝে সব চাল চেলে এই ভুলটা যদি জিইয়ে রাখতে পারি তাহলে আমার প্রেতপুরাণ সারা দুনিয়ায় একেবারে তাক লাগিয়ে দেবে।

চিমসে বুড়োর টিটকিরির প্রথম জবাবটা বেশ ভালই দিলাম। "খোসা কি আপনারই সব ছেড়েছে নাকি?"— দালানের কোণে তার মালপত্র দেখিয়ে বললাম, "ওগুলো তাহলে পুষে রেখেছেন কেন?"

এ জবাব শুনে সে কী খ্যানখেনে হাসি চিমসে বুড়োর! হাসতে হাসতে কল্কের আগুন আবার গায়ে কাপড়ে ছিটিয়ে পড়ল। আগের মতোই সেগুলো যেন চন্দন-বাটার মতো গায়ে ঘষে নিয়ে বললে, "ঠিক ধরেছ! ঠিক! তবে ওগুলো তোমার ওই পুঁটলি আর গুপ্তিভরা লাঠির মতো পুরনো অভ্যেসে জমিয়ে রাখা নয়।"

"অভ্যেসে নয় তো শখে?" আমি একটু ভুতুড়ে ঝাঁঝই দেখালাম।

"আরে না, না। অভ্যেসও নয়, শখও না।" বুড়ো হাসতে হাসতেই বললে, "ও শুধু উৎপাত ঠেকাতে একটু ভড়কি!"

"উৎপাত ঠেকাতে ভড়কি!" এবার আমি সত্যিই হতভম্ব। "কীসের উৎপাত আর কী ভড়কি?"

"কীসের উৎপাত তা বুঝলে না?" বুড়োর গলায় আবার টিটকরির সুর, "তোমায় আগে যা ভেবেছিলাম, সেই হতভাগাদের উৎপাত। বিশ্বাস তো ওদের নেই, লোভ করে কি সত্যি হাঁড়ির হালের হাঘরে হয়ে কেউ পাছে সেঁধুতে এসে জ্বালায়, তাই তৈরি থাকতে হয় সারাক্ষণ।"

উৎপাত করবার হতভাগা মানে যে মানুষ, তা বুঝলাম, কিন্তু ঘরকন্নার মালপত্র দিয়ে তাদের ভড়কি দেওয়াটা কী ব্যাপার? সেই কথাই জানতে চাইলাম।

আমার বোকামিতে বুড়ো এবার খুশি। বললে, "একেবারে আনকোরা আনাড়ি তো! কিছুই এখনও জানো না। ভড়কিটা কী রকম তাহলে শোনো। হতভাগারা একবার সেঁধুলে তো সহজে নড়তে চায় না। তাই তাদের তাড়াবার দাওয়াইটা কড়া করবার জন্যে প্রথম মুখশুদ্ধিটা বেশ মোলায়েম মিষ্টি লাগাবার ওই ভড়কি! হতভাগা যে আসবে, ঘরকন্নার ওই ব্যবস্থা দেখে তার মনে একটু ভরসাই হবে নিজের মতো আরেকজনকে সঙ্গী পেয়ে। নিশ্চিন্ত হয়ে তারপর যেই একটু গুছিয়ে বসবার

কথা ভাবছে, তখন আচমকা গায়ের ওপর কলকের আগুন ছড়াবার মতো একটি প্যাঁচ, কি তেমন জবরদস্ত দুঁদে কেউ হলে মুন্ডুটার ছাল ছাড়ানো এই চেহারা একবার হঠাৎ দেখালেই কাম ফতে! এ বাড়ি মুখো তো নয়ই, এ তল্লাটে আর কোনওদিন সে পা বাড়াবে না।''

চিমসে বুড়োর দিকে চেয়ে সমস্ত শরীরটা আপনা থেকে শিউরে উঠে বুকের ভেতরটা যেন হিম হয়ে গেল। বুড়ো তার প্যাঁচ বোঝাতে তার বিকট ফরমাশি চেহারাটাই আমায় তখন দেখাচ্ছে।

এক গোছা পৈতে ঝোলানো, চিমসে পাকানো আবলুসের কাঠির মতো আদুড় দেহটির ওপর কোটর-বার-করা দাঁত-ছিরকোটানো একটা মড়ার মাথা!

বুকের ভেতর থেকে যে চিৎকারটা আপনা থেকে বেরিয়ে আসছিল, কোনও রকমে সেটা চেপে মুখটা নির্বিকার রাখতেই তখন গায়ে ঘাম দিচ্ছে। তবু প্রাণপণে ধাক্কাটা সামলে ঠোঁটে একটু বাঁকা হাসি টানবার চেষ্টা করে বললাম, ''হ্যাঁ, এ প্যাঁচ একেবারে মোক্ষম! কিন্তু মানুষকে তাড়াবার জন্যে এত গরজ কেন? মানুষকে ভয়টা কী?''

''কী ভয়?'' চিমসে বুড়ো এবার চটেই উঠল আমার ওপর, ''খোলস তো সবে ছেড়েছ, দু'দিন বাদেই বুঝবে মানুষকে কী ভয়, আর কেন। অজাত-বেজাত খোলস-ছাড়া সকলের সঙ্গে মানিয়ে বনিয়ে থাকতে পারো কিন্তু মানুষের সঙ্গে কখনও নয়। সঙ্গে থাকবার একটু সুবিধে দিয়েছ কি, কেন কেমন, কোথায় সব বৃত্তান্ত খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বার করতে চেয়ে জ্বালিয়ে মারবে একেবারে। কেউ আবার ভূতের ওঝা ডাকে আমাদের তাড়াতে। সেই দু'দিন বাদে তো নিজেরাই খোলস ছাড়বি, তা অত ছটফটানি কীসের? সাধে কি ভয় দেখিয়ে ওদের তাড়াতে হয়!''

একটু থেমে বুড়ো মড়ার মুন্ডুটা পালটে হেসে বললে, ''যাক, তোমাকে যখন সেথো পেয়েছি, তখন আর ভাবনার কিছু নেই। দু'জনে মিলে এ

পোড়ো ভিটের এমন সুনাম ছড়াব যে, হাঘরে-টাঘরে তো ছার, গোরা মিলিটারি পর্যন্ত এধার মাড়াবে না। তোমায় পুরনো-নতুন ক'টা প্যাঁচ শিখিয়ে দেব ধীরে-সুস্থে। এখন দু'দিন একটু জিরিয়ে-টিরিয়ে টনকো হয়ে নাও। কাঁচা খোলস ছাড়লে প্রথমটা কেমন একটু সব এলানো-এলানো মনে হয় কিনা। ও হ্যাঁ, এক আস্তানায় থাকব, সময়ে অসময়ে দেখা হবে, তা তোমায় একটা কিছু বলে ডাকতে পারলে ভাল হত না? তোমার পুরনো অভ্যাসের ওই চিহ্ন ধরে গুপ্তি বলে ডাকতে পারি বটে, তুমিও পারো আমায় হুঁকোদা বলতে। কিন্তু তার চেয়ে নাম একটা থাকাই ভাল। কী নাম ছিল খোলস ছাড়বার আগে?''

''নাম?'' এক মুহূর্ত একটু থতমত খেয়ে বলে দিলাম, ''নাম বটকেষ্ট।''

''বটকেষ্ট! তা বেশ বেশ!'' নামটা দু'বার আওড়ে যেন খুশি হয়ে বুড়ো বললে, ''তা বটকেষ্ট করত কী ওপারে?''

''এই মানে,'' একটু আমতা আমতা করে বললাম, ''মুহুরি ছিল এক মোক্তারের।''

''মোক্তারের মুহুরি!'' বুড়ো রীতিমতো খুশি হয়ে বললে, ''ভাল ভাল। খুব ভাল। দুনিয়ার ঘোর-প্যাঁচ তাহলে সবই জানা আছে। আমারও বড় মন্দ নয়। ছিলেম জমিজমা বাড়ি ঘরের দালাল। নাম ছিল ভজহরি। তখন মফস্‌সলের বোকা জমিদারদের গড়ের মাঠই কতবার বিক্রি করে দিয়েছি। বলব তোমায় সেসব গল্প। তুমি আমায় ভজাদা বলেই ডেকো।''

গড়ের-মাঠ-বিক্রি-করা ধুরন্ধর দালাল ভজাদার কাছ থেকে শুধু দালালির গল্প নয়, আরও অনেক কিছু টেনে বার করে আমার প্রেতপুরাণ ভরে দিতে পারব আশা ছিল। কিন্তু সে আশায় অমন করে ছাই পড়বে কে জানত!

সব কিছু ভেস্তে দিল শেষ পর্যন্ত শুধু ক'টা হাঁচি!

হ্যাঁ, স্রেফ ক'টা হাঁচি এত বড় একটা যুগান্তকারী কাণ্ড দিল ভন্ডুল করে।

কী মোলায়েমভাবেই না সব কাজ এগোচ্ছিল। ভজুদার একটু অস্থির চঞ্চল স্বভাব। স্বভাবটার মূলে আছে অবশ্য ভয়। ভজুদার কেবলই ভয়, কোথা থেকে কেউ যদি এসে এ ডেরায় ঢুকে পড়ে।

'কেউ' মানে অবশ্য মানুষ। মানুষজনের আসা ঠেকাতে ভজুদা দিনরাত খাড়া পাহারায় থাকে। ত্রিসীমানায় কাউকে ঘেঁষতে না দেবার জন্যে দিন-দুপুরেও এ বাড়ির বাইরে পর্যন্ত ভয় দেখিয়ে ফেরে, এ বাড়ির ধারে কাছে কেউ আসছে আঁচ পেলে আর ভজুদাকে রোখা যায় না। আর কিছু না পারলে নিদেন পক্ষে গোখরো, কেউটে সেজেও পায়ের তলায় সড়সড়িয়ে ঘুরে মানুষটাকে তল্লাট-ছাড়া করে আসবে। এই অস্থিরতার ফাঁকে ফাঁকে যখন যতটুকু পারি ভজুদাকে ধরে আমার খেরোখাতার পাতা ভরাবার মশলা জোগাড় করে নিই।

তারই মধ্যে হঠাৎ সেদিনকার সেই হাঁচি। হাঁচি কি একবার! হাঁচির পর হাঁচি আর থামাতে পারি না। পুরনো নোনাধরা ঝুরঝুরে পলস্তারার চুনবালি-খসা বাড়ি। দোষের মধ্যে যে-কোণে থাকি তার মেঝে আর দেয়ালগুলো একটু পরিষ্কার করবার জন্য ঝাড়াঝুড়ি করেছিলাম। ব্যস, তাতেই নাকেমুখে মান্ধাতার আমলের ধুলো ঢুকে এমন সুড়সুড়ি ধরিয়েছে যে, প্রাণপণ চেষ্টা করেও তা সামলাতে পারছি না।

ভজুদা তখন কাছে-পিঠে ছিল না। উত্তর দিকের একেবারে জঙ্গল হয়ে-ওঠা বাগানে কাছের গাঁয়ের কে বুড়ি দুটো কাঠকুটো কুড়োতে এসেছে টের পেয়ে গেছল তাকে ভয় দেখিয়ে তাড়াতে।

ভজুদা ফিরে আসার আগে কী চেষ্টাই না করলাম হাঁচিটা বন্ধ করতে। কিন্তু তা আর পারলাম না কিছুতেই।

ভজুদা ফিরে এসে প্রথমে অবাক, তারপর রীতিমতো বিরক্ত। প্রায় খিচিয়ে উঠে বললে, ''ও আবার কী ন্যাকামি! হাঁচি-কাশির শখ এখনও মেটেনি নাকি?''

''না ভজুদা!'' হাঁচির ফাঁকে কোনওরকমে জানাবার চেষ্টা করলাম, ''এটা অ-অ-অভ্যাস! হ্যাঁচ্চো!''

''অভ্যাস!'' ভজুদা তেমনি খাপ্পা, ''বলি হাঁচতে-

হাঁচতেই খোলস ছেড়েছিলে নাকি যে, এখনও অভ্যেস [illegible] ওসব বদভ্যাস চদভ্যোস সঙ্গে তো কখনও আসে না!"

"হ্যাঁ, আসে না, মানে..." যা বলতে চাইলাম, পরপর ক'টা হাঁচিতে তা চাপা পড়ে গেল।

আর ওদিকে ভজুদার ফরমাশি মুখই তখন ফ্যাকাসে মেরে গিয়ে জিভ তোতলা হয়ে এসেছে।

"এ তো সে-সে-সে হাঁ-হাঁ-হাঁচি নয়। তু-তুমি তা-তা-তাহলে মা-নু-ষ।"

শেষ কথাটা যেন উচ্চারণ নয়, একেবারে আর্তনাদ। সেই সঙ্গেই ভজুদাও একেবারে সত্যি সত্যি হাওয়া!

"ভজুদা! ও ভজুদা! শুনুন, শুনুন!" গলা চিরে গেল চিৎকার করতে করতে। কিন্তু কোথায় পাব আর ভজুদাকে? ধারে-কাছে ঘেঁষবার ভয়ে যে মানুষকে ভজুদা তাড়িয়ে বেড়ায়, বাঘের ঘরে ঘোগের মতো সেই মানুষই তাকে ঠকিয়ে তার আস্তানায় ডেরা পেতেছে, এ আর সে সহ্য করতে পারে?

মানুষের ভয়েই ভজুদা একেবারে মুল্লুক-ছাড়া। আমার প্রেতপুরাণ মনের মতো করে লেখা আর হল না।

মেজকর্তার খেরোখাতার বৃত্তান্তও এইখানেই শেষ। আঁতিপাঁতি করে ঘেঁটেও ভজুদার কথা আর কোথাও খুঁজে পাইনি।

১৩৮৪
অলংকরণ: সুধীর মৈত্র

ভূতেরা বড় মিথ্যুক

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ভূতেরা বড় মিথ্যুক।

না, কথাটা আমার নয়। এ শহরের সবচেয়ে লম্বা পাড়ির বাসে দমদম এয়ারপোর্টের দিকে যাবার মুখে বেশ খালি হয়ে আসা বাসের একটি বেঞ্চিতে পড়ে থাকা বেওয়ারিশ একটি পুঁটলিতে যাঁর ছেঁড়া-খোঁড়া একটা খেরো-খাতা পেয়ে মালিকের নাম-ঠিকানা তাতে খুঁজে পেলে ফিরিয়ে দেবার আশ্বাস দিয়ে সেটা নিয়ে এসেছিলাম, সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ভূত-শিকারি দুর্জ্ঞেয়পরিচয় সেই মেজকর্তাও এ কথা বলেননি। এ মন্তব্যটি হল মুনশি মুলুকচাঁদের, মেজকর্তার খেরো-খাতা ঘাঁটতে ঘাঁটতে যাঁর খোঁজ পেয়েছি।

মুনশি মুলুকচাঁদ মেজকর্তাকে বেশ একটু টিটকিরি দিয়েই বলেছিলেন, "যাদের পেছনে ছুটে ছুটে মাথার অর্ধেক চুল ঝরিয়ে ফেললেন, এত দিনেও তাদের একটু চিনলেন না! বড়া আফসোস কি বাত কর্তামশাই, আপনার জন্যে বড়া দুখ হয়, আপনি এখনও জানেন না যে, একদম ষোলো আনা সাচ্চা আদমিরও ওপারে গেলে জবান ঝুটা হয়ে যায়। সব ভুল-ভাল যা মন চায় কিসসা শুনিয়ে দেয় আপনাদের। আর দেবে নাই বা কেন? তাদের যে-রকম জ্বালাতন আপনারা করেন, তাতে আপনাদের নিয়ে একটু বেয়াড়া রসিকতা করে শোধ নিতে চাওয়া তাদের খুব অন্যায় কি?

"এই ধরুন, আপনাদের কী এক নয়া যন্তর এসেছে, কী ওই পেলেনচিট না প্যালানচি কী যেন নাম। কাঠের একটা পানপাতার তলায় তিনটে চাকা বসানো। যেখানে-সেখানে যখন-তখন একটু সুবিধে আর সময় পেলেই ক'জনে মিলে টেবিলের ওপর ওই প্যালানচি নিয়ে আপনারা বসে যান। আপনারা ক'জনে ওই কাঠের পানপাতার ওপর হাত রেখে চোখ বুজে বসে যারা ওপার গিয়েছে তাদের কথা ভাবেন আর তাতেই মনে করেন ওপারের ওরা চুম্বকের টানে লোহার মতো ওই প্যালানচিতে এসে ভর না করে পারবে না। তা ওরা তাই আসে আর প্যালানচিতে ভর করে তা যে চালায় তাও ঠিক। কিন্তু কেন আসে জানেন? আসে কখনও-কখনও আপনাদের বুদ্ধিশুদ্ধির দৌড় দেখে আপনাদের নিয়ে একটু মজা করতে। যেমন দু'-চারটে অজানা খবর আপনাদের মনের লুকানো পাতা থেকেই পড়ে নিয়ে আচমকা জানিয়ে দিয়ে তাক লাগানো। তাক লাগাবার পর ওই পানপাতা প্যালানচি নাড়িয়ে যা লেখে তাতেই আপনারা ভয় ভক্তি বিশ্বাসে গদগদ।

"সে যারা যা হয় হোক, আপনার মতো পাকা জহুরি কিনা ওদের কথা শুনে এমন ভুলটা করলেন?"

"যার তার তো নয়," বলেছিলেন মেজকর্তা, "কথা শুনেছি তো খোদ লালা রাজারামের!"

"লালা রাজারামের!" হেসেছিলেন মুনশি মুলুকচাঁদ।

হেসে তিনি কী বলেছিলেন, আর তার জবাবে কী বলেছিলেন মেজকর্তা, কথাটা উঠেছিল কী থেকে, আর কোথায় কেনই বা এমন সব কথা হয়েছিল তা স্বয়ং মেজকর্তার কাছ থেকে তাঁর নিজের জবানিতে শোনাই নিশ্চয় ভাল।

''আশা তো দূরের কথা, [illegible] লিখেছেন মেজোকর্তা, ''যা [illegible] তাই [illegible] ঘটেছে একেবারে অবাক করে দিয়ে।

''কিন্তু অবাক বা হই কেন? একটু ভেবে দেখলেই তো বুঝতে পারি, যা সোজা আর হিসেবমাফিক তার চেয়ে উল্টোটা দুনিয়ায় বড় কম ঘটে না।

''এই যেমন মাছ ধরার বেলায় হামেশা দেখি। বেশ করে আগে থাকতে চার ফেলে নিখুঁত সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে একেবারে সেরা ছিপ-টিপ নিয়ে আর সবচেয়ে সরেস টোপ ফেলে যেখানে বসি, সেখানে এবেলা-ওবেলা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফাতনার ধ্যানই কতবার না সার হয়। আর তাইতেই বদমেজাজ নিয়ে ফিরে যেতে যেতে বেয়াড়া কোনও আঘাটায় নেহাত হেলায়-ফেলায় টোপ-গাঁথা বড়শিটা একবার ছুড়ে দিয়েছি কি, চোখের পাতা না পড়তে পড়তে চোঁ-চাঁ কীসের টানে জলের তলায় ফাতনা উধাও হওয়ার সঙ্গে সুতো ছাড়ার বেগে হুইলের গোঙানি যেন আর থামতে চায় না।

''ভাগ্য আর-একটু ভাল হলে সেই দফাতেই শেষ পর্যন্ত হয়তো আধমনি একটি মাছের রাজাকে কাটা কলাগাছের ভেলায় চড়ে জল থেকে শেষ পর্যন্ত তুলে আনতে হতে পারে।

''এ যাত্রায় আমার যা হয়েছে তা ঠিক ওই। আমার সেই চিরকেলে নেশার তাগিদে নয়, স্রেফ একটু বিদেশ ঘোরাফেরা আর সেই সঙ্গে যেটুকু তীর্থধর্ম হয় তা সারবার জন্যে কিছুদিনের মতো বেরিয়ে পড়েছিলাম।

''সময়টা মোটে ভাল নয় বলে অনেকে একটু বাধা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি তো ডাঙার পথ মাড়াচ্ছি না বললেই হয়। আমার নিজের ফরমাশ দিয়ে বানানো বজরা, মাঝিমাল্লাও সব আমার পুরনো পাকা লোক। যেখানে যাবার, জলে-জলেই যাব তাদের নিয়ে। ছোটখাটো তো নয়, প্রায় অকূল নদী। এপারে কিছু লোক দেখলে ওপারে গিয়ে ভিড়লেই হল। সুতরাং আমার ভাবনাটা কীসের?

''তা সে-রকম ভয়-ভাবনার কিছু হয়নি এ পর্যন্ত। হেসে-খেলে ভেসে ভেসে অমন দু'-দুটো মুল্লুক তো পার হয়ে এলাম, তার মধ্যে কখনও-সখনও রাতবিরেতে গুড়ুম-গাড়ামের মতো যা আওয়াজ শুনেছি তা মেঘের ডাক যে নয়, তা কে বলতে পারে!

''ওসব কিছুর বদলে যা হল তা এই—

''কৃষ্ণপক্ষের নবমী-দশমী। রাত তখন প্রথম প্রহর পার হয়েছে। মেঘে ঢাকা আকাশ যেমন অন্ধকার তেমনি অন্ধকার নদীর জল। স্রোত আর হাওয়ার সুবিধে নিতে যে-পার ঘেঁষে বজরা যাচ্ছে, সেখানকার সবকিছুও যেন গাঢ় কালির পোঁচ লাগানো।

''এরই মধ্যে হঠাৎ চমকে উঠে বড় মাঝিকে ব্যস্ত হয়ে ডাকলাম, 'দেওলাল! দেওলাল! দেখতে পেয়েছ? শুনতে পাচ্ছ কিছু?'

''দেওলাল তখন আমার পাশেই এসে দাঁড়িয়েছে। একটু যেন দ্বিধা করে বললে, 'হাঁ সরকার।'

'' 'তা হলে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন?' একটু ধমকের সুরে বললাম, 'বজরা রোখো, লাগাও ওই ঘাটে।'

'' 'কিন্তু সরকার,' দেওলাল আমার ধমক খেয়েও সামান্য একটু আপত্তি করে, 'দিনকাল বড় খারাপ! একেবারে অজানা ঘাটে এমন করে বজরা ভিড়ানো কি—'

''তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই আবার ধমকে উঠলাম, 'দিনকাল খারাপ তো কী? অজানা ঘাটে ওই একটা মানুষ আমাদের বজরা-সমেত এতগুলো মানুষকে খেয়ে ফেলবে? মানুষটা আমার নাম ধরে ডাকছে শুনতে পেয়েছ?'

''এমন অসম্ভব জায়গায় ওই নাম ধরে ডাকাটা যত তাজ্জবই করুক তা শোনার পর বজরা না থামিয়ে চলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

''যেখানে মানুষটাকে দেখেছি, বজরা এতক্ষণে স্রোতের টানে তা ছাড়িয়ে অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছে। সেখান থেকে বজরা ঘুরিয়ে যথাস্থানে লাগাবার হুকুম দিয়ে দেওলাল আমার কাছে ফিরে আসবার পর বললাম, 'যাও, আমার কামরা থেকে বন্দুকটা বরং নিয়ে এসো।'

''দেওলাল বন্দুক আনতে গেল না। আনলে বজরা ঘাটে লাগবার পর রীতিমতো লজ্জাতেই পড়তাম। কারণ এমন একটা অসম্ভব জায়গা থেকে এমন অবিশ্বাস্য ভাবে যে আমায় ডেকেছে, সে আর কেউ নয়, লালা রাজারাম। তার সঙ্গে এই পথে দেখা হওয়ার ব্যবস্থা খত লিখে আগে থাকতেই আমাদের ঠিক হয়ে আছে।

''তা থাকলেও লালা রাজারামের এমন জায়গায় এ সময়ে এসে দাঁড়িয়ে আমার বজরা থামাবার জন্যে ডাক দেওয়াটা অবশ্য একেবারে অদ্ভুত কল্পনাতীত ব্যাপার! সেটা কেমন করে সম্ভব হল?

''বজরা পাড়ে লাগবার পর তা থেকে বেশ কষ্ট করেই সেই আঘাটায় নেমে সেই কথাই রাজারামকে জিজ্ঞাসা করলাম। বললাম, 'এই এখানে এমন করে দাঁড়িয়ে কেন লালাজি? তোমার তো আমার সঙ্গে কাল সকালে দিলদারনগর ছাড়িয়ে সেই জামানিয়ার ঘাটে দেখা করার কথা!'

'' 'সেখানে কাল সকালে থাকতে পারব না বলেই তোমায় যাবার পথে ধরবার জন্যে এখানে দাঁড়িয়ে আছি।' জানাল লালাজি।

''তার এ জবাবে বিস্ময়টা বাড়ল বই কমল না। বেশ একটু হতভম্ব হয়েই তাই বললাম, 'কী বলছ লালাজি? অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করতে পারছি না। কিন্তু জায়গাটা চৌসা বলেই মনে হচ্ছে। এখান থেকে নদী দিয়ে জামানিয়া যেতে পঞ্চাশ মাইলের কম নয়। এই এতখানি রাস্তার মধ্যে ঠিক কোথায় দাঁড়ালে আমার বজরা ডেকে থামাতে পারতে তা তুমি ঠিক করলে কী করে?'

'' 'বুদ্ধু নয় বলেই ঠিক করতে পারলাম।' জবাব দিয়ে লালাজি বেশ সোজাভাবেই রহস্যটা পরিষ্কার করে দিল। লালাজি এই অঞ্চলের পয়লা নম্বর কারবারি। এখানকার নদীর হাড়হদ্দ তার জানা। তাই এ পথে পুব থেকে পশ্চিমে যেতে ছোট বড় সব নৌকোকে স্রোতের প্যাঁচে এই জায়গাটিতে নদীর দক্ষিণ পাড় ঘেঁষে যেতে হবে জেনেই লালাজি এইখানে দাঁড়িয়ে ছিল আমার অপেক্ষায়।

''লালাজির এই ব্যাখ্যার পরও একটা-দুটো প্রশ্ন

মনে জেগেছিল। কিন্তু তা আর না-তুলে বললাম, 'যাক, দেখা যখন হয়ে গেছে, তখন বজরায় ওঠো এসে। যেখানে যেতে চাও যেতে যেতে তোমার সব ব্যাপারটা শুনি।'

''কিন্তু বজরায় উঠতে রাজি হল না লালাজি। বললে, 'না, আমি বজরায় উঠব না। তুমি বজরা এখানে মাঝিদের জিম্মায় বেঁধে রেখে আমার সঙ্গে এসো।'

'' 'তোমার সঙ্গে যাব!' এবার সত্যিই একটু অস্বস্তির সঙ্গে বললাম, 'এখানে এই আঘাটায় নেমে কোথায় যাব তোমার সঙ্গে, আর যাবই বা কেন?'

'' 'যেতে যেতেই সব বলছি। এসো।' বলে লালাজি অন্ধকারেই আঘাটায় পাড় বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

''লালাজির আবদারটা অত্যন্ত বেয়াড়া হলেও অগ্রাহ্য করতে পারলাম না। লালা রাজারাম এদিকের এই সমস্ত তল্লাটের মস্ত বড় নামী লোক। শুধু অগাধ ধনী শেঠই নয়, মস্ত বড় দাতা। সারা দেশময় সব বড় বড় শহর আর তীর্থস্থানে কত ধরমশালা যে সে বসিয়েছে তার ঠিক নেই। বাংলাদেশে ভাগীরথীর ধারের সব তীর্থস্থানে এমনি কিছু ধরমশালা বসাবার ব্যবস্থা করবার সময় তার সঙ্গে আমার আলাপটা দোস্তিতে দাঁড়িয়ে যায়। এরকম একটা সাচ্চা মানুষ আমি খুব কম দেখেছি বলে সাক্ষাৎ দেখাশোনা না হলেও চিঠিপত্রে সে দোস্তিটা আমি ফিকে হয়ে যেতে দিইনি। যত বেয়াড়া আজগুবি মনে হোক, এ রাত্রে তার ফরমাশ শুনে তার সঙ্গে তাই না-গিয়ে পারলাম না।

''সঙ্গে যেতে যেতে তার কাছে যা শুনলাম তা খুব দুঃখের হলেও একেবারে অভাবিত কিছু নয়। এ অঞ্চলে এখন দারুণ গণ্ডগোল। কুনওয়ারা সিং আরার কাছে জগদীশপুরে কোম্পানির গোরা পল্টনের কাছে হেরে গেছে। তার সঙ্গে যোগ ছিল বলে কোম্পানির ফৌজ রাজারামের জামানিয়ার কুঠির ওপর চড়াও হয়ে সব লুটপাট করে নিয়ে গেছে। সেখানে আর তার থাকবার উপায় নেই বলেই লালা রাজারাম আমার জন্যে এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

'' 'কিন্তু কী দরকার ছিল অত বড় বিপদের পর তোমার এত কষ্ট করে আমার জন্যে এখানে এসে দাঁড়াবার?' আমি সত্যি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'আমার তো কোনও সত্যিকার দরকার নেই। এই পথে যাচ্ছিলাম বলে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম।'

'''বাঃ! লালাজি আমার কথায় যেন দুঃখ পেয়ে বললে, 'আমি কথা দিয়েছিলাম না যে, তোমার সঙ্গে দেখা করব? আমার কথার কোনও দাম নেই?'

''লালাজির নরম জায়গাটায় ঘা লাগাবার ভয়ে কথাটা ওইখানেই চাপা দিয়ে এতক্ষণের সত্যিকার যা নিয়ে উৎকণ্ঠা সেই প্রশ্নটাই করলাম। 'কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোথায়?'

''শুধু আঘাটা দিয়ে উঠে নয়, অন্ধকারে আদাড়-পাদাড় বন-জঙ্গল আর ছড়ানো ইট-পাথরের পোড়ো জমির ভেতর দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে যেভাবে এতক্ষণ এসেছি, তাতে এই প্রশ্নটাই অনেক আগে করার কথা। রাজারামের কথায় বাধা দিতে চাইনি বলেই এতক্ষণ চুপ করে ছিলাম।

''প্রশ্নটা শুনে লালাজি মনে হল যেন একটু ঠাট্টার সুরে আমার কথাটাই আবার আউড়ে বললে, 'কোথায় যাচ্ছি? এখুনি দেখতে পাবে।'

''তা সত্যিই পেলাম। অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ যেন সামনে একটা কালো পাহাড় খাড়া হয়ে উঠেছে মনে হল।

''পাহাড় নয়, বিরাট একটা সাবেকি মঞ্জিল। এখন অবশ্য প্রায় ধ্বংসস্তূপ হতে চলেছে।

''তারই ভেতর এ-ঘর ওঘর, এ-গলি ও-গলি দিয়ে এ কোথায় নিয়ে যাচ্ছে লালাজি।

''লালাজি অবশ্য যেতে যেতেই সে কথা আমায় জানিয়েছে। কোম্পানির সে এখন বিষ-নজরে পড়েছে। কুনওয়ারা সিংয়ের হারের পর কোম্পানির ফৌজ আর চরেরা সিংজির সঙ্গে বিন্দুমাত্র সংস্রব যাদের ছিল, নির্মম হয়ে তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। লালা রাজারাম তাদের কাছে পয়লা নম্বর দুশমন।

লালাজিকে তাই এখন পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। কোম্পানির হাতে ধরা পড়লেও সোনাদানা হীরা-জহরত নিয়ে তার বিপুল সম্পত্তি যাতে তাদের হাতে না পড়ে তাই লালাজি অনেক খুঁজে খুঁজে এই পুরনো মঞ্জিলের ধ্বংসস্তূপটা বার করে তার একটা গোপন কামরায় সেগুলো লুকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করেছে। নিজের ভাগ্যদোষে ধরা পড়লে বা মারা গেলেও এই বিপুল ঐশ্বর্য যাতে বেপাত্তা না হয়ে গিয়ে তার বিশ্বাসী ভাল একজনের কাজে লাগে তাই সে আমাকে সে গুপ্ত কামরাটা দেখিয়ে রাখবার জন্যে এনেছে।

"তা এনেছে, ভালই করেছে। কিন্তু সে কামরা আমায় দেখাবে কখন? ঘরের পর ঘর, গলির পর গলি, সিঁড়ি দিয়ে ওঠা আর নামা, এই করতে করতে সব জায়গাটা আমার কাছে গোলকধাঁধার চেয়েও জটিল মনে হচ্ছে যে! রাজারাম নিজে সে কামরা আবার চিনতে পারবে তো?

"সে-প্রশ্নের জবাব যা পেলাম তা কল্পনাতীত। একটা বেশ লম্বা আবছা অন্ধকার ঘুলঘুলি দিয়ে আমায় নিয়ে যেতে যেতে লালাজি হঠাৎ আমার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে কীরকম বিশ্রী অদ্ভুতভাবে হেসে বললে, 'এইখানটায়! এইখানটায় আমি নিজেই তারপর হারিয়ে গেছি!'

"এই কথা ক'টা উচ্চারণের পরই সামনে থেকে সে এক নিমেষে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

" 'লালাজি! লালাজি!' আমি চিৎকার করে উঠলাম।

"তার জবাবে প্রথমে একটা বিকট হাসি সমস্ত বাড়িটার ভেতর দিয়ে যেন ঝোড়ো হাওয়ার মতো বয়ে গেল। তারপরই লালাজির বিদ্রুপে বাঁকা গলা, 'খোঁজো, খোঁজো বাবুজি। সোনা চাঁদি, হীরা জহরতের বহুত লালচ তোমার দিলের মধ্যে কেমন? খোঁজো, খোঁজো তা হলে জান দিয়ে। আর কিছু না পারো, সেই লুকনো কামরায় হীরা জহরতের ওপর তোমার হাড্ডিগুলো হয়তো সাজানো থাকতে পারবে।'

" **'লালাজি! লালাজি!' আমি প্রায় কঁকিয়ে** চিৎকার করে বললাম, 'এসব তুমি কী বলছ? তুমি এপারের বদলে ওপারেই যদি গিয়ে থাকো, তা হলেও আমার সঙ্গে বেইমানি কি তোমার সাজে? তোমার লুকনো দৌলতখানা আমি দেখতে চাই না, তুমি শুধু আমায় এ গোলকধাঁধা থেকে বার হবার হদিশ বাতলে দাও। বাতলে দাও লালাজি।'

"উত্তরে আবার সেই নিষ্ঠুর হাসি।

"পাগলের মতো এ-ঘর থেকে ও-ঘর, এ-গলি থেকে অন্য গলি তারপর ছুটে বেড়াতে লাগলাম। দেয়ালে চৌকাঠে ঠোকা লেগে লেগে হাত-পা-মাথা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল, তবু বার হবার রাস্তা পেলাম না।

"সত্যিই শেষ পর্যন্ত তা পাব না নাকি? এই অজানা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আমার কঙ্কাল চিরকালের মতো লুপ্ত হয়ে থাকবে নাকি?

"অস্থির উৎকণ্ঠায় আর-একবার ছুটে বার হবার চেষ্টা করতেই আলোটা দেখতে পেলাম।

"আলো! তার মানে তো নিশ্চয় মুক্তির উপায়!

"সেই আলোর রেখার দিকে পড়ি কি মরি করে ছুটলাম। আলো পাছে আলেয়া হয়ে যায়, এই ভয়।

"তা হল না। একটা বাঁক ঘুরতেই আলোটা দেখতে পেলাম। বেশ লম্বা-চওড়া একটা ঘর। ঘরের মধ্যে এক কোণের দিকে দড়িতে বোনা দু'টি ছোট চৌকি। তার একটিতে বসে এক প্রৌঢ় সরু লম্বা একটা খাতার পাতা ওল্টাচ্ছেন। তাঁর দড়িতে বোনা চৌকির পাশেই বেশ উঁচু মাটির পিলসুজের ওপর একটা প্রায় গোলাকার প্রদীপের মোটা মোটা ক'টা সলতে রেড়ির তেলের জোরেই বোধহয় জ্বলছে।

"ঘরটার ভেতর ঢুকে সেখানকার সরঞ্জাম আর অচেনা প্রৌঢ়টিকে দেখে একটু থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম।

"প্রৌঢ় কিন্তু বিন্দুমাত্র না চমকে, চশমাটা নাকের ওপর থেকে নামাবার সঙ্গে হাতের লম্বা খাতাটা মুড়ে আমাকেই রীতিমতো অবাক করে দিয়ে বললেন, 'আসুন, আসুন, বাবুজি। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করে আছি। আমার নাম [illegible] চাঁদ।'

"[illegible] আপনি

এই গোলকধাঁধা-মঞ্জিলে আমার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন?

"কথাগুলো আমার গলা দিয়ে বার হয়নি। আমার চোখ-মুখের চেহারাতেই প্রকাশ পেল।

"মুনশি মুলুকচাঁদ তা ঠিকমতো বুঝে পাশের অন্য দড়ির চৌকিটা আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, 'বসুন বাবুজি, ঠান্ডা হয়ে বসুন। আজ আপনার বহুত পরেশানি হয়েছে ঝুটমুট।'

"ঝুটমুট! এবার রাগের জ্বালায় আমার গলায় আবার কথা ফুটল, 'শুধু ঝুটমুট বললে কিছুই বলা হয় না মুনশি মুলুকচাঁদজি। কাউকে নিয়ে এরকম বিশ্রী তামাশা শয়তানি ছাড়া আর কিছু নয়, আর সে শয়তানি যে করেছে তার ঠিকানা এখন এপারের, না ওপারের?'

"আমার এই কথা শুনে মুনশিজি বলেছিলেন, 'যাদের পেছনে ছুটে ছুটে মাথার অর্ধেক চুল ঝরিয়ে ফেললেন, এত দিনেও তাদের একটু চিনলেন না?' "

মুনশিজি আর মেজকর্তার মধ্যে তারপর যা কথা হয়েছিল, এই বিবরণের শুরুতেই তা কিছু দূর পর্যন্ত দেওয়া আছে। মেজকর্তার নিজের জবানি গোড়া থেকে ধরবার জন্যে যেখানে তা কাটা হয়েছিল, সেখান থেকে শেষ পর্যন্ত মেজকর্তার নিজের কথাতেই আবার বোনা যেতে পারে। মেজকর্তা কথায় কথায় লালা রাজারামের নামটা করায় 'লালা রাজারামের' বলে হেসেছিলেন মুলুকচাঁদ।

মেজকর্তা তাঁর খেরো-খাতায় তারপর লিখেছেন, "মুনশিজির হাসির ধরনে একটু গরম হয়েই বললাম 'হাসছেন কী? লালা রাজারাম কে তা আপনি জানেন?'

" 'তা একটু জানি বইকী!' একটু যেন চাপা বিদ্রুপের সঙ্গে বললেন মুনশিজি।

"তাতেই আরও জ্বলে উঠে বললাম, 'জানেন, লালা রাজারামের কথার কী দাম! লোকে স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের চেয়ে তাঁর কথায় বেশি বিশ্বাস করে।'

" 'করে নয়, করত।' বললেন মুনশি মুলুকচাঁদ একটু মুচকি হেসে, 'কিন্তু আগেই তো আপনাকে বলেছি যে, এপারের সঙ্গে ওপারের কোনও মিল নেই। এপারে যে ষোলো আনা সাচ্চা, ওপারে হামেশা সে আঠারো আনা ঝুটা হয়ে যায় স্রেফ মজা করবার জন্যেও।'

" 'তা বলে লালা রাজারামও তাই হবে!' অবিশ্বাসের সঙ্গে বললাম, 'এই দু'দিন আগে দেশের জন্যে যিনি জান দিয়েছেন তাঁর হঠাৎ এমন প্রবৃত্তি!'

" 'যদি বলি ওই জান দেওয়াটাও ঝুটা বাহাদুরি!' আগের মতোই মুখ টিপে হেসে বললেন মুনশি মুলুকচাঁদ। 'লালাজি কুনওয়ারা সিংকে ছেড়ে কোম্পানিরই শরণ নিয়েছিলেন। তাঁর জান নিয়েছে কোম্পানির ফৌজ নয়, তাঁর আগের দলেরই লোক বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে।'

" 'কখ্‌খনো না। হতে পারে না!' আমি প্রায় মারমুখো হয়ে বললাম, 'কী জানেন আপনি লালা রাজারামের বিষয়ে? কে আপনি?'

" 'আমি লালা রাজারামেরই মুনশি। তাই সব জানি।' গম্ভীর হয়ে বললেন মুনশিজি।

"মাথাটা প্রথমে গুলিয়ে গেলেও এতক্ষণে নিজেকে অনেকখানি সামলে নিয়েছি। তবু মুনশিজির মুখের দিকে না চেয়ে নীচের মেঝেতে প্রদীপের আলোর ছায়াগুলোর দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললাম, 'আপনি লালা রাজারামের মুনশি ছিলেন, তাই সব জানেন! কেমন মুনশিজি? আপনি লালাজিকে নিজের দলের সঙ্গে বেইমানি করবার জন্যে তাদের হাতে মরতে দেখেছেন, তারপর ওপারে গেলে সাচ্চারাও সব ঝুটা হয়ে যায় জেনে এখানে আমার মতো নিরীহ মানুষ যাতে লালাজির হাতে বেশি নাকাল না হয়, তাই দেখবার জন্যে এখানে পাহারাদার হয়ে বসে আছেন, এই তো আসল ব্যাপার! না মুনশিজি?'

"মুনশিজি এবার খুশি হয়ে কী বলতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে বাধা দিয়ে বলে গেলাম, 'আপনাকে কিছু আর বলতে হবে না মুনশিজি। আপনি যা করছেন তা অতি মহৎ কাজ। কিন্তু এপারের কারুর পক্ষে ওপারের কারুর ওপর পাহারাদারি করায় বেশ একটু ঝামেলা নেই কি?'

'' 'তা আছে।' মুনশিজি স্বীকার না করে পারলেন না, 'তবে, মানে...'

''মুনশিজিকে আবার থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'তবে আপনার নিঃস্বার্থ গরজটা বড় বেশি। লালা রাজারামের লুকনো দৌলতখানা যাতে যার-তার হাতে না পড়ে, তার জন্যে সবকিছু সহ্য করতে আপনি প্রস্তুত।'

'' 'ঠিক! ঠিক ধরেছেন!' উৎফুল্ল হয়ে বললেন মুনশিজি।

'' 'কিন্তু তার সঙ্গে আরও যা-যা ধরেছি, সেটাও তা হলে শুনুন।' এবারে সোজা মুনশিজির মুখের ওপর চোখ রেখে বললাম, 'আপনি নিজে আর এপারের কেউ নন। আমি ঠিকই বুঝতে পারছি, আপনি শুধু লালা রাজারামের মুনশি ছিলেন না, কোম্পানির চরও ছিলেন সেইসঙ্গে। আপনার কাছে গোপন খবর পেয়ে কোম্পানি রাজারামজিকে কুনওয়ারা সিংয়ের দলের বলে জেনে তাঁর আস্তানায় চড়াও হয়ে তাঁকে হত্যা করে। কিন্তু তার আগে নিজের ধনদৌলত লুকোবার ব্যবস্থা করে আপনার বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দিতে লালাজি ভোলেননি। ওপারে যাবার পর আপনার সবচেয়ে বড় দুঃখ এই যে, ওপারে গেলেই সবজান্তা হওয়া যায় না। তাই রাজারামজির লুকনো দৌলতখানার হদিশ আপনি পাচ্ছেন না। তা পাবার জন্যেই এখানে এসে এমন পাহারা দিয়ে বসে আছেন। কিন্তু আপনি ডালে-ডালে বলেই রাজারামজিকে পাতায়-পাতায় যেতে হয়েছে। এতক্ষণে বুঝেছি, আপনাকে হদিশ না-দেবার জন্যে আমার মতো দোস্তের সঙ্গেও বাধ্য হয়ে তাঁকে এমন বিশ্রী চালাকি করতে হয়েছে। তবে যা তিনি করেছেন, তা একেবারে ঝুটমুট নয়। ওই বেয়াড়া রসিকতার ভেতর দিয়েই আমায় আসল ব্যাপারটা বুঝিয়ে তিনি আমাকে দিয়ে তাঁর লুকনো দৌলত উপযুক্ত হাতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে চেয়েছেন। আমি সেই চেষ্টাই এবার করব। দেশের জন্যে যিনি প্রাণ দিয়েছেন, তাঁর দৌলত দেশের কাজেই যাবে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, ওপারের মিথ্যে ছায়াবাজি দিয়ে লালা রাজারামের লুকনো দৌলতখানা আপনার বংশের কারুর হাতে তুলে দেওয়ার আশা আপনার আর নেই।'

''মুনশি মুলুকচাঁদের ফ্যাকাসে মুখটা তখন প্রায় ঝাপসা হয়ে এসেছে। সেদিকে চেয়ে বললাম, 'আপনি যে এপারের নন, সেটা প্রথম কী করে বুঝলাম, তাই ভাবছেন নিশ্চয়। একটা কথা তা হলে আপনাকে বলে যাই। ওপারের হয়ে এপারের সাজতে হলে কায়ার চেয়ে ছায়াটার দিকেই বেশি নজর রাখতে হয়। আপনি এমনিতে আজকের আসরটা ভালই সাজিয়েছিলেন। কিন্তু ধরিয়ে দিয়েছে আপনার ছায়াটা। প্রদীপের আলোয় আপনার ছায়াটা ঠিকমতো পড়তে না-দেখেই আসল ফাঁকিটা ধরে ফেলে আর-সব ব্যাপার আমি বুঝে নিয়েছি। ঠিক যে বুঝেছি, তা তো আপনার ফ্যাকাসে হয়ে মিলিয়ে যাওয়া থেকেই বুঝতে পারছি। আচ্ছা, নমস্কারটা তা হলে নিয়ে যান।' ''

মেজকর্তার লেখা এখানেই শেষ। যা তিনি লিখে গেছেন, তা সত্য মিথ্যা যা-ই হোক, তাঁর নিজের হদিশ তিনি এবারে একটু দিয়ে ফেলেননি কি?

কুনওয়ারা সিংয়ের তিনি নাম করেছেন। কুনওয়ারা সিং তো সিপাহি বিদ্রোহের সময় বিহারের আরা জেলার কাছে তাঁর জগদীশপুরের রাজ্য থেকে কোম্পানির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিলেন।

মেজকর্তা কি তা হলে সেই সিপাহি বিদ্রোহের সময়কার মানুষ? তাঁর খেরো-খাতা আর-একটু ভাল করে ঘেঁটে দেখতে হবে।

সেপ্টেম্বর ১৯৭৮
অলংকরণ: বিমল দাস

ইঁদারায় গণ্ডগোল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

গাঁয়ে একটা মাত্র ভাল জলের ইঁদারা। জল যেমন পরিষ্কার, তেমনি সুন্দর মিষ্টি স্বাদ, আর সে-জল খেলে লোহা পর্যন্ত হজম হয়ে যায়।

লোহা হজম হওয়ার কথাটা কিন্তু গল্প নয়। রামু বাজিকর সেবার গোবিন্দপুরের হাটে বাজি দেখাচ্ছিল। সে জলজ্যান্ত পেরেক খেয়ে ফেলত, আবার উগরে ফেলত। আসলে কি আর খেত! ছোট ছোট পেরেক মুখে নিয়ে গেলার ভান করে জিভের তলায় কি গালে হাপিশ করে রেখে দিত।

তা রামুর আর সেদিন নেই। বয়স হয়েছে। দাঁত কিছু পড়েছে, কিছু নড়েছে। কয়েকটা দাঁত শহর থেকে বাঁধিয়ে এনেছে। তো সেই পড়া, নড়া আর বাঁধানো দাঁতে তার মুখের ভিতর এখন বিস্তর ঠোকাঠুকি, গণ্ডগোল। কোনও দাঁতের সঙ্গে কোনও দাঁতের বনে না। খাওয়ার সময়ে মাংসের হাড় মনে করে নিজের বাঁধানো দাঁতও চিবিয়ে ফেলেছিল রামু। সে অন্য ঘটনা। থাক গে।

কিন্তু এইরকম গণ্ডগোলের মুখ নিয়ে পেরেক খেতে গিয়ে ভারী মুশকিলে পড়ে গেল সেবার। পেরেক মুখে নিয়ে অভ্যেসমতো এক গ্লাস জল খেয়ে সে বক্তৃতা করছে। "পেরেক তো পেরেক, ইচ্ছে করলে হাওড়ার ব্রিজও খেয়ে নিতে পারি। সেবার গিয়েওছিলাম খাব বলে। সরকার টের পেয়ে আমাকে ধরে জেলে পোরার উপক্রম। তাই পালিয়ে বাঁচি।"

বক্তৃতা করার পর সে আবার যথা নিয়মে ওয়াক তুলে ওগরাতে গিয়ে দেখে, পেরেক মুখে নেই একটাও। বেবাক জিভের তলা আর গালের ফাঁক থেকে সাফ হয়ে জলের সঙ্গে পেটে সেঁদিয়েছে।

টের পেয়েই রামু ভয় খেয়ে চোখ কপালে তুলে যায় আর কী! পেটের মধ্যে আট-দশটা পেরেক! সোজা কথা তো নয়। আধ ঘণ্টার মধ্যে পেটে ব্যথা, মুখে গ্যাঁজলা। ডাক্তার কবিরাজ এসে দেখে বলল, "অন্ত্রে ফুটো, পাকস্থলীতে ছ্যাঁদা, খাদ্যনালী লিক, ফুসফুস ফুটো হয়ে বেলুনের মতো হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে। আশা নেই।"

সেই সময়ে একজন লোক বুদ্ধি করে বলল, "পুরনো ইঁদারার জল খাওয়াও।"

ঘটিভর সেই জল খেয়ে রামু আধ ঘণ্টা খানেকের মধ্যে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, সত্যিই লোহা হজম হয়ে গেছে।

ইঁদারার জলের খ্যাতি এমনিতেই ছিল, এই ঘটনার পর আরও বাড়ল। বলতে কী, গোবিন্দপুরের লোকের এই ইঁদারার জল খেয়ে কোনও ব্যামোই হয় না।

কিন্তু ইদানীং একটা বড় মুশকিল দেখা দিয়েছে। ইঁদারায় বালতি বা ঘটি নামালে দড়ি ছিঁড়ে যায়। দড়ি সব সময়ে যে ছেঁড়ে, তাও নয়। অনেক সময়ে দেখা যায়, বালতির হাতল থেকে দড়ির গিঁট কে যেন সযত্নে খুলে নিয়েছে। কিছুতেই জল তোলা যায় না। যতবার দড়ি বাঁধা বালতি নামানো হয়, ততবারই এক ব্যাপার।

গাঁয়ের লোকেরা বুড়ো পুরুতমশাইয়ের কাছে গিয়ে পড়ল। "ও ঠাকুরমশাই, বিহিত করুন।"

ঠাকুরমশাই মাথায় হাত দিয়ে বসে ছিলেন। দুঃখের সঙ্গে বললেন, ''ভায়ারা, দড়ি তো দড়ি, আমি লোহার শেকলে বেঁধে বালতি নামালাম, তো সেটাও ছিঁড়ে গেল। তার ওপর দেখি, জলের মধ্যে সব হুলুস্থুলু কাণ্ড হয়েছে। দেখেছ কখনও ইঁদারার জলে সমুদ্রের মতো ঢেউ ওঠে? কাল সন্ধেবেলায় দেখলাম নিজের চক্ষে। বলি, ও ইঁদারার জল আর কারও খেয়ে কাজ নেই।''

পাঁচটা গ্রাম নিয়ে হরিহর রায়ের জমিদারি। রায়মশাই বড় ভাল মানুষ। ধর্মভীরু, নিরীহ, লোকের দুঃখ বোঝেন।

গোবিন্দপুর গাঁয়ের লোকেরা তাঁর দরবারে গিয়ে হাজির।

রায়মশাই কাছারিঘরে বসে আছেন। ফর্সা নাদুস-নুদুস চেহারা। নায়েবমশাই সামনে গিয়ে মাথা চুলকে বললেন, ''আজ্ঞে গোবিন্দপুরের লোকেরা সব এসেছে দরবার করতে।''

রায়মশাই মানুষটা নিরীহ হলেও হাঁকডাক বাঘের মতো। রেগে গেলে তাঁর ধারেকাছে কেউ আসতে পারে না। গোবিন্দপুর গাঁয়ের লোকদের ওপর তিনি মোটেই খুশি ছিলেন না। তাঁর সেজোছেলের বিয়ের সময় অন্যান্য গাঁয়ের প্রজারা যখন চাঁদা তুলে মোহর বা গয়না উপহার দিয়েছিল, তখন এই গোবিন্দপুরের নচ্ছার লোকেরা একটা দুধেল গাই দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে এসে এক গাল হেসে নতুন বউয়ের হাতে সেই গোরু-বাঁধা দড়ির একটা প্রান্ত তুলে দিয়েছিল।

সেই থেকে রায়মশাইয়ের রাগ। গোরুটা যে খারাপ তা নয়। রায়মশাইয়ের গোয়ালে এখন সেইটেই সব চেয়ে ভাল গোরু। দু'বেলায় সাত সের দুধ দেয় রোজ। বটের আঠার মতো ঘন আর মিষ্টি সেই দুধেরও তুলনা হয় না। কিন্তু বিয়ের আসরে গোরু এনে হাজির করায় চারদিকে সে কী ছিছিক্কার! আজও সেই কথা ভাবলে রায়মশাই লজ্জায় অধোবদন হন। আবার রাগে রক্তবর্ণও হয়ে যান।

সেই গোবিন্দপুরের লোকেরা দরবার করতে এসেছে শুনে রায়মশাই রাগে হুহুংকার ছেড়ে বলে ওঠেন, ''কী চায় ওরা?''

সেই হুংকারে নায়েবমশাই তিন হাত পিছিয়ে গেলেন, প্রজারা আঁতকে উঠে ঘামতে লাগল, স্বয়ং রায়মশাইয়ের নিজের কোমরের কষি পর্যন্ত আলগা হয়ে গেল।

গোবিন্দপুরের মাতব্বর লোক হলেন পুরুত চক্কোত্তিমশাই। তাঁর গালে সব সময়ে আস্ত একটা হত্তুকি থাকে। আজও ছিল। কিন্তু জমিদারমশাইয়ের হুংকার শুনে একটু ভিরমি খেয়ে ঢোক গিলে সামলে ওঠার পর হঠাৎ টের পেলেন, মুখে হত্তুকিটা নেই। বুঝতে পারলেন, চমকানোর সময়ে সেটা গলায় চলে গিয়েছিল, ঢোক গেলার সময়ে গিলে ফেলেছেন।

আস্ত হত্তুকিটা পেটে হজম হবে কি না কে জানে! একটা সময় ছিল, পেটে জাহাজ ঢুকে গেলেও চিন্তা ছিল না। গাঁয়ে ফিরে পুরনো ইঁদারার এক ঘটি জল ঢকঢক করে গিলে ফেললেই জাহাজ ঝাঁঝরা। বামুন ভোজনের নেমন্তন্নে গিয়ে সেবার সোনারগাঁয়ে দু'বালতি মাছের মুড়ো দিয়ে রাঁধা ভাজা সোনা মুগের ডাল খেয়েছিলেন, আরেকবার সদিপিসির শ্রাদ্ধে ফলারের নেমন্তন্নে দুটো আস্ত প্রমাণ সাইজের কাঁঠাল, এক অন্নপ্রাশনে দেড়খানা পাঁঠার মাংস, জমিদারমশাইয়ের সেজোছেলের বিয়েতে আশি টুকরো পোনা মাছ, দু'হাঁড়ি দই আর দু'সের রসগোল্লা। গোবিন্দপুরের লোকেরা এমনিতেই খাইয়ে। তারা যেখানে যায়, সেখানকার সব কিছু খেয়ে প্রায় দুর্ভিক্ষ বাধিয়ে দিয়ে আসে। সেই গোবিন্দপুরের ভোজনপ্রিয় লোকদের মধ্যে চক্কোত্তিমশাই হলেন চ্যাম্পিয়ন। তবে এসব খাওয়া-দাওয়ার পিছনে আছে পুরনো ইঁদারার স্বাস্থ্যকর জল। খেয়ে এসে জল খাও। পেট খিদেয় ডাকাডাকি করতে থাকবে।

সেই ইঁদারা নিয়েই বখেরা। চক্কোত্তিমশাই হত্তুকি গিলে ফেলে ভারী দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। হত্তুকি এমনিতে বড় ভাল জিনিস। কিন্তু আস্ত হত্তুকি পেটে গেলে হজম হবে কি না, সেইটেই প্রশ্ন। পুরনো ইঁদারার জল পাওয়া গেলে হত্তুকি নিয়ে চিন্তা করার প্রশ্নই ছিল না।

চক্কোত্তিমশাই করজোড়ে দাঁড়িয়ে বললেন, ''রাজামশাই, আমাদের গোবিন্দপুর গাঁয়ের পুরনো ইঁদারার জল বড় বিখ্যাত। এতকাল সেই জল খেয়ে কোনও রোগ-বালাই আমরা গাঁয়ে ঢুকতে দিইনি। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা, ইঁদারার জল আর আমরা তুলতে পারছি না।''

রায়মশাই একটু শ্লেষের হাসি হেসে বললেন, ''হবে না? পাপের প্রায়শ্চিত্ত। আমার ছেলের বিয়েতে যে বড় গোরু দিয়ে আমাকে অপমান করেছিলে?''

চক্কোত্তিমশাই জিভ কেটে বললেন, ''ছি ছি, আপনাকে অপমান রাজামশাই? সেরকম চিন্তা আমাদের মরণকালেও হবে না। তা ছাড়া ব্রাহ্মণকে গো-দান করলে পাপ হয় বলে কোনও শাস্ত্রে নেই। গো-দান মহা পুণ্যকর্ম।''

রায়মশায়ের নতুন সভাপণ্ডিত কেশব ভট্টাচার্যও মাথা নেড়ে বললেন, ''কূট প্রশ্ন। কিন্তু কথাটা আপাতগ্রাহ্য।''

রায়মশাই একটু নরম হয়ে বললেন, ''ইঁদারার কথা আমিও শুনেছি। সেবার আমার অগ্নিমান্দ্যের সময় গোবিন্দপুর থেকে পুরনো ইঁদারার জল আনিয়ে আমাকে খাওয়ানো হয়। খুব উপকার পেয়েছিলাম। তা সে ইঁদারা কি শুকিয়ে গেছে নাকি?''

চক্কোত্তিমশাই ট্যাক থেকে আর একটা হত্তুকি বের করে লুকিয়ে মুখে ফেলে বললেন, ''আজ্ঞে না। তাতে এখনও কাকচক্ষু জল টলটল করছে। কিন্তু সে জল হাতের কাছে থেকেও আমাদের নাগালের বাইরে। দড়ি বেঁধে ঘটি বালতি যা-ই নামানো যায়, তা আর ওঠানো যায় না। দড়ি কে যেন কেটে নেয়, ছিঁড়ে দেয়। লোহার শিকলও কেটে দিয়েছে।''

রক্তচক্ষে রায়মশাই হুংকার দিলেন, ''কার এত সাহস?''

এবার হুংকার শুনে গোবিন্দপুরের লোকেরা খুশি হল। নড়ে চড়ে বসল। মাথার ওপর জমিদারবাহাদুর থাকতে ইঁদারার জল বেহাত হবে, এ কেমন কথা!

ঠাকুরমশাই বললেন, "আজ্ঞে মানুষের কাজ নয়। এত বুকের পাটা কারও নেই। গোবিন্দপুরের লেঠেলদের কে না চেনে! গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো মাথার ওপর আপনিও রয়েছেন। লেঠেলদের এলেমে না কুলোলে আপনি শাসন করবেন। কিন্তু এ কাজ যাঁরা করছেন তাঁরা মানুষ নন। অশরীরী।"

গোদের ওপর বিষফোঁড়ার উপমা শুনে একটু রেগে উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু অশরীরীর কথা শুনেই মুহূর্তের মধ্যে কানে হাত চাপা দিয়ে ডুকরে উঠলেন রায়মশাই, "ওরে, বলিস না, বলিস না!"

সবাই তাজ্জব।

নায়েবমশাই রোষকষায়িত লোচনে গোবিন্দপুরের প্রজাদের দিকে চেয়ে বললেন, "মুখ সামলে কথা বলো।"

চক্কোত্তিমশাই ভয়ের চোটে দ্বিতীয় হত্তুকিটাও গিলে ফেলতে ফেলতে অতি কষ্টে সামাল দিলেন।

রায়মশাইয়ের বড় ভূতের ভয়। পারতপক্ষে তিনি ও নাম মুখেও আনেন না, শোনেনও না। কিন্তু কৌতূহলেরও তো শেষ নেই। খানিকক্ষণ কান হাতে চেপে রেখে খুব আস্তে একটুখানি চাপা খুলে বললেন, "কী যেন বলছিলি?"

চক্কোত্তিমশাই উৎসাহ পেয়ে বলেন, "আজ্ঞে সে এক অশরীরী কাণ্ড। ভূ—"

"বলিস না! খবরদার বলছি, বলবি না।" রায়বাবু আবার কানে হাতচাপা দেন।

চক্কোত্তিমশাই বোকার মতো চারদিকে চান। সবাই এ ওর মুখে চাওয়াচায়ি করে। নায়েবমশাই "চোপ" বলে একটা প্রকাণ্ড ধমক মারেন।

একটু বাদে রায়বাবু আবার কান থেকে হাতটা একটু সরিয়ে বলেন, "ইঁদারার জলে কী যেন?"

চক্কোত্তিমশাই এবার একটু ভয়ে ভয়েই বলেন, "আজ্ঞে সে এক সাংঘাতিক ভুতুড়ে ব্যাপার!"

"চুপ কর, চুপ কর! রাম রাম রাম রাম!"

বলে আবার রায়বাবুর কানে হাত। খানিক পরে আবার তিনি, বড় বড় চোখ করে চেয়ে বলেন, "রেখে ঢেকে বল।"

"আজ্ঞে বালতি-ঘটির সব দড়ি তেনারা কেটে নেন। শেকল পর্যন্ত ছেঁড়েন। তা ছাড়া ইঁদারার মধ্যে হাওয়া বয় না, বাতাস দেয় না, তবু তালগাছের মতো ঢেউ দেয়, জল হিলিবিলি করে কাঁপে।"

"বাবা রে!" বলে রায়বাবু চোখ বুজে ফেলেন।

ক্রমে ক্রমে অবশ্য সবটাই রায়বাবু শুনলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "দিনটাই মাটি করলি তোরা। নায়েবমশাই, আজ রাতে আমার শোবার ঘরে চারজন দারোয়ান মোতায়েন রাখবেন।"

"যে আজ্ঞে।"

গোবিন্দপুরের প্রজারা হাতজোড় করে বলল, "হুজুর, আপনার ব্যবস্থা তো দারোয়ান দিয়ে করালেন, এবার আমাদের ইঁদারার একটা বিলিব্যবস্থা করুন।"

"ইঁদারা বুজিয়ে ফেল গে। ও ইঁদারা আর রাখা ঠিক নয়। দরকার হলে আমি ইঁদারা বোজানোর জন্য গো-গাড়ি করে ভাল মাটি পাঠিয়ে দেব'খন।"

তখন শুধু গোবিন্দপুরের প্রজারাই নয়, কাছারি-ঘরের সব প্রজাই হাঁ হাঁ করে উঠে বলে, "তা হয় না হুজুর, সেই ইঁদারার জল আমাদের কাছে ধন্বন্তরি। তা ছাড়া জল তো নষ্টও হয়নি পোকাও লাগেনি, কয়েকটা ভূত—"

রায়বাবু হুংকার দিলেন, "চুপ! ও নাম মুখে আনবি তো মাটিতে পুঁতে ফেলব।"

সবাই চুপ মেরে যায়। রায়বাবু ব্যাজার মুখে কিছুক্ষণ ভেবে ভট্টাচার্যমশাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন, "এ তো লেঠেলদের কর্ম নয়, একবার যাবেন নাকি সেখানে?"

রায়মশাইয়ের আগের সভাপণ্ডিত মুকুন্দ শর্মা একশো বছর পার করে এখনও বেঁচে আছেন। তবে একটু অথর্ব হয়ে পড়েছেন। ভারী ভুলো মন আর দিনরাত খাই-খাই। তাঁকে দিয়ে কাজ হয় না। তাই নতুন সভাপণ্ডিত রাখা হয়েছে কেশব ভট্টাচার্যকে।

কেশব এই অঞ্চলের লোক নন। কাশী থেকে রায়মশাই তাঁকে আনিয়েছিলেন। তাঁর ক্ষমতা বা পাণ্ডিত্য কতদুর তার পরীক্ষা এখনও হয়নি। তবে লোকটিকে দেখলে শ্রদ্ধা হয়। চেহারাখানা বিশাল

তো বটেই, গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল— তা সেও বেশি কথা কিছু নয়। তবে মুখের দিকে চাইলে বোঝা যায় চেহারার চেয়েও বেশি কিছু এঁর আছে। সেটা হল চরিত্র।

জমিদারের কথা শুনে কেশব একটু হাসলেন।

পরদিন সকালেই গো-গাড়ি চেপে কেশব রওনা হয়ে গেলেন গোবিন্দপুর। পিছনে পায়ে হেঁটে গোবিন্দপুরের শ দুই লোক।

দুপুর পেরিয়ে গাঁয়ে ঢুকে কেশব মোড়লের বাড়িতে একটু বিশ্রাম করে ইঁদারার দিকে রওনা হলেন। সঙ্গে গোবিন্দপুর আর আশপাশের গাঁয়ের হাজার হাজার লোক।

ভারী সুন্দর একটা জায়গায় ইঁদারাটি খোঁড়া হয়েছিল। চারদিকে কলকে ফুল আর ঝুমকো জবার কুঞ্জবন, একটা বিশাল পিপুল গাছ ছায়া দিচ্ছে। ইঁদারার চারধারে বড় বড় ঘাসের বন। পাখি ডাকছে, প্রজাপতি উড়ছে।

কেশব আস্তে আস্তে ইঁদারার ধারে এসে দাঁড়ালেন। মুখখানা গম্ভীর। সামান্য ঝুঁকে জলের দিকে চাইলেন। সত্যিই কাকচক্ষু জল। টলটল করছে। কেশব আস্তে করে বললেন, "কে আছিস! উঠে আয়, নইলে থুথু ফেলব।"

এই কথায় কী হল কে জানে। ইঁদারার মধ্যে হঠাৎ হুলুস্থুলু পড়ে গেল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ দিয়ে জল একেবারে ইঁদারার কানা পর্যন্ত উঠে আসতে লাগল। সেই সঙ্গে বোঁ বোঁ বাতাসের শব্দ।

লোকজন এই কাণ্ড দেখে দে-দৌড় পালাচ্ছে। শুধু চক্কোত্তিমশাই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতেও একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন।

"থুথু ফেলবেন না, থুথু ফেলবেন না।" বলতে বলতে ইঁদারা থেকে শয়ে শয়ে ভূত বেরোতে থাকে। চেহারা দেখে ভড়কাবার কিছু নেই। রোগা লিকলিকে কালো কালো সব চেহারা, তাও রক্তমাংসের নয়— ধোঁয়াটে জিনিস দিয়ে তৈরি। সবক'টার গা ভিজে সপসপ করছে, চুল বেয়ে জল পড়ছে।

কেশব তাদের দিকে চেয়ে গম্ভীর হয়ে বললেন, "ঢুকেছিলি কেন এখানে?"

"আজ্ঞে ভূতের সংখ্যা বড্ডই কমে যাচ্ছে যে! এই ইঁদারার জল খেয়ে এ তল্লাটের লোকের রোগ-বালাই নেই। একশো-দেড়শো বছর হেসে খেলে বাঁচে! না মলে ভূত হয় কেমন করে? তাই ভাবলুম, ইঁদারাটা দখল করে থাকি।"

বলে ভূতেরা মাথা চুলকোয়।

কেশব বললেন, "অতি কূট প্রশ্ন। কিন্তু কথাটা আপাতগ্রাহ্য।"

ভূতেরা আশকারা পেয়ে বলে, "ওই যে চক্কোত্তিমশাই দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ওঁরই বয়স একশো বিশ বছর। বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞেস করুন ওঁকে।"

কেশব অবাক চোখে চক্কোত্তির দিকে তাকিয়ে বলেন, "বলে কী এরা মশাই? সত্যি নাকি?"

একহাতে ধরা পৈতে, অন্য হাতের আঙুলে গায়ত্রী জপ কড়ে ধরে রেখে চক্কোত্তি আমতা-আমতা করে বলেন, "ঠিক স্মরণ নেই।"

"কূট প্রশ্ন। কিন্তু আপাতগ্রাহ্য।" কেশব বললেন।

ঠিক এই সময়ে চক্কোত্তির মাথায়ও ভারী কূট একটা কথা এল। তিনি ফস করে বললেন, "ভূতেরা কি মরে?"

কেশব চিন্তিতভাবে বললেন, "সেটাও কূট প্রশ্ন।"

চক্কোত্তি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "কিন্তু আপাতগ্রাহ্য। ভূত যদি না-ই মরে, তবে সেটাও ভাল দেখায় না। স্বয়ং মাইকেল বলে গেছেন, জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?"

ভূতেরা কাঁউমাউ করে বলে উঠল, "তা সে আমরা কী করব? আমাদের হার্ট ফেল হয় না, ম্যালেরিয়া ওলাওঠা, সান্নিপাতিক, সন্ন্যাস রোগ হয় না—তা হলে মরব কীসে! দোষটা কি আমাদের?"

চক্কোত্তি সাহসে ভর করে বলেন, "তা হলে দোষ তো আমাদেরও নয় বাবাসকল।"

কেশব বললেন, "অতি কূট প্রশ্ন।"

চক্কোত্তি বলে উঠলেন, "কিন্তু আপাতগ্রাহ্য।"

শ পাঁচেক ছন্নছাড়া, বিদঘুটে ভেজা ভূত চারদিকে দাঁড়িয়ে খুব উৎকণ্ঠার সঙ্গে কেশবের দিকে তাকিয়ে আছে। কী রায় দেন কেশব।

একটা বুড়ো ভূত কেঁদে উঠে বলল, "ঠাকুরমশাই, জলে ভেজানো ভাত যেমন পান্তা ভাত, তেমনি দিন রাত জলের মধ্যে থেকে থেকে আমরা পান্তো-ভূত হয়ে গেছি। ভূতের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য এত কষ্ট করলুম, সে-কষ্ট বৃথা যেতে দেবেন না।"

"এও অতি কূট প্রশ্ন।" কেশব বললেন।

চক্কোত্তিমশাই এবার আর "আপাতগ্রাহ্য" বললেন না। সাহসে ভর করে বললেন, "তা হলে ভূতেরও মৃত্যুর নিদান থাকা চাই। না যদি হয় তবে আমিও ইঁদারার মধ্যে থুথু ফেলব। আর তারই বা কী দরকার! এক্ষুনি আমি সব ভূত বাবাসকলের গায়েই থুথু ফেলছি।"

চক্কোত্তিমশাই বুঝে গেছেন, থুথুকে ভূতদের ভারী ভয়। বলার সঙ্গে সঙ্গে ভূতেরা আঁতকে উঠে দশ হাত পিছিয়ে চেঁচাতে থাকে, "থুথু ফেলবেন না! থুথু দেবেন না!"

কেশব চক্কোত্তিমশাইকে এক হাতে ঠেকিয়ে রেখে ভূতেদের দিকে ফিরে বললেন, "চক্কোত্তিমশাই যে কূট প্রশ্ন তুলেছেন, তা আপাতগ্রাহ্যও বটে। আবার তোমাদের কথাও ফেলনা নয়। কিন্তু যুক্তি প্রয়োগ করলে দেখা যায় যে, ভূত কখনও মরে না। সুতরাং ভূত খরচ হয় না, কেবল জমা হয়। অন্যদিকে মানুষ দু'শো বছর বাঁচলেও একদিন মরে। সুতরাং মানুষ খরচ হয়। তাই তোমাদের যুক্তি টেকে না।"

ভূতেরা কাঁউমাউ করে বলতে থাকে, "আজ্ঞে অনেক কষ্ট করেছি।"

কেশব দৃঢ় স্বরে বললেন, "তা হয় না। ঘটি বাটি যা সব কুয়োর জলে ডুবেছে, সমস্ত তুলে দাও, তারপর ইঁদারা ছাড়ো। নইলে চক্কোত্তিমশাই আর আমি দু'জনে মিলে থু—"

আর বলতে হল না। ঝপাঝপ ভূতেরা ইঁদারায় লাফিয়ে নেমে ঠনাঠন ঘটি-বালতি তুলতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে ঘটি-বালতির পাহাড় জমে গেল ইঁদারার চারপাশে।

পুরনো ইঁদারায় এরপর আর ভূতের আস্তানা রইল না। ভেজা ভূতেরা গোবিন্দপুরের মাঠে রোদে পড়ে থেকে থেকে ক'দিন ধরে গায়ের জল শুকিয়ে নিল। শুকিয়ে আরও চিমড়ে মেরে গেল। এত রোগা হয়ে গেল তারা যে, গাঁয়ের ছেলেপুলেরাও আর তাদের দেখে ভয় পেত না।

১৩৮৫
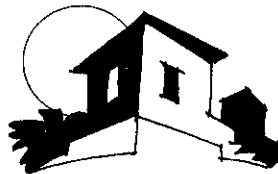
সত্যি ভূতের গল্প

বিমল কর

সারদাচরণ বকসির নাম তোমরা নিশ্চয় শোনোনি। আমরা ছেলেবেলায় শুনেছিলাম। তখন সারদাচরণকে বলা হত গোয়েন্দা সারদা। উনি লহরী সিরিজের ছ'আনা দামের বইগুলোতে হামেশাই দেখা দিতেন। 'মারাকানার গুপ্তধন', 'তিন প্রহরে ঘণ্টা বাজে', 'পরশুরামের পিস্তল'—এ সব ছিল তাঁর বিখ্যাত বই। তবে সারদাচরণের আসল খ্যাতি ছিল ভূতের গল্প লেখায়। প্রায় প্রত্যেকটি কাগজেই তাঁর ভূতের গল্প বেরুত। দারুণ গল্প! অমন গল্প কেউ আর লিখতে পারত না। এক-একটা গল্প পড়ার পর দিন-দুই গা ছমছম করত।

সারদাচরণ কবে যে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছিলেন তা জানতাম না। আর মানুষের ছেলেবেলা তো বরাবর থাকে না, আমরাও বড়সড় হয়ে চাকরি-বাকরি করতে লাগলাম।

ঘটনাচক্রে সারদাচরণের সঙ্গে আমার আলাপ হল সেদিন। ঝাড়গ্রামে গিয়েছিলাম একটা কাজে। সারদাচরণের বাড়ির এক পাশেই আমায় থাকতে হয়েছিল। সেই সূত্রেই আলাপ, তারপর কথায় কথায় ধরা পড়ে গেলেন এই সারদাচরণই সেই গোয়েন্দা সারদাচরণ। বৃদ্ধ মানুষটি এত চমৎকার আর গল্প-গুজবে এমন পাকা যে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে গল্প হচ্ছিল। কার্তিক মাসের ঠান্ডা পড়েছে সামান্য। সন্ধে হয়ে গিয়েছিল।

কথায়-কথায় আমি বললাম, ''আপনি ভূতের গল্প লেখা কবে ছাড়লেন?''

''অনেক কাল আগে।''

''ছাড়লেন কেন? দারুণ লাগত আপনার ভূতের গল্প। দু'-একটার কথা এখনও মনে আছে।''

সারদাচরণ হাসলেন। বললেন, ''কেন ছাড়লাম জানো? একবার এক অদ্ভুত কাণ্ড হল। সেই থেকে ছেড়ে দিলাম।''

''কী কাণ্ড?''

''শুনতে চাও?''

''বাঃ শুনব না কেন? আপনি বললেই শুনব।''

সারদাচরণ একটু চুপ করে রইলেন। তারপর শুরু হল তাঁর গল্প।

সেটা নাইনটিন ফরটি-টুয়ের গোড়া হবে। তখন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পিক পিরিয়ড। কলকাতা থেকে লোকজন সব পালিয়ে গিয়েছে বোমার ভয়ে। খাঁ খাঁ করছে শহর। ব্ল্যাক-আউটের চোটে কলকাতা সন্ধে হতে না হতেই অন্ধকার। ঠুঙি-পরানো গ্যাসের আলো জ্বলে রাস্তায়—তাও সিকি মাইল অন্তর। আমি কিন্তু কলকাতা ছেড়ে পালাইনি। কেমন করে পালাব বলো? পেট চালাতে হবে তো! পল হ্যামলিন কোম্পানিতে চাকরি করি, তারা খুব কড়া ধাতের। থাকতাম শীলবাবুর হোটেলে। মির্জাপুর স্ট্রিটে। চাকরি করি, লহরীর ছ'আনা সিরিজের বই লিখি, আর বাচ্চাদের কাগজে গল্প। ভূতের গল্পই বেশি। বড়দের কাগজেও লিখেছি দু'-চারটে।

একদিন হোটেল থেকে বেরিয়ে খানিকটা পায়চারি করে কলেজ স্কোয়ারে গিয়ে বসলাম। একটু একটু চাঁদের আলো, শীত পালাই-পালাই

করছে, বেশ লাগছিল। আমার বরাবরই চুরুট খাবার অভ্যেস। নতুন একটা চুরুট ধরিয়েছি এমন সময় কে যেন এসে পাশে বসল।

কলকাতায় তখন সন্ধের পর লোকজন বড় একটা বেরুত না। কোথায় বা যাবে অন্ধকারে। পাড়ার মধ্যেই সিনেমা-থিয়েটারে যেত, বা বন্ধু-বান্ধবের কাছে। কলেজ স্কোয়ার একেবারেই ফাঁকা। দু'-চারজন, আমারই মতন আছে হয়তো, চোখে পড়ে না।

পাশে এসে যে লোকটি বসল তাকে আমি নজর করলাম। লিকলিক করছে রোগা, গায়ের রঙ কালোই মনে হল। লম্বা ধরনের একটা জামা পরেছে। সেটা কোট না আলখাল্লা বুঝতে পারছিলাম না।

একটু আলাপ জমাবার চেষ্টা করলাম। লোকটা জবাবই দেয় না কথার, শুধু হ্যাঁ আর না। মনে হল, লোকটা ভীষণ বিরক্ত হয়ে রয়েছে।

আমারও কেমন জেদ ধরে গেল। লোকটাকে কথা না বলিয়ে ছাড়ব না। তাকে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগলাম, আজেবাজে যা মুখে এল। লোকটারও সেই একই রকম জবাব, হ্যাঁ আর না।

আমি যখন হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিচ্ছি তখন লোকটা আমায় চমকে দিয়ে একটা কথা বলল। কী বলল, জানো?

বলল, আমাকে সে জানে। আমার নাম সারদাচরণ বকসি। আমি শীলবাবুর হোটেলে থাকি।

শুনে আমি অবাক। লোকটা কি গোয়েন্দা নাকি!

তারপরই লোকটা বলল, "আপনি মশাই যা জানেন না তা লেখেন কেন? ফাজলামি পেয়েছেন?"

আমি একেবারে বেইজ্জত। বলে কী লোকটা? চটেমটে বললুম, "আমি কী লিখি বলুন তো?"

"যত্ত ছাইপাঁশ।"

শুনলে কথা! রাগে গা জ্বলে উঠল। মনে হল, এক চড়ে লোকটার বদন বিগড়ে দিই। একেবারে অসভ্য। কোনও রকমে রাগ চেপে বললাম, "মশাইয়ের কি ছাই তোলার অভ্যেস আছে?"

"আমার কী আছে না আছে আপনার জেনে দরকার নেই। বেশ তো করে খাচ্ছিলেন তিন রাতে তিন খুন, মৃত্যুফাঁদ লিখে—গল্পের গোরু তরতর করে গাছে উঠছিল; তা মরতে আমাদের দিকে হাত বাড়ালেন কেন?"

রাগে পিত্তি জ্বলছিল। আমার আবার বদ-অভ্যেস ছিল। রাগের মাথায় তিন পয়েন্ট পাঁচ পয়েন্টও চালিয়ে দিতাম—মানে ঘুসি। কিন্তু রাগ হলেও লোকটার কথাবার্তা শুনে একটু ঘাবড়েও যাচ্ছিলাম। বললাম, "আপনাদের দিকে হাত বাড়ালাম মানে?"

"একেবারে ধোয়া তুলসীপাতা সাজছেন যে! বলি এই সেদিন রঙবাহার কাগজে কী লিখেছেন ওটা? ভূত বলে তার জাত নেই—যা খুশি করলেই হল? কোথায় আপনি দেখেছেন ভূতে রিকশা টানছে? ছি ছি, বলিহারি আপনার আক্কেল মশাই, রাত একটায়—অমন শীতের দিনে আপনি ভূতকে দিয়ে নিমতলা স্ট্রিট থেকে বেলগেছে পর্যন্ত রিকশা টানালেন! আপনি নিজে পারবেন টানতে? দেড় দু'মাইল রাস্তা...ছি ছি ছি...।"

আমি একেবারে থ হয়ে গেলাম লোকটার কথা শুনে। কথাটা তো মিথ্যে বলেনি। একেবারে হালে রঙবাহার পত্রিকায় আমার একটা ভূতের গল্প বেরিয়েছে; তাতে বাস্তবিকই এক ভুতুড়ে রিকশা আর রিকশাঅলার কথা রয়েছে।

রাগ একটু কমল। বললাম, "কেন, ভূতে রিকশা টানতে পারে না?"

"না। কভি নেহি...আপনি মশাই বড় বেআক্কেলে। নিজে ফুসফুস করে চুরুট ফুঁকছেন—কই আমাকে তো ভদ্রতা করে একটা দিচ্ছেন না? একটা চুরুট ছাড়ুন।"

এবার আমার হাসি পেল। আচ্ছা মজার লোক তো!

একটা চুরুট তাকে দিলাম। দেশলাইও।

লোকটা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চুরুটটা ধরিয়ে নিল।

আমি বললাম, "আপনি আমার গল্প-টল্প পড়েন?"

"বাধ্য হয়ে।"

"কেন বাধ্য হয়ে কেন?"

"ওটা আমার চাকরি।"

"আপনি কি রঙবাহার কাগজে কাজ করেন? রণদাবাবুর...?

"না না, রণদা-টনদার আমি কিছু নই। ওই রণদাবাবুকে একদিন শিক্ষা দিতে হবে। বাপের পয়সায় কাগজ করে গাধাটা সম্পাদক হয়েছে। ওর বাবা গঙ্গাবাবু প্রায়ই দুঃখ করে বলেন, ছেলেটার কপালে অশেষ দুর্গতি লেখা আছে।"

বলে কী লোকটা? রণদাবাবুর বাবা মারা গিয়েছেন বছর কয়েক, তাঁর সঙ্গে এই লোকটার দেখা হবার কথা নয়। ডাহা মিথ্যে বলছে। বললাম, "রণদাবাবুর বাবা তো স্বর্গে!"

"আমি কি মর্ত্যে থাকার কথা বলেছি! মায়ের কাছে মামারবাড়ির গল্প!"

লোকটার কথাবার্তা থেকে মনে হচ্ছিল, ও যেন আমাকে ধমকাবার জন্যেই এসেছে। বলতে যাচ্ছিলাম, রণদাবাবুর বাবার সঙ্গে আপনার কি কোনও টেলিফোন কানেকশান আছে?—আমাকে কথা বলতে না দিয়ে লোকটা বলল, "ক'দিন আগে বেণুবীণা কাগজে আপনি কী অখাদ্য লেখাই লিখেছেন! ছ্যা ছ্যা। রেল স্টেশনের ওয়েটিংরুমে ভূত ঢুকিয়েছেন। তাও আবার গোসলখানায়। কেন মশাই, ভূত কি রেলের জমাদার না ঝাড়ুদার? আপনার মতো নিরেট মাথা আর দেখিনি।"

আমি হাঁ করে লোকটাকে দেখতে লাগলাম। অন্ধকারে যেটুকু ঝাপসা জ্যোৎস্না ফুটেছে তাতে তাকে অস্পষ্টই দেখাচ্ছিল। লোকটা দেখি টপাটপ গল্প বলে দিচ্ছে। হঠাৎ আমার মনে হল, রঙবাহার আর বেণুবীণা—কাগজ দুটো আলাদা হলেও ছাপা হয় একই প্রেসে। লোকটা নিশ্চয় ছাপাখানার লোক। ছাপাখানায় কাজ করে।

"আপনি কি প্রেসে কাজ করেন? কম্পোজিটার?" আমি বললাম।

"কম্পোজিটার—! কেন?"

"না, বলছিলাম—মানে ছাপাখানার কম্পোজিটার হলে তাকে সবই পড়তে হয়। আপনি পটাপট এত গল্পের কথা বলে যাচ্ছেন—।"

"চ্যাওড়ামি করছেন?" লোকটা খেঁকিয়ে উঠল। "কম্পোজিটার। আপনার সব ক'টা ভূতের গল্পের ভূতদের কথা আমি বলে দিতে পারি। বলব?" বলে লোকটা চুরুটে গোটা-পাঁচেক টান মারল। কাশল খকখক করে। তারপর বলল, "আপনার একটা ভূত ট্রাফিক পুলিশের কাজ করেছে লোয়ার সারকুলার রোডে, তার জন্য দুটো বাস মুখোমুখি ধাক্কা লাগিয়েছে। এরকম হয় না। ভূতরা মানুষের মতন অত বাজে ট্রাফিক পুলিশ হয় না। আপনি আর-একটা যা কাণ্ড করেছেন, লাশকাটা ঘরে একটা ভূতকে দিয়ে অনবরত হা-হা হি-হি করে হাসিয়েছেন, ভূতরা আপনাদের মতন হ্যা-হ্যা করে হাসে না, তারা দাঁত বার করে হাসতে শেখেনি। লাশকাটা ঘর দেখেছেন কখনও জন্মে? তার গন্ধ শুকেছেন! গল্পটা পড়ে আপনাকেই কাটতে ইচ্ছে করছিল।...আপনি অদ্ভুত লোক মশাই, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলোর মতন—যত রাজ্যের বাজে নোংরা কুচ্ছিত কাজ ভূতদের দিয়ে করিয়েছেন। যেন মানুষরা কত ভাল, তারা সব ভাল ভাল কাজ করে। বোলপুরের সেই গল্পটায় একটা বুড়ো ভূতকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে আপনি তেলেভাজা খাইয়েছেন আর নিজেরা খেয়েছেন ওমলেট। তার রেজাল্ট কেমন হয়েছিল মনে আছে তো? কলেরা হতে হতে বেঁচে গিয়েছেন!...আপনি খুবই বাজে লোক। ভূতকে দিয়ে সংস্কৃত বলিয়েছেন। পৃথিবীতে কোনও ভূতই দু'-তিনটে ভাষা বলতে পারে না। সংস্কৃত পারে না, পুস্তু পারে না, জার্মান পারে না। কেন পারে না জানেন না, আপনাকে জ্ঞান দেওয়া বৃথা। আপনি গবেট টাইপের। যাকগে, দুটো কথা বলতে এসেছি, বলে চলে যাই। দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

আমি চুপ। মুখে কথা আসছিল না।

লোকটা বলল, "শুনুন। যা বলছি তার অন্যথা করবেন না। খুন, পিস্তল, গুমখুন—এসব নিয়ে যত খুশি লিখুন, কেউ কিছু বলতে আসছে না। কিন্তু ভূত নিয়ে নয়। আপনারা বাঙালি লেখকরা ভূত নিয়ে তেলেভাজির গপ্প ফাঁদছেন, না-হয় হাসি-মশকরা করছেন। সাহেবরা এমন নোংরা কাজ করে না। তাদের ভূতরা ভদ্রলোক। দু'-চারটে হাই ক্লাসের ভূতের গপ্প মেরে লিখলেও তো পারেন! যত্ত সব...। আচ্ছা চলি, অনেক দুর যেতে হবে। তবে যা বললাম মনে রাখবেন। আর ভূতের গপ্প লিখবেন না। লিখলে এমন শিক্ষা পাবেন যে-নবাবের মতন পার্কে বসে বসে চুরুট ফুঁকতে হবে না।"

লোকটা উঠে দাঁড়াল।

তাড়াতাড়ি বললাম, "আপনার পরিচয়, স্যার?"

"পরিচয়! আমার পরিচয়, আমি ভূতদের রিপ্রেজেনটেটিভ। দূত বলতে পারেন। ওখানকার সেনসার অফিসের একজন জুনিয়ার অফিসার। সদ্য গিয়েছি। আরে মশাই, গত বছর মিলিটারিতে চাকরি পেয়েছিলাম। ফোর্ট উইলিয়ামে আমার পোস্টিং ছিল। মিলিটারি সেনসার অফিসে। এক হুদো আর্মি অফিসার আমায় তার ট্রাকে চাপা দিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চত্ব। ও-সাইডে যেতেই ওরা আমাকে ওদের সেনসার অফিসে কাজে বসিয়ে দিল।...যাকগে, চলি। আপনি ভূতদের মান-সম্মান ইজ্জত তো নষ্ট করেছেনই, তার ওপর বাচ্চা-কাচ্চারাও যে ভূতকে শ্রদ্ধার চোখে দেখবে—তারও বারোটা বাজিয়েছেন। আমায় বলা হয়েছিল—আপনাকে ওয়ার্নিং দিয়ে দিতে। সাবধান করে দিলাম আপনাকে। আচ্ছা চলি!"

লোকটা চলে গেল।

আমি হাঁ করে বসে থাকলাম।

সারদাচরণ তাঁর গল্প শেষ করলেন।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, "লোকটা কে?"

"জানি না বাপু! তবে ভূতের গল্প আর লিখিনি।"

"ভয়ে?"

"না না ভয়ে নয়। মনে হল, আমি ভূতের গল্প লিখলে লোকটার অন্ন মারা যাবে।" সারদাচরণ হেসে উঠলেন।

১১ আগস্ট ১৯৮২

অলংকরণ: সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

থ্যাংক ইউ, রায়বাবু

সুকুমার সেন

শীতকালের সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে। সেবারে কলকাতায় শীত মন্দ পড়েনি। আমাদের বাইরের ঘরে বসে আমার এক বাল্যবন্ধু ও এক নবীন ছাত্রবন্ধুর সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল। অন্তঃপুরে তখন চায়ের জোগাড়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

কথায় কথায় ভূতের গল্প এসে গেল। আমি বললুম, "কলকাতায় বর্ষায় ভূতের গল্প জমে না, তা জমে মফস্‌সলে, বিশেষ করে পাড়াগাঁয়ে। সেখানে বর্ষায় ছটফট করে বাইরে বেরুতে হয় না।"

নবীন ছাত্র আমার কথায় সায় দিলেন না।

আমি বললুম, "তারও কারণ আছে। এখানে বর্ষাধারার স্নিগ্ধ শান্ত মন্দমধুর ঝুপঝুপ একতান কই। এখানে না-আছে চারদিকে গাছপালা, না আছে আশেপাশে খোড়ো চালের ঘর। কলকাতায় বর্ষা নামলে বাইরের লোক নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে আড্ডা তো জমে না। উপরন্তু আকাশে মেঘ জমেছে দেখলেই আড্ডার সম্ভাবনা ভেস্তে যায়। সকলেই বাড়ি পালাবার জন্যে ব্যস্ত হয়। কলকাতায় এক পশলা জোর বৃষ্টি হলেই অমনি ট্রাম বাস বন্ধ। রিকশার ভাড়া চতুর্গুণ।"

আমার অভিযোগ এখন দু'জনে মেনে নিলেন।

ছাত্রবন্ধু বললেন, "শুনেছি আপনার নাকি অনেক ইন্টারেস্ট ভূতের গল্পে। একটা বলুন না নিজের অভিজ্ঞতা থেকে।"

আমি বললুম, "আমার তো ভূত দেখার কোনও স্পষ্ট অভিজ্ঞতা নেই। অস্পষ্ট অভিজ্ঞতা কিঞ্চিৎ আছে। তবে তা ঠিক গল্পের কৌতূহল মেটাবার মতো নয়।"

বাল্যবন্ধু বললেন, "কেন, তোমার সেই ডেলি প্যাসেঞ্জারের গল্পটা?"

আমি বললুম, "সেটা কি এঁর ভাল লাগবে? শুনতে শুনতে গায়ে কাঁটা না দিলে কি খাঁটি ভূতের গল্প হয়?"

ছাত্রবন্ধু বললেন, "বলুন, বলুন।"

"সে আমার প্রথম জীবনের ঘটনা। এম এ পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ করছি। দেশে থাকি। সেখান থেকে প্রায় রোজই কলকাতায় ডেলি প্যাসেঞ্জারি করি। দেশ আমাদের হুগলি জেলায় তেলাণ্ডু স্টেশন থেকে মাইলখানেক দূরে একটি গ্রামে। স্টেশন থেকে পাকা রাস্তা সোজা। দেশ থেকে যাওয়া-আসার কোনওরকম অসুবিধা ছিল না।"

এই কথা বলতে বলতে চা এসে গেল। চায়ের সঙ্গে টা ছিল ঘিয়ে-ভাজা, গোলমরিচের গুঁড়ো মেশানো চিঁড়ে ও কিছু বেগুনি। বাল্যবন্ধু বেগুনি স্পর্শ করলেন না। আমি ও নবীন ছাত্রবন্ধু কোনওটিই ছাড়লুম না। খেতে খেতে বলে চললুম কাহিনি।

"তখনকার লোক্যাল ট্রেনের রেক এখনকার মতো ছিল না। ছোট ছোট অনেক দরজা, তা বাইরের দিকে খোলে। ভিতরে তিন-তিনজন করে সামনাসামনি সিট। মাঝখান দিয়ে করিডরের ফাঁক চলে গিয়েছে দু'প্রান্তে দুটি ল্যাভেটরি পর্যন্ত।

"কিছুদিন গতায়াত করতে করতে বুঝে নিয়েছিলুম, ফেরবার সময় কোন কোন বোগিতে কলকাতার কাছের ও দূরের স্টেশনের দৈনিক যাত্রীরা ওঠে না। আমি [illegible] লাগলুম কলকাতার কাছের

যাত্রীদের বোগিতে। সহজে ভাব হয়ে গেল একটি প্রবীণ যাত্রীর সঙ্গে। নাম সুরেন রায়। ফেয়ারলি প্লেসে ইস্ট ইন্ডিয়া রেল কোম্পানির আপিসে কাজ করেন। পরিচ্ছন্ন পোশাক। কালো রঙের কোট-প্যান্টালুন পরিধান। চকচকে জুতো। অল্প কথা বলেন। মুখ যেন সর্বদা একটু বিষণ্ণ, অথচ ঠোঁটে হাসি লেগে আছে। আসবার সময়ও এঁর সঙ্গে দেখা হতে লাগল। ইনি আমার আগের কোনও স্টেশনে ওঠেন, ইঞ্জিনের কাছাকাছি বোগিতে। আমিও ইঞ্জিনের কাছাকাছি বোগিতে উঠতুম। দু'-এক মাসের মধ্যেই দেখা গেল যে, কলকাতা আসবার সময় তিনি তেলাণ্ডু স্টেশনে মুখ বাড়িয়ে আছেন আমার জন্যে। পাশে আমার জন্যে জায়গা রাখতেন। পরিচিত ডেলি প্যাসেঞ্জাররা সকলেই তাঁকে রায়বাবু বলে কিছু শ্রদ্ধা ও খাতির করেন।

"প্রথম সাক্ষাতের দিনই রায়বাবু আমাকে ভিড়ের মধ্যে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমাকে বসবার জন্যে নিজের সিট দিতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'ছেলেমানুষ, আপনার কষ্ট হবে। বসুন।' আমি বসিনি। বলেছিলুম, 'একটু পরেই সিট খালি হবে, তখন বসব। আপনি কষ্ট করবেন না।' বোধ হল আমার জবাবে তিনি খুশি হয়েছেন।

"দু'-চার দিনের মধ্যেই জানতে পারলুম যে, তিনি নামেন পাণ্ডুয়া স্টেশনে, আমার স্টেশনের এক স্টেশন পরে। এতে আমার ভারী সুবিধে হল। লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করে বেশি খাটুনি

হলে অথবা গরমের চোটে গাড়িতে ঘুমিয়ে পড়লে রায়বাবু আমাকে তেলাণ্ডু স্টেশনে গাড়ি থামবার আগে জাগিয়ে দিতেন। আমি একটু ঘুমিয়ে চাঙ্গা হয়ে বাড়ি পৌঁছুতুম। কোনও কোনওদিন তিনি আমাকে লেমনেড অথবা শসা অথবা কমলালেবু খাওয়াতেন। কথাবার্তা বিশেষ কিছু হত না। শুধু শ্রদ্ধা ও স্নেহপূর্ণ সান্নিধ্য ঘণ্টা দেড়-দুইয়ের মতো। তবে তাঁর কৌতূহল ছিল আমার গবেষণার বিষয়ে।

''আমার এক বন্ধু বড় আপিসে চাকরি করতেন। তাঁদের আপিসে ব্যবহারের জন্যে তখন বেশ জমকালো রকমের ক্যালেন্ডার ছাপা হত। আমার বন্ধু আমাকে সেই ক্যালেন্ডার দু'টি দিয়েছিলেন। তারই একটি আমি তাঁকে দিয়েছিলুম। ক্যালেন্ডারটি পেয়ে তিনি ভারী খুশি হয়েছিলেন।

''এইরকম করে দু'-তিন বছর কাটল। শেষের দিকে মনে হত রায়বাবু যেন দিন দিন বেশি বিষণ্ণ, কাতর হয়ে পড়ছেন। শরীর ভাল আছে কি না, কেউ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন, 'শরীর তো ভালই আছে। তবে পেনশনের সময় তো ঘনিয়ে আসছে।' বোঝা গেল যে, ডেলি প্যাসেঞ্জারি জীবনের অবসান সুরেন্দ্র রায় মহাশয়ের কাম্য নয়।

''কিছুদিন পরে লক্ষ করলুম যে, রায়বাবু ক'দিন তো আসছেন না। তার পরেই খবর পেলুম তাঁর দেহান্ত হয়েছে। মনটা দমে গেল। চিত্তে অপ্রসন্নতা জড়িয়ে রইল। কিন্তু যথারীতি আমার ডেলি প্যাসেঞ্জারি চলতে লাগল।

''একদিন হল কী, ব্যান্ডেল পেরোবার পর ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ যেন কে আমাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিলে। জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখলুম যে, তেলাণ্ডু স্টেশনে ট্রেন ঢুকছে। কে আমাকে ঠেলে তুলে দিলে? গাড়িতে কেউ নেই। তবে মনে হয়েছিল যেন আমার জেগে ওঠবার সঙ্গে-সঙ্গে এক প্যাসেঞ্জার ল্যাভেটরিতে ঢুকেছিল। কেননা সেইরকম ছিটকিনি বন্ধ-র 'খট' আওয়াজ কানে গিয়েছিল। আমি আর কোনওদিকে না চেয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়লুম। গাড়িও সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে গেল। বাড়ি এসে এ ব্যাপারে আমি আর মাথা ঘামাইনি। ল্যাভেটরির দরজা বন্ধ করবার শব্দ আমি স্পষ্ট পেয়েছিলুম। আর ব্যান্ডেল ছাড়বার সময় গাড়িতে দু'-একজন যাত্রী ছিল।

''আরও মাস কতক পরের কথা। আমি বাড়ির জন্যে বড়বাজারের ফলপটি থেকে কিছু ফলটল

ফিরলুম আমার কামরার দিকে। গাড়ি তখন ছেড়ে দিয়েছে। আমি প্ল্যাটফর্মের দিকে চাইতেই চোখ পড়ল পুঁটলিটির উপর। সেটি সযত্নে নামানো রয়েছে। আমি তা হাতে করে তুলে অপস্রিয়মাণ ট্রেনের দিকে চাইলুম। মনে হল আমার কামরার জানালা দিয়ে কালো কোট পরা একটি হাত আঙুল নাড়ছে। আমি পুঁটলিটি নামিয়ে রেখে সেদিকে হাতজোড় করে প্রণাম করলুম।

কিনেছি। গাড়িতে ভিড় থাকায় আমি পোঁটলাটি বেঞ্চির তলায় ঢুকিয়ে রেখেছি। সাধারণত আমি সঙ্গে কোনও মালপত্র নিই না, নিলেও তা এমন করে রাখি না, কোলেই রাখি। সেদিন ভিড়ে ফলফুলুরি চটকে যাবে বলে বেঞ্চির তলায় রেখেছিলুম। ভেবেছিলুম ভিড় কমে গেলেই পুঁটলিটি বেঞ্চির তলা থেকে তুলে চোখের সামনে বা হাতের কাছে রাখব। সেদিন ভিড়ের চাপে তা আর করা হয়নি। ঘুমিয়ে পড়িনি বটে, তবে ক্লান্তিতে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলুম। তেলাগু স্টেশন আসতেই আমি তড়াক করে নেমে পড়লুম। পুঁটলিটি হাতের কাছে কোলের কাছে না থাকায় সে সম্বন্ধে একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম।

"গাড়ি থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মের উলটো দিকে দু'-চার পা চলতেই মনে পড়ল পুঁটলির কথা। অমনি

"এই তো আমার কাহিনি। এক আপনারা কী বলেন?"

বাল্যবন্ধু চুপ করে রইলেন।

ছাত্রবন্ধু শুকনো মুখে বললেন, "অবিশ্বাস করি কী করে? তবে এরপর আর কিছু দেখেছেন?"

আমি বললুম, "না, কারণ তারপর থেকে আমি দূরগামী প্যাসেঞ্জারদের বোগিতে উঠতে লাগলুম। তার কারণ কী জানেন? ভয় নয়, ভক্তি। আমার তত্ত্বাবধানে বিদেহী সত্তাকে অযথা ক্লেশ থেকে মুক্তি দেবার বাসনাই আমার উদ্দেশ্য ছিল।"

ইতিমধ্যে আকাশ ধরে এসেছে। বন্ধু দু'জন স্তব্ধ ও শান্তভাবে বাড়িমুখো হলেন।

১৩৯০

অলংকরণ: অনুপ রায়

ভূতেদের মান-সম্মান

প্রচেত গুপ্ত

আমাদের এই ছোট্ট শহরে বহুদিন যাবৎ জনাকয়েক ভূত আর আমরা মানুষেরা মিলেমিশে বাস করেছিলাম। ওঁদের সঙ্গে আমাদের সুন্দর একটা বোঝাপড়া ছিল। ওঁরা শহরের উত্তরদিকের বনের ধারটায় থাকতেন। ভূতেদের 'ভৌতিক সংগঠন'-এর সঙ্গে আমাদের 'শহর-কমিটি'র যে চুক্তি হয়েছিল তাতে স্পষ্ট করে বলা ছিল, কোনওমতেই কেউ কাউকে জ্বালাতন করতে পারবে না। পিকনিক করতে যাওয়া ছাড়া আমরা সাধারণত বনের দিকটায় যেতাম না। ভূতেরাও শহরে এলে আমাদের মতো মানুষ সেজে আসতেন যাতে আমরা ভয়-টয় না পাই। তবু কতগুলো ভুল বোঝাবুঝির জন্যে ওঁরা অপমানিত হয়ে আমাদের শহর ছেড়ে চলে গেলেন।

অনেকদিন বাদে বিদেশ থেকে বউ ছেলে-মেয়ে নিয়ে মিত্তিরবাবুর বড় ছেলে হাবুলবাবু বাড়ি এলেন। একদিন মাঝরাতে হাবুলবাবুর ছোট মেয়ে টুমি ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ বায়না ধরল, ''বেড়াতে যাব।''

হাবুলবাবু টুমিকে বহু বোঝাবার চেষ্টা করে বললেন, ''এত রাতে বেড়াতে যায় না।'' কে কার কথা শোনে! টুমির কান্না থামে না। ধমক-ধামক দেওয়া হল। তাতেও কিছু হল না। শেষে হাবুলবাবু রেগে গিয়ে বললেন, ''বাইরে বেরোলেই কিন্তু ভূতে ধরবে।'' এই সময় দু'জন ভূত রাত্তিরের ভ্রমণ সেরে ওই পথ দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। তাঁরা গভীর মনোযোগের সঙ্গে মানুষ আর ভূতের সম্পর্ক আরও কত মধুর করা যায় এই বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। হাবুলবাবুর কথাটা ঠিক এই সময়েই তাঁদের কানে আসে। অত্যন্ত অপমানিত হয়ে তাঁরা তখুনি ঘটনাটা 'ভৌতিক-কমিটি'র কাছে রিপোর্ট করেন।

অপমানিত হবারই কথা। এ শহরের ভূতেরা কখনওই কাউকে ভয় দেখাননি, ধরা তো দূরের কথা। বহুদিন বিদেশে থাকার ফলে হাবুলবাবু বোধহয় এ কথাটা ভুলে গিয়েছিলেন। এইভাবেই ভূতেদের সঙ্গে আমাদের ভুল বোঝাবুঝির সূত্রপাত।

সেদিন এক বৃদ্ধ ভূতের খুবই রাবড়ি খাওয়ার শখ হয়েছিল। হাওয়া খেয়ে খেয়ে জিবের স্বাদটা যেন নষ্ট হয়ে গেছে। তিনি নাতিকে ডেকে দুটো শেরশাহের আমলের মুদ্রা দিয়ে বললেন, ''যা, শহর থেকে রাবড়ি নিয়ে আয়।''

হাফপ্যান্ট, জামা-টামা পরে, মানুষ সেজে নাতিভূত তো বিশু ময়রার দোকানে এসে হাজির। বিশু তাকে রাবড়ি দিয়ে পয়সা নিতে গিয়ে দেখে দুটো অদ্ভুত চাকতি দিয়েছে ছেলেটা। বিশু অত না বুঝে ভেবেছে অচল পয়সা চালাচ্ছে। সে রেগে কাঁই হয়ে নাতিভূতের কান ধরে এক থাপ্পড় লাগাল।

সেদিন ভূতেদের মধ্যে একেবারে হইহই পড়ে গেল। মানুষদের এই অপমান, এই অবিচার আর সহ্য হয় না। এরপরের ঘটনাটাই মারাত্মক। শহরে 'শহর-কমিটি'র ইলেকশন হবে। দুটো দল। দারুণ লড়াই। উত্তেজনা চরমে। মিটিং-মিছিলে সবসময়েই গমগম করছে শহর। যাঁরা ভোট দেবেন তাঁদের নামের তালিকা তৈরি হয়েছে। দু'পক্ষই বাড়ি-বাড়ি ঘুরে দেখে নিচ্ছে, ভোটার আছে কি না। প্রতিপক্ষ দল যাতে মিথ্যে নামে জাল ভোট দিতে না পারে,

তার জন্যে দু'দলই সতর্ক। ভোটের আগের দিন শহরে পোস্টার পড়ল: অমুক দলের ভুতুড়ে-ভোটার মানছি না, মানব না।

দু'-একজন অল্পবয়সী, উৎসাহী ভূত মানুষদের ভোট দেখতে এসেছিলেন। তাঁরা মোটেও জানতেন না যে জাল ভোটারদের 'ভুতুড়ে-ভোটার' বলে। তাঁরা ভাবলেন তাঁদের উদ্দেশেই বুঝি অমন লেখা হয়েছে। এতে তাঁরা রেগে গেলেন। সেইদিনই 'ভৌতিক-সংগঠন'-এর নেতৃত্বে সব ভূত আমাদের শহর ছেড়ে চলে গেলেন। যাবার আগে শুধু প্রতিশোধ হিসেবে হাবুলবাবুর মেয়ে টুমিকে একবার দাঁত খিঁচিয়ে ভয় দেখিয়ে গেলেন। বিশু ময়রার রাবড়িতে ঢেলে দিয়ে গেলেন জল। আর ভোট দেবার কাগজগুলোতে ইচ্ছেমতো ছাপ মেরে ফেলে দিয়ে গেলেন ভোটের বাক্সে।

২ নভেম্বর ১৯৮৩
অলংকরণ: দেবাশিস দেব

ভূতের পাতা

বাণী বসু

মাসিক 'গালগপ্পো' পত্রিকার সম্পাদক বীরেশচন্দ্র মুস্তাফিমশাই মহা বিপদে পড়েছেন। বিপদটা এবারের শারদীয় সংখ্যা নিয়ে। ভাল ভাল গল্প উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনি, ছড়া, কবিতা, কমিক্‌স, ধাঁধা সব জোগাড় হয়েছে। হয়নি শুধু ভূতের গল্প। তাবড় তাবড় ভূতের গল্পের লেখকরা সব ধানাইপানাই করছেন। লেখার ফরমাশ নিয়ে যেতেই হেঁহেঁ করে সব বলছেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়। আপনার কাগজে লিখব, সে তো আমার সৌভাগ্য বীরেশবাবু।" কিন্তু যেই বীরেশবাবু তাঁর ফরমাশের পরবর্তী অংশটি পেশ করছেন অর্থাৎ ভূতের গল্পের আবদারটি তুলে ধরছেন, অমনি কেউ-কেউ বেজায় অন্যমনস্ক হয়ে কান চুলকোতে থাকছেন, কেউ খামোখা চাকরকে ধমকাতে ধমকাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন, কেউ কেমন থতমত খেয়ে উদাস বোমভোলা মেরে যাচ্ছেন। জাঁদরেল লেখক কালীকিঙ্কর কয়াল তো ভ্যাঁ করে কেঁদেই ফেললেন। বীরেশবাবু অপ্রস্তুত হয়ে যেই বলেছেন, "আহা-হা-হা করেন কী? করেন কী? কাঁদেন কেন?" অমনি কয়ালমশাই ধুতির কোঁচাটি পকেট থেকে বার করে চোখ মুছতে মুছতে সেই যে বাড়ির ভেতরদিকে চলে গেলেন, আর এলেনই না। অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে ব্যাজার হয়ে বীরেশবাবু কালীকিঙ্করের ছোট নাতনিটিকে দেখতে পেয়ে অবশেষে বললেন, "দাদুকে বলে এসো তো খুকি, আমি এখনও বসে আছি। যাও তো লক্ষ্মীটি, ল্যাবেঞ্চুস দোব।" খুকি ভেতর থেকে ঘুরে এসে বলল, "তুমি আমার ন্যাবেঞ্চুসটা দিয়ে বাড়ি চলে যাও। দাদু এখনও কাঁদছে।" যা ব্বাবা! এরকম ভুতুড়ে কাণ্ড বীরেশ মুস্তাফি তাঁর সতেরো বছর সাত মাস সাড়ে সাতাশ দিনের সম্পাদক-জীবনে কখনও দেখেননি!

গত বছর শারদীয়া ফাঁদতে গিয়ে তাঁকে বিস্তর ঝামেলা পোয়াতে হয়েছিল। তেমন ভাল ভুতুড়ে গল্প মেলেনি। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই 'ভয়ঙ্কর গুপ্ত' ছদ্মনাম নিয়ে 'কঙ্কালের কারসাজি' নামে এক ভয়ানক রোমহর্ষক ভূতের গল্প লিখে ফেলেন। তা সেই গল্প বার করার পর তিনি নানারকম চিঠি পেতে থাকেন। দুটো চিঠি উদ্ধৃত করলেই মুস্তাফিমশাইয়ের মুশকিলটি সবাইকার বোধগম্য হবে। শ্যামবাজার থেকে লেখেন বামাচরণ দাঁ, রামগতি ভড় আর গোলগোবিন্দ ঢ্যাং। এইসব বুড়োরাও মাসিক 'গালগপ্পো'র নিয়মিত পাঠক। বলতে কী, এঁরাই হলেন গিয়ে আসল পাঠক। কারণ, ছোটদের এখন অনেক কাজ বেড়ে গেছে। সায়েন্স এগজিবিশনের মডেল তৈরি করো রে, রক্ষেকালী পুজোর শিকলি কাটো রে, বসে-আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করো রে! তারও ওপর আছে আবৃত্তির আসরে 'পঞ্চনদীর তীরে', গানের আসরে 'দারু... চিনি...র দেশে'। বিস্তর পড়াশোনার পর এতকিছু করে তারা আর 'গালগপ্পো' পড়ার সময় পায় না। যদি বা পায়, পড়ে না ঠিক, কপ করে গিলে ফেলে। সে নিয়ে আবার সম্পাদকমশাইকে চিঠি দিতে তাদের ভারী বয়েই গেছে।

তা সে যাই হোক, এই তিন বুড়ো খোকা তাঁদের

যৌথ চিঠিতে, "মহাশয়, আপনার কাগজটির নাম বদলাইয়া 'গুলগাপ্পা' রাখিলেই যথাযথ হইত। সারাজীবন অনেক কঙ্কাল চরাইয়াছি। কঙ্কাল চরাইয়া চরাইয়া আমরা নিজেরাই এখন কঙ্কালসার। দয়া করিয়া আমাদের আর কঙ্কাল দেখাইবেন না। সে ভয়ংকরই হউক, আর গুপ্তই হউক।"

দ্বিতীয় চিঠিটি ৭১ নং গ্রাহিকা সাত বছরের কুমারী ঝিমলির। ঝিমলি লেখে: "ছম্পাদককাকু, ছারদীয়া গালগপ্পো এত ভাল হয়েছে যে আর কী বলব! যেমনি ছবির রং, তেমনি পাতার গন্ধ। কিন্তু ছবচেয়ে ভাল 'কঙ্কালের কারছাজি' বলে হাছির গপ্পটা। পড়ে আমি আর দাদা দু'জনেই হেছে-হেছে খুন হয়ে গেছি। দু'জনেরই পেটে ব্যথা হয়ে গেছে।"

খুব ভাল চিঠি, সন্দেহ কী! উৎসাহিত হবারই কথা। কিন্তু লিখলেন ভূতের গল্প, আর হয়ে গেল হাসির গল্প? ছিল রুমাল, হয়ে গেল বেড়াল? যাব্বা!

কাজে-কাজেই কার্তিক যখন একমুখ আহ্লাদে হাসি হেসে ঘোষণা করল, ভূতের গল্পের একজন ভাল লেখক জোগাড় হয়েছে, তখন বীরেশবাবু খুশি না হয়ে করেন কী? নাকি প্রবাসী লেখক। ভোজপুরের দিকে নাকি ফাটিয়ে দিচ্ছে। একটি গল্প বাজারে ছাড়লেই বাজারটি মাত হবে। বলাবাহুল্য, এইসব ভাষা ও আশ্বাস কার্তিকেরই, যে কিনা বীরেশবাবুর সহকারী।

যথাসময়ে প্রবাসী লেখকটি বীরেশবাবুর টেবিলে হাজিরা দিলেন। দেখে তো বীরেশবাবুর চক্ষু চড়কগাছ। ভোজপুরি স্বাস্থ্য তো নয়, টোপাকুলের মতো চেহারা, গিলে-করা পাঞ্জাবি, মিহি করে কুঁচনো ধুতির ফুলকোঁচাটি দু' আঙুলে ধরা, গোল-গোল চশমা। নেমন্তন্ন খেতে এসেছে না মাসিক 'গালগপ্পো'র আপিসে এসেছে, বোঝা দায়। এরকম নাড়ুগোপাল চেহারা নিয়ে ভূতের গল্প হয়? ভূতের গল্পের লেখকের দাড়ি হবে খোঁচা-খোঁচা, চোখ হবে গর্তে-ঢোকা, গাল হবে তুবড়োনো, হাত শিরা-ওঠা, গলা কণ্ঠা-জাগা, কান লটপটে, নাক ঢুলঝুলো, পা ঠ্যাঙঠেঙে, গলা খনখনে। হাঁটবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, দেখবে লুকিয়ে-চুরিয়ে, হাসবে খ্যাক-খ্যাক করে, আর রেগে গেলে মস্ত একখানা কালো বেড়ালের মতো মুখ না ঘুরিয়ে, গোঁফ না ফুলিয়ে ফ্যাঁচ করে উঠবে।

নিরাশ হলেও বীরেশবাবু হাত বাড়িয়ে দিলেন। "কই, এনেছেন লেখা?" তাঁর এখন শিরে সংক্রান্তি কিনা! "বাঃ! নামখানা তো জব্বর দিয়েছেন মশাই! ভূতের পাতা। খেলার পাতা, মজার পাতা, তেমনি ভূতের পাতা? পাতায়-পাতায় ভূতের নেত্য, কী বলেন, অ্যাঁ?" বীরেশবাবুর মুখে মুচকি মুচকি হাসি উপচে উপচে পড়ে।

লেখকের মুখখানাও হাসিতে ভরে যায়। খাস কলকাতার পত্রিকা 'গালগপ্পো'র সম্পাদকের কাছে প্রথম রাউন্ডেই এমন হাততালি পেয়ে তিনি গদগদ।

কিন্তু পরক্ষণেই বীরেশবাবুর ভুরু কুঁচকে যায়। ঠোঁট টান-টান নাক খাড়া-খাড়া। "এ-হে-হে-হে, করেছেন কী মশাই? এ কী আরম্ভ? এক যে ছিল ভূত? এ কি রূপকথার গপ্পো পেয়েছেন না কি?" পাণ্ডুলিপিটা তিনি প্রায় ছুড়েই ফেলে দেন।

"কেন? কেন? কী হল তাতে?" ভূতের গল্পের লেখকের ফুলো মুখখানা ঝুলে পড়ে, "ক্ষতিটা কী?"

"আরে মশাই, দেখেই বুঝেছিলুম।" বীরেশবাবু হাত নেড়ে বলেন, "এরকম সুখী-শৌখিন লোক দিয়ে, আর যাই হোক, ভূতের গপ্পো হয় না। যান যান মশাই, আমার এখন বিস্তর কাজ, ঝামেলা বাড়াবেন না আর।"

মেজাজটা একেবারে তিরিক্ষি হয়ে গেছে বীরেশবাবুর।

লেখক বেচারা কাঁচুমাচু মুখ করে বলেন, "শেষ পর্যন্ত পড়েই দেখুন না দাদা গপ্পোখানা, অত করে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-টতা দিয়ে লিখলুম!"

বীরেশবাবু গম্ভীর চালে বলেন, "সাড়ে সতেরো বচ্ছর সম্পাদকি করছি, বুঝলেন? একটা ভাত টিপলেই বুঝতে পারি। এক যে ছিল ভূত? এ কি একখানা স্টাইল হল? ছোঃ। ভূতের গল্প লিখতে হয় বেশ জম্পেশ করে, বুঝলেন? যেমন..."
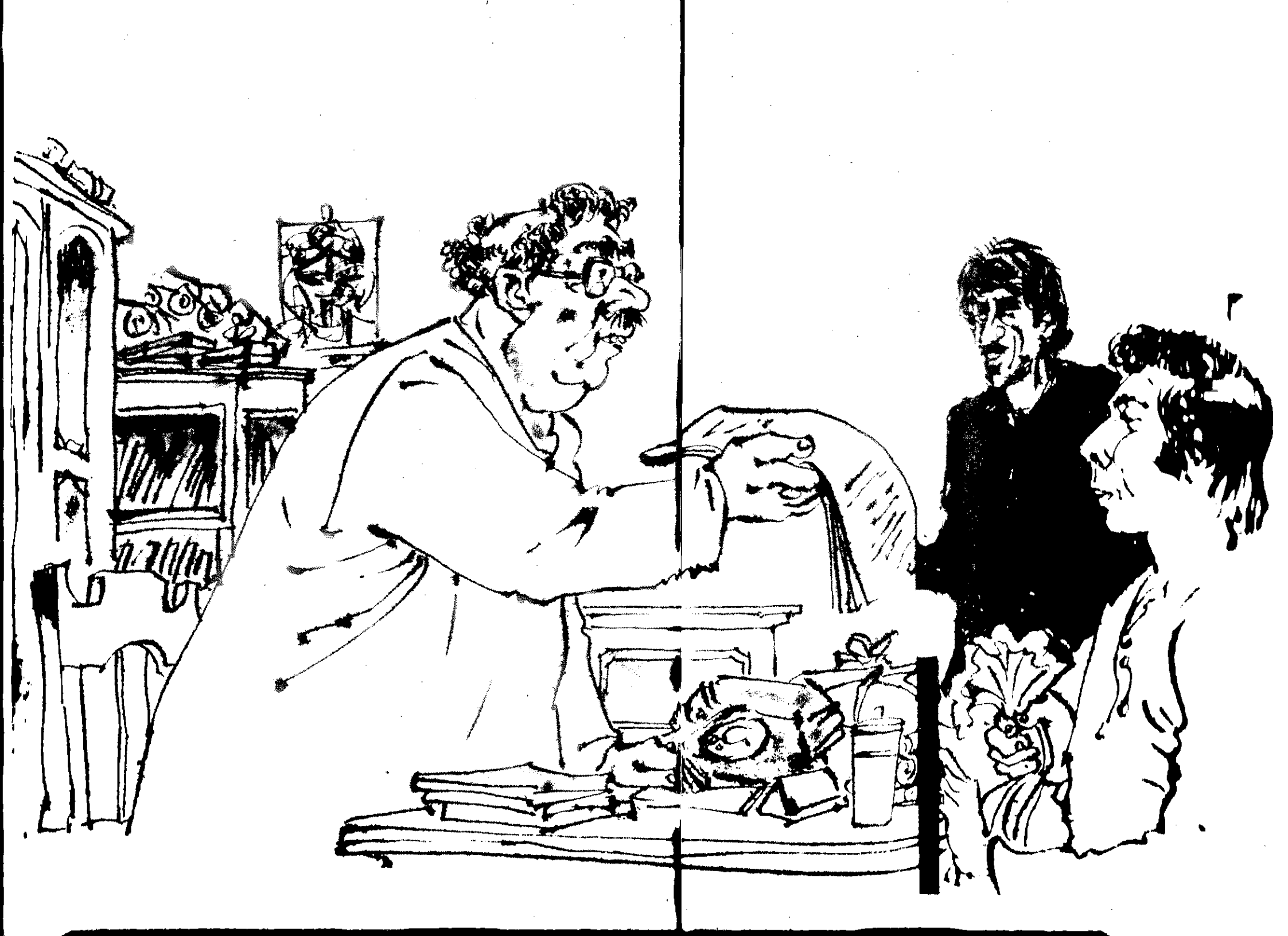
তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ফিচেল হেসে লেখক বললেন, ''যেমন 'ঘুটঘুটে অমাবস্যার রাত। ঝিরঝির করে বিষ্টি পড়ছে। থেকে থেকে বাজ পড়ছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কিন্তু বিদ্যুতের আলোয় সে-রাত্রির সীমাহীন অন্ধকার কিছুমাত্র দূরীভূত হচ্ছে না'...''

বীরেশবাবু লেখকের দুঃসাহস দেখে অবাক। কঙ্কালের কারসাজি থেকে উদ্ধৃত করছে, এত বড় আস্পর্দা! ''আপনি... আ-আ-আপনি...'' রাগে বীরেশবাবু তোতলাতে থাকেন। আর সেই ফাঁকে লেখকমশাই তাঁর ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে যান।

কার্তিককে অবিলম্বে ডেকে পাঠান বীরেশবাবু। ''কী হে কাত্তিক, বলি কোত্থেকে জোগাড় হল তোমার ভূতের গপ্পের লেখক? বন্ধুবান্ধব? না শ্যালক-ট্যালক?''

কার্তিক খুব লজ্জা পেয়ে যায়। ''আজ্ঞে না, মানে, মানে...''

''ঠিকঠাক বলো।'' হুমকি দেন বীরেশবাবু।

''মানে আমার বন্ধু সনাতনের বউদির বোনঝির ভাগনের পিসেমশাইয়ের জামাইবাবুর...''

''আচ্ছা আচ্ছা, খুব হয়েছে!'' বীরেশবাবুর রাগ পড়ে যায়, ''লেখাটা ফেলে গেছে দেখছি। ধাঁ করে ফেরত পাঠিয়ে দাও দেখি! এমন যেন আর কক্ষনও না হয়। নইলে তোমারই ঘাড়ে ভূত নাচাব, মনে থাকে যেন।''

তড়কে গিয়ে কার্তিক তৎক্ষণাৎ বীরেশবাবুর টেবিল থেকে ভো-কাট্টা হয়ে যায়।

যাই হোক, বীরেশবাবু বসে থাকলেও সময় তো আর ভূতের গল্পের জন্যে বসে থাকবে না। মাথার সামান্য ক'টি অবশিষ্ট চুল ছিঁড়ে-টিড়ে বীরেশবাবুও টাকটি মাথাজোড়া করে ফেললেন, আর শারদীয় গালগপ্পোও ছাপাখানায় যাবার সময় হয়ে এল। গল্প, উপন্যাস, কমিক্স, ছড়া, পদ্যে ঠাসা দপ্তরখানা গুছিয়ে নিয়ে দেখতে দেখতে বীরেশবাবু চমকে ওঠেন, ''কাত্তিক, কাত্তিক!''

''যাই আজ্ঞে স্যার।'' মাথা চুলকোতে চুলকোতে কার্তিক এসে দাঁড়ায়।

''সেই 'ভূতের পাতা' ফেরত দাওনি?''

''দিয়েছি বলেই তো মনে হচ্ছে স্যার!''

''উঁহু! তোমার সেই ভোজপুরি লেখকের পাণ্ডুলিপি আদপেই ভাগেনি। আমার শারদীয়-র দপ্তরে গোছা করে গোঁজা রয়েছে এখনও।''

বলতে বলতে কার্তিকের কাঁচুমাচু মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন সন্দেহ হয় বীরেশবাবুর। ইদানীং মাঝে মাঝেই ছোকরার হাবভাব খুব সন্দেহজনক মনে হচ্ছে তাঁর। সর্বদাই কেমন যেন চোর-চোর! উঁকিঝুঁকি! না ডাকতেই একপায়ে খাড়া একেবারে। এই দেখছেন বেরিয়ে যাচ্ছে, পরক্ষণেই টেবিলে হাজির।

''কে যেন হয় বলছিলে তোমার?''

''আজ্ঞে আমার বন্ধু সনাতনের বউদির বোনঝির ভাগনের পিসেমশাইয়ের জামাইবাবুর...''

''বলো, বলো, থামলে কেন? চালিয়ে যাও!''

''পিসেমশাইয়ের জামাইবাবুর আপন শালার শালার ছেলের মামির...''

''হুঁ। বুঝেছি। তুমিই ওটাকে গুঁজে রেখেছ দপ্তরে। এত আপনজন যখন! আত্মীয়-স্বজনের উপকার করার আর জায়গা পেলে না হে ছোকরা?'' রাগ করে বীরেশবাবু পাণ্ডুলিপিখানা কুচিকুচি করতে থাকেন। তারপর বাজে-কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেন। ''এক যে ছিল ভূত! হুঁঃ! ছিঃ! ছোঃ!'' কীভাবে যে ছিছিক্কার করবেন, বুঝে উঠতে পারছেন না তিনি!

যথাসময়ে শারদীয় 'গালগপ্পো' বেরিয়ে গেল। ভূতের গল্প ছাড়াই। কার্তিকই শেষটায় বোঝাল বীরেশবাবুকে। ''কানামামার চেয়ে নেই-মামাই কিন্তু আসলে ভাল স্যার। আপনি আর খুঁতখুঁত করবেন না। তা ছাড়া ভূতেরা সব অনেক-অনেকদিন মরে ভূত হয়ে গেছে। মরা-ঝরা তাদের টেনে-টেনে কাঁহাতক আর ভূতের গল্প লিখবেন লেখকরা? দু'-চার বছর না বেরোলেই ছেলেরা ভূতের কথা ভুলে মেরে দেবে এখন।''

তা কার্তিক তার সাধ্যমতো যতই সান্ত্বনা দিক, বাজারে পত্রিকাটি বার করে দিয়েই বীরেশবাবু আজ

একখানা চোদ্দো দিনের ছুটি নিয়ে ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জে ডুব মেরেছেন। কামস্কাটকা কিংবা কিলিমাঞ্জারোয় যেতে পারলে ভাল হত। ভারখোয়ানস্ক, কিংবা মাডাগাস্কার কিম্বা হোক্কাইডো হলে আরও ভাল। সেইরকম ইচ্ছে ছিল তাঁর। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জের মিসেস ম্যাকলাউড ছাড়া আর কোনও হোটেলওয়ালা-হোটেলওয়ালিকে চেনেন না তিনি। বিশ্বাস করে যাবেন কী করে তবে? কিন্তু ছুটির যেমন শুরু আছে, তেমনি আবার শেষও তো আছে? অতএব, দু' হপ্তা পরে বীরেশবাবুকে আবার ফেরত আসতেই হয়। যথাসময়ে চোরের মতো আপিসে ঢুকে নিজের টেবিল-পত্তর ঝাড়ছেন তিনি, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে তাঁর সহকারী কার্তিকের প্রবেশ। এটাই ভয় করছিলেন বীরেশচন্দ্র। বিক্রি হচ্ছে না! বিক্রি হবে না এ পত্রিকার! উলটেপালটে যেই দেখবে ভুতের গল্প নেই, অমনি আর কাগজ ছোঁবে না খোকাখুকুরা, বা তাদের দাদা দিদি মামা মামিরা, বা পিসি পিসে মামি খুড়িরা। ব্যাপারটা টের পেতে পেতে দোকানিদের হপ্তাখানেক বা বড়জোর দিন দশেক লাগবে। তারপর ঘরের ছেলে সব ঝাঁকে-ঝাঁকে ঘরে ফিরে আসতে থাকবে।

কার্তিক বলল, "সর্বনাশ হয়েছে স্যার!"

"সে তো আমি অনেক আগেই বুঝেছি কাত্তিক।" হতাশ মুখে বলেন বীরেশবাবু।

"না স্যার, বোঝেননি মোটেই। সাংঘাতিক সেল। আমাদের স্টকে যা ছিল সব শেষ, মায় আমার পার্সোন্যাল কপিখানা সুদ্ধু। আপনি ছিলেন না বলে অনুমতি ছাড়াই আরও দশ হাজার কপি ছাপতে দিয়েছিলুম। তাও শেষ। এখনও সব হুমড়ি খেয়ে আছে। বিদেশে যাচ্ছে নাকি। কিন্তু এদিকে বাজারে কাগজ শর্ট। কাগজ না পেলে স্যার এমন সুযোগটা মাঠে মারা যাবে।"

হতভম্ব হয়ে যান বীরেশবাবু। "বলো কী হে? তা গ্রাহকদের চিঠিপত্র কিছু এসেছে না কি? কী বলছে তারা?"

"ওসব দপ্তর আমি এখনও খুলতে সময় পাইনি স্যার, আপনি দেখুন।" বলে কার্তিকচন্দ্র চিঠির তাড়া বীরেশবাবুর সামনে ফেলে দেয়। চিঠিগুলো এক-

এক করে খুলতে থাকেন দু'জনে। 'চমৎকার!'... 'অপূর্ব!'... 'বাঃ!'... 'ওহো-হো-হো!' 'কী সাংঘাতিক!'... 'এমনটা হতে পারে চিন্তাও করতে পারিনি।' কয়েকটা চিঠি পড়ে বীরেশবাবু হতাশ হয়ে কার্তিকের দিকে তাকান। "কোনও বিশেষ লেখাটেখার কথা বলছে না তো হে?"

বীরেশবাবু নিজে ব্যাচিলর মানুষ। মেসে থাকেন। কার্তিকেরও ছেলেপুলে নেই যে, তাদের কাছ থেকে রহস্যের কোনও সূত্র পাওয়া যাবে। কেন এইসব খোকাখুকু হঠাৎ শারদীয় 'গালগপ্পো'র জন্যে এমন হন্যে হয়ে উঠল, দু'জনের কেউই তার হদিশ করতে পারেন না। আসল কথা, শারদীয় সংখ্যা বেরোবার পর কেউই আর সেটাকে উলটেপালটে দেখেননি। দেখেন না। ভেতরের গল্পগাছাগুলোর বানান ঠিক করতে করতে, অভিযান দেখতে দেখতে, ছোটদের অযুগ্যি জিনিস তাদের আনাচকানাচ থেকে ঝাড়াই-বাছাই করে ফেলতে ফেলতে সব কিছুই তাঁদের এতবার পড়া হয়ে যায় যে, কাগজ যখন বেরোয়, সম্পাদক, সহ-সম্পাদক দু'জনকারই তখন তার ছায়া দেখলেও বিরক্ত লাগে।

কার্তিককে সঙ্গে করে বীরেশ মুস্তাফি আনমনার মতো কলেজ স্ট্রিটের দিকে বেরোন। ডিপোতে-ডিপোতে খুঁজে পেতে যেখানে যত কাগজ লুকানো-ছুপানো ছিল, যত আরও পাওয়া সম্ভব ছিল, কতক নিয়ে, কতক অর্ডার দিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে ফিরছেন, অবাক হয়ে দেখেন, পথে আট-দশটি ছেলেমেয়ের একটা দঙ্গল চলছে। প্রত্যেকের দু'বগলে দুটো করে শারদীয় 'গালগপ্পো'।

"এই খোকা, এই খুকু! দাঁড়াও দেখি..." বীরেশবাবুরই প্রথম উপস্থিতবুদ্ধি খোলে, ট্যাক্সিটা দাঁড় করান হুট করে।

"আমাদের এখন সময় নেই মোটে। তাড়া আছে।"

"আহা, দাঁড়াওই না ভাই একটু। একটা বই দুটো করে কপি কিনে নিয়ে যাচ্ছ যে বড়?"

"**কিনবই** তো! আপনি পড়লে আপনিও কিনবেন। **কিনেই দেখুন না...**" **বলতে বলতে** ছেলেমেয়েগুলি রাস্তা পেরিয়ে ছুটতে ছুটতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আপিসে ফিরে আসেন বীরেশবাবু। টেবিলের ওপর কনুই রেখে কপালে হাত দিয়ে বসে থাকেন। কার্তিক প্রেসে গেছে। সে না ফেরা পর্যন্ত যেতে পারছেন না।

হঠাৎ খেয়াল হয়। শেষ চেহারাটা তো দেখাই হয়নি কাগজের। খুলে আবার ভাল করে পড়ে নিজেই দেখেন না কেন কোথায়, কোন লেখায় এমন মজা পেল তাঁর পাঠক-পাঠিকারা! শুধু খুদে নয়, বুড়োরাও তো খুব খুশি দেখা যাচ্ছে। বামাচরণ দাঁ, রামগতি ভড় আর গোলগোবিন্দ ঢ্যাঙের চিঠিও পেয়েছেন। 'শাবাশ, মুস্তাফিভায়া, এবারের কাগজে যা ম্যাজিক দেখিয়েছেন না, জবাব নেই!'

কার্তিকচন্দ্রও প্রেস থেকে ফিরে সেই প্রস্তাবই করে। পড়েই দেখা যাক না কাগজখানা। দু'জনে মিলে র‍্যাক থেকে বইখানা নামান। এই একখানাই পড়ে আছে মোট আপিসে। আর সব ফর্সা!

পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসে পাতা ওলটান দু'জনে। জুতোর বিজ্ঞাপন, আচারের বিজ্ঞাপন, কোনও জমিদারবাড়ির দুর্গাপ্রতিমার ছবি। চকচকে ঝকঝকে দিব্যি হয়েছে কাগজটি। অতঃপর পাতা ওলটাতেই দু'জনে থ। এদিক ওদিক দু'টি পৃষ্ঠা জুড়ে লাল কালো ছাই-ছাই অক্ষরে বড়-বড় করে ছাপা—'ভূতের পাতা'।

"এ কী হে কাত্তিক? সেই তেনার লেখাটি ভোগা দিয়ে এখানে কী করে সেঁধিয়ে গেল? অ্যাঁ?" সাংঘাতিক থতিয়ে যান বীরেশবাবু। "শিগগিরই ফোন করো তো দেখি প্রেসকে। এ কী জুয়াচুরি!" রাগে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকেন তিনি।

শশব্যস্ত হয়ে ফোন করে কার্তিক। এনকোয়ারির পর এনকোয়ারি।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। ও, হ্যাঁ। আপনাদের কাছ থেকেই এসেছিল তো! ...উঁহু, না অন্য কেউ তো দিয়ে যায়নি। ...নিশ্চয়, আপনাদের পরামর্শ মতোই তো..."

কার্তিক ফোন করছে আর বীরেশবাবু তাকে দেখছেন। দেখতে দেখতে দেখতে দেখতে

বীরেশবাবুর মাথার মধ্যে খুট করে কীসের সঙ্গে কী যেন একটা লেগে যায়, তিনি হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠতে থাকেন, আসল কথাটা বেমালুম ভুলে গিয়ে তিনি নিরীক্ষণ করে দেখতে থাকেন কার্তিকচন্দ্রকে। খোঁচা-খোঁচা দাড়ি! গর্তে-ঢোকা চোখ! তুবড়োনো গাল! শির-ওঠা হাত! কী আশ্চর্য! এতদিন খেয়াল করে দেখেননি তো, ভূতের গল্পের এমন মার্কামারা লেখক তাঁর এমন হাতের কাছে! কোনও সন্দেহ নেই, ওরই কীর্তি এটা। কিন্তু এত কারচুপি করার দরকারটা ছিল কী ওর? গল্পটা বাজে, তাই? লজ্জা? তাই একটা বন্ধুকে ভোজপুরি সাজিয়ে তাঁর কাছে ভজিয়ে দিয়ে গেছিল? তা যাক। এ ছেলেকে দিয়ে বর্তমানে না হোক, ভবিষ্যতে ভূতের গপ্পো হবে। হতেই হবে। বীরেশচন্দ্র নিশ্চিন্ত মনে এবার পড়তে শুরু করেন:

"এক যে ছিল ভূত।" সেই অভূতপূর্ব, অনবদ্য ভূমিকা, "ভূতের নাম..." এ কী? এ কী এ? অক্ষরগুলো এরকম ঝাপসা মেরে যাচ্ছে কেন হঠাৎ? আলোটা ঝিমিয়ে যাচ্ছে যে? পাওয়ার কাট?... ফেজ গেল? হঠাৎ দুম ফটাস করে একটা বোমা ফাটার মতো আওয়াজ হল। ঘরের দুটো বাল্ব একসঙ্গে ফেটে গেছে। ব্র্যাকেট থেকে খসে ঝনঝন করে মেঝেয় ভেঙে পড়ল টিউবলাইটটা। ঘরের একটিমাত্র জানলা দিয়ে হু-হু করে কনকনে একটা খোড়ো হাওয়া ঢুকে পড়ে দমাস করে বন্ধ করে দিল দরজাটা। খটাস দুম দড়াম করে সব হুড়কো পড়ে গেল। আবছায়ার মধ্যে বীরেশবাবু দেখলেন টেবিলের অপর প্রান্তে সেই লেখক এসে দাঁড়িয়েছেন। ধুতি, পাঞ্জাবি, চশমা, কোনও ভুল নেই।

হাতের ওপর বইখানা ক্রমশই অস্বাভাবিক ঠান্ডা আর ভারী হয়ে উঠছে। শুকনো মুখে ঢোক গিলে বীরেশবাবু কাঁপা গলায় চেঁচালেন, "কাত্তিক, অ কাত্তিক!"

অমনি ভোজপুরি লেখক ঠিক গেঞ্জি খোলার মতো চড়চড় করে তার শরীরের ওপরের চামড়াখানা খুলে নিল। তারপর শূন্যে হাত বাড়িয়ে একখানা কালচেমতো চামড়া নতুন গেঞ্জি পরার মতো মাথা গলিয়ে পরে, অবিকল কার্তিকটি হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে খলখল করে হাসতে লাগল। হাসে আর শারদীয়-র পাতাগুলো সে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে ঘরময় উড়িয়ে দেয়। ঘরের রাক্ষুসে ঘূর্ণি হাওয়ায় পাতাগুলো পড়ে আর হুসহাস করে বেমালুম উবে যায়। পাতাগুলো উবে যায়, আর বীরেশবাবুও একটু একটু করে জ্ঞান হারাতে থাকেন।

৬ আগস্ট ১৯৮৬
অলংকরণ: সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
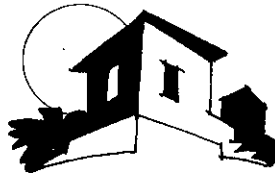
বালিডাঙার মাঠ

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

মির্জানগরের মাঠ পেরিয়ে কানানদী পার হয়ে কিছু পথ গেলেই ডানদিকে যে পুকুরটা পড়বে সেই পুকুরকে এ অঞ্চলের লোক এড়িয়ে চলে। কেননা, ভয়ংকর পুকুর সেটা। সুরুকখানার পুকুর। পুকুরের চারপাশে ঘন বাঁশবন। গভীর কালো জল। পুকুর-ভর্তি মাছ, কিন্তু ধরে না কেউ। এমনও প্রবাদ আছে, এই পুকুর থেকে নাকি মাছরাঙায় মাছ নেয় না। সাপেও ব্যাঙ ধরে না। অথচ মেছো পুকুর। আদিবাসী সম্প্রদায়ের কিছু লোক বা যাযাবর বেদেনিরা দু'-একবার চেষ্টা করেছিল এই পুকুরের পাশে বসবাস করে এর বদনাম ঘোচাতে। কিন্তু পারেনি। একরাত যে থেকেছে, সেই বলেছে 'বাপরে বাপ'।

তা এই পুকুরকে নিয়ে কিন্তু আজকের এই গল্প নয়। বর্ধমানের মুছখানা মথুরাপুর থেকে হরিহর যাচ্ছিল ওর বোনের বাড়ি। অনেকদিন কোনও খবরাখবর না পেয়ে মনে মনে খুব উৎকণ্ঠিত হয়েছিল। এমন সময় হঠাৎই একজনের মুখে শুনতে পেল ওর বোনের নাকি খুব অসুখ। তাই আর একটুও দেরি না করে সে গামছায় দু'টি মুড়ি বেঁধে রওনা হল বোনের বাড়ির দিকে।

হরিহর যে-পথে যাচ্ছিল সেই পথেই এই সুরুকখানা এবং বালিডাঙার মাঠ। তা এই দুটো জায়গাই ছিল খুব খারাপ। এখন বালিডাঙার মাঠ পার হতে পারলে খুব তাড়াতাড়ি ওর বোনের বাড়ি পৌঁছনো যায়। আর এই মাঠকে ত্যাগ করলে বা অন্য পথে ঘুরে গেলে তিন-চার মাইল পথ হাঁটা তো বেশিই হয় উপরন্তু বোনের বাড়ি পৌঁছতে রাতও হয়ে যায় খুব। তাই হরিহর মনের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া করে জেনেশুনেই এই বালিডাঙার মাঠে নামল।

ভূতের উপদ্রবের জন্য এ মাঠে চাষও হয় না বলতে গেলে। আর লোকজনও থাকে না। হরিহর মাঠে নেমে দেখল, ধুধু করছে মাঠ। দিগন্তবিস্তৃত। চৈত্রের রোদ্দুরে লি-লি করছে যেন। এই দিনের আলোয় তাই ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। একবার জয়দুর্গা বলে কোনওরকমে মাঠটা পার হতে পারলেই নিশ্চিন্দি। রাতভিত হলে অবশ্য অন্য কথা ছিল। এখন এখানে ভয় কী? ভূতেরা আর যাই করুক দিনের বেলায় তো ভয় দেখাবে না। আর সত্যিই যদি ভয় দেখায় তো ভূত কী জিনিস তা স্বচক্ষে দেখাই যাবে। কেননা, ভূত আছে শুনেছে। অন্ধকারে পুকুরপাড়ে বনে-বাদাড়ে ভূতের ভয়ে গা ছম-ছম করে তাও জানে। কিন্তু ভূত ও নিজে কখনও দেখেনি, বা কেউ দেখেছে বলে শোনেনি। তা এই বালিডাঙার মাঠে এসে সত্যি-সত্যিই যদি ভূত দেখা যায় তো মন্দ কী?

হরিহর আপন মনেই এগিয়ে চলেছে। তা ছাড়া সত্যি বলতে কী, মনটাও ওর ভাল নেই। বহু কষ্ট করে বোনটার বিয়ে দিয়েছে ও। অথচ এই এক বছরের মধ্যে ওর এমন একটা অসুখের কথা শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। তাই স্বাভাবিকের চেয়েও একটু দ্রুত পা চালিয়ে সে মাঠের ওপর দিয়ে পথ চলতে লাগল।

বেশ খানিকটা গেছে এমন সময় হঠাৎই মনে হল কে যেন ওর পেছন পেছন আসছে। হরিহর একবার তাকিয়ে দেখল। কই, কেউ তো নেই। আবার চলা শুরু করল। আবার ওই একইরকম মনে হল। ভারী মজার ব্যাপার তো!

এমন সময় হঠাৎ ওর সামনে কে যেন একজন পথ রোধ করে দাঁড়াল। দেখল কাস্তে হাতে এক কৃষাণ। মাথায় গামছার ফেট্টি বাঁধা। কৃষাণটি গম্ভীর গলায় বলল, ‘‘ওহে ও ছোকরা, বলি এই ভরদুপুরে বালিডাঙার মাঠ পার হয়ে যাচ্ছ কোথায়?’’

হরিহর বলল, ‘‘আমার বোনের খুব অসুখ। তাই দেখতে যাচ্ছি।’’

‘‘কেন, আর কোনও পথ ছিল না?’’

‘‘সে-পথে গেলে রাত্রি হয়ে যাবে, তাই এই পথে যাচ্ছি। খুব বাড়াবাড়ি অসুখ কিনা।’’

‘‘বাড়াবাড়ি না ছাই। বুকে সর্দি বসে জ্বর হয়েছিল। এখন সেরে গেছে। ভালই আছে এখন। তুমি আর এগিয়ো না। যেমন এসেছ তেমনই ফিরে যাও। হয় ঘুরে যাও, নয়তো ঘরে যাও।’’

‘‘তা কী করে হয় ভাই?’’

‘‘যা বলছি শোনো। আর এগিয়ো না। আমাদের সভা চলছে এখন। গেলে অসুবিধে হবে। তোমার বোনের বাড়ির খবর ভাল।’’

হরিহর বলল, ‘‘খবর ভাল হোক মন্দ হোক এত পথ কষ্ট করে এসেছি যখন ফিরে তো যাব না। আবার কাল কে আসে? যা হয় হবে। আমি যাবই।’’

কৃষাণ বলল, ‘‘আমার কথা তা হলে শুনবে না তুমি?’’

হরিহর ওর কথার উত্তর না দিয়েই এগিয়ে চলল। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পরই হঠাৎ ওর শরীরে কীরকম একটা শিহরন খেলে গেল। ও দেখল একটা প্রাচীন বটগাছের নীচে কতকগুলো কায়াহীন ছায়া গোল হয়ে বসে আছে। আর তাদের মাঝখানে বসে আছে গলায় হাড়ের মালা পরা আর-এক ছায়ামূর্তি। এই কি তবে ভুতের রাজা? আর এরা সবাই ভূত? ভূত ছাড়া এরা আর কীই-বা হতে পারে? কারও কোনও শরীর নেই। শুধু ছায়াগুলো রয়েছে।

হরিহর যেতেই ওদের সভার কাজ থেমে গেল। সবাই চুপচাপ।

ভূতের রাজা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে হরিহরের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘‘কে তুই! এমন আচমকা এসে পড়ে আমাদের সভার কাজ পণ্ড করলি কেন?’’

হরিহর দারুণ ভয় পেয়ে বলল, ‘‘আজ্ঞে, আমি নিরুপায় হয়ে এই পথে এসে পড়েছি। তা ছাড়া আমি তো আপনাদের কোনও ক্ষতি করিনি। আমি তো এপাশ দিয়ে যাচ্ছি।’’

‘‘আমার কোনও লোক তোকে এ পথে আসতে বারণ করেনি?’’

‘‘করেছিল। তবে সে যে আপনার লোক তা অবশ্য আমি জানতাম না।’’

‘‘সে আমারই লোক।’’

ভূতের রাজা হরিহরকে আর কিছু বলল না, শুধু হাত নেড়ে দলের লোকেদের চলে যেতে বলে সবাই মিলিয়ে গেল। সেইদিন দুপুরে ঝাঁঝাঁ রোদ্দুরে একটু ঠান্ডা হাওয়া বইল শুধু। হরিহর বুঝল কাজটা সে সত্যিই ভাল করেনি।

হরিহরের একবার ভয় হল। আবার ভয়কে জয়ও করল সে। জীবনে এই প্রথম ভূত দেখল ও। তাও দিনদুপুরে। এ গল্প ও করবে কার কাছে? যাকে বলতে যাবে সেই তো হাসবে। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করুক আর না করুক হরিহর নিজে তো করেছে। হ্যাঁ, ভূত আছে। সত্যিই আছে। এবং সে ভূত জনশ্রুতির নয়, বাস্তবের। কেননা, সে নিজের চোখে ভূত দেখেছে।

যাই হোক, সন্ধের আগেই সে বোনের বাড়িতে পৌঁছল। হরিহরের মুখে সব কথা শুনে ওর বোনের শ্বশুর এবং অন্যান্য লোকেরা সবাই খুব বকাবকি করল ওকে। সবাই বলল, ‘‘কাজটা খুব ভাল করোনি হরিহর। যে-পথে কেউ আসে না সে-পথে এই ভরদুপুরে কেন তুমি এলে? তাও এলেই যখন ওই কৃষাণের নিষেধ তুমি উপেক্ষা করলে কেন? এখন যদি তুমি ওদের কোপ-দৃষ্টিতে পড়ো তোমাকে রক্ষা করবে কে?’’

হরিহরের বোন বলল, ‘‘তা ছাড়া আমার সত্যি-সত্যিই কোনও ভারী অসুখ হয়নি দাদা। সামান্য

একটু জ্বরই হয়েছিল। বুকে সর্দি বসে জ্বর। কয়েকটা ইনজেকশন নিতেই সেরে গেছে। এদিকে অনেকদিন তুমি আসোনি বলে তোমার কোনও খবর-টবর না পেয়ে মনে দুঃখ হয়েছিল খুব। দারুণ অভিমান হয়েছিল। তাই আমাদের গ্রামের একজন লোক তোমাদের ওদিকে গেলে যাওয়ার সময় জিজ্ঞেস করেছিল, 'বউমা, তোমার বাপের বাড়িতে কোনও খবর দিতে হবে?' তা আমি বলেছিলাম, 'না। কোনও খবরই দিতে হবে না। তবে দাদার সঙ্গে যদি দেখা হয়, কিছু যদি জিজ্ঞেস করে তখন বোলো যে, তোমার বোন মরতে বসেছে।' তুমি সেই কথা শুনেই ছুটে এসেছ দাদা। কিন্তু এটা তুমি কী করলে?''

যা হওয়ার তা হয়েই গেছে। কাজেই আর ভেবে-চিন্তে কোনও লাভ নেই। এখন ভালয়-ভালয় ও-পথ ত্যাগ করে অন্য পথে বাড়ি ফিরতে পারলেই হয়। কিন্তু বাড়ি ফেরার আগে সেই রাতেই হরিহর দু'-একবার রক্তবমি করে অসুস্থ হয়ে পড়ল। শুধু কি রক্ত-বমি? সেইসঙ্গে প্রবল জ্বর আর ভুল বকা।

পরদিন সকালেই হরিহরের ইচ্ছেমতো ওর বোনের বাড়ির লোকেরা হরিহরকে গোরুর গাড়িতে শুইয়ে দেশে পাঠিয়ে দিল।

বালিডাঙা থেকে অত শরীর খারাপ নিয়ে মথুরাপুরে ফিরে এল বটে হরিহর, তবে কিনা কাজের কাজ কিছুই হল না। যতদিন যেতে লাগল ততই স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে লাগল ওর। বহু ডাক্তার বদ্যি ওঝা পত্তর করল। কিন্তু না। কিছুতেই কিছু হল না। হাজার রকমের তুকতাক, জলপড়া, ঝাড়ফুঁক সবই বৃথা হল।

অবশেষে এক সত্যিকারের গুনিনের সন্ধান পেল ওর বাড়ির লোকেরা।

গুনিনকে সন্তুষ্ট করে ডেকে আনতেই সব দেখেশুনে গুনিন বললেন, ''হ্যাঁ। আমি পারব এ ভূত ছাড়াতে। এ বড় জাঁদরেল ভূত। খুব রেগে গিয়ে ধরে আছে ওকে।''

তা গুনিনের ঝাড়ফুঁকে সত্যিই কাজ হল। দু'-চারবার সরষে চোঁয়া ছুড়ে মারতেই আর প্যাকাটির ধুঁ দিতেই ''বাবা রে, মা রে'' করে ভূত হরিহরকে ছেড়ে পালাতে পথ পেল না।

কিন্তু মুশকিল হল এই, গুনিন আসেন, ঝাড়ফুঁক করেন, ভূতও পালায়। কিন্তু যেই গুনিন বাড়ি ফেরেন ভূত এসে আবার ধরে।

বারবার যখন এইরকম হতে থাকে রোগীর বাড়ির লোকেরা তখন আবার ধরে গুনিনকে। বলে, ''বাঁচান মশাই। মরে গেলুম। আর তো পারি না। আপনি গেলে রোগী সুস্থ হয়। আর আপনি খালপার হলেই আবার ধরে রোগীকে।''

তা সেদিন গুনিন নিবারণ হালদারমশাই খুবই রেগে বললেন, ''আজই তা হলে ও ব্যাটার শেষদিন হোক। ওর জন্য আমার কেন বদনাম হয়? তা ঠিক আছে, তোমরা যাও। আজ গিয়ে আমি এমন ওষুধ দেব যে, আর ওর ধারেকাছে কোনও ভূত কখনও আসতে সাহস করবে না। ও ভূত তো কোন ছার।'' এই বলে হালদারমশাই তাঁর শেষ দাওয়াই ব্রহ্মকবচ হাতে নিয়ে রওনা হলেন রোগীর বাড়ির দিকে।

গ্রামসুদ্ধু লোক গুনিনের কেরামতি দেখবার জন্য হাঁ করে বসে ছিল। গুনিন যেতেই হইহই করে উঠল সকলে।

হালদারমশাই বললেন, ''না, আজ আর আমি কোনওরকম ঝাড়ফুঁক করব না। একটা রক্ষাকবচ পরিয়ে দেব শুধু। তারপর দেখব কোন ভূতে কী করে ওকে ধরে!''

গুনিনকে দেখেই ভূত পালাল।

সুস্থ লোকটির গলায় কবচ বেঁধে গুনিন বললেন, ''এই তোমার রক্ষাকবচ বাবা। খুব যত্নে রেখো এটা। অন্তত বছরখানেক। আর তোমাকে ভূতে ধরবে না।''

হরিহর হালদারমশাইকে প্রণাম করল। এবং সত্যি-সত্যিই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সে। অর্থাৎ, সেদিন গুনিন চলে যাওয়ার পরেও আর তাকে কোনও ভূতেই ধরল না।

এই ব্যাপারে ওঝা হিসেবে নিবারণ হালদারের ধনা-ধন্য পড়ে গেল চারদিকে। পড়বে নাই-বা কেন?

[illegible]
[illegible] দেখেছে। ওইরকম একটা ব্যাটা ভূতকে জব্দ করা কি চাট্টিখানি কথা? হালদারমশাইও তাই বিজয়গর্বে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন চারদিকে।

পরদিন সন্ধেবেলা ফাঁকা মাঠে একা পেয়ে ভূতেরা এসে ধরল হালদারমশাইকে। বলল, "হালদার, তুই মস্ত গুনিন। গুনিনের সেরা গুনিন। কিন্তু আমাদের পেছনে লেগে তুই খুব একটা ভাল করলি না। এখনও বলছি আমাদের শিকার আমাদের হাতে তুলে দে।"

হালদার বললেন, "থাম ব্যাটারা। আমি নিবারণ হালদার। আমার সঙ্গে লাগতে আসিস না। আর ওকে তোদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তা হলে এই যে দেশময় ধন্যি-ধন্যি পড়ে গেছে আমার নামে, সব তা হলে বৃথা হয়ে যাবে। তোরা অন্য কাউকে ধর। আমি তাকে ছাড়ব না।"

"হরিহর আমাদের শিকার। আমরা খুব রেগে আছি ওর ওপর। কাজেই ওকে ছাড়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।"

"তাতে আমার কী? হরিহরকে ভাল করে আমার দেশজোড়া খ্যাতি। এ সুনাম আমিও হারাতে চাই না।"

ভূতেরা বলল, "আমাদের কথা তুই শুনবি না তা হলে?

"না।"

"ঠিক আছে। আমরাও এর বদলা নেব। তোর একটি মাত্র ছেলে তো? আনাচে-কানাচে যেখানে-সেখানে ঘোরে। আমরা তার গলা টিপে মারব। তবে তোকে আমরা আর একবার ভেবে দেখার সময় দিলাম।"

"তোদের যা ইচ্ছা কর।"

"তা তো করব। কিন্তু এখনও বলছি হালদার, ওই কবচ তুই খুলে নিয়ে আয়।"

"সম্ভব নয়।"

"তা হলে ধরলাম তোর ছেলেকে। তোর ছেলে এখন পুকুরপাড়ে ওর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে। ধরলাম ওকে। এখনই বেশি ক্ষতি করব না। তবে ঘাড়টা একটু ব্যথা করে দেব।" বলে একটু নীরবতার পর আবার বলল, "তোর ছেলের মুখ দিয়ে এখন রক্ত উঠছে হালদার। তাড়াতাড়ি যা। তবে তুই যাওয়ার আগেই আমরা ওকে ছেড়ে দেব।" এই কথা বলেই ভূতেরা বেপাত্তা।

আর নিবারণ হালদারও দারুণ ভয় পেয়ে ছুটলেন সেই পুকুরপাড়ে তাঁর ছেলের কাছে।

ওই তো। ওই তো তাঁর ছেলেকে ঘিরে সবাই কেমন গোল হয়ে বসে আছে। তবে কি সত্যিই ভূতেরা ধরল ওকে?

হালদারমশাই গিয়ে ঝাড়ফুঁক করে জল-পড়া দিয়ে ছেলেকে ঘরে আনলেন। ছেলের তখন প্রবল জ্বর। অনবরত ভুল বকছে। শুধু বলছে, "ও বাবা গো! কী বড় বড় চোখ! ও বাবা গো! আমাকে কামড়াতে আসছে। আমি মরে যাব বাবা গো। ওই দেখো, আমার কাঠ সাজাচ্ছে।"

হালদারমশাই দেখলেন গতিক সুবিধের নয়। তাঁর যতরকম বিদ্যে জানা ছিল প্রয়োগ করে ছেলেকে তিনি সুস্থ করবার চেষ্টা করলেন। অবশেষে অনেক চেষ্টার পর একটু সুস্থ হল ছেলেটি।

পরদিন সন্ধেবেলা ভূতেরা আবার হালদারমশাইকে বলল, "কী গুনিন, দেখলি তো আমাদের মহিমা? আমরা যা বলি তা করি। এখনও সময় আছে কিন্তু। তোর ছেলেকে শুধু ধরেই একটু মোচড় দিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। এবার কিন্তু জানে মেরে দেব। ভেবে দেখ কী করবি? তোর কাছে খ্যাতি বড় না ছেলে বড়? ভেবে দেখ, তোর কিন্তু ওই একটিমাত্র ছেলে।"

হালদার বললেন, "আমার কাছে খ্যাতিই বড়। ছেলে নয়।"

"ঠিক আছে। হরিহরের বদলাটা তোর ছেলেকে দিয়েই নিতে হবে দেখছি। তবে আর একবার সুযোগ তোকে দেব।"

হালদার চিন্তান্বিত হয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। চিন্তার কারণ আছে বই কী। হতচ্ছাড়া ভূতগুলো আগে যদি কিছু বলত তখন না হয় চিন্তা করে দেখা যেত। কিন্তু এখন নিজের হাতে লোকের গলায় কবচ বেঁধে সেই কবচ খুলে আনবে কী করে? এদিকে ওদের যত রাগ

এখন ছেলেটার ওপর পড়েছে। হালদারমশাইয়ের সবকিছু কেমন যেন গোলমাল হয়ে যেতে লাগল।

বাড়ি ফিরতেই হালদারমশাইয়ের স্ত্রী তো কেঁদেকেটে হালদারের পা দু'টি জড়িয়ে ধরলেন।

হালদার বললেন, "কী ব্যাপার! হল কী তোমার? কাঁদছ কেন?"

"তার আগে বলো, তোমার কি সত্যি-সত্যিই মতিচ্ছন্ন হয়েছে?"

"তার মানে?"

"তার মানে তুমি ভালরকমই জানো।"

"আরে! কী হল বলবে তো?"

"কী হল তুমি জানো না? এই তো একটু আগে পুকুরঘাটে আমাকে দেখা দিয়ে ওরা বলে গেল তুমি নাকি ওদের কথায় রাজি হচ্ছ না? ওরা বলছে, এখনও সময় আছে, হালদারমশাইকে একটু বুঝিয়ে বলো যেন ওই কবচটা কালই গিয়ে খুলে নিয়ে আসে। ওরা এ কথাও বলেছে, আমরা সচরাচর কারও ক্ষতি করি না। ওই লোকটাকে বারণ করা সত্ত্বেও আমাদের জরুরি মিটিং-এর দিন জোর করে ওই মাঠে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, ওরা বারবার বলেছে তুমি ওঝাগিরি করছ বলে ওদের কোনও রাগ নেই তোমার ওপর কিন্তু ওদের কথা তুমি যদি না শোনো, যদি তুমি ওদের মুখের গ্রাস ফিরিয়ে না দাও তা হলে তোমার ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই ওরা তোমার ছেলেকে মারবে। আমাকে মারবে। এখন বলো তোমার এত দরদ কেন ওদের ওপর? কীসের এত জেদ তোমার? শুধু তোমার গোঁয়ারতুমির জন্যই না ওরা আমার ছেলেটার মুখ দিয়ে শুধু শুধু রক্ত ওঠাল। সব জেনেশুনেও চুপ করে আছ তুমি? তুমি বাপ না পিশাচ?"

হালদারমশাই এবার রীতিমতো ভয় পেয়ে বললেন, "ওরা বুঝি এইসব কথা বলেছে তোমাকে?"

"না বললে জানলাম কী করে বলো?"

"কিন্তু মুশকিল হয়েছে কী জানো, আমি ওই কবচ কী করে খুলে আনব?"

"কেন? কাল সকালেই তুমি অন্য একটা বাজে কবচ হাতে নিয়ে ওদের বাড়ি যাও। তারপর গিয়ে বলো, এই নতুন কবচটা আরও বেশি জোরালো। এই কথা বলে আসল কবচটা খুলে নিয়ে নকল কবচ পরিয়ে চলে এসো। ভূতেরা বলেছে ওই কবচ খুলে নিয়ে তুমি ঘরে ফিরলেই ওরা আর এক মুহূর্ত দেরি না করে মেরে ফেলবে লোকটাকে। ঝামেলা একেবারেই চুকে যাবে।"

হালদারমশাই বললেন, "বেশ। তাই করব। ওরা আবার এলে এই কথাই তুমি বলে দিয়ো।"

হালদারগিন্নি দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন।

পরদিন সকালে হালদারমশাই নতুন একটি কবচ নিয়ে আবার গেলেন মথুরাপুরে। হরিহর তখন গোয়ালে গোরু-বাছুরের দেখাশোনা করছিল। হালদারমশাইকে দেখেই এগিয়ে এল সে, "ব্যাপার কী হালদারমশাই?"

হালদারমশাই বললেন, "ব্যাপার কিছুই নয়। শুধু দেখতে এলাম আর কোনও অসুবিধে হচ্ছে কি না।"

"কী যে বলেন! আপনার দেওয়া কবচ গলায় বেঁধে রেখেছি। ভূত তো ভূত, ভূতের বাবারও আর সাধ্য নেই যে এখানে আসে।"

"ঠিক আছে। এখন ওই কবচটা তুমি আমাকে ফেরত দাও।"

"সে কী!"

"ভয় নেই। এই কবচের বদলে তোমাকে আর একটা এমন কবচ দেব যে তা আরও সাংঘাতিক। এই কবচটা তো শুধু তোমাকেই রক্ষা করবে। কিন্তু এই নতুন কবচ রক্ষা করবে তোমার পুরো পরিবারকে।"

এই কথা শুনে হরিহর সরল বিশ্বাসে কবচটা খুলে দিল হালদারমশাইকে। তাঁরই দেওয়া জিনিস তিনি ফিরিয়ে নেবেন, এতে অবিশ্বাস করার কিছু নেই। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আবার হয়তো একদিন নতুন কোনও কবচ দেবেন। এরকম তো হতেই পারে। তাই সরল বিশ্বাসে কবচটা হালদারমশাইকে দিয়ে দিল হরিহর।

হালদারমশাই নিজে হাতে ওর গলা থেকে রক্ষা কবচটি খুলে নিয়ে নতুন একটি নকল কবচ বেঁধে দিলেন। তারপর ভগবানের নাম স্মরণ করে বেরিয়ে এলেন ওদের বাড়ি থেকে।

মথুরাপুরের সীমানা যেই পেরিয়েছেন অমনি শুনতে পেলেন কে যেন বলল, ‘‘আমাদের রাজা তোর ওপর খুব খুশি হয়েছে গুনিন। আমরা তোর ওপর সন্তুষ্ট। আর তোর বউ-ছেলের কোনও ভয় নেই। এখন ওরা নির্ভয়ে চলাফেরা করতে পারবে। তোর ছেলের ওপর থেকে আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে নিচ্ছি। আর এও বলে রাখছি আমরা যদি কাউকে কখনও ধরি আর ওঝা হয়ে তুই যদি সেখানে যাস তা হলে তোকে দেখামাত্রই আমরা তাকে ছেড়ে দেব।’’

হালদারমশাই নিশ্চিন্ত হলেন। একজন রোগীকে সারাতে না পারলেও এরকম অনেক রোগীকে যদি উনি বাঁচাতে পারেন সেটাই বা মন্দ কী! তাঁর কর্মক্ষমতা তাতে কিছুমাত্র কমবে না। বরং উত্তরোত্তর সুনাম বৃদ্ধিই পেতে থাকবে।

ওদিকে হালদারমশাই চলে আসামাত্রই হরিহরও হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। ওর বাড়ির লোকেরা দেখল হরিহরের মুখটা কেমন যেন বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। হরিহর কথা বলতে পারছে না। দুটো চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে। এক অদ্ভুত আতঙ্কে নীল হয়ে আসছে ক্রমশ। বাড়ির লোকেরা দেখতে না পেলেও হরিহর বেশ বুঝতে পারল কালো পোড়া দুটো হাত ওর গলা টিপে ওকে মেরে ফেলতে চাইছে। হরিহরের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। ও ধীরে ধীরে লুটিয়ে পড়ল মাটির বুকে। ওর মুখ দিয়ে এক ঝলক রক্ত বেরিয়ে এল। তারপর প্রাণহীন দেহটা লুটিয়ে পড়ল মাটির বুকে।

বাড়ির লোকেরা গুনিনকে ডাকতে ছুটল। নিবারণ গুনিন বাড়িতেই ছিলেন, সব শুনে এবার কিন্তু তিনি ঋজু হয়ে দাঁড়ালেন। স্ত্রীর নিষেধও এবার তিনি শুনলেন না। বললেন, ‘‘আমি যাব, নকল রক্ষাকবচ দিয়ে হরিহরের যে ক্ষতি করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত করব। এবং আরও অনেক অনেক রক্ষাকবচ তৈরি করব, কাউকেই ভূতের হাতে মরতে দেব না।’’

১৩ জুন ১৯৯০

অলংকরণ: সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

তিনআঙুলে দাদা

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

বেচারাম এসে ঠাকুমাকে গড় করে বলল, ''এবার একটা কিছু করুন দিদিঠাকরুন! ব্যাটাচ্ছেলে বড্ড বেশি জ্বালাচ্ছে। আমি যে এরপর ফতুর হয়ে যাব।''

আমি বারান্দায় শতরঞ্চিতে বসে ভন্তুমাস্টারের ধমক খাচ্ছিলাম। ঠাকুমা কাছাকাছি থাকলেই দেখেছি ওঁর তর্জনগর্জন বেড়ে যায়। কিন্তু এই সাতসকালে বিস্কুটওয়ালা বেচারামের হঠাৎ মুখ চুন করে এসে ঠাকুমাকে গড় এবং ওই নালিশ! ভন্তুমাস্টার আমাকে ভুলে গিয়ে চোখ টেরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ঠাকুমা ফুলবাগানের সেবাযত্ন করছিলেন। হাতে একটা খুরপি। বললেন, ''নাককাটা না তিনআঙুলে?''

বেচারাম করুণ মুখে বলল, ''আজ্ঞে তিনআঙুলে। নাককাটা তো মানুষজনের সাড়া পেলেই লজ্জায় লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু তিনআঙুলে মহা ধড়িবাজ। গাছের ডালে ঘাপটি পেতে বসে থাকে। তলা দিয়ে কেউ গেলেই হয় চুল টেনে দেয়, নয়তো কানে খিমচি কাটে। মিত্তিরমশাইয়ের জামাইয়ের কানে—''

ঠাকুমা তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, ''ক'খানা বিস্কুট নিয়েছে তা-ই বল!''

''তিনখানা খাস্তা, একখানা কিরিমকেক, আড়াইখানা নিমকি।'' বেচারাম ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে ফের বলল, ''এখনও পুরো হিসেব করে দেখিনি। মাথার ঝাঁকায় পেলাস্টিক মোড়া ছিল। সেই পেলাস্টিক তুলে কীরকম হাতসাফাই ভাবুন!''

ঠাকুমা গম্ভীরমুখে বললেন, ''প্লাস্টিক তুললেই তো শব্দ হবে। তোর ভুল হচ্ছে না তো বেচু?''

বেচারাম জোরে মাথা নেড়ে বলল, ''তিনআঙুলে কে ছিল মনে নেই দিদিঠাকরুন?''

''হুঁ। শুনেছি পকেটমার ছিল। বাবুগঞ্জের হাটে ধরা পড়ে নাকি ওই অবস্থা।''

ভন্তুমাস্টার বলে উঠলেন, ''আমি স্বচক্ষে দেখেছিলাম মাসিমা! মারের চোটে একখানা হাত ভেঙে গিয়েছিল। অন্য হাতের আঙুলের দুটো হাড় গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল। হাসপাতালে সেই হাতখানা আর অন্য হাতের দুটো আঙুল কেটে বাদ দিয়েছিলেন ডাক্তারবাবুরা। সেইজন্যই তো তিনআঙুলে নাম হয়েছিল।''

ঠাকুমা চোখ কটমটিয়ে বললেন, ''ভন্তু, পুঁটুকে আঁক কষাও। হাফ ইয়ারলিতে আঁকে গোল্লা পেয়েছে।''

ভন্তুমাস্টার ঘুরে গর্জন করলেন, ''একটা বানর ছয় ফুট উচ্চ খুঁটিতে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। মিনিটে ছয় ইঞ্চি উঠিয়া দুই ইঞ্চি নামিয়া যাইতেছে। এইরূপে ছয় ফুট উঠিতে তাহার কতক্ষণ সময় লাগিবে?''

আমার কান ঠাকুমা এবং বেচারামের দিকে। বেচারাম বলল, ''মাথার ঝাঁকায় যে টান পড়েছিল দিদিঠাকরুন।''

ঠাকুমা বললেন, ''তুই ওকে দেখতে পেলি?''

''নাহ্। ঘুরঘুটে আঁধার। তার ওপর টিপটিপিয়ে বিষ্টি। ষষ্ঠীতলা কেমন জায়গা তা তো জানেন।''

''তুই এখন আয় বেচু। আমি দেখছি কী করা

যায়।" বলে ঠাকুমা একটা কুলগাছের মাটিতে খুরপির কোপ বসালেন। বেচারাম তুম্বো মুখে চলে গেল।

বানরটাকে খুঁটির ডগায় ভন্তুমাস্টার চড়াতে পারলেও আমি পারলাম না।

ষষ্ঠীতলার পর একটা খাল আছে। খালের ওপর কাঠের সাঁকো। ওই পথেই আমাকে রোজ স্কুল যেতে-আসতে হয়। ছুটির পর স্কুলের মাঠে ফুটবল খেলে বাড়ি ফিরতে আঁধার ঘনিয়ে আসে। খালটা গ্রামের শেষদিকটায়। এ পাড়ায় আমার স্কুলের সঙ্গী বলতে কেতো আর টোটো। টোটো ব্যাকে খেলে। কেতো গোলে। আমি কোনও-কোনওদিন হাফব্যাকে চান্স পাই। কিন্তু টোটো যতই গোঁয়ার হোক, ওর ওপর ভরসা রাখা কঠিন। খুব দৌড়বাজ যে। বেগতিক দেখলেই উধাও হয়ে যায়।

আর কেতোর স্বভাব হল ভয় পেলেই আমাকে জাপটে ধরা। ভাবনায় পড়ে গেলাম।

আমাদের গাঁয়ে অনেকরকম ভূত আছে জানতাম। কিন্তু তখনও তাদের সামনাসামনি দেখতে পাইনি। একজনের নাম ছিল 'কাঁদুনে'। সে নাকি খালের ধারে কেঁদে-কেঁদে বেড়ায়। একজনের নাম 'হাসুনে'। সে রাতবিরেতে খালি হেসে বেড়ায় হি-হি করে। 'কাতুকুতু' নামে এক বেজায় দুষ্টু ভূত ছিল। সে একলাদোকলা মানুষজন পেলেই তাকে কাতুকুতু দিয়ে অস্থির করত। 'হেঁচো ভূত' আমাদের বাগানে এসে নাকি খুব হাঁচত। আর রামবাবুদের বাঁশবনে ছিল এক 'বেহালাবাজিয়ে' ভূত। দিনদুপুরেও তার বাজনা শোনা যেত। একবার কেতোর সঙ্গে কঞ্চি কাটতে ঢুকে তার বেহালা শুনে ভয়ে পালিয়ে এসেছিলাম। তার বাজনার সুর বড় বিচ্ছিরি।

কিন্তু 'নাককাটা' আর 'তিনআঙুলে'র কথা সেই প্রথম শুনলাম।

বোঝা গেল এক পকেটমার মরে তিনআঙুলে হয়েছে। কিন্তু নাককাটাটা কে? ভন্তুমাস্টার চলে যাওয়ার পর ঠাকুমার কাছে জেনে নেব ভাবছি, বেচারামের দাদা কেনারাম এসে গড় করল। ঠাকুমা বললেন, "তোর আবার কী হল রে কিনু? দুধে জল মিশিয়ে সিঙ্গিমশাইয়ের চাঁটি খেয়েছিস নাকি?"

কেনারাম কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল, "না দিদিঠাকরুন! সর্বনাশ হয়ে গেছে। নাককাটা আমার এক হাঁড়ি দুধ নাক দিয়ে টেনে নিয়েছে। কাল সন্ধেবেলা দুধটা জ্বাল দিয়ে রেখেছিলাম। সকালে দেখি একটি ফোঁটাও নেই।"

"তুই কী করে জানলি নাককাটাই দুধ খেয়েছে?"

"আজ্ঞে, আমার মেয়ে ইমলি দেখেছে। আমি গিয়েছিলাম রামবাবুদের গোরু দুইতে। ইমলির মা পুকুরঘাটে বাসন মাজতে গিয়েছিল। ইমলি একা ছিল। বলল কী, একটা রোগাটে কালো কুচকুচে লোক পাঁচিল ডিঙিয়ে এসেছিল। তার নাক নেই। ইমলি তা-ই দেখে তো ভয়ে কাঠ। লোকটা দুধের হাঁড়িতে মুখ ঢুকিয়ে চোঁ-চোঁ করে সব শুষে নিয়ে পালিয়ে গেল।"

ঠাকুমা গুম হয়ে বললেন, "হুঁ। দেখছি।"

কেনারাম কাকুতিমিনতি করে বলল, "দেখছি নয় দিদিঠাকরুন! এর একটা পিতিকার আপনি ছাড়া কেউ পারবে না। শুনলাম কাল সন্ধেবেলা বেচুরও সর্বনাশ হয়েছে। আমি বুঝতে পারছি না দিদিঠাকরুন, নাককাটা আর তিনআঙুলে সবাইকে ছেড়ে আমাদের দু' ভাইয়ের পিছনে লাগল কেন? আমরা দু' ভাই কারও সাতে-পাঁচে থাকি না। আমরা ওদের কী করেছি?"

ঠাকুমা একটু ভেবে বললেন, "হ্যাঁ রে, কিনু, পাঁচুকে তুই তো দেখেছিস?"

কেনারাম ভুরু কুঁচকে বলল, "পাঁচু, মানে ঝাঁপুইহাটির সেই পাঁচুচোর?"

"আবার কে?" ঠাকুমা একটু কষ্টমাখা হাসি ফোটালেন মুখে। "পঞ্চগ্রামী বিচারে পাঁচুর নাক কেটে দিয়েছিল। তা পাঁচুর বিরুদ্ধে তুই সাক্ষী দিসনি তো?"

কেনারাম প্রথমে হকচকিয়ে গেল। তারপর আস্তে বলল, "সে তো অনেকদিনের কথা। সাক্ষী দিইনি, তবে পঞ্চগেরামির সময় বারোয়ারিতলায় ছিলাম বটে। সবাই পাঁচুর নাককাটার বিচারে হইচই করে

সায় দিল। তখন আমিও দিয়ে থাকব। কিন্তু কথা হচ্ছে, নাক কেটেছিল তো নোলে। তার কোনও ক্ষতি আজ পর্যন্ত হয়েছে বলে তো শুনি দিদিঠাকরুন!''

ঠাকুমা কেমন রহস্যময় হাসলেন এবার। ''হবে কী করে? হলেও বা জানবি কী করে? নোলেও তো কবে মরে গেছে শুনেছি!''

কেনারাম আবার ঠাকুমাকে প্রতিকারের নালিশ জানিয়ে চলে গেল। আমার এতক্ষণে অবাক লাগল। আজ বেচারাম-কেনারাম ঠাকুমার কাছে নালিশ জানাতে এল। সেদিন মিত্তিরমশাই তাঁর জামাইয়ের কানে কে চিমটি কেটেছে বলতে এসেছিলেন। কাল ভেঁটুবাবুও ক্রাচে ভর করে ঠাকুমার কাছে কী যেন বলতে এসেছিলেন। সারারাত নাকি ঘুম হয়নি এবং 'হাঁচি' কথাটাও কানে এসেছিল। কিন্তু সবাই ঠাকুমার কাছে ভূতের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে আসছে কেন?

না বলে পারলাম না, ''ঠাকুমা, তুমি বুঝি ভূত জব্দ করতে পারো?''

ঠাকুমা চোখ কটমটিয়ে বললেন, ''স্কুলের সময় হয়ে এল। চান করতে যাও।''

সেদিনই স্কুলের ছুটির পর ফুটবল খেলে কেতো আর টোটোর সঙ্গে বাড়ি ফেরার পথে কেনারাম-বেচারামের গল্প শোনাচ্ছিলাম। খালের সাঁকোর কাছে এসে টোটো বলল, ''আজ এসপার-ওসপার করে তবে বাড়ি যাব। পুঁটু! আমার বইখাতা ধর। কেতো! সেদিনকার মতো পুঁটুকে জাপটে ধরবি নে বলে দিচ্ছি। এক কিকে তোকে মাঠে ফেরত পাঠাব, হ্যাঁ!''

কেতো ভয়ে ভয়ে বলল, ''তোর প্ল্যানটা কী?''

টোটো চাপা গলায় বলল, ''তোরা ওই শিবমন্দিরের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে থাকবি। আমি ষষ্ঠীতলার গাছে উঠে ওত পাতব। মনে হচ্ছে, তিনআঙুলে বেচুদার বিস্কুটের লোভে ওই গাছে উঠবে। বেচুদা তো ওখান দিয়েই যাবে। ক্লিয়ার?''

কেতো বলল, ''টোটো, তিনআঙুলে যদি তোকে গাছ থেকে ঠেলে ফেলে দেয়?''

টোটো ঘুসি দেখিয়ে বলল, ''একখানা আপারকাট অ্যায়সা মারব যে, তিনআঙুলে এসে খালের জলে পড়বে।''

বেলা পড়ে এসেছে। নিরিবিলি খালের দু'ধারে গাছপালা কালো হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। পাখিদের হল্লা কমে যাচ্ছে। ভাঙা শিবমন্দিরের আড়ালে কেতোর সঙ্গে চলে গেলাম। ষষ্ঠীতলা একটা ঝাঁকড়া বটগাছ। টোটো গাছে উঠে গেল। তারপর আর সময় কাটতে চায় না। আঁধারে সব অস্পষ্ট হয়ে গেছে। বুক টিপটিপ করছে অজানা ভয়ে। গোঁয়ার টোটোর পাল্লায় পড়ে কী বিপদ কোনদিক থেকে এসে যাবে, কে জানে! পোকামাকড়ের ডাক বেড়ে গেল এতক্ষণে। জোনাকি জ্বলতে দেখছিলাম এখানে-ওখানে। কেতো ফিসফিস করে বলল, ''পুঁটু, বেচুদা এখনও ফিরছে না কেন রে?''

সেই সময় ষষ্ঠীতলার গাছের ওপর টোটোর চেঁচানি শোনা গেল। ''অ্যাই! কী হচ্ছে? হি হি হি হি... আবার?... হি হি হি হি... আরে, মরে যাব!... হি হি হি... ওরে বাবা! হি হি হি হি...''

তারপর ধপাস করে শব্দ। চেঁচিয়ে উঠলাম, ''টোটো! টোটো!''

''হি হি হি হি... মরে যাব! সত্যি! হি হি হি হি... ওরে বাবা! হি হি হি হি...''

বললাম, ''কেতো! আয় তো দেখি!''

কেতো পাছে আমাকে জাপটে ধরে, তার সঙ্গে দূরত্ব রেখে দৌড়ে গেলাম। গিয়ে দেখি, টোটো হি হি হি হি করে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। কেতো বলল, ''সর্বনাশ! টোটো কাতুকুতুর পাল্লায় পড়েছে! পালিয়ে আয় পুঁটু!''

কেতো পালানোর আগেই গাছ থেকে পাতা খসে পড়ার মতো কেউ পড়ল এবং কেমন বিচ্ছিরি গলায় বলে উঠল, ''চোখ গেলে দেব! কান মলে দেব। ছাড় হতভাগা!''

টোটোর হাসি থেমে গেল। সে ফোঁস-ফোঁস করে হাঁফাতে হাঁফাতে উঠে দাঁড়াল। তারপর সটান উধাও হয়ে গেল। কেতো আমাকে জাপটে ধরে বলল, ''পুঁটু, এবার কী হবে?''

গাছ থেকে সদ্য লাফিয়ে পড়া ছায়ামূর্তি তেমনি

বিদঘুটে গলায় বলল, ''তিনআঙুলে থাকতে ভয় কী খোঁকাবাবুরা? কাতুকুতু ব্যাটাচ্ছেলে আমাকে দেখেই পিঠটান দিয়েছে।''

কেতো কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, ''তু-তুমি তি-তিনআঙুলে?''

ছায়ামূর্তি একটা হাত তুলল। আঁধারে স্পষ্ট দেখলাম তার হাতে মোটে তিনটে আঙুল। সে সেই তিনটে আঙুল নেড়ে বলল, ''শিগগিরি কেটে পড়ো তোমরা! বেচারাম আসছে। আমার বড্ড খিদে পেয়েছে।''

খালের দিকে টর্চের আলোর ঝলক। কেতো বলল, ''পুঁটু, চলে আয়! বেচুদা জব্দ হোক। ও বিস্কুটের দাম ডবল নেয়, তা জানিস? তিনআঙুলে দাদা। আজ ওর ঝাঁকাসুদ্ধু তুলে নিয়ো।''

''তা আর বলতে?'' বলে তিনআঙুলে তড়াক করে গাছে উঠে গেল।

আমরা হনহন করে হাঁটতে থাকলাম। বাড়ির আশেপাশে কাতুকুতু গিয়ে লুকিয়ে থাকলে কী করব, সে একটা ভাবনা। তবে সে কাতুকুতু দিলেই ঠাকুমাকে চেঁচিয়ে ডাকব। নয়তো তিনআঙুলে দাদা তো আছেই।

কেতো চাপা গলায় বলল, ''তিনআঙুলে দাদা কিন্তু খুব ভাল। তাই না রে? টোটোকে কাতুকুতুর হাত থেকে না বাঁচালে কী হত বল?''

সায় দিতে যাচ্ছি, কাছাকাছি কেউ হ্যাঁচ্চো করে হেঁচে উঠল। তারপর আর সেই হাঁচি থামতে চায় না। চেঁচিয়ে ডাকলাম, ''ঠাকুমা, ঠাকুমা!''

অমনই হাঁচি থেমে গেল। ঠাকুমাকে ওরা এত ভয় পায় কেন?

পরদিন সকালে পড়তে বসেছি, এমন সময় দেখি, কেনারাম-বেচারাম দুই ভাই এক আলখাল্লাধারী ফকিরকে সঙ্গে নিয়ে হাজির। ঠাকুমা হাসিমুখে ডাকলেন, "এসো! বাবা এসো! তোমার জন্য কতদিন থেকে পথ তাকিয়ে বসে আছি। আসছ না দেখে কিনু আর বেচুকে পাঠিয়েছিলাম।"

বেচারাম বলল, "তিনআঙুলে কাল সন্ধ্যায় আমার ঝাঁকাসুদ্ধু তুলে নিয়েছে। আগে ওই ব্যাটাচ্ছেলেকে জব্দ করুন ফকিরবাবা!"

কেনারাম বলল, "না। আগে নাককাটাকে!"

ফকিরবাবা বিড়বিড় করে মন্তর আওড়াতে আওড়াতে বাগানের মাটিতে বসলেন। তারপর একটু হেসে ঠাকুমাকে বললেন, "বেটি, সেবার তোকে বলেছিলাম শয়তানদের এই ঝুলিতে ভরে পদ্মার ওপারে ফেলে দিয়ে আসি। তুই বললি, না না, গঙ্গা পার করে দিলেই যথেষ্ট। এখন দেখ বেটি, ওরা গঙ্গা পেরিয়ে আবার ফিরে এসেছে। পদ্মাপারে দেশের বর্ডার। বর্ডার পেরোনোর ঝক্কি আছে। বুঝলি কিছু? পাসপোর্ট-ভিসার হাঙ্গামা আছে না?"

ঠাকুমা হাসলেন। "বুঝেছি বাবা, খুব বুঝেছি। এবার তুমি ওদের পদ্মাপার করেই দিয়ে এসো।"

মুচকি হেসে ফকিরবাবা বললেন, "আগে দই-চিঁড়ে-কলা দে বেটি! ফলার করি। তারপর হচ্ছে।"

ভন্তুমাস্টার বললেন, "কিন্তু ফকিরবাবা, শুনেছি বর্ডারে ঘুষ দিলে নাকি পেরনো যায়।"

ঠাকুমা চোখ পাকিয়ে বললেন, "ভন্তু, পুঁটুকে আঁক কষাও।"

ভন্তুমাস্টার গর্জন করলেন, "একটি চৌবাচ্চায় দশ গ্যালন জল ধরে। সেই চৌবাচ্চার একটি ছিদ্র আছে। ছিদ্র দিয়া—"

ফকিরবাবার খবর ততক্ষণে রটে গেছে। একজন-দু'জন করে লোকের ভিড় জমতে শুরু করেছে। কলার পাতায় ফলার সেরে ফকিরবাবা যখন ভূত ধরতে বেরোলেন, তখন তাঁর পিছনে বিশাল মিছিল। ভন্তুমাস্টারকে খুঁজে পেলাম না আর। সেই ফাঁকে আমিও দৌড়ে গিয়ে মিছিলে ঢুকে পড়লাম। দেখলাম কেতো আর টোটোও এসে গেছে কখন।

ষষ্ঠীতলার কিছু আগে রাস্তায় ফকিরবাবা তাঁর প্রকাণ্ড লোহার চিমটে দিয়ে দাগ এঁকে বললেন, "খবরদার, খবরদার, এই দাগ পেরিয়ে কেউ যেন আসবে না। দাগ পেরিয়েছ কি মরেছ। খবরদার, খবরদার!"

ফকিরবাবা ষষ্ঠীতলার পিছনের জঙ্গলে উধাও হয়ে গেলেন। সবাই চুপ করে আছে। শুনলাম, মিত্তিরমশাই মুচকি হেসে চুপিচুপি ভেঁটুবাবুকে বলছেন, "রামবাবুর বাঁশবনের বেহালাদারকে পেলে হয়। মহা ধূর্ত। খাল পেরিয়ে হয়তো সিঙ্গিমশাইয়ের বাঁশবনে গিয়ে ঢুকে পড়েছে।"

সিঙ্গিমশাই পেছনেই ছিলেন। বলে উঠলেন, "বাজে কথা বোলো না মিত্তির! আমার বাঁশবনে কে আছে তা জানো?"

তর্কাতর্কি বেধে গেল। অন্যেরা "চুপ! চুপ!" বলে থামানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু সিঙ্গিমশাইকে থামানো শক্ত। শেষপর্যন্ত ফকিরবাবাকে ষষ্ঠীতলায় ফিরতে দেখে তর্কাতর্কি থেমে গেল। ফকিরবাবার কাঁধের তাপ্পিমারা রংবেরঙের ঝুলিটি এখন প্রায় পুঁটুলি হয়ে উঠেছে। সামনে এসে তিনি বললেন, "চললাম এবার পদ্মাপারে। ফিরে এসে আবার ফলার খাব।"

মুখে ঝলমলে হাসি। প্রকাণ্ড পুঁটুলি হয়ে ওঠা ঝুলিটা খুব নড়ছিল। মিছিল করে গাঁয়ের লোকেরা ওঁর পেছন-পেছন চলল। গাঁয়ের শেষে মল্লিকদের আমবাগানের ধারে পিচরাস্তা। ফকিরবাবা পিচরাস্তায় উঠলে আমার চোখে পড়ল, ওঁর পিঠের দিকে তাপ্পিমারা ঝুলি ফুঁড়ে কালো কুচকুচে তিনটে আঙুল বেরিয়ে আছে। খুব নড়ছে আঙুল তিনটে। 'টা টা বাই বাই' করছে কি তিনআঙুলে দাদা?

দেখে কষ্ট হল। বেশ তো ছিল তিনআঙুলে। বেচারামকে জব্দ করেছিল। কাতুকুতুকে জব্দ করেছিল। ঠাকুমা কী যে করেন। ধ্যাট।

কিছুদিন পরে এক সকালে ভন্তুমাস্টার আমাকে আঁক কষাচ্ছেন। ঠাকুমা ফুলগাছের সেবাযত্ন করছেন। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, ''অ্যাই হতচ্ছাড়া! ভাল হবে না বলছি! রেখে যা। রেখে যা।''

ভন্তুমাস্টার বললেন, ''কী হল মাসিমা?''

ঠাকুমা বাগানের বেড়ার দিকে হন্তদন্ত এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ''অ্যাই বানর! খুরপি দিয়ে যা। নইলে আবার ফকিরবাবাকে খবর পাঠাব।''

ভন্তুমাস্টার আবার বললেন, ''কী হল মাসিমা?''

ঠাকুমা ঘুরে প্রায় আর্তনাদ করে বললেন, ''ও ভন্তু, ও পুঁটে, আমার খুরপি নিয়ে পালাচ্ছে! ধর, ধর!''

''কে খুরপি নিয়ে পালাচ্ছে মাসিমা?''

''তিনআঙুলে। শিগগির ওকে ধর!''

ভন্তুমাস্টার দৌড়ে গেলেন। আমিও দৌড়লাম। বাগানের বাইরে খুরপিটা পড়ে থাকতে দেখা গেল। ভন্তুমাস্টার খুরপিটা কুড়োতে গিয়েই ''উঁহু হু হু'' করে পিছিয়ে এলেন। তারপর কানে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, ''উঁহু হু হু, বড্ড জ্বালা করছে

যে। ও পুঁটু, আমার এই কানটা আছে না নেই দেখ তো বাবা!''

হাসি চেপে বললাম, ''আছে মাস্টারমশাই!''

ভন্তুমাস্টার কানে হাতচাপা দিয়ে বললেন, ''কোবরেজমশাইয়ের কাছে মলম লাগিয়ে আনি। উঁহু হু হু!'' তারপর টাট্টুঘোড়ার মতো উধাও হয়ে গেলেন।

তিনআঙুলে ফকিরবাবার ঝুলি ফুঁড়ে পালিয়ে এসেছে জেনে আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল। বললাম, ''তিনআঙুলে দাদা! ঠাকুমার খুরপিটা আমি কুড়োচ্ছি। আমার কান মলে দেবে না তো?''

না। তিনআঙুলে আমার কান মলে দিল না। খুরপিটা কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ঠাকুমাকে দিলাম। ঠাকুমা খুশি হয়ে বললেন, ''তিনআঙুলে ফিরে এসেছে যখন, তখন থাক। গাঁ-গেরামে দু'-একটা ভূত না থাকলে চলে? তবে নাককাটাটা বড্ড বোকা। সেও পালিয়ে এলে পারত। তাই না পুঁটু?''

১ এপ্রিল ১৯৯২
অলংকরণ: দেবাশিস দেব
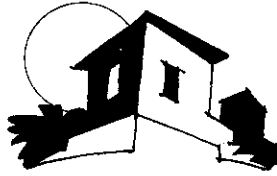
অন্য মহিম

রতনতনু ঘাটী

স্কুল থেকে ফিরে বইয়ের তাকে স্কুলব্যাগটা রাখতে গিয়ে মহিম দেখল, বইগুলো এলেমেলো হয়ে আছে। খুব অবাক হয়ে গেল মহিম। বই গুছিয়ে না রাখার জন্য মা যেদিন খুব বকেছিলেন, সেদিন থেকে মহিম কখনও বইয়ের তাক এলোমেলো করে রাখে না। স্কুলে যাওয়ার সময় যদি দেরিও হয়ে যায় তবুও না। তা হলে আজ বইয়ের তাকটায় কি কেউ হাত দিয়েছিল? মেজোপিসির মেয়ে দিপি এসেছিল হয়তো তার ভাইকে নিয়ে। দিপির খুব শখ বইয়ের ছবি গোনার খেলায়। ওরা ভাইবোনে মিলে হয়তো ছবি গোনার খেলা খেলেছিল। একজন নিয়েছিল বইয়ের সব বাঁ দিকের পাতা, আর-একজন ডান দিকের পাতা। তারপর ছবি গুনে গুনে দেখেছে শেষ পর্যন্ত কার ভাগে ছবি বেশি হয়! তা হলে দিপিই হয়তো বইয়ের তাকটা ঘেঁটেছে।

মাকে জিজ্ঞেস করল মহিম, "মা, দিপি এসেছিল আজ?"

মা বললেন, "কই না তো! দিপির কথা বলছিস কেন?"

মহিম বলল, "না এমনই, মনে হল, তাই।"

মহিম মাকে সব কথা বলল না। কেননা, যদি এমন হয় যে, বইয়ের তাকটা ও নিজেই গুছিয়ে রেখে যেতে ভুলে গেছে, তা হলে মা খুব বকবেন। কিছুতেই মনে করতে পারছিল না মহিম বইগুলো গুছিয়ে রেখে গিয়েছিল কি না।

ওদিকে এখন বিকেল পড়ে এসেছে। ফুটবল শুরু হয়ে যাবে মাঠে। মাঠ মানে, ধান ওঠার পর সরু আলগুলো কেটে-ছেঁটে জমিটাকে মাঠ বানিয়ে নিয়েছে গ্রামের ছেলেরা। বল কেনার জন্য চাঁদাও দিতে হয়েছে সবাইকে। কিন্তু তাই বলে সবাই খেলার সুযোগ পায় না প্রতিদিন। যে যে আগে মাঠে পৌঁছবে, তারাই সুযোগ পাবে— এরকমই নিয়ম ঠিক করে দিয়েছে গেনুদা।

ওদের গ্রামের মধ্যে গেনুদাই ফুটবল খেলার নেতা। গেনুদার ভাল নাম জ্ঞানরঞ্জন। নামটা এরকম হলে কী হবে, গেনুদার পড়ার চেয়ে খেলাতেই আগ্রহ বেশি। মহিম কার কাছে যেন শুনেছিল, গেনুদা একবার মহকুমা শহরের মাঠে গিয়েও খেলে এসেছে।

বিকেলে যারা আগে গিয়ে গেনুদার কাছে হাজির হবে, তারাই খেলার সুযোগ পাবে। এক-একদিন এমনও হয়েছে, ষোলো করে খেলেছে এক এক দলে। এ বছর একদিন তো মহিম বত্রিশজনের পর মাঠে পৌঁছেছিল বলে সারা বিকেলটাই লাইন্সম্যান হতে হয়েছিল। তিনদিন তো সে-সুযোগও পায়নি মহিম। শুধু দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে মাঠের বাইরে।

আজ অবশ্য মহিম খেলার সুযোগ পেয়েছিল। সন্ধের মুখে গেনুদা খেলা শেষের বাঁশি বাজাতেই খেলা বন্ধ হয়ে গেল। যে-যার বাড়ি ফেরার পালা। মহিমও বাড়ি ফিরছিল। বড় রাস্তা ধরে শিবতলা পর্যন্ত অনেকেই ছিল মহিমের সঙ্গে। শিবতলা থেকে বাঁ দিকে বাঁক ঘুরেই সরু রাস্তাটা গেছে মহিমদের বাড়ির দিকে। রাস্তার দু'দিকে স্থলকলমির

বেড়া। বাবলা আর খেজুর গাছের সারি। ফিকে অন্ধকারকেও মনে হয় ঘন অন্ধকার। সন্ধের মুখেই ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি উড়তে শুরু করেছে। বড় শেওড়া গাছটার কাছে আসতেই মহিমের হঠাৎ মনে পড়ে গেল বইয়ের তাকটা এলোমেলো হয়ে থাকার কথা। চারদিকে তাকাল মহিম। ঠাকুরমা সেদিন বলেছিলেন, শেওড়া, নিম আর খিরীষ গাছে নাকি কারা থাকে। অনেক চেষ্টা করেও মহিম 'ভূত' শব্দটা মনে আনল না। তা হলে কি তাদের কেউ হাত দিয়েছিল বইয়ের তাকে? মনে হতেই প্রাণপণে ছুটল মহিম।

সন্ধেবেলা হ্যারিকেনের সামনে পড়তে বসে কিছুতেই পড়ায় মন বসাতে পারল না। তার হঠাৎ হঠাৎ মনে হচ্ছিল, কেউ তাকে আড়াল থেকে দেখছে অপলক। আলো চোখে লাগলে দূরে অন্ধকারের কিছুই তেমন ভাল করে দেখা যায় না। মহিম একটুকরো কাগজ গুঁজে দিল হ্যারিকেনের প্যাঁচানো তারের ফাঁকে। পড়ায় মন দিতে গিয়েও দু'-একবার আড়চোখে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দেখল মহিম, কেউ তাকে দেখছে কি না। উঠোনের পাশের ছোট নিমগাছটা বাতাসে মাথা দুলিয়ে দোল খেল বারকয়েক। ভয় করল মহিমের। বই ফেলে রান্নাঘরে মায়ের কাছে গিয়ে বলল, "মা, আমার ভয় করছে বারান্দায় একা একা পড়তে।"

মা বললেন, "তা হলে বই নিয়ে এসে এখানেই পড়ো।"

মহিমের বাবা অনুতোষবাবু গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য। তাই আজ কীসের যেন মিটিং আছে পঞ্চায়েত অফিসে। তাঁকে যেতে হয়েছে।

বই নিয়ে এসে মহিম রান্নাঘরে মায়ের পাশে বসে মাকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা মা, ভূতগুলো কোথা থেকে আসে বলো তো?"

মা বললেন, "বোকা ছেলে কোথাকার! ভূত বলে সত্যিই কিছু আছে নাকি? সবই মানুষের মনগড়া!"

মা যতই বলুন, ভূত যে আছে সে-কথা ঠাকুরমা বেশ জোর দিয়েই বলতেন মহিমকে। তা ছাড়া ভূত যে আছে তার বড় প্রমাণ বিধু গুনিন। প্রায় রোজ ভূত তাড়াতে ডাক পড়ে বিধু গুনিনের। আশপাশের পাঁচ-সাতটা গাঁয়ের মানুষ ভূতের হাত থেকে যে রক্ষা পেয়ে যাচ্ছে, সে তো শুধু বিধু গুনিনের জন্যই।

এই তো সেদিন, দেবকীর মাকে ভূতে ভর করেছিল কীরকম, সে-গল্প মহিম শুনেছে ওর বন্ধুদের মুখ থেকে। দেবকীর বাবা নেই, মারা গেছেন অনেকদিন আগে। দেবকীর মা অনেক কষ্টে মানুষ করছেন দেবকীকে। একদিন রাতে দেবকীর মা'র ঘুম ভেঙে গেল কীসব ভয়ের স্বপ্ন দেখে। ঘুম ভাঙতেই পা দুটো নাড়াতে গিয়ে তাঁর মনে হল পায়ের ওপর কী একটা যেন ভারী জিনিস চাপানো, পা নাড়ানো যাচ্ছে না। ভয়ে ঘেমে গেলেন দেবকীর মা। একটু পরেই দেখলেন, পায়ের ওপর আর কোনও ভারী কিছু নেই। উঠে ঢকঢক করে জল খেলেন। শুয়ে রইলেন বাকি রাতটুকু। কিন্তু আর ঘুম এল না তাঁর।

তারপরের দিন রাতে ঘটল আরও একটা ঘটনা। দেবকীর মা খাওয়াদাওয়ার পর রান্নাঘরের কাজ গুছিয়ে যখন শুতে এলেন, দেখলেন দেবকী ঘুমিয়ে একদম ভিজে বাতাসা। আলো নিভিয়ে যেই শুয়ে পড়লেন, অমনই ঘরের কোনায় রাখা চাল, ডাল আর সরষের কলসিগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে এসে বসল দেবকীর মা'র মাথার পাশে। দেখে তো দেবকীর মা'র শরীর ভয়ে হিম হয়ে গেল। উঠে আলো জ্বালাতেই দেখলেন, যেখানকার কলসি, গড়িয়ে গড়িয়ে ফিরে গেল সেখানেই। দেবকীর মায়ের সে-রাতেও আর ঘুম এল না।

তারপর ডেকে আনা হল বিধু গুনিনকে। বিধু গুনিন এসে কী সব করল, তারপরে সব নিশ্চিন্দি। আর কখনও ভূতের উপদ্রব হয়নি দেবকীদের বাড়িতে।

শুধু এ গল্পই বা কেন? সেদিন হঠাৎ এক পশলা ভারী বৃষ্টিতে মাঠে জল জমে গিয়েছিল বলে বিকেলে আর ফুটবল খেলা হয়নি। গেনুদা সবাইকে নিয়ে গ্রামের শীতলা মন্দিরের চাতালে বসে গল্প শোনাচ্ছিল। একবার গেনুদার ছোড়দাদু গিয়েছিলেন অম্বিকাচকের হাটে। রাধামণি গ্রামের পাশের গ্রাম অম্বিকাচক। ফিরতে ফিরতে রাত ন'টা।

হয়ে গিয়েছিল। রাধামণি আর অম্বিকাচকের মাঝে পড়ে শ্মশানকালীর বাঁশবন। দশ বছর অন্তর অন্তর রাধামণি গ্রামের বাসিন্দারা শ্মশানকালীর পুজো করেন সেখানে। গেনুদার ছোড়দাদু ঠিক সেখানে আসতেই দেখলেন, রাস্তার ওপর শুয়ে আছে একটা ন্যাড়ামুড়ো বাঁশগাছ। তিনি ভাবলেন, কোনওভাবে বাঁশগাছটার গোড়া আলগা হয়ে গিয়েছিল, তাই হয়তো দমকা বাতাসে পড়ে গেছে রাস্তার ওপর। এই ভেবে যেই বাঁশগাছটা ডিঙানোর জন্য পা বাড়িয়েছেন, অমনই বাঁশগাছটা উঠে গেল শূন্যে। ভীষণ এক আছাড় খেলেন ছোড়দাদু। সেই যে তাঁর কোমরের হাড় ভাঙল, শেষ পর্যন্ত কখনও সোজা হয়ে হাঁটতে পারেননি গেনুদার ছোড়দাদু।

গেনুদাই বলেছিল, চার-পাঁচটা গ্রামের ভূত বিধু গুনিনের জ্বালায় নাকি অস্থির। যে ভূতগুলোকে বিধু গুনিন রাধামণি গ্রাম থেকে তাড়িয়েছে, তারা এই শ্মশানকালীর বাঁশবনে থাকার জন্য আশ্রয় চেয়ে নিয়েছে বিধু গুনিনের কাছ থেকে। ওই বাঁশবনের মাঝখানে আছে একটা প্রকাণ্ড মহানিমের গাছ। চৈত্র মাসের অমাবস্যার রাতে ওই মহানিমের গাছে বিধু গুনিনের বিরুদ্ধে সভা বসে ভূতেদের। বুক-ফাটা গরমে কোথাও যখন একটুও বাতাস থাকে না, তখনও সারারাত ঝড়ের মতো দোল খায় গোটা বাঁশবন, তোলপাড় হয় প্রকাণ্ড মহানিমের গাছ। খোনা গলায় সারারাত নানারকম কথা শোনা যায়। কেউ কেউ নাকি ভূতের আলোকে জ্বলতে-নিভতেও দেখেছে ওই রাতে।

গেনুদা বলেছিল, বিধু গুনিন যে ভূতগুলোকে বোতলে পুরে মুখ বন্ধ করে কাঁকনকুশি নদীর জলে ফেলে দিয়ে আসছে, শুধু ওই ভূতগুলোই যা বন্দি থেকে যাচ্ছে চিরদিনের মতো। তবে নাকি ভূতকে বোতলে পুরতে খুব কষ্ট হয় বিধু গুনিনের। একটা ভূতকে বোতলে পোরবার পর তিনদিন মড়ার মতো শুয়ে থাকে বিধু গুনিন। উঠে দাঁড়াতে পারে না পর্যন্ত।

বিধু গুনিন হরেকরকমের তুকতাকও জানে। সে বলে, বড়দের ভূত তাড়ানো একরকম, ছোটদের ভূত তাড়ানো নাকি আর-একরকম। বিধু গুনিন ভূত তাড়ানোর অনেক মন্ত্রও জানে। গেনুদা কীভাবে যেন দু'লাইনের একটা মন্ত্র জেনে ফেলেছে। একে মন্ত্র বলা যায়, আবার পদ্যও বলা যায়। বিধু গুনিন তেমন তেমন ছেলেমেয়েকে পেলে চুপিচুপি মন্ত্রটা শিখিয়ে দেয়। ছোটদের ভূতেধরা একদম পছন্দ নয় বিধু গুনিনের। ভূতের ভয় পেলে মন্ত্রটা খুব নিচু স্বরে তিনবার আওড়ে গেলেই হল। ভূত পালিয়ে যাবে কোন তেপান্তরে। গেনুদা সেদিন সন্ধেবেলা শীতলা মন্দিরের চাতালে বসে মন্ত্রটা বলেছিল। আরও বলেছিল, ভূতের শরীর নাকি একদম মানুষের মতো। শুধু পায়ের গোড়ালি দুটো মানুষের মতো পেছনের দিকে থাকে না, থাকে সামনের দিকে। আর ভূতকে 'কুটুম' বললে নাকি ভূতেরা খুব খুশি হয়, আবার

"বিপাশার বাবা তোমাকে দেখে এসেছেন, তুমি চুপচাপ কুশির ধারে শিমুলগাছের নীচে একা বসে আছ। উনি তোমার সঙ্গে কথাও বলেছেন।"

"না মা। আমি কুশির ধারে যাইনি। তুমি বিশ্বাস করো। আজ আমি একটা গোলও দিয়েছিলাম। শুধু অন্তুটা যদি না অফসাইডে দাঁড়িয়ে থাকত, তা হলে গেনুদা গোলের বাঁশি বাজাত ঠিক। তুমি গেনুদাকে জিজ্ঞেস কোরো।"

মা গেনুদাকে জিজ্ঞেস করা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন না, পাশের বাড়ি দীপনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন।

দীপন বলল, "না কাকিমা, মহিমকে তো আজ খেলার মাঠে দেখিনি।"

মহিম প্রতিবাদ করে বলল, "তুই কী বলছিস, আমি যে গোল দিলাম, অন্তু অফ সাইডে ছিল বলে গেনুদা গোলের বাঁশি বাজাল না, আর তুই বলছিস কিনা আমি মাঠে যাইনি!"

দীপন জোর দিয়েই বলল, "না, না, তুই অন্য কোনওদিনের গল্প বলছিস হয়তো। আজ তুই মাঠে যাসইনি।"

মা ফিরে এলেন মহিমকে নিয়ে। মহিম কিন্তু ভাবল, দীপন ঠিক বলছে না, ও মাঠেই গিয়েছিল আজ। আবার ভাবল, বিপাশার বাবা যে কুশির ধারে তাকে বসে থাকতে দেখেছেন? তা হলে কি আর-একজন মহিম..., হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তারই মতো দেখতে আর-একজন মহিমকে তিনি কুশির ধারে দেখেছেন। ইস, সেই মহিমের ছায়া পড়েছিল কিনা যদি বিপাশার বাবা দেখতেন, তা হলে ঠিক হত। গেনুদা বলেছিল, ভূতের নাকি ছায়া পড়ে না। মহিমের ভয়-ভয় করল বেশ। সে তখন মায়ের কাছে সরে এসে বসল।

মা বললেন, "নাও বাবু, এবার পড়া শুরু করো। প্রথমে বিবিধ প্রশ্নমালার অঙ্কগুলো করে নাও। তারপর কালকের পড়া করবে। কোন অঙ্কটা বুঝতে পারছ না, আমাকে বলো।"

মহিম স্কুলব্যাগ থেকে বইখাতা বের করল। তারপর অঙ্কের খাতাটা খুলেই অবাক হয়ে গেল। প্রায় চিৎকার করে উঠল মহিম, "মা, এ কী?"

মাও ওর চিৎকারে অবাক হয়ে বললেন, "কী হয়েছে বাবা?"

অঙ্কের খাতাটা এগিয়ে দিয়ে একদম মায়ের কোলের কাছে সরে এল মহিম। মা দেখলেন, সব অঙ্কই তো করা হয়ে আছে খাতায়। বললেন, "তুমি তো সব অঙ্কই করেছ বাবা। খাতা দেখতে ভুল করেছিলে?"

মহিম জোর দিয়ে বলল, "না মা, আমি তো ঠিকই খাতাটা দেখেছিলাম।"

মা একটু হেসে বললেন, "তা হলে কে আবার লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার খাতায় অঙ্কগুলো করে দিয়ে গেল? বোকা ছেলে কোথাকার!"

মহিমের তো ওই একটাই প্রশ্ন। কে খাতায় অঙ্কগুলো করে দিয়ে গেল? এ নিশ্চয়ই কুশির ধারে বসে থাকা আর-একজন মহিমেরই কাজ।

মা বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন।

মহিম মায়ের আঁচলের মধ্যে ঢুকে গিয়ে বিড়বিড় করে তিনবার সেই মন্ত্রটা আওড়ে গেল—

আমগাছের, জামগাছের, আকন্দগাছের ফুল।
মটুকুতভু, মটুকুতভু, ভূতকুটুমের দুল।

১ এপ্রিল ১৯৯২
অলংকরণ: সুব্রত চৌধুরী

কেন দেখা দিল না

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আমার বন্ধু শঙ্করকে গুয়াহাটি যেতে হয়েছিল অফিসের কাজে। আমিও তখন যাচ্ছিলাম দিল্লি হয়ে রাজস্থান। দু'জনে সম্পূর্ণ দু'দিকে যাব। দমদম এয়ারপোর্টে বসে গল্প করলাম খানিকক্ষণ। আমার প্লেন সাড়ে পাঁচটায় আর শঙ্করের প্লেন ছাড়বে সাড়ে ছ'টায়।

শঙ্কর বলল, ''তুই রাজস্থানে ঘুরবি শুনে আমার খুব লোভ হচ্ছে। অফিসের কাজ না থাকলে আমি তোর সঙ্গে চলে যেতাম।''

আমি বললাম, ''আমারও তো ওদিককার ট্রেনের টিকিট কাটা হয়ে গেছে। না হলে দিল্লির বদলে ঘুরে আসতাম গুয়াহাটি।''

প্লেনে ওঠার জন্য আমারই আগে ডাক পড়ল।

শঙ্কর জিজ্ঞেস করল, ''তুই কবে ফিরবি, সুনীল?''

আমি বললাম, ''কুড়ি তারিখ শনিবার সকালে।''

শঙ্কর বলল, ''আমি ফিরে আসব তার অনেক আগেই। তা হলে ওই কুড়ি তারিখ ফিরেই তুই আমার বাড়িতে চলে আসিস। তোর বেড়াবার গল্প শুনব। আর-রাত্তিরে আমরা খাব একসঙ্গে।''

আমি বললাম, ''ঠিক আছে, ওই কথাই রইল।''

আমি চলে গেলাম প্লেনের দিকে। তারপর দিল্লি ছুঁয়ে রাজস্থানে ঘোরাঘুরি করলাম বেশ কয়েকদিন ইচ্ছেমতন এক এক জায়গায় থেকেছি। কোথায় কোন হোটেলে উঠছি, তা আমার বাড়ির কেউ জানত না, জানবার দরকারও বোধ করেনি।

ফিরে এলাম ঠিক কুড়ি তারিখেই। আরও কয়েকদিন থেকে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আজকাল তো ট্রেনের টিকিট যে-কোনও সময় চাইলেই পাওয়া যায় না।

বাড়ি ফিরে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছি, দোতলার মুখে দাঁড়িয়ে আছে আমার ছোট ভাই। আমাকে দেখে তার মুখখানা যেন ছাই রঙের হয়ে গেল।

সে বলল, ''দাদা, তুই খবরটা শুনেছিস?''

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ''কী খবর?''

''তুই শঙ্করদার খবর এখনও জানিস না?''

''শঙ্করের খবর? কী হয়েছে শঙ্করের?''

আমার ছোটভাই চুপ করে গেল। আমি দৌড়ে ওপরে উঠে এসে তাকে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, ''কী হয়েছে? কিছু বলছিস না কেন?''

''শঙ্করদা মারা গেছে!''

কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন আমার জ্ঞান চলে গিয়েছিল। মাথায় কিছু ঢুকল না।

তারপর আমি চিৎকার করে বললাম, ''মিথ্যে কথা! হতেই পারে না!''

এই তো সেদিন দেখা হল শঙ্করের সঙ্গে। আমি বিদায় নেওয়ার সময় সে আমার হাত জড়িয়ে ধরে বলল, ''কুড়ি তারিখে দেখা হবে। আমার চেয়েও শঙ্করের স্বাস্থ্য অনেক ভাল। সুন্দর চেহারা। সে কী করে হঠাৎ মরে যাবে?''

কিন্তু এক-একটা ঘটনা থাকে, চিৎকার করে প্রতিবাদ জানালেও মিথ্যে হয়ে যায় না। এইসব খবর নিয়ে কেউ মিথ্যে ঠাট্টাও করে না।

শঙ্কর সত্যিই নেই। গুয়াহাটিতে গিয়ে তার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। কোনও চিকিৎসার আগেই তার শেষ নিশ্বাস পড়ে।

অন্য বন্ধুবান্ধবরা কেউ শঙ্করের মৃতদেহ দেখেনি। খবর পাওয়া গিয়েছিল প্রায় এক দিন পরে, কারণ টেলিফোনের লাইন পাওয়া যাচ্ছিল না। প্লেনে ফিরিয়ে আনার অনেক ঝামেলা। শঙ্করের মামা গুয়াহাটি চলে গিয়ে পোড়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

আমি সিঁড়ির ওপর বসে পড়লাম। আমার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল গড়াতে লাগল। শঙ্কর আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তার সঙ্গে আর কোনওদিন দেখা হবে না? আজ কুড়ি তারিখ, শনিবার, আজ সে আমাকে নেমন্তন্ন করে রেখেছিল, তার বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করার কথা। আজ আমি শঙ্করের মায়ের সামনে দাঁড়াব কী করে?

শঙ্করের মৃত্যুর পরেও তার চিঠি আসতে লাগল। ও খুব চিঠি লিখতে ভালবাসত। পোস্টকার্ডে ছোট ছোট চিঠি লিখত অনেককে। সেইসব চিঠি এসে পৌঁছতে লাগল অনেক পরে। সেই সব চিঠি দেখলেই বুকটা ধক করে ওঠে। মনে হয় না মানুষটা বেঁচে আছে?

এয়ারপোর্টে শেষ দেখা শঙ্করের সেই চেহারা এখনও আমার চোখে ভাসে, তার কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পাই।

তারপর কেটে গেল তিন মাস। শঙ্করের বাড়ির বৈঠকখানায় আমাদের বন্ধুদের একটা আড্ডা ছিল, এখন আর সেখানে কেউ যায়ই না। তবু প্রায়ই শঙ্করের কথা মনে পড়ে।

আমি আবার একটা নেমন্তন্ন পেলাম মানসের জঙ্গল ঘুরে দেখার। জঙ্গল আমার খুব প্রিয়। ডাক পেলেই ছুটে যাই। আর মানস ফরেস্ট তো অতি বিখ্যাত। থাকার ব্যবস্থা জঙ্গলের মধ্যেই, ডাকবাংলোতে।

তিন দিন ধরে সেই জঙ্গলে প্রচুর ঘোরাঘুরি করার পর একজন অসমিয়া বন্ধু আমাকে তার জিপ গাড়িতে করে পৌঁছে দিয়ে গেল গুয়াহাটির সার্কিট হাউসে। সেখানে আমার নামে একটা ঘর বুক করা আছে। কী একটা কারণে যেন অসমের সব সরকারি অফিসে স্ট্রাইক চলছে, তাই সার্কিট হাউসে খাবার পাওয়া যাবে না। অসমিয়া বন্ধুটি বাইরে থেকে একগাদা খাবার কিনে নিয়ে এল আমার জন্য।

কিছুক্ষণ গল্প করার পর সে বিদায় নিল। রাত প্রায় সাড়ে দশটা। সারাদিন জিপ গাড়িতে চেপে এসেছি বলে ধুলোয় গা একেবারে চিটচিটে হয়ে গেছে। তাই আমি স্নান সেরে নিলাম ভাল করে। তারপর খেতে বসলাম।

আজ আর ডাকলে বেয়ারাদেরও পাওয়া যাবে না। প্লেট, চামচ কিংবা এক গ্লাস জলও কেউ দেবে না। সবাই ছুটি নিয়েছে। সার্কিট হাউসের আর কোনও ঘরে কোনও লোক নেই। এত বড় সার্কিট হাউসটা একেবারে নিস্তব্ধ।

আমি একা থাকতে ভালবাসি। হাতে একটা বই খুলে নিয়ে একা একা খাওয়াটাও পছন্দ করি। যত ইচ্ছে সময় লাগুক, কেউ মাথা ঘামাবে না।

একখানা লুচিতে আলুর দম ভরে সবে মাত্র মুখে দিয়েছি, জানলার কাছে কীসের যেন একটা শব্দ হল। মুখ তুলতেই মনে হল, কে যেন জানলার পাশ দিয়ে চট করে সরে গেল।

আমি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলাম, ''কে?''

কেউ কোনও উত্তর দিল না। যতদূর জানি, আজ সার্কিট হাউসে কোনও লোক নেই। তা হলে কে দাঁড়িয়ে ছিল? কেউ থাকলেও লুকিয়ে পড়বে কেন? চোর-টোর নাকি?

দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিয়ে দেখলাম। না, কেউ নেই। তা হলে আমারই ভুল হয়েছে। জানলার পরদাটা উড়ছে, সেই জন্যই ভুল হতে পারে।

ফিরে এসে বইটা তুলে নিয়ে খাওয়া শুরু করতেই আবার ঠকাস করে জানলার একটা পাল্লা বন্ধ হয়ে গেল। এবার যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম, জানলার পাশ দিয়ে সরে গেল একটা মুখ।

আবার ধমকের সুরে চেঁচিয়ে বললাম, ''কে? কে ওখানে?''

কোনও উত্তর নেই। চোখে এত ভুল দেখছি!

উঠে গিয়ে আবার দরজা খুলে দেখলাম, কেউ

কোথাও নেই। অন্য সব দরজায় তালা লাগানো, মাঝখানে লম্বা বারান্দা, চোর যদি হয় সে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে শব্দ করবে কেন? কেউ কি আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে!

এই লুকোচুরি কথাটা মনে আসতেই মনে পড়ল শঙ্করের কথা।

শঙ্কর এই গুয়াহাটিতে এসেই মারা গেছে। শঙ্করের বড়মামা ছাড়া আর আমাদের চেনাশোনা কেউ শঙ্করের মৃতদেহ দেখেনি। মামা-ভাগ্নেতে মিলে কোনও ষড়যন্ত্র করেনি তো? কোনও কারণে শঙ্কর গুয়াহাটিতে লুকিয়ে থেকে নিজের মৃত্যুসংবাদ রটিয়ে দিয়েছে?

কিন্তু শঙ্করের ছোট ভাই আর বোনকে আমি কী দারুণ কাঁদতে দেখেছি। শঙ্করের মা শোকে-দুঃখে যেন পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। মায়ের কাছে কি কেউ ছেলের নামে এমন মিথ্যে বলতে পারে? শঙ্করের বড়মামাও খুব গম্ভীর ধরনের মানুষ, তিনি এ ধরনের [illegible] পারেন না।

[illegible]

আবার খাওয়া [illegible] মধ্যে একটা দমকা হাওয়া ঢুকে [illegible], ঘরের [illegible]দিকের দেওয়ালে একটা জঙ্গলের ছবি, আর-একদিকের দেওয়ালে একটা ক্যালেন্ডার। হাওয়ায় ক্যালেন্ডারটা খুলে পড়ে গেল মাটিতে।

আমি ক্যালেন্ডারটা তুলবার জন্য উঠতে গিয়েও ভাবলাম, থাক, থাক, খাওয়ার পর তুললেই হবে।

তখনই মনে পড়ল, আজকের দিনটাও শনিবার, আর এ মাসের কুড়ি তারিখ। সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরে একটা শিহরন বয়ে গেল।

আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, "শঙ্কর, শঙ্কর, তুই কি লুকিয়ে আছিস? আমার সামনে চলে আয়। আমাকে সব কথা বল!"

কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

তিন মাস আগেকার এক কুড়ি তারিখ, শনিবারে শঙ্করের সঙ্গে আমার খাওয়াদাওয়া করার কথা ছিল, আজও সেইরকম একটা দিন। শঙ্কর নেই। আজ কি আমি একা একা খেতে পারি?

খাবার সরিয়ে রেখে আমি বাথরুমে গিয়ে হাত ধুয়ে নিলাম। শঙ্করের জন্য বুকটা হু হু করে উঠল।

বাথরুমের জানলা দিয়ে বাইরে দেখা যায় অন্ধকার একেবারে ঘুটঘুট করছে। পাশেই বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদী। জলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু নদীটা দেখা যাচ্ছে না।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখি, ঝড়ের মতন হাওয়ায় জানলার পরদা উথালপাথাল করছে। এ ঘরের সব দরজা-জানলায় বড় বড় ভারী পরদা। এমন পরদা, যার আড়ালে কোনও মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে।

একেবারে ফাঁকা সার্কিট হাউস, চোর-ডাকাত ঢুকে পড়া অসম্ভব নয়। আমার কাছে টাকা-পয়সা প্রায় কিছুই নেই, কিন্তু চোর-ডাকাতরা তা জানবে কী করে?

আমি সবক'টা পরদা সরিয়ে সরিয়ে দেখলাম। দরজায় লাগালাম খিল আর ছিটকিনি। কাছের জানলাগুলোতে শক্ত গ্রিল লাগানো আছে, কেউ ঢুকতে পারবে না।

বইটা পড়ার চেষ্টা করতেই ঝড়ের হাওয়ায় একটা জানলার পরদা খুব উড়তে লাগল। কাচের পাল্লা তো বন্ধ করেছিলাম, খুলে গেল কী করে?

উঠে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম। ছিটকিনিটা একটু আলগা মতন, হাওয়ার ধাক্কায় নিজে নিজেই খুলে গেছে। হাওয়া আসছে দারুণ জোরে। অন্য একটা জানলার পরদা সরিয়ে দেখলাম, তার দুটো পাল্লাই খোলা, এটা বোধহয় বন্ধই করিনি।

এই প্রথম আমি ভয় পেলাম। একই দিকে দুটো জানলা। দুটোই নদীর দিকে। কিন্তু একটা জানলার পরদা দমকা হাওয়ায় উড়ছিল, আর অন্য জানলার পরদাটা একটুও নড়েনি। দুটো জানলাই খোলা, দুটো জানলা দিয়েই তো সমান হাওয়া আসার কথা।

বাইরে কিছুই দেখা যায় না। এমন হতে পারে, অন্য জানলাটার কাছেই কোনও বড় গাছ আছে কিংবা দেওয়াল-টেওয়াল কিছু আছে, তাই হাওয়া বাধা পাচ্ছে। এ ছাড়া আর তো কোনও কারণ থাকতে পারে না।

এইসব কথা ভাবলেও সত্যি কথা বলছি, আমার বেশ ভয় করতে লাগল।

এখন আর বই পড়া যাবে না। দুটো জানলায় ভাল করে ছিটকিনি এঁটে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।

একটু পরেই মনে হল, জানলায় কেউ ঠক ঠক করছে।

আমি মনে মনে বলতে লাগলাম, কেউ না। কেউ না! ওটা ঝড়ের শব্দ, বাতাসের ধাক্কা। তা ছাড়া আর কিছুই নয়।

হঠাৎ প্রচণ্ড একটা ধাক্কায় সেই প্রথম জানলাটার পাল্লা খুলে গেল হাট করে, ঝোড়ো বাতাস ঘরের মধ্যে যেন তাণ্ডব শুরু করে দিল। ঝনঝন শব্দে পড়ে ভেঙে গেল দেওয়ালের ছবিটা।

আমি দারুণ ভয়ে আঁ আঁ চিৎকার করে উঠলাম।

অন্য জানলাটায় একটুও শব্দ নেই, বাতাসের ঝাপটা নেই। তা হলে এ নিশ্চয়ই অলৌকিক কাণ্ড!

শঙ্কর নেই, তবে কি তার প্রেতাত্মা দেখা করতে চায় আমার সঙ্গে? অর্থাৎ, ভূত।

এতকাল ভূতে বিশ্বাস করিনি। কিন্তু এখন ভয়ে কাঁপিয়ে দিচ্ছে সর্বাঙ্গ। সত্যিই মনে হচ্ছে, অন্ধকার ঘরের মধ্যে কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বেড সুইচটা টিপে আলো জ্বালতেই অবশ্য দেখা

গেল, সব খালি। কেউ নেই, এলোমেলো বাতাস বইয়ের [illegible] নিয়েছে।

এবার আমি ঠাস করে নিজের গালে একটা চড় কষালাম।

যদি শঙ্কর ভূত হয়ে এসেও থাকে, তাতে আমার ভয় পাওয়ার কী আছে? শঙ্কর আমার প্রতি প্রিয় বন্ধু ছিল, সে কি আমার কোনও ক্ষতি করবে? কখনও না।

ছেলেমানুষের মতন ভয় না পেয়ে আমার ধৈর্য ধরে দেখা উচিত। ভূত আছে না নেই, তার প্রমাণ হয়ে যাবে। নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভূত হলে ভয় পাওয়ার কোনও কারণই নেই। তার কাছ থেকে ভূতেদের ব্যাপারস্যাপার সব জেনে নেওয়া যাবে।

নিজেকে চড় মারার ফলে অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেলাম। খুলে দিলাম দুটো জানলার পাল্লা। আসুক হাওয়া। আরও যদি কেউ আসতে চায় তো আসুক।

বিছানা ছেড়ে চেয়ারে বসলাম বইটা নিয়ে। জোরে বললাম, ‘‘শঙ্কর আয়, দেখা দে। কিংবা যদি কিছু বলতে চাস, বল। আমি ভয় পাব না। তোর যেরকম চেহারাই হোক, ভয় পাব না। আয় শঙ্কর, আয়, তোর সঙ্গে আমার অনেক গল্প বাকি আছে।’’

তারপর মাঝে মাঝে বই পড়া আর মাঝে মাঝে জানলার দিকে তাকানো, এইভাবে কেটে গেল সারারাত। চেয়ারে বসে। কেউ এল না। কেউ কিছু বলল না। শঙ্কর দেখা দিল না।

১ এপ্রিল ১৯৯২
অলংকরণ: সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
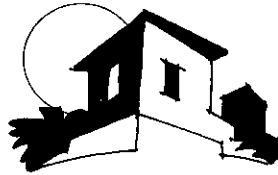
টেলিফোনে

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

টেলিফোন তুলতেই একটা গম্ভীর গলা শোনা যাচ্ছে, "সিক্স ফোর নাইন ওয়ান... সিক্স ফোর নাইন ওয়ান... সিক্স ফোর নাইন ওয়ান...।"

সকাল থেকে ডায়াল-টোন নেই। টেলিফোনের হরেক গণ্ডগোল থাকে বটে, কিন্তু এ অভিজ্ঞতা নতুন। গলাটা খুবই যান্ত্রিক এবং গম্ভীর। খুব উদাসীনও।

প্রদীপের কয়েকটা জরুরি টেলিফোন করার ছিল। করতে পারল না।

কিন্তু কথা হল, একটা অদ্ভুত কণ্ঠস্বর কেবল বারবার চারটে সংখ্যা উচ্চারণ করে যাচ্ছে কেন? এর কারণ কী? ঘড়ির সময় জানার জন্য বিশেষ নম্বর ডায়াল করলে একটা যান্ত্রিক কণ্ঠে সময়ের ঘোষণা শোনা যায় বটে, কিন্তু এ তো তা নয়। মিনিটে মিনিটে সময়ের ঘোষণা বদলে যায়, কিন্তু এই ঘোষণা বদলাচ্ছে না।

অফিসে এসে সে তার স্টেনোগ্রাফারকে ডেকে টেলিফোনের ত্রুটিটা এক্সচেঞ্জে জানাতে বলেছিল। তারপর কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সে একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির বড় অফিসার। বহু বছর দিল্লিতে ছিল, সম্প্রতি কলকাতায় বদলি হয়ে এসেছে। কোম্পানিই তাকে বাড়ি, গাড়ি ও টেলিফোন দিয়েছে। তার আগে এই পদে ছিলেন কুরুপ্পু নামে দক্ষিণ ভারতের একজন লোক। তিনি রিটায়ার করে দেশে ফিরে গিয়ে ফুলের চাষ করছেন বলে শুনেছে প্রদীপ। খুবই দক্ষ ও অভিজ্ঞ মানুষ ছিলেন তিনি। রিটায়ার করার বয়স হলেও কোম্পানি তাঁকে ছাড়তে চায়নি। বরং আরও বড় পোস্ট দিয়ে ধরে রাখতে চেয়েছিল। কুরুপ্পু কিছুতেই রাজি হননি।

দুপুরে লাঞ্চের আগে সে একটি পার্টিকে একটা বকেয়া বিলের জন্য তাগাদা করতে টেলিফোন তুলে ডায়ালের প্রথম নম্বরটার বোতাম টিপতেই আচমকা সেই উদাসীন, গম্ভীর, যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, সিক্স ফোর নাইন ওয়ান... তারপরই অবশ্য কণ্ঠস্বর থেমে গেল।

প্রদীপ খুবই অবাক হয়েছিল। সামলে নিয়ে বাকি নম্বর ডায়াল করতে রিং বাজল এবং ওপাশে একজন ফোনও ধরল। প্রয়োজনীয় কথা সেরে নিয়ে প্রদীপ খুব চিন্তিতভাবে অফিসের ইলেকট্রনিক টেলিফোনটার দিকে চেয়ে রইল। এই ফোনেও কণ্ঠস্বরটা এল কী করে? এসব হচ্ছেটা কী?

কলকাতার বাড়িতে প্রদীপের আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। তার মা, বাবা, বোন, ভাই সব দিল্লিতে। সে বিয়ে করেনি। একা থাকে। একজন রান্নার ঠিকে লোক রেঁধে দিয়ে যায়। আর ঘরদোর সাফ করা, বাসন মাজা ও কাপড় কাচার জন্য ঠিকে একজন কাজের মেয়ে আছে। তারা কেউ বাড়িতে থাকে না। আলিপুরের নির্জন অভিজাত পাড়ায় তিনতলার মস্ত ফ্ল্যাটে প্রদীপ সম্পূর্ণ একা। তবু প্রদীপ হঠাৎ ফ্ল্যাটের নম্বর ডায়াল করল এবং শুনতে পেল ওপাশে রিং হচ্ছে।

মাত্র তিনবার রিং বাজতেই কে যেন ফোনটা ওঠাল। কিন্তু কথা বলল না।

প্রদীপ বলল, "হ্যালো। হ্যালো।"

জ্বলছিল। তবে আলো জ্বেলে ঝলমলে আধুনিক ফ্ল্যাটটার দিকে চেয়ে তার ভয় ভয় ভাবটা কেটে গেল। তবে ফোনটার ধারেকাছে সে আর গেল না।

প্রদীপের গভীর ঘুম ভাঙল রাত দুটো নাগাদ। হলঘরে ফোন বাজছে। ঘুমচোখে সে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। দিল্লিতে মা-বাবার শরীর খারাপ হল না তো!

ফোন ধরতেই শিউরে উঠল সে। সেই যান্ত্রিক উদাসীন গম্ভীর গলা বলতে লাগল, "সিক্স ফোর নাইন ওয়ান... সিক্স ফোর নাইন ওয়ান... সিক্স ফোর নাইন ওয়ান...।"

ফোনটা রেখে দিল সে। বাকি রাতটা আর ঘুম হল না। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে কাটিয়ে দিল।

কলকাতার টেলিফোন ব্যবস্থা যে খুব খারাপ, তা প্রদীপ জানত। তবু সকালে ব্রেকফাস্টের সময় টেলিফোন বেজে উঠতেই প্রদীপ যখন কম্পিত বক্ষে গিয়ে টেলিফোন ধরল, তখন একটি অমায়িক কণ্ঠস্বর বলল, "স্যার, আপনি টেলিফোন খারাপ বলে কমপ্লেন করেছিলেন কাল। কিন্তু আমরা টেস্ট করে দেখেছি আপনার লাইনে তো কোনও গণ্ডগোল নেই। লাইন তো চালু আছে।"

"কিন্তু আমি যে টেলিফোনে একটা অদ্ভুত গলা শুনতে পাচ্ছি।"

"হয়তো ক্রস কানেকশন হয়ে গিয়েছিল। আমাদের যন্ত্রপাতি সব বহু পুরনো, তাই মাঝে মাঝে ওরকম হয়। আপনি ডায়াল করে দেখুন, এখন লাইন ঠিক আছে।"

কেউ জবাব দিল না। কিছুক্ষণ পর ফোনটা কেউ আস্তে নামিয়ে রাখল।

দুপুরবেলাতেও প্রদীপের শরীর হিম হয়ে এল। এসব হচ্ছেটা কী? যদি রং নম্বরই হয়ে থাকে তা হলেও তো পাশ থেকে কেউ না কেউ সাড়া দেবে!

বিকেলে পার্টি ছিল, ফ্ল্যাটে ফিরতে একটু রাতই হয়ে গেল তার। আর ফেরার সময় মাথায় দুশ্চিন্তাটা দেখা দিল। সে অলৌকিকে বিশ্বাসী নয়, কিন্তু কোনও ব্যাখ্যাও তো পাওয়া যাচ্ছে না।

দরজা খুলে ফ্ল্যাটে ঢোকার পর একটু গা ছমছম

বাস্তবিকই লোকটা কানেকশন কেটে দেওয়ার পর ডায়াল-টোন চলে এল এবং অফিসের নম্বর ডায়াল করতেই লাইনও পেয়ে গেল প্রদীপ।

ফোন স্বাভাবিক হল বটে, কিন্তু প্রদীপের মাথা থেকে 'সিক্স ফোর নাইন ওয়ান...' গেল না। কাজকর্মের ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে নম্বরটা মনে পড়তে লাগল। এক-আধবার প্যাডে নম্বরটা লিখেও ফেলল।

বিকেলের দিকে কয়েকটা চিঠি সই করতে গিয়ে হঠাৎ চিঠির ওপরে টাইপ-করা তারিখটা দেখে সে একটু সচকিত হল। টু ফোর নাইন্টি ওয়ান। অর্থাৎ একানব্বই সালের দোসরা এপ্রিল। সিক্স ফোর নাইন ওয়ান মানে কি এপ্রিলের ছয় তারিখ?

কথাটা টিকটিক করতে লাগল মাথার মধ্যে। অফিস থেকে বেরিয়ে সে গেল একটা ক্লাবে টেনিস খেলতে। তারপর একটা হোটেলে রাতে খাবার খেয়ে ফ্ল্যাটে ফিরে এল। টেনিস খেলার ফলে ক্লান্ত শরীরে খুব ঘুম পাচ্ছিল। শোওয়ার আগে সে সভয়ে টেলিফোনটার দিকে চেয়ে রইল। দিল্লিতে ফোন করে মা-বাবার একটা খবর নেওয়া দরকার। ফোন করাটা উচিত হবে কি? যদি আবার...?

না, ফোন তুলে ডায়াল-টোনই পাওয়া গেল। দিল্লির লাইনও পাওয়া গেল একবারেই। মা, বাবা, ভাই ও বোনের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে মনটা হালকা লাগল। আজ শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

তিন-চারদিন আর কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটল না। টেলিফোন স্বাভাবিক। দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগটাও আস্তে আস্তে সরে যেতে লাগল মন থেকে।

কিন্তু রবিবার সকালে গলফ খেলতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল প্রদীপ। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। প্রদীপ অন্যমনস্কভাবে টেলিফোন তুলতেই সেই অবিস্মরণীয় যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল, দিস ইজ দ্য ডে... দিস ইজ দ্য ডে... দিস ইজ দ্য ডে... দিস ইজ দ্য ডে...।

সকালের আলোর মধ্যেও ভয়ে হঠাৎ হিম হয়ে গেল প্রদীপ। চিৎকার করে বলল, "হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অব ইট?"

অবিচলিত কণ্ঠস্বর একইভাবে বলে যেতে লাগল, "দিস ইজ দ্য ডে... দিস ইজ দ্য ডে..."

প্রদীপ চিৎকার করে ধমকাল, দু'-একটা নির্দোষ গালাগালও দিল, কাকুতি-মিনতি করল। কিন্তু কণ্ঠস্বরের অধিকারী ওই একটা বাক্যই উচ্চারণ করে গেল।

এপ্রিলের কলকাতা এমনিতেই গরম। ফোনে চেঁচামেচির পর আরও ঘেমে উঠল সে। ফোনটা রেখে কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে রইল। এর মানে কী?

হঠাৎ খেয়াল হল, আজ এপ্রিলের ছয় তারিখ। সিক্স ফোর নাইন ওয়ান। আজকের দিনটা সম্পর্কে কেউ তাকে কিছু বলতে চাইছে কি? কী বিশেষত্ব এই দিনটার?

আজ তো চমৎকার একটা দিন। আজ সারাদিন তার দারুণ প্রোগ্রাম। তাদের অফিসের সবচেয়ে বড় ক্লায়েন্ট মান্টু সিং সরখেরিয়ার আমন্ত্রণে তারা আজ যাচ্ছে কলকাতার বাইরে দিল্লি হাইওয়ের কাছে সরখেরিয়ার বিশাল বাগানবাড়িতে। সকালে সেখানে গলফ আর টেনিসের আয়োজন, দুপুরে বিশাল লাঞ্চ, সন্ধেবেলায় হাই টি। তারপরও গানবাজনা হবে। একেবারে ডিনার সেরে ফেরার কথা। এমন চমৎকার মজায় ভরা দিনটা নিয়ে চিন্তা করার কী আছে?

ফুরফুরে হাওয়ায় হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে দিল্লি রোড হয়ে সরখেরিয়ার বাগানবাড়িতে পৌঁছনোর সময় দুশ্চিন্তাটা কখন উবে গেল। অনেক অতিথি জড়ো হয়েছে, হাসি-হট্টগোল চলছে। গলফ কিট নিয়ে বেরিয়ে পড়ল প্রদীপ, এক কাপ কফি খেয়ে নিয়েই।

সরখেরিয়ার খামারের পাশেই গলফের বিশাল মাঠ। মাঝে মধ্যে ঝোপ-জঙ্গল, জলা। অনেক গলফ-খেলোয়াড় জড়ো হয়েছেন। খেলতে খেলতে সব দুশ্চিন্তা সরে গেল মাথা থেকে।

বলটা একটা ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল। প্রদীপ বল খুঁজতে সেখানে ঢুকল। জায়গাটা যেন অন্ধকার এবং দুর্গম। কিন্তু জঙ্গলটা এমন জায়গায়
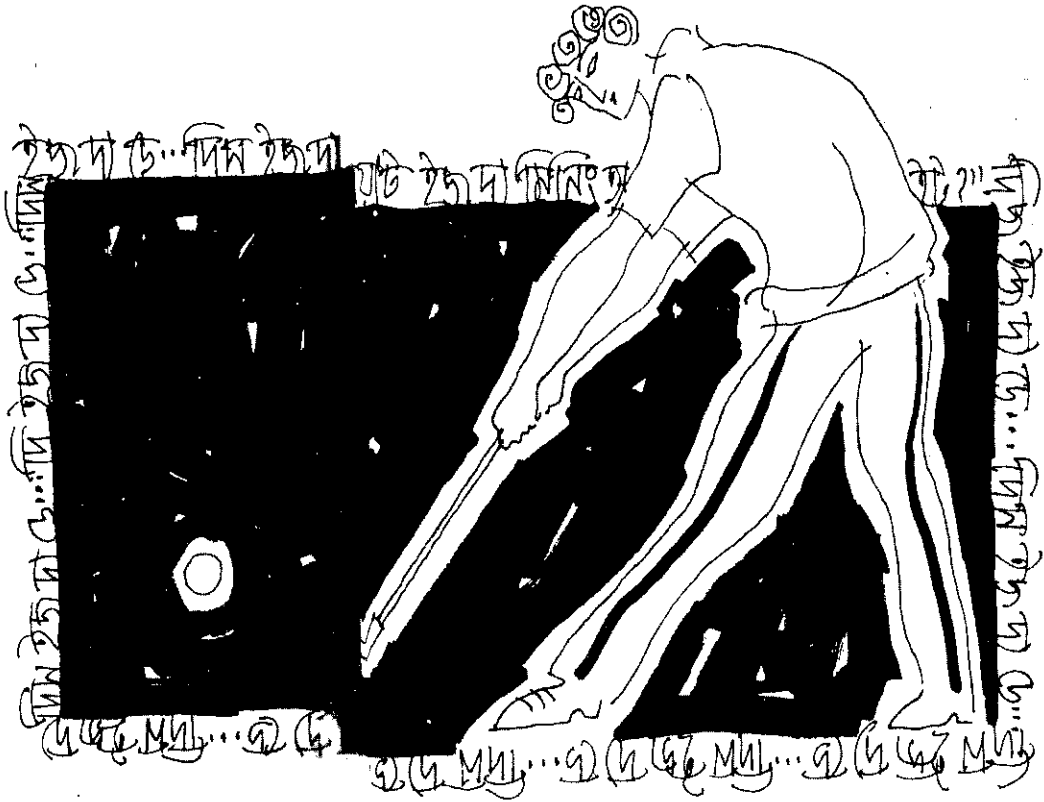
যে, গর্ত পর্যন্ত যেতে হলে এই জঙ্গলটি পেরোতেই হবে।

সেই জঙ্গলে নিচু হয়ে বলটা খুঁজবার সময়ে আচমকাই একটা দূরাগত কণ্ঠ যান্ত্রিকভাবে হঠাৎ বলে উঠল, ''দিস ইজ দ্য ডে...''

একটা ক্লিক করে শব্দ হল কোথাও। সন্দেহজনক কিছু নয়। কিন্তু হঠাৎ প্রদীপের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ই যেন কিছু জানান দিল। সে বিদ্যুৎ-গতিতে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গেই বজ্রপাতের মতো একটা বন্দুকের শব্দ হল। গাছের গোটা কয়েক ডাল প্রচণ্ড শক্তিশালী বুলেটের ঘায়ে ভেঙে পড়ল। তারপরই এক জোড়া পায়ের দ্রুত পালানোর শব্দ।

প্রদীপ যখন উঠে বসল তখন খানিকটা হতভম্ব হয়ে চারদিক দেখল সে। কেউ তাকে মারার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু খুবই সামান্যর জন্য সে বেঁচে গেছে।

উঠে গায়ের ধুলোটুলো ঝেড়ে চারদিকটা দেখল সে। কে তাকে মারতে চায়? কেনই বা?

বন্দুকের শব্দ শুনে কেউ ছুটে আসেনি। তার কারণ আশপাশে অনেকেই শিকারে বেরিয়েছে। বন্দুকের শব্দ হচ্ছেও আশপাশে।

সারাদিনটা খুব অন্যমনস্কতার মধ্যে কেটে গেল প্রদীপের। ঘটনাটার কথা সে কারও কাছে প্রকাশ করল না। রাতে বাড়ি ফিরে সে টেলিফোনটার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, টেলিফোনে এই দিনটার

পূর্বাভাস দেওয়া হচ্ছিল তাকে। কিন্তু কেন? কে দিচ্ছিল?

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ টেলিফোন বেজে উঠল। সভয়ে টেলিফোন ধরল প্রদীপ।

"হ্যালো।"

ওপাশ থেকে একটি ভরাট গলা তার নম্বরটা উচ্চারণ করে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, "এই নম্বর তো?"

"হ্যাঁ। আপনি কে?"

"আমি কুরুপ্পু। আপনি কে?"

"প্রদীপ রায়।"

"ওঃ, হ্যাঁ। আমি আপনার নাম জানি। দিল্লিতে ছিলেন। শুনুন, জরুরি একটা কথা আছে। সরখেরিয়ার এক কোটি চব্বিশ লাখ টাকার একটা বিল আছে। আপনি কি সেটা পাশ করে দিয়েছেন?"

"না। বিলটা একটু ইররেগুলার। ক্ল্যারিফাই করার জন্য ডিপার্টমেন্টকে বলেছি।"

"খুব ভাল। ওই বিলটা একদম জালি। কিন্তু বিলটা আটকালে আপনার বিপদ হতে পারে। সরখেরিয়া বিপজ্জনক লোক।"

"বোধহয় আপনি ঠিকই বলেছেন। আজ কেউ আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল।"

"হ্যাঁ, এরকম ঘটনা আরও ঘটতে পারে। কিন্তু ভয় পাবেন না, টেলিফোনটার দিকে মনোযোগী থাকবেন।"

এইবার প্রদীপ চমকে উঠে বলে, "হ্যাঁ, টেলিফোনেও একটা অদ্ভুত কাণ্ড হচ্ছে..."

কুরুপ্পু স্নিগ্ধ গলায় বললেন, "জানি, মিস্টার রায়, ভূত মাত্রই কিন্তু খারাপ নয়। অন্তত ওই ফ্ল্যাটটায় যে থাকে সে খুবই বন্ধু-ভূত। তাকে অবহেলা বা উপেক্ষা করবেন না, ভয়ও পাবেন না। তা হলেই নিরাপদে থাকতে পারবেন। বিপদের আগেই সে সাবধান করে দেবে। আমাকেও দিত। তার পরামর্শেই আমি রিটায়ার করে ফুলের চাষে মন দিয়েছি। আচ্ছা। গুড নাইট।"

প্রদীপ হাতের স্তব্ধ টেলিফোনটার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল।

১ এপ্রিল ১৯৯২
অলংকরণ: সুব্রত চৌধুরী

বন্ধ ঘরে কান্নার শব্দ

শৈলেন ঘোষ

আমার নাম সায়র। এই পৃথিবীতে আমি একা। তাই আমি জানি না, 'সায়র' নামে কে আমায় প্রথম ডেকেছে। আমার মনে নেই আমার মাকে। জানি না কে আমার বাবা। আশ্চর্য, কে আমায় এত বড় করেছে তোমার মতো? কেমন করে কেটে গেল আমার এত বর্ষার রাত, আর শীতের সকাল? কার কোলের দোলনায় দুলে দুলে আমি গান শুনেছি, নয়তো গল্প? কিছুই জানি না। শুধু জানি, গানের সুরে আমার মন দুলে ওঠে। আমি গান গাইতে পারি।

হ্যাঁ, আমি গান গাই পথে পথে। এই আকাশের নীচে। একটু একটু করে বড় হয়েছি যত, একটু একটু চিনতে শিখেছি আকাশটাকে। এই আকাশই আমার বন্ধু। আমি গান গাইলে আকাশ আমায় আদর করে। আকাশের আদর ওই ছোট্ট ছোট্ট তারার আলোর বিন্দু। টুপটাপ গড়িয়ে পড়ে আমার চোখে। আমি ঘুমিয়ে পড়ি।

গান আমি গাই ঠিকই, তবে কি আর তেমন গাইতে পারি? অনেকে কেমন বাজনা বাজিয়ে গান গায়। আমার বাজনাও নেই, কিচ্ছুই নেই। থাকলেই বা কে শিখিয়ে দিত। কেউ না! গানও আমায় কেউ শেখায়নি। কেউ গান গাইলে শুনি। শুনতে শুনতে আমার সুরও গুনগুনিয়ে ওঠে। আমি শিখে ফেলি। তারপর পথের ছেলে পথে পথে পাড়ি দিই, গান গাইতে গাইতে। কখনও নদীর ছলাতকার আমায় হাতছানি দেয়। আমি ছুটে যাই নদীর কিনারে। কখনও বনের সবুজ যেন বলে, "এসো আমার কাছে।" আমি বনের আলোছায়ায় হারিয়ে যাই। সেখানে কত পাখি। যত পাখি, তত রং, তত গান। আমি বলি, "ও পাখি, আমায় তুমি গান শেখাবে?" পাখি উড়ে পালায়। আমি দাঁড়িয়ে থাকি একা। তারপর চমকে উঠি, যখন কানে আসে ঘণ্টার শব্দ। বন ডিঙিয়ে আমি আবার ছুটি। ছুটতে ছুটতে দেখতে পাই কত বলদ চলেছে দলে দলে। তাদের গলায় ঘণ্টা। তাদের পিঠে টাটকা আনাচ। নয়তো মশলাপাতি বস্তা-বাঁধা। কত মানুষ আগু-পিছু হাঁটছে। কারও মাথায় চুপড়ি-ঝুড়ি। গুড়ের কলসি। কারও কাঁধে মন্ডা-মিঠাই, দইয়ের হাঁড়ি। ধুতি-শাড়ি, রং বাহারি। ওরা হাটে চলেছে। আমিও ছুটি ওদের দলে। যাই হাটে। যেদিনই হাট যে-গাঁয়ে, সেইদিনই যাই সেই গাঁয়ে। গান গাই।

এমনই এক হাটের দিন। আমি আনমনে গান গাইছিলুম গাছের গায়ে হেলান দিয়ে। কে এক ভদ্দরলোক, কখন যে থমকে দাঁড়িয়ে আমার গান শুনছিল আমি খেয়াল করিনি। কিন্তু হঠাৎ যখন সে ডাকল, "ও খোকা", আমি থতমত খেয়ে গান থামিয়েছি। চেয়ে দেখি, একজন ধোপদুরস্ত ভদ্দরলোক আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কিছু বলার আগেই লোকটি জিজ্ঞেস করল, "তুই কোথা থাকিস?"

আমি বললুম, "আমায় চেনো না? আমার নাম সায়র। আমি তো এইখানেই থাকি।"

"এইখানে!" অবাক হল লোকটি গাছের দিকে তাকিয়ে। তারপর আবার জিজ্ঞেস করল, "তোর মা-বাবা নেই? ঘরদোর?"

আমি হাসলুম। হাসতে হাসতে বললুম, ‘‘থাকলে আমি এখানে থাকব কেন!’’ বলতে গিয়ে দৃষ্টি আমার আকাশে পড়ল। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, ‘‘আকাশ আমায় ভালবাসে।’’

লোকটি চমকে তাকাল আকাশের দিকে নিমেষের জন্য। তারপর আবার আমার মুখের দিকে চোখ নামাল। আমি শুনতে পেলুম, সে অস্ফুট স্বরে বলল, ‘‘এমন মিষ্টি গলা তোকে কে দিল! কে শেখাল গান!’’

আমি হেসে উঠলুম। লোকটি চুপ করে গেল। আমি হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালুম। লোকটি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘‘কোথা যাচ্ছিস?’’

আমি বললুম, ‘‘দেখি।’’

‘‘আর-একটা গান শোনাবি আমাকে?’’

আমি উত্তর দিলুম, ‘‘আর আমার গান গাইবার ক্ষেমতা নেই। আমার খিদে পেয়েছে।’’ বলতে বলতে আমি পা বাড়ালুম।

‘‘দাঁড়া।’’

তার পিছুডাক শুনে দাঁড়াতেই হল।

‘‘আমার সঙ্গে যাবি?’’ লোকটি আমার সামনে এসে জিজ্ঞেস করল।

‘‘কোথায়?’’

সে বলল, ‘‘আমার বাড়িতে। আমি তোর গান শুনব।’’

আমার আবার হাসি পেয়ে গেল। বললুম, "তুমি তো বেশ লোক। পেটে খিদে নিয়ে তোমায় গান শোনাব আমি?"

লোকটি বলল, "তোকে পেটভরে খাওয়াব আমি?"

আমার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলুম, "তোমার বুঝি আমাকে দেখে দয়া হচ্ছে?"

সঙ্গে সঙ্গে লোকটি উত্তর দিল, "ছিঃ ছিঃ, ওকথা কেন বলছিস! তোকে আমার ভাল লাগছে।"

আমার বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। কেননা, আমার নিজেরই যে নিজেকে কোনওদিন ভাল লাগে না। আমার গায়ের এই জামাকাপড়টা দেখো, যেমন ছেঁড়া, তেমনই ময়লা। আমার মুখের ছিরি যে কতটা সুচ্ছিরি, আমি জানি না। নিজের মুখ তো আর নিজে কেউ দেখতে পায় না। অবশ্য আয়না থাকলে অন্য কথা। তবে আমার মুখের ছায়া আমি জলে দেখেছি অনেক। তাতে ছিরিবিচ্ছিরির কী বুঝবে মানুষ! কিন্তু আমার পা দুটো দেখো, ধুলোয় ভর্তি। আর মাথার চুলে যে কোন জন্মে তেল পড়েছে, সে এক ভগবান ছাড়া কেউ জানে না। তাই, এই ভদ্দরলোকটির আমাকে দেখে যে কেমন করে ভাল লাগল, ভেবে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। তার মুখের দিকে হতবাক হয়ে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলুম। হয়তো আমায় অমন করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, "যাবি না?"

সত্যি বলতে কী, তার মুখখানা দেখে লোকটিকে সন্দেহ করতে আমার কষ্ট হল। তবু তাকে জিজ্ঞেস করলুম, "আচ্ছা ধরো, তোমার বাড়িতে একপেট খেয়ে আমি যদি তোমাকে গান না শোনাই?"

লোকটি হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বলল, "না শোনালে আমি আর কী করব!"

"আমাকে মারবে না?"

তোমাকে কী বলব, আমার মুখে এমন একটা কথা শুনে লোকটি আমায় জড়িয়ে ধরল। আমার এই ময়লা পোশাক আর নোংরা চেহারা দেখে তার একটুও ঘেন্না হল না। আমার মাথায় সে হাত রাখল। আদর করল। আমার চোখে জল এসে গেল। আমি চিৎকার করে উঠলুম, "আমি যাব, তোমার সঙ্গে যাব। আমি তোমায় গান শোনাব।" তারপর আর কিছুই বলতে পারিনি। আনমনে হাঁটতে হাঁটতে তার বাড়ি পৌঁছে গেলুম। তখন বেলা পড়ছে।

বাড়ির সামনেই গেট। ঠেলা দিয়ে গেট খুলে লোকটি আমায় ডাকল, "আয়!"

বাড়ির ভেতর ঢুকেই আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছি। বাড়িটা মস্ত একটা প্রাসাদ যেন। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "এইটাই তোমার বাড়ি?"

"হ্যাঁ।"

আমি ফ্যালফ্যাল করে চারদিক দেখছি। বাড়িটা—দোতলা। ঘরগুলো যেন এক-একটা হলঘর। পেল্লাই। অথচ আশ্চর্য, সব খালি! এত বড় বাড়িতে একটুও হইচই নেই। এমন খাঁ খাঁ করছে, মনে হচ্ছে, লোকটি বুঝি একাই থাকে বাড়িতে।

লোকটি একতলার দরদালান পেরিয়ে একটি ঘরে আমায় নিয়ে এল। বলল, "বাড়িটা আমার ঠিক নয়। আমার বাবার।"

আমি চকিতে তার মুখের দিকে তাকালুম। আমায় কিছু বলতে না দিয়ে লোকটি বলল, "এইখানে বোস।"

কী চমৎকার সাজানো-গোছানো ঘরটা। কাঠের আসবাব। রঙিন ছবি। খাট, বিছানা। ঝকঝকে। বসতে গিয়ে নিজের চেহারা দেখে আমারই কেমন বাধো-বাধো ঠেকল।

"বোস!" ভদ্দরলোক আবার বলল।

আমি নিজের পায়ের দিকে তাকালুম।

"ও, পায়ে ধুলো!" লোকটি হাসল। বলল, "আয় আমার সঙ্গে।"

সে আমায় কলঘরে নিয়ে এল। আমি পা ধুতে ঢুকলুম। অঢেল জল কলঘরে।

বেরিয়ে এসে আবার আমিই বললুম, "কাপড়জামাও তো নোংরা।"

সে বলল, "তুই বোস। আমি দেখি তোর
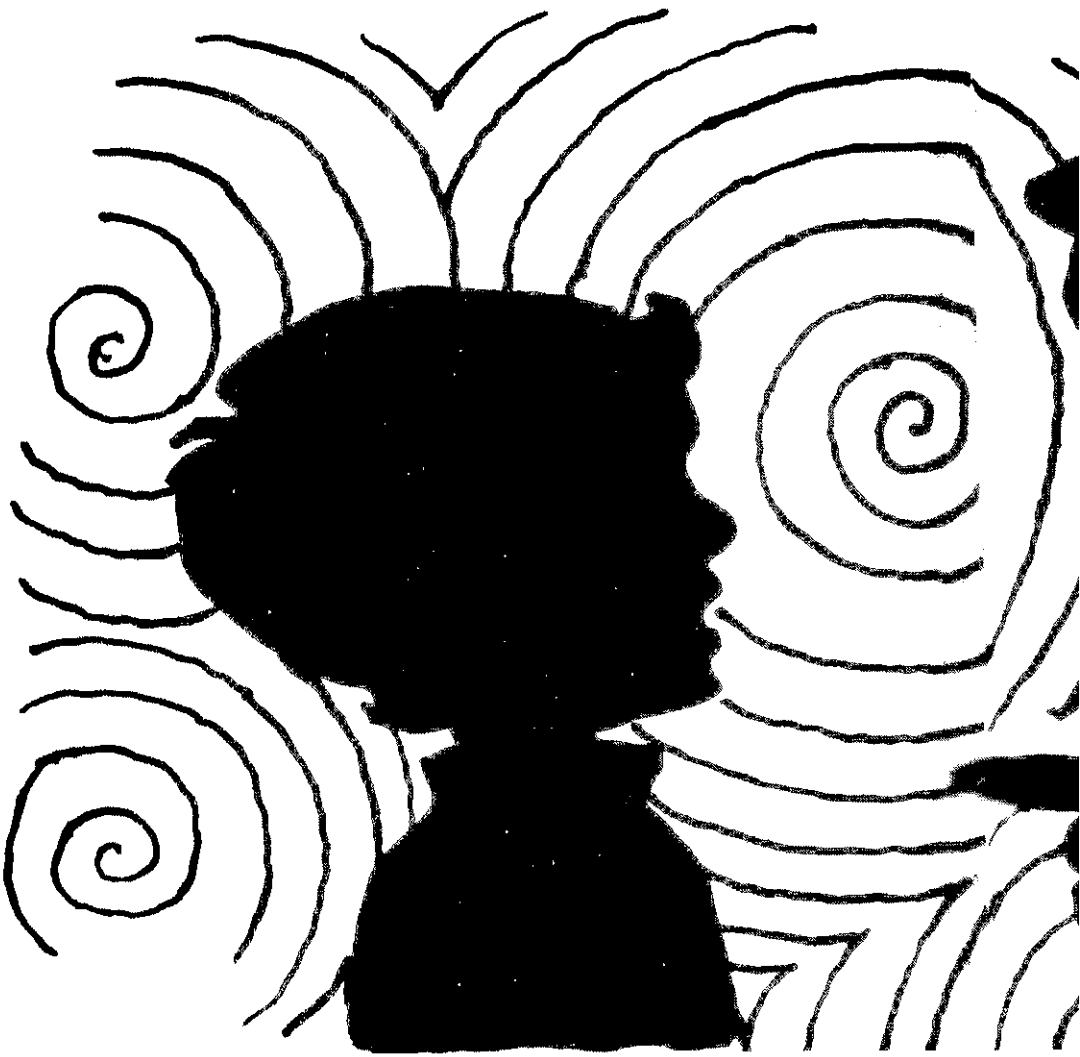
গায়ের একটা জামা পাই কি না।'' বলতে বলতে ভদ্দরলোকটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি এখন একা এই ঘরে। সবই কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে। ভাবলুম, সত্যি কি এত বড় বাড়িটায় ভদ্দরলোক একা থাকে। আর কেউ নেই? ভাল করে সেটা জানবার জন্য আমার মন ছটফট করতে লাগল। কিন্তু দেখা হল না। ঘরের মধ্যে হঠাৎ একজন বউ ঢুকে পড়ল। ঢুকেই থমকে দাঁড়াল। আমাকে দেখে একমুখ হাসি উছলে উঠল তার। হাসতে হাসতেই বলল, ''ওমা, কী সুন্দর ছেলে।''

ভদ্দরলোকটি একেবারে সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকে বলে উঠল, ''ছেলেটিকে দেখেই তুমি সুন্দর বলছ বউ, তা হলে ছেলেটির গান শুনে তুমি কী বলবে?''

''তাই নাকি, গান জানে বুঝি!''

''তবে কী বলছি!'' বলে লোকটি বউয়ের হাতে একটা জামা আর কাপড় দিয়ে বলল, ''দেখো, ওর হয় কি না।''

আমার আর বুঝতে বাকি রইল না এই বউটি ভদ্দরলোকেরই বউ। জামাটা হাতে নিয়ে ভদ্দরলোকের বউ আমার কাছে এগিয়ে এল। আমার
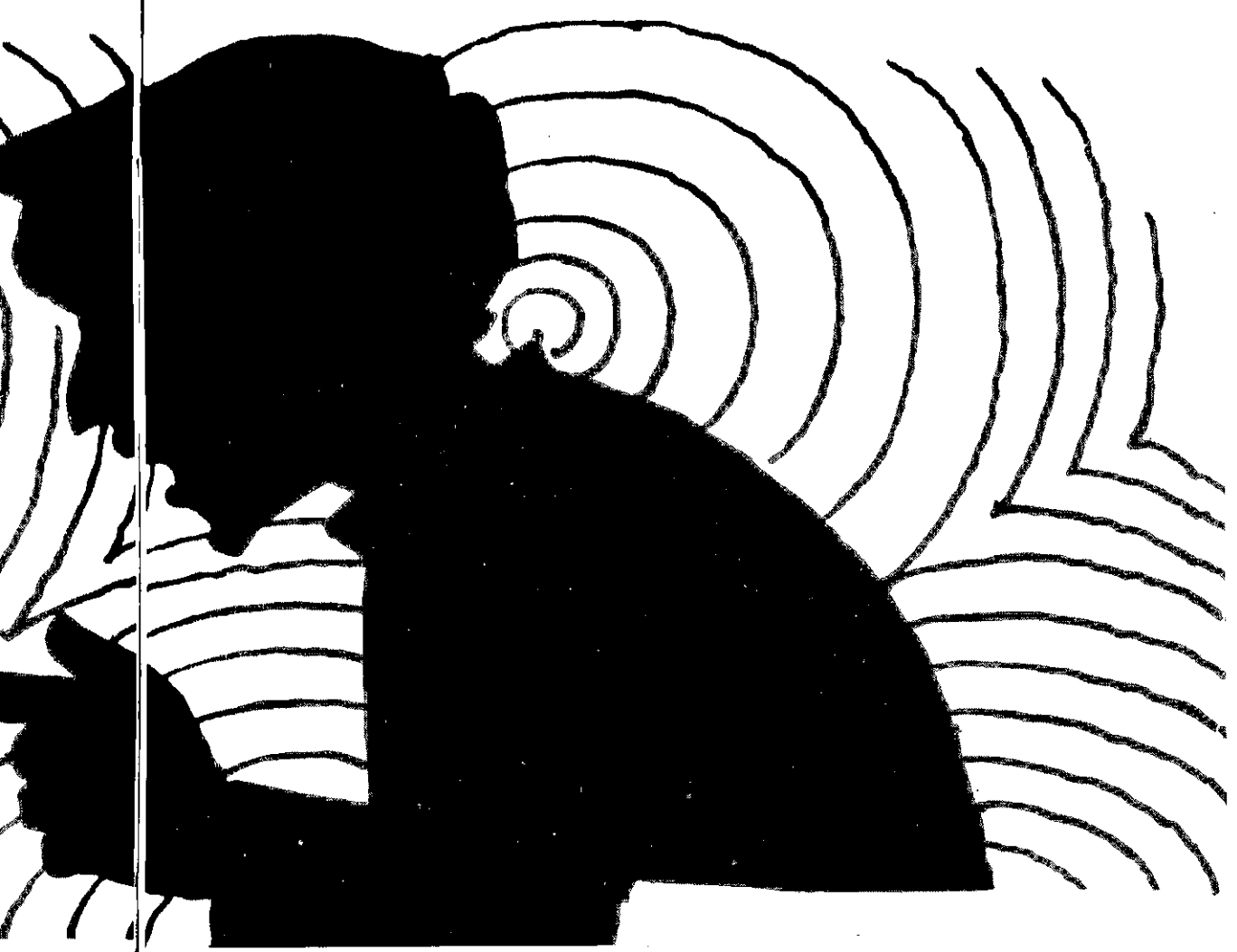
নোংরা জামাটা আমি নিজেই টানাটানি করে খুলে ফেললুম। নতুন জামাটা গায়ে দিতেই আমি কেমন জানি নতুন হয়ে গেলুম নিমেষের মধ্যে। তারপর নোংরা কাপড়টাও যখন পালটে ফেললুম, তখন আমিই আমাকে চিনতে পারছিলুম না।

''বাঃ, ঠিক হয়েছে। একেবারে ধোপদুরস্ত বাবুটি।'' বলে হা হা করে হেসে উঠল ভদ্দরলোক। হাসল তার বউও। সেই লম্বা চওড়া ঘরটা হাসির শব্দে গমগম করে উঠল। খুশিতে আমারও হেসে উঠতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু পারলুম না। কেননা তার বউ হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল, ''তোর নাম কী?''

''সায়র!''

''বাঃ! যেমন সুন্দর ছেলে, তেমনই সুন্দর নাম। কে রেখেছে?''

আমি বলতে পারলুম না। ভদ্দরলোক তার বউকে বলল, ''সায়রের কেউ নেই।''

ভদ্দরলোকের মুখে আমার নামটা শুনে আমি চমকে উঠলুম। পরক্ষণেই ভাবলুম বলি, না না, আছে। আমি এতদিনে খুঁজে পেয়েছি তোমাদের। তোমরাই আমার আপনজন। কিন্তু না, সে কথা

বলার সাহস হল না আমার। বললে যদি অন্য কিছু ভেবে বসে! ভাবে, রাস্তার ছেলের আস্পর্ধা তো কম নয়! কিন্তু হঠাৎ আমার সব ভয় ভেঙে দিয়ে ভদ্দরলোকের বউ যখন বলল, ''আহা, তা হলে যে বড্ড কষ্ট রে তোর। তুই একা থাকিস? না, আজ থেকে আর তোকে একা থাকতে হবে না। তুই আমাদের কাছে থাকবি। চ, এখন খেয়ে নিবি চ।'' তখনও কিন্তু কোনও কথা বলতে পারলুম না আমি। আমি হতভম্ব। তাদের সঙ্গে চুপচাপ ক'পা হেঁটে খাবার ঘরে ঢুকে পড়লুম।

কী ছিমছাম খাবার ঘরটা। পরিষ্কার তকতকে। মখমলের আসন পাতা। ঝকঝকে থালা-ভরতি কতরকমের যে খাবার! আমি নামই জানি না অর্ধেকের। তা, নাম না জানলেই বা কী! তখন খিদেয় পেট চুঁইচুঁই করছে। রাক্ষসের মতো গপগপ করে চেঁচেপুঁছে থালা সাফ করে ফেললুম। আহা, কী সোয়াদ! অমন রান্না আমি আজ পর্যন্ত মুখে দিইনি!

খাওয়াদাওয়া শেষ হল। বেলা আরও পড়ল। আমি ফিরে এলুম আবার সেই ঘরেই। ভদ্দরলোকটি বলল, ''আজ থেকে তোকে আর গাছের নীচে থাকতে হবে না। তুই এই ঘরেই থাকবি। আজ থেকে তোকে আর পথে পথে গান গাইতে হবে না, তুই এই ঘরেই গান গাইবি। আজ থেকে তুই আমাদের ছেলে।''

ভদ্দরলোকের বউ তার কথায় সায় দিয়ে আমার চিবুক ধরল। আমার বুকটা আনন্দে শিরশির করে উঠল।

একটু পরেই আমি গান গাইতে শুরু করলুম। একটু পরেই সন্ধের ছায়ায় আকাশ তার গায়ে ওড়না জড়াল। আমি দেখলুম, ভদ্দরলোকের বউ ঘরের সেজবাতি জ্বেলে দিল। তার শিখা ঝিলমিল করছে হাওয়ায়। আমিও দুলছি গানের সুরে। আমার সুর প্রতিধ্বনি তোলে ঘরের এ কোণে ও কোণে। আমি বিভোর হয়ে যাই গাইতে গাইতে।

আচমকা আমার বুকটা ধড়ফড় করে উঠল। আমার গান থামল। আমি বিষম খেয়েছি। ও কে দাঁড়িয়ে! ঠিক আমার সামনের ওই জানলাটার বাইরে! ভদ্দরলোক আর তার বউ ব্যস্ত হয়ে আমার কাছে ছুটে এল। জিজ্ঞেস করল, ''কী হল?''

আমি তখনও কাশছি। উত্তর দিতে পারলুম না।

ভদ্দরলোক তার বউকে বলল, ''যাও যাও, শিগগির এক গেলাস জল নিয়ে এসো।''

প্রায় পড়িমরি করে ছুটে তার বউ আমার জন্য জল নিয়ে এল। আমি ঢকঢক করে খেয়ে ফেললুম। কাশি থামল। আমার বুকের ধড়ফড়ানিটাও শান্ত হল। আমি আবার সামনের জানলাটার দিকে তাকালুম। কাউকে দেখতে পেলুম না। ইস, আমি একটা আস্ত গাধা! একটা বুড়োমানুষকে জানলার ওধারে উঁকি মারতে দেখে ভয় পেয়ে গেলুম!

ভয় পাবই তো! এই সন্ধেরাতের আলোছায়ায় তুমিও যদি সে মুখ দেখতে, আমি হলপ করে বলতে পারি তোমারও বুক কেঁপে উঠত। কী বিচ্ছিরি চোখ দুটো। কোটরে ঢোকা। ভাঙা চোয়াল। শুঁটকো, হাড়-গিলগিলে। তা নয় নয় করে বয়েসও যে অনেক হয়েছে, একঝলক দেখলেই বোঝা যায়। আমার দেখেশুনে আর গান গাইবার মতো অবস্থা নেই। আমি শুয়ে পড়লুম। ভদ্দরলোক আর তার বউ দু'জনেই বলল, ''না, এখন আর গান গাইবার দরকার নেই। এখন একটু আরাম করে নে।''

এমন নরম বিছানায় আমি জন্মে শুইনি। কাজেই এরকম বিছানায় শুয়ে আমার অস্বস্তি হওয়ারই কথা। হলও তাই। বেশ কিছুক্ষণ এ পাশ ও পাশ করলুম। ওই জানলাটার দিকে থেকে থেকে চেয়েও থাকলুম। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়লুম, নিজেও জানি না।

অনেক রাত্তিরে আমার ঘুম ভাঙল হঠাৎ। আমি ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়েছি। দেখি, চারদিক অন্ধকার। নিস্তব্ধ। আমার ঘরে কেউ নেই। আমি একা। সেজবাতিটাও নেই। সেজবাতির বদলে বাতিদানে একটা মোমবাতি জ্বলছে। তার ছায়াটা ঘরের দেওয়ালে যতই কাঁপছে, ততই কতরকমের ছবি ফুটে উঠছে এধারে ওধারে। হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়ল সেই জানলাটার দিকে। আমি বিছানা ছেড়ে সেই

জানলাটার দিকেই এগিয়ে এলুম আলতো পায়ে। কিছুই দেখতে পেলুম না। থমথম করছে অন্ধকার। বুঝতে পারলুম, এখন রাত গভীর। তা হলে এখন কী করব আমি। তবে কি আবার শুয়ে পড়ব। না, আর ঘুম পাচ্ছে না। বোধ হয় বাকি রাতটুকু একাই জেগে বসে থাকতে হবে। সেই ভদ্দরলোক আর তার বউও এখন নিশ্চয়ই অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু তাদের শোবার ঘর কি এই একতলায়, না ওপরে? আর সেই বুড়োটা? সেই-বা কোথায় এখন! তবে কি এই শুঁটকো হাড্ডিসার বুড়োই এই ভদ্দরলোকের বাবা! লোকটিকে দেখতে এমন, অথচ বুড়োকে দেখতে কী বিচ্ছিরি। আমি আনমনে বাতিদানের সামনে এসে দাঁড়ালুম। আগুনের ছোঁয়ায় মোম গলে গলে গড়িয়ে পড়ছে বাতির গা বেয়ে। দেখে মনে হল, খুব দামি এই বাতিদানটা। হাত বাড়ালুম। তুলে নিলুম বাতিদান নিজের হাতে। তারপর নিজের খেয়ালেই ঘরের দরজাটা আলতো ঠেলে খুলে ফেললুম। ভাবলুম এই সুযোগে দেখে ফেলি বাড়ির চেহারাটা। আমি পা বাড়ালুম। মোমের আবছা আলোয় পথ ঠাওর করতে আমার খুব একটা কষ্ট হচ্ছিল না। অজানা বাড়িতে ঢুকে মানুষ যেমন তল্লাশি দৃষ্টিতে সবকিছু দেখার চেষ্টা করে, আমিও মোমের আবছা আলোয় সেই চেষ্টাই করছিলুম। দেখছি ঘরগুলো সবই প্রায় বন্ধ। শুধু এক-আধটার জানলা খোলা। জানলায় উঁকি মারছি। কিন্তু মনের মতো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তবে দরদালানে দু'-একটা পাথরের মূর্তি নজরে পড়ল। দেয়ালে টাঙানো ছালের সঙ্গে বাঘের মাথা, তাও দেখতে পেলুম। দেখতে পেলুম বড় বড় ছবিও। বোঝা যায় ধুলো পড়েছে। দু'-একখানা বেঁকে ঝুলে আছে। সেইসব ছবির গায়ে যতই মোমের আলো ছড়িয়ে পড়ছে, ততই কী অদ্ভুত দেখতে লাগছে। মূর্তিগুলোর ঠাটবাট দেখলে তোমার মনে হবেই হবে, এরা যেন সেই কোন মান্ধাতার আমলের মানুষ। আমার জন্মের যে কত বছর আগে, সে কি আর আমি বলতে পারি! আমি তো নিরেট মুখ্যু!

হঠাৎ একটা সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেল। আমার হাতের বাতিসমেত বাতিদানটা ছিটকে গেল। কে যেন আমায় ধাক্কা মারল। নিমেষে সব অন্ধকার। জমাট অন্ধকার! আমি ভয়ে আঁতকে চিৎকার করে উঠলুম, "কে-এ-এ-এ।" পিছু ফিরতেই আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে গেছে। দেখলুম, অন্ধকারে কেবলই দুটো চোখ। জ্বলজ্বল করে জ্বলছে আমার দিকে চেয়ে! আমি তার চেহারাটা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু অন্ধকারেই পালাতে গেলুম। চোখের পলকে আমার পথ আটকে দাঁড়িয়ে পড়ল সেই জ্বলন্ত চোখ দুটো। আমি আর্তনাদ করে উঠলুম, "বাঁচাও-ও-ও!" সারা দরদালান আমার আর্তনাদে গমগম করে উঠল। কারও সাড়া পেলুম না। কিন্তু যার সেই জ্বলন্ত চোখ, সে ধমকে উঠল, "চুপ!" আমি বুঝতে পারলুম এ কোনও বুড়ো লোকের গলা। সঙ্গে সঙ্গে আমার চমক ভাঙল। আমি অন্ধকারের আবছা ছায়ায় তাকে চিনতে পেরেছি। এই লোকটাই তখন জানলার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছিল। সে তার বিদিগিচ্ছিরি মুখখানা আমার মুখের ওপর ঝুলিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুই কে?" তার গলার স্বরটা কী ভয়ংকর খসখসে!

আমার আর উত্তর না দিয়ে নিস্তার নেই। আমি ভয়ে কুঁকড়ে উত্তর দিলুম, "সায়র।"

"এ বাড়িতে ঢুকেছিস কেন?"

"একজন ভদ্দরলোক আমায় নিয়ে এল। আমি নিজে ঢুকিনি।"

"কেন নিয়ে এল?"

"আমার গান শুনবে বলে।"

লোকটা এবার দাবড়ে উঠল, "কেন তুই গান গাইলি?"

আমি ভয়ে-ময়ে বলে ফেললুম, "গান জানি বলে।"

বুড়ো আমার উত্তর শুনে কর্কশ গলায় খেঁকিয়ে উঠল, "জানিস, এটা আমার বাড়ি। জানিস, আমি গান পছন্দ করি না। এই বয়সে গান! আমি বুঝতে পেরেছি, গানের নাম করে এই বাড়িতে ঢুকে চুরি করবার মতলব এঁটেছিস তুই! শুনে রাখ, আমি সারারাত জেগে থাকি। জেগে জেগে বাড়ি পাহারা দিই। আজ তুই ধরা পড়েছিস আমার হাতে। চোর ছেলে, চাবকে তোর পিঠের ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে নেব।"

তার কথা শুনে ভয়ে আমার পেটের মধ্যে হাত-পা সেঁধিয়ে গেল। আমি বলবার চেষ্টা করলাম, আমি চোর নই। কিন্তু আমার গলা ভয়ে এমন শুকিয়ে গেছে, গলা দিয়ে স্বর বেরোল না।

লোকটা আবার খ্যাক-খ্যাক করে উঠল, ''আমার হাতে চোরের শাস্তি কী জানিস? গলা টিপব আর মেরে ফেলব।'' বলে, লোকটা রেগে এমন একটা নিশ্বেস ফেলল যে, তার গরম হাওয়াটা আমার গায়ে ছিটকে লাগল। আমি ঝট করে সরে গেলুম। কিন্তু সরে যাব আর কোথায়! সে আবার আমার দিকে এগিয়ে আসছে। এখন কোনদিকে গেলে যে এই বুড়োটার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব বুঝতে পারছি না। অথচ, বুঝতে পারছি, এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে লোকটা নির্ঘাত আমার গলাটা টিপে আমাকে মেরে ফেলবে। সেই ভদ্দরলোকের ওপর আমার ভয়ানক রাগ হল। তার টিকিটি পর্যন্ত আমার নজরে পড়ছে না আর। তারও না, তার বউয়েরও না। কী আক্কেল লোকটার! এইরকম সাংঘাতিক একটা বিপদে ফেলে নিজেরা দিব্যি ঘুমোচ্ছে! কে জানে এটা সেই ভদ্দরলোকেরই কারসাজি কি না! গান শোনার নাম করে আমায় ভুলিয়ে ভালিয়ে ধরে এনেছে মারবে বলে! না, এখানে আর দাঁড়ানো নয়! আচমকা আমি ছুট মারলুম। কিন্তু পথ কোনদিকে? খুঁজে পাই না। সুতরাং বুড়োটাও তেড়ে এল। বুড়োটার তাড়া খেয়ে খাঁচায় বন্দি পাখির মতো হাঁকপাঁক করতে লাগলুম সেই দরদালানের ভেতরে। অন্ধকারে কখনও দেওয়ালে ধাক্কা খাই, নয়তো হাতড়ে-বেড়াই। আমি যদি বাঁ দিকে যাই, সেও যায় বাঁয়ে। আমি যদি ডাইনে পালাই, সেও ঘোরে ডাইনে। ধরা আমি পড়বই।

না, খুব বেঁচে গেছি। একটা দরজায় হুড়মুড়িয়ে

ধাক্কা খেয়েছি। একেবারে সটান হাট হয়ে খুলে গেল দরজাটা। দরজা ডিঙিয়ে মার ছুট। অন্ধকারে ছুটলে যে আমি কোনদিকে যাব, আমি জানি না। এখন যদি এটা অন্ধকার রাত না হয়ে রোদ-ঝলমল দিন হত, তা হলেও এই বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে পথ খুঁজে পেতুম কি না বলা খুবই শক্ত। তবে লুকোবার জায়গার অভাব যে নেই, সেটা বাড়িতে প্রথম ঢুকেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম। কিছু না হোক লুকিয়ে পড়তে পারলেও বাঁচতে পারি। সুতরাং অন্ধকারেই ছুটতে ছুটতে লুকিয়ে পড়ার ঘুপচি খুঁজতে লাগলুম। হ্যাঁ, আমার পিছু নিয়েছে সেই বুড়ো লোকটাও। সে আমার চেয়েও জোরে ছুটছে। আশ্চর্য। বুড়োর এত শক্তি এল কোত্থেকে। আমি কি সত্যিই ধরা পড়ব। উফ। কী ভাগ্য! হঠাৎ আমার চোখে পড়ে গেল বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার সেই ফটকটা। মানে, আমি ঠিক রাস্তাতেই ছুটে এসেছি। ফটকটা খোলা নেই। ভাগ্যিস খুব উঁচু নয়। মারলুম লাফ। এক লাফেই ফটক পার। কী অদ্ভুত কাণ্ড! মনে হল, বুড়োও লাফ মেরেছে! সেও নিশ্চয়ই ফটকটা ডিঙোতে পেরেছে। কেননা, আমার পায়ের কাছেই তার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। তারপরই তার গলার শব্দ শোনা গেল। সে চেঁচাল, "ওরে হতচ্ছাড়া চোর ছেলে, পালাবি কোথায়? কেউ আর তোকে বাঁচাতে পারবে না। তোর মরণ আমার হাতে।"

আমি মরব কি না জানি না। কিন্তু রাস্তা ধরে ছুটতে ছুটতে সামনেই দেখি নদী। নদীর ওপর সাঁকো। সাঁকোর ওপর যেই উঠেছি, অমনই সেই বুড়ো হাড্ডিসার লোকটা আমার পিঠে এমন জোরে এক ঠেলা মারলে, আমি সটান নদীর জলে ঝপাং! ডুব-জলে উপুড়-ঝুপুর। হাবুডুবু। সাঁতার না জানলে

মানুষের যা হয়। তারপর যে কী হল, আমার একদম খেয়াল নেই।

অনেকক্ষণ পর আমার হুঁশ হয়েছে মনে হল, আমি নদীর তীরে উঠে এসেছি। তখনও আকাশ ছেয়ে আছে রাতের অন্ধকারে। নিজেকে দেখতে দেখতে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। ভাবছি, কেমন করে তীরে এলুম! কে আমায় তীরে টেনে আনল! তবে কি নদীর ঢেউয়ে দুলতে দুলতে আমি তীরে এসেছি? ঠিক তখনই আমার সেই বুড়োর কথা মনে পড়ে গেল। তার সেই ভয়ংকর চোখ দুটো আমার চোখের ওপর ভেসে উঠল। রাগে আমার সারা শরীর রি রি করে উঠছে। আমি নিজেই নিজেকে ছিঃ ছিঃ করে মনে মনে বলে উঠলুম, একটা হাড়-গিলগিলে বুড়ো আমায় এমন করে নাকাল করল! বুড়োকে দেখে আমি ভয় পাই কী বলে! একটা ভীষণ রোখ চাপল আমার মাথায়। মন বলল, নদীর জলে ঠেলে ফেলে দেওয়ার প্রতিশোধ আমায় নিতেই হবে। বুড়োকে আমি দেখে নেব! আর সেইসঙ্গে দেখে নেব সেই ভদ্দরলোক আর তার বউকেও! সবক'টা শয়তান! বুড়োকে আমার পেছনে লেলিয়ে দিয়ে নিজেরা ঘুমোচ্ছে! ছিঃ! আমি আবার ছুটলুম বুড়োর খোঁজে, মস্ত বাড়িতে।

যত জোরে ছুটে এসেছিলুম এই নদীর তীরে, তারও আগে পৌঁছে গেলুম সেই মস্ত বাড়িতে আবার। চিনতে আমার ভুল হয়নি। এবারও একদানে ফটকটা লাফ মেরে ডিঙিয়েছি আমি। একছুটে পৌঁছে গেছি সেই দরদালানে। তারপর ঘরের দোরে দোরে ধাক্কা মেরে চিৎকার করতে লাগলুম, "আয়, বেরিয়ে আয়! দেখি, তোদের কত ক্ষমতা!" কিন্তু কোনও ঘরেই সাড়া পাই না। একতলা থেকে আমি দোতলায় ছুটলুম। আমি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ঘরে ঘরে ধাক্কা মারতে লাগলুম। কেউ ঘরও খোলে না। কারও সাড়াও পাই না। তবে কি কেউ নেই বাড়িতে। নেই সেই ভদ্দরলোক, কিংবা তার বউও। আমার যেন কেমন সব ধাঁধা মনে হল। আমি আরও জোরে চিৎকার করি। আরও জোরে ধাক্কা লাগাই। হঠাৎই হাট হয়ে একটা দরজা খুলে গেল। আমার চোখের সামনেই বুড়ো জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি হেসে উঠলুম, হা হা হা! হি হি হি! হাসতে হাসতে বললুম, "শুঁটকো বুড়ো, আমাকে জলে ডুবিয়ে মারতে চেয়েছিল তুই। এবার আমি তোর ঘাড় মটকাব!"

বুড়ো মুখখানা তেমনই বিচ্ছিরি করে বলে উঠল, "কে তুই?"

"আমি, আমি। দেখতে পাচ্ছিস না? এগিয়ে আয়!"

বুড়ো ভয়ে আঁতকে উঠল। আমি আবার হা হা হা করে হেসে উঠলুম। বুড়ো এবার চিৎকার করে উঠল, "কে এ এ এ?"

আমি তার গলাটা ধরব বলে হাত বাড়িয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে যাই, হা হা হা! হি হি হি! আমার মনে হল বুড়ো আমাকে এখনও দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু বোধ হয় আমার হাসিটা শুনতে পাচ্ছে। সে এদিক-ওদিক দেখছে। আমি তবুও হি হি হি করে হাসছি। এমন সময় সে চিৎকার করে উঠল, "ভূত! ভূত!" আমি থতমত খেয়ে থমকে গেলুম।

কিন্তু সে চিৎকার থামাল না। সে চেঁচাচ্ছে গলা ফাটিয়ে। ঠিক সেই সময়ে পড়িমরি করে ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এল সেই ভদ্দরলোক আর তার বউ। দু'জনের হাতেই মোমের বাতি। ভদ্দরলোক ব্যস্ত হয়ে চিৎকার করে উঠল, "কী হল বাবা?"

সেই বুড়ো চেঁচাল, "ঘরে ভূত ঢুকেছে!"

"কই?" ছেলের গলাতেও আতঙ্ক।

আমি বললুম, "চেয়ে দেখো আমাকে। তোমার বাবা আমাকে নদীর জলে ঠেলে ফেলে দিয়ে এখন আমাকে 'ভূত' বলে বদনাম দিচ্ছে। আমাকে দেখো ভাল করে। তোমার কি মনে হচ্ছে আমি ভূত?"

"কে কথা বলছে?" সেই ভদ্দরলোক অবাক গলায় জিজ্ঞেস করল।

"কেন, দেখতে পাচ্ছ না আমাকে? আমি সায়র।"

"কই তুই?"

"এই তো আমি।"

"দেখতে পাচ্ছি না। কেন?"

"তোমার মোমের বাতিটা আরও একটু তুলে ধরো।"

ভদ্দরলোক বাতি তুলে ধরল। তুলে ধরল তার বউও। আমি তাদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

"কই?"

"এই তো, তোমাদের চোখের সামনে।" আমি গলায় জোর দিলুম।

ভদ্দরলোকও আঁতকে উঠল, "তুই ভূত! ভূত!" তার হাতের বাতি হাতেই নিভে গেল। বুড়ো ঢুকে পড়ল নিজের ঘরে। চোখের পলকে ভদ্দরলোকের বউ ভদ্দরলোকের হাত ধরে টান মারল। তারাও হুড়মুড় করে বুড়োর ঘরেই ঢুকে পড়ল। ঢুকে দরজা বন্ধ করে হুড়কো এঁটে দিল।

আমি চিৎকার করে উঠলুম, "আমি ভুত নই, সায়র! দরজা খোলো! দরজা খোলো!" আমি দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিলুম। আরও জোরে। গায়ে আমার যত জোর আছে, তার চেয়েও জোরে। তবু দরজা খুলল না তারা। তখন আমার নিজেরও কেমন ভয় হয়ে গেল। আমি তখন নিজেকেই নিজে দেখবার চেষ্টা করলুম। দেখতে পেলুম না। আমি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলুম, "আমি সায়র-র-র। আমি গান গাই। তোমরা আমাকে ছেলে বলেছ।"

কিন্তু বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে গলায় শব্দ উঠল, "তুই ভূত! তুই ভূত!"

আমি আর থাকতে পারলুম না। আমি কেঁদে ফেললুম। কেউ আমার কথা কেন বিশ্বাস করছে না? আমি কি তবে সত্যিই ভূত! আমি কি তবে নদীর জলে ডুবে গেছি? আমি কি মরে গেছি! না, না, না, আমি মরিনি। আমি ভূত নই। আমি সায়র! আমার নাম সায়র। কিন্তু আমার কথা কেউ শুনল না। আমি ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলুম সেই মস্ত বাড়ির ভেতর থেকে। কাঁদছি। সকাল হয়ে আসছে। একটি-দু'টি পাখি ডাকছে। আমি কেঁদে-কেঁদে চেঁচাচ্ছি, "আমি সায়র, আমি সায়র।" কিন্তু আমাকে কেউ দেখছে না। আমার কথা কেউ শুনছে না। এমনকী, আমার ভালবাসার আকাশ সেও আমায় চিনতে পারছে না! ও আমার আকাশ, তুমি আমায় ভালবাসো, ভালবাসো, ভালবাসো!

১ এপ্রিল ১৯৯২
অলংকরণ: দেবাশিস দেব

বোড়ালের সেই রাত

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

তিরিশ বছর আগেকার কথা। চব্বিশ পরগনা জেলার বোড়াল গ্রামে আমাদের এক বন্ধু ছিল। তার নাম কমলেশ। কী একটা অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়ে আমরা তিন বন্ধু গিয়েছিলাম কমলেশদের বাড়িতে। অজয়, সুশান্ত এবং আমি।

এখনকার বোড়াল গ্রামকে দেখে তখনকার সেই গ্রামের কথা কিন্তু কল্পনাও করতে পারবে না কেউ। সেই প্রবীণ মানুষদের যদি কেউ এখনও বেঁচে থাকেন, তা হলে তিনিই বলবেন আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। এই গ্রামের গাছপালা তখন এত ঘন ছিল যে, বাইরে থেকে দেখে এটাকে তখন কোনও গ্রাম নয়, একটা দুর্ভেদ্য জঙ্গল বলেই মনে হত।

যাই হোক, ওখানে গিয়ে বিকেলের দিকে গ্রামের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াবার সময় হঠাৎ গ্রামের প্রান্তে একটি ভাঙা বাড়ি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। কী চমৎকার বাড়ি! কোনও রাজামহারাজার ছিল বোধহয়। কিন্তু এখন তার এমনই হতশ্রী চেহারা যে, দেখলে দুঃখ হয়। বসবাসের অযোগ্য তো বটেই, বাড়িটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম, এত জায়গা থাকতে এই গ্রামের ভেতর কবে কোন মান্ধাতার আমলে কে যে এই বাড়ি তৈরি করেছিলেন তা কে জানে? সবচেয়ে রহস্যময় ব্যাপার এই যে, বাড়িটি পরিত্যক্ত এবং বসবাসের অযোগ্য হলেও এর কাঠামো এমন মজবুত যে, একে সারালে আবার এ তার পূর্ব রূপ ফিরে পাবে। ছাদের আলসের প্রতিটি কার্নিস এখনও অক্ষত। অর্থাৎ, ভাঙা বাড়ি কিন্তু ধ্বংসস্তূপ নয়। পরিত্যক্ত বাড়ি, তবু ফেলে দেওয়ার নয়।

বাড়িটার দিকে কৌতূহলী চোখে চেয়ে থেকে পায়ে পায়ে সেদিকে এগোতেই বাধা দিল কমলেশ। হাত ধরে বলল, ‘‘আর না বন্ধু। আর এগিয়ো না।’’

‘‘কেন?’’

‘‘বাড়িটার একটু বদনাম আছে।’’

‘‘সে তো সব বাড়িরই থাকে। যেখানে যত পোড়ো বাড়ি আছে সবেরই বদনাম। তাই বলে এমন চমৎকার বাড়িটাকে একবার ভেতরে ঢুকে দেখা যাবে না?’’

‘‘কেউ ঢোকে না ও-বাড়িতে।’’

‘‘কেন, ভূতের ভয়ে? ওই বাড়ির ভেতরে ঢুকলে ভূতে গলা টিপে মারবে?’’

‘‘ঠিক তাই। ভূতে এসে গলা টিপে মারবে কি না জানি না, তবে ভূতের বাড়ি ওটা।’’

‘‘ভূতের বাড়ি!’’ আমরা হো হো করে হেসে উঠলাম।

এর পর যা হয়ে থাকে সচরাচর, এক্ষেত্রেও তাই হল। অর্থাৎ কিনা আমরা নানারকম ঠাট্টা, তামাশা, বিদ্রুপ এইসব করতে লাগলাম কমলেশকে।

কমলেশ একটুও উত্তেজিত হল না। বরং হেসে বলল, ‘‘দেখ ভাই, আমরা গ্রামে থাকি। তোরা তো আমাদের মানুষের মর্যাদা দিস না। ভাবিস কুসংস্কারে আচ্ছন্ন কিছু দু'পেয়ে জীব বুঝি ওগুলো। কিন্তু জেনে রাখ, যা বলছি তা মিথ্যে নয়। সাহস থাকলে পরীক্ষা করে দেখিস। অবশ্য পরীক্ষা না করাটাই ভাল। কারণ তোদের মতো গোঁয়ার-গোবিন্দ যে দু'-একজন পরীক্ষা করতে

গেছে তারা এমন শিক্ষা পেয়েছে যে, আর এমুখো হয়নি।''

অজয় বলল, ''তাই নাকি! তা হলে তো পরীক্ষা করতেই হচ্ছে। অবশ্য তোর কথা যে একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছি তা নয়, তবে কী জানিস, যেখানেই যাই, যে-গ্রামেই যাই, পোড়ো বাড়ি দেখলেই শুনি ভূতের উপদ্রবের কথা। মাঠের মাঝখানে বেলগাছ থাকলেই শুনি সে-গাছে নাকি ব্রহ্মদৈত্য আছে। আর মাছভরতি পুকুর দেখলেই শুনতে পাই, এর পাড়ে রাতদুপুরে ভূত ঘোরে। যারা মাছ ধরে তাদের কাছে ঘ্যানঘ্যান করে মাছ চায়। কাজেই এই ব্যাপারগুলোতে আর আমাদের আস্থা নেই। তাই ভাবছি, তোদের দেশের এই পোড়ো বাড়িতে একরাত কাটিয়ে ভূত জিনিসটা আসলে কী, তা একবার দেখে যাই।''

কমলেশ বলল, ''না। তোদের মতো অবিশ্বাসী ছেলেদের এদিকে নিয়ে আসাটাই ভুল হয়েছে।''

আমি বললাম, ''খুব রেগেছিস মনে হচ্ছে?''

''রাগের কী আছে?''

সুশান্ত বলল, ''বেশ তো। আমরা কোনও পরীক্ষা চাই না। শুধু গোঁয়ারতুমি করে একরাত এই বাড়িতে থাকতে এসে উচিত শিক্ষা পেয়েছে এমন একজনের সঙ্গেই অন্তত আমাদের পরিচয় করিয়ে দে।''

কমলেশ এবারে আমতা আমতা করতে লাগল।

সুশান্ত বলল, ''তার মানে এমন কারও নামও তোদের জানা নেই, যে-লোকটা প্রত্যক্ষদর্শী, যে কিছু একটা বলতে পারে। অথচ অত বড় বাড়িটাকে ভূতের বাড়ি আখ্যা দিয়ে চোর-ডাকাতের ঘাঁটি করে রেখেছিস তোরা।''

আমি বললাম, ''আজ রাত্রেই এর রহস্য উন্মোচন করতে চাই আমরা।''

কমলেশ বলল, ''দোহাই। আজ নয়। একটা কাজের বাড়িতে এসেছিস, খেয়েদেয়ে আনন্দ করে যা। পরে যখন হোক, যেদিন হোক, আসবি। কথা দিচ্ছি, আমি নিজে সাহায্য করব তোদের।''

''বেশ, তাই হবে। নতুন একটা অ্যাডভেঞ্চারের মনোভাব নিয়েই আর একবার এখানে আসব আমরা। তখন যা হয় হবে।''

বেলা গড়িয়ে আসছে তখন। আমরা আর ওই ভুতুড়ে বাড়ির দিকে না এগিয়ে অন্য পথ ধরলাম।

মাসখানেক পরে আবার একদিন কমলেশের সঙ্গে ওদের গ্রামের বাড়িতে এসে হাজির হলাম আমরা। ওর বাড়ির লোকেরা তো দারুণ আপত্তি করলেন আমাদের মতলব শুনে। সবাই অনেক করে বোঝালেন এই কাজের ঝুঁকি না নিতে। কিন্তু আমরা কারও কথাই কানে তুললাম না। যথারীতি ওদের বাড়িতে খাওয়াদাওয়ার পর একটু বেলাবেলি তিন বন্ধুতে এসে হাজির হলাম সেই পোড়ো বাড়িতে। এল না শুধু কমলেশ। সে আগেই বলেছে, ‘‘দেখ ভাই, আমি ওসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে নেই। ও বাড়ির ঘটনার কথা আমার অজানা নয়। কাজেই জেনেশুনে বিষপান আমি করব না। তবে তোরা যেতে চাইছিস, যা। কেউ যদি নিজের থেকে মরতে চায়, তা হলে কার কী ক্ষমতা যে, তাকে বাঁচাতে পারে?’’

এই কথামতোই আমরা এলাম। ঠিক হল, একরাত এই পোড়ো বাড়িতে থেকে পরদিন সকালে ফিরব। তবে আমাদের থাকাথাকিতে কোনও বাজি-টাজির ব্যাপার ছিল না। শর্ত ছিল সততার। অর্থাৎ, আমরা অলৌকিক কিছু দেখলে সেটাকে অস্বীকার করব না। আবার সত্যিসত্যিই যদি কোনও রোমহর্ষক ঘটনার সম্মুখীন হই, তা হলেও রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যেতে লজ্জাবোধ করব না। আসলে আমাদের এই থাকাথাকির ব্যাপারটা ঠিক চ্যালেঞ্জের ব্যাপার নয়, স্রেফ সত্য যাচাই এবং কৌতূহল মেটানোর ব্যাপার।

আমাদের আগ্রহ দেখে স্থানীয় লোকরাও অনেকে বারণ করলেন। সবাই বললেন, ‘‘কী দরকার ভাই, সুখে থাকতে ভূতে কিলোবার? ভূত না থাকুক, গুন্ডা-বদমাশ তো আছে? অযথা গোঁয়ারতুমি করতে গিয়ে কেন বেঘোরে মরবেন? তার চেয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান। এই বাড়িতে সত্যিই ভূতের উপদ্রব না হলে মাঠের মাঝখানে বাড়িটা কখনও এমনই পড়ে থাকে?’’

আমরা কিন্তু কারও কথাতেই কর্ণপাত করলাম না। যে যা বলল, তা কানখাড়া করে শুনে গেলাম। তাদের কথার গুরুত্ব দিয়ে ফিরে এলাম না। দিব্যি সেই পোড়ো বাড়ির ভেতর ঝিঁঝির ডাক শুনে, মশার কামড় খেয়ে রাতজাগা শুরু করলাম। মাঝে মাঝে ভয় যে করছিল না, তা নয়। ভয় ছিল সাপের। হাজার হলেও বহুদিনের পোড়ো বাড়ি। তবু আমরা সাবধানতা অবলম্বন করেছিলাম। অর্থাৎ, বিকেলবেলা বাড়িতে ঢুকেই কার্বলিক অ্যাসিড ছড়িয়ে দিয়েছিলাম চারদিকে। মুরগির মাংস, রুটি আর সন্দেশ ছিল রাতের খাদ্য-তালিকায়। আর ছিল চা তৈরির সরঞ্জাম। তখন গ্রামেঘরে এখনকার মতো এত ব্যাপকভাবে স্টোভের প্রচলন ছিল না। তাই প্রচুর শুকনো নারকোল পাতা এনে রেখেছিলাম।

আমরা চা খাচ্ছি, গল্প করছি আর ঘড়ি দেখছি—কখন সন্ধে হয়, কখন ভূত আসে। দেখতে দেখতে সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে গেল। অন্ধকারে ঢেকে গেল চারদিক। আমরা অধীর আগ্রহে ভূতের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

রাত বারোটা। কোনও উপদ্রব নেই। ভয় নেই। ভূতেরা সাধারণত যা করে, অর্থাৎ গায়ের ওপর গরম নিশ্বাস ফেলা, খ্যাল-খ্যাল করে হাসা, হ্যারিকেনের আলো নিভিয়ে দেওয়া, গায়ে ঘাস ছুড়ে মারা, কিছুই করল না। এমনকী হঠাৎ কোনও আর্তনাদ বা মড়াকান্নাও শুরু করল না কেউ। শুধু ভূত কেন, একটা শেয়াল-কুকুর পর্যন্ত ধারেকাছে এল না।

রাত তখন একটা। তখনও কারও কোনও অস্তিত্ব অনুভব করলাম না। ইতিমধ্যে দু'রাউন্ড চা পর্ব শেষ হয়েছে আমাদের। সময় কাটাবার জন্য এবং একঘেয়েমির হাত থেকে বাঁচবার জন্য আবার আমরা নারকোল পাতা জ্বালিয়ে চা তৈরি করে খাচ্ছি এমন সময় কোথা থেকে হঠাৎ আধপাগলা একজন লোক এসে হাজির হল সেখানে। ওর হাতে একটি কলাইয়ের মগ। সেটা এগিয়ে বলল, ‘‘আমাকে একটু চা দেবে দাদাবাবু?’’

আমি বললাম, ‘‘কে বাবা তুমি?’’

লোকটি ফিক করে হেসে বলল, ‘‘আমি ভূত।’’

‘‘ভূত!’’

‘‘তবে আর বলছি কী? যাকে দেখবে বলে তোমরা এসেছ, আমিই সেই। কেমন দেখছ?’’

"ভালই, তা বাবা ভূতই যদি তুমি হবে তো এইরকম ছিরি কেন তোমার? হাতের জায়গায় পা থাকবে। পায়ের জায়গায় হাত থাকবে। মুখটা হবে উল্টোমুখ। গায়ে কোনও মাংস থাকবে না। নয়তো অর্ধেক শরীর দেখা যাবে, অর্ধেক অদৃশ্য থাকবে। তবে তো?"

লোকটি হেসে অস্থির হয়ে বলল, "তবেই তোমরা ভুত দেখেছ। ও ভুত এখানে নেই বুঝলে? ও ভুত থাকে গল্পের বইতে। যাক, এখন আমাকে এক কাপ চা দাও দিকিনি।"

আমাদের চা তখন তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তাই থেকেই একটু দিলাম ওকে।

লোকটি বেশ আয়েস করে চা খেতে খেতে বলল, "মেজাজ এসে গেল। কতদিন যে এমন চা খাইনি। ভাগ্যিস তোমরা এসেছিলে।"

"আর একটু দেব?"

"নাঃ। থাক। যাচ্ছিলুম এই পথ দিয়ে, আলো জ্বলছে দেখে ঢুকে পড়লুম।"

"কিন্তু এত রাতে তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?"

"হাই দেখো, ভূতেরা তো রাতবিরেতেই যায়-আসে গো। তা ছাড়া তাদের তো নির্দিষ্ট কোনও ঠিকানা থাকে না। তাদের কাজই হল ঘোরা।" বলে মগটি হাতে নিয়ে উঠে গেল লোকটি।

অজয় বলল, "এ কী! তুমি চলে যাচ্ছ?"

"যাব না তো কি বসে থাকব? আমার এখন অনেক কাজ।"

"বেশ মজার লোক তো তুমি। যেই গরম চা পেটে পড়ল অমনই কেটে পড়ছ? একটু বোসো। গল্পসল্প করি।"

"না রে ভাই, বসবার সময় নেই।"

লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে দরজার কাছ পর্যন্ত গেল।

অজয় বলল, "শোনো।"

লোকটি বলল, "আঃ। যাওয়ার সময় পিছু ডাকো কেন?"

সুশান্ত বলল, "আরে শোনোই না, একটা কথা বলি।"

লোকটি ফিরে এসে বলল, "নাও, কী বলবে বলো।"

"আমরা তো এ বাড়িতে এসেছি ভূত দেখতে। তা তুমি যখন বলছ তুমিই ভূত, তখন যাওয়ার আগে তোমার ভূতের খেলাটা একবার দেখিয়ে যাও না বাবা।"

লোকটি হেসে বলল, "কী ছেলেমানুষি করছ তোমরা রাতদুপুরে? যাও, ঘরের ছেলে ঘরে যাও। ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে ভাল করে ঘুম দাওগে।" বলেই কোনওদিকে না তাকিয়ে হনহন করে চলে গেল লোকটি।

আমরা টর্চের আলোয় অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করলাম, লোকটি অন্ধকারে বাইরে গিয়েই হঠাৎ মিলিয়ে যায় কি না। কিন্তু না। সে দিব্যি খোশমেজাজে, কখনও বা নাচতে নাচতে দূরের গ্রামের দিকে চলে গেল।

রাত দুটো। পাশের একটি বাদামগাছের ডাল থেকে একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল শ্-স্-স্-স্। তারপর হঠাৎ প্যাঁচাটা দারুণ ভয় পেয়ে চিৎকার করতে করতে আমাদের ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে ডানা ঝাপটে বারবার পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল। সে এক বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার। তারপর আমাদের তাড়া খেয়ে আরও একপাক ঘুরে উড়ে গেল অন্ধকারে।

রাত তিনটে। আমরা আর-একবার চা খেলাম।

ভোর পাঁচটা। সব আলো ফুটি-ফুটি করছে। গাছের ডালে একটি-দু'টি করে পাখি ডাকছে। কিন্তু কই? না এল কোনও ভূত, না কোনও জন্তু-জানোয়ার। আমরা নিজেরাই এবার দারুণ বিরক্তিতে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলাম, "শুধু শুধু এই গেঁয়ো ভূতগুলোর কথা শুনে রাতের ঘুম নষ্ট করে ভূত দেখতে না এলেই হত। কী দেখলাম? কিছুই তো না। মাঝখান থেকে মশার কামড় খেলাম। ঘুম হল না। শরীরও খারাপ হল। যত্ত সব।"

দেখতে দেখতে ভোর হল। আমরা তল্পিতল্পা গুটিয়ে পোড়ো বাড়ির বাইরে চলে এলাম। বেশ কিছুটা পথ আসবার পর দেখলাম কমলেশ এবং গ্রামের দু'-চারজন লোক আমাদের অবস্থা দেখবার জন্য এই দিকে এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি এসে মুখোমুখি হতেই অবাক বিস্ময়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। এমনভাবে তাকাল, যেন আমাদের দেখেইনি কোনও দিন। ভয়, বিস্ময়, কী না ছিল ওদের চোখে? যেন আমরাই ভূত। তাই ভয়ে ভয়ে আমাদের ভূত দেখছে।

একজন জিজ্ঞেস করলেন, "রাত্রে আপনারা ভয়-টয় পাননি তো?"

"না।"

"তেনাদের কোনও উপদ্রব হয়নি?"

"না।"

"কিছু দেখেননি আপনারা?"

"হ্যাঁ, দেখেছি আমরা। একটা ঘোড়ার মাথা আর হাতির মুন্ডু।"

"তা তো দেখবেনই বাবু। হাজার হলেও রাজারাজড়ার বাড়ি। হাতি-ঘোড়া কত কী ছেল।"

আর-একজন বলল, "আরে বুঝছ না কত্তা। বাবুরা আমাদের বিদ্রুপ করছেন।"

আমি রেগে বললাম, "করবই তো। শুধু শুধু তোমাদের বুজরুকিতে উত্তেজিত হয়ে এই যে একটা পোড়ো বাড়িতে ফালতু একটা রাত কাটালাম, এর খেসারত কে দেবে? এইভাবে মানুষকে ধাপ্পা দেওয়ার কোনও মানে হয়?"

আর-একজন বলল, "ধাপ্পা দেব কেন? যা আমরা বরাবর শুনে আসছি, তাই বলেছি। তা ছাড়া আমরা তো আপনাদের পায়ে ধরে সাধতে যাইনি ওই বাড়িতে রাত কাটাবার জন্য। বরং আপনাদের ভালর

জন্য আমরা বারবার বারণই করেছিলাম। আপনারা তো শুনলেন না। আমরা লোকের মুখের শোনা কথার ওপর ভিত্তি করে কেউ ঢুকি না ও বাড়িতে।''

আমি বললাম, ''বেশ। এবার আমরা ওই বাড়িতে একরাত থেকে তো প্রমাণ করে দিলাম যে, তোমাদের শোনা কথার কাহিনিগুলো কত ভুল। এবার থেকে নির্ভয়ে যাবে ও-বাড়িতে। ভূত তোমাদের ভয়ও দেখাবে না, মেরেও ফেলবে না, খেয়েও নেবে না।''

কমলেশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ''সবই তো হল। কিন্তু একটি রাতের ভুলের মাশুল যে তোদের কী কঠিন মূল্যে দিতে হল তা কি তোরা এখনও বুঝতে পারিসিনি?''

''কীরকম!''

''তোরা একবার খুব ভাল করে নিজেদের চেহারাগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখ তো।''

কমলেশের কথা শুনে আমরা সবাই সবাইয়ের দিকে তাকালাম। সত্যিই তো! এ কী চেহারা হয়েছে আমাদের? আমাদের বন্ধুদের মধ্যে অজয় ছিল অত্যন্ত রূপবান। কিন্তু তার সেই চাঁপাফুলের পাপড়ির মতো গায়ের রং হঠাৎ এত কালো হয়ে গেল কী করে? ওর বাঁশির মতো লম্বা নাকটা যেন টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো বেঁকে গেছে। তা ছাড়া ওর দু'কানে মাকড়ি, হাতে বালা। কোথেকে এল? যেন অরণ্যবাসী এক ভিল যুবক। আর সুশান্ত? এই একরাতে ওর মাথার চুলগুলো সব পেকে গেছে। ঠিক যেন আশি বছরের বুড়ো। গায়ের চামড়াতেও কোঁচ পড়েছে। সামনের সারির কয়েকটা দাঁত নেই। না, না। এ হতে পারে না। এ নিশ্চয়ই কোনও ইন্দ্রজালের ব্যাপার। এই যদি ওদের অবস্থা হয় তা হলে আমার অবস্থা কী হয়েছে? সামনে একটা আয়না থাকলে অবশ্যই নিজেকে দেখতাম। কিন্তু এ কী! আমার হাতে এত রক্ত এল কী করে? ঠিক মনে হচ্ছে আমি যেন কাউকে খুন করে এসেছি। তা ছাড়া আমার সেই জামা-প্যান্ট, জুতো কিছুই তো নেই। তার বদলে এ কী! ময়লা চিরকুট ভুটানিদের মতো পোশাক। পায়ে ছেঁড়া নাগরার জুতো। যেন এইমাত্র কোনও চা-বাগান থেকে বেরিয়ে এসেছি। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, আমার কোমরে একটা রং-চটা কলাইয়ের মগ ময়লা দড়ি দিয়ে বাঁধা। যে-মগটায় কাল রাতের সেই অদ্ভুত লোকটা চা খেয়ে সেটা হাতে নিয়েই চলে গিয়েছিল। এও কি সম্ভব?

১ এপ্রিল ১৯৯২
অলংকরণ: বিমল দাস

ভূত অদ্ভুত

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আমার ঠাকুরদা যখন বাড়িটা কিনছিলেন, তখন তাঁর বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সকলেই বলেছিলেন, কাজটা ভাল হচ্ছে না। বাড়িটা ঐতিহাসিক, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ওলন্দাজ গর্ভনরের কুঠিবাড়ি। কিন্তু, যেখানেই ইতিহাস, সেইখানেই তো ভূত। ইতিহাসের আর-এক নাম ভূত বললেই বা ক্ষতি কী! বাড়িটায় যেমন অনেক রহস্য আছে, সেইরকম অনেক ভূতও আছে। তা না হলে এতদিন খালি পড়ে থাকে!

ঠাকুরদা বলেছিলেন, "মশা তাড়াবার যেমন ধূপ আছে, আমার কাছে সেইরকম ভূত তাড়াবার ধুনো আছে। ভূতকে আমি তেমন ভয় পাই না, ভয় পাই মানুষকে।"

আমার ঠাকুরদা ছিলেন নামকরা শিক্ষক। আমাদের পরিবারের লোকসংখ্যাও কিছু কম ছিল না। সকলেই বিজ্ঞানচর্চা করতেন। ভূত, প্রেত, ভগবান, কোনওটাই মানতেন না। বাড়িটা কেনা হল প্রায় জলের দামে। বিশাল এক দোতলা বাড়ি। দু'মহলা। সামনের দিকটা পুব থেকে পশ্চিমে প্রসারিত। পেছনের মহল দক্ষিণ থেকে উত্তরে। 'এল' শেপ। পেছনে একটা বারান্দা। পুবে শুরু হয়ে দক্ষিণ বরাবর পশ্চিম হয়ে উত্তরে ঘুরে গেছে। এই উত্তরটাই ছিল ভয়ংকর। নিরালা, নির্জন। গাছপালা-ঘেরা। মনে হত ভুতের আড়ত।

নানা জনের নানা কথায় ওই বাড়িতে ভূতের যে তালিকা পাওয়া গিয়েছিল, তা ছিল এইরকম।

এক, গভীর রাতে বাড়ির ন্যাড়া ছাত থেকে কেউ একজন বিশাল একটা ঘুড়ি ওড়াত। কালো রঙের ঢাউস ঘুড়ি। অন্ধকার আকাশ। জ্বলজ্বলে তারা। কালো একটা ঘুড়ি প্রেতাত্মার মতো লাট খাচ্ছে, টাল খাচ্ছে। গোত্তা খেয়ে নীচে নামছে, পড়পড় শব্দে উঠে যাচ্ছে আকাশের টঙে। যাদের ঘুম ভেঙে যেত, তারা শব্দটা শুনতে পেত। সাহসী যারা তারা বারান্দায় বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে তাকালে ঘন কালো ছায়ার মতো একটা কিছু দেখতে পেত।

দুই, কুয়োর সঙ্গে একটা হ্যান্ড-পাম্প লাগানো ছিল। গভীর রাতে কেউ সেটাকে পাম্প করত। হ্যাচাং-হ্যাচাং শব্দ শুনতে পেত প্রতিবেশীরা। তালাবন্ধ খালি বাড়ি অথচ জল পাম্প করার শব্দ। সাহসীরা তিনতলার ছাত থেকে এই বাড়ির পাতকো তলায় টর্চলাইট ফেলত। লোক নেই, জন নেই। পাম্পের হাতল ওঠানামা করছে।

তিন, মাঝরাতের ন্যাড়া ছাতে জলের মূর্তি। একটা মূর্তি চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু জল টলটলে। যেমন, এক বালতি জল। বালতিটা নেই, জলটা বালতির আকার ধরে আছে। সেইরকম মানুষের আকারে জল। ছাতে টলে-টলে বেড়াচ্ছে। মাঝে-মাঝে আকাশে হাত তুলছে।

চার, সার্চলাইট। হঠাৎ একটা তীব্র আলোর রেখা অন্ধকার চিরে আকাশের দিকে ছুটে যেত। গোল হয়ে ঘুরত। সেই আলোর উৎস এই বাড়ির ছাত।

পাঁচ, একবার এক যাত্রার দল এই পাড়ায় তিনদিন ধরে যাত্রা করতে এসেছিল। সেই দলকে

[illegible]
[illegible] দশটার সময় ছাত থেকে ভেতরের উঠোনে পড়ে গিয়ে হাত-পা ভেঙে হাসপাতালে পড়ে ছিলেন এক মাস। তিনি বলেছিলেন, অদৃশ্য কেউ ছাত থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল।

ছয়, একবার এক ভবঘুরে মানুষ এই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ভীষণ সাহসী। সারা পৃথিবী ঘুরেছিলেন তিনি। যাওয়ার আগে পাড়ার লোককে বলেছিলেন, এই বাড়িটায় অদ্ভুত একটা কিছু আছে। প্রবল বাতাস যখন কোনও ফাঁক-ফোকর দিয়ে বইতে থাকে তখন শিস দেওয়ার মতো একটা শব্দ হয়। সারা রাত এই বাড়িতে সেইরকম শব্দ হয়। বাইরে বাতাস নেই, ভেতরে বাতাস কেঁদে কেঁদে ফেরে।

সাত, বাগানের মাটি খুঁড়ে একটা কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল। কোনও মহিলার। হাতে বালা ছিল।

আট, রান্নাঘরের বাইরের দেওয়াল বেয়ে একটা পোড়া মাটির নল সোজা উঠে গেছে তিনতলার ছাতে। খালি বাড়ি। তালা বন্ধ। কেউ কোথাও নেই। প্রতিবেশীরা দেখেছে, গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

আমার ঠাকুরদা এর সব ক'টাই লিখে রেখেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন 'ভূতের লিস্ট'। বাড়ির দখল নিয়ে বললেন, "দেখা যাক, কোন ভূত কখন দর্শন দেয়। ভূতের দর্শন পেলে ভগবানেরও দর্শন পাব।" আমরা তখন খুবই ছোট। আমি আর আমার দিদি সন্ধে হলেই দু'জনে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতুম। এ-মহল থেকে ও-মহলে যেতে ভয়ে বুক কাঁপত। বারান্দার ঘুরপাক। বাঁ দিক দিয়ে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে নীচে। আর-একটা সিঁড়ি উঠে গেছে ছাতে। ডান দিকে বাগান থেকে উঠে এসেছে ঝোপঝাপ, গাছপালা। রেলিং-এ ঝুঁকে নীচের দিকে তাকালে পাতকো তলা। হ্যান্ড-পাম্পের হাতলটা অন্ধকারে নিরেট এক অন্ধকার। ঝিঁঝির ডাক। পাতার ফাঁকে ফাঁকে চিকচিকে জোনাকি। কে আবার শিখিয়ে [illegible]

[illegible] দিদি আর আমি যেন অবিচ্ছেদ্য দুই প্রাণী। দিনের বেলা যত ঝগড়া, রাত্তির হলেই গায়ে গা লাগানো গলায়-গলায় ভাব। মা কি জ্যাঠাইমা হয়তো উত্তর মহলের রান্নাঘর থেকে ডাকলেন, "উমা, শুনে যা।" আমরা অমনই দু'জনে জড়াজড়ি করে হাজির হলুম।

মা আমাকে বললেন, "তোকে কে ডেকেছে! পড়া ছেড়ে উঠে এলি কেন?"

জ্যাঠাইমা মাকে বললেন, "বুঝলি না, সব ভূতের ভয়ে জুজু হয়ে আছে।"

আমি আর দিদি দু'জনে যে ঘরে বসে পড়তুম, সেই ঘরের দুটো জানলা। হা-হা করছে। জানলা মানেই ভূত। লম্বা লম্বা হাত বাড়ালেই হল। জানলার দিকে পেছন ফিরে বসা চলবে না। ভূত পিঠে সুড়সুড়ি দিতে পারে। দু'জনে মাথা খাটিয়ে বের করলুম, দু'জনে পিঠে পিঠ দিয়ে বসব। একজনের মুখ এ-জানলার দিকে, আর-একজনের মুখ ও-জানলার দিকে। ভূত যদি হাত বাড়ায়, দেখতে পাব আর চিৎকার করে উঠব। একটু করে পড়ি আর ভয়ে-ভয়ে তাকাই। তাকাই আর পড়ি, পড়ি আর তাকাই।

আমি যে জানলাটার দিকে তাকাতুম, তার ওপাশেই ছিল বাইরে যাওয়ার সিঁড়ি। বাড়িটার দুটো সিঁড়ি ছিল। একটা খিড়কির, আর-একটা সদরের। ওটা ছিল সদরের সিঁড়ি। একদিন আমরা দু'জনে পড়তে বসেছি। পড়া বেশ কিছুটা এগিয়েছে, এমন সময় জানলায় একটা মুখ। সাদা লম্বা দাড়ি, চুল। ধকধকে দুটো চোখ। সঙ্গে সঙ্গে আমার চিৎকার, "দিদি রে! ভূত।" বলা মাত্রই দিদির এক লাফ। দু'জনে বইপত্তর উলটে, জড়াজড়ি করে দৌড় মারলুম উত্তর মহলের রান্নাঘরের দিকে। জ্যাঠাইমা ময়দা মাখছিলেন। সোজা তাঁর ঘাড়ে। তিনজনেই চিতপাত। জলের ঘটি উলটে গেল। উলটে গেল দুধের ডেকচি। মা আলুর দমের আলুর খোসা ছাড়াচ্ছিলেন। তিনি ভাবলেন, ভূমিকম্প হচ্ছে। মা ভয় পেলে ইংরেজি বলেন। চিৎকার করতে লাগলেন, "আর্থকোয়েক, আর্থকোয়েক। শাঁখ বাজাও, শাঁখ বাজাও।"

জল, ময়দা, ডাল, দুধ সব মেখে আমরা উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, ''আমরা ভূত দেখেছি।''

''সন্ধে সাতটার সময় ভূত!''

না, ভূত নয়। এক ভদ্রলোক। আশুবাবু, আমার ঠাকুরদার বন্ধু। কবি। ভদ্রলোকের পেছন-পেছন ঠাকুরদাও উঠছিলেন সিঁড়ি দিয়ে। তিনি হুটোপটির শব্দ শুনছিলেন। রান্নাঘরে এসে বললেন, ''ছি ছি! কী লজ্জার কথা। আশুবাবু বলছেন, 'আমার চেহারাটা কি এতই ভয়ংকর যে, ছেলেমেয়ে দুটো ওইভাবে ছুটে পালাল। এ দাড়ি তো আমার অনেক দিনের। কবিতায় তেমন ফোর্স আসছিল না বলেই দাড়ি রাখতে বাধ্য হয়েছি, কবিগুরুর অনুপ্রেরণায়।'''

মা বললেন, ''বাবা, এ দুটো হল রামভিতু। দিনরাত, চলতে-ফিরতে ভূত দেখছে।''

পরে দিদিতে-আমাতে একটা গবেষণা হল। যতই হোক আমরা তো অপমানিত হয়েছি। ভয়ংকর অপমান। ঠাকুরদার কবি-বন্ধুকে ভূত ভেবেছি।

দিদি বললে, ''বিল্টু, ভূত সম্পর্কে তোর কোনও আইডিয়া আছে? কেমন দেখতে, না দেখতে?''

আমরা দু'জনেই তো দেখিনি কখনও। কেবল শুনেছি। ভূত দেখা যায় না। ভূত কেবল কর্ম। কর্ম বললে ভুল হবে। ভূত হল অপকর্ম। নানারকম অদ্ভুত-অদ্ভুত কাজ করে। দিদি বললে, "একটা লিস্ট কর। এক নম্বর, ভূত অদ্ভুত-অদ্ভুত শব্দ করে। দুই, ঘাড়ের কাছে ঠান্ডা নিশ্বাস ফেলে। তিন, যে-কোনও জিনিসকে শূন্যে উঠিয়ে দেয়। চার, শুয়ে থাকলে ঠ্যাং ধরে ঘুরিয়ে দেয়। পাঁচ, বন্ধ জানলা-দরজা খুলে দেয়। ছয়, হা হা করে হাসে। সাত, পিঠে সুড়সুড়ি দেয়। আট, ঝড় হয়ে বয়ে যায়। নয়, মেজাজ ভাল থাকলে জিনিসপত্তর হাতের কাছে এগিয়ে দেয়। দশ, জিনিসপত্তর অদৃশ্য করে দেয় আবার জিনিস রেখেও যায়। এগারো, ঘুমন্ত মানুষের বুকের ওপর চেপে বসে। বারো, কখনও অস্পষ্ট সাদা মূর্তির মতো কাউকে কাউকে দর্শন দেয়। নাকিসুরে কথা বলে।"

লিস্ট শেষ হওয়ার পর দিদি বললে, "শোন বিলু, এর পর থেকে কোনও লোক দেখলে ভূত-ভূত করে চেঁচাবি না গাধার মতো। আমাদের একটা প্রেস্টিজ আছে। ছোট হলেও খুব ছোট নই। ভূতের কোনও চেহারা থাকে না। ভূত হল বাতাস, ভূত হল ধোঁয়া, ভূত হল শব্দ।"

বেশ চলছিল হেসে-খেলে আমাদের সংসার। মা আর জ্যাঠাইমা যেন দুই বোন। ঠাকুরদা যেন মহাদেব। বাবা আর জ্যাঠামশাই যেন হলায় গলায় দুই বন্ধু। আর আমরা, ভাই-বোন, কেউ কাউকে ছেড়ে এক মুহূর্ত থাকতে পারি না। দু'জনে সকালে স্কুলে যাওয়ার সময় রোজ কী মন খারাপ! অনেকক্ষণ দেখা হবে না দু'জনের। স্কুল থেকে ফেরার সময় দিদির স্কুলে সামনে গিয়ে দাঁড়াতুম। দু'জনে একসঙ্গে গল্প করতে করতে ফিরতুম। দিদি ভীষণ বেড়াল ভালবাসত। পথে কোনও বেড়াল দেখলেই থমকে দাঁড়াত। বলত, বিলু, দেখ, কী সুন্দর মা-লক্ষ্মীর মতো বেড়াল। চুক-চুক করে ডাকত। বেড়াল অমনই লেজ তুলে নির্ভয়ে দিদির কাছে এসে পায়ে গা ঘষত। আমার একটু দুষ্টুমি করার ইচ্ছে হত। লাফিয়ে গাছের ডাল ধরে টানছি। বুটজুতো দিয়ে পাথরের টুকরোয় শট মারছি। আর দিদি আমাকে সাবধান করছে। যখন শুনছি না, কান ধরে বলছে, বানর ছেলে। আমি হিহি করে হাসছি। দিদি ভয় দেখাচ্ছে, "বাড়ি চলো না, তোমার হবে।" বাড়ির কাছাকাছি এসে আমাদের দু'জনের দৌড় শুরু হত। রেস। দিদিকে খুব ফরসা আর সুন্দর দেখতে ছিল। যখন ছুটত, ফিতে-বাঁধা বিনুনি পিঠে দুলত। সপাত-সপাত শব্দ করত। ফরসা গাল দুটো গোলাপের মতো লাল হয়ে যেত। আর আমি তখন দিদিকে আরও ভালবেসে ফেলতুম।

এই সময় মা একদিন ভীষণ ভয় পেলেন। রাত এগারোটা নাগাদ কাজকর্ম শেষ করে রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে দক্ষিণের মহলে আসছেন, ডান দিকে ছাতে ওঠার সিঁড়ি। জায়গাটা অন্ধকার-অন্ধকার। হঠাৎ দেখলেন, লালপাড় শাড়ি পরে কে একজন ছাতে উঠে যাচ্ছে। মা ভেবেছিলেন, জ্যাঠাইমা। জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘এত রাতে ছাতে যাচ্ছ কেন?’’ কিন্তু ঘরে এসে জ্যাঠাইমাকে দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। মায়ের কথা কেউ বিশ্বাস করতেই চাইলেন না। শেষে বাবা আর জ্যাঠামশাই টর্চ নিয়ে ছাতে গেলেন। কিছুই দেখতে পেলেন না।

ঠাকুরদা বললেন, ‘‘কিছুই না, চোখের ভুল, অমন হয়। ভুত তো বাইরে নেই, আছে মানুষের মনে।’’

সবাই সায় দিলেন, ‘‘ঠিকই তো, ঠিকই তো।’’

মা কিন্তু পর-পর তিনদিন একই সময় সেই মূর্তিকে ছাতে উঠে যেতে দেখলেন। জ্যাঠাইমা ছাড়া কেউই তেমন পাত্তা দিলেন না মায়ের এই দেখাটাকে। ঠিক সাতদিনের মাথায় ছাতে কাপড় শুকোতে দিতে গিয়ে মায়ের পায়ের তলায় একটা মাছের কাঁটা ফুটে গেল। হয় কাকে এনেছিল, না হয় বেড়ালে। কাঁটাটা টেনে খুলে ফেলে দিয়েছিলেন। নীচে নেমে এসে জ্যাঠাইমাকে একবার বলেছিলেন। জ্যাঠাইমা আয়োডিন লাগিয়ে দিয়েছিলেন। জিনিসটাকে কেউই তেমন ভয়ের চোখে দেখেননি, কিন্তু সেইদিনই সন্ধেবেলা মায়ের কেঁপে জ্বর এল। ডাক্তার এলেন। পরীক্ষা করে বললেন, ‘‘আর কিছু করার নেই, ধনুষ্টঙ্কার হয়ে গেছে।’’ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মা চলে গেলেন।

দিদি আর আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকি আকাশের দিকে। মনে মনে ভাবি, মা হয়তো কোথাও বেড়াতে গেছেন। হঠাৎ ফিরে আসবেন একদিন। দু'হাতে জড়িয়ে ধরবেন আমাদের দুজনকে। আমি দিদির দিকে তাকাই। দিদি আমার দিকে। দু'জনেই কেঁদে ফেলি।

দিদি বলে, "মায়ের মতো মা কি আর পাওয়া যাবে রে বিলু! আর বেঁচে থেকে কী হবে? জ্যাঠাইমাও আমাদের মা। তা হলেও, মা একটা আলাদা জিনিস।"

পাড়া-প্রতিবেশীরা বলতে লাগল, তখনই বলেছিলুম, বাড়িটা হানাবাড়ি। শুনলে না তোমরা! এখনও সময় আছে। সংসারটা চুরমার হয়ে যাওয়ার আগে পালাও। কেউই সে কথা শুনলেন না। বাবা বললেন, "এদের মা যেখানে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন, আমার কাছে সেই জায়গাটা তীর্থ।"

জ্যাঠামশাই বললেন, "ঠিকই তো, ঠিকই তো!"

ছ'টা মাস কোথা থেকে কেটে গেল। শীতের মুখে দিদি একদিন সেই মূর্তি দেখতে পেল সিঁড়িতে। লালপাড় শাড়ি পরে ছাতের সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দে উঠে যাচ্ছে ওপরে। দিদি ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল, "বিলু, এইবার আমার মরার পালা।"

সকলে দিদিকে জেরা শুরু করলেন, "তুই কী দেখেছিস, ঠিক করে বল।"

দিদি বললে, "বলে আর কী হবে! আমি যা দেখেছি তা দেখেছি। এইবার আমাকে নিয়ে যাবে। আমাকেও চলে যেতে হবে মায়ের কাছে।"

আমি আর দিদি এক বিছানায় পাশাপাশি শুতুম। চাঁদের আলো এসে পড়েছে দিদির মুখে। দিদি অনেকক্ষণ জেগে শুয়ে ছিল কপালে হাত রেখে। হঠাৎ আমার দিকে পাশ ফিরে বললে, "শোন বিলু, আমি তো চলে যাচ্ছি, আমার যা আছে সব একটা বাক্সে ভরে তোর কাছে রেখে দিলুম। কাউকে দিবি না। বাক্সটার ওপর বড় বড় করে লিখে রাখবি, 'আমার দিদি'। যখন তুই অনেক অনেক বড় হয়ে যাবি, তখনও বাক্সটা তোর কাছে রেখে দিবি। মাঝে-মাঝে খুলে দেখবি। যখনই খুলবি আমার গলা শুনতে পাবি, বিলু।"

সে-রাতে দু'জনেই জেগে রইলুম। কারও চোখে ঘুম নেই। সকালে সারা বাড়িতে ভীষণ উত্তেজনা। আমাদের ছাতে আমাদেরই সাদা ধবধবে বেড়ালটা মরে পড়ে আছে। সুস্থ-সুন্দর বেড়াল। আগের রাতে জ্যাঠাইমার হাতে মাছ-ভাত খেয়ে গেছে। এমন তো হওয়ার কথা নয়। ফুলের মতো সাদা একটা বেড়াল দলা পাকিয়ে পড়ে আছে ছাতের এক কোণে। কাল রাতে কাগজের একটা দলা নিয়ে কত খেলেছে! দিদির কোলে শুয়ে ঘড়ঘড় করেছে। জ্যাঠাইমা যখন রান্নাঘরে রাঁধছিলেন, পিঠে গা ঘষেছে।

দিদি ঘরে গিয়ে চুপ করে বসল। আমাকে বলল, "বড় ভয় করছে রে বিলু! আমার মৃত্যুটা কীভাবে হবে! ছাতে, না ঘরে!"

আমার ঠাকুরদা সেদিন আর স্কুলে গেলেন না। কোথায় যেন বেরিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় বাবা আর জ্যাঠামশাইকে বলে গেলেন, "তোমরা উমাকে ঘিরে বসে থাকো, যেন নিয়ে না যেতে পারে!" কোথায় যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন, কিছুই বললেন না।

অনেকক্ষণ পরে ফিরে এলেন একটা লরি চেপে, সঙ্গে তিনজন লোক। সেইদিনই আমরা বাড়িটা ছেড়ে দিলুম। সব জিনিসপত্তর নিয়ে আমরা আর-একটা বাড়িতে এসে উঠলুম। ভূত আছে কি না জানি না, কিন্তু ভূত যেন একালের টেররিস্ট। দিদির বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে সেদিন বলেছিল, "বাড়িটা ছাড়, নয়তো একেও মারব!"

শুধু একটাই দুঃখ, বাড়িটায় না এলে মা হয়তো আজও বেঁচে থাকতেন!

১ এপ্রিল ১৯৯২
অলংকরণ: দেবাশিস দেব

টটনের কুকুর

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

টটনের বাবা খুব গরিব। কিছু জমিজমা, পুকুর ছাড়া টটনের বাবা মনোমোহন বলতে গেলে ফকির। টটনের ভাইবোন মেলা। মা-ঠাকুমা তো আছেনই। জমিজমায় চলে না। প্রথম কোপটা পড়ল টটনের ওপর। ওর লেখাপড়া বন্ধ। জমির কাজে লেগে গেলে সংসারে দু'পয়সা আসে। গোরু-বাছুর সামলালে মনোমোহনের কাজ হালকা।

টটনের বাবা গরিব বলে, তাকে সবাই 'ফকিরের ব্যাটা' বলে। গাঁয়ে, আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে গেলেও ফকিরের ব্যাটা। অবশ্য টটনের দোষও আছে। সে বোঝে তার কোনও কিছুতেই বায়না করা সাজে না। তবু এই ব্যামোটা তার আছে। কেউ ভালমন্দ খেলে তারও খেতে ইচ্ছে হয়। সে হাত পাতে। টটনকে দেখলেই তারা খাবার লুকিয়ে ফেলে।

টটন টের পায়।

এই যেমন নব, ওর বাবার চায়ের দোকান। দোকানে নবও মাঝে মাঝে বসে। বসলেই লজেন্স-বিস্কুট সরায়। পালিয়ে খেতে দেখলেই টটন ছুটে যাবে, "কী খাচ্ছিস রে?" তাড়াতাড়ি পকেটে যা-ই থাকুক, লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করে নব।

কিন্তু টটন ছাড়বার পাত্র নয়।

তখন নব বলবে, "আন, এক বালতি জল।"

সে জল নিয়ে আসে এক বালতি।

তারপর বলবে, "কাপ-প্লেটগুলো ধুয়ে রাখ।"

টটন খুশি মনেই কাপ-প্লেট ধুয়ে দিলে হয়তো দুটো লজেন্স দিয়ে বলবে, "ভাগ ফকিরের ব্যাটা।"

এতে সে কিছু মনে করে না। তার বাবা গরিব। গরিব আর ফকিরের তফাতই বা কী? তা ফকিরের ব্যাটা বললে সে খুশিই হয়। খুশিতে সে আরও দু'-একটা ফাউ কাজ করে ফেলে।

পাড়া-প্রতিবেশীরাও টটনকে দেখলে ফাউ কাজ করিয়ে নেওয়ার তালে থাকে।

"গাছ থেকে আম পাড়।"

সে আম পেড়ে দেয়।

একটা আম হাতে দিলেই খুশি।

"সাইকেলটা সাফ কর। কাদা মুছে ফেল।"

টটন সাইকেল ন্যাকড়া দিয়ে ঝকঝকে করে ফেললে— দশটা পয়সা। হাত পেতে নেবে আর দেখবে। কোথায় যে রাখবে! জামা নেই গায়ে। প্যান্টের পকেট ছেঁড়া। যা রাখে সবই পড়ে যায়। সেই টটন একদিন জমিতে বাপকে ভাত দিয়ে ফেরার সময় এক কাণ্ড। কোথা থেকে একটা কুকুরের বাচ্চা ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে বাবুর অনুসরণ করছে।

সে রেগে যায়। সে গাল দেয়, "ফকিরের ব্যাটা আমার লগ ধরলি! যা। আমার পকেটে কিছু নেই।"

টটনের ধারণা, কুকুরের বাচ্চাটা সেয়ানা। খাবারের লোভে তার লগ ধরেছে। পকেটে যে কিছু নেই, তাও নয়। লেড়ো বিস্কুটটি সে পেয়েছে পীতাম্বরের দোকান থেকে। একটা বিস্কুট দিয়ে তাকে মেলা ফাউ কাজ করিয়ে নিয়েছে। এতে সেও খুশি, পীতাম্বরও খুশি। তার সেলাই-কলের দোকান। ঘর ঝাঁট দেওয়া থেকে খাবার জল কল থেকে তুলে দিয়ে এসেছে।

বাচ্চা কুকুরটা ঠিক টের পেয়েছে। সে যেমন টের পায় তাকে লুকিয়ে কে কখন কী খায়। সে তো মাত্র একবার লেড়ো বিস্কুটের খানিকটা ভেঙে মুখে দিয়েছে, তারই ভেতর নজর পড়ে গেল! ভাইবোনেরা পর্যন্ত টের পায় না। পেলেই ছেঁকে ধরে। আর তুই কোথাকার ফকিরের ব্যাটা টের পেয়ে গেলি! ধাঁই করে একটা লাথি কষাল। কুকুরটা ফুটবলের মতো কিছুটা উড়ে গিয়ে পড়ে গেল। কুঁই-কুঁই করছে। সঙ্গে সঙ্গে টটনের মনে হল, পা-টা কে যেন খামচে ধরেছে! পা-টা সরিয়ে নিল! টটন বেশ ঘাবড়ে গেছে।

সে হাঁটা দিল। জামবাগানের ভেতর থেকে দেখল, কুকুরটার লজ্জা নেই। আবার পায়ে-পায়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে হাঁটছে। তার পিছু নিয়েছে। আর পারা যায়! বলল, ''নে। খবরদার আর পা বাড়াবি না।'' নুয়ে সে পা দেখল। পায়ে দুটো দাঁত ফোটাবার দাগ। কীসের দাগ, বুঝল না। কে শোনে তার কথা! কুকুরটা ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে তার পিছু পিছু আসছে। যত দেয়, তত কুকুরটা ল্যাংচায়। আর কুঁই-কুঁই করে। টটনের মহা মুশকিল। বাড়ি গিয়ে উঠলে মায়ের তেজ, ''নিজের খেতে ঠাঁই নেই শঙ্করাকে ডাকে!''

মায়ের দোষ নেই। বাবা না আনতে পারলে দেবেন কোত্থেকে। তবে একবার বোঝাতে পারলে, তার মায়ের মতো মা হয় না। যদি বুঝে যান— তখন মা নিজেই ডাক-খোঁজ করবেন। ''আরে নিজে খেলি, কুকুরটাকে দিলি না। ভগমানের দান, যাবে কোথায়!''

তা কুকুরটাকে দেখে মাও কেমন খুশি। বাবা জমি থেকে ফিরে বললেন, ''কুকুরটার ঠ্যাং ভাঙল কে? ল্যাংচাচ্ছে। তোমার ছেলের কাজ নয় তো!''

টটন রাস্তায় দাঁড়িয়ে সব শুনতেই দৌড়ে গেল। বাবার মেজাজও কুকুরটিকে দেখে অপ্রসন্ন নয়। বাবা-মা খুশি থাকলে সেও খোশমেজাজে থাকে। সে বলল, ''কী পাজি এটা, মাঠ থেকে সঙ্গ ধরেছে। কিছুতেই যাবে না। আমার সঙ্গে বাড়ি উঠে এল। লাথি মারলাম। তাও না।'' অবশ্য লাথি মারার সময় কে যেন খামচে দিয়েছিল। সে-কথা বলল না।

খামচে দিয়েছিল, না কামড়ে দিয়েছিল— সে তা ঠিক মনে করতে পারছে না। তবে গোড়ালির জায়গাটা লালায় ভেজা মনে হয়েছিল। দাঁতের কামড়ও। তবে শুধু দাগ। কামড় জোরে বসায়নি রক্ষে।

কে যে কামড়াল! কুকুরের কামড়ের মতো। অবশ্য এ নিয়ে ভাবে না। কোথাও ছিল, ঝোপজঙ্গলে পালিয়ে গেছে। তবে বাচ্চা কুকুরটা নয়। কারণ ওটা তো ধানের জমিতে ছিটকে পড়েছে। বললে তরাস লেগে যাবে। মা বলবেন, ''আরে বলছিস কী! কই দেখি আয় তো।'' চেঁচামেচি শুরু করে দেবেন।

ছোটভাই মটর বলল, ''দাদা, কী সুন্দর না দেখতে?'' কুকুরটার নামও সে দিয়ে দিল। টুটু।

মটরের মাথা সাফ। বাবা তার স্কুলের পড়া গজব করেননি। টটন এজন্য রাগ পুষে রাখেনি। তার যখন হবে না, আর তার তো বই দেখলেই রাগ ধরে যায়— এত খোলামেলা বাড়ি, গাছপালা, গোরু-বাছুর, জমিতে ফুলকপি-বাঁধাকপির চাষ, এক হাতে বাবা সামলাতেও পারেন না। সে বাবার কাজে লেগে গিয়ে ভালই করেছে। সংসারের সাশ্রয়। তার নাম টটন, কুকুরের বাচ্চাটার নাম টুটু। টটনের কুকুর টুটু।

বাচ্চাটাকে বাংলা সাবান দিয়ে স্নান করাবার সময় দেখল একটা পায়ে বেশ বড় ক্ষত। মাকে দেখাল। মা চুন-হলুদ গরম করে লাগিয়ে দিতেই কুকুরটির আরাম বোধ হচ্ছে টের পেল টটন।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনোমোহন দেখতে পেলেন, একজন কাপালিক গোছের লোক, গাছের নীচে বসে আছেন।

মনোমোহন উঠোনে দাঁড়িয়ে সবে সূর্যপ্রণাম করছেন।

''আমার কুকুরটা?''

মনোমোহন তাকালেন। কাপালিক মানুষকে সবাই ভয় পায়, সে কাছে গিয়ে বলল, ''কিছু বলছেন ঠাকুর?''

''আমার কুকুরটা?''

কুকুরের কথা শুনে সবাই উঠোন পার হয়ে গাছতলায়।

মটর বলল, ''এখানে কোনও কুকুর নেই।''

''আছে। একটা বাচ্চা কুকুর। কালো রং। এক পা খোঁড়া।''

''আরে টুটুর কথা বলছেন?'' সে দৌড়ে ঘরে ঢুকে বলল, ''দাদা, টুটুকে নিতে এসেছে।''

''কে? টুটুকে কে আবার নিতে এল!''

''আয় না।''

টটন বের হয়ে বলল, ''এটা আপনার কুকুর?''

টুটু কিছুতেই কোল থেকে নামবে না। মা চেঁচাচ্ছেন, ''দিয়ে দে বাবা। কার মনে কী আছে কে জানে।''

মা ঠাকুর-দেবতাকে ভয় পান, সাধুসন্তের ভয়ে কাবু থাকেন। টটন জানে। যার কুকুর তাকে দেওয়াই ভাল। কী না আবার অনাসৃষ্টি শুরু হবে। সে কুকুরটাকে নামিয়ে দিলেই কুঁই-কুঁই করতে লাগল। যাবে না। কাপালিক গোছের লোকটি যেই না টুটুকে খপ করে ধরতে গেলেন, কী হল কে জানে, ''ওরে বাবা এ তো আগুন রে বাবা।''

লোকটা ধপাস করে পড়ে গেলেন, না কিছু দেখে ঘাবড়ে গেলেন, বুঝল না। লোকটা চিমটে, ত্রিশূল, থলে নিয়ে দৌড়তে লাগলেন। যেন কেউ ঠেলে ফেলে দিয়েছিল তাঁকে।

সবাই তাজ্জব।

বাবা বললেন, ''কী হল, পড়িমরি করে ছুটে পালাল কেন? যেন কেউ ঠেলে দিল লোকটাকে। কোনওরকমে প্রাণে বেঁচে গেছে।''

টটন বলল না তারও এমন হয়েছে। পায়ে কীসে কামড়ে দিয়েছিল। তবে দাঁত ফোটায়নি। তাই রক্ষে।

টটন বলল, ''লোকটা মিছে কথা বলেছে বাবা। কুকুরটাকে আমি তো নীলপুকুরের পাড়ে পেয়েছি।''

সে যাই হোক, কুকুর নিয়ে আর কেউ পরে কথা চালাচালি করেনি। জবরদস্ত কাপালিক কোন সুবাদে বাড়িতে হাজির, কী করেই বা জানলেন, টুটু

মনোমোহনের বাড়ি গিয়ে উঠেছে তাও তারা বুঝল না। তবে কুকুরটার মধ্যে কিছু একটা আছে। মা তো একেবারে চুপ। বাবা বললেন, "দেখ, যেন পালিয়ে না যায়। কী আবার বিপদে পড়ব বুঝতে পারছি না।"

টুটুকে নিয়ে শীতকালটা মজারই ছিল। ভাল খেতে পেয়ে নাদুসনুদুস, গড়িয়ে গড়িয়ে হাঁটে। সর্বক্ষণ টটনের সঙ্গে। সে জমিতে গেলে টুটু জমিতে, সে ঝোপজঙ্গলে ঘুরে বেড়ালে, সঙ্গে টুটু। সে যা পায় সবই দু'জনে ভাগ করে খায়।

একদিন এক ছাগলের ব্যাপারী বাড়ি এসে হাজির। সেও বলল, তার কুকুর হারিয়েছে। এই বাড়িতেই আছে।

বাবা রেগে গিয়ে বললেন, "কুকুর হারালেই আমার বাড়ি! এ তো আচ্ছা ঝামেলা।" সোজা জবাব, "না, এখানে কুকুর-টুকুর নেই।"

"আছে। আপনি জানেন না। মিছে কথা বলছেন।"

"আরে, মিছে কথা বলব কেন! বলছি কারও কুকুর আমার বাড়ি আসেনি। আমাদের কুকুর ছাড়া অন্য কোনও কুকুর আমাদের বাড়িতে নেই।"

"ওটাই আমার। দেখান।" বলে পাঁচনখানা বগল থেকে নিয়ে হাতের ওপর ঘোরাতে থাকল।

টটন কোথা থেকে এসে শুনেই খাপ্পা। সে টুটুকে বগলে তুলে গাছতলায় দৌড়। ব্যাপারীকে বলল, "এটা?"

"হ্যাঁ, এটা। এটাই আমার কুকুরের বাচ্চা!"

আর যায় কোথায় পাঁচন-টাচন ফেলে লোকটা চিত হয়ে পড়ে গেল। আর্ত ডাক, "বাঁচান কর্তা। আমারে খেয়ে ফেলল।" যেন লোকটাকে কেউ আক্রমণ করছে। পা ছুড়ছে, হাত ছুড়ছে— গড়াগড়ি খাচ্ছে। এক হাতে কাপড় সামলাচ্ছে, অন্য হাতে পাঁচন দিয়ে আক্রমণ যেন সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে।

টটন, তার বাবা, মা, এমনকী, দু'-একজন প্রতিবেশীও হাজির। আর দেখল, লোকটা প্রাণভয়ে দৌড়চ্ছে। বলছে, "ওরে বাবা রে, আমাকে কামড়ে দিল রে।"

টটন, বাবা, [illegible] লোকটার পা থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে।

মনোমোহনের মাথা ঘুরছে।

কুকুরের বাচ্চাটার দিকে মনোমোহন তাকালেন। ওটা তো টটনের কোলেই আছে। কেমন ত্রাসে পড়ে গেল! বাচ্চাটাকে রাখা উচিত-অনুচিতের কথাও ভাবছে। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলার সাহস নেই।

মনোমোহন ছেলেকে প্রশ্ন না করে পারলেন না, "নীলপুকুরের কাছে কোথায় পেলি?"

"জমিতে। ওই সেখানে করদের জমিতে। পাশটায় হোগলা বন আছে, বন থেকে বের হয়ে এল।"

মনোমোহন জানেন, নীলপুকুরের বেলগাছটা ভাল না। দোষ পেয়েছে। ওঁর ধারণা ছিল, যদি বেলগাছটার নীচে কুকুরের বাচ্চাটাকে পায়, তবে গাছের দোষ কুকুরেও বর্তাতে পারে। রাতেবিরেতে কেউ বড় গাছটার নীচ দিয়ে আসে না। গাছটায় নীরদা গলায় ফাঁস দিয়েছিল। কিন্তু জমিতে পাওয়া গেলে গাছের দোষ দেওয়া যায় না। খুব বেশি বলাও মুশকিল। কে আবার অদৃশ্যলোক থেকে তাকেই না আক্রমণ করবে। কিংবা কামড়াবে। ব্যাপারী তো ছুটেই পালাল, সবাই দেখেছে গোড়ালি থেকে, হাঁটুর নীচ থেকে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। কুকুরে কামড়ালেই এমনটা হওয়ার কথা।

কিন্তু বাচ্চাটা তো টটনের কোলেই ছিল। কামড়াবে কী করে! বাচ্চা কুকুর কামড়াতেও জানে না। লোকটারই বা দোষ কী। তার কুকুর যদি হয়, সে বলতেই পারে, কুকুরটা আমার। আমার বাচ্চা কুকুরটাকে টটন চুরি করে এনেছে। টটন আনতেও পারে। মারের ভয়ে সে কখনওই সত্যি কথা বলে না। কিন্তু নিজের চোখের ওপর দেখার পর টটনের গায়ে হাত তোলা তো দূরে থাক, তোষামোদের বাড়াবাড়ি শুরু হয়ে গেল।

টটনের দিকে তাকিয়ে মনোমোহন বললেন, "সত্যি বলছিস, জমিতে পেয়েছিস!"

"বা রে, মিছে কথা বলি কখনও!"

"না, তুই মিছে কথা আর কবে বললি?" ধর্মপুত্তুর, মুখে এসে গিয়েছিল, তবে বললেন না। কারণ কীসে

কোন আপদ সৃষ্টি হবে, তা তিনি নিজেও জানেন না। খুবই বিনয়ের গলায় বললেন, "বলছিলাম, যার কুকুর তাকে দিয়ে দেওয়াই ভাল।"

মাও বললেন, "আমি বলছিলাম, পর পর যা হচ্ছে, তাতে কিন্তু কুকুরটাকে সুবিধের মনে হচ্ছে না।"

টটনের এক কথা, "কুকুরটা কি তোমাদের কামড়ায়, না রাতে ঘেউ ঘেউ করে? তোমাদের ঘুমের কি ব্যাঘাত হয়, বলো!"

"না, তা অবশ্য করে না। তোর বুকের কাছে শুয়ে থাকতে পারলেই নিশ্চিন্তি। চোর-ছ্যাঁচোড়ের ভাবনা তার নেই। ডাকাডাকির বিষয়টা কুকুরটা জানেই না। কখনও তো দেখলাম না ঘেউ করতে। কেবল লেজ নেড়ে এটা-ওটা শুঁকে বেড়ায়। খাবার পেলে লাফায়। তোকে দেখলেই লাফিয়ে কোলে উঠতে চায়।"

"তবে!" টটনের এক কথা। "যার কুকুর তাকে দিয়ে দিতে বলছ কেন? আমি জানিই না কার কুকুর! আর কে নেবে? যে আসে সেই তো পালায়। বলো, দেবটা কাকে?"

এর পর আর কী বলা যায়, মনোমোহন ভেবে পেলেন না। এবারে শীতের ফসল খুবই ভাল হয়েছে। মা লক্ষ্মী তাঁকে ঢেলে দিয়েছেন। এক কেজি, দেড় কেজি মুলোর ওজন। বাজারে দরও ভাল যাচ্ছে। মনোমোহন এত পয়সার মুখ কোনও শীতের মরশুমে দেখেননি। কুকুরটা আসায় তাঁর যেন ধনে-জনে লক্ষ্মীলাভ।

মানুষের হাতে পয়সা এলে যা হয়, খাওয়া-পরার লোভ বাড়ে। মনোমোহনও সেই লোভে শহর রওনা হবেন। ছেলেমেয়েদের জামা-প্যান্ট, পরিবারের একখানা ভাল শাড়ি, নিজের দুটো লুঙ্গি, গেঞ্জি, একটা শার্ট কেনার জন্য শহরে যাবেন। বাবা শহরে গেলে ভাল মিষ্টিও নিয়ে আসেন। টটন-মটর দু'জনেই বাবাকে বাস রাস্তায় এগিয়ে দিতে গেল। মোড়ের বটগাছটার নীচে বাস লোকজন তুলে নেয়। বাবাকে তুলে দিয়ে ফিরে আসবে।

অবাক, কুকুরটা কিন্তু সেই থেকে কুঁই কুঁই করছে কোলে। কেন করছে বুঝছে না। টটনের বুকে লেপটে থাকতে চাইছে না। টটন ছেড়ে দিল। ছেড়ে দিলেই বাড়িমুখো ছুটতে চাইছে। এত দূর থেকে পথ চিনে না-ও যেতে পারে। বাচ্চা কুকুর ছেড়ে দিতেও ভয়। কোথায় কোন কাপালিক, কিংবা ব্যাপারী ওত পেতে থাকবেন কে জানে! কুকুরটাকে জোরজার করেই যেন নিয়ে যাচ্ছে টটন, মটর।

আর বাসে ওঠার সময়ই মনে হল মনোমোহনের, তাঁর কোঁচা ধরে কে টানছে। তিনি পা-ঝাড়া দিলেন। বললেন, "কে রে? কেউ তো নেই।" কাছেই টটন-মটর দাঁড়িয়ে আছে। বাচ্চাটাও টটনের কোলে। কেবল কুঁই-কুঁই করছে। ছটফট করছে।

আবার পা ঝটকা দিলেন। তাঁর কাপড় ধরে কেউ টানছে। মনে হল, কোঁচা ধরে টানছে। ভারী তাজ্জব ব্যাপার তো! তিনি নেমে পড়লেন। মনে সন্দেহ। বাস কন্ডাক্টর বললেন, "আরে উঠবেন তো উঠুন।" কিন্তু উঠতে গেলেই কোঁচা ধরে কে যেন টানছে। যেন এবার কিছুতে পা কামড়ে ধরল। মনোমোহন নেমে গেলেন বাস থেকে। চারপাশে তাকালেন। কেউ নেই। কে তবে পায়ে এত জড়াজড়ি করছে!

বাসটা ছেড়ে দিল।

বিকেলে খবর পেল, বাসটা দুর্ঘটনায় পড়েছে। বাসসুদ্ধ লোক নয়ানজুলিতে। সকালেই খবরের কাগজে পড়লেন, বাস দুর্ঘটনায় পঁয়ত্রিশজনের মৃত্যু। ভাগ্যিস মনোমোহন বাসে যাননি। তিনি কুকুরটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মাকে ফিসফিস করে বাবা কী বললেন, টটন বুঝল না।

দু'দিনও পার হয়নি। টটন জমিতে বাবার ভাত দিতে গেছে। সঙ্গে কুকুরের বাচ্চাটা।

ফেরার সময় ঝোপজঙ্গলে ঢুকে যাওয়া-তার স্বভাব। এদিকটা খুবই শুনশান। বড় বড় সব গাছ আর জঙ্গলে ভর্তি। শিশু গাছই বেশি। রাজরাজড়ার পতিত জায়গা। জঙ্গল শুধু বাড়ছেই। তবে শীত শেষ হয়ে যাচ্ছে বলে ঝোপজঙ্গলের পাতাও ঝরে গেছে। গরিব মানুষেরা কাঠকুটোর জোগাড়ে জঙ্গলে এবারে ঢুকে যাবে। সেও কতবার মরা ডাল, শুকনো ডালপাতা মাথায় করে বাড়ি নিয়ে গেছে। জঙ্গলটা

ঘুরে দেখার একটা মোহ আছে। সেই মোহে পড়ে এমন একটা তাজ্জব কাণ্ড দেখবে সে আশাই করেনি। দু'জন ষণ্ডামার্কা লোক কী নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করছে। মারামারি করছে। একজন অন্যজনকে ছোরা দেখিয়ে ব্যাগ কেড়ে নিতে চাইছে। ধুন্ধুমার কাণ্ড। জঙ্গলের মধ্যে অকারণ ব্যাগ নিয়ে মারামারি তার পছন্দ না। আর দেখল, তখনই লম্বামতো লোকটা বেঁটেমতো লোকটাকে মাটিতে ফেলে গলা টিপে ধরেছে। ব্যাগটা পড়ে আছে একপাশে।

সে বুঝল, তাকে দেখতে পেলে রক্ষে নেই। সে দৌড়ে পালাল। কুকুরের বাচ্চাটাও তার পিছু ধরেছে। সড়কে উঠে বেমালুম তাজ্জব বনে গেছে। কাউকে কিছু বলারও সাহস নেই, বাড়িতে নালিশ হবে এবং বাবা ধরে পেটাবেন। "আবার জঙ্গলে ঘোরাঘুরি! বলেছি না, জায়গাটা ভাল না।"

সে বাড়ি এসেও চুপ। সে জঙ্গলে ঢুকলেই মা খাপ্পা হয়ে যান।

কিন্তু পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনোমোহনের মাথায় হাত। বারান্দায় ব্যাগ। কার ব্যাগ, কী আছে, চেঁচাতেও পারছেন না। কার মুন্ডু কেটে ব্যাগে ভরে রেখে গেছে তাও জানেন না। যা দিনকাল, খুনখারাপি জলভাত। কোনওরকমে ব্যাগের মুখ খুলে উঁকি দিতেই মাথার ঘিলু হজম। তাঁর চোখ ছানাবড়া। জড়োয়া গয়নায় ভর্তি ব্যাগ। দামি পাথর-টাথরও আছে।

মনোমোহন মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। তারপর কিছুটা মন শান্ত হলে ডাকলেন, "ওগো শুনছ! ওঠো। আমার যে এবার সব যাবে। দেখো কী কাণ্ড! কী করি এখন!"

মা দেখলেন। টটনও দেখল। কারও মুখে রা নেই।

মা বললেন, "যার ব্যাগ সে ঠিক নিতে আসবে। রেখে দাও। যার জিনিস তাকে ফেরত দেওয়াই ভাল। গরিবের কপালে সুখ সয় না।"

বাবা বললেন, "সেই ভাল।"

টটনও বলল, "সেই ভাল।"

কিন্তু আতঙ্ক, আবার ব্যাগ নিতে এসে যদি পালায়। তখন তিনি যাবেন কোথায়! থানা-

পুলিশকে যমের মতো ভয় পান মনোমোহন। আর সেই রাতেই, রাত তখন অনেক, দু'জন লোক বাড়িতে হাজির। টর্চ জ্বেলে বলল, "মনোমোহন!"

মনোমোহন দরজা খুলে বাইরে বের হলেন না। চুপি দিয়ে বললেন, "আপনাদের কিছু হারিয়েছে?"

"হারিয়েছে মানে। তোমার পুত্র ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। দাও। কিছু খোয়া গেলে পরিবারে কেউ বেঁচে থাকবে না! খবর ফাঁস হলেও খুন।"

মনোমোহন বললেন, "আজ্ঞে না। আমরা কিছু ধরিনি।" বলে ব্যাগটা তুলে হাতে দিতে গেলেই, "ওরে বাবা রে" বলে দৌড়।

কোথায় গেল! মনোমোহন, টটন, মটর হ্যারিকেন নিয়ে লোক দু'জনকে খুঁজছে। যত তাড়াতাড়ি ব্যাগটিকে ধরিয়ে দেওয়া যায়। না, কোথাও পাওয়া গেল না। এখন এই ব্যাগ নিয়ে উপায়! কার কাছে যাবে। কাউকে বললেই দশ কান— নানা ঝামেলা। চুরির দায়ে জেল। কী দরকার, যার থলি তাকেই ফেরত দেওয়া ভাল। কিন্তু লোক দু'জন বেপাত্তা। তিনি ডাকলেন, "কোথায় গেলেন দাদারা?" অগত্যা ফিরে আসতে হল। রাতে কারও ভাল ঘুম হল না।

সকালে শোনা গেল, সড়কের ধারে দু'জন লোক মরে পড়ে আছে। গলার নলিতে কোনও জন্তুর কামড়।

বিপাকে পড়ে কুকুরের মালিকের খোঁজে বের হয়ে গেলেন মনোমোহন। কুকুরটা আসার পর থেকে বাড়িতে নানা উপদ্রব। পীতাম্বরই খবর দিলেন, "আরে, এই বাচ্চাটা। এটার মা'টা তো লরি চাপা পড়ে মরেছে। রাস্তার কুকুর। বাচ্চাটা নিয়ে এধার-ওধার ঘুরত। বাচ্চাটাই চাপা পড়ত, তবে মা'র পরান বোঝোই! নিজে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাচ্চাটাকে বাঁচিয়েছে। কেন, কী হয়েছে?"

"না, কিছু না।" তারপর মনোমোহন বললেন, "আচ্ছা, ওর জন্য পিণ্ডদান করলে কেমন হয়!"

"কার? কুকুরের!"

পীতাম্বর শুনে অবাক। বললেন, "কুকুরের আবার পিণ্ডদান কী? তোর কি মাথাখারাপ?"

তার পরদিন মনোমোহন আরও তাজ্জব। কুকুরের বাচ্চাটা বাড়িতে নেই। কোথাও নেই, টটন সারাদিন ডেকে বেড়ায়, "টুটু, তুই না বলে কয়ে চলে গেলি! কোথায় গেলি?"

কোনও সাড়া পাওয়া যায় না। সাড়া আর পায়ওনি।

১ এপ্রিল ১৯৯২

অলংকরণ: সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
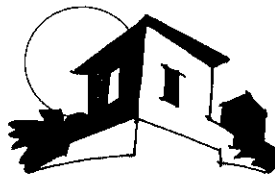
সত্যি পুকুরচুরি

শিবায়ন ঘোষ

বোঝালেই বুঝবে, বিনু এমন ছেলে নয়। পাক্কা দশ বছরের শেষ সিঁড়িতে পা রেখেছে বিনু, এগারোয় পড়ল বলে। সামনের মাসের দু' তারিখে। অথচ দাদু ভাবেন কী? বোকা? বিনু একদম বোকা? কিন্তু বিনু জানে সে তত বোকা নয়, ওর দাদু যতটা ভাবছেন।

বিনু কী যেন বলতে যাচ্ছিল, "দাদু কুকুর..."

ওর দাদু হইহই করে উঠলেন, "ঘুমো, ঘুমো বলছি বিনু! দুক্কুরবেলা খবরদার কুক্কুরের নাম মুখে আনবি নে।"

বিনু নাছোড়। দুপুরবেলা কুকুরের নাম মুখে আনবে না, তবে কখন আনবে? দাদু বলেন কী? তা হলে কি ঘুমঘুম গভীর ভোরঘুমে কুকুরের নাম মুখে আনবে? অন্যরকম এক উৎসাহে বলল ও, "আনলে কী হয়, দাদু?"

বিনুর দাদু ঢোক গিললেন, বললেন, "হাঃ হাঃ, আনলে যা হয়! খুব খারাপ হয়!"

ও এখন দাদুকে কোণঠাসা করতে চাইছে বোঝা যাচ্ছে। বলল, "কী হয়, বলো না?"

ওর দাদু একটুখানি ভাবলেন মনে হল। তারপর বললেন, "বলছি তো খারাপ হয়। এই ধর না কেন, কুক্কুরের নাম করলে, করলে, করলে, চুরি হয়!"

বিনু খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। নামতা পড়ার মতন বলতে শুরু করল, "কুকুর এক্কে কুকুর, দুই কুকুর কুকুর, তিন কুকুর..."

বিনু কুকুরের নামে নামতা পড়া শুরু করতেই ওর দাদু কড়া ধমক দিতে গিয়েও থামলেন, "খবরদার বলচি, এর পর দত্যি এলে, পুকুরচুরি হলে দোষ দিবিনে।"

বিনুর অবস্থা হ অথবা থ। এরকম কথা তো কখনও শোনেনি, কোথাও পড়েনি পর্যন্ত। কুকুরের নাম করলে, দত্যি আসে, পুকুরচুরি হয়।

খিকখিক করে হেসে উঠল বিনু, বলল, "মিথ্যে!"

খুব গম্ভীর মুখ করে ওর দাদু প্রশ্ন করলেন, "কী বললি? মিথ্যে?"

বিনু চটপট উত্তর দেয়, "হুঁ, মিথ্যে!"

বিনুর দাদু সহজভাবে হাসলেন। বললেন, "কেন মিথ্যে বিনুবাবু?"

সন্ধেবেলা সাপের নাম মুখে আনতে হয় না। হঠাৎ বলে ফেললেও বলতে হয়, এক লতা দুই লতা তিন লতা... এভাবে সাতবার। কিন্তু কুকুরের নামে পুকুরচুরি? বিনু এরকম আজগুবি কথা শুনে হাসবে তো বটেই।

তা ছাড়া তাকিয়ে দেখল, ওর দাদুর চোখে মশকরার মিহিদানা কাঁপছে। বিনু ওর দাদুর দিকে ঘন করে তাকিয়ে কী যেন কী বলতে যাচ্ছিল, ওর দাদু বিনুর চোখ দুটো আঙুলে ঢেকে বললেন, "ঘুমো দস্যুটা!"

ওর দাদু ওকে খুব ভালবাসেন, কিন্তু কথা না শুনলে খুব রেগে যান। বিনু আর কী করবে? ঘুমোবার ভান করে চোখ বুজল। একটু একটু পিটপিট করে দেখছে দাদু ঘুমোচ্ছেন কি না!

বিনুর দাদুর ঘুমটা খুব মজার। ছাদের কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে, এই তো একটু আগেও কথা বলছিলেন। একটু পাশ ফিরে শুয়েছেন কী, অমনই

ঘুম। ঘুম বলে ঘুম, জোরে জোরে নাকও ডাকছে। অবাক কাণ্ড! বিনুর চোখের সামনে যেন এক বিস্ময়ের বদ্বীপ এসে হাজির। এই এক অভ্যাস ওর দাদুর। ঘুমোলেন কী নাক ডাকার শুরু। মুখটা হাঁ হয়ে গেল!

বিনু আর কী করবে? কেউ কথা বলছে না যে! কেউ যে-হোক কানের কাছে কথা বললে তবুও জেগে থাকা যায়। একা-একা কতক্ষণ থাকবে? ওদের বাড়ির ঠিক পুব পাশে একটা পুকুর। পুকুরের পুব দিকে পাশাপাশি কয়েকটি নারকোলগাছ। বোধ হয় নারকোলগাছের পাতায় বসে একটা ঘুঘুপাখি ডাকছে ঘুঘ্ঘু, ঘু, ঘু, ঘুঘু, ঘুঘ্ঘু, ঘু-ঘু ঘু-ঘু... শুনতে থাকে বিনু। ঠিক সাতবার। ঘুঘু পাখিটা যেন নিজের নাম করে নিজেই ঘুঘ্ঘু বলে ডাকছে।

কেমন বিষণ্ণ, মনখারাপ-করা দুপুর। দু'চোখ জড়িয়ে আসতে থাকে, বিনু ঘুমিয়ে পড়ে।

ছলাত করে ছলকে উঠল পুকুরের জল।

ওদের বাড়ির পুব দিকে একটা পুকুর।

বড় নয়, ছোটই বলা যায়। রামগোপাল ঠাকুরের দিঘিপুকুরের মতন তো নয়। ছোট্ট একটা আয়তাকার পুকুর। পুকুরের ঘাটটিও ইটবাঁধানো নয়। অল্প কিছু কচুরিপানাও আছে। তবু কেন যেন এরকমের একটা সামান্য পুকুরের ওপর বিনুর একটা অসামান্য দুর্বলতা ভেতরে ভেতরে।

নিজের হাতে ছিপ দিয়ে সে কখনও কখনও তেলাপিয়া, পুঁটিমাছ ধরে। হঠাৎ হঠাৎ দু'-একটা ট্যাংরামাছ, কইমাছের বাচ্চাও উঠে আসে।

এরকমই একটা পুকুর। পুকুরটার চারদিকে গাছগাছালি। নানারকমের। নারকোল গাছ তো আছেই, একদিকে ঘন বাঁশ গাছ নিচু হয়ে জলের ওপরে। পুকুরের উত্তর-পূর্ব কোণে একটা বড় ঝাঁকড়ামাথা গাব গাছ। দক্ষিণ দিকে লিচুগাছটা। পাশেই বেল গাছ। পশ্চিম দিকে ছোট দুটো পেয়ারা গাছ, আর একটা জামরুল গাছ। পুকুরের পুব দিকে, ঠিক পুকুরের ধার-বরাবর কলাগাছে-কলাগাছে ভর্তি। সার সার নানারকম কলা গাছ, পাত্তারস, বড়বেগুলা, মর্তমান, দু' একটি চিনে[illegible]সব।

বিনু যেন লিচুগাছটির ছায়ায় একটা ছিপ হাতে বসে।

হঠাৎ ফাতনা ডুবল। সজোরে টান দিল ও। কোনওদিন বাঁধে না, এমনই বড় একটা মাছ গেঁথে গেল ওর ছিপে। সামান্য ছিপ। তলতা বাঁশের ডগা দিয়ে তৈরি। ছোটখাটো মাছ ধরা যায় এরকমের ছোট বড়শি। তবে হ্যাঁ, সুতোটা খুব মজবুত। একেবারে নাইলনের সুতো, সহজে ছেঁড়া কঠিন। ছিপটা যেন মুহূর্তে বেঁকে গেল ধনুকের মতন। ও ঠিকঠাক টান রাখতে হিমশিম খাচ্ছে। প্রাণপণ শক্তি দিয়ে দু'হাতে শক্ত করে দাঁতে দাঁত চেপে ধরে আছে ছিপটাকে।

ঠিক এমন সময়, কে যেন ওর হাতের ওপরে ঠান্ডা হাত রেখে বলল, "ছিঁপটা দেঁ!"

বিলু মন্ত্রমুগ্ধের মতন ছিপটা তার হাতে তুলে দিল।

লোকটা কী? মানুষ, না কি দস্যু? ময়দানব, না কি ব্রহ্মদৈত্য? উঁচু, তা প্রায় ফুটদশেক। পাগুলো দেখলে বিনুর হয়ে যায়। যেন এক-একটা চিনেডয়রা কলাগাছের মতন। এমনকী হাতের লোমগুলিও যেন ভালুকের লেজের মতন বড় এবং কালো। গোঁফটাও ঠিক কালো কুকুরের লেজের মতো মোটা। আর দাঁতগুলো তো এক-একটা নোড়ার মতো। কেমন হলুদ হলুদ দেখতে।

অথচ আশ্চর্য, বিনু ঠিক যতটা ভয় পাওয়ার কথা, ততটা ভয় পেল না। দত্যিটা বেশ মশকরা করে হেসে বলল, "মাঁছ ধঁরছিঁলি কেঁন?"

বলেই, এক ঠুকোটানে মাছটাকে ডাঙায় ফেলল। ও হরি! ছ্যাঃ! এর জন্যই এত! একটা মোটে বেলেমাছ? কতটুক-বা! এই একশো গ্রাম বড়জোর। এত ছোট একটা মাছ সে ধরতে পারছিল না? এই মাছটাই এত টানছিল? বিনু হকচকিয়ে যায় ঘটনার রকম দেখে।

দৈত্যটা একটু আগেও হাসছিল, বিনু একটুও ভয় পাচ্ছিল না। ভয় যে ঠিক কেমন অনুভূতি, সে যেন ভুলেই ছিল। কিন্তু এখন যেন দত্যিটা কেমন রাগ

রাগ গম্ভীর মুখে তাকাচ্ছে ওর দিকে। তাকিয়ে বলল, ''উত্তর দিচ্ছিস নেঁ কেঁন, এঁই মাঁনুষেঁর ছেঁলে?''

এরকম সম্বোধন জীবনে কখনও শোনেনি বিনু। দত্যিরা কি ভদ্রতাটুকুও জানে না! মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হলে, কেউ কি এভাবে কথা বলে! ভয়ে ভয়ে বিনু বলল, ''খাঁব বলে।''

''হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ, খাঁব বঁলে, হিঁ হিঁ, কী ফুঁর্তি! হিঁ হিঁ হিঁ।''

দত্যিটা কেমন যেন তাচ্ছিল্য করছে। কেন হে। এত ভেংচি কেন? খাবে না কি তবে ফেলে দেবে? মাছ তো খালে খালেই। এর আগেও বিনু অনেক মাছ ধরেছে। বলা মাত্র ওর মা ভেজে মাছটাকে ওর পাতেই তুলে দিয়েছেন। বেশ মজাসে খেয়েছে ও। খাবে বলেই তো এত সব! তা ছাড়া দত্যিটা কি একটুও বোঝে না, ছোট হোক, বেলেমাছই হোক, নিজের হাতে ধরা মাছ, তার স্বাদই আলাদা। ইলিশমাছও তুচ্ছ হয়ে যায়। আরও মনে হয়, তেলাপিয়া মাছটা ভাজা হয়েছে, একটু কামড়ে দেখি! তো এই হচ্ছে, বিনুর ইতিপূর্বেকার মাছ ধরার খবর বৃত্তান্ত।

বিনু বেশ জোরের সঙ্গে কথা চালিয়ে বলল, ''খাবই তো! তোদের পুকুর?''

দত্যিটা যেন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। পকেট থেকে একটিপ নস্যি নিয়ে নাকে ঢোকাল। বারকয়

হ্যাচ্চো-হ্যাচ্চো করে হাঁচল, তারপর চোখ পিটপিট করে বলল, ''আঁলবঁত! শুঁনো বাঁচ্চো, ইঁয়ে হাঁমারা পুঁকুর হ্যায়। চাঁর দোঁস্ত-কাঁ।''

চার দোস্ত! দত্যি তো মাত্র একজন। সামনে এই! চারজন কোথায়? কিন্তু ভাবতে গিয়ে অবাক বিনু। হতবাকও। যেন গাবগাছের মগডাল থেকে ঝুপঝাপ করে হাফপ্যান্ট পরা আরও তিনটে দত্যি নেমে পড়ল। খিকখিকখিক, খ্যাকখ্যাক, খিয়াখিয়া কেমন যেন হাসল মনে হল। হঠাৎ একটা জোর লাফ। পুকুরটা পেরোল কি, ওপার থেকে এক লাফে এপারে। পা পিছলে হুড়মুড় করে একবার জলেও পড়ল না।

প্রথম দত্যিটা অর্থবহভাবে মুচকি হেসে বলল, ''ইঁয়ে দেঁখ, এঁক, দোঁ, তিঁন, আঁর হঁম... সঁব মিলকর চাঁর।''

বিনু তো থ! এ আবার কী? দত্যিদের দেশেও কি

হিন্দিভাষা আছে নাকি? বিনুদের স্কুলে উঁচু ক্লাসের দিকে হিন্দি শেখানো হয়, দত্যিদের স্কুলেও কি এরকম হিন্দি শেখায়? হবে হয়তো।

বিনু আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুম বহুত আচ্ছা হিন্দি বোলতা হ্যায়। কাঁহাসে শিখা?"

খলখল করে হেসে উঠল দত্যিগুলো একসঙ্গে, ওদের হাসির নিশ্বাসে যেন কাছের লিচুগাছটা অবধি দুলে উঠল।

এবার বেশ ঘাবড়ে গেল বিনু।

হঠাৎ মুখ গম্ভীর করে বলল অন্য দত্যিটা, "বাঁঙ্গালা ভি হ্যাঁয় হিন্দিভি হ্যায়, থোঁড়া থোঁড়া ইংরিজি ভি হ্যাঁয়।"

বিনুর ইচ্ছে করছিল টেনে জিজ্ঞেস করে, "ফ্রেঞ্চ? রাশিয়ান? ওই যে কেমন বলে রাশিয়ানরা, ইদরুস, তি বিদারসতি..." কিন্তু বিনু তেমন সাহস পেল না। সাহস পেল না বললে ঠিকঠাক বোঝানো হয় না।

বরং বলা ভাল, কুঁকড়ে গেল! মুখটা শুকিয়ে উঠল, গলাটা কেমন কাঠ-কাঠ!

হঠাৎ দত্যিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বদখত দেখতে যে-দত্যিটা, একটু বাচ্চাগোছের, গোঁফটা বাদামি রঙের, সে খপ করে ওর ডান হাতটা চেপে ধরে বলল, "হঁয়ে মঁছলি তুঁম কোঁ দিঁয়া যাঁতা হ্যাঁয়, লেঁকিন ইঁয়ে পুঁকুর হাঁম সঁব লেঁ চঁলেঙ্গে!"

বিনুর ইচ্ছে করছিল মাথা ঝাঁকিয়ে তীব্র আপত্তি করে বলে, "কভি নেহি।"

বেশি তর্ক করলে দেখাবে বিনু। দেবে দত্যিটার গালে একটা বারোশো গ্রাম ওজনের ঘুসি। বিনুর এই ছোট্ট শরীরে এর চেয়ে বড় ঘুসি মারার শক্তি এখনও হয়নি। অল্প রেগে গেলে ওর ঘুসির ওজন চার-পাঁচশো, আরও একটু বেশি রেগে গেলে ওর ঘুসির ওজন আটশো সাড়ে-আটশো; আরও বেশি রেগে গেলে, ও বড়জোর ওইরকম এককেজি বারোশো গ্রামের একটা ঘুসি মেরে বসতে পারে। তো এরকম একটা ঘুসি মেরে খুব তেমন সুবিধে হবে কি? এ তো বিড়ালের মাথা দিয়ে ঠুসি মারার মতন ছোট্ট একটা অনুভূতি। সুড়সুড়ি লেগে শেষে হয়তো দত্যিটা খিলখিল করে হেসেই উঠবে। তখন? তারপর?

বেলগাছটা কাছেই। এত কাঁটা। দেখে দেখে সব শুধু বিনুর পায়েই ফোটে। দত্যিগুলোর পায়ে যদি গজালের মতন ওইসব বড় বড় বেলকাঁটা দু'-একটা ফুটত, বেশ মজা হত!

আবোল তাবোল ভাবল বিনু।

দেখল, দত্যিগুলো অন্য তালে আছে। পুকুরের চারকোনা ধরে উঁচু করে তুলেছে। ধরেছে কী সহজে! যেন পুকুরটার তেমন কোনও ওজন নেই! ধরেছে যেন সেই বিছানার চাদরের মতন।

বিনুর দাদুর একবার জ্বর হয়েছিল। উঠোনের চারা নারকোল গাছ থেকে কয়েকটি ডাব পাড়ার খুব দরকার। ছোটকাকে ঠেলে ওঠানো হল। কিন্তু মুশকিল হল, কচি কচি ডাব, কাঠফাটা উঠোনে পড়লে আর দেখতে হবে না। ফটফটাস, সব ফেটে যাবে। কী উপায় করা যায় সবাই ভাবছিল।

বিনুর মা বুদ্ধি দিলেন। বললেন, "চ তো ছোট্টু, বিছানার বড় চাদরটা নিয়ে আসি।"

ছোট্টু মানে বিনুর ছোট কাকিমা।

চাদর আনা হল। চাদরটির চারদিকের চারকোনা ধরল বড়রা চারজন। ছোটকা গাছ থেকে ধুপধাপ করে চাদরের ওপরে একটা একটা করে ডাব ফেলতে লাগলেন।

পুকুরটাকে উঁচু করে ধরল ঠিক ওই চাদরের মতন। তবে হ্যাঁ, পুকুরটাকে উঁচু করে তুলতে ওদের যে খুব কষ্ট হচ্ছে, বেশ বোঝা যাচ্ছে। জলসমেত পুরো একটা পুকুর তুলতে কষ্ট তো হবেই।

সবচেয়ে বয়স্ক দত্যিটা, যার গোঁফে একটু একটু পাক ধরেছে, সে বুদ্ধি দিল, "এঁক কাঁম কঁর, থোঁড়া সাঁ পাঁনি পিঁ লোঁ।"

ও বোধ হয় নেতা ওদের। ওদের সর্দার। বয়স্ককে ওরা খুব সম্মান করে বোঝা গেল। বলা মাত্র যেন আদেশ পালন করছে, এমনিভাবে চারজনে চুমুক দিল পুকুরটায়। চোঁ চোঁ করে আধাআধি জল খেয়ে ফেলল চোখের নিমেষে। বাকি অর্ধেক জলও বোধ হয় খেত, ওই সর্দার দত্যিটা বারণ করল, "বঁহুত খুঁব, বঁহুত খুঁব, অঁর নেঁহি! মঁছলি মঁর যাঁয়েগি!"

বিনু দুঃখ পাচ্ছিল। ওদের পুকুরে অনেক মাছ। মাছগুলো বড় নয় ঠিক, কিন্তু সংখ্যায় অনেক। অনেক মানে কী? অনেক, অনেক। এত এত। জল অর্ধেক হতেই মাছগুলি সব যেন কিলবিলিয়ে উঠল। মাছগুলো মরে যাবে যে!

কিন্তু দত্যিগুলো ওরকম দেখতে হলে হবে কী, বুদ্ধি খুব। দয়ামায়াও কম নয়। ফুচ করে পেট থেকে অনেকখানি জল উগরে দিল পুকুরে। মাছগুলি যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচে উঠল।

মনে মনে বিনু দত্যিগুলোকে এখন শ্রদ্ধা করতে শুরু করল। কিন্তু পরক্ষণেই শ্রদ্ধাভক্তি সব উবে গেল। ও দেখল ওদের পুকুরটাকে দত্যিগুলো উঁচু করে তুলে আকাশের দিকে উড়তে শুরু করবে-করবে করছে।

বিনু খুব চালাক। গায়ের জোরে তো আটকানো

যাবে না, বুদ্ধির জোরে যদি যায়। ও অনুনয় মিশিয়ে গলাটা যথাসম্ভব হালকা করে আদুরে আদুরে ভাবে বলল, "পুকুরটাকে নিয়ে যাচ্ছেন, সার?"

বিনু জানে, সার বললে সবাই খুব খুশি হয়। একটু আগে তুইতোকারি করছিল সর্দার-দত্যিটাকে, এখন কাজ হাসিল করতে হলে, একটু আপনি-আপনি, সার-সার বলতে হবে বইকী! এটুকু বুদ্ধি বিনুর হয়েছে এখন।

বিনুর কথার ধরন দেখে ফিক করে হাসল সর্দার দত্যিটা। ফিক করে হাসিটা [illegible] যেন খ্যাঁকখ্যাঁক করে হাসির [illegible] বাকি তিনজন [illegible]।

এখনই হাল ছাড়লে চলবে না। বিনু আরও বেশ তোষামোদের আতরজল মিশিয়ে বলল, "সার, আমাদের এই একটাই পুকুর, সার! তাও দেখছেন তো, কী ছোট্ট! এতটুকু! গরিব লোক তো সার। বড় পুকুর চান তো দিতে পারি, সার!"

বড় পুকুর! দত্যিগুলোর চোখ যেন চিকচিক করে উঠল। খুব মনোযোগ দিয়ে শুনল, তারপর বলল, "দেঁ, দেঁ তাঁ হঁলে... নঁইলে তোঁদেরটাঁই চুঁরি কঁরব... হেঁ হেঁ..."

বিনুর ঠোঁটে রামগোপালের দিঘিপুকুরটা ভেসে উঠল। বলতে গিয়েছিল প্রায়। কিন্তু কী যেন ভেবে মত পালটাল, বলবে না। রামগোপাল ঠাকুর আরও

গরিব। পুকুরের মাছগুলো ফি-বছর বিক্রিবাটা করে কোনওভাবে তাঁর দিন যায়। তাঁর পুকুরটা গেলে, খাবেনটা কী? নিজের যদি একটু ক্ষতি হয়ও, হোক গে, পরের ক্ষতি হোক বিনু চায় না। তা ছাড়া ওই দিঘিপুকুরের জলে বিনু এবং ওর বন্ধুরা পুরো গরমের ছুটিতে সাঁতার কাটে।

দত্যিগুলো বিনুকে যৎপরোনাস্তি পীড়াপীড়ি করল, কিন্তু রামগোপাল ঠাকুরের দিঘিপুকুরটা যে অধিকারীদের আমবাগানের ঠিক উলটো দিকে, এ-কথা খুলে বলল না।

অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল, দত্যিগুলো ওদের পুকুরটাকে এই এতখানি উঁচু করে আকাশ-পথে উড়ে চলল।

বিনু চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করল। মাছগুলোন যেন বিনুর নাম ধরে ডাকছে মনে হল।

এই তো এক বছরও হয়নি, গত বর্ষায় বিনুর বাবা অনেক গলদাচিংড়ির বাচ্চা এনেছিলেন। বিনু গুনে গুনে ছেড়ে দিয়েছিল বাচ্চাগুলো। তিড়িং তিড়িং করে তালু থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে জলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল চিংড়িগুলো। চারশো বাষট্টিটা চিংড়ি। তার মধ্যে দু'-একটা মরে গিয়ে থাকলে[illegible]শো তো বেঁচে আছেই। যেন সেইসব চিংড়ি আকাশের দিক থেকে একসঙ্গে কেঁদে উঠল।

বিনুকে কে যেন অসহায়ভাবে আটকে রেখেছে। কত জোরে হাত-পা ছুড়ছে ও, কিচ্ছু হচ্ছে না; এমনকী গলার কাছে এসে আটকে আছে কথাগুলো।

হঠাৎ দেখল, ওর দাদু হইহই করে উঠলেন, "হেই, হেই বিনে, হাত-পা ছুড়ছিস কেন রে, ছেলে? ওঠ, ওঠ শিগগির।"

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল বিনু। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। হতেও তো পারে! কত পুকুর তো শেষ অবধি বাড়ি হয়ে যায়।

ও এক ছুটে পুকুরের কাছে এল। তখনও চোখে যেন ঘোর। ও যেন দেখছে, পুকুরটা সত্যিই উধাও, পুকুরটা সত্যিই চুরি হয়ে গেছে।

কিন্তু পুকুর কি সত্যি চুরি হয়ে যায়? সবাই দেখবে, জলভর্তি গাছপালার ছায়ায় এই তো সেই পুকুর! বিনু দেখছে, অদৃশ্য বেদনা ছাড়া এই মুহূর্তে তার আর সম্বল কিচ্ছু নেই।

১ এপ্রিল ১৯৯২

অলংকরণ: অনুপ রায়
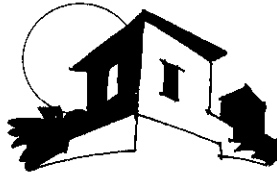
রাতটা ছিল দুর্যোগের

সমরেশ মজুমদার

দিনটা ছিল দুর্যোগের। আকাশে আলো ছিল না একফোঁটা। ঠান্ডা বাড়ছিল হু হু করে। পোড়া কাঠের মতো মেঘগুলো চাপ হয়ে ঝুলছিল, যেন টোকা মারলেই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে। দিন ফুরোবার আগেই রাত নামল। সেইসঙ্গে দাঁতালো হাওয়ারা নেমে এল খোলা পৃথিবীতে। এখনও বৃষ্টি নামেনি, এই রক্ষে।

রাস্তায় এই আবহাওয়ায় মানুষ থাকার কথা নয় বলেই নেই। স্ট্রিট ল্যাম্পগুলো ডাইনির চোখ হয়ে জ্বলার চেষ্টা করছিল। এই অবস্থায় ভদ্রমহিলাকে দেখা গেল দ্রুত হাঁটতে। তাঁর বয়স চল্লিশের ওপরেই, একটু মোটাসোটা ভালমানুষ গোছের চেহারা। হনহনিয়ে হাঁটছেন আর বারংবার পেছন ফিরে দেখছেন। যেন কেউ তাঁকে অনুসরণ করছে। স্ট্রিটল্যাম্পের নীচ দিয়ে তিনি যখন হেঁটে গেলেন, তখন তাঁর মুখটা চকখড়ির মতো সাদা দেখাল। সেটা ঠান্ডায় যতটা নয়, আতঙ্ক ঢের বেশি। ওঁর শরীরে শীতের পোশাক আছে। তার ওপর একটা কালো চাদরে মাথা-গলা ঢেকে রেখেছেন। সম্ভবত কানে যাতে হাওয়া না ঢোকে, তাই সতর্কতা। হাতে একটা ব্যাগ। যেসব ব্যাগ নিয়ে মহিলারা অফিসে যান, সেইরকমের। পায়ে মোজা এবং পাম্প-শু গোছের জুতো।

দ্রুত চলার জন্যই ভদ্রমহিলা হাঁপাচ্ছিলেন। মনে হচ্ছিল তিনি যে-কোনও মুহূর্তেই বসে পড়বেন। দু' পাশের বাড়িগুলোর দরজা-জানলা বন্ধ। একটুও আলো চোখে পড়ছিল না। বাঁক ঘুরতেই ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে পড়লেন। সামনে একটা বাড়ির দোতলার জানলায় আলো দেখা যাচ্ছে। কাচের আড়ালে কেউ যেন দাঁড়িয়ে কথাও বলছে। ভদ্রমহিলা আর দেরি না করে ছুটে গেলেন একতলার দরজায়। প্রাণপণে বেলের বোতাম টিপে ধরলেন। সেই মুহূর্তেও তাঁর চোখ পেছন দিকে চলে গেল। দূরে কুয়াশায় কেউ যেন দাঁড়িয়ে আছে। ওপর থেকে গলা ভেসে এল, ''কে?''

''দয়া করে দরজা খুলুন। প্লিজ। আমাকে বাঁচান।'' ভদ্রমহিলা আর্তনাদ করলেন।

দরজাটা খুলে যেতেই একদঙ্গল আলো রাস্তায় ভদ্রমহিলার শরীর ভাসিয়ে লাফিয়ে নামল। একজন মধ্যবয়সি মানুষ দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ''আপনি?''

ভদ্রমহিলা বললেন, ''একটু যদি ভেতরে আসতে দেন, তা হলে বলছি।''

ভদ্রলোকের স্ত্রী পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, ''আসুন, নিশ্চয়ই আসবেন।''

ভদ্রমহিলা কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে ভেতরে ঢুকতেই ভদ্রলোক দরজা বন্ধ করলেন। ওঁরা ভদ্রমহিলাকে ওপরে নিয়ে এসে বসতে বললেন। সেটা খুবই প্রয়োজন ছিল ওঁর। একটা চেয়ারে বসে বড় বড় নিশ্বাস ফেললেন তিনি। ভদ্রলোকের স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, ''আপনি কি অসুস্থ?''

''অ্যাঁ? না, ঠিক, আসলে দৌড়ে আসছিলাম বলে, অভ্যেস তো নেই।'' ওঁর কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল।

"দৌড়চ্ছিলেন কেন?"

"মনে হচ্ছিল, হচ্ছিল বলব কেন, স্পষ্ট দেখেছি, কেউ যেন আমাকে ফলো করছিল। রাস্তায় তো আজ একটাও লোক নেই, তাই ভয়ে..." ভদ্রমহিলা কথা শেষ করতে না পেরে দু'হাতে মুখ ঢাকলেন।

ভদ্রলোক বললেন, "সে কী। এ পাড়ায় কে অমন কাজ করার সাহস পাবে?" তিনি সোজা জানলার কাছে চলে গিয়ে রাস্তাটা দেখার চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন, "নাঃ, কেউ নেই।"

"কিন্তু ছিল!" ভদ্রমহিলা প্রতিবাদ করলেন।

"বেশ, থাকেও যদি, তা হলে আর আপনার ভয় নেই। আমার স্বামী সরকারি অফিসার। সবাই ওঁকে চেনেন।" স্ত্রী পরিচয় দিতেই স্বামী এগিয়ে এলেন, "শোনো, আমার মনে হয় ওঁকে এককাপ গরম দুধ দিলে ভাল হয়।"

ভদ্রমহিলা আপত্তি করলেন, "না, না, দুধ আমি খাই না।"

ভদ্রলোক হাসলেন, "শৈশব থেকেই অনেকে

এই বদ অভ্যেসটা করে ফেলে। বেশ, কফি চলবে?''

ভদ্রমহিলা আরও সঙ্কুচিত হলেন, ''না, না। আমার এসব লাগবে না।''

ভদ্রলোকের স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, ''আচ্ছা, এই বিচ্ছিরি আবহাওয়ায় আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন?''

ভদ্রমহিলা মুখ নিচু করে মাথা নাড়লেন, ''কাজে। আমি যেখানে কাজ করি, সেখানে অনুপস্থিত হলেই মাইনে কাটে। টাকার প্রয়োজন বলেই এই আবহাওয়াতেও সকালে বেরিয়েছিলাম।''

ভদ্রলোক সমব্যথীর গলায় বললেন, ''সকালে অবশ্য আবহাওয়া এত খারাপ ছিল না।''

ওঁর স্ত্রী বললেন, ''তা হলে আপনি চাকরি করেন। বাড়িতে আর যাঁরা আছেন...।''

''আর কেউ নেই ভাই।'' ভদ্রমহিলা মুখ তুলছিলেন না। তিনি রুমালে চোখ মুছলেন।

ভদ্রলোক ইশারায় স্ত্রীকে নিষেধ করলেন এ বিষয়ে কথা চালাতে। স্ত্রীর সেটা ভাল লাগল না। একটু সময় যেতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ''আপনার স্বামী...?'' প্রশ্নটা ইচ্ছে করেই শেষ করলেন না।

''তিনি মারা গিয়েছেন অ্যাকসিডেন্টে। এইরকম খারাপ আবহাওয়ার সন্ধে ছিল সেদিন।''

ভদ্রলোক কিছু বলার আগেই ওঁর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, ''তারপর?''

''উনি অন্যমনস্ক হয়ে রাস্তা পার হচ্ছিলেন, এই সময় একটা কালো গাড়ি এসে ওঁকে চাপা দেয়।''

''ইস।''

''কিন্তু আমি জানি, উনি কখনও অন্যমনস্ক হয়ে রাস্তায় হাঁটতেন না।''

''তার মানে?''

''আমার কথা পুলিশ বিশ্বাস করেনি। কালো গাড়িটাকেও ধরতে পারেনি, কিন্তু আমি দেখেছি।''

''দেখেছেন মানে?''

''যখনই আমি একা-একা এই রাস্তায় হেঁটে যাই, তখনই দেখি একটা কালো গাড়ি আমার পেছন পেছন আসছে। যতক্ষণ না সেটা বেরিয়ে যায়, ততক্ষণ আমি রাস্তা পার হই না।''

''গাড়িতে কে থাকে দেখেছেন?''

''না। মুখ দেখতে পাইনি।''

''হ্যাঁ। প্রথমে গাড়িটাকে দেখলাম। একবার। তারপর মনে হল, কেউ যেন দরজা খুলে নেমে আমার পেছন পেছন আসতে লাগল।''

ভদ্রলোক আবার জানলায় চলে গেলেন। ভাল করে রাস্তাটা দেখে ফিরে এলেন তিনি, ''আচ্ছা, আপনি কতদূরে থাকেন?''

''সামনের রাস্তা ধরে মিনিটচারেক গেলে বাঁ দিকের তিনতলা কাঠের বাড়িটায় থাকি আমি।''

''ও। সামান্যই পথ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি আপনাকে পৌঁছে দেব।''

''না, না। আপনি কেন যাবেন? ছি ছি, এসেই বিব্রত করেছি, তার ওপর।''

''মোটেই বিব্রত করেননি।'' ভদ্রলোক বড় গলায় বললেন, ''প্রতিবেশীকে যদি সাহায্য না করি, অন্যের প্রয়োজনে যদি না লাগি, তা হলে মানুষ হয়ে জন্মালাম কেন?''

ওঁর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, ''আপনার শরীর এখন কেমন লাগছে?''

ভদ্রমহিলার মুখের সাদা ভাব এখন অনেকটাই চলে গিয়েছে। সোজা হয়ে বসে বললেন, ''ভাল। আমি এখন যেতে পারব। শুনুন, আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। আমি একাই যেতে পারব।''

''তা হয় না। যে কালো গাড়ি আর তার ড্রাইভারের গল্প শোনালেন, তারপর আর আপনাকে একা ছেড়ে দিতে পারি না। হ্যাঁ, আপনাকে কথা দিচ্ছি, কয়েকদিনের মধ্যেই এই কালো গাড়ির রহস্য-সমাধান হয়ে যাবে। কাল থেকেই পুলিশকে বলব ওয়াচ করতে।''

ভদ্রমহিলা মাথা নাড়লেন, ''আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ জানাব।''

''কর্তব্য, বুঝলেন, এসব কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।'' ভদ্রলোক উদার গলায় বললেন।

ওঁরা উঠে দাঁড়াতেই স্ত্রী স্বামীকে ডেকে নিয়ে গেলেন পাশের ঘরে, চাপা গলায় বললেন, ''তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে?''

স্বামী অবাক হলেন, ''কেন? কী করেছি?''

''তুমি ওঁকে পৌঁছে দিতে যাচ্ছ! এই আবহাওয়ায় একটা কুকুরও রাস্তায় নেই।''

ভদ্রলোক আড়চোখে বাইরের দিক দেখলেন, ''তোমার কিস্‌সু মনে নেই।''

''মানে?''

''আমার একটা কালো গাড়ি ছিল এবং আমিও একটা অ্যাকসিডেন্ট করেছিলাম।''

''কিন্তু তুমি তো বলেছিলে লোকটা মরেনি।''

''করার সময় তাই মনে হয়েছিল, পরে তো দেখতে যাইনি, খবরও নিইনি।''

''তার মানে, তোমার গাড়িতেই...?''

''নাও হতে পারে। শুনলে তো, এখনও সেই কালো গাড়িটা ওঁকে ফলো করে।''

স্ত্রীর উত্তেজনা কমল। তিনি মনে করে বললেন, ''তুমি তখন বলতে, গাড়িটা যেন কীরকম!''

''হ্যাঁ। সবসময় ড্রাইভারের কথা শুনত না। তাই তো বিক্রি করে দিলাম।'' ভদ্রলোক উসখুস করলেন, ''চলি। উনি অনেকক্ষণ বসে আছেন।''

''শোনো, যে-জন্যে তোমাকে ডাকলাম, তুমি রিভলভারটা নিয়ে যাও।''

''রিভলভার?''

''হ্যাঁ। যাচ্ছই যখন, তখন সাবধান হয়ে যাওয়াই ভাল।''

''বেশ।'' ভদ্রলোক আলমারির দিকে এগোলেন।

ভদ্রমহিলা দরজার কাছে চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। যেন এই ঘরেও তাঁর শীত লাগছে, এমন ভঙ্গি। ভদ্রলোকের স্ত্রী হাসিমুখে এগিয়ে এলেন, ''আপনার কোনও ভয় নেই। উনি পৌঁছে দিয়ে আসবেন। আচ্ছা, আপনার বাড়ির ফোন নম্বর কত?''

''আমার বাড়িতে তো ফোন নেই।''

''ওঃ। বাড়ি পৌঁছে একটা ফোন করলে নিশ্চিন্ত হতাম, তাই বললাম। ওই অ্যাকসিডেন্টটা কতদিন আগে ঘটেছিল?'' খুব সাধারণ গলায় জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোকের স্ত্রী।

''বছর-দুই আগে।''

ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। ওঁরা নীচে নেমে গেলে ভদ্রলোকের স্ত্রী বারংবার তাড়াতাড়ি ফিরে আসার কথা বলে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

এখন রাস্তায় ঘন কুয়াশা। স্ট্রিট ল্যাম্পগুলোকে ভুতুড়ে দেখাচ্ছে। ভদ্রমহিলা লজ্জিত গলায় বললেন, ''দেখুন তো, আমার জন্যে আপনার কী কষ্ট হচ্ছে!''

''কষ্ট কেন বলছেন! এটা কর্তব্য।''

কয়েক পা হেঁটে ভদ্রমহিলা পেছন ফিরে তাকালেন। সেটা লক্ষ করে ভদ্রলোক দাঁড়ালেন। তাঁর কোটের পকেটে রিভলভারটাকে আঁকড়ে ধরে লক্ষ করলেন, কাউকে দেখতে পাওয়া যায় কি না। না পেয়ে বললেন, ''কেউ নেই তো।''

''পায়ের আওয়াজ শুনলাম।''

''ঠিক আছে, আপনি এগোন, আমি একটু পিছিয়ে আপনাকে ফলো করব। কেউ যদি কাছে এসে পড়ে, তা হলে আমার হাত থেকে ছাড়া পাবে না।''

''না, না। তার দরকার হবে না। ওই যে জুতোর দোকানটা এসে গেছে, আমি ঠিক যেতে পারব। আপনি চলে যান।'' ভদ্রমহিলা সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে বললেন।

এই সময় গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। তারপরেই দুটো হেডলাইটকে কুয়াশা চিরে এগিয়ে আসতে দেখলেন ওঁরা। ভদ্রলোক রিভলভার বের করে তৈরি হলেন। কিন্তু গাড়িটা দাঁড়াল না। সমান গতিতেই তাঁদের পেরিয়ে চলে গেল। দু'জনেই দেখতে পেলেন গাড়িটার রং সাদা।

ভদ্রমহিলা স্বস্তিতে বলে উঠলেন, ''নাঃ।''

''হ্যাঁ, আমিও...।'' ভদ্রলোক রিভলভার আর ঢোকালেন না, ''চলুন, আপনাকে পৌঁছে না দিয়ে আমি ফিরব না।''

কয়েক পা হেঁটে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, ''আপনার স্বামী কী করতেন?''

''মাস্টারমশাই ছিলেন।''

''কীরকম শয়াস ছিল?''

"এই, আপনারই বয়সি।"

ভদ্রলোক ঢোক গিললেন, "ও। উনি কি দুর্ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ। পুলিশ তাই বলেছিল।"

কিছুদুর যাওয়ার পর ভদ্রমহিলা বললেন, "আমি এসে গিয়েছি। আর চিন্তা নেই।"

"ও। বাড়িটায় আলো জ্বলছে না।"

"পুরনো বাড়ি। দোতলায় আমি ছাড়া কেউ থাকে না। তিনতলাটা বন্ধ।"

"চলুন, আপনাকে আপনার ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"না, না। কোনও দরকার নেই। আমি ওই সিঁড়ি ধরে দোতলায় উঠলেই ফ্ল্যাটের দরজায় পৌঁছে যাব। আর আমার কোনও ভয় নেই।"

"বেশ। তা হলে চলি।"

"হ্যাঁ। অনেক ধন্যবাদ।" বলেই ভদ্রমহিলা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। তিনি যতক্ষণ না চোখের আড়ালে না গেলেন, ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর নিশ্বাস ফেলে বাড়ির পথ ধরলেন।

কয়েক পা হাঁটার পরই মনে হল, কেউ যেন তাঁর পেছনে আসছে। স্পষ্ট পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছেন তিনি। ঘুরে দাঁড়িয়ে লক্ষ করলেন। কুয়াশা এখন এমন ঘন হচ্ছে যে, কাউকেই দেখতে পেলেন না। রিভলভারটা উঁচিয়ে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই গাড়ির শব্দ কানে এল। একটা গাড়ি যেন আসছে, কিন্তু তার হেডলাইট নেভানো। সেটা জ্বললে তিনি দেখতে পেতেন। দ্রুত ফুটপাতের শেষপ্রান্তে চলে এলেন তিনি। গাড়িটা রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যাক, তারপর তিনি যাবেন। কিন্তু সরে আসামাত্র শব্দটা

থেমে গেল। কুয়াশারা এখন পাক খাচ্ছে সর্বত্র। স্ট্রিট ল্যাম্পগুলোকেও গিলে ফেলেছে তারা। তিনি আবার পা ফেলতেই গাড়ির শব্দ শুনলেন। যেন গাড়িটা ওত পেতে ছিল একপাশে, তাঁকে চলতে দেখেই সক্রিয় হয়েছে।

ভদ্রলোকের সমস্ত শরীরে কাঁটা ফুটল। ওই ঠান্ডায় কুয়াশায় দাঁড়িয়েও হাতের মুঠোয় ধরা রিভলভারটা ভিজে উঠল। তাঁর মনে হল, এগোনোটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তিনি এক দৌড়ে পেছন দিকে চলে এলেন। ভদ্রমহিলার বাড়ির কাঠের সিঁড়িটা দেখতে পেয়ে পেছন ফিরে তাকালেন। না, কেউ নেই। তাঁর মনে হল একা ফিরে যাওয়া ঠিক হবে না। থানায় একটা ফোন করে সাহায্য চাইতে হবে। ফোন কোথায় পাওয়া যায়? ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পারেন। তিনি দ্রুত কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। ভদ্রমহিলা বলেছিলেন, দোতলায় উনি একা থাকেন। অতএব ওঁকে খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে না।

দোতলায় উঠে পা বাড়াতে গিয়ে কোনওমতে নিজেকে সামলে নিলেন ভদ্রলোক। সিঁড়ির সামনে বারান্দা বা করিডোর বলে কিছু নেই। কাঠগুলো অনেক, অনেক আগেই খসে পড়ে গিয়েছে। ওপাশের দরজাটা ভাঙা এবং অন্ধকার।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে ভদ্রমহিলা এই শূন্য দিকে হেঁটে গিয়েছেন।

২০ জানুয়ারি ১৯৯৩

অলংকরণ: অনুপ রায়

কালাচাঁদের দোকান

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

নবীনবাবু গরিব মানুষ। পোস্ট অফিসের সামান্য চাকরি। প্রায়ই এখানে-সেখানে বদলি হয়ে যেতে হয়। আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের ভাবসাব নেই। প্রায়ই ধারকর্জ হয়ে যায়। ঋণ শোধ দিতে নাভিশ্বাস ওঠে। নবীনবাবুর গিন্নি স্বামীর ওপর হাড়ে চটা। একে তো নবীনবাবুর ট্যাঁকের জোর নেই, তার ওপর লোকটা বড্ড মেনিমুখো আর মিনমিনে। এই যে যখন-তখন যেখানে-সেখানে বদলি করে দিচ্ছে, নবীনবাবু যদি রোখাচোখা মানুষ হতেন তবে পারত ওরকম বদলি করতে? বদলির ফলে ছেলেপুলেগুলোর লেখাপড়ার বারোটা বাজছে। আজ এ স্কুল কাল অন্য স্কুল করে বেড়ালে লেখাপড়া হবেই বা কী করে?

এবার নবীনবাবু নিত্যানন্দপুর বলে একটা জায়গায় বদলি হলেন। খবরটা পেয়েই গিন্নি বললেন, ''আমি যাব না, তুমি যাও। আমি এখানে বাসা ভাড়া করে থাকব। আর বদলি আমার পোষাচ্ছে না বাপু!''

নবীনবাবু মাথা চুলকে বললেন, ''তাতে খরচ বাড়বে বই কমবে না। ওখানে আমারও তো আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে। দুটো এস্টাব্লিশমেন্ট টানব কী করে?''

গিন্নি বললেন, ''ঠিক আছে, যাব। কিন্তু তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে এর পর বদলি করলে তুমি কিছুতেই বদলি হতে রাজি হবে না। সরকারকে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে হবে যে, তুমি দরকার হলে মামলা করবে। তোমার মতো মেনিমুখো পুরুষদের পেয়েই তো নাকে দড়ি দিয়ে ওরা ঘোরায়।''

নবীনবাবু মিনমিন করে বললেন, ''একখানা দরখাস্ত নিয়ে ওপরওয়ালার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তা তিনি বললেন, নিত্যানন্দপুর থেকে আর বদলি করবে না। দেখা যাক।''

বাক্স-প্যাঁটরা গুছিয়ে সপরিবার এক শীতের সন্ধেবেলা নবীনবাবু নিত্যানন্দপুরে এসে পৌঁছলেন। বেশ ধকল গেল। ট্রেন থেকে নেমে অনেকটা পথ গোরুর গাড়িতে এসে তারপর আবার নদী পেরিয়ে আরও ক্রোশ দুই পথ পেরোলে তবে নিত্যানন্দপুর। গঞ্জমতো জায়গা। তবে নিরিবিলি, ফাঁকা-ফাঁকা।

রাত্রিটা পোস্টমাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে কাটিয়ে পরদিন একখানা বাসা ভাড়া করলেন। পাকা বাড়ি, টিনের চাল। উঠোন আছে, কুয়ো আছে।

জায়গাটা ভালও নয়, মন্দও নয়। ওই একরকম। তবে ভরসা এই যে, আর বারবার ঠাঁইনাড়া হতে হবে না। ওপরওয়ালা কথা দিয়েছে, এখানেই বাকি চাকরির জীবনটা কাটাতে পারবেন নবীনবাবু।

তাঁর স্ত্রী অবশ্য নাক সিঁটকে বললেন, ''কী অখেদ্দে জায়গা গো। এ যে ধাপধাড়া গোবিন্দপুর! অসুখ হলে ডাক্তার-বদ্যি পাওয়া যাবে কি না খোঁজ নিয়ে দেখো। দোকানপাটও তো বিশেষ নেই দেখছি। বাজারহাট কোথায় করবে?''

নবীনবাবু বললেন, ''বাজার এখান থেকে এক ক্রোশ। তাও রোজ বসে না। হপ্তায় দু'দিন হাট।''

''তবেই হয়েছে। এখানে স্কুলটা কেমন খোঁজ নিয়েছ?''

''স্কুল একটা আছে মাইলটাক দূরে। কেমন কে জানে।''

''জায়গাটা এমন বিচ্ছিরি বলেই এখান থেকে তোমাকে আর বদলি না করতে ওপরওয়ালা সহজেই রাজি হয়ে গেছে। এখন মরি আমরা এখানে পচে!''

নবীনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ''কী আর করা! নিত্যানন্দপুরেই মানিয়ে গুছিয়ে নিতে হবে।''

প্রথমদিন বাজার করতে দু'ক্রোশ দূরে গিয়ে বেশ দমেই গেলেন তিনি। জিনিসপত্রের দাম বেশ চড়া। প্রত্যন্ত গাঁ, এখানে জিনিস আনতে ব্যাপারীদের অনেক খরচ হয়। জিনিসপত্র তেমন ভালও নয়। পাওয়াও যায় না সব কিছু।

বাজারের হাল শুনে গিন্নি চটলেন। বললেন, ''আবার দরখাস্ত করে অন্য জায়গায় বদলি নাও। এ জায়গায় মানুষ থাকে? মা গো!''

নবীনবাবু ফাঁপরে পড়লেন। এখন কী করা যাবে তাই ভাবতে লাগলেন।

একদিন সন্ধেবেলা গিন্নি এসে বললেন, ''ওগো, খুকি তেলের শিশিটা ভেঙে ফেলেছে। একটি ফোঁটাও তেল নেই আর। রাতে রান্না হবে কী দিয়ে?''

''তেল পাব কোথায়?''

''দেখো না একটু খুঁজে-পেতে। অনেক গেরস্তবাড়িতে ছোটখাটো জিনিস পাওয়া যায় শুনেছি।''

অগত্যা নবীনবাবু বেরোলেন। বেশি লোকের সঙ্গে চেনাজানা হয়নি এখনও। কার বাড়ি যাবেন ভাবছেন। ডান হাতি পথটা ধরে হাঁটছেন। ডান ধারে একটু জঙ্গলমতো আছে। হঠাৎ দেখতে পেলেন, জঙ্গলের একটু ভেতর দিকে একটা আলোই যেন জ্বলছে মনে হল। নবীনবাবু কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ঠাহর করে দেখলেন, একখানা ঝাঁপতোলা দোকান বলেই যেন মনে হচ্ছে। নবীনবাবু এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, দোকানঘরই বটে। দীনদরিদ্র চেহারা হলেও দোকানই। কালো রোগাপানা কণ্ঠিধারী একজন লোক দোকানে বসে আছে। বিনয়ী মানুষ। নবীনবাবুকে দেখেই টুল থেকে উঠে বলল, "আজ্ঞে আসুন।"

নবীনবাবু খুশি হলেন। আজকাল বিনয় জিনিসটা দেখাই যায় না। সরষের তেলের খোঁজ করতেই লোকটা বলল, "আছে। ভাল ঘানির তেল।"

"কত দাম?"

লোকটা হেসে মাথা চুলকে বলল, "দাম তো বেশ চড়া। তবে আপনার কাছ থেকে বেশি নেব না। ছ'টাকা করেই দেবেন।"

নবীনবাবু খুবই অবাক হলেন, দু'ক্রোশ দূরের বাজারে তেল দশ টাকা। নবীনবাবু আড়াইশো গ্রাম তেল কিনে আনলেন। গিন্নি তেল পরীক্ষা করে বললেন, "বাঃ, এ তো দারুণ ভাল তেল দেখছি। কোথায় পেলে গো?"

নবীনবাবু বললেন, "আরে, কাছেই একটা বেশ দোকানের সন্ধান পেয়েছি। লোকটা বড় ভাল।"

লোকটা যে সত্যিই ভাল তার প্রমাণ পাওয়া গেল দু'দিন পরেই। ডাল ফুরিয়েছে। সন্ধের পর সেই দোকানে গিয়ে হানা দিতেই বিনয়ী লোকটা প্রায় অর্ধেক দামে ডাল দিল। বলল, "আপনাকে অত দাম দিতে হবে না।"

নবীনবাবু ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার নামই তো জানি না এখনও।"

"আজ্ঞে, কালাচাঁদ নন্দী। 'কালো' বলেই ডাকবেন।"

"আপনি কি সব জিনিসই রাখেন কালোবাবু?"

"যে আজ্ঞে। তবে সন্ধের পর আসবেন। দিনমানে আমি দোকান খুলি না। ও-সময়ে আমার চাষবাস দেখতে হয়।"

দিন দুই পর গিন্নি হঠাৎ বললেন, "ওগো, আজ একটু পোলাও খাওয়ার বায়না ধরেছে ছেলেমেয়েরা। ঘি আর গরম মশলা লাগবে। এনে দেবে নাকি একটু?"

কালোর দোকানে ঘি বা গরম মশলা পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছিল না নবীনবাবুর। দোনোমনো করে গেলেন।

কালাচাঁদ বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, কেন পাবেন না? এক নম্বর ঘি আছে, আর বাছাই গরম মশলা।"

"দাম?"

"দাম তো অনেক। তবে আপনাকে অত দিতে হবে না। দশ টাকা করেই দেবেন।"

নবীনবাবুর হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। খানিকক্ষণ কালাচাঁদের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা বলে তিনি ফিরে এলেন। গিন্নি ঘি আর গরম মশলা দেখে খুব খুশি। বললেন, "ওগো, দোকানটা খোকাকে চিনিয়ে দিয়ো তো! দরকার মতো ওকেও পাঠাতে পারব। তা হ্যাঁ গো, দোকানটা কি নতুন খুলেছে? আজ দাসবাড়ির গিন্নি গল্প করতে এসেছিল। কথায় কথায় তাকে কালাচাঁদের দোকানের কথা বললুম। কিন্তু সে তো আকাশ থেকে পড়ল, বলল, 'সাত জন্মে কালাচাঁদের দোকানের কথা শুনিনি।' "

"হবে হয়তো, নতুনই খুলেছে। আমি খোঁজ নিয়ে বলব'খন।"

দু'দিন পর ফের কাল্যোজিরে আর ময়দা আনতে গিয়ে নবীনবাবু বললেন, "তা হ্যাঁ কালাচাঁদবাবু, আপনার দোকানটা কতদিনের পুরনো?"

কালাচাঁদ ঘাড়-টাড় চুলকে অনেক ভেবে বলল, "তা কম হবে না। ধরুন, এ গাঁয়ের পত্তন থেকেই আছে।"

নবীনবাবুর একটু খটকা লাগল। দোকান যদি এত পুরনোই হবে তা হলে দাস-গিন্নি এ দোকানের কথা শোনেনি কেন?

কালাচাঁদ যেন তাঁর মনের কথা পড়ে নিয়েই বলল, "এ গাঁয়ে আমার অনেক শত্রু। লোকের কথায় কান দেবেন্ না।"

"আচ্ছা, তাই হবে।"

পরদিন নবীনবাবু এক বাড়িতে নারায়ণপুজোর নেমন্তন্ন খেয়ে ফেরার পরই গিন্নি বললেন, "হ্যাঁ গো, তোমার কালাচাঁদের দোকানটা কোথায় বলো তো! খোকাকে কুয়োর দড়ি আনতে পাঠিয়েছিলাম, সে তো দোকানটা খুঁজেই পেল না। পোস্ট অফিসের পিয়ন বিলাস এসেছিল। সেও বলল, ওরকম দোকান এখানে থাকতেই পারে না। বলল, 'নবীনবাবুর মাথাটাই গেছে।' "

নবীনবাবুর বুকের মধ্যে একটু যেন কেমন করল। মুখে বললেন, "কালাচাঁদের সঙ্গে অনেকের শত্রুতা আছে কিনা, তাই ওরকম বলে।"

পরদিন টর্চের ব্যাটারি আনতে গিয়ে নবীনবাবু এ কথা সে কথার পর কালাচাঁদকে বললেন, "তা কালাচাঁদবাবু, আমার ছেলেও কাল আপনার দোকানটা খুঁজে পায়নি।"

কালাচাঁদ বিনয়ের সঙ্গে বলল, "আর কাউকে পাঠানোর দরকার কী? নিজেই আসবেন।"

"ইয়ে অন্যরা সব বলছে যে, কেউ নাকি এ দোকানের কথা জানে না।"

কালাচাঁদ তেমনই মৃদু মৃদু হেসে বলে, "জানার দরকারই বা কী? আপনার ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।"

নবীনবাবুর বুকটা একটু দুরদুর করে উঠল। বললেন, "হ্যাঁ, তা আমি তো আমিই। কিন্তু আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোনও খদ্দের কখনও দেখি না। দোকানটা চলে কী করে?"

কালাচাঁদ বিনীতভাবে বলল, "একজনের জন্যই তো দোকান।"

"অ্যাঁ!"

কালাচাঁদ হাসল, "আসবেন।"

নবীনবাবু চলে এলেন। কিন্তু তারপর আবার পরদিনই গেলেন। মাসের শেষ, হাতে টাকা নেই। খুব সংকোচের সঙ্গে বললেন, "কয়েকটা জিনিস নেব। ধারে দেবেন?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, কেন নয়?"

"পরের মাসে মাইনে পেয়েই দিয়ে যাব।"

"তাড়া কীসের?"

ধারে প্রচুর জিনিস নিয়ে এলেন নবীনবাবু। পরের মাসে ধার শোধ করতে গেলে কালাচাঁদ জিভ কেটে বলল, "না না, অত নয়। আমার হিসেব সব লেখা আছে। পাঁচটি টাকা মোটে পাওনা। তাও সেটা দু'দিন পর হলেও চলবে। বসুন, একটু সুখ-দুঃখের কথা কই। টাকা-পয়সার কথা থাক।"

নবীনবাবু খুবই অবাক হলেন! পাঁচ টাকা পাওনা! বলে কী লোকটা? তিনি অন্তত দেড়শো টাকার জিনিস নিয়েছেন।

তা এভাবেই চলল। চাল, ডাল, মশলাপাতি, ঘি, তেল সবই কালাচাঁদের দোকান থেকে আনেন নবীনবাবু। মনোহারি জিনিস, বাচ্চাদের খেলনা, পোশাক, শাক-সবজিও ক্রমে ক্রমে আনতে লাগলেন। মাছ-মাংসও পাওয়া যেতে লাগল কালাচাঁদের আশ্চর্য দোকানে। গিন্নি খুশি। নবীনবাবুর মাইনে অর্ধেকের ওপর বেঁচে যাচ্ছে।

নবীনবাবু একদিন গিন্নিকে বললেন, "ওগো, নিত্যানন্দপুর থেকে বদলি হওয়ার দরখাস্তটা আর জমা দেওয়া হয়নি।"

"দিয়ো না। হ্যাঁ গো, কালাচাঁদের দোকানটা ঠিক কোথায় বলো তো! আমাকে একদিন নিয়ে যাবে?"

নবীনবাবু শশব্যস্তে বললেন, "না না, তোমাদের কারও যাওয়ার দরকার নেই। সকলের কি সব সয়?"

গিন্নি চুপ করে গেলেন।

নবীনবাবু নিত্যানন্দপুরেই রয়ে গেলেন।

২৭ এপ্রিল ১৯৯৪
অলংকরণ: বিমল দাস

ভূতের চিরুনি

আবুল বাশার

জ্বর হলে ভূত দেখতে পেতেন দিনুখুড়ো। আবিরমামা গণ্ডিলালকে বলেছিলেন, জ্বর গায়ে দিনু দুর্বোধ ভাষায় চিৎকার করে গান গাইতেন। সবাই বলত, খুড়ো অমন করেই ভূত নামায়।

নীলকুঠির পুরনো দরোয়ান ছিলেন দিনু সিকদার। সাদা চামড়ার সাহেবদের নীলের ব্যাবসা কবেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তারাও স্বাধীনতার কত আগে কুঠি ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু কুঠিবাড়ির দরোয়ানি বজায় ছিল স্বাধীনতার পরেও। শেঠের দিঘির চৌধুরীরা কুঠি-এলাকার মালিকানা পেয়েছিলেন সাহেবদের কাছ থেকে। তাঁরাই দিনুখুড়োকে কুঠির দরোয়ানির চাকরিতে বহাল রেখেছিলেন সাহেবদের মতোই। খুড়োর ছিল সাড়ে সাত টাকা মাইনে। দিন বদলেছে, কিন্তু মাস-মাইনে তাঁর বাড়েনি।

কিছুকাল আগের কথা। কুঠির প্রকাণ্ড লোহার গেটের মুখে খুড়ো একটি পানবিড়ির দোকান খুলেছিলেন। দোকান চালাত ভাইপো সিধুচরণ। সন্ধ্যার মুখে ওই দোকান খুলত ভাইপোটা, দিনমান মাঠে খাটত।

শোনা যায়, দিনুখুড়ো সোয়াশো বছর বেঁচেছিলেন। দিনের বেলা কুঠির গেট খোলা, কিন্তু সূর্য অস্ত যেতে-না-যেতেই সেই গেট বন্ধ করে দিতেন সিকদার। লোক ঢুকতে পারত না। ভাইপোর পানবিড়ির দোকানে সারারাত টিমটিম করে কুপির আলো জ্বলত। গোরুর ব্যাপারীরা রাতে পাকা সড়ক দিয়ে গোরুর দল হাঁকিয়ে নিয়ে যেত সীমান্তের দিকে। বাংলাদেশে ওই গোরু চালান যেত। তখনকার কালে বাংলাদেশের নাম ছিল পূর্ব-পাকিস্তান। সেই ব্যাপারীরা ওই দোকান থেকে পানবিড়ি কিনত।

মামা বলেছিলেন, কুঠি জায়গাটাই ছিল ভূতগ্রস্ত। ভূত এবং জিন কুঠিকে ঘিরে থাকত। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে গেটের কাছে ফিটনের ঝুমঝুম শব্দ ভেসে উঠত। ব্যাপারীদের মুখে শুনেছিলেন আবিরমামা। অশ্বের তীব্র হ্রেষাও নাকি শোনা যেত। মাঝে মাঝে দরোয়ানের তকমা আঁটা দিনুর অস্বাভাবিক দুর্বোধ কণ্ঠস্বর উচ্চকিত হত। বাতাসে ভাসত বর্মা চুরুটের গন্ধ, ফরাসি আতরের উগ্র ঝাঁঝ। গোলাপজলের ঠান্ডা হাওয়া গেটের সড়কে গোত্তা খেয়ে খেলে উঠত, মদির একটা গন্ধও মিশে থাকত সেই বাতাসে। বাতাসে কান পাতলে শোনা যেত, নারী-পুরুষের চাপা গলার আলাপ। ভাঙা বাংলা আর চড়া হিন্দি মেশানো অদ্ভুত সাহেবি ভাষা ব্যাপারীরা শুনেছে।

জ্বরের গায়ে দিনুখুড়ো সাহেব-মেমদের স্যালুট করছেন, ফিটন এসে ভিড়েছে গেটের মুখে, সে ভারী চমৎকার দৃশ্য। আপনা থেকে কড়কড় করে লোহার গেট খুলে যাচ্ছে, কুঠির ভেতর দালানের নাচঘরে ঝাড়বাতি জ্বলে উঠেছে।

জ্বলন্ত বরফের মতো সাদা ঘোড়াগুলি ঝড়ের বেগে গাড়ি টেনে এসে পাথরের বড় গামলায় মুখ ডুবিয়ে জাবনা আর জল খাচ্ছে। এক মেম ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট হাতে ধরা, ঘোড়ার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

গায়ে জ্বর না এলে খুড়ো এইসব দৃশ্য দেখতে পান না। তিনি বলেছিলেন, "বুঝলে আবিরলাল,

কুঠির বাগানে বাঁশবনের ওইদিকে একটা বুড়ো গো-জিন চরে বেড়ায়। গো-জিন কিঁ না বুঝবে কী করে? তা হলে তোমাকে ফাল্গুনের জ্যোৎস্নারাতে এখানে আসতে হবে। গো-ভূত হোক আর গো-জিন হোক, ওরা হাড় খায়।''

আবিরমামা এ কথা শোনামাত্র আঁতকে উঠলেন ভয়ে। ''হাড় খায়?''

খুড়ো তাজ্জব গলায় হেসে ফেলে বললেন, ''হ্যাঁ বাপু। হাড়। মানুষের হাড়। কঙ্কাল খায়।''

''কিন্তু এখানে কঙ্কাল কোথায় খুড়ো?''

''আছে বইকী আবিরলাল! কুঠি আছে আর মানুষের হাড় থাকবে না! কাউকে যদি না বলে ফেলো, তোমাকে দেখাতে পারি। খুব সাবধান! কথা যেন দু'কান না হয় আবির! আগে দেখো, তারপর চেপে যাও। ফাল্গুনের পূর্ণিমায় এসো।''

আবিরমামার কাছে আমরা নানাখানা ভূতের গল্প শুনে আসছি বরাবর। গত্তি আমার জ্যাঠতুতো দাদা, আমার নাম কিরণ। আমার দু'-চারটি ডাকনাম আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় বোধ হয় চুনো।

মামা একদিন আমাকে শুনিয়ে বললেন, ''শোন চুনো, কুঠি হলেই জানবি, জায়গাটার নিশ্চয়ই বদনাম আছে। এককালে নীলকর সাহেবরা জোর করে চাষিদের দিয়ে নীলের চাষ করাত, ধান বুনতে দিত না। না খেয়ে মরতে হত চাষিকে। কোনও চাষি অবাধ্য হলে তার হালের বলদ, জোত-জোয়াল সব ছিনিয়ে নিত নীলের সাহেব, পেয়াদা দিয়ে ধরে এনে এই কুঠিতে ভয়ানক মারধর করত। মারতে মারতে মেরে ফেলত পর্যন্ত। তারপর সেই মৃতদেহকে কোথায় যে ফেলে দিত!''

গত্তিদাদা বলল, ''নীলের ব্যাবসায় সাহেবদের খুব লাভ হত, তাই না মামা?''

মামা বললেন, ''সাহেবরা ওই নীল চালান দিত বাইরে। মোটা টাকা লাভ করত। এদিকে চাষি সংবৎসরের জন্য মুখের খাবার জোগাড় করতে পারত না। ধানের জমিতে নীল ফলাতে হলে ভাতের জোগাড় হয় কী করে! দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে সাহেবদের সেই অত্যাচারের ঘটনা পাওয়া যায়। কী নিষ্ঠুর আর মর্মান্তিক!''

আমি প্রশ্ন করলাম, ''ওই কুঠিতে কখনও ঢুকেছিলে তুমি?''

মামার মুখের রং কেমন একটুখানি বদলে গেল, অত্যন্ত গম্ভীর গলায় মামা বললেন, ''হ্যাঁ চুনো, মাত্র একবার। সেই ফাল্গুনের পূর্ণিমা রাতে। যাকে বলে ফিনফোটা জ্যোৎস্না চারদিক টইটই করছে। আর বাজিতপুরের দিগন্তজোড়া মাঠ পেরিয়ে ছুটে আসছে মন-কেমন-করা আশ্চর্য জোরদার হাওয়া। দিনুখুড়ো মাঠের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'মাঠে ভুলো নেমেছে।' মাঠের ভেতর সত্যিই জ্যোৎস্নার ম-ম করা ধাঁধোশের সমুদ্রে দপ করে আলো জ্বলে উঠছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে, বিলের পাড়ে কয়েকটি আলো ছোটাছুটি করছে, শুনেছি স্যাঁতসেঁতে ভেজা মাটিতে এক ধরনের গ্যাস তোয়ের হয়, তাইতে আগুন জ্বলে ওঠে। ভুলোটুলো বাজে কথা। দু'দিন আগে ভাল জলঝড় হয়েছে, সে কারণে ভুলোর আমদানি হয়েছে।''

এইসব যুক্তি পেশ করার পর আবিরমামা বললেন, ''সবই বুঝতাম চুনো। কিন্তু দিনুখুড়োর গলার মধ্যে কী ছিল কে জানে, ভুলোর আলো দেখে গা কেমন ছমছম করে উঠল। খুড়ো বললেন, 'এই ধরনের রাতে গো-জিনদের মচ্ছব হয় আবির! এসো তোমাকে কঙ্কাল সরোবরে নিয়ে যাই।' কঙ্কাল সরোবর কথাটাই কেমন ভয় ধরানোর মতো। হঠাৎ কুঠির দালানের পুরনো কাঠামো হাওয়ার আঘাতে মটমট করে উঠল বুঝি। লোহার গেট কড়কড় শব্দে খুলে যেতে লাগল।''

''আপনিই খোলে নাকি খুড়ো?''

''তা খোলে বইকী! ঘোড়াগাড়ি ঢুকবে কি না! চোখে দেখবে না ঠিক, তবে কানে শুনবে। আগে এই শরবতটুকু খেয়ে নাও।''

''কেন?''

''বলছি খাও, প্রশ্ন কোরো না।'' বলে দিনুখুড়ো মস্ত গোল কাঠের টিপয়ে রাখা ঢাকনা-ঢাকা গেলাসের শরবত হাতে করে তুলে ঢাকনা সরিয়ে

আমার সামনে এগিয়ে ধরলেন। বললেন, ''তুমি খাবে, আমি মন্ত্র পড়ব। ভয় পেয়ো না, এই রাতে যেসব ভূত আসে তারা কতক মিস্ত্রি, কতক হলগে বাড়ি তৈরি করা এঞ্জিনিয়ার। এরা কেউ ফোরাত নদীর ধারে নগর গড়েছিল, কেউ পারস্যের মহল গড়েছিল। প্যালেস্টাইনে এরাই বানিয়েছিল ঐরাবত দুর্গের ধাঁচা। বাদশা সুলেমানের আমলে এদের বংশধররাই ময়ূর মহল নির্মাণ করেছিল। মনে রাখবে খাটিয়ে লোকরা চিরকাল বোকা হয়। সেইজন্যে [illegible] বোঝায়।"

''আপনি [illegible] বলছেন।''
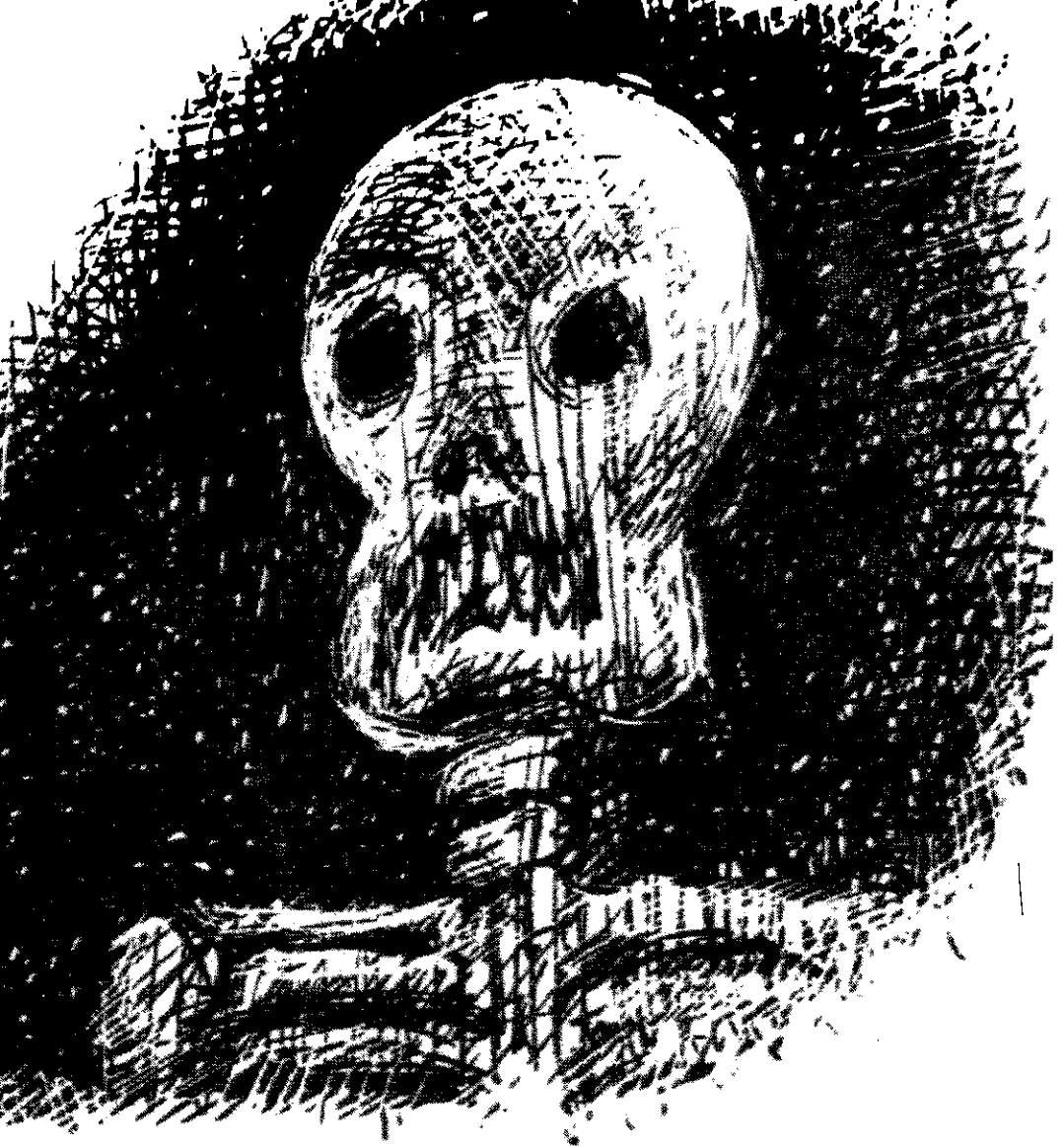
"তা বলছি, কেননা সমস্ত কথা আমার মুখস্থ আছে। হাজারদুয়ারির গাইডরা যেরকম শিক্ষিত ভাষায় কথা বলে, আমিও সেইরকম বলি। কুঠির গাইড আমি। তা ছাড়া কালির অক্ষর আমার পেটেও কিছু আছে। শেঠের দিঘির চৌধুরীরা আমাকে যে বহাল রেখেছেন, তার প্রধান কারণ এই পালিশ করা ভাষা। আমি তাঁদের বাড়ির বউদের পর্যন্ত গো-ভূত দেখিয়েছি। মাইনে সাড়ে সাত টাকা। কিন্তু বছরান্তে চৌধুরীরা আমাকে ধানগম সাহায্য করেন, কুঠির সবজির একটা ভাগ পাই।"

এক মিনিট চুপ করে থেকে খুড়ো বললেন, "এখানে কোনও চাষি চাষবাস করতে আসবে না।

গো-জিন যেখানে থাকে, গোরু ডরায় বাবা। শুধু ট্রাকটার দিয়ে চাষ করানো যায় বটে, কিন্তু চৌধুরীর ড্রাইভার সাহস করেনি। অগত্যা এই দিনুই ভাগজোত টেনে এই কুঠি আগলাচ্ছে। ভাইপোটাকে বলি, ওরে সিধে, এখানের মন্ত্রপাঠ শিখে হাল ধর বাবা, তা সে ভয়েই আসে না।''

দম ফেলে খুড়ো মন্ত্র আওড়ে উঠলেন, ''ই আর কী, মুই আর কী ফট! সামনে ভূতের পট। তুমি দেখবা আবিরলাল?''

''আজ্ঞে!'' ভয়ে আমার গলা শুখু-শুখু।

ঢোক গিলে মামা শুধালেন, ''কী দেখব খুড়ো?''

''আগে গলা ভিজিয়ে নাও, তারপর সব হচ্ছে! ভূতের পট নিশ্চয় তোমাকে দেখাব। ওরা পট টাঙিয়ে দিয়ে গান গেয়ে গেয়ে ইমারত বানাত! নগর তৈরি করত। ইকড়ি মিকড়ি চিক। তিনি আছেন পচ্ছিম দিক।''

''তিনি কে?''

''আর কে! যে ভূতটা পট লেখে!''

''কোথা?''

''আর কোথা! ওই হোথা। চলো দেখাচ্ছি। আগে শরবত শেষ করো।''

ভয়ে মামা ঢকঢক করে গেলাসের শরবত খেয়ে ফেললেন। যদিও আবিরমামা ভূত ঠিক বিশ্বাস করেন না, তাঁর ধারণা মনের কোনও ধরনের বিকার হলে ওই পদার্থ দেখা গেলেও যেতে পারে, সুস্থ মানুষ ভূত দেখে না। তবু তাঁর ভয়ই করছিল। কুঠির দালানগুলো এমনিই পোড়ো, পলস্তরা খসা, লাল ছোট-ছোট ইটের দাঁত বের করা, থামগুলো নোনায় খাওয়া, একেবারেই দড় মনে হয় না। সিলিং অনেক উঁচু, পুরনো শালকাঠের তীরবরগা অনেক স্থানে ক্ষয়ে হড়কে খসে যেতে বসেছে, কিছু স্থলে ছাদ পড়ে গিয়েছে। বুনো পায়রা, প্যাঁচা, বাদুড় নানা জায়গায় বাসা গেড়েছে, মাঝে-মাঝেই বিদঘুটে চিৎকার করে উঠছে। এখানে দাঁড়াশ সাপ ঘুরে বেড়ায়।

শরবত খাওয়া শেষ হলে খালি গেলাস টিপয়ে রেখে দিয়ে খুড়ো বললেন, ''এটা খেলে তো। এবার তোমার গায়ে সামান্য তাপ বাড়বে। মাথাটা ঝিকোবে। আমি মন্ত্র পড়ে দিয়েছি, কালী কটকা, হাওয়াই সটকা, মন্তর। ঝিন্নু তিন্নু গুরুং খাজি পটিতং ম্রাউ, মিস্ত্রির গন্ধ পাও?''

''আজ্ঞে কিছুকিঞ্চিৎ পাই।''

''পট পটিতং পড়চা, পাচকিসিতন খরচা, রং আর তুলি। এসো।''

''আজ্ঞে কোথা?''

''পটের সামনে।''

আবিরমামাকে হাত ধরে একটি ভাঙা গুহার মতো জায়গায় টেনে আনলেন দিনু সিকদার। গুহার মুখে, আসলে ঘরের দেওয়াল খসে গিয়ে গুহাবৎ দেখায়, তার মুখে কালো পরদা ঝুলছে, তারই গায়ে আঁকা সাদা রঙের নরকঙ্কালের ভয়ংকর ছবি, দেখেই রক্ত বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

''এর নাম দুম্বা পির। ভূতের এরকম লেজ দেখেছ কখনও? উল্কা আকাশে ছিটিয়ে গেলে যেরকম ঝরা আগুনের স্রোত হয়, ঝাঁটার মতো, দুম্বার সেইরকম লেজ ছিল। ওইটে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে উনি জিন তাড়াতেন, ভূতের চালচলন সিধে করতেন। মিশরের লাল দরিয়ার তীরে তাঁর ছিল বাবার নৌকো গড়ার ব্যাবসা। ব্যাবসায় তাঁর মন ছিল না।''

''তো, কীসব বলছেন আপনি খুড়ো? এখানে সেই পির থাকতেন?''

''হ্যাঁ। এ ছিল সাহেবের হাওয়াখানা। ওই পিরকে উনি আশ্রয় দেন। এখন আমিই এখানে পিরের খিদমত করি, মানে সেবা করি। এই পটের নকশা তাঁরই শিক্ষা। তাঁর হাতে ছিল একটা লাঠি। জাদুলাঠি বলা যায়। এই গোটা চাকলা ছিল আমার ঠাকুরদার বাবার তিনপুরুষ আগের জমিজিরাত। সাহেবরা কেড়ে নিয়ে কুঠি বসায়। ঠাকুরদার পূর্বপুরুষরা এখনও আছেন। কঙ্কাল সরোবরের ধারে একটা মহল আছে, সেখানে।''

''কীভাবে আছেন তাঁরা?''

''কঙ্কাল হয়ে ঝুলছেন।''

''পিরের লাঠিটা?''

''তাও আছে। সুলেমানি আষা। ময়ূরে মহল যখন

তৈরি হচ্ছে, বাদশা একটা ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে লাঠিটা পিছনে প্যালা দিয়ে মানে ঠেকনো করে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন। রাতদিন যতক্ষণ কাজ চলত, উনি দাঁড়িয়ে থাকতেন। দুম্বা পিরের পূর্বপুরুষরা মিস্ত্রি ছিল। তারা কাজ করতে করতে মুখ তুলে বাদশাকে যে একবার চেয়ে দেখবে, তাতেও ভয়। এতই কড়া বাদশা ছিলেন সুলেমান।"

"তারপর?"

"একদিন বাদশা কাজের তদারকি করতে করতে লাঠিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই মারা গেলেন, কেউ জানতেও পারল না। তখন বাদশার পোষা জিনেরা বাদশাকে ওইভাবেই খাড়া করে রেখে দিল। লোকেরা বাদশা রয়েছেন দেখে হাত চালিয়ে রাতদিন কাজ করে মহল বানিয়ে ফেলল। দুম্বার বাবা হেড মিস্ত্রি। কাজ শেষে বাদশার সামনে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম দিলেন। মিস্ত্রির হাতের সামান্য ধাক্কা লেগে গেল বাদশার পায়ে। বাদশা উলটে পড়ে গেলেন। তখন দুম্বার বাবা বুঝলেন, তাঁরাও কেউ বেঁচে নেই, তাঁরা সব ভূত হয়ে গেছেন।"

আবিরমামা বললেন, "আমার নেশা হয়েছে খুড়ো। জ্বর-জ্বর লাগছে। ফিটনের শব্দ পাচ্ছি। বাদশার লাঠিটা তা হলে দুম্বার বাপ..."

"হ্যাঁ গো! ওই লাঠি হাতে করে দুম্বা তখন মরুভূমির বুকে বিবাগী হয়ে বীরত্বের জন্য বের হয়ে চলে আসেন। জিনসিদ্ধ লাঠি। নীল সাহেব ভেবেছিল তারাও ওইভাবে চাষিদের ওপর তদারকি করবে। মরে গিয়েও পাহারা দেবে। সেইজন্য কঙ্কাল লটকে রেখে গেছে।"

ধীরে ধীরে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো হয়ে পড়েন মামা আবিরলাল। কঙ্কাল সরোবরের পাড়ে এসে দাঁড়ালেন মামা আর দিনুখুড়ো। এক আশ্চর্য দুর্বোধ ভাষায় গান গাইতে লাগলেন দিনু সিকদার। সরোবরে অনেকরকমের ফুল ফুটেছে। নানা তার রং। সাদা ফুলগুলো হিরের মতো জ্বলছে।

হঠাৎ জল তোলপাড় করে ভেসে উঠল কয়েকটি কঙ্কাল। তারপর তারা জলের ওপর অনেকখানি খাড়া হয়ে উঠে নাচতে শুরু করল। এরা কি সব মিস্ত্রি?

"নাচে কারা খুড়ো?"

"কই, কারা নাচে বাবা?"

"আমি যে দেখছি।"

"নেশা হয়েছে আবির। খুয়াব-এ-দুম্বা পাচক খেয়েছ, হাতেনাতে ফল পাচ্ছ। ভূত তো কেউ বিশ্বাস করে না, প্যাঁচে পড়লে করে। আর কী দেখো হে?"

কত কী যে দেখতে পাচ্ছিলেন মামা। ভূতের পট বারবার চোখের সামনে ভেসে ভেসে উঠছিল। একটা রাজা-ভূতের নাম ভারত-ভূশন্ডী জননাথন, আর-একটা উপজাতি ধরনের ভূতের নাম কিমাশ্চর্য পারস্যের চাকমা, ছোট রাজ্যের নাম কিমাগড়। সেই কিমাগড়ির ভূতের জমিদার গরুড়ানন্দ পটপটেশ্বর, তাঁর বংশলতিকায় নিম্নস্থানে রয়েছে মির্জা আয়কমবায়কম ক্ষতিবুদ্দিন গাড়োয়াল। সত্যি সেলুকাস! কী বিচিত্র এই কুঠিয়ালি ভূতের দেশ।

একটা দেওদার গাছের দিকে মামার চোখ চলে যায় সহসা। সরোবরের নাচ থেমেছে, আশ্চর্য পূর্ণিমায় মৃতেরা কি এইভাবে জেগে ওঠে? দেওদারের মাথার ওপর গোল চাঁদ ফটফট করে হেসেই আকুল। গাছের নীচে ঘাসের জমিতে অত্যন্ত ফরসা একটি মেয়ে বসে দাঁত দিয়ে ঘাস কাটছে। অপূর্ব তার রূপ। ও কারও দিকে চাইছে না, আকাশপারে চেয়ে আছে। ওর চোখ দিয়ে গলে পড়ছে নিঃশব্দ কান্নার জল। কেন কাঁদছে ওই সুন্দরী? ওখানেই বা ওইভাবে বসে আছে কেন? ও কি পরি? ও কি মানুষ নয়? ওর ডানা কোথায়? ও কি কারও জন্য প্রতীক্ষা করছে? তবে কি সে কোনও রাজকন্যা?

খুড়ো আবিরমামার একটা হাত চেপে ধরে ছড়া কাটলেন:

দোল দোল দুলুনি
ভূতের মাথায় চিরুনি।

অবাক হয়ে দেখলাম, মেয়েটির মাথার চুলে একখানা চিরুনি গোঁজা। মামা এইভাবে বলেছিলেন আমাদের। ওঁর মনে হয়েছিল, এমন সুন্দর মেয়ে কি কখনও ভূত হয়?

খুব সাহস করে দেওদার তলায় এগিয়ে গিয়ে মামা

দেখলেন কোনও মেয়ে নয়, ছায়ামেশানো খানিকটা জ্যোৎস্না, আর কিছু নেই। মামা এবার যথেষ্ট ভয় পেয়ে গেলেন। জ্যোৎস্না তা হলে নিজেই কখনও কখনও সুন্দরী মেয়ে সেজে বসে থাকে। পরি হয়। যদিও মাথায় গোঁজা থাকে ভূতের চিরুনি।

দিনুখুড়ো অতঃপর মামাকে একটি অন্ধকার মহলে ঢুকিয়ে দিলেন। ঘরে ঢুকেই অদ্ভুত দীর্ঘশ্বাস শুনতে পান মামা। হাড়ে হাড়ে ঘা লেগে কেমন শব্দ হচ্ছে। কারা যেন কথা বলতে চাইছে। অথচ শব্দ ফুটে বের হচ্ছে না, ঘনঘন শ্বাস পড়ছে। মামার হাতে লাগল হাড়ের মতো শক্ত খাঁচা একটি। বুঝতে পারলেন, শূন্যে ভাসছে মানুষের কঙ্কাল কয়েকটি। কী দিয়ে টাঙানো আছে অন্ধকারে বোঝা যায় না। ওই ওপরে ঘুলঘুলি দিয়ে সামান্য জ্যোৎস্নার আভা আসে, তাতে কঙ্কালগুলোকে আরও ভয়াবহ মনে হয়।

ফিসফিস করে উঠল কারা? কানের ওপর শ্বাস ফেলল কে? হি হি করে হাসছে একজন। কোনও একটা অদৃশ্য ফোকর বা গবাক্ষ দিয়ে খুব হাওয়া আসছে মনে হয়। কে যেন বলল, ''আমরা সব খেটে খাওয়া মানুষ বাবা। আমার নাম তোরাপ। নাটকের লোক। দীনবন্ধুবাবুর নাটক। মনে নাই? এখানে চাষিবউ খুব নাদান হয়, কাঁদে গো।''

আবিরলাল কঙ্কাল ঠেলে ঠেলে ঘরের মধ্যে পাগলের মতো ঘুরতে লাগলেন। বাইরে দুর্বোধ ভাষায় চিৎকার করছেন দিনুখুড়ো। কাকে যেন আয় আয় করে ডাকছেন। মনে পড়ে গেল গো-জিনের কঙ্কাল ভক্ষণ করতে আসার কথা।

কঙ্কাল ঠেলতে ঠেলতে ঘেমে উঠেছিলেন মামা। গায়ে এসে আছড়ে পড়ছিল তারা, কপালে লেগে ঝনঝন করে উঠছিল। হঠাৎ চড়া গম্ভীর গলায় কে যেন বলল, ''স্কাউন্ড্রেল! পুওর কালটিভেটার। হামি টুমার কলিজা খাবে। হামার দণ্ড ডিয়া প্রহার করবে, কিল করবে।''

অনেক কষ্টে কঙ্কাল মহল থেকে বের হয়ে আসেন মামা। বাঁশবাগানে ছায়া আর জ্যোৎস্নার মাখামাখি, কী একটা জীব ওখানে ঘুরছে। কালো তার রং। তাকেই বোধহয় ডেকে চলেছেন দিনু সিকদার। মামা

বাইরে এসে [illegible] বসে পড়লেন। ক্লান্তিতে আর ভয়ে হাঁফ নিতে নিতে হঠাৎ মহলটার বাইরের একটা থামে পেতলের চাকতির ওপর চোখ পড়ে তাঁর। থামের গায়ে সাঁটা। উঠে গিয়ে মামা দেখলেন চাঁদের স্পষ্ট আলোয় লেখা রয়েছে ইংরেজিতে, 'সায়েন্স ল্যাব'। তারপর সাহেবের নাম লেখা। এ তা হলে ল্যাবরেটরি, কঙ্কাল থাকবে না কেন!

এতক্ষণ তা হলে কী সব কথা শুনলেন আবিরলাল? তাঁর আশ্চর্য লাগছিল ই আর কি অর্থাৎ ইয়ারকি, মুই আর কি— ফট, ফটকা, হাওয়াই সটকা দিনু সিকদারের কাণ্ড দেখে! দিনু পট লেখে। ভূতের ছবি আঁকে। নানা কথায় বানিয়ে বানিয়ে অবাক ভয়ংকর কুঠিয়ালির প্রেতরাজ্য গড়েছেন।

বাঁশবনে হাড় খাচ্ছে পশুটা। ভয়ই করছিল মামার। এখানে ভাগজোত করতে সত্যিই কোনও চাষি সাহস করে আসবে না। এ শুধুই দিনুখুড়োর ভাগজোতের জায়গা, তিনি ভূতের ভয় দেখিয়ে অন্য চাষিদের দূরে সরিয়ে রেখেছেন, একা ভোগ করছেন শেঠের চৌধুরীদের কুঠির সম্পত্তি। দিনুর অবস্থা কিন্তু সম্পন্ন।

বাঁশবনের দিকে সাহস করে এগিয়ে চললেন মামা আবিরলাল। ছায়া আর জ্যোৎস্নায় সে এক বিচিত্র সমাবেশ। মটমট করে শব্দ করছে বাঁশের গ্রন্থি, মনে হচ্ছে তারা বাতাসের মুখ-গহ্বরে হাড় চিবিয়ে চলেছে।

বাঁশের ঠোঙা আর মরা পাতায় পা পড়ে পিছলে যেতে চায়। এক-একটা মানুষ থাকে, হাঁটাচলার সময়ও যাদের হাড় মটমট করে, দিনু সেইরকম মানুষ।

মামার পিছনে মটমট করে ছুটে আসেন খুড়ো। তাঁর দেহের গ্রন্থি কি আলগা? এই বয়েসেও খুব খাটিয়ে লোক, লাঙল চালাতে পারেন, মই চড়ে কোমর সিধে করে দাঁড়াতে চান জমির ওপর।

খুড়ো বললেন, ''মানুষের হাড়ের চিরুনি কখনও দেখেছ আবিরলাল? দেওদার গাছের ওখানে পড়ে ছিল। নাও, হাতে নিয়ে দেখো।''

কী আশ্চর্য! সব বুঝেও মামা হাত বাড়াতে [illegible] দিনু [illegible] পাহারাদার উঁচু [illegible] হা হা করে হেসে ফেললেন। তাঁর দাঁতগুলো কি নকল? এত বয়সে দাঁত থাকার কথা নয়। মনে হল, তিনি একটা ভূতের মতো হেসে চলেছেন।

কালো জীবটা মাটি শুঁকে শুঁকে কী যেন খুঁজছে, আরে এ তো ভাগাড়। হাড় খুঁজছে নির্ঘাত। ওটা তা হলে কী ধরনের প্রাণী?

খুড়ো বললেন, ''লোম আছে। কাছে এলে মানুষের হাড়ের চিরুনি দিয়ে ওর গা আঁচড়ে দিই বাবা। পশুটা আনন্দ পায়।''

আর সাহস হল না মামার। এখানে সব কেমন উলটোপালটা হয়ে গেছে। গো-জিনের গায়ের লোম আঁচড়ে দেওয়া হয় মানুষের হাড়ের চিরুনি দিয়ে, ভাবলেই গা কাঁটা দিয়ে ওঠে।

পশুটা নিশ্চয়ই খুব ভীরু। কাছে আসতে চাইছে না। মামা একটা দুর্বোধ ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন। সেই শব্দে গো-জিন পালাতে পালাতে ভেউ করে কেঁদে উঠল। আকাশের দিকে মুখ তুলে কেঁদে উঠল। মামা ওকে তাড়া করে ছুটতে লাগলেন।

মামা বসে ছিলেন দক্ষিণ কলকাতার এক বন্ধুর ফ্ল্যাটে। বন্ধুর পত্নী একজন আমলা। তাঁর গাড়ির গ্যারাজের পাশ দিয়ে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মুখে দেওয়ালে প্লেটে সুন্দর করে ইংরেজিতে লেখা, 'কুকুর হইতে সাবধান'।

কুঠির কুকুরটা ছিল পথের কুকুর। খিদের জ্বালায় ওই ভাগাড়ে পুরনো হাড় খুঁজে খেতে এসেছিল। তেড়ে ধরতে না পারলেও মামা ছুটতে ছুটতে একসময় বুঝতে পেরেছিলেন ওটা নিতান্তই ক্ষুধার্ত শীর্ণ কুকুর, রোগা, অসহায়। পথে পথে তার জীবন কেটে যায়।

কলকাতার বন্ধু থাকেন প্রকাণ্ড উচ্চ সৌধে। এত বড় ফ্ল্যাট, আর চারদিক শোভাময়, দেওয়ালে লক্ষ টাকার চিত্র টাঙানো। একটি ভয়ংকর হিংস্র কুকুরকে সঙ্গে করে এসে দেখা দিলেন মিসেস ঝা। তাঁর বাংলা উচ্চারণে কেমন ইংরেজির মতো গন্ধমাখানো, শ্বাসাঘাতে ইংরেজির মতো জড়িমা। কুকুরটার গায়ে

হাত বুলিয়ে দিতে দিতে একটি স্ফটিকশুভ্র পাথরের দামি প্লেটে ভর্তি করা সাদা শাঁক আলুর খাবার এগিয়ে দিলেন। তাঁর স্বামী বড় ব্যবসায়ী। কলকাতার বুকে তিনি বস্তি উঠিয়ে দিয়ে ইমারত তৈরির ব্যাবসা করেন। প্রমোটার।

মামার বন্ধু হওয়ার কথা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে একসঙ্গে পড়েছেন। সামান্য একটা কথা জেনে নেওয়ার জন্য এসেছেন মামা। কিন্তু লোকটা যে এত ধনী তা তিনি জানতেন না। স্ত্রী বাঁ হাতে চিরুনি ধরে মাথার চুল আঁচড়ে নিতে নিতে অকারণ হেসে মামাকে দৃষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। নিজের চুল আঁচড়ে নিয়ে কুকুরকে খাওয়াতে খাওয়াতে হঠাৎ সেই চিরুনি কুকুরের বলিষ্ঠ গায়ে লোমের ভিতর চালাতে চালাতে কথা বললেন, "আপনার নাম?"

কুকুরটার দেহ কেমন পুলকিত হয়ে উঠল। চোখ তুলে মামার চোখে জ্বলন্ত দৃষ্টিক্ষেপ করল কুকুরটা। প্রাণীটার লেজ আগুনের ঝাঁটার মতো লেলিহান। মামা আশ্চর্য ভয় পেয়ে লক্ষ করলেন, এ নির্ঘাত গো-ভূত। হাড় খায়।

২৭ এপ্রিল ১৯৯৪
অলংকরণ: কৃষ্ণেন্দু চাকী
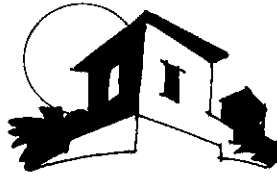
মানুষই ভূত

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

ইদানীং ভূপতির শরীর ভাল যাচ্ছে না। জ্বর-জ্বালা, কিছুদিন বুকে সর্দি বসে গিয়ে বেশ কষ্ট পেয়েছে। শরীরে আর আগের মতো জোর পায় না। একা দূরে যেতেও কেমন তার ভয় লাগে। সঙ্গে কেউ থাকলে ভাল হয়। বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল, যেতে পারেনি। মা একবার নিজে ঘুরে গেছেন, তারপর চিঠি, সে চিঠির কোনও জবাব দেয়নি। ছোটপুত্রের তাগাদায় অতিষ্ঠ হয়ে মা ঘুরে গেছেন, তাও বোঝে ভূপতি। ''এবারের মতো দে, আর বলব না। চোখের সামনে আমি আর এত কষ্ট দেখতে পারছি না। কিছু একটা যদি করে বসে, এটাই শেষ চেষ্টা। দে বাবা। শত হলেও তোর ছোট ভাই, সব আঙুল কি সমান হয় রে বাবা?''

ভূপতি রা করেনি। তার আর অনটনের কথা শুনতেও ভাল লাগে না। এমনিতেই মা'র আলাদা মাসোহারা, ছোট ভাইয়ের আলাদা মাসোহারা সে পাঠায়। সম্প্রতি অবসর নেওয়ায় তার নিজের সম্পর্কেও চিন্তা বেড়েছে। হুট করে চাইলেই দেওয়া যায় না। নিজের সংসারের দায়ও কম নয় তার।

''কী রে কিছু বললি না যে।''

''কী বলি বলো তো?''

''তুই দিতে পারিস ইচ্ছে করলে। আর কার কাছে হাত পাতবে?''

''দিচ্ছি তো। আর কত ঠেকা দেব বলো।''

''তা দিচ্ছিস বাবা। মাসে-মাসে টাকা নেয় তাও জানি। আমাকে কিছু বলে না। তোর কাছে ঘুরে যায়, বলে কলকাতার মহাজনের কাছে কাজ ছিল। এত মিছে কথা বলতে পারে! ফল বিক্রি করে ক'টা টাকা হয় বল? পাঁচ-পাঁচটা পেট সোজা কথা! সকালে সাইকেল নিয়ে বের হয়, ফিরতে ফিরতে রাত আটটা-ন'টা। চালের ব্যাবসা করবে বলছে, হাজার-আটেক টাকা দিলেই শুরু করতে পারে। আমাকে ধরেছে। কোন মুখে তোর কাছে চাইবে, বুঝতে পারিস না!''

''আবার চালের কারবার! নৃপতির কি মাথা খারাপ আছে মা? একবার করে শিক্ষা হয়নি! কত টাকা আমার গচ্চা গেল। থানা, পুলিশ, আদালত, প্রায় এক যুগ ধরে মামলা— কত টানব বলো? কথায়-কথায় নানা অজুহাতে বাবার লাগানো গাছগুলো তোমরা বিক্রি করে দিচ্ছ। কষ্ট হয় না তোমাদের! বাড়ি পর্যন্ত যেতে ইচ্ছে হয় না। শ্মশানের মতো খাঁ খাঁ করছে সব। চার-পাঁচ বিঘের বাড়িটাতে এখন শুধু জঙ্গলের রাজত্ব।''

''কী করি বল, সব কিছুর দাম আগুন। এত বড় ঘর তো করে গেছে, তার মেরামত আছে না! তোর বাবা কি মানুষ ছিল? অপদেবতা বিশেষ। জীবনে কিছু করেছে। শুধু ওই গাছ আর গাছ। গাছ লাগালে, কি পেট ভরে রে বাবা?''

ভূপতি জানে, বাবার কথা উঠলে মা'র অভিযোগের অন্ত থাকবে না। বাবার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগই সে শুনতে চায় না। শুনতে তার ভালও লাগে না। বাবা মারা গিয়েও মা'র চোপাতে সারাদিন অস্থির থাকেন। সামান্য অভাব-অভিযোগে বাবাকে ধরে টানবেন। ''কী? গাছ খাওয়াচ্ছে না! সারাজীবন

বসে-বসে খেলে, উপার্জন করলে না এক পয়সা। এখন পুত্রের মুখাপেক্ষী। টাকা পেলে রমরমা, না পেলে হা-পিত্যেশ। সারাজীবন গাছপাগল হয়ে থাকলে। দেব সব গাছ কেটে।''

চিঠি মা'র।

''ঝড়-বৃষ্টি-বাদলায় মাটির দেওয়াল রাখা যাচ্ছে না। উত্তরের সীতাভোগ আমগাছ বেচে দিলাম। ক'টা টিন পালটাতে হবে।''

আবার চিঠি।

''নৃপতির লোনের টাকা শোধ করতে হবে। অত টাকা পারে কোথায়! ব্যাঙ্ক লাল চিঠি ধরিয়ে দিয়ে গেছে। নৃপতির এখন ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা। খুবই ফাঁপরে পড়ে গেছে। শ্রীপতি বাড়ি এসেছিল, সে রাজি না। বলে গেছে মেজদা অনুমতি দিলে আমাদের আপত্তি নাই।''

এখন বাড়িটা সাত শরিকের। তবু ভূপতি জানে, নানা কারণেই দাদা এবং ভাইবোনেরা তার মুখাপেক্ষী। সে অনুমতি দিলে, কেউ আর বাধা দেবে না। মা'রও দোষ দিতে পারে না। চোখের সামনে নৃপতির অভাব-অনটন সত্যি সহ্য করা যায় না। বাড়ির সামনের জমিটায় নৃপতি ঘর তুলে আছে। জমির বণ্টননামা হয়নি। সব জমি এবং গাছপালা মা ভোগ করে। মা'র ওরফে নৃপতিও কিছুটা ভোগ করে। মা'র অবশ্য আলাদা একটি গলগ্রহ আছে। ভাইঝি সুনন্দা। মা'র কাছেই বড় হয়েছে, মা'র সঙ্গেই থাকে। পড়াশোনা বিশেষ হয়নি। বাবার লাগানো গাছের সঙ্গে এ বাড়িতে সেও বড় হয়ে উঠেছে। গাছ কাটলে সুনন্দাই বেশি কষ্ট পায় এটাও সে বোঝে।

গাছ যেদিন কাটা হয়, সুনন্দা বাড়ি থাকতে পারে না। সে পিসির বাড়ি চলে যায়। ক্রোশখানেক দূরে পিসির বাড়ি সাইকেলে চলে যাওয়ার আগে সবাই দেখেছে, সুনন্দা কিছুক্ষণ গাছটার নীচে বসে থাকে। ভূপতি বুঝতে পারে, গাছের সঙ্গে বড় হয়ে উঠলে মায়া তো পড়বেই। বাবা গাছও লাগিয়েছেন, সুনন্দাকেও তুলে এনেছিলেন। দাদার সন্তান-সন্ততির মাত্রা একটু বেশি। বড় মেয়েটির প্রতি দাদার মায়া মমতা কম, টের পেয়েই বোধ হয় বাবা এ কাজটি করে গেছেন। সুনন্দার দেখতে দেখতে কত বয়েস হয়ে গেল! এখনও পাত্র জোটানো গেল না। দাবিদাওয়া নিয়ে কম করে লাখ টাকা, কে দেয়! সুনন্দা খুশিই এতে, সে আছে, গাছগুলোও আছে। আম, জাম, লিচু, সবেদা, কাঁঠাল— কী গাছ নেই! সারা বাড়িতে সব গাছপালা মহীরূহ হয়ে গেছে। গাছের ভালবাসায় সেও মজে গেছে। গাছ কাটা হবে ভাবলেই ভূপতির চোখে সুনন্দার মুখ ভেসে ওঠে। এতে সেও কম কষ্ট পায় না। তবু তাকে অনুমতি দিতেই হয়।

নানা অজুহাতে সব গাছই শেষ। আছে একটা অর্জুন গাছ। বাঁশের জঙ্গলে গাছটা বড় হয়েছে নিজের খুশিমতো। সেই গাছটাও বোধহয় এবারে যায়।

মা নিজের খুশিমতো গাছ দিয়ে দেন।

একবার লিখলেন, ''শ্রীপতি বাড়ি করছে। তার দরজা-জানলার কাঠ চাই। বাজারে কাঠের দাম আগুন। বড় সিঁদুরে গাছটা সে চাইছে। গাছটা পেলে দরজা-জানলার কাঠ আর তাকে কিনতে হয় না। শ্রীপতি তোমার অনুমতির অপেক্ষায় আছে।''

ভূপতি বোঝে, এই করে সবাই বাবার গাছগুলো শেষ করে দিচ্ছে।

নৃপতি টাকা নিতে এলে বলবে, ''মা টিয়াঠুঁটি গাছটা বিক্রি করে দিল। উত্তরের দিকের গাছ আর একটাও নেই।''

ভূপতি না বলে পারে না, ''যা খুশি করুক।''

নৃপতির আরও অভিযোগ, ''গাছ তো দাদা আমরাই কাটছি না, মাও কাটছে। লোক দিয়ে এত বড় জামগাছটা জলের দরে বিক্রি করে দিল। মা'র কী অভাব আছে বল! কেন গাছ বেচে দেয় বল। টাকা, বুঝলি না, গুচ্ছের টাকা সুনন্দার নামে ব্যাঙ্কে ফেলে রাখছে।''

ভাইঝিটি নৃপতির চক্ষুশূল। নৃপতির স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা নেই। প্রায় একই উঠোনে নৃপতির ঘর। নৃপতির ছেলেমেয়েরা ওত পেতে থাকে, কখন ঠাকুমা খেতে বসবেন। ঠাকুমাকে ভালমতো খেতে দেয় না। কেড়েকুড়ে সব খেয়ে নেয়। ভূপতি এমনও অভিযোগ শুনতে পায়। সুনন্দা এলে বলবে, ''কাকা,

আপনি একবার বাড়ি যান। সবাইকে ডেকে বলুন, গাছ যেন কেউ আর বিক্রি না করে। রেষারেষি যত গাছ নিয়ে। ছোটকাকা তো জোর করেই গাছ কাটছে। ঠাকুমার কথা শুনছে না। ছেলে স্কুলে যাবে, সাইকেল নেই। পুকুরপাড়ের গাব গাছটা কেটে ফেলল।''

ভূপতি না বলে পারেনি, ''মা কাটতে দিল কেন? মা বাধা দিতে পারত।''

''তা হলেই হয়েছে। নাতির কষ্ট, এতটা রাস্তা হেঁটে স্কুলে যায়, আসে। আপনি অনুমতি যদি না দেন, সেই ভয়ে ঠাকুমাও চিঠি লেখেনি। রোজ ঠাকুমাকে জ্বালায়, আমার একটা সাইকেল কিনে দাও। জেঠুকে চিঠি দাও। জেঠুকে লেখো, আমাকে যেন একটা সাইকেল কেনার টাকা দেয়।''

ভূপতি কুপিত হয়। তার মাথা গরম হয়ে যায়, ''তোরা কী ভেবেছিস বল তো, আমি কি টাকার গাছ যে, ঝাড়া দিলেই ঝরে পড়বে। আমরা দেড়-দু' ক্রোশ হেঁটে স্কুল-কলেজ করিনি! আমরা পারলে নৃপতির ছেলে পারবে না কেন?''

''সেটা কে বলে কাকা? আমি এখন ঠাকুমার চক্ষুশূল। বাধা দিতে গেলে ঠাকুমাই চেঁচামেচি করে। তোর গাছ, না তোর বাপের গাছ? আমার কর্তা লাগিয়ে গেছে। গাছ থাকবে কি যাবে আমি বুঝব। গাছের জন্য দরদ উথলে উঠছে। গাছ না থাকলে

বাড়ির শোভা থাকে না! গাছ থাকলে সব জঙ্গল হয়ে যায়! হোক জঙ্গল। বাড়িটাতে আছে কী, কেউ দেখে বাড়িটা!"

ভূপতি চোখ বুজে সব শোনে।

বাবা থাকতে বাড়িটা ছিল তপোবনের মতো। পাঁচ বিঘে জমিতে একটা আগাছা জন্মাতে পারত না। বাড়ির গৃহদেবতার পুজো আর গাছপালার পরিচর্যা ছিল তাঁর নেশা। সব গাছের নাম বাবাই দিয়েছেন। আমগাছই মেলা। জাম, জামরুল, চালতে গাছও আছে। বাবা একটি সুন্দর লেবুর বাগানও করেছিলেন। গন্ধরাজ লেবু পাতে না পড়লে খাওয়ার সুখ থাকে না। পুকুর পাড়ের দিকটায় শুধু নারকোল গাছ আর খেজুর গাছ। খেজুর গাছ বাবা অবশ্য লাগাননি। জলের দরে জমি কেনার পর জঙ্গল সাফ করে একটি মজা পুকুর এবং খেজুর গাছগুলি বাবা আবিষ্কার করেছিলেন। উত্তরের দিকটায় বাঁশের বন ছিল, তা বাবা অক্ষতই রেখেছিলেন। গেরস্থের ঘরে বাঁশ না হলে চলে না।

কত দূর-দূর থেকে বাবা গাছের কলম করিয়ে নিজে কাঁধে বয়ে এনেছেন। নাওয়া-খাওয়ার কথা বাবার মনে থাকত না। গাছ লেগে গেলে বাবা বালকের মতো খুশি। একবার বাবা তাকে কলেজেও যেতে দিলেন না। সবে সে কলেজে তখন ঢুকেছে। বাবা ঘর্মাক্ত কলেবরে বাড়ি ফিরে, কাঁধ থেকে

গাছের কলমটি নামিয়ে বললেন, "ভূপতি, এই গাছটা তুমি আজ লাগাবে।"

"কাল লাগালে হবে না?"

"হবে না কেন, হবে। তবে গাছের মর্যাদা থাকে না। এত দূর থেকে কাঁধে করে বয়ে আনলাম, গোলাপখাস আমের কলম। খুবই লাজুক স্বভাব। কলম করাই কঠিন। যাও গাছ কলম দিল, তাকে বাড়ি এনে ফেলে রাখলে গাছ কুপিত হবে না!"

তারপর যা কাণ্ড করলেন, সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে তাকে, কলমটি অতি যত্নের সঙ্গে তুলে নিয়ে গেলেন বাড়ির পুবের দিকের জঙ্গলটায়। জঙ্গল সাফ করে কোমরসমান গর্ত করে ফেললেন। ভূপতি কী আর করে। সে নিজেই তার বাবার কাছ থেকে কোদালটি প্রায় কেড়েই নিল, "তুমি দেখিয়ে দাও, আমি সব করছি।"

"তুমি পারবে না।"

"পারব।"

বাবার তবু অবিশ্বাস। কলমটি লাগাবার সময় যেন কোনও ত্রুটি থেকে না যায়। বাবা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব তদারক করছেন।

"আস্তে নামাও। না না, ঠিক হচ্ছে না। কলমের গোড়াটি কলাপাতায় মোড়া। ওটা আলগা না করে নিলে গাছ জোর পাবে না।"

"দেখবে যেন গাছে চোট না লাগে। আর একটু সোজা হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ঝুরঝুরে মাটি চাই। মিহি করে দাও। ফেলো, গাছ লাগালে আত্মপ্রত্যয় বাড়ে।"

বর্ষাতেই গাছটি লেগে গেল। বাবা তাকে একদিন গাছটার কাছে নিয়ে গেলেন। সন্তর্পণে অতি যত্নে একটি পাতা হাতে দিয়ে বললেন, "দেখ তো, কোনও গন্ধ পাস কি না!"

ভূপতি পাতাটি শুঁকে কিছুই টের পেল না।

বাবা বললেন, "এসো এদিকে।"

আরও দুটো গাছের পাতা দিয়ে বললেন, "দেখ তো, এবার কোনও গন্ধ পাস কি না?"

ভূপতি অবাক। কীসের গন্ধ? বাবা তার কেমন গন্ধ চান সে বুঝতে পারছে না। সব আম পাতার যেমন গন্ধ থাকে, এগুলো তার ব্যতিক্রম হবে কেন?

বাবা হতাশ গলায় বললেন, "গাছটি বাঁচলে হয়। গন্ধই টের পাও না গাছের! আমি তো গাছের পাতা শুঁকে বলতে পারি কোনটায় কোন সিজনের আম ধরবে। গোলাপখাস আর মধুটুকরি পাতার কি এক গন্ধ হয়! একটাতে গোলাপখাস আমের গন্ধ পাবে, আর একটাতে মধুটুকরির। সব গাছের জাত আলাদা, গন্ধ আলাদা। ফুল, ফল আলাদা। আমের জাত না চিনলে গাছ লাগিয়ে কী হবে! গাছ লাগালে মানুষের ভালবাসা বাড়ে, বোঝো? গাছ লাগালে, মানুষের বিবেক জাগ্রত থাকে। গাছ তো শুধু ছায়া দেয় না, শুধু ফুল-ফলও দেয় না। গাছ মানুষের বিবেকও জাগ্রত রাখে।"

ভূপতির কেন জানি বাবার কথা ভাবতে গিয়ে চোখে জল এসে গেল। এগুলো তো শুধু গাছ নয়, বাবার প্রাণ। বাবা এই ফল-ফুলের গাছের ছায়ায় বেঁচেছিলেন। কোনও কিছুরই অভাব বোধ করেননি। অভাব থাকলেও জীবনে তাঁর কোনও দৈন্য ছিল না। সব দুঃখ-হতাশা বাবা গাছগুলির দিকে তাকিয়ে জয় করে গেছেন। সময়মতো বাড়ির মাসোহারা পাঠাতে না পারলে বাবা যে অগাধ জলে পড়ে যাবেন, সে বুঝত। নিজের সংসারের টানাটানিতে কত সময় সে বাবার মাসোহারা ঠিকমতো একসময় পাঠাতে পারত না। বাবা কখনও মুখ ফুটে অভাবের কথা প্রকাশ করতে পারতেন না। এত বিচিত্র গাছগাছালি তাঁর নিজের হাতে লাগানো। গাছগুলোর নীচে বসে থাকলে বাবার আত্মতৃপ্তির শেষ ছিল না। এত গাছ যাঁর, তাঁর আবার অভাব কীসের!

পরদিন সকালে উঠেই ভূপতি স্ত্রীকে বলল, "আমি আজই বাড়ি যাচ্ছি।"

স্ত্রী মণিকা বলল, "তার মানে? এই শরীর নিয়ে একা যাবে? গেলেই হল। সর্দি, কাশি, জ্বরে কবে থেকে ভুগছে। লো ব্লাড প্রেশার। এতদূরে যাবে, সঙ্গে কেউ না গেলে হয়।"

ভূপতি বলল, "সাতটা পঁয়তাল্লিশের ট্রেন ধরব। বউমাদের বলো আমার জামাকাপড় গুছিয়ে দিতে। আমাকে যেতেই হবে। বাধা দেবে না।"

মণিকা চেঁচামেচি শুরু করে দিল, "বাড়িই তোমাকে খাবে। এই শুনছ, লিলি, লিপিকা শুনছ, তিনি কী বলছেন!"

ভূপতি কিছুই গ্রাহ্য করল না। ঘড়ি দেখল। ছ'টা বাজে। সে বাথরুমে ঢুকে গরম-ঠান্ডা জলে স্নান করে নিল। হুকুম তামিল করার কাজ এখন বাড়ির লোকদের। গোছগাছ না করে দেয়, সে এক জামা-কাপড়েই বের হয়ে যেতে পারে। ছেলেরা উপরে উঠে এল।

বড় ছেলে বলল, "তোমার মাথায় হঠাৎ হঠাৎ কী ঢোকে বলো তো? যাবে ঠিক আছে। দু'দিন পরে যাও, দেখি আমরা কেউ সঙ্গে যেতে পারি কি না। ছুটিছাটার ব্যাপার আছে।"

বাথরুম থেকে বের হয়ে আয়নার সামনে চুল আঁচড়াল ভূপতি। মণিকা থম মেরে আছে।

"এ কেমন মানুষ রে বাবা। গোঁ ধরল তো ধরল। বাড়ির সুবিধে-অসুবিধে বুঝবে না। আমার একটাও ক্যাজুয়াল পাওনা নেই। আমি না হয় সঙ্গে যেতে পারতাম। হঠাৎ বাড়ির জন্য এতটা উতলা হয়ে পড়লে, কেউ বাড়ির খোঁজ নেয় না। শুধু গাছ বিক্রি আর টাকা, এ ছাড়া তোমার মা'র চিঠিতে কী থাকে।"

ভূপতি তবু রওনা হয়ে গেল। ছোট ছেলে স্টেশনে তুলে দিয়ে এল। কিছু ওষুধপত্র সঙ্গে দিল। হজমের, অম্বলের, আমাশয়ের বড়ি ভাগ ভাগ করে সাজিয়ে দিল। মণিকা বলল, "সুনন্দাকে বলবে যেন জল ফুটিয়ে দেয়। শিয়রে টর্চ নিয়ে শোবে। গ্রাম জায়গা, বর্ষাকাল, সাপখোপের উপদ্রবও কম নেই।"

ভূপতি চুপচাপ শুনল, কোনও কথা বলল না। তিন-চার বছর পর সে বাড়ি যাচ্ছে। এখনই জমির বণ্টননামা করে দিতে না পারলে বাড়ির শেষ গাছটিকেও রক্ষা করা যাবে না। অন্তত বাঁশের জঙ্গলটাও যদি সে পায়, বাবার শেষ গাছটি সে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। দেরি করলে সেটাও যাবে। এবার সে আট হাজার টাকার কোপে পড়েছে। এই কোপ থেকেই শেষ পর্যন্ত মা অর্জুন গাছটি বিক্রি করে নৃপতির হাতে টাকা ধরিয়ে দিতে পারেন। যেন বিন্দুমাত্র দেরি করলে বাবা বলতে পারেন, এই তুমি আমার লায়েক পুত্র! তোমার ওপর এত আশা ছিল। মরে যেতে-না-যেতে যে জঙ্গল কিনেছিলাম, বাড়িটা সেই জঙ্গল হয়ে গেল। সাত-আট বছরে সব গাছ কেটে তোমরা সাফ করে দিচ্ছ। আমার কষ্ট হয় না!

কষ্ট তারও কম হয় না। কৈশোর, যৌবন, সেও

এইসব গাছের ছায়ায় বড় হয়েছে। এক-একটা গাছ যেন বাবার এক-একজন সন্তান। গাছগুলির সঙ্গে বাবা একা থাকলে কথাও বলতেন। তারা যে যার মতো উড়ে গেছে। এক নৃপতিই বাড়িছাড়া হয়নি। বাবার অমতে বিয়ে করে আলাদা ঘর তুলে আছে। শেষ বয়সে প্রায় তিনি সম্পর্কবিহীন হয়ে পড়েছিলেন। গাছগুলি ছিল বলে রক্ষা। গাছের কোথায় পোকা লেগেছে, পাতা ঝরে যাচ্ছে, লতাপাতায় গাছ জড়িয়ে গিয়ে দম ফেলতে পারছে না, কিছুই বাবার নজর এড়াত না। বর্ষার আগে গাছের গোড়ার মাটি আলগা করে দিতেন, কলম করতেন, কলম বিলোতেন। যে নিয়ে যেত, তাকে বারবার বলতেন, গাছের যত্ন করতে। "যত্ন না করলে গাছ ফল দেয় না। ভাল না বাসলে গাছ নির্জীব হয়ে যায়।"

কখনও বাবা এক ক্রোশ দু' ক্রোশ পথ হেঁটে নিজেই চলে গেছেন। যে গাছ নিল, তার যদি গাফিলতি থাকে পরিচর্যায়— খোঁজ খবর না নিতে পারলে মনে শান্তি পেতেন না। বাড়ি ফিরলে মা'র চোট শুরু হয়ে যেত।

"তুমি মানুষ! তোমার আক্কেল নেই। এতদূর হেঁটে গেলে গাছটি বেঁচে আছে না মরেছে, তোমার এত দায়।"

বাবা বলতেন, "গাছ তো নিজ হাতে একটাও লাগালে না। লাগালে বুঝতে পারতে।"

সারা রাস্তায় ভূপতি বসে বসে ট্রেনে এসবই ভাবছিল। রাস্তায় ট্রেন অবরোধের মুখেও পড়ল। বেলা একটায় তার পৌঁছনোর কথা। সাঁঝ লেগে গেল। বৃষ্টি-বাদলার দিন। স্টেশন থেকে দেড় ক্রোশ রাস্তা। শরীরে জ্বর-জ্বর ভাবটা আছে। রিকশা না পেলে খুবই মুশকিল। রাস্তাঘাটও ভাল না। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কিছুটা যেতে হয়। তারপরই কলোনির শুরু।

এত অন্ধকার যে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। তিন-চার বছরে জায়গাটার পরিবর্তনও কম হয়নি। মেলা বাড়িঘর উঠেছে। জলের দরে যারা জমি কিনেছিল, তারা সবাই প্লট করে বিক্রি করে দিচ্ছে। আট-দশ হাজার টাকা দর। এখন আর কোথাও ঝোপ-জঙ্গল নেই বললেই চলে। সে তার নিজের বাড়ির সামনে রিকশা থেকে নামতেই টের পেল, সামনের জমিটুকু ছাড়া বাকি জায়গা ঝোপ-জঙ্গলে ছেয়ে আছে। নৃপতির ঘরের দরজা বন্ধ। বাড়িতে কি কেউ নেই! সে ডাকল, "নৃপতি আছিস!"

নৃপতির ছোট ছেলেটা দরজা খুলে বের হয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে কোলাহল শুরু, "ঠাকুমা, জেঠু উঠোনে দাঁড়িয়ে।" নৃপতি বোধহয় ফেরেনি। বাড়িতে আরও লোকজন থাকার কথা। তারা গেল কোথায়!

নৃপতির উঠোনে বেশ জোরালো একটা আলো জ্বলছে। আলোতে সবই সে দেখতে পেল। সত্যি, ঝোপজঙ্গলের যেন শেষ নেই। বাবার ঘরটা পার হয়েই ঝোপজঙ্গলের শুরু। তার গলা পেয়ে মাও দরজা খুলে বের হয়ে এলেন।

রাত আটটাও বাজে না। গাঁয়ে এতটা নিশুতি রাত তো হওয়ার কথা না।

মা বারান্দায় চেয়ার বের করে দিতে গেলে না বলে পারল না, "সুনন্দা কোথায়!"

"মনোদের বাড়িতে টিভি দেখতে গেছে।"

"নৃপতির বউ কোথায়?"

মা বললেন, "কী জানি কোথায়। সাঁঝ লাগলে কেউ কি আর বাড়ি থাকে রে বাবা। কখন রওনা হয়েছিস? কী খাবি!" বলেই রাস্তায় নেমে গেলেন সুনন্দার খোঁজে।

সবকিছু কেমন হতচ্ছাড়া মনে হচ্ছে তার। ছোট ছেলেটাকে ঘরে একা রেখে নৃপতির বউ, মেয়ে ঠিক টিভি দেখতে গেছে। মা একা এক ঘরে। নৃপতির ছেলেটা একা এক ঘরে। দু'জনে মিলে বাড়িটাকে পাহারা দিচ্ছে। সুনন্দা এসে বলল, "আপনি আসবেন জানব কী করে? কোনও খবরও তো দেননি।"

যাই হোক, খাওয়া-দাওয়ার পর ভূপতি বলল, "নৃপতিকে ডাক।"

নৃপতি প্রায় ছুটেই এল। দাদার খুবই সে অনুগত। দাদা বাড়ি এলে তার কিছু বেশি আর্থিক সুবিধে হয় সে জানে। তাকে খুশিই দেখাচ্ছিল। হয়তো চালের কারবার শুরু করার একটা ছিল্লে করতেই দাদা চলে এসেছে।

ভূপতি বারান্দায় বসে। নৃপতি পায়ের কাছে বসে। মা অদূরে বারান্দার থামে হেলান দিয়ে আছেন।

"নৃপতি, কাল সবাইকে খবর দিবি। শ্রীপতিকে আসতে বলবি। বিপিন অমলকেও খবর দিবি। দাদাকে আসার সময় স্টেশনে চিঠি রেখে এসেছি। রাতেই চিঠি পেয়ে যাবে। দাদা মনে হয় কাল বিকেলেই চলে আসবে। ভাবছি, জমির ঝামেলা আর রাখব না। বণ্টননামা করে দিয়ে যাব। বিপিন জমির আইন-টাইন বোঝে ভাল। পূর্ণ আমিনকে ডেকে দু'-তিন দিনের মধ্যে কাজটা সেরে ফেলা দরকার।"

"সে না হয় খবর দিচ্ছি, কিন্তু দাদা, এত বড় জঙ্গল তো দু'-চার দিনে সাফ করা যাবে না। সকালে ঘুম থেকে উঠলে টের পাবি। ঘোর জঙ্গল হয়ে আছে বাবার গাছপালার জায়গাটা।"

"সব তো বুঝলাম নৃপতি, কিন্তু তোরা কত বড় অমানুষ বুঝতে পারছিস? গাছ কাটছিস, বেশ করছিস। গাছ কেটে পাশে কি আর একটা গাছ লাগানো যেত না! আর কিছু না হোক, বাবা অন্তত খুশি হতেন। সাত-আট বছরে তাঁর গাছগুলো সাফ করে দিলি!"

"ওরে বাব্বা! গাছ লাগাবে! গাছ কাটলেই জায়গাটা দু'-চার মাসে জঙ্গলে অগম্য হয়ে যায়! সাধ্য কার ঢোকে। এজমালি জমি, অভাবী মানুষ আমি, জঙ্গল সাফ করব যে টাকা পাব কোথায়!"

সুনন্দাও বলল, "কাকা, তাজ্জব কাণ্ড। কাল দেখতে পাবেন। রাজ্যের আগাছায় সব জায়গা ভরে গেছে। গাছ কাটার পর দু'দিনও যায় না। জঙ্গলে ঢেকে যায় জায়গাটা।"

সকালে ঘুম থেকে উঠে ভূপতি এটা ভালভাবেই টের পেল। উঠোনে দাঁড়িয়ে যতদূর চোখ যায় দেখল। বাঁশ-সমান উঁচু থরেথরে জঙ্গলের মাথা দেখা যায়। লতাগুল্মে ভর্তি। বর্ষাকাল বলে জঙ্গলটা খুবই সতেজ।

সে এগিয়ে গেল জঙ্গলটার কাছে। এই জঙ্গলের মধ্যেই বাবার লাগানো গাছ না থাকলেও গুঁড়িগুলি আছে। সামনে কিছুটা যেতে পারলেই সে তার নিজের লাগানো গাছটির গুঁড়ি দেখতে পাবে। যেন কিছুটা ঘোরে পড়েই ঝোপজঙ্গলের ডালপালা ঠেলে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করল।

নৃপতি চিৎকার করছে, "দাদা, যাস না।"

সুনন্দা চিৎকার করছে, "কাকা, যাবেন না। দুটো শ্বেত গোখরোর বাসা আছে ওদিকটায়।"

মা চিৎকার করছেন, "বাবা তোমার কত বড় অপদেবতা এবারে বোঝো। গোটা বাড়িটাকে জঙ্গল বানিয়ে মজা লুটছে।"

ভূপতি তবু চেষ্টা করছে ঢোকার। তার অপদেবতায় বিশ্বাস কম। সাপের উপদ্রব থাকতে পারে। সতর্ক থাকলেই হবে।

ভূপতি জঙ্গলের ভেতর কিছুটা ঢুকেই ফাঁপরে পড়ে গেল। সারা গায়ে-মাথায় ডালপালা জড়াজড়ি করে তাকে যেন নিশ্বাস ফেলতে দিচ্ছে না। লতাপাতায় সে আটকা পড়ে যাচ্ছে। সে দু'হাতে যত লতাপাতা সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, তত সে আরও বেশি জড়িয়ে যাচ্ছে। সে বলল, "বাবা, আমি তো কোনও দোষ করিনি।" কথাটা বলে সে যেন জোর পেল মনে। কোনওরকমে লতাপাতার জাল থেকে বের হয়ে হাঁপাতে লাগল।

সকালে দশ-বারোজন লোক নিয়ে এল নৃপতি। তারা জঙ্গল কাটতে শুরু করেছে। জ্বর গায়ে বারান্দায় বসে আছে ভূপতি। জঙ্গলের পাহাড় জমে উঠছে উঠোনে। জঙ্গলের পাহাড় দেখতে দেখতে ভূপতির কেন যে মনে হল, গাছ কেটে তারা ভাল কাজ করেনি। বাড়িটাতে বাবার অশুভ নজর পড়েছে। না হলে, সুন্দর বাড়িটা এমন ছন্নছাড়া হয়ে যায় না।

জঙ্গল কিছুটা সাফ হতেই একটা কাটা গাছের গুঁড়ি দেখা গেল। ভূপতি অবাক। গুঁড়ির পাশে সজীব একটা আম গাছ বড় হয়ে উঠছে। লতাপাতায় ঢাকা ছিল। জঙ্গল সাফ হওয়ায় গাছটা যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। এভাবে জঙ্গল যত সাফ হতে লাগল ভূপতি নৃপতি তত ঘোরে পড়ে যাচ্ছে। যেখানে যে গাছটি কাটা হয়েছে, তার পাশেই আর-একটি সেই গাছ, কাঁঠাল হলে কাঁঠাল গাছ, আম, জাম, জামরুল, আমলকী হলে আম, জাম, জামরুল, আমলকী গাছ। বছর অনুযায়ী তারা বেড়ে উঠেছে জঙ্গলে।

"গাছ কে লাগাল?" ভূপতি না বলে পারল না।

শ্রীপতি বলল, "গাছ তো দাদা বীজ থেকে হয়।"

ভূপতি কেমন কিছুটা ঘোরে পড়ে গেছে। বলল, "বাজে কথা। জঙ্গল হলে বীজ পচে যায়। গাছের চারা মরে যায়। সব গাছ বীজ থেকে হয়ও না। গাছগুলো সব সমান দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ করেছিস? কোনও নিপুণ কারিগরের কাজ মনে হয় না?"

"হয়।" শ্রীপতি ঢোক গিলে বলল।

নৃপতি বলল, "আমি সত্যি জানি না দাদা। আমি লাগাইনি। মরণের সময় পাই না, গাছ লাগাব!"

ভূপতির এক কথা, "গাছ কেউ না লাগালে এভাবে বড় হয়!"

শ্রীপতি বলল, "লতাপাতায় গাছগুলি ছেয়ে ছিল বলে বোঝাই যায়নি, জঙ্গলে গাছ বড় হচ্ছে।"

সুনন্দা কেমন ভয় পেয়ে গেছে। "আমি সত্যি জানি না কাকা। আমি লাগাইনি। এ তো ভূতুড়ে কাণ্ড কাকা।"

মা'র চোপা শুরু, "তোমরা বুঝছ না কার কাজ! তোমার বাবা ছাড়া এমন দুর্মতি কার হবে! তিনি ছাড়া কে গাছ লাগাবেন! সারা জীবন জ্বালিয়েছেন। মরে গিয়েও বাড়ি ছাড়ছেন না। তিনি এখন আবার গাছ লাগাতে শুরু করেছেন। কত বড় অপদেবতাকে নিয়ে ঘর করেছি, নিজের চোখে দেখে বোঝো!"

ভূপতি বারান্দায় ফিরে এসে সবাইকে বলল, "আপাতত বণ্টননামা আর হচ্ছে না। বাবার গাছগুলিকে বড় হতে দাও। দেখি পরে কী করা যায়!"

ভূপতি সেদিন রাতেই কলকাতায় রওনা হয়ে গেল।

২৭ এপ্রিল ১৯৯৪

অলংকরণ: কৃষ্ণেন্দু চাকী
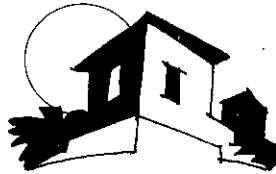
আধা-তেপান্তরের অদ্ভুত কাহিনী

হিমানীশ গোস্বামী

কাদাগোলার আজই ভয় দেখানোর প্রথম দিন।

কাদাগোলা হল ভূতের ছানা। আধা-তেপান্তরের মোটামুটি সচ্ছল অবস্থা এই গোলাবংশের। কাদাগোলার বাবা ছাইগোলা আর ছাইগোলার পেতনি খানদানি কুচকুচে বংশের মেয়ে। নামও মনে রাখার মতো— ঘোরামাবস্যা কুচকুচে। নামটা মনে রাখবার মতো হলেও এত বড় নাম বলে অনেকেই ভুলে যায়, তাই কেউ-কেউ ঘোরাবউদি বলে ডাকে, কেউ ডাকে ঘোরাদি। অন্য পেতনিরা তাকে কেবল ঘোরা বলেই ডাকে। অনেকে বলে ওঁর পুরো নামটা নাকি ভারী অলক্ষুনে! অলক্ষুনে কেন জানো? ওই নামটির মধ্যে দেখো 'রামা' কথাটা কেমন ঢুকে রয়েছে। আর রামা কথাটা যে ভূতেদের কানে খুব আরামপ্রদ হবে না, সেটা বোধহয় বুঝিয়ে না বললেও চলবে। বিয়ে হওয়ার পর যখন ঘোরামাবস্যা এলেন গোলাবংশের পেতনি হয়ে, তখন তাঁর স্বামী ছাইগোলা একটু আবদার করে বলেছিলেন, ''তোমার নামটা একটু বদল করে ঘোরাবণামাবস্যা করলে তোমার আপত্তি আছে?'' শুনেই তাঁর নতুন বিয়ে-করা পেতনির সে কী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। না, ঠাকুরদার দেওয়া নাম তিনি বদলাবেন না, কিছুতেই নয়।

ভূতেদের বাড়ি, খুব বড় নয়, তবে যেমন যেটুকু দরকার সেটুকু সাজানো-গোছানো রয়েছে। ভূতেদের বৈঠকখানায় আটরকম পচা গন্ধ ম-ম করছে। এখানে ছাই ওখানে ছাই, প্রতিদিন নতুন-নতুন কাদা এনে দেওয়ালে ছুড়ে ছুড়ে কেবল রাখা হয় তা নয়, মানুষের নর্দমা থেকে অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি বালতি-বালতি সেই জল দেওয়ালে আটকে থাকা কাদায় রাতের মধ্যে এগারোবার ছেটানো হয়। তা ছাড়া এ-কোণে ও-কোণে ভাঙা ইট, পাটকেল, পচাপাতার রাশি। নতুন-নতুন পচাপাতা এনে রাখা হয়। দেওয়ালে একটা বড় ছবি, রাবণের। ছবিতে দেখা যাচ্ছে দশমাথাওলা রাবণের চমৎকার চেহারা। রোজ এই ছবির সামনে দাঁড়িয়ে ছাইগোলা একটু জপ করেন। কী যে বিড়বিড় করে বলেন, তা অবশ্য বোঝা যায় না। তবে ভূতেদের মন্ত্রের শেষে ছ'বার রাবণ বলা হয়। এটা প্রাচীনকালের প্রথা। আজ এই বাড়িতে হইচই পড়ে গেছে কেন, তার বিবরণ একটু পরে দেব। কেউ-কেউ হয়তো প্রশ্ন করবে ভূতেরা অ্যালুমিনিয়ামের বালতি ব্যবহার কেন করে, তার কি কোনও বিশেষ কারণ আছে? খুবই চমৎকার প্রশ্ন। এর উত্তর হল, নিশ্চয়ই আছে। অ্যালুমিনিয়াম ছাড়া পেতলের, তামার বালতিও ব্যবহার করতে পারে ভূতেরা। তারা ব্যবহার করতে পারে না কেবল লোহা! লোহা ব্যবহার করলে কোনও ক্ষতি হয়, তার কোনও প্রমাণ নেই। কিন্তু প্রথাটি প্রাচীন, সেজন্য প্রাচীনপন্থী ভূতেরা লোহা ছোঁয় না। ছুঁলে কিছু হয় না, কিন্তু প্রাচীনপন্থীরা জানতে পারলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। সে প্রায়শ্চিত্ত বড় কষ্টকর ব্যাপার। কিন্তু সে-কথা থাক। আমরা শুরু করেছিলাম কাদাগোলার আজ ভয় দেখানোর প্রথম দিন— এই কথা বলে। কাদাগোলার বয়স একটু বেশি। সাত বছর পার হতে চলল, অথচ এর ভয়

দেখানোর হাতেখড়ি হয়নি। ভূতের বাচ্চারা সকলেই পাঁচ বছর চোদ্দো দিনের মধ্যে ভয় দেখানো শিখে যায় কিন্ডারগার্টেনে থাকতে থাকতেই। এমনও শোনা গেছে, তিন বছর একুশ দিন বয়সেই একটি ভূতের ছানা ভয় দেখিয়ে 'জিনেস বই'-এ নাম লিখিয়েছে। সাহেব ভূতেরা জিনেস বই বের করে প্রতি বছর। জিনেস বই হল জিন-দের বই। আসলে সবরকম ভূতের কার্যকলাপের শ্রেষ্ঠ বিবরণ এতে প্রকাশিত হয়। এই বইয়ে জিন, পরি, হরেকরকম ভূত, শাঁকচুন্নি, টাকচুন্নি, পেতনি এসবের বিবরণ তো থাকেই, তা ছাড়া থাকে গো ভূত, হামদো ভূত, পলটার জাইস্টদেরও নানা কীর্তিকলাপ। বইটার নাম যাতে বড় না হয়ে যায় সেজন্য সাহেব ভূত প্রকাশকেরা ওর ইংরেজি নাম দিয়েছে, 'জিনেস বুক অব রেকর্ডস'। এই বইতে নাম ওঠা ভয়ানক এক সম্মানের ব্যাপার। বাংলাদেশের যে কয়েকটি ভূতের নাম এই বইয়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে আছে সবচেয়ে ছোট ভূতের নাম। এই ভূত আবার এক নাস্তিককে ভয় দেখিয়েছে বলে তাকে বিশেষ সম্মানের স্থান দেওয়া হয়েছে। যখেরাও ভূতেদের দলে নাম লিখিয়েছে। তা টাকার জোরে কী না হয়! কাদাগোলাকে এতদিন ভয় দেখানো শেখানো হয়নি তার কারণ তার মায়ের আবদার। অন্য ভূতেরা যখন কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি হয় তখন কাদাগোলার মা বলেছিলেন, না, আমার কাদাগোলা সাধারণ ভূতদের সঙ্গে মিশে গোল্লায় যাবে? ও প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়বে বাড়িতে। তা প্রাইভেটে পড়ুক বা যাই করুক ইস্কুলে ভর্তি হতে গেলে একটা

কঠিন পরীক্ষা দিতে হয় প্রত্যেক ভূতের ছানাকে। সে হল ভয় দেখানোর পরীক্ষা। ভয় দেখানোর পরীক্ষা দু'রকম: একরকম হল থিয়োরেটিকাল; এটা মোটামুটি সহজ। দু'-চারখানা বই পড়তে হয়। অবশ্য বইগুলো খুব ছোট নয়। তা হলেও বুঝতে অসুবিধে হয় না। এছাড়া নোটবইও পাওয়া যায় প্রচুর। এই পরীক্ষা পাশ করলে তবে নেওয়া হয় প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা। এটা ভারী শক্ত পরীক্ষা। এটাতে পাশ করতে না পারলে ইস্কুলে ভর্তি হওয়ার আর কোনও আশা নেই। সেজন্য লেখাপড়া ভাল করে শেখানোর আগেই অনেক বাবা-মা বাড়িতেই নিজেদের ছানাপানাদের ভয় দেখানো শেখান। অনেক ছানাপানা চলে যায় বিশেষ প্রেপারেটরি স্কুল বোর্ডিং-এ। ভয় দেখানোর প্র্যাকটিকাল কোর্স বেশ বড়। সেখানে প্রথমে পাখিকে ভয় দেখানো শেখানো হয়, তাও চড়ুইপাখি কিংবা শালিখপাখি। এগুলো সাধারণ পাখি, সেজন্য বড়লোকের ছানারা প্রথমে ভয় দেখানো শেখায় ছোট্ট ছোট্ট মুনিয়া কিংবা বাজেরিয়ার, আর সবচেয়ে দামি হল মৌটুসি। এরপর আস্তে আস্তে পায়রা, ঘুঘু, মাছরাঙা, বক, মোরগ, হাঁস। তারপর চিল, শকুন, প্যাঁচা, ডাহুক, বাজ। এইভাবে আস্তে আস্তে পাখিদের ভয় দেখানোর পর ময়ূর, উটপাখি, অ্যালবাট্রস। সবচেয়ে অসুবিধে হয় টিয়া, ময়না এইসব পাখিদের ভয় দেখানো। টিয়া আর ময়না ভয় পেতেই চায় না। অনেক সময় তারা নিজেরাই ভয় দেখাতে চেষ্টা করে। সেজন্য ভূতের ছানারা কিছুতেই ময়না বা টিয়াপাখিদের একা-একা ভয় দেখাতে চায় না। নিজেরাই ভয়ে অস্থির হয়। আর-একটা মজার ব্যাপার আছে। সব পাখি অল্পবিস্তর ভয় পেলেও ধনেশ পাখিকে কিছুতেই ভয় দেখানো যায় না। সেজন্য দুষ্টু ভূত-ছানারা, যারা একটু বেপরোয়া, তাদের বলা হয় 'ধনেশ'! যেসব ভূতের ছানা ভয়ংকর সাহসের কাজ করে তাদের ধনেশ পুরস্কার দেওয়া হয়। বছরে মাত্র দু'-তিনটে ভূতের বেশি এরকম পুরস্কার পায় না। এই পুরস্কার দেওয়া হয়, কিন্তু গত তিন বছর তো কেউই পায়নি। তাতে ভূতদের পাক্ষিক পত্রিকা ঘোরপ্যাঁচ পত্রিকায় সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল: বাঙালি ভূতদের নানাদিকে অধঃপতন শুরু হইয়াছে। আজকাল আর সে রাত নাই। এককালে সমস্ত ভারতে বাঙালি ভূতেদের একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। মান ছিল, চাহিদা ছিল। বাঙালি ভূতেরা সর্বত্র মাথা নিচু করিয়া থাকিত (ভূতেরা মাথা উঁচু করাকে কাপুরুষের লক্ষণ মনে করে), কিন্তু এ কী হইতেছে? ক্রমশ বাঙালি ভূতেদের চরিত্র দুর্বল হইতেছে কেন? গত তিন বৎসর বাঙালি ভূতছানারা সাহসিকতার জন্য কোনও সোনা, রুপো কিংবা ব্রোঞ্জ আনিতে পারে নাই। ইহা চলিতে থাকিলে বাঙালি ভূতেদের ভবিষৎ যে তীব্র আলোকময় হইবে এমন কথা বলা বোধহয় অন্যায় বা অসংগত হইবে না ইত্যাদি।

পাখিদের ভয় দেখানো শেখার পর ভয় দেখানো শিখতে হয় চতুষ্পদদের। প্রথমে ইঁদুর, তারপর বেড়াল, তারপর কুকুর। তারপর শেয়াল, নেকড়ে, ডোরাকাটা বাঘ, সিংহ। এরপর ভয় দেখানো শিখতে হয় বানর এবং মানুষদের। আগে কম বয়সের দিয়ে শুরু; তারপর ধীরে ধীরে ষাট বছর পর্যন্ত মানুষ। বানরদের নিয়ে হয় মুশকিল। ওরা ভয় পেয়েছে কি না বোঝা যায় না, এর ফলে বানরদের ভয় দেখালেও এবং বানররা ভয় পেলেও যিনি পরীক্ষা নেন তিনিও অনেক সময় বুঝতে না পেরে হয় মার্ক বেশি দেন বানর ভয় পেলেও, কিংবা কম দেন এই মনে করে যে, বানর ভয় পায়নি। এজন্য প্র্যাকটিকাল পরীক্ষায় বানরকে ভয় দেখাতে হবে এইরকম প্রশ্নপত্র দেখলেই খুব সাহসী ভূতেরাও ভয় পেয়ে যায়। আর ফেল করলে আবার পরীক্ষা দাও। সে এক বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার!

আগেই বলেছি, কাদাগোলার আজই ভয় দেখানোর প্রথম পরীক্ষা। এতদিন তাকে পুতুপুতু করে রেখে দেওয়ায় তার বুক দুরদুর করছে। তার ইচ্ছে নয় যে, সে কাউকে ভয় দেখায়। তার মা তাকে কয়েক সপ্তাহ ধরে দু'জন দুর্ধর্ষ ভূত টিউটর হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন, যাঁরা ভয় দেখানোয় একজন তিনবার রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন, অন্যজন পেয়েছেন বিশ্ব ভূত পুরস্কার। এই ভূতদের চেহারাই

এমন যে, ভুতের ছানারা তাঁদের দেখেই গোঁ-গোঁ করে অজ্ঞান হয় আর কী। তাঁদের দৈনিক চোদ্দো কেজি করে কাঁচা হেড়িং মাছ, দশ কেজি পদ্মার ইলিশ আর তেরো কেজি পান্তা ভাত দিতে হয়েছে। নানারকম ভয় দেখানো শিখেছে কাদাগোলা, কিন্তু আত্মবিশ্বাস কিছুতেই আসছে না। মুশকিল হচ্ছে এই যে, একবার পরীক্ষা-অঞ্চলে ঢুকে গেলে আর তার সঙ্গে আত্মীয়স্বজন, টিচার বা অন্য কেউ থাকতে পারবে না। আগে থেকে যে কোশ্চেন আউট হবে তারও জো নেই। অ্যালুমিনিয়ামের পাতে যে মানুষকে ভয় দেখাতে হবে তার নাম এবং ঠিকানা লেখা হয়। এইরকম যতজন পরীক্ষা দেবে প্রত্যেকের জন্য একটা মানুষ স্থির থাকে। মানুষদের নাম এবং ঠিকানা লিখে একটা পরিষ্কার জলের পুকুরে ফেলা হয়। তারপর ভূতেরা, যারা পরীক্ষা দেবে, তারা ওই বিচ্ছিরি পরিষ্কার জলে জয় রাবণ বলে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রত্যেকে একটা করে চাকতি তুলে আনে। সেই চাকতিতে যে মানুষের নাম লেখা থাকবে, ওই ভূতকে তারপরের একুশ ঘণ্টার মধ্যে ভয় দেখাতে হবে, নইলে ফেল।

সবাই চায় যে মানুষের নাম [illegible] [illegible] প্রকৃতির হয়। [illegible] হয় আর বাড়িটা যেন খুব দূরে না হয়, ঠিকানাটা যাতে সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। এছাড়া যে ভূত পরীক্ষা নেবেন তাঁর প্রকৃতি যেন একটু নরম হয়।

পরীক্ষার দিন আজ। সন্ধে থেকেই তোড়জোড় চলছে ছোট ছোট ভূতদের বাড়িতে। কাউকে ভাল করে ধুলোয় গড়াগড়ি দেওয়ানো হচ্ছে। কারও কপালে লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে নোংরার টিপ। বাড়ি থেকে বেরনোর সময় বাড়ির লোকেরা সব 'রাবণ, রাবণ' বলে আশীর্বাদ করছে। যারা নাস্তিক ভূত তারা পর্যন্ত মনে মনে কাঁপছে, আবার কেউ-কেউ এতই নার্ভাস হয়ে পড়ছে যে, মাঝে-মাঝে হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে। তখন বাবা, মা, অভিভাবক সব চিৎকার করে বলছে, ''ওরে পচা ডিম কোথায় গেলি রে, ওরে পচা তাল দ্যাখা দে রে, এরকম করলে কী করে হবে রে! ভয় দেখানোটা খুব সোজা রে!'' আবার কোনও-কোনও ভূতের ছানা ভয় দেখানোটা আগে অভ্যেস করেনি, এখন শেষ মুহূর্তে 'চিঁ-চিঁ চাঁম চাঁমু দাম দামু চিঁচিঁ চিঁকাই পিঁকাই' করে বিকট আওয়াজ করছে। একজন মুখস্থ করবার চেষ্টা করছে।

তোঁর রঁক্ত মিঁষ্টি, ভাঁলই অনাছিঁস্টি
গুঁরগুঁরে মেঁঘ অঁমাবস্যায়, এলঁ ঝেঁপে বিষ্টি
দেঁখিস কীঁ রেঁ এঁদিক-ওঁদিক শূঁন্য পাঁনে দিঁষ্টি
এঁবার তোঁর মাঁংস-হাঁড়ে কঁরব মোঁরা ফিঁস্টি!!

এটা নাকি ভয় দেখানোর অব্যর্থ উপায়। ভয় দেখানোর 'লাস্ট মিনিট সাজেশন' বলে একটা বইতে এরকম আটাশটা মন্ত্র আছে। কাদাগোলাকে পুরো আটাশটা ছড়া মুখস্থ করানো হয়েছিল। মুখস্থ করেওছিল মোটামুটি। কিন্তু আজ সন্ধেয় ঘুম ভাঙার পর থেকে তার মাথাটা বেবাক ফাঁকা হয়ে গেছে। একটা মন্ত্রও মনে পড়ছে না। সে যে মন্ত্র স্বর ভুলে গেছে, সেটা কাউকে বলতেও পারছে না। বললেই তো বাড়িতে হাহাকার পড়ে যাবে। মা, তাকে বাড়ির সম্মান রাখতেই হবে। সে দু'-একটা মাত্র মনে আনবার চেষ্টা করল, কিন্তু একটাও মনে এল না। সে বলল, ''হে রাবণ, আমাকে রক্ষা করো। আমি যেন বাবা-মা'র মুখ কালো করতে পারি। হে রাবণ, তুমি আমার বুকে বাসা বাঁধো। হে রাবণ, আমাকে যেন সোজাসুজি একটা ভিতুরামকে ভয় দেখাতে দেওয়া হয়।'' বলেই কাদাগোলা তার দেড় মিটার জিভ বের করে বলল, ''এঁঃ, এঁঃ, ভুঁল কঁরে ভিঁতুরাম বঁলেছি, কীঁ হঁবে কেঁ জাঁনে। আঁসলে হঁবে ভিতু রাঁবণ! হেঁ রাঁবণ, আঁমাকে ক্ষঁমা কঁরো।''

ভূতেদের কথা সবসময় নাকি হয় না, কখনও-কখনও হয়, বিশেষ করে যারা ভয়ে-ভয়ে কথা বলে, আর শিশুদের। এ ছাড়াও কতগুলি তিথি আছে, সেসব তিথিতে ভূতেদের স্বর নাকি হতেই পারে। নাকিস্বরে কথা তাই আর বিশেষ করে লিখব না। চন্দ্রবিন্দুগুলো আমি কখনও-কখনও দিয়ে দেব। ভুলে গেলে খুশিমতো লাগিয়ে নাও। এরপরই কাদাগোলা ভ্যাঁ করে কেঁদে কেবলই রাবণ-রাবণ করতে লাগল, আর বলতে লাগল, ''আমি বাড়ি যাব, পরীক্ষা দেব না।'' কিন্তু লুকিয়ে-লুকিয়ে মন্ত্রের বই থেকে একটা পৃষ্ঠা ছিঁড়ে লুকিয়ে রাখল!

''পরীক্ষা দেব না, এ কী কথা?'' কাদাগোলার বাবা আর কাকা দু'জনে অনেক করে বোঝালেন। পকেট থেকে একটা ব্যাঙপোড়া পুরে দিলেন কাদাগোলার মুখে, সঙ্গে একটা বড় লঙ্কা। এতে নাকি ছোটদের সাহস বাড়ে, ব্যাঙের মতো লাফানোর শক্তি হয়, আর লঙ্কা খাওয়ানোর উদ্দেশ্য হল যাকে খাওয়ানো হচ্ছে তার যাতে রাবণের নামটা মনে পড়ে যায়। কেমন করে? ভূতগুরু পরম-পরম ব্রহ্মদৈত্য কুটিল কাটাল প্রায় সত্তর বছর আগে এই নিদান দিয়ে গেছেন, ভিতুদের সাহসী করার কাজে ব্যাঙপোড়া সবচেয়ে কাজের। সঙ্গে অবশ্য লঙ্কা, ছোটদের জন্য সবুজ কাঁচালঙ্কা, বড়দের জন্য পাকা লাল লঙ্কা আর বুড়োদের জন্য হলুদ আর কাঁচালঙ্কা। একই লঙ্কা যদি হলুদ রঙের আর সবুজ রঙের হয় তা হলে সর্বোত্তম, না হলে হলুদ রঙের লঙ্কার বোঁটার দিক, আর সবুজ রঙের লঙ্কার ডগার দিক খেলেই সাহস অনেকটা

বেড়ে যায়। তবে এই দাওয়াই ঘণ্টাতিনেকের মতো কাজ দেয়, নইলে আস্তে-আস্তে ধক কমে যায়। তখন আবার ব্যাঙপোড়া, আবার বিশেষ রঙের লঙ্কা খেলে তবে রক্ষা। কিন্তু পরীক্ষার আগে ভূতগুরুরা প্রত্যেক ছাত্রের পকেট সার্চ করে তবে ঢুকতে দেয়। তাই, যদি কেউ ঘণ্টাতিনেকের মধ্যে ভয় দেখানোর সুযোগ পায় তবে সে নির্ভীকভাবে ভয় দেখাতে পারে, নইলে নিজেই ভিতু হয়ে পড়ে। তবে কি বাঁ-পিটে ভূত নেই? তাও আছে। তাদের সংখ্যা কম। সাহসের জন্য তাদের ব্যাঙপোড়া আর লঙ্কা খেতে হয় না।

কাদাগোলা পরীক্ষা দিতে গেল বুক ফুলিয়ে। ব্যাঙপোড়া আর লঙ্কায় কাজ দিয়েছে। মনে-মনে উচ্চারণ করছে, "হে রাবণ, হে রাবণ আমাকে যেন কাছেই কোনও ভালমানুষ ভিতু-ভিতু মানুষকে ভয় দেখানোর ভার পড়ে। কাছাকাছি না হলে, মানুষের ঠিকানা খুঁজতেই তো কত সময় লেগে যাবে।" ভূত হলেও কাদাগোলার মনটা বেশ নরমই।

সকলেই একটা পরিষ্কার জলের পুকুরে লাফিয়ে চাকতি তুলে আনছিল। এক-একজনের মুখ খুশিতে কালো, কারও আবার মুখ ভয়ে উজ্জ্বল। কেউ ভয় দেখানোর ভার পেয়েছে কাছেই, কেউ দূরে। তবে আসার আগে প্রত্যেকেই ব্যাঙ আর কাঁচালঙ্কা খেয়েছে, সেটা বোঝা যায়। পরীক্ষাকেন্দ্রের কাছাকাছি অন্তত চার-চারটে ব্যাঙপোড়ার দোকান নতুন গজিয়ে উঠেছে। সঙ্গে কাঁচালঙ্কা। এক-একটা কাঁচালঙ্কার দাম মানুষের হিসেবে প্রায় দু' টাকা হবে।

"হে রাবণ, রাবণ গো!" বলে কাদাগোলা পরিষ্কার জলে ঝাঁপ দিল। প্রায় তিনশো ভূতের ছানা এর আগে ঝাঁপ দিয়েছে, তাই জল আর পরিষ্কার নেই, তাতে কাদাগোলার খুব একটা খারাপ লাগল না। সে এক ডুবে চাকতি খুঁজে পেল না। দ্বিতীয়বার ডুব দিতে হল। কী ভাগ্যিস, দ্বিতীয়বারেই চাকতি খুঁজে পেয়েছে একটা, নইলে তৃতীয়বারেও যদি চাকতি না পেত তা হলে ফের পরদিন আবার আসতে হত, নতুন পরীক্ষার ফি দিতে হত।

সে চাকতিটি পড়ে দেখল, তাতে নাম লেখা আছে ঐশ্বদীপ্ত লাহিড়ি। ঠিকানা কলকাতার দক্ষিণ অঞ্চলে পাতাল রেলের কাছে। চাকতিতে একটা ম্যাপও দেওয়া আছে। কলকাতা খুব দূরে নয়। সারারাত প্রতি একচল্লিশ মিনিটে একটা করে হুশ এক্সপ্রেস সেখানে যায়। ভাগ্য ভাল আসানসোল কি অসম নয়। কলকাতা আবার কাদাগোলার খুব পরিচিত জায়গা। তার দু'-একজন আত্মীয় থাকে কলকাতায়। কলকাতা আগে ভাল ছিল না। এখন খুব অন্ধকার করে রাখা হয় বহু জায়গায়। তা ছাড়া নিত্যনতুন ভূতের নেত্য হয় সেখানে। কত দেশের কতরকম ভূত! তাদের কতরকম নাচ! সে কয়েকবার কলকাতায় এসে ভূতের নাচ দেখেও গেছে।

কাদাগোলা বলল, "রাবণ, রাবণ!" বলে হুশ এক্সপ্রেসের টিকিট কিনে আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেল দক্ষিণ কলকাতার ওই নির্দিষ্ট জায়গায়। কিন্তু তার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। ভেবেছিল জায়গাটা অন্ধকারে ভরা থাকবে। এখানেই ঐশ্বদীপ্ত থাকে। চাকতিতে লেখা দেখল বয়স মাত্র সাত। সে আরও খুশি হল। সে খুশির সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে, এই যাঃ ট্রামলাইনে তার পা ছুঁয়ে গেল। কী সব্বনাশ! লোহার সঙ্গে ছোঁয়া লেগেছে। কী হবে? সে বলল, "রাবণ, রাবণ! পরীক্ষার আগে এ কী দুর্ঘটনা!" সে জানে তার পরীক্ষকমশাই আনাচে-কানাচে কোথাও আছেন। থাকতেই হবে, কিন্তু আলোর তেজে কাদাগোলা কাউকে দেখতে পেল না। সে বুঝতে পারল না তার ওই লোহা ছোঁয়া কেউ দেখে ফেলেছে কি না! বিশেষ করে তার পরীক্ষক দেখলেই তো চিত্তির! কালীঘাট স্টেশনের কাছেই বাড়িটা। বাড়িটা চারতলা। রাত তখন সাড়ে তিনটে হবে। রাতটা খুব গরম। সে রাতেই ঐশ্বদীপ্ত, ওরফে ভজু তার বন্ধু পাণ্ডুর বাড়িতে চাররকম মাছ আর দু'রকম মাংস দিয়ে পেট পুরে খেয়ে এসেছে। এত বেশি তার খাওয়া উচিত হয়নি। তার ওপর তিনটে বাঘা-বাঘা আইসক্রিমও সে শেষ করেছে। তাই ঘন ঘন তার ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল জলতেষ্টায়। তার ওপর সে বিদঘুটে সব স্বপ্ন দেখছিল। নাঃ, অত না খেলেই হত। সে মনে মনে ভাবল। একটু আগে

সে ভূতের কী একটা স্বপ্ন দেখে ভয়ে চেঁচিয়েও উঠেছিল।

বাইরের দিকে সে তাকাল। বাড়ির সামনে সার-সার গাছ। দেবদারু গাছ। বাইরে তীব্র আলো। রাস্তা একেবারে ফাঁকা। টং করে আওয়াজ হল। ভজু তার বালিশের তলা থেকে টর্চ নিয়ে ঘড়িতে দেখল। দেড়টা বাজল। রাস্তা দিয়ে দু'-একটা মোটরগাড়ি, লরি হুড়মুড় করে চলেছে। হঠাৎ ঝপ! কী অন্যায়, লোডশেডিং হয়ে গেল যে! ঘুমও খুব পাচ্ছিল, সে খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়েই ঘুম।

ঠিক এই সময় জানলার বাইরে এসে পৌঁছল কাদাগোলা। ঠিকানা অনুযায়ী এসেছে ঠিকই সে। এবার তার ভয় দেখানোর কাজ। ব্যাঙপোড়া আর লঙ্কার প্রভাব এখনও আছে। সে ভয় পাচ্ছে না। সে জানলার বাইরে থেকে বলল, ''এঁই ঐঁশ্ব! ঐঁশ্ব? উঁঠে এঁকটু বৈঁসসো।'' তার দেখে ভাল লাগল জানলায় গরাদ নেই।

আর ভজুর মনে হল, সে স্বপ্নই দেখছে। স্বপ্নে লোকের অনেক সময় সাহস বেড়ে যায়। ভজু বলল, ''তুই কে রে?''

কাদাগোলা বলল, ''আঁমি তোঁর যঁম! আঁজ আঁমি তোঁকে খাঁব।''

হি-হি করে ভজু বলল, ''তা বেশ তো খাবি বই কী। তা কী দিয়ে খাবি?''

কাদাগোলা ভাবল, এ আবার কেমন মানুষের ছা। ভয় নেই এর? এদিকে জানলার ভেতর দিয়ে সে ইচ্ছে করলেই ঘরে ঢুকে যাচ্ছেতাই কাণ্ড করতে পারে, কিন্তু পরীক্ষার নিয়ম অনুযায়ী ভয় দেখাতে হবে অন্তত দশ ফুট দূর থেকে, নইলে ফেল। সে বলল, ''আঁমি ভূঁত।''

ভজুর সাহস বেড়ে গেছে। সে বলল, ''তা বেশ তো! ভূত কখনও দেখিনি আমি। ভেতরে আয়, দেখব তোকে। মা বলে কী জানো ভাই, আমার চেহারা নাকি ভূতের মতো হয় চানটান না করলে। তা ভূত তো কখনও দেখিনি, এবার দেখি।''

কাদাগোলার তখন খুব খারাপ লাগছে। সে শুনেছে মানুষরা ভূতের নাম শুনেই অনেকে অজ্ঞান হয়ে যায়। দেখা হলে মরেও যায়। সে ভাবল একবার দেখা দিতে হয়। ভূতদের একটা ব্যাপার আছে, তারা ইচ্ছে করলে মাসে দু'-একবার দৃশ্যমান হতে পারে। খুব প্রয়োজনেই তা করা যায়।

কাদাগোলা কী একটা মন্ত্র পড়ল, দু'বার তার দুটো হাত খুলে আবার জোড়া লাগাল, তারপর দৃশ্যমান হল।

ভজু বলল, ''বাঃ, বেশ তো! চমৎকার চেহারা। তবে ডান হাত বাঁ দিকে আর বাঁ হাত ডানদিকে কেন, আর চেহারা অমন বদখদ কেন? চোখ দুটো ঠেলে সাত ইঞ্চি বেরিয়েছেই বা কেন? ছিঃ।''

''ছিঃ মানে? তুমি ভয় পাচ্ছ না?''

ভজু বলল, ''অমন বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে তোমাকে। চোখ দুটো কোটরে ওদের নিজের জায়গায় নিয়ে যাও। আর হাতবদল করো। দেখতে যে কী বিচ্ছিরি লাগছে কী বলব!''

কাদাগোলা বলল, ''আমি তো ইচ্ছে করেই অমন করেছি। তোমাকে ভয় দেখাব বলেই তো এসেছি সেই কতদূর থেকে হুশ এক্সপ্রেসে করে।''

''হুশ এক্সপ্রেস? সেটা আবার কী?''

''সেসব ভূতেদের ব্যাপার, তুমি বুঝবে না।''

''আমি বুঝতেও চাই না!'' ভজু বলল, ''আমার বয়েই গেছে।''

''রাগ করলে ভাই?'' কাদাগোলা বলল। তারপরেই সে বুঝল এসব ঠিক হচ্ছে না। ভয় দেখানো তার এখন দরকার। এটাই তার কাজ। কিন্তু ছেলেটা যেন কী! আমার এই বিচ্ছিরি চেহারা দেখেও সে ভয় খাচ্ছে না। সে তখন এদিক-ওদিক তাকিয়ে পকেট থেকে চিলতে কাগজটা দেখে চিৎকার করে বলতে লাগল:

তোর রঁক্ত মিষ্টি, ভাঁলই অনাছিষ্টি
গুঁরগুঁরে মেঁঘ আঁমাবস্যায়, এলঁ ঝেঁপে বিষ্টি
দেঁখিস কীঁ রেঁ এঁদিক-ওঁদিক শূঁন্য পাঁনে দিঁষ্টি
এঁবার তোঁর মাঁংস-হাঁড়ে কঁরব মোঁরা ফিঁস্টি।

কিন্তু ভজু বলল, ''বাঃ, বেশ তো, তা এত

চিৎকার করছ কেন? এটা বেশ সুর করে গাওয়াও যায়। কথাগুলো ভারী চমৎকার।''

কাদাগোলা এবার সত্যি-সত্যি ঘাবড়ে গেল। সে বলল, ''তোমার কিছু মনে হচ্ছে না?''

''কী মনে হবে?''

''ভয়। ভয় পাচ্ছ না তুমি?''

''ভয় পাব কেন? তোমাকে আমার তো খুব বিপজ্জনক বলে মনে হচ্ছে না। তুমি বুঝি সত্যিই ভূত?''

''হ্যাঁ।'' কাদাগোলা বলল, ''সত্যিই ভূত।''

''বেশ তো। কিন্তু সত্যি ভূত, না মিথ্যে-মিথ্যে সেজে এসেছ? সত্যি ভূতরা তো ভয়ানক হয়।''

''সত্যি ভূত। আমি ভয়ানক!''

ভজু বলল, ''তা তোমাকে তো ভয়ানক বলে মনে হচ্ছে না! তুমি আমার বন্ধু হবে? আমার একটা বন্ধুও ভূত নয়।''

''বন্ধু? কাদাগোলার গলায় কী যেন বেধে গেল।'' আস্তে আস্তে বলল, ''না ভাই, তা হয় না।''

''কেন?''

''আমি তোমাকে ভয় দেখাতে এসেছি। ভয় দেখালে তবে আমি পাশ হব। ভয় করছে না তোমার?''

''ভয় হবে কেন?''

''আমার ভারী দরকার। তুমি ভয় না পেলে আমি ফেল করব।''

''ঠিক আছে। আমি ভয় পাব। ভারী ভয় পাব। তোমার তাতে যদি সুবিধে হয় তাতে আমার আপত্তি নেই। তবে আগে বলো তুমি আমার বন্ধু হবে?''

কাদাগোলা আর কী করে! সে আস্তে আস্তে বলল, ''আচ্ছা।''

''তা হলে আমরা বন্ধু?''

''বন্ধু।''

''তুমি রোজ রাত্তিরে আসবে?''

''রোজ না হলেও অমাবস্যায় অমাবস্যায় ঠিক আসব।''

''এইবার তোমাকে একটা জিনিস দেখাই।''

বলতে-না-বলতে বাইরে বিদ্যুতের আলো এসে গেল।

কাদাগোলা বলল, ''উঃ, বড্ড কষ্ট হচ্ছে। জানলা বন্ধ করে দাও, এক্ষুনি! বড্ড আলো।''

''তা হলে ঘর অন্ধকার হয়ে যাবে যে!''

''বাঃ, অন্ধকার তো ভাল। তোমার অন্ধকার ভাল লাগে না?''

''ঘুমনোর সময় ভাল লাগে। তা হলে তোমাকে কেমন করে দেখাই? একটা কলের খেলনা।'' বলে ভজু তার একটা খেলনা অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বের করল।

''তোমার নাম কী ভাই?''

''আমার নাম কাদাগোলা। আমার বাড়ি আধা-তেপান্তরে।''

''নামটা, নামটা...।''

''বিচ্ছিরি তো?''

''না, না, ভালই তো।'' ভজু বলল। তারপর বলল, ''আমি ছোট্ট একটা আলো জ্বালাই? তোমার তাতে কষ্ট হবে না।''

''জ্বালো।'' কাদাগোলা বলল।

কাদাগোলার সাহস কমে আসছে, সে বুঝতে পারছে। সে বলল, ''তুমি ওসব পরে দেখিয়ো, আগে ভয় পাও।''

''আমি ভয় পেয়েছি।''

কাদাগোলা বলল, ''যাক, তা হলেই হল। এবার কী দেখাবে বলছিলে, কী খেলনা?''

ভজু খেলনাটা বের করল, একটা দোতলা বাস। প্রায় আধ মিটার উঁচু। ব্যাটারিতে চলে। সেটা দূর থেকে বোতাম টিপে চালানো যায়।

কাদাগোলা দূর থেকে বাস চালানো দেখে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল। কোনও মতে সে বলল, ''কী ভয়ানক, কী ভয়ানক!'' আসলে তার ব্যাঙপোড়া আর কাঁচালঙ্কার প্রভাব কমে আসছিল।

''ভয়ের কিছু নেই এতে। পরে বুঝিয়ে দেব।''

''আমি আজ চলি ভাই। সকাল হওয়ার আগেই পৌঁছতে হবে। তার আগে তুমি বলো, তুমি ঠিক ভয় পেয়েছ তো? তুমি ভয় না পেলে আমি ফেল করব।''

"আমি ভয় পেয়েছি ভাই কাদাগোলা। ভারী ভয় পেয়েছি। তবে বন্ধু, তুমি এরপর এসো। অমাবস্যায় অমাবস্যায় আসবে তো?"

"চলি ভাই। ভারী আনন্দ হল। অমাবস্যায় ঠিক আসব।" এরপর আর তাকে দেখা গেল না।

ভজু হঠাৎ যেন জেগে উঠল। সে দেখল সে বিছানা ছেড়ে মেঝেতে গড়াচ্ছে। ভজুর মা দরজা খুলে আলো জ্বেলে বললেন, "কীসব বকবক করছিলি? মনে হচ্ছিল যেন কার সঙ্গে কথা বলছিলি?"

"ঠিকই তো! কাদাগোলা এসেছিল মা! আমার বন্ধু। সে একটা ভূত।"

"হ্যাঁ, ভূত!" মা বললেন, "ইয়ার্কির আর জায়গা পাসনি? যা, বিছানায় শুয়ে থাক। এখন প্রায় চারটে বাজে, আলো হয়ে আসছে।"

"আচ্ছা মা। ঘুমোব।"

তারপর বলল, "আমার বন্ধুর নাম শুনলে না? আমার ভূত-বন্ধুর নামটা বেশ। কাদাগোলা!"

মা বললেন, "আবার বাজে কথা?"

১৪০১

অলংকরণ: সুব্রত চৌধুরী

চাঁপাগাছের দোলনা

অনিতা অগ্নিহোত্রী

গাছটা একটা হলুদ পাতা ঝরাল। বৃষ্টিতে চান করে উঠেছে গাছটা। এলোমেলো হাওয়ায় বুঝি শীত করে তার! জলে ভেজা পাখির শরীর থেকে যেভাবে একখানা রঙিন পালক খসে পড়ে, পাতাটা সেভাবে উড়তে উড়তে নীচে এল। বোধহয় গাছতলার সোঁদা মাটিতে, ভেজা ঘাসের মধ্যে ডুবে যেতে তার ইচ্ছে করল না। পাতাটা তাই আহ্লাদ করে গিয়ে বসল দোলনার ওপর।

চাঁপাগাছের ডালে বাঁধা দোলনা। গতকালই আকিম আর বুয়াম দুই ভাই মিলে এটা তৈরি করেছে। আকিম প্রথমে একরাশ হালকা ডাল ছোট করে কেটে জংলি ঘাটে বেঁধে সমান সপাট করতে চেষ্টা করছিল। বুয়াম এসে সেটা বাতিল করে দিল, ''পলকা হচ্ছে রে আকিম, ওতে ভার সইবে না।''

সৈরিদিদিদের রান্নাঘরে একটা আমকাঠের তক্তা অনেকদিন ধরে পড়ে আছে। কোনও কাজে লাগে না। এক কোনায় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো। বুয়ামের মনে ছিল, দেখেছে অনেকবার। সেই তক্তাটাকে ভাল করে 'সাবাই' ঘাসের দড়িতে বেঁধে গাছে টাঙানো হয়েছে। বুয়াম অবশ্য আকিমের চেয়ে ঢ্যাঙা। তবুও ওই দোলনা উঁচু ডালে টাঙানো তার একার কাজ নয়। দিঘাইকাকা নিজেই এল শেষটায়। আকিম তরতর করে পলকা ডালটায় চড়ে দড়ি ঝুলিয়ে দিল নীচে। এই করতে সন্ধে।

লক্ষ্মণ মাঝির তেলকল থেকে ভাল সরষের তেল আনবে বলে আকিম সকালে বেরিয়েছে। ঘুম থেকে উঠে, দাঁত মেজে, মুড়ি খেয়ে, রান্নাঘরের সামনের পাথরে ঘষে মা মৌরলা মাছ বাছছেন। আকিমকে ভাঁড় থেকে টাকা বের করে দিল বুয়ামই। মায়ের হাত জোড়া বলে। কাল প্রায় সারারাত বৃষ্টি হয়েছে, না হলে এই সকালেই তেড়েফুঁড়ে উঠত রোদ। আজ রোদের হলুদ রং আছে, ঝাঁজ নেই। আকিমের হাঁটতে ভাল লাগছে।

ঝিমধরানো বৃষ্টির পর যেন আড়ামোড়া ভেঙে উঠে বসেছে আরাসু গাঁ। ভাদ্রের মাঝামাঝি। আগামীকাল নবান্নের পরব। মাঠে মাঠে 'আশু' ধান ফলে উঠেছে। এই ধানের চারাগুলো বেঁটেখাটো। ধানের দানাগুলোও ছোট্ট-ছোট্ট। আরাসু গাঁয়ের মানুষ বলে 'বুঢ়া ধান'। আষাঢ়ের গোড়ায় বীজ ছিটিয়ে দিলে ভাদ্রের মাঝামাঝি পেকে ওঠে। তখন গাঁয়ে গাঁয়ে নবান্নের উৎসব। নবান্নের দিন পায়েস হবে, চালের গুঁড়োর পিঠে ভাপিয়ে তৈরি করা হবে, তার মাঝখানটায় থাকবে নারকোল-গুড়ের পুর।

তারকেশ্বর মেহের তার হাটতলার দোকানে অনেক নারকোল নিয়ে বসেছে। এ অঞ্চলে নারকোল বিশেষ হয় না, সমুদ্রের ধারের জায়গা থেকে বায়না দিলে তবে আনানো যায়। সৈরিদিদি গতকাল নারকোল দিয়ে গেছে দুটো, না হলে আকিম নিশ্চয়ই তেলের ফেরত পয়সায় কিনত। মা অবশ্য কিছুই বলেননি ওকে।

পায়ে-চলা পথটা ওদের পাড়ার মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে গিয়ে কুমোরপাড়া ডান হাতে রেখে পাইকডাঙার মস্ত মাঠ পেরিয়ে পাকা সড়কে পড়েছে। কুমোরপাড়ার মুখেই লক্ষ্মণ মাঝির

[illegible]কাল। ধান বেশিদিন হল বসেনি। লোকে বলে, লক্ষ্মণ মাঝি টম্যাটো আর ফুলকপি চালান দিয়ে খুব টাকা করেছে। আরাসু ও আশপাশের গাঁয়ে শ্রীমন্ত চাষিরা অনেকদিন থেকেই সরষে ফলায়। শীতের দিনে ঝকঝকে নীল আকাশের নীচে সরষের একটানা হলুদ চোখে নেশা ধরিয়ে দেয়। এতদিন অন্য জেলা থেকে পাইকার গোরুর গাড়ি বোঝাই করে কিনে নিয়ে যেত। আজকাল লক্ষ্মণ মাঝি নিজেই কিনে নেয়। ফলে সকলেরই সুবিধে। ইটের দেওয়াল, টালির ছাদ দেওয়া দোকান। একটু দূরে তেলের ঘানি। টিনের চালা। মেশিন চলার ঘড়-ঘড় ঘ্যান-ঘ্যান শব্দ। সরষের বস্তা, ডাঁই-করা খোলের পাহাড় থেকে বেরনো ঝাঁজ দূর থেকে নাকে লাগে। বেশ গন্ধটা।

আসার সময় তেলের খালি বোতলটা ঘোরাতে ঘোরাতে আনছিল আকিম, দড়ি বাঁধা বোতল। ফেরার সময় সাবধানে, না দুলিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বাড়ির কাছে, খিড়কি দুয়ারের একটু আগে বৈষ্ণবদের বাগানের ভাঙা পাঁচিল। ঝোপঝাড়, আম, অর্জুনের ঝাঁকড়া গাছ। আকন্দ আর ধুতরোর ঝোপে দিনমানে ঝিঁঝি ডাকছে। একটা নিচু সবেদা গাছের পাশে চাঁপার গাছটা। এখানেই পাঁচিলটা পুরো ভাঙা। সেইজন্য রাস্তা থেকে সোজা পায়ে হেঁটেই গাছটার কাছে চলে যাওয়া যায়। এবার অকালে বর্ষা হয়েছিল, বৈশাখের শেষে। কী বৃষ্টি, কী বৃষ্টি! কত যে পাখির বাসা ভেঙেচুরে পড়েছিল ওই বৈষ্ণববাগানে, কত কচি ডাল ঘাড় মটকে ঝুলে ছিল। গাছগুলোকে দেখে মনে হচ্ছিল কেউ যেন ঝুঁটি ধরে নেড়ে দিয়েছে তাদের। বৃষ্টিতে অনেক চাঁপাফুলও অসময়ে ঝরে পড়ে গিয়েছিল। খালি হয়ে গেল গাছটা। অথচ গাছের নীচে জলে ভেজা চাঁপার গন্ধ অনেকদিন ধরে পাওয়া যেত, মনখারাপের মতো কাছে ঘেঁষে থাকা গন্ধটা। এখন গাছটা তার ডালপাতার ফাঁকে হিসেবির মতো দু'-একটা ফুল অনেক ভেবেচিন্তে লুকিয়ে রেখে দিয়েছে। কাউকে দেবে না। অবশ্য যদি সত্যি কোনও রাজকন্যা হঠাৎ গাছতলায় এসে দাঁড়ায়, তা হলে মত বদলালেও বদলাতে পারে।

হলুদ পাতাটা দোলনার মাঝখানে বেশ মৌরসিপাট্টা গেড়ে বসেছিল। তেল আনতে যাওয়ার সময় আকিম ওকে দেখে গেছে। এখন, বাড়ি ফেরার মুখে, আকিম একনজর তাকিয়ে দেখল পাতাটা নেই। কোথাও উড়ে-টুড়ে গেছে হয়তো। আর তখনই সেই অদ্ভুত ব্যাপারটা ঘটল। দোলনাটা দুলে উঠল। প্রথমে আস্তে, পরে বেশ জোরে। কেউ সত্যি বসে দুললে যেমনটি হওয়ার কথা। অথচ কেউ নেই।

ডান হাত দিয়ে ভাল করে দু'চোখ মুছে নিল আকিম। তেলের ঝাঁজে ওর দু'চোখ জ্বালা করে উঠল তখনই। নাঃ, সত্যিই কেউ নেই। তবে কি...? গা-টা শিরশির করে উঠল আকিমের, কানের কাছটা গরম গরম ঠেকল। তারপরই মনে মনে 'ধ্যাত' বলে ও পাঁচিলের ভাঙাচোরা ইট ডিঙিয়ে গাছটার কাছে গেল। বোতলটা নীচে রেখে দু'হাতে ধরে দোলনাটাতে থামাতে চেষ্টা করল। কানের কাছে খিলখিল হাসি। ছোট্ট ছেলেকে কাতুকুতু দিলে যেমন হাসতে পারে, সেইরকম। আশ্চর্য! দোলনাটা থেমে গেল। তুড়ুক করে যেন নেমে পড়ল কেউ, কারণ হালকা লাগল হাতে। তারপর আকিম চোখ গোল গোল করে দেখল, ওর তেলের বোতলটা আপনা থেকেই ওপরে উঠে গেল, আর দুলতে দুলতে যেতে লাগল। অবাক হলেও বুদ্ধি হারায়নি আকিম।

"এই, এই দুষ্টু, কে আমার বোতল নিয়ে যাচ্ছিস?" বলে এক দৌড়ে গিয়ে ও খপ করে ধরল বোতলের ওপর হাতটা যেখানে থাকার কথা, সেইখানটায়, বেশ শক্ত মোচড় দিল, দুটো-তিনটে চড়-চাপড়ও কষিয়ে দিল আন্দাজে। হাতে নরম ঠেকল, অথচ কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না!

এবার ফোঁপানোর শব্দ এল, যেন কেউ কান্না চাপছে, পিছিয়ে যেতে লাগল শব্দটা।

"আরে, কী হল? তোমার লাগল?"

কোনও উত্তর নেই।

রাস্তার ওপরে একটা বড় বটগাছ। মনে হল ছোট ছোট পায়ের আঁকাজোঁকায় কে যেন ধুলো ওড়াচ্ছে গাছতলায়।

নাঃ, বলা না বলা তো রয়েই গেল।

বাড়ি চলে এল আকিম।

মা ততক্ষণে চান-টান করে কাচা জামাকাপড় মেলে দিয়ে রান্না চড়িয়েছেন। বোতলের তলার দিকে লেগে থাকা ধুলো দেখে একটু ভুরু কোঁচকালেন। কিন্তু কিছু বললেন না। বুয়াম নিজের টিনের বাক্স খুলে বসেছিল। পরশুদিনের পরের দিন ও সাধপুরের স্কুল হস্টেলে ফিরে যাবে। এবার সঙ্গে নেবে শীতের আলোয়ান, একটা কাঁথা, নিমের দাঁতন, একটা আয়না, নতুন চিরুনি এইসব। বাক্স গোছাচ্ছে আগেভাগে।

আকিম ঘরের ভেতরে বসে ওকে ফিসফিস করে চাঁপাগাছের দোলনার গল্পটা বলল। যত কথা আকিমের দাদারই সঙ্গে, যদিও মাঝেমধ্যেই ঝগড়া, খুনসুটি লেগেই যায়।

বুয়াম শুনে গম্ভীর মুখে বলল, "এটা ভুত। বাচ্চা ভুত। তুই তেল আনতে গিছিলি তো? সরষের মধ্যে ভুত থাকে। দেখি তোর গায়ে মাথায় ঘানির সরষে লেগে আছে কি না?" বলে আকিমের চুল টেনে, জামা ঝেড়ে দেখল।

"যাঃ, সরষের মধ্যে যদি ভুত থাকে, তবে তো লক্ষ্মণ মাঝির বাড়ির চৌহদ্দিতে কিলবিল করবে ভুত! ভুতের ভিড়ে সরষে খেতের ধার দিয়ে তো হাঁটাই যাবে না!" আকিম দাদার কথাটা মানতে পারল না মন থেকে। তা ছাড়া ও তো শুনেছে, তেলের গন্ধে ভুত পালায়। এ আবার বোতল নিয়ে পালাচ্ছিল। তবে কোনটা সত্যি?

সেদিনটা একরকম কেটে গেল। বিকেলের দিকে নদীর ধারে গিয়েছিল আকিম। সৈরিদিদির বাবা দিঘাইকাকা, কাকার বন্ধু ঘনশ্যাম দাস দু'জনে ছিপ ফেলে বসে ছিলেন সারাদিন। কী মাছ উঠেছে দেখতে গেল আকিম আর বুয়াম। ঘনশ্যাম দাস এত কথা বলেন যে, মাছ পালিয়ে যায়। তাই নিয়ে দিঘাইকাকা বিরক্ত হন।

সারাদিন দু'জনে কিছু না পেলেও, সন্ধের মুখে কয়েকটা চারা পোনা, বাটা এইসব উঠল। আকিম জল-কাদা ঘেঁটে এত লাফালাফি করছিল যে, ভুতের কথাটা ওর মনেই ছিল না।

পরের দিন সকালে হলুদপাতায় মুড়ে গরম জলের ভাপে পিঠে সেদ্ধ করতে বসাচ্ছেন আকিমের মা, এমন সময় একটা শব্দ। স্-স করে কে যেন জিভের জল টেনে নিল। আকিমের মায়ের মাথার পেছনে দুটো চোখ আছে, নানারকমভাবে দুষ্টুমি করতে গিয়ে ধরা পড়ে আকিম এটা বুঝে গেছে।

"অ্যাই!" বলে মা পেছনে তাকালেন।

আকিম আর ওদের বোন কুরুম তখন চালের গুঁড়ো গুলে বারান্দায় এতোল-বেতোল আলপনা দিচ্ছে। বুয়াম চানে গেছে।

কেউ তো নেই! আওয়াজ করল কে!

"তুই শব্দ করলি?" মা জিজ্ঞেস করলেন আকিমকে।

"না তো!" বলেই আকিম বুঝল ওর বুকের মধ্যে ধড়াস শব্দ হল।

একটু পরে ভ্যাঁ করে উঠল কুরুম। পিঠে হয়ে গেছে ততক্ষণে। থালায় নিয়ে বসার তর সয় না মেয়েটার। ও আগেভাগেই একখানা হাতে তুলে নিয়েছে রান্নাঘরের দাওয়া থেকে। কিন্তু পেছন ফেরার আগেই হাত খালি। কে যেন ওর মুঠি ছাড়িয়ে নিয়ে গেল পিঠেটা। অত কথা কি আর কুরুম গুছিয়ে বলতে পারে, তিন বছরের মেয়ে তো? রান্নাঘরের পেছনে সজনে আর কুলগাছের মাঝখান থেকে খিকখিক হাসি শুনে আকিম বুঝতে পারল, ছেলেটা, মানে ভুতটা খালি দুষ্টু নয়, হ্যাংলাও। কিন্তু এর সঙ্গে কি আর কুস্তি করা যায়?

গুম হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে গতকালের চাঁপাগাছতলার ঘটনাটা বলল আকিম। মা'র কাছ থেকে লুকনোর কোনও মানে হয় না এখন।

ভয়-টয় কিছু পেলেন না মা, কেবল জিজ্ঞেস করলেন, "বোকা ছেলে, কাল বলবি তো!"

একটা মাটির ভাঁড়ে আলপনা দেওয়ার চালের গুঁড়ো ছিল। মুঠো মুঠো গুঁড়ো ছড়ালেন মা আঙিনায়। তারপর তার কাছেই একটা পেতলের রেকাবিতে পাঁচ-ছ'টা পিঠে সাজালেন। মায়ের ঠোঁটের ওপর আঙুল, কাজেই আকিম সতর্ক হয়ে আছে, কুরুম হাতের পিঠ দিয়ে গাল বেশ ভাল করে মুছে আর

একটা পিঠে খাচ্ছে, এমন সময় টুকটাক করে আনাড়ি হাতে পিঠেগুলো তুলে নিল কেউ, রেকাবিটা পড়ে রইল। আকিম অবাক হয়ে দেখছে চালের গুঁড়োর ওপর ছোট্ট ছোট্ট পায়ের দাগ। আকিমের চেয়ে ছোটই হবে ভূতটা, তবে কুরুমের চেয়ে বড়। চান করে নদী থেকে ফিরে বুয়াম তো একেবারে অবাক! ভিজে চুলগুলো ওর একেবারে খাড়া-খাড়া হয়ে উঠেছে।

একেবারে সত্যি ভূত, দিনে-দুপুরে ওদের বাড়ির মধ্যে। যদি স্কুলে গল্প করে, সায়েন্স-এর সার জগদীশ মিত্র মাথায় গাট্টা মারবেন নিশ্চয়ই। কিন্তু অন্য ছেলেরা! তারা গোল হয়ে বসে বুয়ামের গল্প শুনবে, আর ''আরও বল, আরও বল,'' বলে টানাটানি করবে ওকে ধরে! দারুণ মজা হবে।

আকিমের মনে কিন্তু শান্তি নেই। কই, মা তো একটুও অবাক হল না, ভয় পেল না। এমন ভাব যেন ছেলেটা, মানে ভূতটার সঙ্গে কতদিনের চেনা। ব্যাপারটা কী? একটু হিংসেও যে হল না, তা নয়।

সন্ধেবেলা নারকোল কুরুনিটা ফেরাতে গেছে সৈরিদিদির বাড়ি, দেখে সৈরিদিদি তেঁতুলগাছ তলায় পা ছড়িয়ে চুপচাপ বসে আছে। চুলগুলো এলো, পিঠের ওপর ছড়ানো, বাঁধা হয়নি। সৈরিদিদিকে এমন বিনা কাজে কোনওদিন বসে থাকতে দেখেনি আকিম।

আকিমকে দেখে সৈরিদিদি একটু হেসে বলল, ''আয়, এখানে বোস। মা কোথায়?''

''মা পরেশদের বাড়িতে ধান কুটতে গেছে। তুমি এমন একলাটি বসে আছ কেন?''

সৈরিদিদি আকিমের চুলে বিলি কেটে দিয়ে বলল, ''তুই ভয় পেয়েছিলি, না রে আকিম?''

ভূতটার কথা হচ্ছে বুঝতে পেরে নড়েচড়ে বসল আকিম, ''নাঃ, ভয় পাইনি। তবে একটু কেমন-কেমন লাগছে। দেখতে পাচ্ছি না তো, মনে হচ্ছে এই বুঝি পেছন থেকে...''

সৈরিদিদি খানিকক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে রইল সামনে। দারাং পাহাড়ের মাথায় আকাশে গাঢ় লাল রং ছড়িয়ে সূর্য অস্ত যায়। পাখিদের কিচিরমিচির আওয়াজ হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে।

মনখারাপ-করানো সন্ধেটা। একটু পরে বলল, ''আকিম, তুই ওকে দেখিসনি। আমার ভাই শিরু

ও। অনেকদিন আগে এইরকম নবান্নের সময় চলে গিয়েছিল, তুই তখন জন্মাসনি। বুয়াম একেবারে ছোট। বছর ছয়েক বয়স ছিল শিরুর, হ্যাঁ, ছয়ই, সাতে পড়েনি, দু'দিনের জ্বর, কিছু করার আগেই চলে গেল! 'পিঠে-পায়েস খাব' বলে শেষ সময় পর্যন্তও মাকে জ্বালাতন করেছে। আমরা দিইনি, তখন কি আর জানি ও চলে যাবে!''

''এতদিন পরে কোথা থেকে এল? এতদিন আসেনি কেন?'' আকিমের মনে হল, ও নিজের গলাটাই চিনতে পারছে না।

''সেই কথা তোর মাকে কাল বলছিলাম। ওই যে তুই আর বুয়াম আমকাঠের তক্তাটা নিয়ে গেলি! কোনও কাজে লাগত না অবশ্য, কিন্তু ওইটা ওর ভাত খাওয়ার পিঁড়ে ছিল রে আকিম। ওইটা তোরা চাঁপাগাছতলায় নিয়ে যেতেই দুষ্টুটা ওখানে ছুটেছে। এতদিন আমাদের রান্নাঘরে, আগুনের ভেতরে কী করে না করে, কে আর জানছিল! ছোট ছেলেমেয়ে ভালবাসে শিরু, তোদের কোনও ক্ষতি করবে না দেখিস। বরং তোকে, বুয়ামকে, কুরুমকে কাছাকাছি দেখে ওর বেশ মজাই লেগেছে বোধহয়!''

চাঁপাগাছের দোলনাটা সাত-পাঁচ ভেবে খুলেই আনল বুয়াম আর দিঘাইকাকা। তক্তাটা থাক রান্নাঘরেই, আগের মতন। বোষ্টমের জঙ্গুলে ভিটেতে কখন কী হয়, ছোট ছেলে বলে রেয়াত করবে না তো মানুষে বা ভূতে, মিথ্যে গালমন্দ করতে পারে ওর নামে, অন্য ক্ষতিও করতে পারে। তার চেয়ে থাক শিরু যেখানে ছিল...

অনেক রাত।

পরের দিন চলে যাবে বুয়াম। আকিমের মনটা একটু খারাপ। বুয়ামকে ভোরে উঠতে হবে। ও ঘুমিয়ে পড়েছে। আকিমের আর ঘুম আসে না। দাওয়ার খোড়ো-ছাদের বাইরে দৃষ্টি বাড়ালে অথই কালো রাতের আকাশ। লাখ-লাখ তারা। মা-ও ঘুমোচ্ছেন। পাশে আঁচল-চাপা কুরুম ঘুমে কাদা। আর ঠিক তখনই সে এল। শিরু। আকিম স্পষ্ট বুঝতে পারল, আঙিনায় ওর নরম পায়ের শব্দ। বুঝল রান্নাঘরের সামনে দিয়ে মেপে গাছতলা পেরিয়ে ও আকিমের মাথার দিকে এসে দাঁড়িয়েছে। ঠিক অস্বস্তি নয়, একটা অদ্ভুত মমতা হল আকিমের মনে। শিরু ওদের বন্ধু হতে চাইছে এটা স্পষ্ট বোঝা যায়। এতদিন একা ছিল। এখন আকিমদের হঠাৎ দেখে ওর মনটা কৌতূহলে ভরে আছে। সৈরিদিদিদের ইঁদুরভরা ওই ভাঁড়ার ঘরে কী করে বেচারা লুকিয়ে এতদিন বসে ছিল কে জানে! না হলে তো কবেই আলাপ হয়ে যেত ওর সঙ্গে। শিরুটা খুব ভিতুই বোধহয়।

এইসব ভাবতে-ভাবতেই মাথার কাছে শিরুর মৃদু নিশ্বাসের শব্দ পেল আকিম। আকিম বলেই পেল। অন্য কেউ পেত না হয়তো।

মা আর আকিমের মাঝখানে অল্প একটু জায়গা। বুয়ামের দিকে আর-একটু ঘেঁষে শুয়ে বালিশটা বাড়িয়ে দিয়ে আকিম আস্তে করে বলল, ''এসো শোবে।'' আকিমের গায়ে পাতলা একটা সুতির চাদর।

একটু ইতস্তত করল শিরু।

আকিম আবার বলল, ''এসো!''

হ্যাংলা ছেলেটা চুপটি করে মাঝখানে এসে শুয়ে পড়ল। আকিমের আধখানা চাদর টেনে। বেশ হাড়-জিরজিরে রোগা চেহারা, আকিম হাত বুলিয়ে দেখল গায়ে, অন্ধকারে বসে কী খেত কে জানে!

ভোরবেলা বুয়াম-আকিম উঠে যাওয়ার অনেক পর মা কুরুমকে তুলতে এসে ঘুমন্ত কুরুমের আধো মুঠোর মধ্যে একটা সোনা-রং চাঁপাফুল পেলেন। মরশুমের শেষ চাঁপা বোধহয়।

১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫
অলংকরণ: কৃষ্ণেন্দু চাকী

ভুতুরা

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

আবার বুঝি লেগেছে। রুমি, ঝুমি— দু'জনে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে রাধামোহন খুবই ফাঁপরে পড়ে যান। তিনি দোতলায়। দৌড়ে নীচে নামতেও পারছেন না। বয়স হয়েছে। সিঁড়িতে পা হড়কে গিয়ে গেল বছর টানা একমাস বিছানায়। তিনি জানেন, রুমি, ঝুমি খেপে গেলে তাদের আয়াটি আরও দিশেহারা হয়ে যায়।

যমজ হলে বোধহয় এই হয়! এই ভাব, এই মারামারি। এর পুতুল ও ধরলেই হাত কামড়ে, চুল টেনে ধুন্ধুমার কাণ্ড!

ঝুমিটাই মার খায় বেশি। তবে পেছনে লাগার স্বভাব ঝুমিরই বেশি। রুমি পুঁটিমাছ, রুমির নাক খাচ্ছি, মচমচ করে যেন নাক চিবোচ্ছে ঝুমি! আর যায় কোথায়! লেগে গেল। রুমিটা দিন দিন একগুঁয়ে জেদি হয়ে উঠছে। যত আক্রোশ ঝুমির ওপর। সে তার কিছুতে ঝুমিকে হাত দিতে দেবে না। একটা বড় গামলায় সব খেলনা— পুতুল,রেলগাড়ি, টিয়াপাখি, খরগোশ, ব্যাঙ— সবই জোড়ায়-জোড়ায়। জেদ চেপে গেলে রুমি ঝুমিকে কিছুই ধরতে দেয় না। ধরলে আঁচড়ে-কামড়ে শেষ করে দেয়।

তিনি সিঁড়ির মুখে এসে ডাকলেন, "এই আরতি, তুমি কোথায়?'

আরতির সাড়া নেই। ঘুমোতেও পারে। ঠিক মেঝেতে ঘুমিয়ে আছে, আর খাটে দুটো মারামারি শুরু করেছে।

তিনি সিঁড়ি ধরে নামছেন— কী পড়ল, কীসের শব্দ। তিনি আর পারলেন না, "কী হচ্ছে রুমি।"

ঝুমির আর্ত চিৎকার, "দাদুমণি, ভুতুরা বলছে।"

"কে ভুতুরা বলছে তোমাকে?"

"আমি ভুতুরা, দাদুমণি?"

"না, কখনওই না।"

নীচে নেমে দেখলেন, বিছানা লন্ডভন্ড। আরতি নেই, বাথরুমে থাকতে পারে, অথবা কলতলায়। কলতলায় চান করলে এ ঘরের চেঁচামেচি শোনা যায় না। রান্নার মেয়েটিই-বা কোথায়!

তাঁকে দেখেই ঝুমি এসে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে রুমিও। রুমির অভিযোগ, "আমি পুঁটিমাছ দাদুমণি!

"তোরা ঘুমোসনি? মারামারি করছিস!"

"আমি ভুতুরা দাদুমণি?" ঝুমির অভিযোগ।

"না, কখনওই নয়।"

এতে রুমি খেপে গেল। অভিমান, দাদুমণি তাকে ভালবাসেন না। ঝুমিকে বুকে নিয়ে আদর করছেন, সহ্য হবে কেন? ঝুমি ভুতুরা নয় তবে কে ভুতুরা? দাদুমণি ভুতুরা। "দাদুমণি, তুমি ভুতুরা।"

"ঠিক আছে, আমি ভুতুরা। এবার শুয়ে পড়ো। না, না, তুমি ঝুমির বালিশ ধরে টানছ কেন? ঝুমি এখানে শোবে। ঝুমি কত ভাল, কথা শোনে। ঝুমি, চোখ বোজো। এই তো, লক্ষ্মী মেয়ে। রুমিও খুব ভাল। রুমি অবাধ্য হয় না, পেটভরে খায়, তাই না! রুমি পুঁটিমাছ হতেই পারে না।"

"আমি পেট ভরে খাই, না দাদুমণি!" রুমি দাদুমণির দিকে তাকিয়ে আছে।

ঝুমি বলল, "আমিও পেট ভরে খাই, না দাদুমণি!"

"সবাই খাও, এখন আর কথা না। চোখ বোজো। দরজা-জানলায় পরদা টেনে দিলাম। তোমরা দু'জনেই খুব ভাল। ঘুম থেকে উঠে আমরা পার্কে বেড়াতে যাব। খালধারের জঙ্গলটায় হরিণগুলো আছে, তারা কী বলছে জানো? রুমি, ঝুমি দাদুমণির হাত ধরে বেড়াতে আসবে। কী মজা। হরিণগুলোকে ঘাস খেতে দেবে না। বাচ্চা হরিণটা কেমন লাফায়।"

রুমি বলল, "আমাকে হরিণ দেবে দাদুমণি?"

"দেব।"

ঝুমিও উঠে বসল, "আমাকে হরিণ দেবে দাদুমণি?"

"ওঠে না। উঠতে নেই। এখন সবাই ঘুমোয়। দুপুরে খেয়েদেয়ে সবাই ঘুমোয়। না ঘুমোলে হরিণের দেখাই পাওয়া যাবে না।"

সঙ্গে সঙ্গে রুমি, ঝুমি দু'জনেই মুখে আঙুল দিয়ে শুয়ে পড়ল।

"এই তো, কত ভাল মেয়ে। কথা শোনে।"

তারপর ঘুমিয়ে পড়লে তিনি রান্নাঘরে উঁকি দিলেন। আরতি খেতে বসেছে।

"ওরা ঘুমিয়েছে মেসোমশাই।"

"তোমাদের এত দেরি কেন বলো তো চান করতে, খেতে? জেগে গেলে ঘরে একা থাকতে বাচ্চারা ভয় পায়, জানো! এত করে বলি, চান-টান সকালেই সেরে নেবে।"

রাধামোহন জানেন, আয়াটি জবাব দেবে না। সকালে তার এত কাজ, কখন চান করে নেবে! কিছু না বললেও রাধামোহনবাবুর বুঝতে কষ্ট হয় না চুপচাপ থেকে কী বলতে চায় আরতি।

সকাল ন'টার পর বাড়ি ফাঁকা। সবাই অফিস, না হয় স্কুলে। বাড়িটায় তিনি আর তাঁর দুই যমজ নাতনি। আয়ার ওপর ভরসা রাখা যায় না, রাধামোহনবাবুর কানখাড়া থাকে। বাচ্চাদের মা-বাবাও বোঝেন, তিনি তো আছেনই, নিশ্চিন্তে অফিসকাছারি করে রাত করে ফিরলেও অসুবিধে থাকে না।

দুই সাধের নাতনিকে নিয়ে তিনি ভাল আছেন

কি মন্দ আছেন, বুঝতে পারেন না। তবে নাতনিদের বায়নানা শোনা লেগেই। কিছুই মুখে দিতে চায় না। উঠতে বসতে গল্প শোনা চাই। তিনি রাম রাবণের গল্প বলেন, শূর্পণখার গল্প বলেন, দুষ্টু খেঁকশেয়ালের গল্প যখন বলেন, বড় বড় চোখে তারা শোনে। দু'পাশে দু'জন দাঁড়িয়ে যায়— যেন দুটো ডলপুতুল, চোখমুখ অতি সজীব। তখন লাফায় না, দৌড়য় না, দু'জন সত্যি খুব ভাল মেয়ে হয়ে যায়। আজগুবি যা কিছুই তিনি বলেন, রুমি, ঝুমি কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করে।

স্কন্ধকাটার গল্প বললে দু'জনই তাঁকে জড়িয়ে ধরে, ''তারপর দাদু?''

''তারপর সেই রাজপুত্র কী করে! বরফ পড়ছে।''

''বরফ কী দাদু?''

''বরফ— দেখাচ্ছি।'' ফ্রিজ থেকে আইসক্রিমের ট্রে বের করে দেখান।

''আমাকে বরফ দেবে?''

''না, না, ঠান্ডা লাগবে। ঠান্ডা লাগলে সর্দি-জ্বর হয় জানো— তারপর না, পাইনগাছগুলোর পাতা ঝরে যাচ্ছে। বাগানে রাজপুত্রের কত গোলাপগাছ। চাই একটা গোলাপফুল। কিন্তু পাবে কোথায়? এত শীতে গোলাপগাছ বলল, ফুল দেব কী করে? দেখছ না, কী ঠান্ডা!''

''গোলাপফুল কেন দাদুমণি?''

''রাজপুত্র যে রাজকন্যার সঙ্গে নাচবে। রাজকন্যাকে গোলাপফুল যে দিতে পারবে, তার সঙ্গেই নাচবে।''

''আমি নাচব দাদুমণি।''

''গোলাপফুল ফুটুক। নাও এবারে হাঁ করো। হাঁ করলে গোলাপফুল ফুটবে।''

আরতি দুধ, ভাত, কলা চটকে চামচে ধরে আছে। হাঁ করতেই চামচ মুখে ঢুকে গেল।

''তারপর না সেই গুপি গায়েন বাঘা বায়েন ঢোল বাজাতে লাগল।''

''আমাকে ঢোল দেবে দাদুমণি?''

''দেব।''

''আমি ঢোল বাজাব।''

''বাজাবে। আবার হাঁ করো। হাঁ না করলে ঢোল বাজবে কেন?''

আরতি আর-এক চামচ মুখে দিয়ে বললেন, ''দেখি তো পেট দু'খানা তোমাদের কতটা ঢোল হল!'' দু'জনই জামা তুলে পেট দেখালে বলেন, ''এবারে ঢোল বাজবে। আর দু' চামচ খেলেই বাজবে।''

ঢোল বাজবে শুনেই দু'জনে যত দ্রুত পারল মুখের ভাত গিলে ফেলল। কারটা আগে বাজে! দু'বোনের রেষারেষি, কে আগে কতটা বেশি খাবে। কার আগে ঢোল বাজবে।

এই করে দুপুরের খাওয়া। আরতি দু'থালায় ভাত, ডাল, মাছ, শাক এবং দুধের বাটিতে দুধ নিয়ে খাওয়াতে বসলেই দু'জন দু'দিকে পালায়। একজন দরজার দিকে ছুটে গেল তো আর-একজন কলপাড়ে। ভাত খাওয়ানোটা রোজকার বিড়ম্বনা। তাই যত অসম্ভব আজগুবি গল্প বানিয়ে বানিয়ে বলতে হয়। কখনও রাজপুত্র, কোটালপুত্র, কখনও অজগরের, হাতির গল্প, টিভি চালিয়েও খাওয়ানো হয়। বাঘ, হরিণ, ভোঁদড়, খেঁকশিয়াল কিছুই বাদ যায় না, গল্পের গোরু গাছে ওঠে। হাতির পাখা গজায়, ''ওই দেখো আকাশে একটা হাতি উড়ে যাচ্ছে।''

''কোথায়, কোথায়?''

''আগে হাঁ করো, তবে দেখাব।''

রাধামোহন আর পারেন না, আজগুবিরও শেষ আছে, তবে ইদানীং দুই বোনই বলছে, ''ওই গল্পটা বলো দাদুমণি।''

''কোন গল্প?''

''রাজপুত্র নাচবে।''

তিনি বুঝতে পারেন, রাজপুত্র নাচলে তারাও নাচবে।

গল্পটার মুশকিল, তাঁর সব ঠিকঠাক মনে নেই। বিদেশি গল্প কবে কোথায় পড়েছিলেন আবছামতো তার কিছুটা মনে আছে। বিশেষ করে একটি নাইটিঙ্গেল পাখি সারারাত হিমের মধ্যে বুকে গোলাপ গাছের কাঁটা বিঁধিয়ে গান গেয়েছিল। শীতের ঠান্ডায় গোলাপগাছে ফুল না ফুটলে কী করা।

রাজার বাগানে এত গোলাপগাছ, অথচ ফুল নেই গাছে। গাছগুলোর পাতা ঝরে গেছে। বরফে গাছপালা-নদী জমে গেছে, অথচ চাই একটি গোলাপফুল। রাজপুত্র ফুলটি না পেলে রাজকন্যার সঙ্গে নাচতে পারবে না। এই পর্যন্ত তিনি মনে করতে পারেন। রাজকন্যার চাই গোলাপফুল।

হঠাৎ কী হল, এক দুপুরে দুই বোনেরই বায়না, ''দাদুমণি, গোলাপফুল দেবে না! রাজপুত্র দেবে না?''

''ফুটুক। ফুল ফুটলে রাজপুত্রও চলে আসবে।''

''কবে ফুটবে!''

''এই ফুটবে। তোমরা না খেলে ফুটবে না। খাও।''

রোজ রোজ এক কথা শুনবে কেন! কিছুতেই খাওয়ানো যাচ্ছে না। পালাচ্ছে, মুখে দিলে উগরে দিচ্ছে। শাসন করলে বাটি ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে। আচ্ছা বিপদে পড়া গেল!

''গোলাপগাছ কোথায়? রাজপুত্র কোথায়?''

''আছে। খাও। খাওয়া হলেই গোলাপ গাছের কাছে নিয়ে যাব।'' আসলে ঠিক ওদের অন্যমনস্ক না করে দিতে পারলে রক্ষা নেই।

''আমরা ফুল দেখব।''

জানলার পাশে একটি করবীফুলের গাছ। করবীফুলের গাছটা দেখালেন, ''এই তো ফুল, খাও।''

''ওটা তো করবীফুলের গাছ।''

বাড়ির গাছপালা তাদের চেনা হয়ে গেছে। পেয়ারাগাছ দেখিয়েও বলার উপায় নেই, ওটা গোলাপগাছ। তারা সত্যিকারের গোলাপগাছ না দেখতে পেলে কিছুতেই খাবে না। এখন তিনি কোথা থেকে যে গোলাপগাছ দেখান! টবের গোলাপ কিনে আনলে হয়। তিনি আর পারছেন না। আরতিও দৌড়ঝাঁপ করতে গিয়ে কাহিল। তাঁর আজগুবি কথাবার্তা নাতনিরা আর মোটেও গ্রাহ্য করছে না।

শেষে বললেন, ''চলো তো দেখি, গোলাপগাছ খুঁজে পাওয়া যায় কি না!''

ওরা সঙ্গে সঙ্গে দাদুর পায়ে পায়ে সিঁড়িতে উঠে এল। ভাবলেন, ইস, বাজার থেকে একটা গোলাপগাছ কিনে রেখে দিলে পারতেন। তিনি সিঁড়িতে উঠছেন। রুমি, ঝুমিও দাদুর হাত ধরে উঠছে। বেশ চঞ্চল হয়ে পড়েছে। একটু কিছু মুখে দেওয়া গেল না, অন্য কিছু দেখিয়ে তারপরই মনে হল দোতলায় তাদের কাঠের ঘোড়াটি পড়ে আছে। তিনি বললেন, ''আগে ঘোড়ায় চাপো। ঘোড়াটা আকাশে উড়লে গোলাপগাছটা দেখা যেতে পারে।''

''না, না, ঘোড়াটা নড়ে না।''

''না, না, ঘোড়াটা ওড়ে না।''

''কোথায় পাই তবে বল! তোরা খেয়ে নে, তারপর না হয় সবাই মিলে গাছটা খুঁজব।''

''ফুল কোথায়?''

''গাছ কোথায়? রাজপুত্র কোথায়?''

কী করেন রাধামোহন! বৃষ্টি নেই, বাদলা নেই, বাড়িতে একটা টবও নেই, টবে গাছও কেউ লাগায় না, কিন্তু চাই একটা গোলাপফুল। একটা গোলাপগাছ। তিনি এখন পান কোথায়!

ভুলিয়ে-ভালিয়ে যদি গাছের মোহ কাটানো যায়! তিনি দোতলার একটা জানলা খুলে দিলেন, দু' নাতনিকে দাঁড় করিয়ে দিলেন জানলায়। তারা গ্রিল ধরে ঝুলছে। গ্রিল বেয়ে ওপরে উঠছে। গাছের কথা ভুলে গেলে তিনি রক্ষা পান। তিনি বললেন, ''ওই যে স্কুলবাড়িটা দেখছ, সেখানে কিন্তু ভুতুরা থাকে। না খেলে ভুতুরা রাগ করবে।''

এরা ভুতুরা, স্কন্ধকাটা, রাক্ষস-খোক্কসের নামে জড়সড় হয়ে থাকে। ভুতুরার ভয় দেখিয়ে যদি খাওয়াতে পারেন! হাতে থালা নিয়ে আরতি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সেদ্ধ ডিম, মাখন, ভাতে চটকে গোল্লা তৈরি করে রেখেছে। হাঁ করলেই মুখে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।

দু'জনেই মুখ ফিরিয়ে নিল। খেল না।

আবার সেই এক কথা।

''গাছ কোথায়? ফুল কোথায়? রাজপুত্র কোথায়?''

নাও, এবার বোঝো ঠ্যালা। ভবি ভুলছে না। রেগেমেগে রাধামোহন বললেন, ''যাও, ভাত খেতে
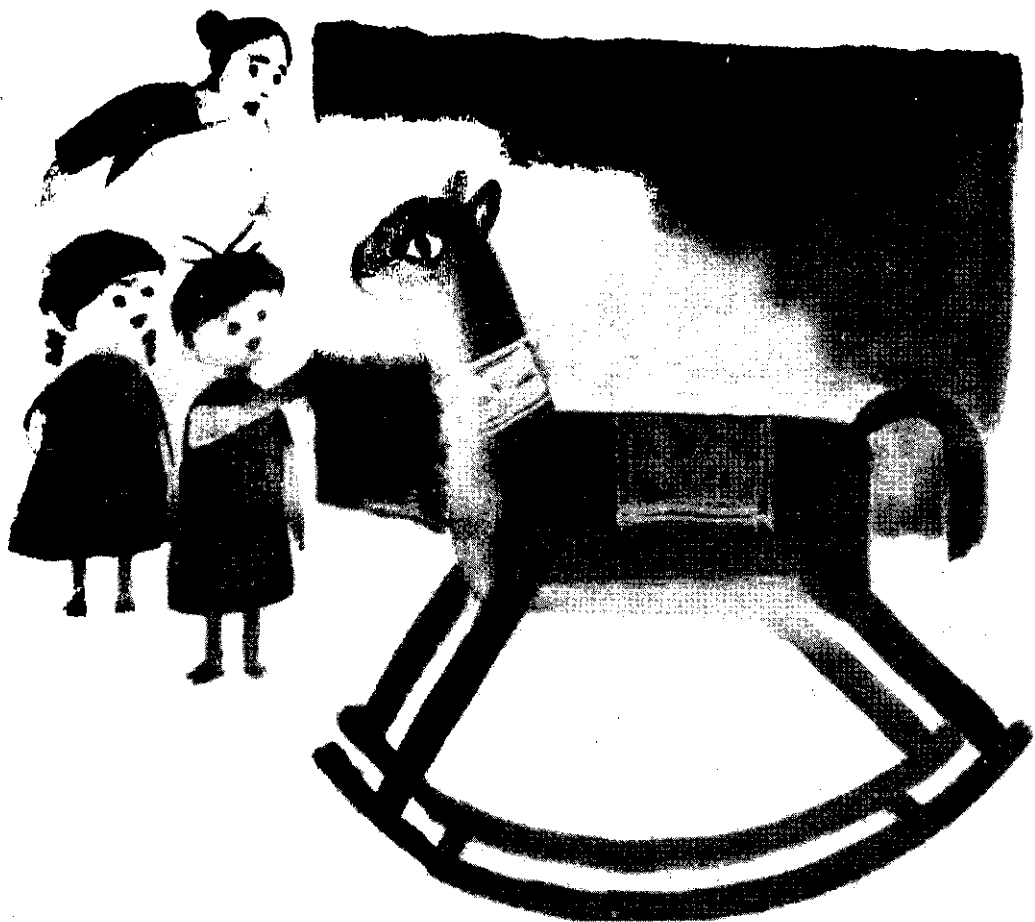
হবে না। আরতি, ভাত নিয়ে চলে যাও। খাবে না। কতক্ষণ তোরা না খেয়ে থাকতে পারিস দেখি!''

দু'জনেই অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে ফেলল। গ্রিল বেয়ে নীচে নেমে দু'জনই ঘরের দু'কোনায় মাথা নিচু করে বসে রইল। টসটস করে চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে।

''গাছ কোথায়? ফুল কোথায়? রাজপুত্র কোথায়?''

''কাল নিয়ে আসব। বাজার থেকে নিয়ে আসব। লক্ষ্মী মেয়ে, খাও। তোমাদের মা এসে কষ্ট পাবে না? দুপুরে কিছু খাওনি শুনলে খারাপ ভাববে। জেঠু তোমাদের কত কিছু নিয়ে আসে। বড়মা তোমাদের কী ভালবাসে। রাইদিদি স্কুল থেকে ফিরে তোমরা খাওনি শুনলে মুখ ব্যাজার করে ফেলবে। খাও লক্ষ্মীটি।''

''গাছ কোথায়! ফুল কোথায়! রাজপুত্র কোথায়!''

''গাছ আমার পেটের ভেতর। শয়তান হচ্ছে দিন-দিন! এ কে রে বাবা, কিছুতেই গোঁ ছাড়বে না। এবারে কিন্তু মারব।'' এতে রুমি, ঝুমি আরও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। দাদুমণি বকেছেন, দাদুমণি তো সবসময় আদর করেন, দাদুমণিকে তারা রাগতেই দেখেনি। জোরে ধমক দিলে তারা না কেঁদে পারে! দু'বোনই জড়াজড়ি করে কাঁদতে বসে গেল। আর তখনই তিনি দেখলেন, দোতলায় খোলা বারান্দায় একটা ফুলের গাছ। কারুকাজ-করা সুন্দর টবে একটি গোলাপফুলের

গাছ। অবাক বিস্ময়ে গাছটি দেখতে দেখতে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওই তো গোলাপগাছ। শিগগির আয় রুমি, ঝুমি।" দরজা খুলে বারান্দায় ছুটে গেলেন। রুমি, ঝুমিও দাদুর পায়ে পায়ে দৌড়ে গেল।

কাছে যেতেই দেখতে পেলেন, টবটির গায়ে চিত্রবিচিত্র কিছু ছবি, টবটি পেতলের হতে পারে, তামারও হতে পারে, মিনা-করা প্রাচীন ধাতুর সিলমোহর, ফারাওয়ের মুখ, পিরামিডের ছবি এবং কোনও নদীর অববাহিকা টবের গায়ে আঁকা। চটাওঠা, প্রাচীন মুদ্রার মতো বর্ণহীন টবটা এখানে কে রাখল? কে নিয়ে এল? গাছটা খুবই নির্জীব, পাতা নেই বিশেষ, যেন বরফের দেশ থেকে কেউ তুলে এনে রেখে দিয়েছে। শীতে পাতা ঝরে গেছে। দুটো-একটা যাও-বা আছে তারও রং হলুদ। গাছের কাঁটায় যেন শ্যাওলা জমে আছে। গাছটা দেখতে দেখতে তিনি বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "এই তো সেই গাছ!"

ততক্ষণে রুমি, ঝুমিরও কৌতূহল বেড়ে গেল।

"এটা কী দাদুমণি?"

"এটা গোলাপগাছ।"

"এটা কী?"

"এটা পাতা।"

রুমি, ঝুমির স্বভাবই এরকম। নতুন কিছু দেখলেই এটা কী, এটা কী করা।

"এটা কী?"

"এটা টব। ফুলের টব।"

"এটা কী?"

"এটা মাটি। এটা কাঁটা, এটা গাছ। গোলাপগাছ।"

পাতায় হাত দিয়ে ঝুমি বলল, "ফুল কোথায়? রাজপুত্র কোথায়!"

গাছটার পাতা ধরে রুমি বলল, "দাদু, ছিঁড়ব।"

"না, ছিঁড়বে না। গাছটার কষ্ট হবে।" রুমি, ঝুমি গাছটার কাছ থেকে নড়তে চাইছে না। লাফাচ্ছে আর গাছটাকে দেখছে। রাধামোহন ভাবলেন, গাছটা এখানে কে নিয়ে এল। ভৌতিক কাণ্ড নয় তো! টবটাও বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না। তিনিই-বা চেঁচিয়ে উঠলেন কেন, এই তো সেই গাছ। বড়ই ধন্দে পড়ে গেলেন রাধামোহন।

"ফুল কোথায়? রাজপুত্র কোথায়?"

তখনই মনে হল, আরতি ওদের খাবারের থালা হাতে নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে। জোর করেও খাওয়ানো যায় না। নিজে না খেলে কে খাওয়াতে পারে! দুধ অবশ্য জোর করেই খাওয়ানো হয়। তবে ইদানীং জোর করতে গেলেই রুমি, ঝুমি চেঁচাবে, "নিজে-নিজে খাব।"

"তবে খাও।" দুধের গ্লাস হাতে তুলে দিলে খায়, একটু খায়, আবার রেখে দেয়, পালায়, ছোটাছুটি, নিজে-নিজে খাব, খায় ঠিক, বড় সময় নেয়। কিন্তু দুপুরের ভাত কো আর গেলানো যায় না। না খেতে চাইলে কী করা!

ঝুমি, রুমি চঞ্চল হয়ে পড়ছে। ঝুঁকে গাছটা দেখছে। টবের চারপাশে গোল হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে কিছু।

"ফুল কোথায়?"

"ফুটবে। তোমরা খাও, খেলেই ফুল ফুটবে।"

দৌড়ে আরতির কাছে চলে গেল। হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকল। এক গ্রাস মুখে নিয়ে ছুটে এসে বলল, "ফুল কোথায়?"

"সবটা শেষ করো, না হলে ফুল ফুটবে না।"

রুমি, ঝুমি দৌড়ে গেল আরতির কাছে। গবগব করে খেল। জল খেল, আবার দৌড়ে এল, "ফুল কোথায়! আমরা খেয়েছি দাদুমণি।"

"গাছটাকে বলো, তোমরা খেয়েছ।"

"আমরা খেয়েছি।" গাছটার কাছে মুখ নিয়ে দু'বোনই চেঁচিয়ে কথাটা বলল।

তারপর রাধামোহনের দিকে তাকিয়ে বলল, "ফুটছে কই! ফুল কোথায়! রাজপুত্র কোথায়?"

"আরও জোরে বলতে হবে। রোজ রোজ বলতে হবে। গাছটা ঘুমিয়ে আছে। রোজ দুপুরে পেটভরে খাবে, খাবার পর মুখ ধোবে, তারপর গাছটার কাছে এসে বলবে, আমরা খেয়েছি, মুখ ধুয়েছি। আমরা ঘুমোব এবার। ফুল দাও। তোমার সব কথা শুনি, তুমি একটা ফুল দিতে পারো না।"

ঠিক রাধামোহনের মতোই গাছটাকে তারা সব বলল। পাতা ছিঁড়তে গিয়েও ছিঁড়ল না। যদি গাছটা সত্যি রাগ করে! তারা তো কিছুই চায় না, রাজকন্যার মতো একটা শুধু গোলাপফুল চায়— রাজপুত্র চায়।

তাদের এক কথা গাছটার সঙ্গে "আমরা পেট ভরে খাই, তুমি একটা ফুল দিতে পারো না!"

একদিন ঝুমিই চেঁচিয়ে ডাকল, "দাদুমণি, এসো না দেখবে।" তিনি কাছে গেলে বলল, "এটা কী?"

একটা নরম ছোট্ট পালক গাছটার ডালে জড়িয়ে আছে। পালক, নরম উষ্ণতায় ভরা। কোনও নাইটিঙ্গেল পাখির পালক নয় তো! টুনটুনি কিংবা চড়াইয়ের পালক যে এটা নয়, রাধামোহন সবিশেষ এটা জানেন।

"এটা কী?" আবার প্রশ্ন ঝুমির।

তিনি কিছুটা ঘোরে পড়ে যাচ্ছিলেন, তবে কি মৃত নাইটিঙ্গেল পাখিটাই মিশরের কোনও প্রান্ত থেকে উড়ে আসছে, অথবা সাইবেরিয়ার তুষারভূমি পার হয়ে এখানে এসে আবিষ্কার করেছে, এই তো সেই ফুলগাছটা, কে রেখে গেল এখানটায়!

"এটা কী!"

ঘোরের মধ্যেই যেন তিনি বললেন, "নাইটিঙ্গেলের পালক।"

"আমি নেব।"

"না, নিতে নেই। গাছে আছে, গাছেই থাকুক।"

কী জানি, পালকটা যদি সত্যি নাইটিঙ্গেল পাখির হয়, আর ওটা ধরলে যদি রুমি, ঝুমির অকল্যাণ হয়, এসব ভেবেই যেন বলা।

"না, নেবে না। ভুতুরা আছে, পালকটা ধরবে না।"

দু'জনেই দাদুমণিকে জড়িয়ে ধরে বলল, "ভুতুরা দাদুমণি?"

আসলে এক রাতে ঠিক এমনই তাঁকে দু' বোনই ভুতুরা-ভুতুরা বলতে বলতে তাঁর কোলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তিনি তাঁর বসার ঘরে সোফায় বসে সিপাহি বিদ্রোহের ইতিহাস পড়ছিলেন, খুবই মগ্ন ছিলেন পড়ায়, হঠাৎ দু'বোনের 'ভুতুরা, ভুতুরা আসছে' চিৎকার শুনে কিছুটা বিপাকে পড়ে তাদের বাবাকে ডেকেছিলেন, "ভুতুরা কী। ওরা এত ভয়ে কাবু।"

ছোট পুত্র উঁকি দিয়ে বলেছিল, "ভুতুরা জানেন না, ভূতেরা সব ওদের কাছে ভুতুরা হয়ে গেছে।"

"কেন যে আজেবাজে ভয় দেখাও তোমরা, বুঝি না! কচি মন, সহজেই ভয় পেতে পারে।" দু'বোনকে জড়িয়ে বুকে তুলে নিয়ে বলেছিলেন, "ভুতুরা আমার বন্ধু জানো! কিচ্ছু করে না। তোমরা বলবে, দাদুমণি বলেছে, ভুতুরাকে ভয় না পেতে। দাদুমণির বন্ধুকে কেউ ভয় পায়? যা চাইবে, তাই এনে দেবে।"

এত বলেও তাদের ভুতুরার ভয় তিনি নিরসন করতে পারেননি। এখন নিজেই এক ভুতুড়ে কাণ্ড ভেবে গাছটার খুব কাছে রুমি ঝুমিকে ঘেঁষতে দিচ্ছেন না। কারণ, কেউ স্বীকার করেনি, তারা কেউ ফুলের টব এনে এখানটায় রেখেছে। "কার দায় পড়েছে, তুমি নিজেই কখন নিয়ে এসেছ, মনে করতে পারছ না।" তিনি আর কী বলেন! বড় পুত্র আর-এক কাঠি ওপরে, টবটি দেখে তার মন্তব্য, "দেখে তো মনে হয় ফারাওদের সমাধি থেকে তুলে আনা হয়েছে।"

হয়ে গেল! অথচ আশ্চর্য, রুমি, ঝুমি বিশ্বাস করে বসে আছে, তারা পেটভরে খেলে গাছটাতে একদিন ঠিক একটি গোলাপ ফুটবেই। রাজপুত্র গাছের পাশে তাদের জন্য দাঁড়িয়ে থাকবেই। এখন আর খাওয়া নিয়ে ছোটাছুটি করতে হয় না, ঘুমনো নিয়ে বকাঝকা করতে হয় না। সময়মতো তারা খায়, না হলে গাছটা রাগ করতে পারে, সময়মতো ঘুমোয়, রাজপুত্র যদি শেষে না আসে! এত কিছুর মধ্যেই একদিন শীতের জ্যোৎস্না রাতে, রাধামোহন গাছটার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন; রুমি, ঝুমি কখন পায়ের কাছে এসে জুটেছে; জুটতেই পারে, নীচের ঘরে টিভি চলছে, টিভিতে অজস্র আজগুবি সব সিরিয়াল, বুঁদ হয়ে সিরিয়াল দেখার সময় শিশুদের দৌরাত্ম্য কে সহ্য করে? এটা টানছে, ওটা ভাঙছে, নীচের ঘরগুলিতে দাপাদাপি করে বেড়ালে নিশ্চিন্তে সিরিয়াল দেখাও যায় না,

তখন একটা দুষ্টবুদ্ধিই মাথায় খেলে যায় সকলের, ''যাও তো ওপরে, দাদুমণি কী করছে দেখে এসো তো।'' আর কথা নেই, ''দাদুমণি, দাদুমণি তুমি কী করছ,'' তাঁর শোওয়ার ঘর থেকেই রুমি, ঝুমির গলার আওয়াজ পাওয়া যায়। তিনি গাছটার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন তারা জানে না। তিনি যে উবু হয়ে জ্যোৎস্নায় এবং বারান্দার আলো জ্বেলে অবাক চোখে গাছটাকে শুধু দেখছেন, রুমি, ঝুমি জানবে কী করে? তারা এসে অবাক, দাদুমণি গাছটার পাশে চুপচাপ বসে আছেন।

''দাদুমণি, ও দাদুমণি, ফুল ফুটবে?''

''মনে হয় ফুটবে।''

তিনি একটা কুঁড়ি দেখিয়ে বললেন, ''এটা কী!''

''এটা কী?'' ঝুমিরও প্রশ্ন।

''এটা ফুলের কুঁড়ি।''

''ফুলের কুঁড়ি, দাও না!''

''না, ফুটতে দাও। পাখিটা উড়ছে।''

''কোথায় পাখি?''

''দেখছ না, আরও সব পালক পড়ে আছে। রেশমের মতো নরম পালক। পাখিটা ঠিক রোজ রাতে উড়ে আসে। গাছটার ওপর পাক খায়। ঠিক একদিন গাছের ডালে বসে যাবে, বুকে গাছের কাঁটা বিঁধিয়ে দেবে, সারারাত ধরে গান গাইবে। উষ্ণতার খুব দরকার দিদিভাই। উষ্ণতার খুব দরকার। না হলে ফুল ফোটে না।''

ঘোরের ভেতর কথা বললে যা হয়, রুমি, ঝুমি কেমন অবাক হয়ে দেখছে দাদুমণিকে। এ দাদুমণিকে তারা চিনতে পারছে না।

আর সকালেই রুমি, ঝুমি চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করছে, ডাকছে, ''দাদুমণি, শিগগির ঘুম থেকে ওঠো। গাছটায় ফুল ফুটেছে।''

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পড়লেন রাধামোহন। তাঁর ঘরের দরজা খুলে বারান্দায় ছুটে গেলেন। আশ্চর্য! গাছটা সবুজ পাতার সমারোহে আজ উদ্ভাসিত। গাছটায় একটামাত্র তাজা লাল গোলাপ। তিনি নতজানু হয়ে গাছটার পাশে বসলেন।

তারপরই ঝুমি [illegible] কেমন ভয় পেয়ে সরে দাঁড়াল।

''এটা কী?''

তিনি গাছের ভেতর ঝুঁকে দেখলেন, মাকড়সার জালে একটা মৃত পাখি। গাছের কাঁটায় আর মাকড়সার জালে জড়িয়ে আছে। চড়াইপাখির মতো বড় নয়, টুনটুনিপাখির মতো তত ছোটও নয়, বুকে তার নরম পালক।

''এটা কী দাদুমণি?''

''এটা নাইটিঙ্গেল পাখি।''

''ওটা আমি নেব।''

''না, ওটা মরে গেছে।''

''মরে গেছে কেন? আমি মরে যাব।''

এর কী জবাব দেবেন তিনি! এতদিন হাজার প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন উদ্ভট সব কথা বলে, তাদের কৌতূহল নিরসন করেছেন, কিন্তু আজ কেন জানি তাঁর কোনও কথা মুখে জোগাল না। তিনি শুধু বললেন, ''চল পাখিটাকে মাটিচাপা দিই। ওটা মরে পড়ে থাকলে পচা গন্ধ উঠবে।''

ঝুমির এক কথা, ''মাটিচাপা কেন দাদুমণি?''

''এসো, দেখতে পাবে।''

নীচে খাওয়ার জন্য ডাকাডাকি শুরু হয়েছে। রুমি, ঝুমি সাড়া দিচ্ছে না। তারা দেখল, দাদুমণি পাখিটার ডানা ধরে নীচে নামছেন, দাদুমণি হাতে কী নিলেন। ''এটা কী দাদুমণি?'' রুমির প্রশ্ন।

নিজেই ফের বলল, ''এটা খুরপি, না দাদুমণি?''

রাধামোহন বললেন, ''তোমরা বড় হয়ে গেছ, আমার সঙ্গে এসো।'' কলপাড়ে কামিনীগাছের নীচে ছোট্ট গর্ত করে পাখিটাকে শুইয়ে দিলেন। তারপর মাটিচাপা দিয়ে দেখতে পেলেন, রুমি, ঝুমি কেউ তাঁর পাশে নেই। তিনি উঠতে যাবেন, রুমি, ঝুমি ফের হাজির। হাতে তাদের সেই আশ্চর্য গোলাপ।

''গাছ থেকে ফুল তুলতে নেই। ফুল ছিঁড়লে কেন?''

''আমরা ছিঁড়িনি দাদুমণি। রাজপুত্র দিল।''

''রাজপুত্র! কোথায় রাজপুত্র! কী বলছিস।''

''বা রে! গাছটার পাশে। কী সুন্দর দেখতে। হাতে দিয়ে বলল, নাও।''

''যেই দিক, গাছ থেকে ফুল ছেঁড়া উচিত হয়নি। গাছটার কষ্ট হয় না! চলো, আমরা গাছটার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিই।''

শিশুরা স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে। রাজপুত্র, কোটালপুত্র, কত কিছু তাদের চাই। হাতি, ঘোড়া, এরোপ্লেন চাই, তবে ভুতুরা একজন না থাকলে এসবের বুঝি কোনও গুরুত্ব থাকে না। রাজপুত্র ফুলটা তাদের দিতেই পারে।

''চলো তো, কোথায় গাছের পাশে রাজপুত্র দাঁড়িয়ে আছে দেখি।'' বলে রাধামোহনবাবু সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে এলেন। রুমি, ঝুমিও দাদুর পেছন-পেছন উঠে এল।

কোথায় রাজপুত্র! গাছটা কোথায়! টব, গাছ, পাতা, কাণ্ড, সব হাওয়া! রাধামোহন গাছটা না দেখে একেবারে হতভম্ব।

রুমি বলল, ''এখানে ছিল রাজপুত্র।''

ঝুমিও বলল, ''এখানে ছিল।''

''ইয়ার্কি হচ্ছে! মিছে কথা বলছ।''

''না দাদুমণি, মিছে কথা না! সত্যিই ছিল।'' তারপর দু'জনেই দাদুমণির ধমক খেয়ে ভ্যাক করে কেঁদে ফেলল।

রাধামোহন ফাঁপরে পড়ে গেলেন। রাজপুত্র না-ও থাকতে পারে। কিন্তু গোলাপগাছ কোথায়! তার তো তিনি দিনরাত পরিচর্যা করেছেন!

রুমি বলল, ''গোলাপগাছ কোথায়?''

রাধামোহনের মাথা গরম হয়ে গেল। রুমি, ঝুমিকে নিয়ে সারা বাড়িতে গাছটা খুঁজলেন। কোথাও নেই! কোথাও খুঁজে পেলেন না। কেউ বললও না এ বাড়িতে কখনও একটা গোলাপগাছ ছিল। তিনি রোজ গাছে জল দিতেন, রুমি, ঝুমি জল দিত গাছের গোড়ায়, কেউ বিশ্বাসই করল না।

তিনি তাড়াতাড়ি দৌড়ে সিঁড়ি ধরে নীচে নামলেন— কলতলায় কামিনীগাছের নীচেও কিছু দেখতে পেলেন না। তাজা গোলাপটা কোথায়! খোঁড়াখুড়ি কোথায় করলেন, কোথায় মাটির নীচে পাখিটাকে রেখেছেন, কিছুরই কোনও চিহ্ন নেই। শুধু দেখলেন, একজোড়া ভুঁইচাপা ফুটে আছে এক কোনায়।

রুমি, ঝুমি বলল, ''দাদুমণি, ফুল।''

তিনি শুধু বললেন, ''চলে এসো। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে নেই।''

১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫
অলংকরণ: সুব্রত চৌধুরী
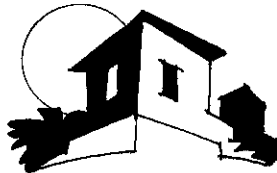
গোবিন্দলালের ভূত

রূপক সাহা

আড্ডা জমেছে কলকাতার ভূত নিয়ে, সিংহিবাড়ির বৈঠকখানায়, কালীপুজোর রাতে। জানলার পাশে আমি, আমার উলটো দিকে সমীরণ, ওর বাঁ পাশে বিক্রম আর মৈনাক। একটা সময় হেয়ার স্কুলের একই ক্লাসে আমরা চারজন পড়তাম। এখন চাকরি-বাকরি করি, নানা জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছি। বহুদিন পরে বিক্রম ওদের এই বাড়িতে আমাদের নেমন্তন্ন করেছে।

জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, নাটমন্দিরে পুজোর উদ্যোগ চলছে। উঠোন জুড়ে প্রচুর লোকের ভিড়। সিংহিবাড়িতে খুব নিষ্ঠা ভরে পুজো করেন কালীঘাটের এক পুরোহিত। তাই আশপাশের অনেকেই সারারাত্তির বসে বসে পুজো দেখেন। ছেলেবেলায় প্রতি বছর এইদিনে বিক্রমদের বাড়িতে আসতাম। একটু বেশি রাতে আর জেগে থাকতে না পারলে বৈঠকখানায় এসেই শুয়ে পড়তাম। সিংহিবাড়ির বৈঠকখানাটা বেশ বড়। একধারে চেয়ার-টেবল, অন্যপ্রান্তে ফরাস পাতা। আজও দেখছি, দু'-তিনজন চাদর চাপা দিয়ে গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে।

বিক্রম যেখানটায় বসে, তার ঠিক পিছনেই দেওয়াল জুড়ে একটা অয়েল পেন্টিং। বৈঠকখানায় ঢুকলে প্রথমেই ছবিটা চোখে পড়ে। ছেলেবেলা থেকেই দেখছি। বিক্রম একবার বলেছিল, ছবিটা ওদের পূর্বপুরুষ গোবিন্দলাল সিংহের। ইংরেজ আমলে উনি বেনিয়ান ছিলেন। এই সিংহিবাড়ি ওঁরই তৈরি, প্রায় দুশো বছর আগে। বেনিয়ান কথাটার মানে তখন বুঝতাম না, অনেক পরে জেনেছি। আসলে, গোবিন্দলাল তখন ইংরেজ ব্যবসায়ীদের টাকা ধার দিতেন, ব্যাবসায় সাহায্য করতেন।

আড্ডায় ভূতের কথাটা উঠল যখন বিক্রম কথায় কথায় বলল, "জানিস শুভ, প্রতি বছর কালীপুজোর রাতে আমাদের বাড়িতে নাকি গোবিন্দলাল একবার করে আসেন। আমি কোনওদিন দেখিনি। তবে উনি চলে যাওয়ার পর টের পেয়েছি, উনি এসেছিলেন।"

শুনে মৈনাক ফিক করে হেসে বলল, "তার মানে আজও আসবেন। এলে ধরে ফেলতে হবে রে। জানতে হবে, তোদের বাড়িতে কোনও গুপ্তধন আছে কি না।" মৈনাক সায়েন্স কলেজে পড়ায়। কী একটা যুক্তিবাদী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত, তর্ক করতে ওস্তাদ।

সমীরণ আর আমি হেসে উঠলাম। কিন্তু বিক্রম গম্ভীর হয়ে বলল, "এই, এসব নিয়ে ঠাট্টা করিস না।"

মৈনাক বলল, "কথাটা তুই বিশ্বাস করিস নাকি?"

"আগে করতাম না, এখন করি।"

"গোবিন্দলাল কেন আসেন, তা তো বললি না?"

"নিয়ম-নিষ্ঠা ভরে পুজো হচ্ছে কি না তা দেখার জন্য। শুনেছি খুব রগচটা টাইপের মানুষ ছিলেন। পুজো ঠিকমতো না হলে... মারাত্মক একটা দুর্ঘটনা ঘটবে আমাদের পরিবারে। আমার বাবা মুখে রক্ত
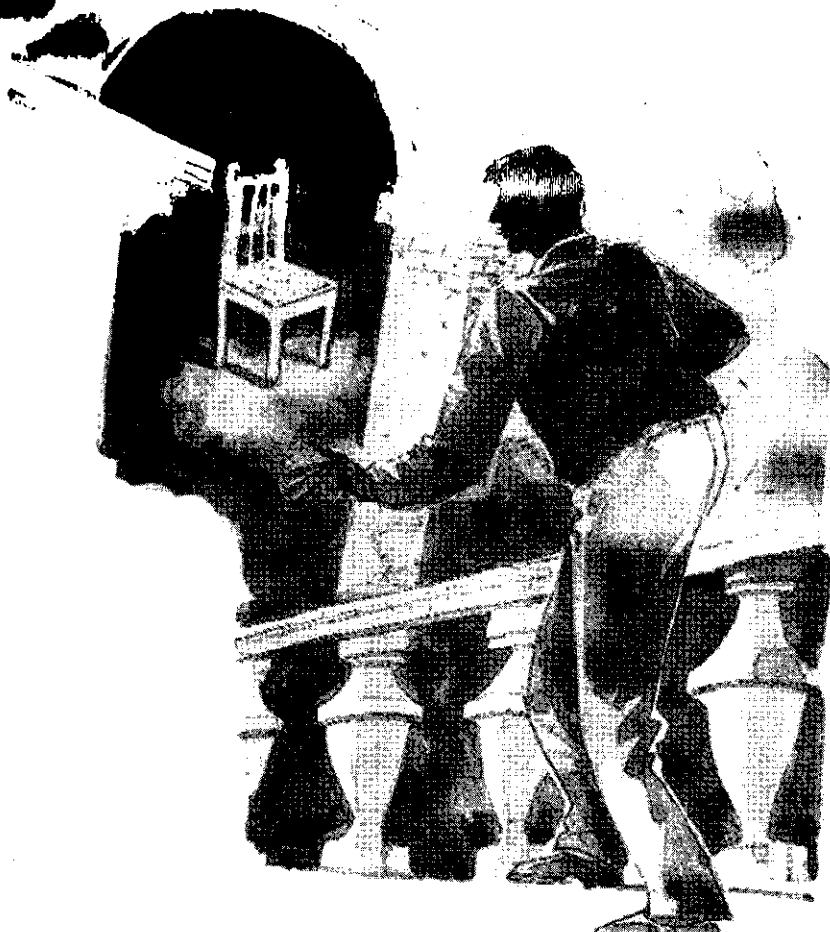
তুলে মারা গিয়েছিলেন এই কালীপুজোর রাতে, কেননা সেবার পুজোয় ত্রুটি হয়েছিল।''

মৈনাক বলল, ''ভূত, প্রেত, আত্মা— এসব ফালতু, স্রেফ মনের দুর্বলতা। আমি একটা ঘটনার কথা বলছি, শোন।''

বিক্রম বলল, ''না রে থাক। আজ অমাবস্যার রাত। ভূত-প্রেত নিয়ে আলোচনা না করাই ভাল।''

কিন্তু মৈনাক পাত্তাই দিল না। বলল, ''আরে শোনই না। তখন আমরা চেতলার দিকে থাকি। হঠাৎ একদিন রাত প্রায় একটার সময় খবর এল, দিদা... মানে আমার মায়ের মা প্রচণ্ড অসুস্থ। থাকেন পোস্তার দিকে। তাঁকে পি জি হসপিটালে নিয়ে আসতে হবে। খবরটা পেয়েই তো আমি পাড়ার একটা ট্যাক্সি নিয়ে পোস্তায় দৌড়লাম। রাত প্রায় দুটো নাগাদ যখন প্রেসিডেন্সি জেলের পাশ দিয়ে রেসকোর্সের দিকে এগোচ্ছি, তখন কবরখানার কাছে ট্যাক্সি ড্রাইভারটা বলে উঠল, 'দাদা, চোখ বন্ধ করুন, চোখ বন্ধ করুন। পিছন দিকে একেবারে তাকাবেন না।'''

সমীরণ এই সময় বলে উঠল, ''কেন?''

''তখন বুঝতে পারিনি। হঠাৎ দেখি, পাঁচতলা সমান উঁচু একটা লোক দু'পা ফাঁক করে কবরখানার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে একটা পতাকার মতো কিছু রয়েছে, খুব জোরে জোরে সেটা নাড়াচ্ছে লোকটা। ট্যাক্সিটা হুশ করে বেরিয়ে গেল। ড্রাইভার মারাত্মক জোরে চালাচ্ছিল। ভুল

দেখলাম কি না ভেবে পিছন ফিরে তাকালাম। কিন্তু তখন কাউকে দেখতে পেলাম না। পরে ড্রাইভার বলল, 'প্রায়ই রাতের দিকে ওই জায়গায় লোকটাকে দেখা যায়। লোকটা যদি পতাকা নাড়ে, তা হলে ঠিক আছে। আর ওই পতাকা নামিয়ে রাখলে তখন ওই রাস্তা দিয়ে যে যাবে, সে শেষ।'''

বিক্রম বলল, ''তা হলে স্বীকার করছিস, ভূত বলে কিছু আছে?''

''তোর মুন্ডু। পরদিন ইনস্পেকশনে গেলাম। কবরখানার কাছে ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘুরি করে বুঝতে পারলাম, কেন ওই লোকটাকে দেখেছিলাম। আসলে কী জানিস? কবরখানার উলটো দিকে তখন পরপর কয়েকটা মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং তৈরি হচ্ছিল। তারই ছায়া এসে পড়েছিল কবরখানার গেটে।''

সমীরণের বিশ্বাস হল না কথাটা শুনে। ও বলল, ''তা হলে পতাকাটা?''

মৈনাক বলল, ''আরে, ওটা একটা ছেঁড়া ব্যানার। হাওয়ায় তখন নড়ছিল।''

সমীরণ বলল, ''তুই উড়িয়ে দিচ্ছিস বটে, আমি কিন্তু একবার ভূত দেখেছি। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। উফ, এখনও সেদিনটার কথা ভাবলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।''

বিক্রম এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। এবার বলল, ''হ্যাঁ, আমিও শুনেছি। ওখানে নাকি ভূত আছে।''

''ভাই, তোরা বিশ্বাস করবি কি না জানি না। তখন আমি রিসার্চ করার জন্য প্রায়ই ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে যেতাম। একদিন সন্ধে সাতটা নাগাদ লাইব্রেরি থেকে ফিরে আসছি, মনটা খুব খারাপ। রিসার্চের জন্য পুরনো একটা বই দরকার। সেটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কিছুতেই। মেন গেটের দিকে আসার পথে বাগানের মাঝামাঝি হঠাৎ দেখি, একটা লোক যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এল। সিগারেট ধরানোর জন্য লাইটার চেয়ে লোকটা আমার পাশাপাশিই হাঁটতে লাগল। এ-কথা সে-কথার পর লোকটা হঠাৎ বলল, অত চিন্তা করার কিছু নেই। কাল অমুক জায়গায় অমুক র‍্যাকে বইটা খুঁজবেন, ঠিক পেয়ে যাবেন। গেটের সামনে এসেই লোকটা হাওয়া হয়ে গেল।''

মৈনাক হাসতে হাসতে বলল, ''বাব্বা, তোর ভূত তো দেখছি সিগারেটও খায়। লোকটা যে ভূত, কী করে বুঝলি?''

''পরদিন লাইব্রেরিতে গিয়ে জানতে পারলাম। বইটা অমুক র‍্যাকে আছে, বের করে দিন— বলতেই লাইব্রেরির লোকেরা বললেন, 'আপনিও তা হলে মোহান্তির পাল্লায় পড়েছিলেন?' কে মোহান্তি? ওঁরা বললেন, 'মোহান্তি ছিল লাইব্রেরিরই এমপ্লয়ি। একবার ঝড়-বৃষ্টির দিনে বাগানে গাছ চাপা পড়ে মারা গিয়েছিল।'''

মৈনাক বলল, ''বোগাস গল্প।''

আমি কিছু বলতে চাইছিলাম না, তাই চুপ করে ওদের কথা শুনছিলাম। ভূতে আমি খুব বিশ্বাস করি। একবার টেরও পেয়েছি। তাও রাত-বিরেতে নয়, একেবারে দিনের বেলায়। উফ, সেদিনটার কথা ভাবলে এখনও আমার ভয় ভয় করে। সত্যি বলতে কী, ভয়ে আমি খিদিরপুর আর গার্ডেনরিচের দিকটাই মাড়াই না। সমীরণ চুপ করে যাওয়ার পর আমি জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। সিংহিবাড়িতে পুজোর সময় ঢাক বাজানোর নিয়ম নেই। গভীর রাত, চারদিক নিস্তব্ধ। তারই মাঝে জলদগম্ভীর গলায় মন্ত্র উচ্চারণ করছেন পুরোহিত।

মৈনাক ঠাট্টা করে বলল, ''কী রে শুভ, তোর কোনও গল্প নেই?''

ওর বলার ধরন দেখে একটু রাগই হল। বললাম, ''আছে। তবে তোকে বলে কী হবে? তুই তো বিশ্বাস করবি না।''

''তবুও বলে ফ্যাল। কী জুটেছিল তোর কপালে? ভাল ভূত না খারাপ ভূত?''

বিরক্ত হয়েই বললাম, ''জানি না।''

তখন সমীরণ বলল, ''ঘটনাটা বলই না। কী হয়েছিল রে?''

সমীরণের আগ্রহ দেখে বলতে শুরু করলাম, ''বছরদুয়েক আগে কলকাতায় একটা লোক এসেছিল বেনারস থেকে। লোকটা শক্তির খেলা দেখাত। এই যেমন, গায়ের জোরে একটা প্লেনকে আটকে রাখতে পারত, দু'হাতে মোষ তুলে ধরত। লোকটার

নাম বাহাদুর [illegible] এবং বাহাদুর সিংহ দাবি করল, [illegible] জোর দেখাবে। দাঁত দিয়ে আস্ত একটা জাহাজ টানবে। এই বাহাদুরিটা ও দেখাবে গার্ডেনরীচের ছ'নম্বর ডকে।

''আমার এক বন্ধু আছে, সুনন্দ চৌধুরী। রাইটার্সের বড় অফিসার। জাহাজ টানা দেখানোর জন্য সে আমাকে টেনে নিয়ে গেল ছ'নম্বর ডকে। পোর্টের ডকে তার আগে আমি কখনও যাইনি। ধারণাই ছিল না, ডক অত বড়। গিয়ে দেখলাম, প্রায় হাজারদুয়েক লোকের ভিড়। জাহাজটা দাঁড়িয়ে আছে তীর থেকে প্রায় চার-পাঁচশো গজ দূরে। ও প্রান্তে একটা মোটা দড়ি বাঁধা। বাহাদুর সিংহ সেই দড়ির একটা প্রান্ত দাঁতে কামড়ে ধরে তীরের দিকে টানবে।

''যেখানে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে, তার পাশেই ডকের তিনতলা পুরনো গুদাম, দোতলায় টানা বারান্দা— প্রায় দুশো গজের মতো হবে। ইংরেজ আমলে ওইসব গুদামে মাল রাখা হত। এখন ওখানে কেউ পা-ও মাড়ায় না। সেটা আমি অবশ্য জানতাম না। উপরদিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার মনে হল, গুদামের বারান্দায় যদি উঠে যাই, তা হলে নীচের পুরো অনুষ্ঠানটা ভাল করে দেখা যাবে। দোতলায় ওঠার জন্য লোহার একটা স্পাইরাল সিঁড়ি আছে। সবার অজান্তে ওই সিঁড়ি দিয়ে আমি দোতলায় উঠে গেলাম।

''দোতলায় উঠতেই হঠাৎ আমার গা ছমছম করে উঠল। দীর্ঘদিন জমে থাকা ময়লা, বিচ্ছিরি গন্ধ। গুদামের ভিতরদিকে তাকাতেই দেখলাম ঘন অন্ধকার। ওই প্রান্তে কী আছে, দিনেরবেলাতেও কিছু বোঝা যাচ্ছে না। বারান্দার দিকে এগিয়ে রেলিংয়ের ধারে যেতেই মন থেকে ভয় ভয় ভাবটা চলে গেল। নীচে প্রচুর লোকজন হুড়োহুড়ি করছে। বাহাদুর সিংহ এবার দাঁত দিয়ে জাহাজটা টানবে, কাছ থেকে সবাই সেটা দেখতে চান। বাহাদুরির মধ্যে কোনও চালাকি আছে কি না, সেটা বোঝার জন্য আমি এদিক-ওদিক নজর দিতে লাগলাম।

''হঠাৎই চোখে পড়ল ভিড়ের মাঝে এক ভদ্রলোক মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। চোখাচোখি হতেই কেন জানি না আমার শরীর শিরশির করে উঠল। ভদ্রলোক বেশ লম্বা, ছ' ফুটের সামান্য বেশি। পরনে পুরনো আমলের পোশাক, যাত্রায় যেমন রাজা-উজিররা পরেন তেমন আর কী। ভ্যাপসা গরমেও গায়ে একটা চাদর, মুখের অর্ধেকটা ঢাকা। আমার দিকে তাকিয়ে উনি যেন বলতে চাইছেন, 'ওখানে থেকো না, নীচে নেমে এসো।'

''সঙ্গে সঙ্গে আমি চোখ সরিয়ে নিলাম। এদিকে বাহাদুর জাহাজ টানা শুরু করেছে। ঠিক বুঝতে পারছি না জাহাজ পাড়ের দিকে আসছে কি না। তখন লোকজনের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা। দাঁত দিয়ে দড়ি টানতে টানতে বাহাদুর আর নিজের জায়গায় নেই। গুদাম থেকে আরও দূরে চলে যাচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ও এগোচ্ছে। মনে হল, জাহাজটা যেন সত্যিই পাড়ের দিকে একটু এগিয়ে আসছে।

''হঠাৎই নীচের দিকে চোখ পড়তেই দেখি সেই লম্বামতো ভদ্রলোক ঠিক বারান্দার নীচে এসে দাঁড়িয়েছেন। বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন। চাদরের আড়াল খানিকটা সরে গেছে। মুখটা দেখে মনে হল কোথায় যেন ভদ্রলোককে দেখেছি। কিন্তু তখন মনে পড়ল না। ঠোঁট নাড়া দেখে মনে হল উনি বলছেন, 'উপরে বিপদ, শিগগির নীচে নেমে এসো।'

''পোর্টের কোনও কর্মী হবেন ভেবে আমি বেশ চিৎকার করেই বললাম, 'আমাকে কিছু বলছেন?'

''নীচ থেকে উনি ঘাড় নাড়লেন। তারপর ফের ঘাড় নেড়ে বোঝালেন নীচে নেমে এসো। আমি বুঝতেই পারলাম না, কেন উনি এত সাবধান করছেন। পুরনো আমলের বাড়ি। হয়তো বারান্দা ভেঙে পড়তে পারে। তখন মনে হল, আর তো মাত্র মিনিটখানেকের ব্যাপার। জাহাজটা পাড়ের দিকে প্রায় টেনে এনেছে বাহাদুর। লোকজন হাততালি দিতে আরম্ভ করেছে, ওঁকে ঘিরে আছে টিভি-ক্যামেরা। যা দেখার, তা দেখা হয়ে গেছে। উপরে থেকে আর কোনও লাভ নেই। আমি সিঁড়ির দিকে এগোলাম।

''হঠাৎ চোখে পড়ল, গুদামের ঠিক মধ্যিখানে

একটা লিফ্‌ট। বেশ বড় একটা ঘরের মতো। লিফ্‌টের ঠিক মাঝে কাঠের হাতলওয়ালা একটা চেয়ার। বোঝাই যাচ্ছে, বহু বছর ওই লিফ্‌ট কেউ ব্যবহার করেনি। হয়তো এই লিফ্‌টের সাহায্যে একদিন মাল ওঠানো হত। কোলাপসিবল গেটটা হাঁ করে খোলা। কেন জানি না, লিফ্‌টটা আমায় টানতে লাগল। মনে হল, ওই চেয়ারে গিয়ে বসি।

"কে যেন আমায় টেনে নিয়ে গেল ওই লিফ্‌টের ভিতর। চেয়ারে বসতেই আপনা থেকে বন্ধ হয়ে গেল কোলাপসিবল গেটটা। তারপরই ঘট ঘট ঘটাং একটা আওয়াজ, লিফ্‌ট চালু হলে যেমনটা হয়। চেয়ারটা একবার কেঁপে ওঠার পর লিফ্‌ট নীচের দিকে নামতে শুরু করল। ঘন অন্ধকারের মধ্যে আমি ডুবে যাচ্ছি। কয়েক সেকেন্ড পর বিকট শব্দ তুলে লিফ্‌ট নীচে কোথাও আছড়ে পড়ল।"

এই সময় মৈনাক জিজ্ঞেস করল, "তোর কি মনে হয়, দিনেরবেলাতেও লিফ্‌টের ভিতর ভূত বসে ছিল?"

সমীরণ ওকে পাত্তা না দিয়ে বলল, "তারপর কী হল, বল?"

"মনে -হয় আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। যখন জ্ঞান ফিরে এল, প্রথমেই শুনলাম ছলাত ছলাত শব্দ। অন্ধকারে কিছু দেখতে না পেলেও বুঝতে পারলাম জল-কাদার উপর পড়ে আছি। তখনই শীত শীত করতে লাগল। অন্ধকারটা ফিকে হয়ে আসতে টের পেলাম, আমি ওখানে একা নই। জায়গাটা কোনও নদীর পাড়ে। বিরাট একটা নৌকো দাঁড়িয়ে আছে, আর সেখান থেকে বস্তা বস্তা মাল কাঁধে করে নিয়ে আসছে কুলি মজুররা। আমার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে উপরে কোথাও। কারও মুখে কোনও কথা নেই। দু'-একজনকে থামানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু ওরা আমাকে দেখতে পাচ্ছে বলে মনে হল না। কী করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। শেষে কপালে যা-ই থাক, ভেবে ওদের পিছু পিছু সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এলাম। দেখি, বিরাট একটা গোডাউন। সেখানে সারি সারি বস্তা সাজানো। লালমুখো কয়েকজন সাহেব দাঁড়িয়ে কথা বলছে চাপকান-পরা একজন লোকের সঙ্গে। সাহেবরা আমাকে লক্ষই করল না। চাপকান পরা লোকটা আমাকে দেখে অবাক হয়ে তাকাল। চোখাচোখি হতে আমি চমকে উঠলাম। আরে, এ তো সেই লোকটা যে আমাকে গুদামের দোতলা থেকে নেমে আসতে বলেছিল! এখন আর লোকটার মুখে চাদর ঢাকা নেই।"

এ পর্যন্ত শুনে মৈনাক বলল, "গল্পটা কিন্তু ভাল বানিয়েছিস, শুভ। ওই লোকটাই তোকে শেষ পর্যন্ত ছ' নম্বর ডক থেকে বের করে আনল, তাই না? পরে আর মনে পড়েনি লোকটা কে?"

ও অবিশ্বাস করছে বুঝে বললাম, "মনে করার চেষ্টা করিনি। পরে পোর্টের লোকজনের মুখে শুনেছি, ওই ছ'নম্বর ডকে মাল নামানোর সময় একবার ক্রেন ভেঙে বেশ কয়েকজন মজুর মারা গিয়েছিল। তাদের আত্মা এখনও ওখানে ঘুরে বেড়ায়।"

বিক্রম বলল, "থাক, আর ভূতের আলোচনা করতে হবে না। পুজো প্রায় শেষ হতে চলল। চল, নাটমন্দিরে যাই।"

আমরা উঠব উঠব করছি, এমন সময় জলদগম্ভীর স্বরে কে যেন বলল, "বাবাসকল, একটু দাঁড়াও।"

আমরা চারজনেই চমকে উঠলাম। বৈঠকখানার অন্যদিকে তাকিয়ে দেখি, চাদর জড়িয়ে শুয়ে থাকা একজন উঠে বসেছেন। আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "ভাল করে দেখে বলো তো বাবা, আমিই সেই ব্যক্তি কি না?"

বলতে বলতে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সোজা আমাদের দিকে হেঁটে এসে এক মুহূর্ত মৈনাকের দিকে তাকালেন। তখনই আমি লোকটাকে চিনতে পারলাম। বিক্রমদের পূর্বপুরুষ গোবিন্দলাল সিংহ। যেন ছবি থেকে উঠে এসেছেন। গোবিন্দলাল এবার বললেন, 'বাবাসকল, যাই দেখে আসি মায়ের পুজো কেমন হচ্ছে।" তারপর আমাদের সকলের চোখের সামনে দিয়ে উনি বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

৬ অক্টোবর ২০০২
অলংকরণ। অনুপ রায়

ঘোড়ামারায় একটি রাত

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

নার্ভাস মুখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল সুমন। বিকেলবেলাতেও স্টেশনটাকে এমন পাণ্ডববর্জিত মনে হয়নি, এখন চারদিকটা কেমন ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। স্টেশনের আশপাশে একটা-দুটো যা দোকানপাট ছিল তাও বন্ধ হয়ে গেছে বহুক্ষণ। কোথাও কোনও জনমনিষ্যির চিহ্নটি নেই। কানে আসে শুধু ঝিঁঝিপোকার গা-শিরশির-করা আওয়াজ।

পার্থ প্ল্যাটফর্মের সিমেন্টের বেঞ্চিতে বসে পড়েছে। কম্ফর্টারে কান-মাথা ঢাকতে ঢাকতে গজগজ করে উঠল, ''তোর জন্য... তোর জন্যই লাস্ট ট্রেনটা মিস করলাম।''

সুমন কাঁচুমাচু মুখে বলল, ''বা রে, আমার কী দোষ? পথে যদি রিকশাঅলার সাতবার চেন খুলে যায়...!''

''তুই দেরি করে খেতে বসলি কেন?'' পার্থ খেঁকিয়ে উঠল, ''বরযাত্রীদের জন্য কেন অপেক্ষা করলি? আগের ব্যাচে বসা যেত না? রজত তো কতবার বলেছিল, তোরা কলকাতা ফিরবি, কেন মিছিমিছি দেরি করছিস...।''

''ইল্লি রে, কেন আগে বসব? বরযাত্রীদের ব্যাচটা সবসময়ে স্পেশ্যাল হয়। ওদের জন্য কত কী আলাদা করে তোলা ছিল দেখেছিস? সলিড-সলিড মাংসের পিস, গোবদা গোবদা ফিশফ্রাই, জলভরা তালশাঁস-সন্দেশ...''

''তুই কী হ্যাংলা রে। খাওয়াটাই কি জীবনের মোক্ষ?''

''ফ্যাচফ্যাচ করিস না। তুইও কিছু কম টানিসনি। চেয়ে চেয়ে পাঁচখানা ফিশফ্রাই খেলি, এক ডজন সন্দেশ সাবাড় করলি, ভাবছিস আমি কিছুই লক্ষ করিনি?''

''আহা, চটে যাচ্ছিস কেন?'' ঝপ করে আহারের প্রসঙ্গটা চেপে গেল পার্থ। হাতমুখ নেড়ে বলল, ''এখন কী করা যায় তাই বল। সারারাত এভাবেই কি ভ্যাবলার মতো বসে থাকব?''

এই চিন্তাতেই তো গায়ের লোম পর্যন্ত খাড়া হয়ে যাচ্ছে সুমনের। হাওড়া থেকে ঘোড়ামারা স্টেশন ট্রেনে পাক্কা এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিট। অর্থাৎ কমপক্ষে পঞ্চাশ কিলোমিটার। এই রাতদুপুরে কীভাবেই বা ফেরা যাবে এতটা পথ?

মাইলখানেকের মধ্যে হাইওয়ে আছে বটে, কিন্তু সেখানেও কি বাস-টাস পাওয়া যাবে এখন? তা ছাড়া হাইওয়েতে নাকি চোর-ছ্যাঁচোড়ের বেজায় উপদ্রব। রজতই গল্প করছিল, এদিককার চোররা নাকি ভারী নচ্ছার, কিছু না পেলে তারা নাকি জামাকাপড় খুলে নিয়ে চলে যায়। এই হাড়কাঁপানো মাঘের রাতে তেমন কারও পাল্লায় যদি পড়ে...।

রজতদের বাড়িই ফিরে যাবে কি? কিন্তু সেও তো মেলা দূর। স্টেশন থেকে না হোক দু'-আড়াই মাইল। রিকশাঅলা তো তোদের নামিয়ে দিয়েই উলটোমুখে ছুট মারল, স্ট্যান্ডেও আর গাড়ি নেই, শীতে কাঁপতে কাঁপতে অতটা রাস্তা হাঁটা কি এখন সম্ভব?

ইস, কী কুক্ষণে যে রজতের দিদির বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে এসেছিল আজ! বাড়িতে পইপই করে বলে দিয়েছিল, সুমনরা যেন অবশ্যই

রাতে ফিরে আসে। কাল কী ঝাড় যে কপালে আছে!

হতাশ মুখে সুমন বলল, ''চোখ-কান বুজে কয়েকটা ঘণ্টা কাটাতেই হবে রে! উপায় নেই।''

''খোলা প্ল্যাটফর্মে? ঠান্ডায় জমে কুলপি হয়ে যাব যে!''

''একটা কাজ অবশ্য করা যায়। ওপারে টিকিট কাউন্টারের সামনে ঢাকামতন জায়গা আছে একটা। বেঞ্চি-টেঞ্চিও আছে। বিকেলে ট্রেন থেকে নেমে দেখেছিলাম। ওখানেই যাই চল। অন্তত ঠান্ডাটা তো কম লাগবে।''

''চল তবে।''

উঠে পড়ল পার্থ। ওভারব্রিজের দিকে এগোচ্ছে দুই বন্ধু। চাপ চাপ কুয়াশায় ছেয়ে আছে চরাচর। প্ল্যাটফর্মের বাতিগুলো কেমন ঝাপসা ঝাপসা। আকাশে চাঁদ উঠেছে আধখানা, কুয়াশার দাপটে তারও বেশ নিষ্প্রভ দশা। জ্যোৎস্না যেন পৌঁছেও পৌঁছতে পারছে না পৃথিবীতে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সুমন বলল, ''জায়গাটা
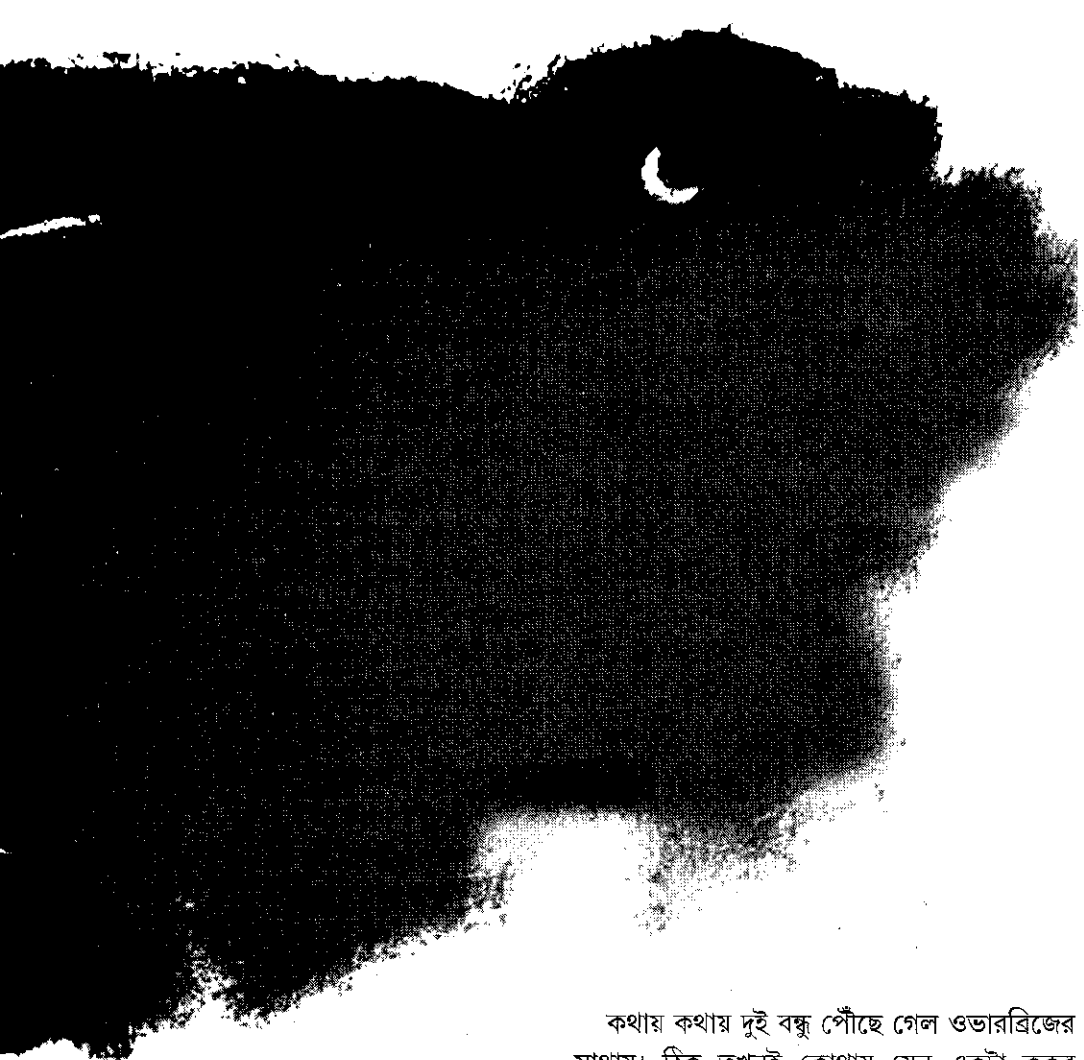
বড় নিঝুম রে! মনে হচ্ছে যেন ভৌতিক স্টেশন। তাই না?''

পার্থ টেরচা চোখে তাকাল, ''তুই বুঝি ভূতে বিশ্বাস করিস?''

''তা নয়। তবে... এত শুনশান, কেমন একটা আলো-আঁধারের খেলা চলছে... তোর গা ছমছম করছে না?''

''ধুস, আমি ভূতে বিশ্বাস করি না।''

''না রে, এসব জায়গায় কিন্তু ভূত থাকার খুব চান্স।''

কথায় কথায় দুই বন্ধু পৌঁছে গেল ওভারব্রিজের মাথায়। ঠিক তখনই কোথায় যেন একটা কুকুর ডেকে উঠল করুণ সুরে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এক বাজখাঁই হুংকার, ''টিকিট?''

বেজায় চমকেছে দুই বন্ধু। ওদিকের সিঁড়ির মুখে এক দশাসই চেহারার লোক দাঁড়িয়ে। পরনে সাদা প্যান্ট, কালো কোট। গায়ের রং গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ।

লোকটা আবার হাঁক পাড়ল, ''টিকিট? টিকিট? এই খোকারা, জলদি টিকিট দেখাও।''

খোকা সম্বোধনটা ঠং করে কানে লেগেছে দু'জনেরই। হোক না ফার্স্ট ইয়ার, কলেজে তো পড়ছে, একটা অজানা লোক তাদের খোকা বলে কোন আক্কেলে?

অসন্তুষ্ট গলায় সুমন বলল, "আমরা হাওড়া থেকে রিটার্ন কেটেই উঠেছি।"

"অ। কিন্তু রাত বারোটার পর তো ওই টিকিট আর চলবে না।"

"রাত বারোটার পর তো আপনাদের ট্রেনও নেই।" পার্থর স্বরে বিরক্তি, "কাল সকালে আমরা নতুন টিকিট কেটে নেব।"

"ঠিক আছে।" লোকটা যেন সামান্য নরম হয়েছে, "তা এখন চললে কোথায়?"

"ওই ঢাকা জায়গাটায় গিয়ে বসব।"

"ওখানে?" লোকটার স্বরে যেন একটু চিন্তান্বিত ভাব, "ওখানে বসাটা কি ঠিক হবে?"

"বেঠিক কী আছে? ওটাই তো ঘোড়ামারা ওয়েটিংরুম, না কী?"

"তা বটে। তবে ওখানে একটু গণ্ডগোল আছে। তিনি কিন্তু যখন তখন এসে পড়তে পারেন।"

"তিনি?" সুমন আর পার্থ মুখ চাওয়াচাওয়ি করল, "কে তিনি?"

"যিনি মাঝেমধ্যেই রাতবিরেতে হানা দেন।" গলা নামাল লোকটা, "আর একবার যদি তোমাদের ওখানে দেখতে পায়, তো হয়ে গেল!"

সুমনের বুকটা ধুকধুক করে উঠল। খপ করে চেপে ধরেছে পার্থর হাত। পার্থ গলাখাঁকারি দিল, "আপনি কি আমাদের ভয় দেখাতে চাইছেন?"

"বালাই ষাট। তোমরা ভয় পাবে কেন? তিনি কখনও কারও অনিষ্ট করেন না। ওখানে বসে থাকলে টানাহ্যাঁচড়া করে ধরে নিয়ে যাবেন এই যা। যেসব প্যাসেঞ্জার ট্রেন না পেয়ে আটকে যায়, তাদের উপর ভীষণ মায়া ওঁর।"

সুমন ফের আঁকড়ে ধরেছে পার্থর হাত। ফিসফিস করে বলল, "অ্যাই চল, যেখানে ছিলাম সেখানেই ব্যাক করি। কী দরকার ভুতটুতের খপ্পরে পড়ার।"

"ছাড় তো।" পার্থ হ্যাঁচকা টান দিল সুমনকে, "আমরা ওখানেই যাব। কিছু হবে না।" বলেই তরতরিয়ে সিঁড়ি ধরে নামছে। একদম নীচের ধাপিতে এসে ঘুরে তাকাল। লোকটা এখনও ঠায় দাঁড়িয়ে।

পার্থ চেঁচিয়ে বলল, "আপনার ভূতবাবাজি আজ এদিকের [illegible] না। [illegible]লেছেন? এই শর্মাকে ভূতেরাও [illegible]"

লোকটা হো-হো অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। হাসিটা ছড়িয়ে যাচ্ছে নির্জন প্ল্যাটফর্মে। হাসতে হাসতে লোকটা চলে গেল ওভারব্রিজ বেয়ে। ক্রমশ মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

'বিশ্রামাগার' লেখা জায়গাটায় আলো-টালোর বালাই নেই। প্ল্যাটফর্মের টিমটিমে বাতিরাই যা দু'-এক কুচি আলো ছিটিয়ে দিচ্ছে। আবছা আঁধার-মাখা বেঞ্চিতে সুমনকে নিয়ে বসেছে পার্থ। বন্ধুর পিঠে জোরসে একটা চাপড় মেরে বলল, "কী রে, খুব ঘাবড়েছিস?"

সুমন ঢোক গিলল, "না মানে... লোকটা যা বলল, তাতে মনে হয়..."

"ধুৎ, পাত্তা দিস না তো! বুঝলি না লোকটার ধান্দা? রাতদুপুরেও ঘাপটি মেরে ছিল, যদি কোনও বিনা টিকিটের প্যাসেঞ্জার পায়! আমাদের কবজা করতে পারল না তো, তাই একটু ফিচলেমি করে গেল।"

"বলছিস? আমার কিন্তু..."

"ভয়কে জয় করতে শেখ।... দেব তোকে একটা ভয় তাড়ানোর দাওয়াই?"

"কী দাওয়াই?"

"আছে। গান। আয়, দু'জনে মিলে গলা ছেড়ে গান গাই।"

"এখন? গান? এখানে?"

"ইয়েস। শীত জব্দ চানে, ভয় জব্দ গানে। চান তো এক্ষুনি করা যাবে না, এক গানেই এখন ডবল এফেক্ট আনব।"

সুমন বুঝি সাহস পেল খানিকটা। বলল, "কী গান গাইবি?"

"আছে একখানা জব্বর কালোয়াতি। কাফি ইমন দরবারি মালকোশ সব পাঞ্চ করা। আমি শুরু করছি, তুই সঙ্গে সঙ্গে সুরটা ধরে যা।"

উরুতে তাল বাজাতে বাজাতে গলা ছাড়ল পার্থ। প্রথমে একটুক্ষণ আ আ করে আলাপ। তারপর ঢুকেছে গানে,— "কচুবনে কেঁদে গেল

কালো মুখুরে... তাই মা দেখে বেড়ালছানা ঝিমোয় দুপুরে...''

নানান কায়দায় খেলিয়ে খেলিয়ে গেয়ে চলেছে পার্থ। ওই দু'লাইনই। শুনে শুনে সুমনও কণ্ঠ মেলাল। যৌথ স্বর কখনও সপ্তমে চড়ে, কখনও নেমে আসে খাদে। গিটকিরির দাপটে ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে ভয়। তানের কসরতে শীত বেচারার পালাই-পালাই হাল।

হঠাৎই কোত্থেকে খোনা-খোনা গলার ডাক, ''এঁই যেঁ শুঁনছঁ? শুঁনছ?''

সুরের আবেশে চোখ বুজে গিয়েছিল দুই বন্ধুর। দু'জোড়া চোখ পটাং করে খুলে গেল। কই, কেউ তো নেই ধারেকাছে! কী রে বাবা, মনের ভুল নাকি?

ফের উৎসাহ নিয়ে দুই বন্ধু শুরু করেছে যুগলবন্দি, তখনই পার্থর ঘাড়ে একটা হিমশীতল ছোঁয়া, ''এঁই যেঁ তোঁমরাঁ কাঁরাঁ?''

পার্থ যেন ইলেকট্রিক শক খেল। ধড়মড়িয়ে সামনে হুড়মুড়িয়ে পড়েছে। কোনওক্রমে ঘাড় ঘোরাতেই দেখতে পেল এক ছায়ামূর্তি। কে ওটা?

পার্থ নয়, সুমন কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞেস করল, ''আ আ... আপনি কে?''

''আঁমি এঁখানকাঁর টিঁকিঁটচেঁকাঁর।''

ঘোড়ামারা স্টেশনে রাতে কোনও মানুষ নামে না, সেখানে কিনা একজোড়া টিকিটচেকার? এ কি সম্ভব? ঝিঁঝিপোকার ডাকটাই বা বন্ধ হয়ে গেল কেন হঠাৎ?

বেঞ্চিতে ভর দিয়ে পার্থ উঠে দাঁড়াল। তোতলাতে তোতলাতে বলল, ''আ আ... আমাদের টি টি... টিকিট আছে। বি বি... বিশ্বাস করুন।''

বেঞ্চির পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে ছায়ামূর্তি। হাতে একখানা মিটমিটে লণ্ঠন। বাতিটা উঁচু করে ধরতেই মুখখানা স্পষ্ট হল খানিক। ঘোমটার মতো করে আষ্টেপৃষ্ঠে মাফলার জড়িয়ে আছে, গায়ে লতপতে কালো কোট। মুখের মধ্যে চোখ আর দাঁতই আগে নজরে আসে। ভ্যাবাচ্যাকা দুষ্ট চোখ কেমন ঠেলে বেরিয়ে আসছে, লম্বা লম্বা দাঁত ঝুলছে ঠোঁট বেয়ে।

খুনখুনে গলায় ছায়ামূর্তি বলল, ''তাঁ তোঁ বুঁঝলাঁম। কিন্তু এঁই ঠাঁন্ডায় এঁখানেঁ বঁসে বঁসে চিল্লাচ্ছঁ কেন? আঁমার কাঁচা ঘুঁমটা ভেঁঙে গেঁল।''

''চেঁচাইনি তো স্যার। গান গাইছিলাম।''

''খুব শীত করছিল যে। গাড়ি ফেল করলাম, বাড়ি ফেরা হল না...''

''আঁ। তাঁর মাঁনে খুঁব আঁতাঁন্তরেঁ পঁড়েঁছ?'' ভুতুড়ে নাকিসুরে মমতা ঝরে পড়ল, ''যাঁক গেঁ, আঁমি যঁখন এঁসেঁ গেঁছি, আঁর কোঁনও ভঁয় নেই। ওঁঠো। উঁঠে পঁড়োঁ।''

কোরাসে ককিয়ে উঠল দুই বন্ধু, ''কেন স্যার?''

''এঁসোঁ আঁমাঁর কোঁয়ার্টারেঁ। এঁই তোঁ, সাঁমনেঁই।''

এবার পার্থ খামচে ধরল সুমনের সোয়েটার। তার গলা শুকিয়ে কাঠ। জিভে তালু ভিজিয়ে বলল, ''না না, এখানেই বেশ আছি।''

''যাঁহ, তাঁ হঁয় নাঁকি? আঁমি থাঁকতে এঁই শীঁতে এঁখানেঁ পঁড়েঁ থাঁকবেঁ? নিঁমোনিয়া হঁয়ে যাঁবে যেঁ।''

''আমাদের শীত করছে না স্যার।'' সুমন অস্ফুটে বলল, ''আমরা ঘামছি স্যার।''

''বুঁঝেছি। লঁজ্জা পাঁচ্ছ। আঁরে বাঁবা, আঁমি এঁকাই থাঁকি। আঁমার ওঁখানে তোঁমাদের কোঁনও অঁসুবিধেঁ হঁবে নাঁ। আঁমার খাঁট আঁছে, বিছানা আঁছে, কঁম্বল আঁছে, আঁরাম কঁরে কঁয়েক ঘঁণ্টা শুঁয়ে নাঁও।''

পার্থ ডুকরে উঠল, ''লাগবে না স্যার। আমাদের ঘুম পাচ্ছে না।''

''দ্যাখোঁ ছোঁকরা, পাঁকামি কোঁরো নাঁ। তাঁ হঁলে আঁমি কিঁন্তু বঁকব।''

''আঁইই, ভূতের বকুনি! সর্বনাশের মাথায় পা।''

সুমন ফিসফিস করে পার্থকে বলল, ''বেশি চটিয়ে দিস না। ঘাড় মটকে দিতে পারে।''

ছায়ামূর্তি ঠিক শুনতে পেয়ে গেছে। বলল, ''এঁমাঁ ছিঁ ছিঁ, এঁ কীঁ কঁথা! এঁসোঁ নাঁ আঁমার সঁঙ্গে, রঁসগোল্লাঁ খাঁওয়াবঁ।''

''আমাদের খিদে নেই স্যার।'' আবার কোরাস বেজে উঠল, ''আমরা বিয়েবাড়িতে প্রচুর খেয়েছি।''

"তোমরা এমন করছ কেন? কত আদর করে ডাকছি তোমাদের। এসো, এসো আমার সঙ্গে।" বলেই খপ করে হাত বাড়াল ছায়ামূর্তি। ধরে ফেলেছে পার্থর হাত। বরফের মতো হিম আঙুলগুলো টানছে পার্থকে।

পার্থ পলকে অজ্ঞান। আঁ আঁ করতে করতে সুমনও।

কখন জ্ঞান ফিরল, জানে না পার্থ। চেতনা আসার সঙ্গে সঙ্গে আবার ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। মুখের কাছে ঝুঁকে আছে সেই গজাল-গজাল দাঁত, ঠেলে আসা চোখ।

দন্তপঙ্ক্তি বিকশিত হল, "কী, এখন কেমন বোধ করছ?"

পার্থ অতিকষ্টে বলল, "আমি কোথায়?"

"আমার ঘরে। আমার বিছানায় শুয়ে আছ..."

সত্যি তো, এ তো একটা ঘরই বটে! আলো নেই তেমন, বোধহয় লণ্ঠন জ্বলছে, তার মধ্যেও দেওয়াল-টেওয়ালগুলো বুঝতে অসুবিধে হয় না। আশ্চর্য, মাথার উপর একটা সিলিংফ্যানও আছে।

সুমনেরও সংজ্ঞা ফিরেছে। সে শুয়ে আছে সিঁটিয়ে, চোখ খুলেই বুজে ফেলছে। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, "আমরা এখানে এলাম কী করে?"

"বুড়োমানুষটাকে খুব খাটিয়েছ। দু'জনকে টেনে আনতে গিয়ে আমার ঘাম ছুটে গেছে।" গজাল-দাঁত বিছানার কোণে বসল। খ্যাঁচ করে শব্দ হল একটা। ফের নাকি-নাকি সুর বাজল, "তোমরা আমায় দেখে এত ভয় পাচ্ছ কেন বলো তো? নাকি আমায় ভূত ভাবছ?"

একেই কি বলে ভৌতিক রসিকতা? ভূত বলে তাকে ভাবা হচ্ছে কেন?

সুমন মরিয়া হয়ে বলল, "কেন ঠাট্টা করছেন স্যার? আমরা জেনে গেছি।"

পার্থ বলল, "হ্যাঁ স্যার, চেকারবাবু আমাদের বলে দিয়েছেন আপনি কে?"

"কে চেকারবাবু? কালোদা নয় তো? ওভারব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে ছিল?"

"হ্যাঁ স্যার। উনি তো বললেন, আপনি আসবেন, আমাদের বাড়িতে নিয়ে আমাদের জন্য পীড়াপীড়ি করবেন..."

"আরে দূর বোকা, কালোদাই তো ভূত। সাত বছর আগে অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে কালোদার। রানিং ট্রেনে উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল, কেটে একেবারে দু আধখানা। এই ঘোড়ামারা স্টেশনেই। তারপর থেকেই রাতবিরেতে লোককে ভয় দেখানোর জন্য দাঁড়িয়ে থাকে ওখানটায়। বেঁচে থাকার সময়ে যাত্রীদের উত্যক্ত করত খুব, মরে গিয়েও অভ্যেসটা যায়নি।"

"ও, আপনি তা হলে সেরকম কিছু নন!" সুমন সোজা হয়ে উঠে বসল, "সত্যি, এতক্ষণে আমাদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার জোগাড় হয়েছিল।"

সাহসী পার্থও উঠে বসেছে। তবে তার এখনও ধন্দ যায়নি। জুলজুল চোখে দেখছে গজাল-দাঁতকে। সন্দিগ্ধ গলায় বলল, "কিন্তু আপনার গলার আওয়াজটা তো...?"

"ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে হয়েছে ভাই। এককালে ঘোড়ামারায় মশার খুব সুনাম ছিল তো, কামড়ালেই পালাজ্বর।" গজাল-দাঁত ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলল, "এখন আর সেই রামও নেই, অযোধ্যাও নেই। সেইসব পিনপিনে মশা আর কোথায় এখন? ঝোপঝাড় সাফ হয়ে গেছে, ঘরে ঘরে মশামারা-ধূপের উৎপাত, কতসব ট্যাবলেট বেরিয়ে গেছে..."

"বুঝলাম। তা আপনার কোয়ার্টারটা এত অন্ধকার কেন?"

"লোডশেডিং চলছে যে! ঘোড়ামারায় এরকমই হয়। কারেন্ট এই আছে, এই নেই। যাক গে যাক, তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ো। কম্বলগুলো ভাল করে গায়ে টেনে নাও।"

কদাকার লোকটাকে আর তেমন কিম্ভূতকিমাকার লাগছিল না পার্থ-সুমনের। চেহারা যেমনই হোক, লোকটা সত্যিই বড় ভাল। নিজেদের বোকামির জন্য মনে মনে হাসিও পাচ্ছিল দুই বন্ধুর। আসল ভূতকে মানুষ ভেবে তারা কিনা এক জ্যান্ত মানুষকে ভূত ভেবে ফেলেছিল। ছ্যা ছ্যা...।

গজাল-দাঁত লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর সুমন বলল, ''বিশ্বাস হল তো, ভূত আছে কি নেই?''

ওভারব্রিজের কালোদার কথা ভেবে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল পার্থর। তবু জোর করে একটা তাচ্ছিল্যের সুর ফোটাল গলায়, ''দূর, ওটা কি একটা পাত্তা দেওয়ার মতো ব্যাপার? ঘুমিয়ে পড়।''

কম্বলের ওমে সুমনের চোখ জড়িয়ে এল। দু'মিনিটের মধ্যে পার্থরও নাক ডাকছে। মিশমিশে অন্ধকারে একটাই আওয়াজ— ফররফর... ফররফর।

কনকনে ঠান্ডায় কাকভোরে ঘুম ভেঙে গেল সুমনের। চোখ রগড়ে উঠে বসতেই শরীর হিম। পাগলের মতো দু'হাতে ঝাঁকাচ্ছে পার্থকে।

জাগতে-না-জাগতেই পার্থর চক্ষু চড়কগাছ। এ তারা কোথায়?

রাত্তিরের সেই ঘর, বিছানা, কম্বল বেবাক মিলিয়ে গেছে মহাশূন্যে। ঘোড়ামারা স্টেশনের সিমেন্টের বেঞ্চিতেই তো তারা শুয়ে আছে দু'জনে! খোলা প্ল্যাটফর্মে!

৬ অক্টোবর ২০০২
অলংকরণ: সুব্রত চৌধুরী
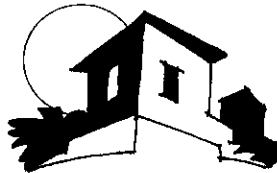
পোড়ো কারখানার বাসিন্দা

বিপুল মজুমদার

শহরতলির একপ্রান্তে শান্ত নিরিবিলি পরিবেশে পিকলুদের বাড়ি। ওদের বাড়ির পাশে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা হলুদ রঙের একতলা বাড়িটা সামন্তদের। বছরখানেক ধরে ওইবাড়ির দরজায় তালা ঝুলছে। সামন্তদের কর্তা-গিন্নি বর্তমানে আমেরিকায় ছেলের কাছে রয়েছেন। ওঁরা যখন ছিলেন তখন ওই বাড়িতে পিকলুর অবাধ যাতায়াত ছিল। কর্তা-গিন্নির স্নেহের পাত্র ছিল পিকলু। সামন্তদের বাড়ির পিছনদিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে উঁচু পাঁচিল-ঘেরা একটা পরিত্যক্ত কারখানা। লোকে বলে, নাটবল্টুর কারখানা। অন্ধকারে ওই বন্ধ কারখানার উঁচু শেড আর ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লোহালক্কড়ের টুকরোগুলিকে প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীদের মতো দেখতে লাগে। রাত্রিবেলা বাড়ির ছাদ থেকে বারকয়েক সামন্ত জেঠুদের ওই ভাঙাচোরা কারখানাটির দিকে তাকিয়ে দেখেছে পিকলু। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই গা ছমছম করে ওঠে।

বার্ষিক পরীক্ষার দিনকয়েক আগের ঘটনা। বিকেলের দিকে পড়াশোনার শেষে পাড়ার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে ক্রিকেট খেলছিল পিকলু, নিজেদের বাড়ির সামনের রাস্তায়। হঠাৎ ওর ব্যাটের সপাট আঘাতে বল সরাসরি সামন্তদের বাড়ির ছাদে। কিছুক্ষণ আগে এমনই এক ছক্কা হাঁকাতে গিয়ে একটা বল গায়েব হয়েছে। এটি দ্বিতীয়টি। বলটি যার, সে খেপে গিয়ে পিকলুকে চেপে ধরল। যেহেতু ছক্কাটি তার হাত দিয়ে বেরিয়েছে, সুতরাং বল খুঁজে আনার দায়িত্ব যেন পিকলুরই। সামন্তদের বাড়ি বন্ধ থাকায় সিঁড়ি দিয়ে ছাদে ওঠার কোনও উপায় নেই। ওই বাড়ির লাগোয়া পেয়ারাগাছটি একেবারে ছাদে গিয়ে পড়েছে। বন্ধুর পীড়াপীড়িতে অগত্যা পেয়ারাগাছটিকেই ভরসা করল পিকলু। বন্ধুদের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে অতি সন্তর্পণে গাছ বেয়ে ছাদে গিয়ে উঠল।

ছাদের প্রতিটি কোণ আঁতিপাঁতি করে খোঁজার ফাঁকে একসময় তার চোখ গেল কারখানার দিকে। কারখানা-চত্বরের ঝাঁকড়া নিমগাছটার তলায় একখানা ট্রাক বহুদিন ধরে পড়ে আছে। জীর্ণ ট্রাকটার তোবড়ানো পিছনের চাকার গা ঘেঁষে মাটির উপর একটা লোক আর-একটা লোকের বুকের উপর চেপে বসেছে। উপরের মানুষটার দশটা আঙুল নীচের মানুষটার গলায় সাঁড়াশির মতো চেপে বসেছে। নীচের মানুষটা বাঁচার জন্য প্রাণপণে পা-দুটো শূন্যে ছুড়ে দিচ্ছে বারবার। তার চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। কী ঘটছে বুঝতে আর একমুহূর্ত সময় লাগল না পিকলুর। পলকে তার শিরদাঁড়ায় ঠান্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল। বল খোঁজার কথা ভুলে গিয়ে হতবাক হয়ে চেয়ে রইল সে।

কিছুক্ষণ পরে নীচের মানুষটার ছটফটে পা-দুটো নেতিয়ে পড়লে আচ্ছন্ন পিকলু কোনওক্রমে গাছ বেয়ে নেমে এল টলতে টলতে। বাইরে বন্ধুর দল অপেক্ষায় ছিল। বল পাওয়া যায়নি শুনে খেলা ভেঙে গেল। বন্ধুরা সব এদিক-ওদিক ছিটকে পড়লে একটু পরে পিকলুও ব্যাট হাতে ঘরে ফিরে এল আনমনে। মনের মধ্যে চাপা আতঙ্ক। চোখের সামনে কারখানার

দৃশ্যটা বারবার ঘুরেফিরে আসছে। ভেবেছিল মা-বাবাকে সব খুলে বলবে, কিন্তু পেয়ারাগাছ বেয়ে ছাদে ওঠার ব্যাপারটা যদি ফাঁস হয়ে যায়, সেই ভয়ে কিছু বলতে পারেনি। সেদিন সাধারণত দু' চোখের পাতা এক করতে পারেনি পিকলু। তীব্র যন্ত্রণায় শুধু ছটফট করেছে।

ঘটনার পরদিন থেকেই সে কেমন যেন বদলে যেতে লাগল। আগের চেয়ে কথা কম বলে। সারাটা দিন চুপচাপ বসে বসে কী যেন ভাবে। পড়াশোনায় মন নেই। বইয়ের অক্ষরগুলো সব কেমন হিজিবিজি হয়ে যায়। চোখের সামনে কেবলই সেই ভয়ংকর দৃশ্যটা ভেসে ওঠে। ভয়ে, বিপদের আশঙ্কায় বাবা-মাকেও এই ঘটনার কথা জানাতে পারেনি পিকলু।

এই করতে করতেই একদিন ফাইনাল পরীক্ষা এসে গেল। তারপর রেজাল্ট বেরনোর পর দেখা গেল কোনওদিন যা হয়নি তাই ঘটেছে। ক্লাসের ভাল ছেলে পিকলু সেভেন থেকে এইটে ওঠার পরীক্ষায় রীতিমতো মুখ থুবড়ে পড়েছে।

পরীক্ষার রেজাল্ট দেখে পিকলুর বাবা রেগে আগুন হয়ে গেলেন। এমনিতেই মাসদেড়েক ধরে ছেলের বিচিত্র হাবভাবে ভদ্রলোকের মেজাজ তিরিক্ষি। এবার বিশ্রী রেজাল্ট দেখে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে তিনি হাতের কাছে কুড়িয়ে পাওয়া উইকেট দিয়ে ছেলেকে পেটাতে শুরু করলেন।

মারের হাত থেকে বাঁচতে পিকলু সামন্তজেঠুদের নিরিবিলি বাড়িতে ঢুকে পড়ল। সামন্তদের কর্তা-গিন্নি থাকলে এই অবস্থায় নির্ঘাত পিকলুর বাবাকে বকাঝকা করতেন, সামন্তজেঠিমা ফ্রিজ খুলে আদর করে হয়তো আইসক্রিম খেতে দিতেন... এখন তাঁরা কেউ নেই। পুরনো দিনের কথা ভাবতে ভাবতে মনমরা পিকলু সামন্তদের নির্জন বাড়ির মধ্যে ঘুরতে লাগল। হঠাৎই সেই খুনের ঘটনা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। খানিকটা কৌতূহলে, খানিকটা বাবার প্রতি অভিমানে তরতর করে পেয়ারাগাছ বেয়ে উঠে পড়ল ছাদে।

কারখানা-চত্বরে সেই একই ছবি। ভাঙা কারখানা আর তার শতচ্ছিদ্র টিনের শেড। ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা [illegible]কড়ের স্তূপ। হাতির মতো খাপটি [illegible] থাকা জবুথবু ট্রাক। আর সেই ঝাঁকড়া [illegible] নিমগাছটার নীচে ওই লোকটা কোথা থেকে এল। খোঁচা খোঁচা দাড়িওলা একটা লোক বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকে যেন লক্ষ করছে! ভুরু কুঁচকে দেখছে তাকে। চোখে চোখ পড়তেই অস্বস্তিতে চোখ সরিয়ে নিল পিকলু। নির্জন কারখানার মধ্যে একলা একজন মানুষ করছেটা কী? পুরনো মালপত্র সরাবার মতলবে নেই তো?... সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে পিকলু তড়িঘড়ি গাছ বেয়ে নীচে নেমে এল। নীচে নেমেই দেখল কারখানায় দেখা লোকটা সামন্তদের পাঁচিলের উপর দিব্যি পা ঝুলিয়ে বসে রয়েছে। সে হতবাক! এত দ্রুত লোকটা পাঁচিলের উপর উঠে এল কী করে?

ভয়ে, বিস্ময়ে পিকলু মিনমিনে গলায় বলে উঠল, "কে আপনি?"

খোঁচা-দাড়ি বিষণ্ণ হাসল, "পোড়ো কারখানার এক দুঃখী বাসিন্দা। কিন্তু তুমি কে?"

"আমি পিকলু। পাশের বাড়িতে থাকি।"

"তা এখানে ফাঁকা বাড়ির ছাদে কী করছিলে একা একা?"

"এমনি একটু ঘুরছিলাম।"

"ঘুরতে হলে নিজেদেরও তো ছাদ আছে। অন্য লোকের ছাদে কেন?"

"এটা আমার জেঠুর বাড়ি। সামন্তজেঠু। ইচ্ছে হলে আমি আসতেই পারি।"

"তা হয়তো আসতে পারো, তবে পেয়ারাগাছ বেয়ে ছাদে ওঠা কিনা, তাই ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে ঠেকছে!"

থতমত খেয়ে আমতা আমতা করে উঠল পিকলু, "মনখারাপের কারণটা জানতে পারি কি?"

মনে মনে বিরক্ত হলেও বিরক্তি চাপা দিয়ে পিকলু বলল, "বাবা মেরেছেন, তাই..."

মুখে অদ্ভুত একটা শব্দ করল লোকটা, "মেরেছেন! তা মারবার হেতুটা কী?"

পিকলু বেশ বিব্রত বোধ করল, "পরীক্ষায় ফেল করেছি, তাই.."

পিকলু। আর রাগ চাপতে পারল না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উত্তর দেবে না ঠিক করে মুখ গুঁজে দাঁড়িয়ে রইল। ওকে গুম মেরে যেতে দেখে লোকটা হেসে উঠল আবার, ‘‘আমার কথায় রাগ করলে তুমি? নিজে জীবনে একবারও ফেল করার সুযোগ পাইনি তো, তাই তোমার ফেল করবার কারণ জানতে মনটা আনচান করে উঠল।’’

অপমানিত হয়ে পালটা প্রশ্নের কামান দাগল পিকলু, ‘‘আপনি ওই পোড়ো কারখানায় কী করছিলেন?’’

লোকটা একটু থতমত খেয়ে গেল, ‘‘মাসদেড়েক ধরে ওখানেই আমি আস্তানা গেড়েছি কিনা।’’

চোখ কপালে তুলল পিকলু, ‘‘ওইরকম গা-ছমছমে একটা জায়গায় আপনি থাকেন?’’

পোড়ো কারখানার দুঃখী বাসিন্দা দাঁত বের করে হাসল, ‘‘থাকি তো।’’

পিকলু হঠাৎ আনমনা হয়ে গেল, ‘‘দেড় মাস... তার মানে ওই ঘটনা নিশ্চয় আপনার চোখে পড়েছে... গলা টিপে মারার ঘটনা...!’’

নিজের অজান্তে কথাগুলো মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়ায় হঠাৎ কেমন গুটিয়ে গেল পিকলু। চোখ নামিয়ে নিল। লোকটার দু’চোখে হঠাৎ একরাশ বিস্ময়। পিকলুর কথায় রীতিমতো নাড়া খেয়েছে যেন। নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়েই পাঁচিল থেকে লাফ দিয়ে নেমে এল লোকটা, ‘‘তোমার চোখে কীভাবে ধরা পড়ল ঘটনাটা। এই ছাদ থেকে দেখেছিলে বুঝি?’’

কথা না বলে আচ্ছন্নের মতো মাথা নাড়ল পিকলু। লোকটার চোখে-মুখে স্বস্তির ভাব, ‘‘আমায় তুমি বাঁচালে বটে। আমি ভেবেছিলাম কাকপক্ষীও বোধহয় টের পায়নি।’’

ভয়ে কুঁকড়ে গেল পিকলু। কথার ধরনধারণ দেখে লোকটাকে সেই খুনি বলেই মনে হচ্ছে যেন। হয়তো কারখানার ভিতরের এর ডেরা। নির্জনতার সুযোগ নিয়ে সামন্তজেঠুদের বাড়িতে নানারকম অসামাজিক কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। খুনে সাক্ষীকে [illegible] [illegible] জন্য লোকটা এখন নিশ্চয়ই ঝাঁপিয়ে পড়বে তার উপর। সঙ্গে সঙ্গে ছুট লাগাল সে। কিন্তু দু’পা যেতে-না-যেতেই লোকটা প্রায় উড়ে এসে তার একটা হাত খপ করে ধরে ফেলল। লোকটার গলায় কাতরতা, ‘‘তোমার কোনও ক্ষতি করব না। শুধু বলো খুনের কথাটা তোমার বাবা-মাকে জানিয়েছিলে কি না।’’

হাত ছাড়ানোর নিষ্ফল চেষ্টা করতে করতে পিকলু বলল, ‘‘না।’’

লোকটার চোখে-মুখে হতাশা ফুটে বেরোল, ‘‘বলোনি!’’ পরক্ষণে হতাশা কাটিয়ে কী মনে করে হেসে উঠল, ‘‘আজকেই তবে বাড়িতে গিয়ে জানাও। কথা চেপে রাখলে পরীক্ষা খারাপ হবে না তো কী!’’

পিকলু চিন্তায় পড়ল। লোকটার আচরণে অবিশ্বাস করার মতো কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। তা ছাড়া লোকটা যে কথা বলল তা বেঠিকও নয়, খুনের ব্যাপারটা চাপতে গিয়ে তো পরীক্ষা খারাপ হয়ে গেল! তবে পোড়ো কারখানার দুঃখী বাসিন্দাটিকে তেমন ভরসাও করা যাচ্ছে না। লোকটা নিজের হাতের মুঠোয় এখনও পিকলুর একটা হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে। আশ্চর্যরকম ঠান্ডা হাত লোকটার! পিকলুকে ভাবতে দেখে সে আবার বলে উঠল, ‘‘একটা লোক বিনা দোষে আর একটা লোককে মারল, তার কোনও শাস্তি হবে না! অপরাধী ধরা পড়ুক, তা কি তুমি চাও না? বাড়িতে গিয়ে বাবা-মাকে সব কথা খুলে বলবে। তুমি এও বলবে, মৃত মানুষটাকে নিমগাছটার হাতদশেক দূরে এক ঝোপের পাশে পুঁতে রাখা হয়েছে!’’

হতভম্ব হয়ে লোকটার মুখের দিকে তাকাল পিকলু। এত কথা ও জানল কী করে? তা ছাড়া এত কিছু যদি ওর জানা, তবে ও নিজে গিয়ে পুলিশকে জানাচ্ছে না কেন! পিকলু ভাবল, কোনও পাগলের পাল্লায় সে পড়ল না তো? হয়তো পরিত্যক্ত কারখানাটার মধ্যে পাগলটার বাস। সেখানকার কোনও গোপন জায়গা থেকে ঘাপটি মেরে খুনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে। অবশ্য খুনির মতো পাগলও

কম বিপজ্জনক নয়। মরিয়া পিকলু এক ঝটকায় লোকটার হাত ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগল।

বাড়ি ফিরতেই বাবার প্রশ্নের জবাবে অপ্রস্তুত পিকলু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর দুঃখী বাসিন্দাটির কথা মনে করে গড়গড় করে সব কথা বলে ফেলল। দেড় মাস আগে দেখা খুনের ঘটনা থেকে শুরু করে একটু আগে রহস্যজনক লোকটার সঙ্গে কথোপকথনের সম্পূর্ণ বিবরণ। ছেলের মুখে সব কথা শুনে মা-বাবা দু'জনেই হতভম্ব হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ ধরে দু'জনের মুখ দিয়ে কোনও কথা সরল না। শেষে পিকলুর বাবাই প্রথম নীরবতা ভাঙলেন, "খুনি খুন করার পর লাশটাকে যে পুঁতে দিল তা তুই দেখেছিস?"

পিকলু মাথা নাড়ল, "না। তার আগেই আমি ছাদ থেকে নেমে এসেছি।"

বাবার কপালে ভাঁজ পড়ল, "তা হলে লোকটা জানল কী করে যে, লাশটা নিমগাছের হাতদশেক দক্ষিণে এক ঝোপের পাশে পুঁতে রাখা হয়েছে!"

পিকলুর মায়ের চোখ তেরছা হয়ে গেল, "লোকটা সেই খুনিটা নয় তো?"

বাবা মাথা নাড়লেন, "তা কী করে হবে? খুনি কেন নিজের খুনের কথা পুলিশকে জানাতে চাইবে!"

মা বললেন, "হয়তো খুনির মনে অনুশোচনার উদয় হয়েছে। খুনের কথা পুলিশের কাছে কবুল করে সে হালকা হতে চায়।"

খবর পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই থানা থেকে একদল পুলিশ এসে হাজির। কারখানার বড় লোহার গেটটায় মস্ত লোহার শেকল ঝুলছে। শেকলের দু'মাথা আগলে রেখেছে বিশাল এক তালা। থানার বড়বাবু রিভলভারের গুলিতে তালা গুঁড়িয়ে দিয়ে সদলবলে কারখানা-চত্বরে ঢুকে পড়লেন। নুড়িবিছানো চওড়া রাস্তার দু'ধারে ঝোপজঙ্গলে ভরে গেছে। পিকলুর কথামতো থানার বড়বাবু জীর্ণ ট্রাকটার পাশে এসে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন, "পিকলুবাবু, ঘটনাটা ঠিক কোথায় ঘটেছে?"

পিকলু ভয়ে ভয়ে তুবড়ে যাওয়া পিছনের চাকার পাশের জায়গাটা আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল।

অল্প খোঁজাখুঁজি করতেই সম্ভাব্য জায়গাটার হদিশ পাওয়া গেল। নিমগাছটার হাতদশেক দক্ষিণে ছোট্ট এক ঝোপের পাশে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে ঝুরঝুরে নরম মাটির অঞ্চল। খানিকক্ষণ খোঁড়াখুঁড়ি করতেই পচাগলা কঙ্কালসার একটা দেহ বেরিয়ে এল। বড়বাবুর মুখে যুদ্ধজয়ের হাসি। পিকলুর বাবার দিকে তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন, "আপনার ছেলের কথা বিশ্বাস করতে প্রথমটায় মন চাইছিল না। ভেবেছিলাম, ছেলেমানুষ কী দেখতে কী দেখেছে! এখন দেখছি, ওর কথায় গুরুত্ব না দিলে ভুল করতাম। ছেলে আপনার ইন্টেলিজেন্ট মশাই!"

বড়বাবুর কথায় পিকলুর বাবা হেসে উঠলেন মিটিমিটি। বাবাকে হাসতে দেখে পিকলুর বুকটাও গর্বে ফুলে উঠল। চওড়া হাসি ফুটল তার মুখেও।

লাশ তোলার কাজকর্মের মধ্যেই একজন কনস্টেবল রেলের একটা মান্থলি টিকিট খুঁজে পেয়ে বড়বাবুর হাতে জমা দিল। লাশের জামার পকেটের মধ্যে ছিল বিবর্ণ মান্থলিটা। অনেক কষ্টে নামটা উদ্ধার করলেন, ভগবান দাস। নাম জানতে পেরে বড়বাবুর মুখে স্বস্তির হাসি, "নাম যখন পাওয়া গেছে, তখন তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে সুবিধে হবে।"

ঝামেলা চুকতে চুকতে সন্ধে হয়ে গেল। সারা পাড়ায় পিকলুকে নিয়ে গুজগাজ, ফিসফাস। সবার মুখে ওর সাহসের তারিফ। থানার বড়বাবু যাওয়ার আগে নিজের পকেট থেকে একশো টাকার কড়কড়ে একখানা নোট পিকলুকে মিষ্টি খাওয়ার জন্য দিয়ে গেলেন। টাকা পাওয়ার আনন্দে হোক কিংবা কৃতিত্বপূর্ণ কাজের গৌরবে, অনেকদিন পর নিজের পড়ার ঘরে ফেলুদা সিরিজের জয় বাবা ফেলুনাথ খুলে বসল পিকুল। তিনতলার চিলেকোঠায় ছোট্ট ঘর। বাবা প্রায় বলেন, এত ভাল পড়বার ঘর ক'টা লোকের বাড়িতে আছে? পড়বার ঘরের নিরিবিলিতে বসে পিকলুরও মনে হল, এত ভাল পড়বার ঘর

থাকা সত্ত্বেও সব কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল! একেবারে ফেলই করে গেল সে!

হঠাৎই জানলার বাইরে ফ্যাঁসফেসে গলা, "এই যে পিকলুবাবু, ধন্যবাদটা জানাব বলে শেষপর্যন্ত চলেই এলাম।"

জানলার গ্রিল ধরে পোড়ো কারখানার সেই রহস্যময় লোকটা ঝুলছে।

বই ফেলে হা হা করে জানলার কাছে ছুটে গেল পিকলু, "তিনতলায়... কীভাবে এলেন?... পড়ে যাবেন যে!..."

লোকটা হাসল, "বাতাসের মতো হালকা শরীর! ওজনই নেই তো পড়ব কী! তোমাকে মন দিয়ে পড়তে দেখে কী যে ভালই লাগছে। সামনের বছর ফার্স্ট হওয়া চাই কিন্তু।" তারপর গলায় উদাস ভাব এনে বলল, "আমার কাজ মিটেছে। পোড়ো কারখানায় আর কোনওদিন আমায় দেখতে পাবে না। যাওয়ার আগে খুনি লোকটার নাম তোমায় জানিয়ে যাই। বড়বাবুকে বলে দিয়ো, বদমাশটার নাম হল পাঁচু বল্লভ।"

পিকলু বুঝতে পারল না এখন কী করবে সে। বাবাকে চিৎকার করে ডাকবে, না কি চুপ করে থাকবে! তার মধ্যেই লোকটাকে সামলে রাখার জন্য কথার মোড় তড়িঘড়ি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিল, "আপনার নামটা কিন্তু জানা হল না। কী নাম আপনার?"

লোকটা ম্লান হেসে বলল, "ভগবান দাস।" তারপর-হঠাৎই গ্রিল আঁকড়ে ধরা হাতটাকে আলগা করে দিল।

নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ডুবে গেল চারদিক। পিকলু আর কিচ্ছু দেখতে পেল না।

৬ অক্টোবর ২০০২
অলংকরণ: কৃষ্ণেন্দু চাকী
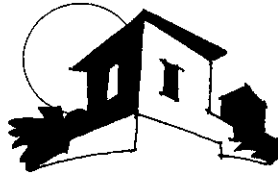
আঁকশির মতো হাত

অমিতাভ পাল

ভজহরিবাবু কিছুদিন হল চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টার ছিলেন। তাই দুপুরবেলা ঘুমের অভ্যেস নেই, আবার হাতে কাজও নেই। কী আর করেন? ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে বই পড়ছিলেন। 'ভূতের বাপের বিয়ে' বইটা তিনি কিনেছিলেন ট্রেনের এক হকারের কাছ থেকে। ট্রেনের হকারের কাছে এমন এমন সব বই পাওয়া যায়, যা কিনা কোনও বইয়ের দোকানে পাওয়া যায় না। তাই সুযোগ পেলেই দু'-একখানা কিনে ফেলেন। বইগুলো বেশ সস্তাদরেও পাওয়া যায়। এত সস্তায় বাজারে এক আঁটি পুঁইশাকও পাওয়া যায় না।

বেশ তারিয়ে তারিয়ে পড়েন ভজহরিবাবু। দু'পাতা পড়েন, একটু সময় চোখ বুজে বসে বসে ভাবেন, তারপর আবার পড়েন। পড়া এবং চোখ বুজে বসে থাকার ফাঁকে একটু ঝিমুনি মতন এসেছিল, বুঝতেই পারেননি তিনি। ভজহরিবাবুর মাথাজোড়া টাক। সেই টাকে কেউ যেন ঢাকের কাঠি দিয়ে চাটি মারল। চমকে উঠলেন তিনি, "কে মারল?"

কে আবার মারবে? ঘরে তো অন্য কেউ নেই। চারপাশটা ভাল করে দেখলেন। নিজেকে নিজেই বোঝালেন, তবে হয়তো মনের ভুল। ফের তিনি পড়তে শুরু করলেন, ফের চোখ বুজে ভাবতে শুরু করলেন। আবার কোন ফাঁকে তাঁর ঝিমুনি ধরে গেল। আবার চাটি। টাকের উপরে ঢাকের কাঠি! এবারে বেশ জোরে। চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, "কে, কে?"

হাতটা আপনা থেকেই টাকে চলে গেল। না, টাকে তো কিছু নেই। টাক পরিষ্কার। পালিশ করা মেঝের মতো মসৃণ। রেগেমেগে ডাক পাড়লেন তিনি, "ভুতো?"

ডাক শুনেই বুঝতে পারল ভুতো, বাবু বেশ চটেছেন। কাঁপতে কাঁপতে এসে হাজির হল সে। ভজহরিবাবু বললেন, "আমার টাকে কে চাটি মারল?"

ভয়ে ভয়ে ভুতো বলল, "আজ্ঞে, আমি তো মারিনি।"

আরও চটে গেলেন তিনি, "আমি কি বলেছি, তুই মেরেছিস? আমি জানতে চাই, কে মেরেছে?"

ভুতো বলল, "ফুটবল পিলিয়ার ঘুমের মধ্যেও ফুটবলে কিক মারে, কিরিকেট পিলিয়ার ব্যাট চালায়। ইয়ে, আপনিও...।"

"আমি কী, শুনি?"

"পোস্টাপিসের পিয়োন ছিলেন তো!"

"পিয়োন নয়, পোস্টমাস্টার!"

"সারাজীবন চিঠির উপরে ঝপাঝপ ইস্ট্যাম মারতেন তো!"

"তাই এখন বসে বসে নিজের টাকে নিজেই চাটি মারছি!"

হাত কচলে ভুতো বলল, "আজ্ঞে, ঠিক তাই!"

ভজহরিবাবু রেগে উঠলেন, "এই তোর বুদ্ধি! তুই তো ভুতো নোস, তুই একটা ভূত!"

ভুতোর আঁতে ঘা লাগল, "কী বললেন বাবু, আমি ভূত?"

ভজহরিবাবু বললেন, "তুই ভূত ছাড়া আর কী?

তোর চেহারাটা ভূতের মতো। তোর গায়ের রং ভূতের মতো মিশকালো। নামেও তুই ভুতো।"

ভুতো বলল, "আমার বাপ-মা আমার নাম রেখেছিলেন, ভূতনাথ। তার থেকে করলেন, ভুতো। এখন আবার বলছেন, ভূত।"

"তোর কাণ্ডকারখানাও ভূতের মতো।"

"কীরকম?"

"একদিন সকালে দেখলাম, সবজির খেতে দাঁড়িয়ে তুই কাঁচা শাকসবজি পটাপট তুলছিল আর ভূতের মতো কচকচ করে চিবিয়ে খাচ্ছিস।"

"মুলো, গাজর, বিট, শালগম তো অনেকেই কাঁচা খায়। আমিও খাই।"

"আর-একদিন রাতে দেখলাম, ছাতের উপরে অন্ধকারে তুই একা একা ভূতের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিস। তোর পা দুটো উপরে, মাথা নীচের দিকে।"

"শরীর ঠিক রাখার জন্য আমি রোজ সন্ধেবেলা খোলা ছাতে ব্যায়াম করি। পা উপরের দিকে, মাথা নীচের দিকে করে আসন করি। শীর্ষাসনের নাম শোনেননি আপনি?"

"তা অবশ্য শুনেছি।"

অভিমানে ভুতোর গলা বুজে এল, "আসলে কী জানেন বাবু, আমার গায়ের রং কালো। চেহারাটা ঢ্যাঙা সিড়িঙ্গেপানা, আর নামেও ভুতো বলে আপনি আমাকে অচ্ছেদ্দা করেন। আপনি একা মানুষ। আমি ছেড়ে দেলে কে আপনাকে রেঁধেবেড়ে দেবে, ঘরদুয়ার ঝাঁটপাট দেবে, দেখাশুনো করবে, ভেবে আমি এতদিন মুখ বুজে সহ্য করেছিলাম। আজ আবার ভূত বলে আমাকে অপমান করলেন। আমার প্রেস্টিজ একেবারে পাংচার করে দিলেন। আর নয়। এই রইল আপনার হেঁশেলের চাবি, বাজারের ফর্দ। আমি চললাম।"

'ভূতের বাপের শ্রিদ্ধে' বইটা পড়ছিলেন ভজহরিবাবু। পড়া মাথায় উঠল। কাতরভাবে বললেন তিনি, "ভুতো, বাবা ভূতনাথ, আমাকে ফেলে কোথায় চললি? তুই চলে গেলে আমি যে একা একা একেবারে আতান্তরে পড়ে যাব।"

ভুতো ফিরল না। যেতে যেতে শুনিয়ে গেল, "মানুষকে ভূত বলে যারা অচ্ছেদ্দা করে, তাদের তো আতান্তরে পড়াই উচিত।"

সত্যিই দারুণ আতান্তরে পড়ে গেলেন ভজহরিবাবু। বিয়ে তো করেননি, সংসারে অন্য কোনও লোকজন নেই। দীর্ঘদিন ভুতোর উপরে নির্ভরশীল ছিলেন। এখন একেবারে একা। কে রান্নাবান্না করে, কেই-বা ঘরদুয়োর সাফসুরত করে? রান্না করতে গিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলেন, চা বানাতে গিয়ে চিনি দিতে ভুলে যান। ঘরে ঠিকমতো ঝাঁটপাট পড়ে না। দিনে দিনে বাড়ির অবস্থা হয়ে উঠল হতশ্রী। এলোমেলো আর অগোছালো। ভজহরিবাবু মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দেন। না, আর কোনওদিন মানুষকে ভূত বলে অচ্ছেদ্দা করবেন না।

অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, একজন কাজের লোক না হলে আর চলছে না। চেনাজানা সকলকে বললেন, একজন কাজের লোক খুঁজে দিতে। পাড়া-পড়শিদের ধরে ধরে বললেন, একজন কাজের লোক জোগাড় করে দিতে। চেনাজানারা বললেন, "দেখছি।"

পাড়া-পড়শিরা বললেন, "খুঁজছি।"

দেশে বিশ্বস্ত আর নির্ভরযোগ্য কাজের লোকের যে এত আকাল, আগে বুঝতে পারেননি। ভুতো চলে যাওয়ার পর মর্মে মর্মে বুঝলেন। অগত্যা নিরুপায় হয়ে ভজহরিবাবু 'কাজের লোক চাই' বলে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন।

বিজ্ঞাপন দেখে একদিন একটি লোক এল। বেশ গাট্টাগোট্টা চেহারা। তার হাতের গুলি, পায়ের পেশি আর বুকের পাটা দেখে ভজহরিবাবু নিজেই ভয় পেয়ে গেলেন। এ লোক তো ঠিক কাজের লোকের মতো নয়। একা মানুষ পেয়ে বাড়িতে ঢুকতে চাইছে। তারপর একদিন সুযোগ বুঝে বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে তাঁর সব কিছু কেড়েকুড়ে নিয়ে কেটে পড়বে। ভজহরিবাবু তাকে বিদায় করে দিলেন।

আর-একদিন এল এক ফিটফাট ফুলবাবু। তার কোঁচানো ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি, চোখে চশমা, হাতে ঘড়ি। কোঁচাকুঁচি সামলে এ লোক কাজ করবে

কী করে? দেখেই বুঝতে পারলেন, এ লোক তাঁর কাজ করবে কী! এ লোকের কাজই না তাঁকে করে দিতে হয়! ভজহরিবাবু মানে মানে তাকেও বিদায় করলেন।

বিজ্ঞাপনটা তা হলে অনেকের নজরে পড়েছে। কাজের খোঁজে আর-একদিন আর-একজন লোক এল। লোকটি লম্বা নয়, বেঁটেও নয়। ফরসা নয়, কালোও নয়। ফিটফাট ফুলবাবুটি নয়, আবার রাস্তার ভিখিরি-মার্কাও নয়। হাঁটুর উপরে খাটো ধুতি, গায়ে ফতুয়া। দেখেশুনে লোকটিকে মোটামুটি পছন্দ হল ভজহরিবাবুর।

লোকটি নিজে থেকেই বলল, "কাজের ব্যাপারে চিন্তা করবেননি বাবু। সব কাজে একেবারে ফাস্টোকেলাস। শুধু একটু পানের নেশা আছে। তাও দিনের বেলা নয়, শুধু রেতের বেলা।"

ঘাড় নেড়ে ভজহরিবাবু বললেন, "পানের নেশা, তাতে আর কী! তা, খাও না বাপু যত খুশি। মাঝেমধ্যে দু'-এক খিলি আমাকেও দিয়ো।"

লোকটি বিনয়ের সঙ্গে হাত কচলে বলল, "ও পান নয়, বাবু, এ হল..."

ভজহরিবাবুর চোখ কপালে উঠল। এরপর ভজহরিবাবু আর কী বলবেন? শুধু বললেন, "বেরোও।"

যেতে যেতে লোকটি বলল, "কাজটি ভাল করলেননি বাবু। আমার মতো কাজের লোক হাজার খুঁজলেও দু'টি পাবেননি।"

এর পরেও অনেকে এসেছিল কাজের খোঁজে। অনেক খুঁজেও ভজহরিবাবু ভুতোর মতো কাজের লোক পেলেন না একজনও।

দুপুরবেলা নিজের হাতে দু'টি ভাত ফোটালেন। তাতেই দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল। গরম ভাতে একটু মাখন ছড়িয়ে কোনওরকমে গলাধঃকরণ করলেন। তারপর বুকের উপরে 'ভূতের মায়ের স্বয়ংবরা' বইটি নিয়ে ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে দিলেন। পড়তে পড়তে হয়তো তন্দ্রামতো এসে গিয়েছিল।
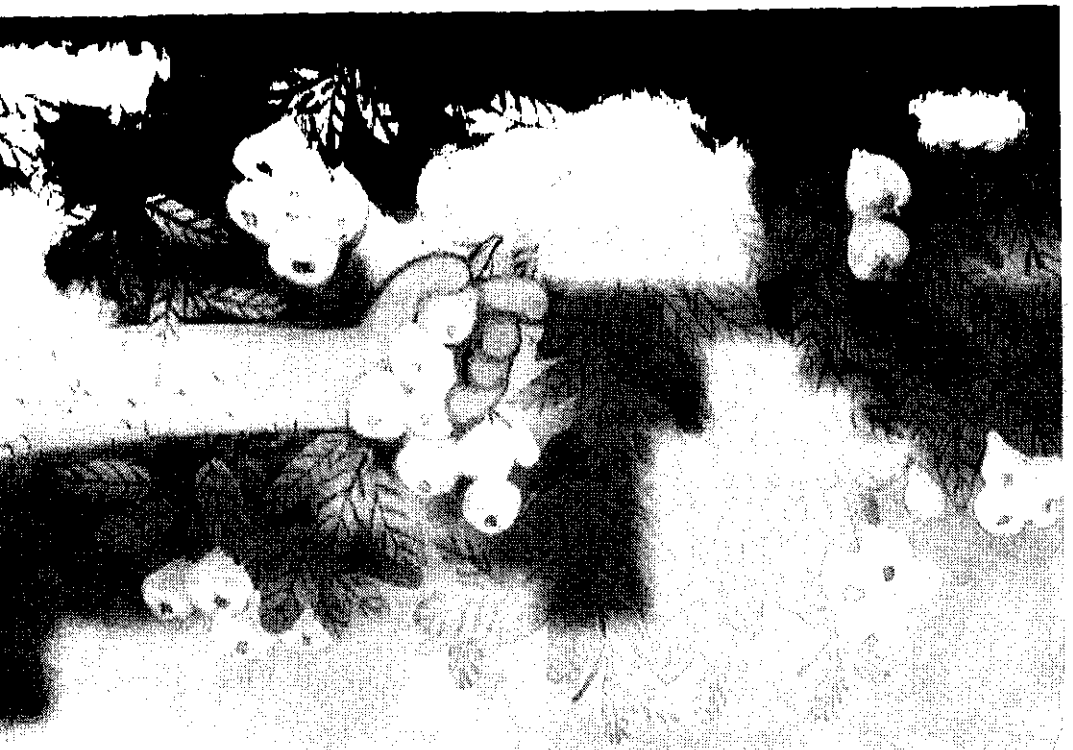
চ্যাটাং করে টাকে পড়ল চাটি। তড়াক করে সোজা হয়ে বসলেন ভজহরিবাবু, "কে, কে রে?"

ঘাড় ঘুরিয়ে ঘরের চারদিকটা ভাল করে দেখলেন। না, কেউ তো কোথাও নেই। ভজহরিবাবু কি একটু ভয় পেলেন?

"যা ভাগ, ভাগ। আমার বাবুকে তোরা বিরক্ত করিস কেন রে?" কথাটা বলতে বলতেই লোকটি ঘরে এসে ঢুকল।

ভজহরিবাবু এবারে সত্যিই ভয় পেয়ে গেলেন, "কে, কে রে তুই?"

"আমাকে চিনতে পারলেন না বাবু? আমি যে আপনার...।"

লোকটিকে চিনতে পেরে ভজহরিবাবু একেবারে আহ্লাদে আটখানা হলেন। বললেন, "এতদিনে বাবুকে তোর মনে পড়ল রে ভুতো, ইয়ে ভূতনাথ?"

ঢের শিক্ষা হয়েছে ভজহরিবাবুর। আর ভুতোকে ভুতো নয়, ভূতনাথ বলেই ডাকবেন তিনি।

ভুতো বলল, "মনে কি আর পড়েনি? খুব পড়ত। ফিরে আসতেও ইচ্ছে হত। কিন্তু একটু বাধোবাধো ঠেকত।"

"কেন, বাধোবাধো কেন?"

"বিজ্ঞাপনটা আমারও চোখে পড়েছিল। ওই বিজ্ঞাপনের সঙ্গে যদি আরও দু'-একটি কথা জুড়ে দিতেন, তো তখনই এসে পড়তাম।"

"কী কথা বল দিকিনি?"

"ভুতোর মতো লম্বা, সিড়িঙ্গে, মিশকালো লোক হলেও চলবে।"

"ঠিক বলেছিস রে ভূতনাথ, খুব ভুল হয়ে গেছে।"

কথায় কথায় অনেকটা সময় গেল। ভজহরিবাবু জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন। জানলার বাইরে একটা জামরুল গাছ। গাছে থোকা থোকা জামরুল পেকে আছে। বাইরে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভজহরিবাবু বললেন, "গাছে কত জামরুল, অথচ একটা জামরুলও আমার খাওয়া হয়ে

ওঠেনি, তুই তো ছিলি না। কে আমাকে পেড়ে খাওয়াবে।''

ভুতো উৎসাহের সঙ্গে বলল, ''খাবেন বাবু? পেড়ে দেব?''

ভজহরিবাবু বললেন, 'ভর সন্ধেবেলা! আজ আর গাছে উঠে কাজ নেই। কাল সকালে বরং পেড়ে দিস।''

ভুতো বলল, ''গাছে উঠতে যাব কেন? জানলার ভিতর দিয়েই তো দিব্যি পেড়ে আনতে পারি।''

জানলা থেকে গাছের দূরত্ব অন্তত পাঁচ গজ তো হবেই। লম্বা আঁকশির মতো হাত বাড়িয়ে গাছের মগডাল থেকে একথোকা জামরুল পেড়ে আনল ভুতো।

চমকে উঠলেন ভজহরিবাবু, ''ভূতনাথ, তুই...?''

ভুতো বলল, ''চিরকাল আমাকে ভুতো বলে ডেকেছেন, এখন আবার ভূতনাথ কেন? মানুষকে ভুতো বললে অচ্ছেদ্দা করা হয়, কিন্তু...।''

ভজহরিবাবু হাসতে হাসতে বললেন, ''তোকে ভূতনাথ বললে তোর প্রেস্টিজ পাংচার হয়, তাই না রে?''

হাত কচলাতে কচলাতে সলজ্জ হেসে ভুতো বলল, ''হেঁ হেঁ হেঁ, ঠিক বঁলেছেঁন বাঁবু।''

২ মে ২০০৫
অলংকরণ: সুব্রত চৌধুরী
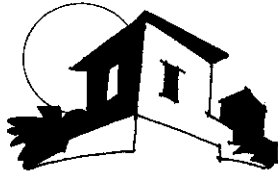
ব্রাউন সাহেবের বাড়ি

সত্যজিৎ রায়

ব্রাউন সাহেবের ডায়রিটি হাতে আসার পর থেকেই ব্যাঙ্গালোর যাবার একটা সুযোগ খুঁজছিলাম। সেটা এল বেশ অপ্রত্যাশিত ভাবে। আমাদের বালিগঞ্জ স্কুলের বাৎসরিক রি-ইউনিয়নে দেখা হয়ে গেল আমার পুরনো সহপাঠী অনীকেন্দ্র ভৌমিকের সঙ্গে। অনীক বলল সে ব্যাঙ্গালোরে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে চাকরি করছে। ''একবার ঘুরে যা না এসে আমার ওখানে। দ্য বেস্ট প্লেস ইন ইন্ডিয়া! একটা বাড়তি ঘরও আছে আমার বাড়িতে। আসবি?''

অনীক স্কুলে থাকতে আমার খুবই বন্ধু ছিল। তারপর যা হয় আর কী। কলেজ হয়ে গেল দু'জনের আলাদা, তা ছাড়া ও বিজ্ঞান আর আমি আর্টস। দু'জনে প্রায় উলটোমুখো রাস্তা ধরে চলতে আরম্ভ করলাম। মাঝে ও আবার চলে গেল বিলেতে। ফলে ক্রমে দু'জনের বন্ধুত্বের মধ্যেও অনেকটা ব্যবধান এসে পড়ল। আর আজ প্রায় বারো বছর পর তার সঙ্গে দেখা। বললাম, ''গিয়ে পড়তে পারি। কোন সময়টা ভাল?''

''এনি টাইম। ব্যাঙ্গালোরে গরম নেই। সাধে কি জায়গাটা সাহেবদের এত প্রিয়? তুই যখনই আসতে চাস আসিস। তবে সাত দিনের নোটিশ পেলে ভাল হয়।''

যাক, তা হলে ব্রাউন সাহেবের বাড়িটা দেখার সৌভাগ্য হলেও হতে পারে। কিন্তু তার আগে সাহেবের ডায়রিটার কথা বলা দরকার।

আমি হলাম যাকে বলে পুরনো বইয়ের পোকা। ব্যাঙ্কে কাজ করে প্রতি মাসে যা রোজগার হয়। ভ্রমণকাহিনি, শিকারের গল্প, ইতিহাস, আত্মজীবনী, ডায়রি— কতরকম বই না গত পাঁচ বছরে জমে উঠেছে আমার। পোকায় কাটা পাতা, বার্ধক্যে ঝুরঝুরে হয়ে যাওয়া পাতা, ড্যাম্পে বিবর্ণ হওয়া পাতা— এসবই আমার কাছে অতি পরিচিত এবং অতি প্রিয় জিনিস। আর পুরনো বইয়ের গন্ধ— এর জুড়ি নেই। অগুরু কস্তুরী গোলাপ হাসনুহানা— মায় ফরাসি সেরা পারফিউমের সুবাস এই দুটো গন্ধের কাছে হার মেনে যায়।

এই পুরনো বই কেনাই আমার একমাত্র নেশা, আর পুরনো বই কিনতে গিয়েই পাওয়া ব্রাউন সাহেবের ডায়রিটা। বলে রাখি এ ডায়রি একেবারে খাগের কলমে লেখা আসল ডায়রি। লাল চামড়ায় বাঁধানো সাড়ে তিনশো পাতার রুলটানা খাতা। ছ'ইঞ্চি বাই সাড়ে চার ইঞ্চি। মলাটের চারপাশে সোনার জলের নকশা করা বর্ডার, তার মাঝখানে সোনার ছাপার অক্ষরে লেখা সাহেবের নাম— জন মিডলটন ব্রাউন। মলাট খুললে প্রথম পাতায় সাহেবের নিজের হাতে নাম সই, তার নীচে সাহেবের ঠিকানা— এভারগ্রিন লজ, ফ্রেজার টাউন, ব্যাঙ্গালোর— আর তার নীচে লেখা— জানুয়ারি, ১৮৫৮। অর্থাৎ এ ডায়রির বয়স হল একশো তেরো। এই ব্রাউন সাহেবের নাম লেখা অন্য আরও খানকতক বইয়ের সঙ্গে ছিল এই লাল চামড়ায় বাঁধানো খাতাটা। নামকরা বইয়ের তুলনায় দাম খুবই কম। মকবুল চাইল কুড়ি, আমি বললাম দশ, শেষটায় বারো টাকার বিনিময়ে বইটা আমার

সম্পাওি হয়ে গেল। ব্রাউন যদি নামকরা কেউ হতেন তা হলে এই বইয়ের দাম হাজার টাকা হতে পারত।

ডায়রিটাতে তখনকার দিনের ভারতবর্ষে সাহেবদের দৈনন্দিন জীবনের বাইরে আর কিছু জানতে পাব এমন আশা করিনি। সত্যি বলতে কী, প্রথম শ'খানেক পাতা পড়ে তার বেশি পাইওনি। ব্রাউন সাহেবের পেশা ছিল ইস্কুলমাস্টারি। ব্যাঙ্গালোরের কোনও একটা স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। সাহেব নিজের কথাই বেশি বলেছেন; মাঝে মাঝে ব্যাঙ্গালোর শহরের বর্ণনা করেছেন। এক জায়গায় তখনকার বড়লাটের গিন্নি লেডি ক্যানিং-এর ব্যাঙ্গালোর আসার ঘটনা বলেছেন, ব্যাঙ্গালোরের ফুল ফল গাছপালা ও তাঁর নিজের বাগানের কথা বলেছেন। এক এক জায়গায় আবার ইংল্যান্ডের সাসেক্স অঞ্চলে তাঁর পৈতৃক বাড়ি, আর তাঁর পিছনে-ফেলে আসা আত্মীয়স্বজনের কথা বলেছেন। তাঁর স্ত্রী এলিজাবেথের উল্লেখও আছে, তবে স্ত্রীটি কয়েক বছর আগেই মারা গিয়েছিলেন।

সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে সাইমন নামে কোনও এক ব্যক্তির বারংবার উল্লেখ। এই সাইমন যে কে ছিলেন— তাঁর ছেলে না ভাই না ভাগ্নে না বন্ধু না কী— সেটা বোঝার কোনও উপায় ডায়রিতে নেই। তবে সাইমনের প্রতি ব্রাউন সাহেবের যে একটা গভীর টান ছিল সেটা বুঝতে কোনও অসুবিধা হয় না। সাইমনের বুদ্ধি, সাইমনের সাহস, সাইমনের রাগ অভিমান দুষ্টুমি খামখেয়ালিপনা ইত্যাদির কথা বারবার আছে ডায়রিতে। সাইমন অমুক চেয়ারটায় বসতে ভালবাসে, আজ সাইমনের শরীরটা ভাল নেই, সাইমনকে আজ সারাদিন দেখতে পাইনি বলে মনখারাপ— এই ধরনের সব খুঁটিনাটি খবরও আছে। আর আছে সাইমনের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর। ২২শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ বজ্রাঘাতে সাইমনের মৃত্যু হয়। পরের দিন ভোরবেলা ব্রাউন সাহেবের বাগানে একটা বাজে ঝলসে যাওয়া ইউক্যালিপটাস গাছের পাশে সাইমনের মৃতদেহ পাওয়া যায়।

এরপর থেকে একটা মাস ডায়রিতে প্রায় আর কিছুই লেখা হয়নি। যেটুকু হয়েছে তার মধ্যে শোক আর হতাশার কথা। ছাড়া আর কিছু নেই। ব্রাউনসাহেব দেশে ফিরে যাবার কথা ভাবছেন— কিন্তু সাইমনের আত্মা থেকে দূরে সরে যেতে তাঁর মন চায়নি। সাহেবের স্বাস্থ্যও যেন অল্প অল্প ভেঙে পড়েছে। 'আজও স্কুলে গেলাম না' কথাটা পাঁচ জায়গায় বলা হয়েছে। লুকাস বলে একজন ডাক্তারের উল্লেখও আছে। তিনি ব্রাউন সাহেবকে পরীক্ষা করে ওষুধ বাতলে গেছেন।

তারপর হঠাৎ— ২রা নভেম্বর— ডায়রিতে এক আশ্চর্য ঘটনার উল্লেখ; এবং এই ঘটনাই আমার কাছে ডায়রির মূল্য হাজার গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ব্রাউন সাহেব এ ঘটনাটা লিখেছেন রোজকার নীলের বদলে লাল কালিতে। তাতে বলেছেন (আমি বাংলায় অনুবাদ করছি)— "আজ এক অভাবনীয় আশ্চর্য ঘটনা। আমি বিকালে লালবাগে গিয়েছিলাম গাছপালার সান্নিধ্যে আমার মনটাকে একটু শান্ত করার জন্য। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ বাড়ি ফিরে বৈঠকখানায় ঢুকেই দেখি— সাইমন ফায়ারপ্লেসের পাশে তার প্রিয় হাই-ব্যাকড চেয়ারটিতে বসে আছে। সাইমন! সত্যিই সাইমন! আমি তো দেখে আনন্দে আত্মহারা। আর শুধু যে বসে আছে তা নয়— সে একদৃষ্টে আমারই দিকে তাকিয়ে আছে তার স্নেহমাখানো চোখ দু'টি দিয়ে। এদিকে ঘরে বাতি নেই। আমার ফাঁকিবাজ খানসামা টমাস এখনও ল্যাম্প জ্বালেনি। তাই সাইমনকে আরেকটু ভাল করে দেখব বলে আমি পকেট থেকে দেশলাইটা বার করলাম। কাঠি বার করে বাক্সের গায়ে ঘষতেই আলো জ্বলে উঠল— কিন্তু কী আফসোস! এই কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সাইমন উধাও! অবিশ্যি সাইমনকে যে কোনওদিন আবার দেখতে পাব সেটাই তো আশা করিনি। এইভাবে ভূত অবস্থাতেও যদি মাঝে মাঝে সে দেখা দিয়ে যায়, তা হলে আমার মন থেকে সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে। সত্যি আজ এক অপূর্ব আনন্দের দিন। সাইমন মরে গিয়েও আমাকে ভোলেনি; এমনকী তার প্রিয় চেয়ারটিকেও সে ভোলেনি। দোহাই সাইমন—
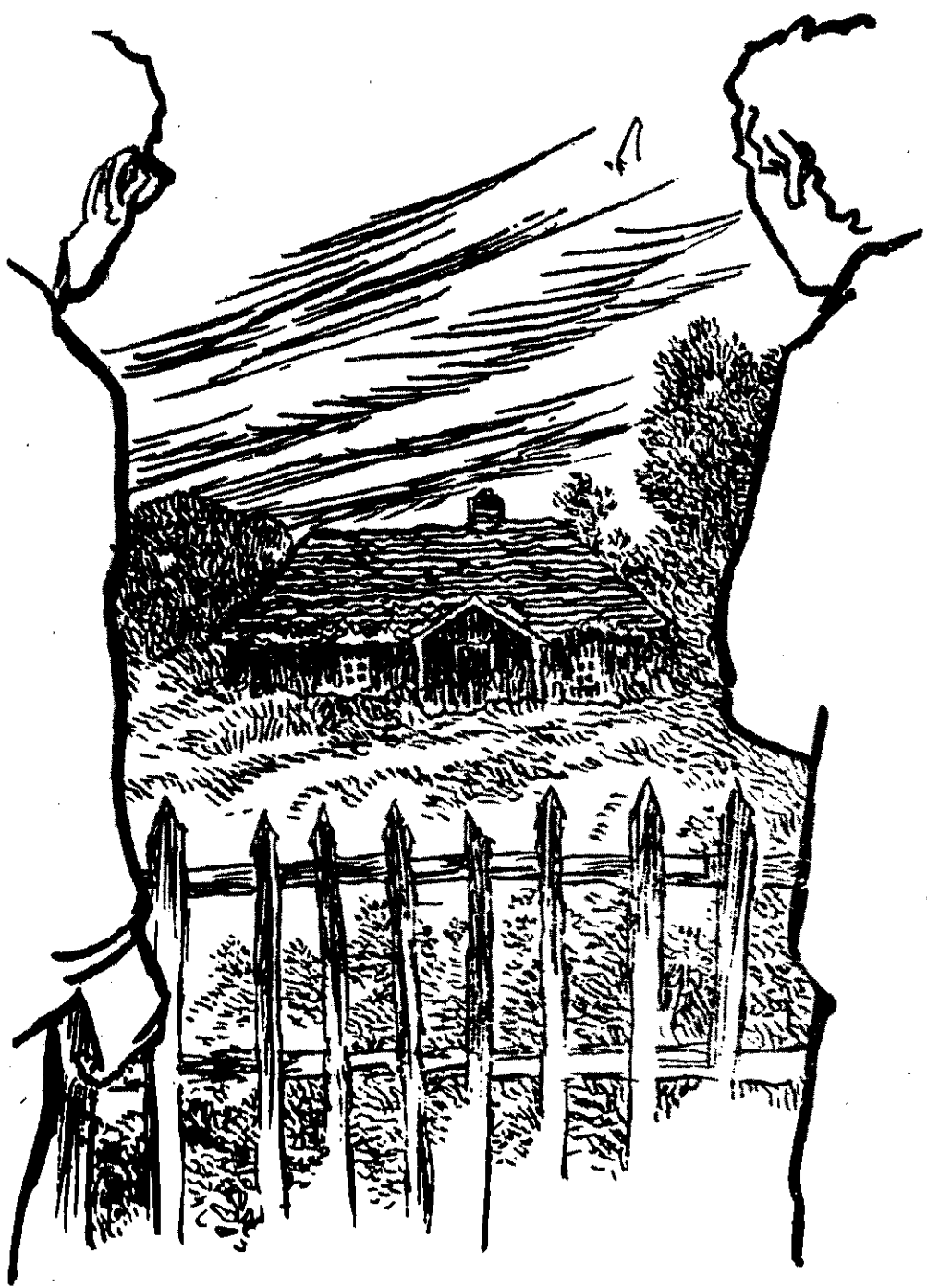
মাঝে মাঝে দেখা দিয়ো— আর কিছু চাই না আমি তোমার কাছে। এইটুকু পেলেই আমি বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটাতে পারব।''

এর পরে ডায়রি আর বেশিদিন চলেনি। যেটুকু আছে তার মধ্যে কোনও দুঃখের ছাপ নেই, কারণ সাইমনের সঙ্গে ব্রাউন সাহেবের প্রতিদিনই একবার করে দেখা হয়েছে। সাইমনের ভূত সাহেবকে হতাশ করেনি।

ডায়রির শেষ পাতায় লেখা আছে— ''যে আমাকে ভালবাসে, তার মৃত্যুর পরেও যে তার সে-ভালবাসা অটুট থাকে, এই জ্ঞান লাভ করে আমি পরম শান্তি পেয়েছি।''

ব্যস— এই শেষ। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে— ব্রাউন সাহেবের এই বাড়ি— ব্যাঙ্গালোরের ফ্রেজার টাউনের এভারগ্রিন লজ— এখনও আছে কি? আর সেখানে এখনও সন্ধ্যাকালে সাইমন সাহেবের ভূতের আগমন হয় কি? আর সে ভূত কি অচেনা লোককে দেখা দেয়? আমি যদি সে বাড়িতে গিয়ে একটা সন্ধ্যা কাটাই— তা হলে সাইমনের ভূতকে দেখতে পাব কি?

ব্যাঙ্গালোরে এসে প্রথম দিন অনীককে এসব কিছুই বলিনি। সে আমাকে তার অ্যাম্বাসাডর গাড়িতে করে সমস্ত ব্যাঙ্গালোর শহর ঘুরিয়ে দেখিয়েছে— এমনকী ফ্রেজার টাউনও। ব্যাঙ্গালোর সত্যিই সুন্দর জায়গা, তাই শহরটা সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে আমার কোনও মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়নি। শুধু সুন্দর নয়— কলকাতার পর এমন একটা শান্ত কোলাহলশূন্য শহরকে প্রায় একটা অবাস্তব স্বপ্নরাজ্যের মতো মনে হয়।

দ্বিতীয় দিন ছিল রবিবার। সকালে অনীকের বাগানে রঙিন ছাতার তলায় বসে চা খেতে খেতে প্রথম ব্রাউনসাহেবের প্রসঙ্গটা তুললাম। ও শুনে-টুনে হাত থেকে চায়ের পেয়ালা নামিয়ে বেতের টেবিলের উপর রেখে বলল, ''দ্যাখ রঞ্জন— যে বাড়ির কথা বলছিস সে বাড়ি হয়তো থাকলেও থাকতে পারে, একশো বছর আর এমন কী বেশি। তবে সেখানে গিয়ে যদি ভূত-টুত দেখার লোভ থেকে থাকে তোর, তা হলে আমি ওর মধ্যে নেই। কিছু মনে করিসনি ভাই— আমি চিরকালই একটু অতিরিক্ত সেনসিটিভ। এমনি দিব্যি আছি— আজকের দিনের শহরের কোনও উপদ্রব নেই এখানে— ভূতের পিছনে ছোটা মানে সাধ করে উপদ্রব ডেকে আনা। ওর মধ্যে আমি নেই!''

অনীকের কথা শুনে বুঝলাম এই বারো বছরে ও বিশেষ বদলায়নি। ইস্কুলে ভিতু বলে ওর বদনাম ছিল বটে। মনে পড়ল একবার আমাদের ক্লাসেরই জয়ন্ত আর আরও কয়েকটি ডানপিটে ছেলে ওকে এক সন্ধ্যায় বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের রাইডিং স্কুলের কাছটাতে আপাদমস্তক সাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে ভয় দেখিয়েছিল। অনীক এই ঘটনার পর দু'দিন ইস্কুলে আসেনি, এবং অনীকের বাবা নিজে হেডমাস্টার বীরেশ্বরবাবুর কাছে এসে ব্যাপারটা নিয়ে কমপ্লেন করেছিলেন।

আমি এ বিষয়ে কিছু বলার আগেই অনীক হঠাৎ বলে উঠল, ''তবে নেহাতই যদি তোর যেতে হয়, তা হলে সঙ্গীর অভাব হবে না। আসুন মিস্টার ব্যানার্জি।''

পিছন ফিরে দেখি একটি বছর পঁয়তাল্লিশের ভদ্রলোক অনীকের বাগানের গেট দিয়ে ঢুকে হাসিমুখে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। বেশ বলিষ্ঠ চেহারা, প্রায় ছ'ফুট হাইট, পরনে ছাই রঙের হ্যান্ডলুমের প্যান্টের উপর গাঢ় নীল টেরিলিনের বুশশার্টের গলায় সাদা-কালো বাটিকের ছোপ মারা সিল্কের মাফলার।

অনীক পরিচয় করিয়ে দিল, ''আমার বন্ধু রঞ্জন সেনগুপ্ত— মিস্টার হৃষিকেশ ব্যানার্জি।''

ভদ্রলোক শুনলাম ব্যাঙ্গালোরে এয়ারক্রাফট ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন, বহুদিন বাংলাদেশ ছাড়া, তাই কথার মধ্যে একটা অবাঙালি টান এসে পড়েছে, আর অজস্র ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করেন।

অনীক বেয়ারাকে ডেকে আর এক পেয়ালা চায়ের কথা বলে দিয়ে একেবারে সোজাসুজি ব্রাউন সাহেবের বাড়ির কথাটা পেড়ে বসল। কথাটা শুনে ভদ্রলোক এমন অট্টহাস্য করে উঠলেন যে, কিছুক্ষণ

থেকে [illegible] দেখছিলাম আমাদের টেবিলের আশেপাশে নির্ভয়ে ঘোরাফেরা করছে, সেটা ল্যাজ উঁচিয়ে একটা দেবদারু গাছের গুঁড়ি বেয়ে সটান একেবারে মগডালে পৌঁছে গেল।

"গোস্টস? গোস্টস্? ইউ সিরিয়াসলি বিলিভ ইন গোস্টস? আজকের দিনে? আজকের যুগে?"

আমি আমতা আমতা করে বললাম, "একটা কৌতূহল থাকতে ক্ষতি কী? এমনও তো হতে পারে যে, ভূতেরও একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে, যেটা দশ বছরের মধ্যে জানা যাবে।"

ব্যানার্জির হাসি তবুও থামে না। লক্ষ করলাম ভদ্রলোকের দাঁতগুলো ভারী ঝকঝকে ও মজবুত।

অনীক বলল, "যাই হোক মিস্টার ব্যানার্জি— গোস্ট অর নো গোস্ট— এমন বাড়ি যদি একটা থেকেই থাকে, আর রঞ্জনের যদি একটা উদ্ভট খেয়াল হয়েই থাকে— একটা সন্ধেবেলা ওকে নিয়ে খানিকটা সময়ের জন্য ও বাড়িতে কাটিয়ে আসতে পারেন কি না সেইটে বলুন। ও কলকাতা থেকে এসেছে, আমার গেস্ট— ওকে তো আর আমি একা যেতে দিতে পারি না সেখানে। আর সত্যি বলতে কী— আমি নিজে মানুষটা একটু অতিরিক্ত, যাকে বলে, সাবধানী। আমি যদি নিয়ে যাই তা হলে বোধহয় ওর সুবিধের চেয়ে অসুবিধেই হবে বেশি।"

মিস্টার ব্যানার্জি তাঁর শার্টের পকেট থেকে একটা বাঁকা পাইপ বার করে তার মধ্যে তামাক গুঁজতে গুঁজতে বললেন, "আমার আপত্তি নেই— তবে আমি যেতে পারি কেবল একটা কন্ডিশনে— আমি সঙ্গে শুধু একজনকে নেব না, দু'জনকেই নেব।"

কথাটা শেষ করে ব্যানার্জি আবার হাসলেন, আর তার ফলে এবার আশেপাশের গাছ থেকে চার-পাঁচরকম পাখির চিৎকার ও ডানা-ঝাপটানির আওয়াজ শোনা গেল। অনীকের মুখ কিঞ্চিৎ ফ্যাকাসে দেখালে সে আপত্তি করতে পারল না।

"কী নাম বললেন বাড়িটার?" ব্যানার্জি জিজ্ঞেস করলেন।

"এভারগ্রিন লজ।"

"ফ্রেজার টাউনে?"

"তাই তো বলছে ডায়রিতে।"

"হুঁ..." ভদ্রলোক পাইপে টান দিলেন। "ফ্রেজার টাউনে সাহেবদের কিছু পুরনো বাড়ি আছে বটে, কটেজ টাইপের। এনিওয়ে— যেতেই যদি হয় তো দেরি করে লাভ কী? হোয়াট অ্যাবাউট আজ বিকেল? এই ধরুন চারটে নাগাদ?"

ইঞ্জিনিয়ার হলে কী হবে— মেজাজটা একেবারে পুরোদস্তুর মিলিটারি এবং সাহেবি। ঘড়ি ধরে চারটের সময় হৃষীকেশ ব্যানার্জি তাঁর মরিস মাইনর গাড়িটা নিয়ে হাজির। গাড়িতে যখন উঠছি তখন ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "সঙ্গে কী কী নিলেন?"

অনীক ফিরিস্তি দিল— একটা পাঁচসেলের টর্চ, ছ'টা মোমবাতি, ফার্স্ট-এড বক্স, একটা বড় ফ্লাস্ক ভর্তি গরম কফি, এক বাক্স হ্যাম স্যান্ডউইচ, এক প্যাকেট তাস, মাটিতে পাতবার চাদর, মশা তাড়ানোর জন্য এক টিউব ওডোমস।

"আর অস্ত্রশস্ত্র?" ব্যানার্জি জিজ্ঞেস করলেন।

"ভূতকে কি অস্ত্র দিয়ে কিছু করা যায়? কী রে রঞ্জন— তোর সাইমনের ভূত কি সলিড নাকি?"

"যাই হোক," মিস্টার ব্যানার্জি গাড়ির দরজা বন্ধ করে বললেন, "আমার কাছে একটি ছোটখাটো আগ্নেয়াস্ত্র আছে, সুতরাং সলিড-লিকুইড নিয়ে চিন্তা করার কোনও প্রয়োজন নেই।"

গাড়ি ছাড়ার পর ব্যানার্জি বললেন, "এভারগ্রিন লজের ব্যাপারটা একেবারে কাল্পনিক নয়।"

আমি একটু অবাক হয়েই বললাম, "আপনি কি এর মধ্যেই খোঁজ নিয়েছেন না কি?"

ব্যানার্জি রীতিমতো কসরতের সঙ্গে দুটো সাইকেল চালককে পর পর পাশ কাটিয়ে বললেন, "আই অ্যাম এ ভেরি মেথডিক্যাল ম্যান, মিস্টার সেনগুপ্ত। যেখানে যাচ্ছি সে জায়গাটা অ্যাট অল আছে কি না সেটার সম্বন্ধে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রাখা উচিত নয় কি? ওদিকটায় শ্রীনিবাস দেশমুখ থাকে— আমরা একসঙ্গে গলফ খেলি— অনেকদিনের আলাপ। সকালে এখান থেকে ওর

বাড়িতেই গেসলাম। বলল এভারগ্রিন লজ বলে একটা একতলা কটেজ নাকি প্রায় পঞ্চাশ বছর থেকে খালি পড়ে আছে। বাড়ির বাইরের বাগানে বছর দশেক আগে পর্যন্ত লোকে পিকনিক করতে যেত, এখন আর যায় না। খুব নিরিবিলি জায়গায় বাড়িটা। আগেও নাকি একটানা বেশিদিন কেউ ও বাড়িতে থাকেনি। তবে হন্টেড হাউস বলে কেউ কোনওদিন অপবাদ দেয়নি বাড়িটার। বাড়ির ফার্নিচার সব বহুদিন আগেই নিলাম হয়ে গেছে। তার কিছু নাকি কর্নেল মার্সারের বাড়িতে আছে। রিটায়ার্ড আর্মি অফিসার। তিনিও ফ্রেজার টাউনেই থাকতেন। সব শুনে-টুনে, বুঝেছেন মিস্টার সেনগুপ্ত, মনে হচ্ছে আমাদেরও এই পিকনিক জাতীয়ই একটা কিছু করে ফেরত আসতে হবে। অনীকেন্দ্র তাসটা এনে ভালই করেছে।''

ব্যাঙ্গালোরের পরিষ্কার প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে গাড়ি করে যেতে যেতে বারবারই মনে হচ্ছিল যে শহরটা এতই অভুতুড়ে যে, এখানে একটা হানাবাড়ির অস্তিত্বই কল্পনা করাই কঠিন।

কিন্তু তার পরেই আবার মনে পড়ে যাচ্ছিল ব্রাউন সাহেবের ডায়রির কথা। লোকে নেহাত পাগল না হলে ডায়রিতে আজগুবি কথা বানিয়ে লিখবে কেন? সাইমনের ভূত ব্রাউন নিজে দেখেছেন। একবার নয়, অনেকবার। সে ভূত কি আমাদের জন্য একবার দেখা দেবে না?

বিলেত আমি যাইনি, কিন্তু বিলেতের কটেজের ছবি বইয়ের পাতায় ঢের দেখেছি। এভারগ্রিন লজের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল সত্যিই যেন ইংল্যান্ডের কোনও গ্রামাঞ্চলের একটা পুরনো পরিত্যক্ত বাড়ির সামনে এসে পড়েছি।

কটেজের সামনেই ছিল বাগান। সেখানে ফুলের কেয়ারির বদলে এখন শুধু ঘাস আর আগাছা। একটা ছোট্ট কাঠের গেট (যাকে ইংরেজিতে বলে wicket) দিয়ে বাগানে ঢুকতে হয়। সেই গেটের গায়ে একটা ফলকে খোদাই করে এখনও লেখা রয়েছে বাড়ির নামটা। তবে হয়তো কোনও চড়ুইভাতির দলেরই কেউ রসিকতা করে এভারগ্রিন কথাটার আগে একটা N জুড়ে দিয়ে সেটাকে নেভারগ্রিন করে দিয়েছে।

আমরা গেট দিয়ে ঢুকে বাড়ির দিকে এগোলাম। চারিদিকে অজস্র গাছপালা। ইউক্যালিপটাসও গোটা তিনেক রয়েছে দেখলাম। আর যা গাছ আছে তার অনেকগুলোরই নাম আমার জানা নেই, চোখেও দেখিনি এর আগে কোনওদিন। ব্যাঙ্গালোরের জলমাটির নাকি এমনই গুণ যে, সেখানে যে-কোনও দেশের যে-কোনও গাছই বেঁচে থাকে।

কটেজের সামনে একটা টালির ছাউনি দেওয়া পোর্টিকো, তার বাঁকা থামগুলো বেয়ে লতা উঠেছে ওপর দিকে। ছাউনির অনেক টালিই নেই, ফলে ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখা যায়। সামনের দরজার একটা পাল্লা ভেঙে কাত হয়ে আছে। বাড়ির সামনের দিকের দরজা-জানলার কাচ অধিকাংশই ভাঙা। দেয়ালের ওপর শেওলা ধরে এমন অবস্থা হয়েছে যে বাড়ির আসল রংটা যে কী ছিল তা আজ বোঝার উপায় নেই।

দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম আমরা।

ঢুকেই একটা প্যাসেজ। পিছন দিকে একটা ভাঙা দরজার ভিতর দিয়ে একটা ঘর দেখা যাচ্ছে। আমাদের ডাইনে-বাঁয়েও ঘর। ডাইনেরটাই বেশি বড় বলে মনে হল। আন্দাজে বুঝলাম এটাই হয়তো বৈঠকখানা ছিল। মেঝেতে বিলিতি কায়দায় কাঠের তক্তা বসানো— তার কোনওটাই প্রায় আস্ত নেই। সাবধানে পা ফেলতে হয় এবং প্রতি পদক্ষেপে খুটখাট খচখচ শব্দ থাকে।

আমরা ঘরটাতে ঢুকলাম।

বেশ বড় ঘর, ফার্নিচার না থাকাতে আরও খাঁ খাঁ করছে। পশ্চিম আর উত্তর দিকে জানলার সারি। একদিকের জানলা দিয়ে গেট সমেত বাগান, আর অন্যদিক দিয়ে গাছের সারি দেখা যাচ্ছে। এরই একটাতে কি বাজ পড়েছিল? সাইমন দাঁড়িয়েছিল সেই গাছের নীচে। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু। ভাবতে গা-টা ছমছম করে উঠল।

এবারে দক্ষিণদিকের জানলাবিহীন দেয়ালের দিকে

চাইলাম। [illegible] ফায়ারপ্লেস। এই ফায়ারপ্লেসের পাশেই ছিল [illegible] চেয়ারখানা।

ঘরের সিলিং-এর দিকে চাইতে চোখে পড়ল ঝুল আর মাকড়সার জাল। এককালে সুদৃশ্য এভারগ্রিন লজের অবস্থা এখন খুবই শোচনীয়।

মিস্টার ব্যানার্জি প্রথমদিকে লা লা করে বিলিতি সুর ভাঁজছিলেন, এখন নতুন করে পাইপ ধরিয়ে বললেন, ‘‘কী খেলা আসে আপনাদের? ব্রিজ, না পোকার, না রামি?’’

অনীক হাতের জিনিসপত্র মেঝেতে সাজিয়ে চাদরটা বিছিয়ে মাটিতে বসতে যাচ্ছিল, এমন সময় একটা শব্দ কানে এল।

অন্য কোনও ঘরে কেউ জুতো পায়ে হাঁটছে।

অনীকের দিকে চেয়ে দেখলাম সে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

পায়ের শব্দটা থামল। মিস্টার ব্যানার্জি হঠাৎ মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে নিয়ে বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, ‘‘ইজ এনিবডি দেয়ার?’’ সঙ্গে সঙ্গে আমরা তিনজনে প্যাসেজের দিকে এগোলাম। অনীক আলতো করে আমার কোটের আস্তানাটা ধরে নিয়েছে।

এবার জুতোর শব্দটা আবার শুরু করল। আমরা বাইরে প্যাসেজে গিয়ে পড়তেই ডানদিকের ঘরটা থেকে একটি ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে সামনে আমাদের দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। লোকটি ভারতীয়। মুখ ভরতি খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফ সত্ত্বেও ইনি যে ভদ্র এবং শিক্ষিত তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ভদ্রলোক বললেন, ‘‘হ্যালো।’’

আমরা কী বলব ঠিক বুঝতে পারছি না, এমন সময় আগন্তুক নিজেই আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করলেন।

‘‘আমার নাম ভেঙ্কটেশ। আই অ্যাম এ পেন্টার। আপনারা কি এই বাড়ির মালিক না খদ্দের?’’

ব্যানার্জি হেসে বললেন, ‘‘দুটোর একটাও না। আমরা এমনি ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছি।’’

‘‘আই সি। আমি ভাবছিলাম এই বাড়িটা যদি পাওয়া যেত তা হলে আমার কাজের জন্য একটা স্টুডিয়ো হতে পারত। ভাঙাচোরায় আমার আপত্তি নেই। মালিক কে জানেন না বোধহয়?’’

‘‘আজ্ঞে না। সরি।’’ ব্যানার্জি বললেন। ‘‘তবে আপনি কর্নেল মার্সারের ওখানে খোঁজ করে দেখতে পারেন। সামনের রাস্তা ধরে বাঁদিকে চলে যাবেন। মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথ।’’

‘‘থ্যাঙ্ক ইউ’’ বলে মিস্টার ভেঙ্কটেশ বেরিয়ে চলে গেলেন।

গেট খোলার এবং বন্ধ করার শব্দ পাবার পর ব্যানার্জি আবার তাঁর অট্টহাসি হেসে বললেন, ‘‘মিস্টার সেনগুপ্ত, ইনি নিশ্চয়ই আপনার সাইমন বা ওই জাতীয় কোনও ভূত-টুত নন!’’

আমি হেসে বললাম, ‘‘সবেমাত্র সোয়া পাঁচটা, এর মধ্যেই আপনি ভূতের আশা করেন কী করে? আর ইনি ভূত হলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর নিশ্চয়ই নন, কারণ তা হলে পোশাকটা অন্যরকম হত।’’

আমরা ইতিমধ্যে বৈঠকখানায় ফিরে এসেছি। অনীক মাটিতে পাতা চাদরের উপর বসে পড়ে বলল, ‘‘মিথ্যে কল্পনার প্রশ্রয় দিয়ে নার্ভাসনেস বাড়ানো! তার চেয়ে তাস হোক।’’

‘‘আগে মোমবাতি খানকতক জ্বালাও দেখি,’’ ব্যানার্জি বললেন, ‘‘এখানে বড় ঝপ করে সন্ধে নামে।’’

দুটো মোমবাতি জ্বালিয়ে কাঠের মেঝেতে দাঁড় করিয়ে ফ্লাস্কের ঢাকনিতে কফি ঢেলে তিনজনে পালা করে খেয়ে নিলাম। একটা কথা আমার কিছুক্ষণ থেকে মনে আসছিল সেটা আর না বলে পারলাম না। ভূতের নেশা যে আমার ঘাড়ে কীভাবে চেপেছে সেটা আমার এই কথা থেকেই বোঝা যাবে। ব্যানার্জিকে উদ্দেশ করে বললাম, ‘‘আপনি বলেছিলেন কর্নেল মার্সার এ-বাড়ির ফার্নিচার কিছু কিনেছিলেন। তিনি যদি এতই কাছে থাকতেন তা হলে তাঁর বাড়িতে গিয়ে একটা জিনিসের খোঁজ করে আসা যায় কি?’’

‘‘কী জিনিস?’’ ব্যানার্জি প্রশ্ন করলেন।

‘‘একটা বিশেষ ধরনের হাই-ব্যাকড চেয়ার।’’

অনীক যেন একটু বিরক্ত হয়েই বললে, ‘‘কেন

বল তো? হঠাৎ এখন হাই-ব্যাকড চেয়ারের খোঁজ করে কী হবে?''

''না, মানে, ব্রাউনসাহেব বলেছেন ওটা নাকি সাইমনের খুব প্রিয় চেয়ার ছিল। সে ভূত হয়েও ওটাতে এসে বসত। ওটা থাকত ওই ফায়ারপ্লেসটার পাশে। হয়তো ওটা ওখানে এনে রাখতে পারলে—''

অনীক বাধা দিয়ে বলল, ''তুই ব্যানার্জি সাহেবের ওই মরিস গাড়িতে করে হাই-ব্যাকড চেয়ার নিয়ে আসবি? না কি আমরা তিনজনে ওটাকে কাঁধে করে আনব? তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে?''

ব্যানার্জি এবার হাত তুলে আমাদের দু'জনকেই থামিয়ে দিয়ে বললেন, ''কর্নেল মার্সার যা কিনেছেন তার মধ্যে ওরকম চেয়ার নেই এটা আমি জানি। তাঁর বাড়িতে আমার যথেষ্ট যাতায়াত আছে। ওটা থাকলে আমার চোখে পড়ত। আমি যতদূর জানি উনি কিনেছিলেন দুটো বেক কেস, দুটো অয়েল পেন্টিং, খানকতক ফুলদানি, আর শেলফে সাজিয়ে রাখার জন্য গুটিকতক শখের জিনিস, যাকে আর্ট অবজেক্টস বলে।''

আমি দমে গেলাম। অনীক তাস বার করে সাফল করতে আরম্ভ করেছে। ব্যানার্জি বললেন, ''রামিই হোক। আর এসব খেলা জমে ভাল যদি পয়সা দিয়ে খেলা যায়। আপনাদের আপত্তি আছে কী?''

বললাম, ''মোটেই না। তবে আমি ব্যাঙ্কের সামান্য চাকুরে, বেশি হারাবার সামর্থ্য আমার নেই।''

বাইরে দিনের আলো ম্লান হয়ে এসেছে। আমরা খেলায় মন দিলাম। আমার তাসের ভাগ্য কোনওদিনই ভাল না। আজও তার ব্যতিক্রম লক্ষ করলাম না। আমি জানি অনীক মনে মনে নার্ভাস হয়ে আছে, সুতরাং সে জিতলে পরে আমি অন্তত একটু নিশ্চিন্ত হতাম, কিন্তু তারও কোনও লক্ষণ দেখলাম না। কপাল ভাল একমাত্র মিস্টার ব্যানার্জির। গুনগুন করে বিলিতি সুর ভাঁজছেন, আর দানের পর দান জিতে চলেছেন। খেলতে খেলতে নিস্তব্ধতার মধ্যে একবার একটা বেড়ালের ডাক শুনলাম। তার ফলে আমার মনটা আরও একটু দমে গেল। ভূতুড়ে বাড়িতে বেড়ালেরও থাকা উচিত নয়। কথাটা বলাতে ব্যানার্জি হেসে বললেন, ''বাট ইট ওয়াজ এ ব্ল্যাক ক্যাট— ওই প্যাসেজ দিয়ে হেঁটে গেল। ব্ল্যাক ক্যাট তো ভূতের সঙ্গে যায় ভালই— তাই না?''

খেলা চলতে থাকল। বেশ কিছুক্ষণের জন্য একবার মাত্র একটা অজানা পাখির কর্কশ ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ, দৃশ্য বা ঘটনা আমাদের একাগ্রতায় বাধা পড়তে দেয়নি।

ঘড়িতে সাড়ে ছ'টা, বাইরে আলো নেই বললেই চলে, আমি একটু ভাল তাস পেয়ে পর পর দু'বার জিতেছি, আর এক রাউন্ড রামি হয়ে গেছে ইতিমধ্যে, এমন সময় হঠাৎ অস্বাভাবিক শব্দ কানে এল।

কে যেন বাইরের দরজায় টোকা মারছে।

আমাদের তিনজনেরই হাত তাসসুদ্ধ নীচে নেমে এল।

টক টক টক টক।

অনীক এবার আরও ফ্যাকাসে। আমার বুকের ভিতরেও মৃদু কম্পন শুরু হয়েছে। কিন্তু ব্যানার্জি দেখলাম সত্যিই ঘাবড়াবার লোক নন। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেদ করে তাঁর বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, ''হু ইজ ইট?''

আবার দরজায় টোকা— টক টক টক।

ব্যানার্জি তদন্ত করার জন্য তড়াক করে উঠে পড়লেন। আমি খপ করে ভদ্রলোকের প্যান্টটা ধরে চাপা গলায় বললাম, ''একা যাবেন না।''

তিনজনে একসঙ্গে ঘর থেকে বেরোলাম। প্যাসেজে এসে বাঁদিকে চাইতেই দেখলাম দরজার বাইরে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে— তার পরনে সুট ও হাতে একটা লাঠি। অন্ধকারে তাকে চেনার কোনও উপায় নেই। অনীক আবার আমার আস্তিন চেপে ধরল। এবার আরও জোরে। ওর অবস্থা দেখেই বোধহয় আমার মনে আপনা থেকেই একটা সাহসের ভাব এল।

ব্যানার্জি ইতিমধ্যে আরও কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, ''ও হ্যালো ডক্টর লার্কিন! আপনি এখানে?''

এবার আমিও প্রৌঢ় সাহেবটিকে বেশ ভালভাবেই দেখতে পেলাম। অমায়িক সাহেবটি

তাঁর সোনার চশমার পিছনে নীল চোখ দুটোকে কুঁচকে হেসে বললেন, ‘‘তোমার মরিস গাড়িখানা দেখলাম বাইরে। তারপর দেখি বাড়ির জানলা দিয়ে মোমবাতির আলো দেখা যাচ্ছে। তাই ভাবলাম একবার টুঁ মেরে দেখে যাই তুমি কী পাগলামি করছ এই পোড়ো বাড়ির ভেতর।’’

ব্যানার্জি হেসে বললেন, ‘‘আমার এই যুবক বন্ধু দু'টির একটু উদ্ভট ধরনের অ্যাডভেঞ্চারের শখ। বলল এভারগ্রিন লজে বসে তাস খেলবে, তাই আর কী।’’

‘‘ভেরি গুড, ভেরি গুড! যুবা বয়সটাই তো এ ধরনের পাগলামির সময়। আমরা বুড়োরাই কেবল নিজেদের বাড়ির কৌচে বসে রোমন্থন করি। ওয়েল ওয়েল— হ্যাভ এ গুড টাইম!’’

লার্কিন সাহেব হাত তুলে গুড বাই করে লাঠি ঠক ঠক করতে করতে চলে গেলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়বার ভুতের আশা পরিত্যাগ করতে হল। কী আর করি, আবার তাসে মনোনিবেশ করলাম। প্রথমদিকে প্রায় সাড়ে চার টাকার মতো হারছিলাম, গত আধঘণ্টায় তার খানিকটা ফিরে পেয়েছি। সাইমনের ভূত না দেখলেও, শেষ পর্যন্ত তাসে কিছু জিতে বাড়ি ফিরতে পারলেও আজকের আউটিংটা কিছুটা সার্থক হয়।

ঘড়ির দিকে মাঝে মাঝেই চোখটা চলে যাচ্ছিল। আসল ঘটনাটা কখন ঘটেছিল তার টাইম আমার জানা আছে। ব্রাউন সাহেবের ডায়রি থেকে জেনেছিলাম যে সন্ধ্যার এই সময়টাতেই বাজ পড়ে সাইমনের মৃত্যু হয়।

আমি তাস বাঁটছি, মিস্টার ব্যানার্জি তাঁর পাইপে আগুন ধরাচ্ছেন, অনীক সবেমাত্র স্যান্ডউইচ খাবার মতলবে প্যাকেটটাতে হাত লাগিয়েছে, এমন সময় তাঁর চোখের চাহনিটা মুহূর্তের মধ্যে বদলে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে গেল।

তার দৃষ্টি দরজার বাইরে প্যাসেজের দিকে। বাকি দু'জনের চোখও স্বভাবতই সেদিকে চলে গেল। যা দেখলাম তাতে আমারও কয়েক মুহূর্তের জন্য গলা শুকিয়ে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল।

বাইরে প্যাসেজের অন্ধকারের মধ্যে একজোড়া জ্বলন্ত চোখ আমাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ফসফরাসের মতো ফিকে সবুজ আর হলদে মেশানো একটা আভা এই নিষ্পলক চাহনিতে।

মিস্টার ব্যানার্জির ডানহাতটা ধীরে ধীরে তাঁর কোটের ভেস্ট পকেটের দিকে চলে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই যেন ম্যাজিকের মতো আমার কাছে ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গিয়ে আমার মন থেকে সমস্ত ভয় দূর করে দিল। বললাম, ‘‘আপনার পিস্তলের দরকার নেই মশাই— এটা সেই কালো বেড়ালটা।’’

আমার কথায় অনীকও যেন ভরসা পেল। ব্যানার্জি পকেট থেকে তাঁর হাত বার করে এনে চাপা গলায় বললেন, ‘‘হাউ রিডিকুলাস!’’

এবার জ্বলন্ত চোখ দুটো আমাদের ঘরের দিকে এগিয়ে এল। চৌকাঠ পেরোতেই মোমবাতির আলোতে প্রমাণ হল আমার কথা। এটা সেই কালো বেড়ালটাই বটে।

চৌকাঠ পেরিয়ে বেড়ালটা বাঁদিকে ঘুরল। আমাদের দৃষ্টি তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে, তাকে অনুসরণ করছে।

এবারে আমাদের তিনজনের গলা দিয়ে একসঙ্গে একটা শব্দ বেরিয়ে পড়ল। আচমকা বিস্ময়ের ফলে যে-শব্দ আপনা থেকেই মানুষের মুখ থেকে বেরোয়— এ সেই শব্দ। এই শব্দের কারণ আর কিছুই না— আমরা যতক্ষণ তন্ময় হয়ে তাস খেলেছি তারই ফাঁকে কীভাবে কোত্থেকে জানি একটা গাঢ় লাল মখমলে মোড়া হাই-ব্যাকড চেয়ার এসে ফায়ার প্লেসের পাশে তার জায়গা করে নিয়েছে।

অমাবস্যার রাতের অন্ধকারের মতো কালো বেড়ালটা চেয়ারটার দিকে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল। তারপর এক মুহূর্ত সেটার সামনে দাঁড়িয়ে একটা নিঃশব্দ লাফে সেটার ওপর উঠে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। আর সেই মুহূর্তে একটা অদ্ভুত শব্দ শুনে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। কোনও এক অশরীরী বৃদ্ধের খিলখিলে হাসির ফাঁকে ফাঁকে বারবার উচ্চারিত হচ্ছে ‘‘সাইমন সাইমন সাইমন

সাইমন''— আর তার সঙ্গে ছেলেমানুষি খুশি হওয়া হাততালি।

একটা আর্তনাদ শুনে বুঝলাম অনীক অজ্ঞান হয়ে গেছে। আর মিস্টার ব্যানার্জি? তিনি অনীককে কোলপাঁজা করে তুলে ঊর্ধ্বশ্বাসে প্যাসেজ দিয়ে দরজার দিকে ছুটছেন।

আমিও আর থাকতে পারলাম না। তাস মোমবাতি ফ্লাস্ক চাদর স্যান্ডউইচ সব পড়ে রইল। দরজা পেরিয়ে মাঠ, মাঠ পেরিয়ে গেট, গেট পেরিয়ে ব্যানার্জির মরিস মাইনর।

ভাগ্যে ব্যাঙ্গালোরের রাস্তায় লোক চলাচল কম, নইলে আজ একটিমাত্র পাগলা গাড়ির পাগলা ছুটে ক'টা লোক জখম হতে পারত তা ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়।

অনীকের জ্ঞান গাড়িতেই ফিরে এসেছিল, কিন্তু তার মুখে কোনও কথা নেই। প্রথম কথা বললেন মিস্টার ব্যানার্জি। অনীকের বেয়ারার হাত থেকে ব্র্যান্ডির গেলাসটা ছিনিয়ে নিয়ে এক ঢোকে অর্ধেকটা নামিয়ে দিয়ে ঘড়ঘড়ে চাপা গলায় বলে উঠলেন, ''সো সাইমন ওয়াজ এ ক্যাট!''

আমার নিজেরও কিছুই বলার অবস্থা নেই, কিন্তু আমার মন তাঁর কথায় সায় দিল।

সত্যিই, ব্রাউন সাহেবের বুদ্ধিমান, খামখেয়ালি, অভিমানী, অনুগত, আদরের সাইমন— যার মৃত্যু বজ্রাঘাতে আজ থেকে একশো তেরো বছর আগে— সেই সাইমন ছিল আমাদের আজকের দেখা একটি পোষা কালো বেড়াল!

মে ২০০৫

[প্রথম প্রকাশ: সন্দেশ, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৭৮]
অলংকরণ: সত্যজিৎ রায়
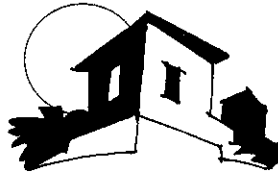
জোড়া ভূতের কান্না

দুলেন্দ্র ভৌমিক

দখনোর দিকে একটা গ্রাম আছে, তার নাম ভুতুড়িয়া। এরকম নাম কেন তা জানি না। নানা জায়গার নাম এবং তার উৎপত্তি নিয়ে সুকুমার সেন মহাশয়ের একখানা বই আছে। সেই চটি বইটি বিস্তর ঘাঁটাঘাঁটি করেও ভুতুড়িয়া গ্রামের রহস্য উদ্ধার করতে পারিনি। গ্রামখানার নাম ভুতুড়িয়া কী করে হল তা নিয়ে ভুতুড়িয়া গ্রামবাসীদের মধ্যে কোনও কৌতূহল নেই। নব্বইয়ের ঘরে পা রেখেছেন এমন জনাদুয়েক লোক বলেন, ‘‘একদা এই গ্রামের সদাশয় এবং দানশীল জমিদার ভূতনাথ চৌধুরী নাকি এক অমাবস্যার রাতে নিজের ঘরে খুন হন। কে বা কারা তাঁকে খুন করেছিল এবং কেন খুন করেছিল তার কোনও হদিশ হয়নি। পুলিশ বিস্তর খোঁজাখুঁজি করেছিল তদন্তের নামে জমিদারবাড়ির কাজের লোক মায় তাদের দুধওলাকে পর্যন্ত যৎপরোনাস্তি নাস্তানাবুদ করেছিল, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ভূতনাথ চৌধুরীর মৃত্যু বা খুনের ঘটনা আজও তেমনই রহস্যে ঢাকা। যদিও এসব কথা গ্রামের শতকরা নব্বইজন মানুষই ভুলে গেছেন। ভুলে গেছেন না বলে ভুলে ছিলেন বলাই ভাল। ভূতনাথ থেকেই হয়তো ভুতুড়িয়া হয়েছে।

কিন্তু সম্প্রতি এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে ভূতনাথ চৌধুরীর রহস্যজনক মৃত্যুটা কিছু লোকের মধ্যে আবার নতুন করে চর্চা হতে শুরু করেছে। প্রথম ঘটনা ঘটে এক শীতের রাতে। গ্রামখানা ঘন কুয়াশায় ঢাকা। আকাশে আলো নেই। কারণ, সেইদিন অমাবস্যা। এই গ্রামের কিছু অংশে বিজলিবাতি আছে বটে, তবে তা না থাকার মতোই। রোজই সন্ধের পর হুশ করে আলো চলে যায়। কখনও মধ্যরাতে আলো আসে, কখনও বা সকালের আগে আসেই না। এই গ্রামের মানুষ এতেই অভ্যস্ত। মানুষ একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে কর্তাব্যক্তিদের দায় বাঁচে। কারণ, মানুষ তখন অভিযোগ করতে ভুলে যায়। তা সেই প্রথম ঘটনার দিন পুবপাড়ার হরিপদ স্কুলের মাঠ থেকে যাত্রা শুনে একা একা নিজের বাড়িতে ফিরে আসছিল। জমিদারি উঠে গেলেও জমিদারবাড়িটা এখনও আছে। অত বড় বাড়িতে গুটিকয়েক লোক থাকে। যে ঘরে ভূতনাথবাবু খুন হয়েছিলেন, সেই ঘরটা দোতলায়। গয়ার প্রেতশিলায় গিয়ে পিণ্ডি দেওয়ার পরেও নাকি দোতলার ঘরগুলোতে ভূতের দৌরাত্ম্য কমেনি। ওই বাড়িতে যে কয়েকজন লোক এখনও থাকে, তারা সবাই একতলাতেই থাকে। রাতের বেলা ভুলেও দোতলায় যায় না। কিন্তু বাইরের লোক যারা ওই বাড়ির সামনে দিয়ে প্রায়ই যাতায়াত করেন, তারা কেউ কখনও ভূত-টুত দেখেনি। গ্রামের বহু লোক ভূত বিশ্বাসই করে না। হরিপদও করত না। কিন্তু ওই রাতে, মানে হরিপদ যে রাতে যাত্রা শুনে একা একা জমিদারবাড়ির সামনে দিয়ে ফিরছিল, সেই রাতেই তার মনে হল, কে যেন তাকে পিছন থেকে ডাকছে, ‘‘হরে, এই হরে!’’

হরিপদকে খুব চেনা লোকরাই ‘হরে হরে’ বলে ডাকে। আজ এত রাতে জমিদারবাড়ির অন্ধকার ফটকের সামনে কে তাকে হরে হরে বলে ডাকবে।

প্রথমবার পিছন ফিরে কাউকে দেখতে না পেয়ে শোনার ভুল মনে করে আবার এগিয়ে যেতেই পিছন থেকে ডাক এল, ‘‘হরে, এই হরে।’’

হরিপদ দাঁড়িয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে পিছন ফিরে তাকাল। এমন থকথকে অন্ধকার যে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। হরিপদ সাহসে ভর করে ডাকল, ‘‘কে? আমারে কে ডাকে?’’

অন্ধকার থেকে উত্তর এল, ‘‘বদমাশ, নিজের বাপের গলা চিনতে পারিস না! আমি তোর বাপ!’’

হরিপদ চমকাল। তার বাবা তো কবেই মারা গেছেন। এই মধ্যরাতে আবার তার বাবা আসবেন কেমন করে। এবার মনে হল, গলার ভঙ্গিটা তার বাবার মতোই বটে!

হরিপদ বলল, ‘‘বাবা, তুমি কি তবে মরোনি?’’

হরিপদর বাবা উত্তর দিলেন, ‘‘মরেছি বই কী। নিশ্চয়ই মরেছি। কিন্তু আত্মার মুক্তি ঘটেনি বলে এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি।’’

হরিপদ অবাক গলায় প্রশ্ন করল, ‘‘কেন বাবা, আমি তো গয়ায় গিয়ে তোমার পিণ্ডদান করেছি।’’

হরিপদর বাবা খেপে গিয়ে বললেন, ‘‘ছাই করেছ! একজন জলতোলা বামুনকে দিয়ে ভুলভাল মন্ত্র পড়িয়ে তড়িঘড়ি পিণ্ডদান করেছিস। তার যে ট্রেন ধরার তাড়া ছিল। ওতে কি আত্মার মুক্তি হয়? তাই তো বৈতরণী পেরোবার আগেই যমের একখানা ব্যাকভলিতে আবার গ্রামে ফিরে এলুম। ভাগ্যিস জমিদারবাবু ছিলেন, তাই এই বাড়িতে, বাগানে, গাছে গাছে আমার মতো কত অতৃপ্ত আত্মা মুক্তি না পেয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।’’

হরিপদর এবার গা ছমছম করতে লাগল। সে বলল, ‘‘জমিদারবাবুর আত্মাও কি এই বাড়িতে ঘুরছেন?’’

হরিপদর বাবা বললেন, ‘‘ঘুরছে কি না দেখ। ওই যে তিনি।’’

হরিপদ বিশাল জমিদারবাড়িটার দিকে তাকাল।

অন্ধকারের মধ্যে সাদা রঙের বড় বাড়িটা দিব্যি দেখা যাচ্ছিল। হরিপদ দেখল, দোতলার সানসেটের উপর দাঁড়িয়ে জমিদারবাবু গড়গড়া টানছেন। গড়গড়া টানার শব্দ এবং সুগন্ধি তামাকের গন্ধটা দিব্যি টের পাওয়া যাচ্ছে। বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মধ্যে ছোট্ট একটা হাইফেনের মতো তার মনটা দুলছিল। হঠাৎ জমিদারবাবুর গম্ভীর গলা বলে উঠল, ‘‘নিরাপদ, কার সঙ্গে কথা কইছ? ওই লোকটা কে?’’

হরিপদর বাবা নিরাপদ উত্তর দিলেন, ‘‘আজ্ঞে, আমার ছেলে হরিপদ।’’

জমিদারবাবু বললেন, ‘‘তা বেশ! বাবাকে দেখতে এয়েছে বুঝি?’’

নিরাপদ এবার অভিমানের গলায় বললেন, ‘‘দেখতে এয়েছে না ছাই! আমিই তো ডেকে দেখা দিলুম। এখনকার ছেলেদের মধ্যে পিতৃভক্তির বড়ই অভাব।’’

জমিদারবাবু বললেন, ‘‘কী করবে হরিপদ! এ হচ্ছে যুগের হাওয়া। আমার দোতলায় রাখালবাবুদের পরিবার রয়েছেন। রাখালবাবু, তাঁর স্ত্রী আর মা। রাখালবাবুর ছেলেই বাবা-মা আর ঠাকুরমাকে ভিটেছাড়া করে উদ্বাস্তু করে দিল।’’

নিরাপদর গলায় যেন অপার বিস্ময়। তিনি বললেন, ‘‘সেটা কেমন করে ঘটল?’’

জমিদারবাবু গড়গড়ায় টান দিয়ে বললেন, ‘‘সে এক কাণ্ড। রাখালবাবুর ছেলে প্রোমোটার হয়েছে। জলাজমি বুজিয়ে বড় বড় ফ্ল্যাটবাড়ি তুলছে। মৃত্যুর পর রাখালবাবু আর তাঁর স্ত্রী মোষডোবা খালের পাশে জলাজমিতে থাকতেন। ওখানেই মা'র সঙ্গে দেখা। তিনটি আত্মা বেশ সুখেই ছিলেন। কিন্তু থাকতে কি পারলেন! ওই জলাজমিতে রাখালবাবুর ছেলের নজর পড়ল। ব্যস, জমি ভরাট করে, তরতর গতিতে ফ্ল্যাটবাড়ি উঠে গেল। ফলে রাখালবাবু মা-বউ নিয়ে এখন উদ্বাস্তু। বাধ্য হয়ে আমার দোতলায় থাকতে দিতে হল। জলার ভূত, এই প্রজাতির ভূত প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে!’’

হরিপদর শরীর কাঁপছিল। সে কোনও দুঃস্বপ্ন দেখছে না তো? নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখল, না সে জেগেই আছে। ভয় তাকে এমনই আড়ষ্ট করে ফেলল যে, সে দৌড়তে গিয়ে পায়ে পা জড়িয়ে রাস্তাতেই পড়ে গেল।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটল এর কয়েকদিন পর। ঠিক সন্ধের মুখে। মাঠ থেকে গোরু নিয়ে ফিরছিল কানাই দুধওয়ালা। সে হঠাৎ দেখল, একটা জ্বলন্ত সিগারেট তার দিকে এগিয়ে আসছে। ওটা যে সিগারেট, সেটা প্রথমে বোঝা যায়নি। কাছে আসতে কানাই দুধওয়ালা দেখল, সিগারেটটা যেন শূন্যে ঝুলছে। কেউ একজন সেটা যে টানছে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। ফুক ফুক করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। অথচ সামনে কেউ নেই। কানাই ভয় পেল, তবু বলল, ''তুমি কে গা? মুখের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছ অথচ শরীরখানা দেখা যাচ্ছে না?''

এবার ফ্যাঁক ফ্যাঁক করে একটু হাসি শোনা গেল। পরে বলল, ''বড় যে দেখার শখ! বেঁচে থাকতে একবারও দেখতে গিয়েছ?''

কানাই বলল, ''তুমি কে বটে গো? যারে দেখা যায় না, তারে দেখতে যাব কেমন করে?''

এবার উত্তর এল, ''আমি তোমার শ্বশুর। বিয়ের সময় কুড়ি ভরি সোনার সঙ্গে দশ হাজার টাকা নগদ নিয়ে আমাকে ফতুর করেছ। বেঁচে থাকতে কিছু করতে পারিনি। এবার তার শোধ তুলব।''

এই পর্যন্ত বলে যেই না কানাইয়ের হাত থেকে গোরুর দড়িটা টান মেরে নিয়ে নিল, অমনি কানাই 'ওরে বাবা রে, বাঁচা রে' বলে ছুটতে ছুটতে গ্রামের মধ্যিখানে হেলাবটতলায় এসে ক্লাবঘরের দরজায় উপুড় হয়ে পড়ল। নিরাপদ, তারপর কানাই, এই দু'জনের ঘটনার পর থেকে ভুতুড়িয়া গ্রামে ভূতের ভয়টা আবার নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সন্ধের পর কেউ আর একা একা কোথাও যায় না। জমিদারবাড়ির সামনের রাস্তাটা ভুতুড়ে রাস্তা বলে চিহ্নিত হয়ে যাওয়ায় ওই রাস্তা দিয়ে লোক চলাচল কমে আসতে লাগল। গ্রামের সবাই ভয়ে কাবু। সন্ধে নামার পর থেকেই যেন আতঙ্ক ছড়াতে থাকে। কিন্তু এভাবে তো বেশিদিন কাটানো যায় না। অতএব পঞ্চায়েতে খবর গেল। পঞ্চায়েত খবর দিল থানায়। থানা খবর পাঠাল এস পি-কে। এস পি থেকে ডি এম আর দমকল হয়ে গ্রামের কাছে দু'মাস পরে যে খবরটি এল, তার সারমর্ম হল, ''ভূত ধরা আমাদের কাজ নয়। নিজেরা সতর্ক থাকুন। সংঘবদ্ধভাবে ভূতেদের মোকাবিলা করুন। আবেদন করলে সরকারি সহযোগিতা পাবেন।''

এইরকম খবরে মুষড়ে পড়ারই কথা। গ্রামের সবাই মুষড়ে পড়লেন। এরই মধ্যে কোদালিয়া গ্রাম থেকে দু'জন ভূত তাড়ানোর ওঝা নিয়ে আসা হল। ওঝা দু'জন এলেন। পেটপুরে সিধু ময়রার দোকান থেকে কচুরি, অমৃতি আর ডিবেগজা খেয়ে বললেন, ''একটা-দুটো ভূত হলে চেষ্টা করা যেত। এ যে দেখছি গোটা গ্রামেই ভূত থইথই করছে। ভুতুড়িয়া তো এখন ভূতেদের নিজস্ব কলোনি। ক'টাকে তাড়াব? তাড়িয়ে দিলে এত ভূত যাবেই বা কোথায়? ভূত-পেতনি যাই হোক, মানবিকতার ব্যাপারটাও তো দেখতে হবে! পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে উচ্ছেদ করাটা অমানবিক।''

ওঝা দু'জন সাত টাকা করে চোদ্দো টাকা গাড়ি ভাড়া নিয়ে চলে গেলেন। এর ঠিক তিনদিন পর ঘটল আর-এক কাণ্ড। রাতের দিকে তো জমিদারবাড়িতে যাওয়ার প্রশ্নই নেই। কেউই যেতে চায় না। একবার কথা হয়েছিল, সবাই যদি দল বেঁধে যাই এবং আমাদের সঙ্গে যদি পুলিশ থাকে, তা হলে? কিন্তু থানার দারোগা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন, ''চোর, ডাকাত, খুনি ধরার ট্রেনিং আমাদের আছে। কিন্তু ভূত ধরার কোনও ট্রেনিং আমাদের দেওয়া হয়নি। অতএব, আমাদের দ্বারা ওসব কাজ হবে না।''

দমকল তো আগেই জানিয়ে দিয়েছে, ''ভূত যদি কোথাও আগুন ধরিয়ে দেয়, তা হলে সেই আগুন নেভাতে আমরা যাব। আমাদের কাজ আগুন নেভানো।''

ভুতুড়িয়া গ্রামের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ভুতুড়িয়া সমাচার' তার সম্পাদকীয় নিবন্ধে সরকার আর প্রশাসনের সমালোচনা করে লিখল, ''এ কেমন সরকার, কেমন প্রশাসন? যে সরকারের ভূত ধরার কোনও পরিকাঠামোই নেই? পলাশির যুদ্ধের পরই এই গ্রাম ভূত-কবলিত হয়। তখন এর নাম হয় ভুতুড়িয়া। ক্রমে ক্রমে [illegible] হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ করে আবার [illegible] আমদানি হল কোত্থেকে।

ভূতেদের এই অবৈধ অনুপ্রবেশ আটকানোর কি কোনও উপায় নেই।''

যখন ভুতুড়িয়া গ্রামে ভূতের উৎপাত নিয়ে এই ধরনের আলোচনা চলছে, তখনই জমিদারবাড়ির একজন কর্মচারী এসে হেলাবটতলার ক্লাবঘরে একটি আশ্চর্যের খবর দিল। হেলাবটতলার ক্লাবঘরে আপাতত ভূত প্রতিরোধ কমিটির অস্থায়ী অফিস করা হয়েছে। সেই প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি গিরিধারী হালদার যখন ক্লাবঘরে ভূতেদের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষণ দিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই এক জঙ্গি ভূত সবার দৃষ্টির আড়ালে এসে গিরিধারী হালদারের গালে এমন একটি চড় কষাল যে, তার শব্দ ক্লাবঘরের বাইরে সিধু ময়রার দোকান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। গিরিধারীবাবুর সেটাই শেষ ভাষণ। তারপর তিনি দু'খানি কশের দাঁত খুইয়ে বাড়িতেই শয্যা নিয়েছেন। ভূত বিষয়ে কোনও মতামতই দিচ্ছেন না।

হেলাবটতলার ক্লাবঘরের সামনে জমিদারবাড়ির জনৈক কর্মচারীকে দেখে সবাই অবাক হয়ে তাকাল। কেউ কেউ একটু দূরে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল, ''কী ব্যাপার? নতুন কিছু ঘটেছে নাকি?''

কর্মচারীটি বলল, ''নতুন মানে, তাজ্জব ব্যাপার। দোতলায় ভূতেদের মধ্যে কী ঘটেছে জানি না। কিন্তু দু'টি ভূত বেজায় কাঁদছে। কেঁদেই চলেছে। মানুষ অথবা ভূত যেই হোক, কেউ যদি উপরে কেবল কেঁদে চলে, তা হলে নীচে আমরা থাকি কেমন করে?''

''খুবই খাঁটি কথা। ভূত বলে কি তাদের দুঃখ-কষ্ট নেই। কিন্তু কাঁদছে কেন? ভূতই যে কাঁদছে সেটা কীসে বোঝা গেল?''

ওই কর্মচারী বলল, ''তা ছাড়া কে কাঁদবে! দোতলার বারোখানা ঘরে তেনারা ছাড়া আর আছেটা কে?''

মধু বড়াল গ্রামের প্রধান মানুষ। তিনি বললেন, ''বারোখানা ঘরে বারোখানা ভূত?''

কর্মচারী বলল, ''বারোখানা ঘরে বারোজন না কি বত্রিশজন তা তো গুনে দেখিনি। তবে সব ঘরেই তেনারা আছেন।''

মধু বড়াল বললেন, ''বাংলায় বারো ভুঁইয়ার কথা জানি। এ যে দেখছি ভূতেদের মধ্যে আবার সেই বারো ভুঁইয়া।''

পঞ্চানন সাঁতরা পঞ্চায়েতের সদস্য। তিনি বললেন, ''ব্যাপারটা সোজা নয়। কথায় বলে না, সবকিছু বারো ভূতে খাবে? অতএব, বারো ভূত মানেই খুব বিপজ্জনক ব্যাপার। যাই করবেন, খুব সাবধানে।''

জমিদারবাড়ির কর্মচারীকে বসিয়ে রেখে সবাই তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিল, জমিদারবাড়িতে ভূতেদের কান্নাটা শুনতে আমাদের যাওয়া উচিত। যদি ওদের কান্নার উপশম করা যায় তা হলে হয়তো বুঝিয়ে-সুজিয়ে ওদের গ্রামছাড়া করা যাবে। কিন্তু যাবে কে? সবাই প্রস্তাব করল, হরিপদই যাক। কেননা, ওখানে ওর বাবা নিরাপদ আছেন। তিনি ছেলের বড় রকমের কোনও অকল্যাণ করবেন না। বরং রক্ষা করবেন। কানাই দুধওয়ালার যাওয়া বোধ হয় ঠিক হবে না। ওখানে কানাইয়ের শ্বশুর আছেন। জামাই-শ্বশুরের সম্পর্ক একেবারেই ভাল না। অতএব, হরিপদই যাক। অন্যরা জমিদারবাড়ির বাইরে থাকবে। আর কান্না যখন দিনেও শোনা যাচ্ছে, তখন রাতে যাওয়ার দরকার নেই। হরিপদ দিনেই যাবে। অন্যরা পশ্চাতে থাকবে। হরিপদ যে এককথায় রাজি হয়ে গেল, তা নয়। অনেক খোশামোদের পর তাকে রাজি করানো গেল।

একদিন বেলা এগারোটা নাগাদ দশ-বারোজনের একটা ছোট দল জমিদারবাড়ির দিকে রওনা দিল। সেদিন আকাশটা একটু মেঘলা-মেঘলা ছিল। অন্যদিনের মতো ঝকঝকে রোদ নেই। পথ চলতে চলতে সেই দলের মধ্যে থেকে কে যেন একজন বলে উঠল, ''আজকের আবহাওয়া খারাপ। মেঘলা দিনের আর বাদলা দিনের ভূতেরা বদমেজাজি হয়। সবকিছু বুঝেশুনে কথা বলতে হবে। হরিপদকে সেটা বলে দেওয়া দরকার।''

হরিপদ কথাটা শুনল। মুখে কিছু বলল না বটে, কিন্তু ভিতরে গজগজ করতে করতে বলল, ''সবজান্তা সর্বেশ্বর। এ যেন ভূতের মামা।''

জমিদারবাড়ির দু'জন কর্মচারী গেটের সামনেই অপেক্ষা করছিল। সবাই বাড়ির ভিতরে ঢুকল না। হরিপদকে নিয়ে মাত্র তিনজন জমিদারবাড়ির একতলায় এসে শুনল, দোতলায় দু'টি দুঃখী ভূতের কান্না। ভূতেরা কাঁদে কি না তাই তার জানা ছিল না। জোড়া ভূতের এই করুণ কান্না শুনে হরিপদর হঠাৎ মনে হল, তার বাবা কাঁদছেন না তো? যে কোনও কারণেই হোক, আজ না হয় বাবা ভূত হয়েছেন, কিন্তু বাবা তো বটে!

হরিপদর মন খারাপ হয়ে গেল। দোতলায় ওঠার সিঁড়ির কাছে গিয়ে হরিপদ বিষণ্ণ গলায় ডাকল, "বাবা, বাবা গো? তোমার কী হয়েছে?"

একটু পরে উপর থেকে উত্তর এল, "কে? হরিপদ? আমার হরে! তা কী মনে করে এলি বাবা!"

হরিপদ বলল, "তোমাদের মধ্যে কারা কাঁদছে? কী হয়েছে?"

হরিপদর বাবা নিরাপদ উত্তর দিলেন, "দাঁড়া, আমি নীচে গিয়ে বলছি।"

হরিপদ ছাড়া অন্যরা হরিপদকে বলল, "হরিপদ, বাবাকে নীচে নামতে বারণ কর। যা বলার উপর থেকেই বলুন।"

ভূতেদের মতিগতি সম্বন্ধে হরিপদ মোটেও ওয়াকিবহাল নয়। বাবা বেঁচে থাকতে তাঁর মতিগতিই বুঝতে পারত না। এখন সেই বাবা ভূত হয়ে গিয়ে কেমন মতি হয়েছে সেটা জানার উপায় নেই। তাই হরিপদ বলল, "বাবা, তুমি সিঁড়ির উপর থেকেই বলো। কষ্ট করে নীচে নামার দরকার নেই।"

উপরের ঘরে জোড়া ভূতের কান্নাটা তেমনই চলছিল। ভূতবাবা নিষেধ শুনলেন না। সিঁড়িতে খটাখট শব্দ করে নীচে নেমে এসে বললেন, "আমি এসেছি, দেখা পাচ্ছিস না বলে মনে করিস না আমি আসিনি। এবার বল, দলবল নিয়ে কেন এসেছিস?"

হরিপদ একবার ঢোক গিলে বলল, "বাবা, জন্ম অবধি শুনে আসছি ভূত নাকিসুরে কথা কয়, নাকিসুরে কাঁদে। কিন্তু তোমরা তো তা করছ না।"

হরিপদর ভূতবাবা নিরাপদ বললেন, "ভুল শুনে এসেছিস। তোদের মানুষদের মধ্যেও তো অনেকে নাকিসুরে কথা কয়, নাকিসুরে গান গায়, এমনকী রবি ঠাকুরের গানও নাকের ন্যাকামি দিয়ে গায়, তার বেলা? আমি মানছি, মানুষের মতো ভূতেদের মধ্যেও কারও কারও নাসিকা সমস্যা আছে। এটা কোনও দোষের নয়।"

হরিপদ বলল, "উপরে কাঁদে কারা? ওদের কষ্টটা কীসের?"

নিরাপদ জবাব দেওয়ার আগেই গম্ভীর গলায় জমিদারবাবু বললেন, "তোমরা কি কেউ ওর কষ্টটা দূর করতে পারবে? কান্না থামাতে পারবে?"

হরিপদ খুব বিনীতভাবে বলল, "কান্নার কারণ জানা গেলে চেষ্টা করতে পারি।"

জমিদারবাবু এবার বললেন, "ওদের একজন আমার নিষেধ অমান্য করে একা গঞ্জের হাটে বেড়াতে গিয়েছিল। ভূত হয়েই যদি যেত তা হলে অঘটনটা ঘটত না। বাহাদুরি দেখিয়ে গেল মানুষের রূপ ধরে। ব্যস, ওখানে ওকে মানুষে ধরল।"

হরিপদ অবাক গলায় বলল, "কীসে ধরল?"

জমিদারবাবু বললেন, "মানুষে। ভূত যেমন মানুষের ঘাড়ে চাপে অর্থাৎ ভূত মানুষকে ধরে, এখানে উলটোটা ঘটল। মানুষ ভূতকে ধরল। এখনও ধরেই আছে!"

হরিপদ বলল, "তাড়াতে পারছেন না?"

এবার জমিদারবাবুর ভূত নয়, হরিপদর বাবার ভূত বললেন, "কী করে তাড়াব? আমরা কি মানুষ তাড়াবার মন্ত্র জানি! তিব্বতে খবর গেছে। ওখান থেকে দু'জন লোক আসবে। তারা নাকি মানুষের ওঝা। ভূতকে মানুষ ধরলে একমাত্র ওরাই ছাড়াতে পারে। ওদের ভরসাতেই আছি। তোরা তো জানিস না, জমিদারবাবুর ভাগনে জমিদারবাবুকে খুন করে গা ঢাকা দিয়েছিল। সেই জমিদারবাবুই ভূত হয়ে একদিন মোষডোবা খালের ধারে ভাগনেকে খুন করেন। এমনই কপাল, সেই ভাগনের ভূত এখন আশ্রয়ের জন্য জমিদারবাবুর পা ধরে কান্নাকাটি করে। জোড়া ভূতের কান্নার মধ্যে ওই ভাগনের ভূতের কান্নাও

আছে। আমরা বাপু আমাদের নিয়ে আছি। তোরা তোদের নিয়ে থাক না। আমাদের টানাটানি কেন? আমাদের নিয়ে এত রঙ্গ-তামাশাই বা কেন? ভুতুড়ে ব্যাপার, ভুতুড়ে ভোটার, ভুতুড়ে বেগার, বারোভূতে খাবে, এত ভূত নিয়ে কথা কেন? ভূতের কান্না শুনে ছুটে এলি? তোরা কি মানুষের কান্না শুনতে পাস না? ভূতের ওঝা না খুঁজে দুঃখের ওঝা খোঁজ।''

জমিদারবাবুর ভূত বললেন, ''চলে এসো নিরাপদ। এসব কথা কাকে বলছ? আজ শুনবে কাল ভুলে যাবে। চলো, ওদের পাশে গিয়ে বসি। ওদের দুঃখের ভাগ নিই। ভূতের দুঃখ ভূত না বুঝলে কে বুঝবে! চলে এসো।''

সিঁড়িতে শব্দ করে ওঁরা উঠে গেলেন। বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে এক সময় হরিপদর মনে হল, সেও যেন ভূত হয়ে যাচ্ছে। সত্যিকারের মানুষ না হতে পারার চেয়ে ভূত হওয়া বোধ হয় খারাপ নয়!

২ মে ২০০৫

অলংকরণ: অনুপ রায়
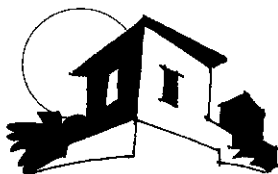
ধুলোটে কাগজ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

নিরাপদর মা মারা যাওয়ার পর তার আর কেউ রইল না। বড্ড একা পড়ে গেল সে। মাকে ভালবাসতও খুব। মা ছাড়া কেউ ছিল না কিনা! কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে সারাদিন। বাড়িতে মন টিকতে চায় না মোটে। তার ঠাকুরদার আমলের এই বাড়িখানায় পাঁচ-ছ'টা ঘর। সব পুরনো জিনিসে ঠাসা। পুরনো আমলের বাক্সপ্যাঁটরা, তোরঙ্গ, কৌটোবাউটো, রাজ্যের ন্যাকড়া-ট্যাকরা, ভাঙা লণ্ঠন থেকে ডালা-কুলো সব ডাঁই হয়ে আছে সারা বাড়িতে। মা যক্ষীর মতো এসব আগলে রাখত। কোন কাজে লাগবে কে জানে! কিন্তু নিরাপদ যেদিকেই তাকায় অমনি মায়ের কথা মনে পড়ে, আর বড্ড হু হু করে বুক।

গাঁয়ের বন্ধুরা আর পাড়াপ্রতিবেশীরা অবশ্য তাকে নানা কথাবার্তায় ভুলিয়ে রাখল।

শ্রাদ্ধশান্তি মিটে যাওয়ার পর গাঁয়ের মহাজন এবং মাতব্বর পশুপতি রায় একদিন গম্ভীরমুখে এসে বললেন, ''ওরে নিরাপদ, বাড়িটার বিলিব্যবস্থা কী করলি? তোর মা যতদিন বেঁচে ছিল কিছু বলিনি। অনাথা বিধবা মানুষ, তার দুঃখ বাড়িয়ে লাভ কী? কিন্তু টাকাগুলো তো আর ফেলে রাখতে পারি না। সুদে-আসলে যে অনেক দাঁড়িয়ে গেছে রে।''

নিরাপদ হাঁ। বলল, ''কীসের টাকা?''

পশুপতি রায় একখানা ধুলোটে কাগজ বের করে দেখাল, ''এই দেখ, তোর বাপের সই। শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার। বিশ হাজার টাকা হাওলাত নিয়েছিল বাড়ি আমার কাছে বাঁধা রেখে। সুদে-আসলে দেড় লাখ দাঁড়িয়ে গেছে।''

বাবাকে নিরাপদর মনেই নেই। সে যখন ছোট ছিল, তখন মারা যায়। বাপের সইসাবুদও তার চেনার কথা নয়। কিন্তু পশুপতি ডাকসাইটে মানুষ। তার দাপটে সবাই তটস্থ। পশুপতি রায়ের সুনাম নেই বটে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে কেউ টুঁ শব্দটি করার সাহস পায় না।

নিরাপদ মিনমিন করে বলল, ''তা আমাকে কী করতে হবে?''

পশুপতি রায় ভ্রু কুঁচকে বলল, ''পিতৃঋণ শোধ করা পুত্রের অবশ্য-কর্তব্য। তা, তুই যদি বাপের ধার এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা শোধ করে দিতে পারিস তা হলে আর ঝামেলায় পড়তে হয় না।''

নিরাপদ ঢোক গিলে বলে, ''টাকা! টাকা কোথায় পাব? আমার তো খাওয়াই জুটছে না।''

''তা হলে তো বাপু বাড়িখানা ছাড়তে হচ্ছে। এই পুরনো ঝুরঝুরে বাড়ির দাম তিরিশ-চল্লিশ হাজার টাকা ওঠে কি না সন্দেহ। কিন্তু কী আর করা, কিছু টাকা বোকাদণ্ডই যাবে আমার। দু'দিন সময় দিলুম। পরশু দিন সকালে এসে বাড়ির দখল নেব। আর শোন, আমার দুটো পাইক পাহারায় থাকবে। বাড়ির কোনও জিনিস পাচার করা চলবে না। বাড়ি থেকে তো দাম উঠবে না, পুরনো মাল বেচে যদি আরও কিছু উসুল হয়।''

পশুপতি চলে গেল। কিন্তু দুটো যণ্ডামার্কা পাইক বাড়ির বারান্দায় লাঠি হাতে বহাল রইল। দু'জনেই ভারী গম্ভীর।

নিরাপদ বুঝে গেল, সে চিপিকলে পড়ে গেছে।

পশুপতি রায়ের থাবা থেকে বাড়িটা বাঁচানোর কোনও উপায় নেই। মুচকুন্দপুর গাঁয়ে বা তার আশপাশে এমন কেউ নেই যে পশুপতির সঙ্গে এঁটে উঠবে।

নিরাপদ একটু ভালমানুষ আর একটু বোকা, আর একটু ভিতুও বটে। তাই সে বসে বসে আকাশপাতাল ভাবতে লাগল। বাড়ি ছাড়তে হলে সে যাবেই বা কোথায়, খাবেই বা কী? মা যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন পশুপতি কেন উদয় হয়নি কে জানে? আর মা থাকতে তার খাওয়াপরারও অভাব ছিল না। মা কীভাবে চালাত তা অবশ্য সে জানে না। কখনও জিজ্ঞেস করারও দরকার হয়নি।

পাইক দু'জন তার দিকে রক্তচক্ষুতে তাকিয়ে আছে দেখে সে ভয় পেয়ে ঘরে ঢুকে খিল তুলে দিল।

পশুপতিকাকা ঘরের জিনিসপত্র সরাতে বারণ করে যাওয়ায় আরও ফাঁপরে পড়ে গেছে সে। ঘরের চাল-ডালে টান পড়েছে। ভেবেছিল দু'-একটা পুরনো বাসন বেচে দিয়ে চাল-ডাল কিনবে, এখন তো তাও হবে না। নিরাপদ এখন করে কী? কুয়ো থেকে জল তুলে একপেট জল খেয়ে সে ভিতরের দিকের দাওয়ায় বসে রইল চুপ করে। সামনে দেওয়াল-ঘেরা ছোট উঠোন। দুটো পেঁপে গাছ। একটা আম আর পেয়ারা গাছ। আমগাছে বসে দুটো কাক সমানে ডাকছে। নিরাপদর মাথায় কোনও মতলব আসছে না। দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। খিদে পেয়েছে। তবু উঠে দুটো ভাত ফুটিয়ে নেওয়ার গরজও নেই তার। মনটা বড্ড খারাপ।

এমন সময় সদর দরজায় প্রবল কড়া নাড়ার শব্দ শুনে চমকে উঠল সে। তাড়াতাড়ি উঠে এসে দরজা খুলেই দু'পা পিছিয়ে এল নিরাপদ। দুটো মুসকো পাইক রাগে গজরাচ্ছে। প্রথমজন বলল, "তোর এতবড় সাহস যে, তুই পিছন থেকে আমাকে লাথি মেরে পালিয়ে এসেছিস!"

অন্যজন বলল, "বেয়াদব, নচ্ছার, এত তোর বুকের পাটা যে, পিছন থেকে আমার মাথায় গাট্টা মারলি।"

নিরাপদ ভয় পেয়ে তোতলাতে তোতলাতে বলে, "আ-আমি। কাকুরা কী যা-তা বলছেন? আমি মারব আপনাদের? আমি তো পিছনের দাওয়ায় বসে ছিলাম!"

প্রথম পাইকটা খপ করে তার চুলের মুঠি ধরে বলল, "অন্যায় করে ফের মিথ্যে কথা! দেব ঘাড়টা মটকে?"

প্রথম পাইকটা দ্বিতীয় পাইকটাকে সরিয়ে দিয়ে বলল, "দে না আমার হাতে ছেড়ে, গাট্টা কাকে বলে আমি ছোঁড়াকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

নিরাপদ জীবনে কারও কাছে মারধর খায়নি। সে ভয়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। কিন্তু তাতে ভবি ভোলার নয়। দ্বিতীয় পাইকটা তার ঘাড় ধরে হেঁটমুণ্ডু করে পেল্লায় একটা গাট্টা বসিয়ে দিল। নিরাপদর মাথাটা ঝিনঝিন করে উঠল।

এই সময় তাকে হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয় পাইকটা প্রথম পাইকটার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "এই বিষ্টু, তুই আমার পিঠে কিল মারলি কেন রে?"

লোকটা অবাক হয়ে বলে, "আমি কিল মারলাম! বলিস কী? আমি তো তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছি! মিথ্যে কথা বলার আর জায়গা পাস না!"

"মিথ্যে কথা! কিল মেরে ফের ভালমানুষ সাজা হচ্ছে! বুঝেছি, একটু আগে যখন আমি বারান্দায় বসে গুনগুন করে রামপ্রসাদী গাইতে গাইতে একটু ঢুলে পড়েছিলাম, তখনই তুই গাট্টা মেরে গিয়ে ভালমানুষের মতো তফাতে বসে পড়েছিলি।"

"দেখ পটা, বেশি বাড় ভাল না। জষ্টিমাসে কর্তাবাবুর বাগানের কাঁঠাল চুরি করে খেয়ে আমার ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছিলি, সেকথা আমি ভুলিনি। হিরু পাইকের নাগরা জুতো হারিয়ে ফেলে আমাকে চোর বলে বদনামও তুই-ই তা হলে রটিয়েছিলি! আজ তোকে ছাড়ছি না।"

"দেখ বিষ্টু, লাই দিলে কুকুরও মাথায় চাপতে চায়। তোর বহুত বেয়াদপি এতদিন মুখ বুজে সহ্য করেছি, কিন্তু আর নয়। আজ তোর শেষ দেখে ছাড়ব।"

এই বলতে বলতে দু'জনের মধ্যে ধুন্ধুমার লড়াই
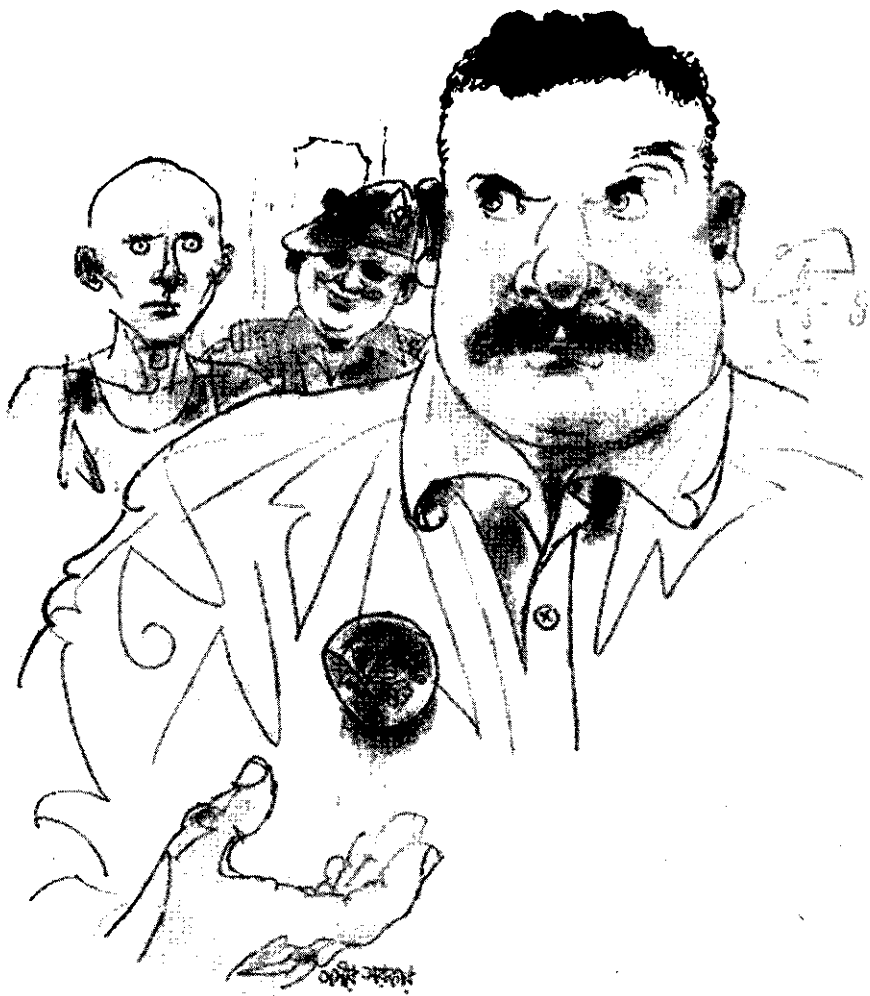
লেগে গেল। নিরাপদ খিদে-তেষ্টা ভুলে দুই পাইকের লড়াই দেখতে লাগল। মারামারি করতে করতে দু'জনে জড়াজড়ি করে গড়াতে গড়াতে রাস্তায় গিয়ে পড়ল। হইহই শুনে লোকজন ছুটে এসে ভিড় করে ফেলল। যত লড়াই-ই একসময় শেষ হয়। এটাও হল। আধ ঘণ্টাটাক বাদে ধুলোমাখা দুটো পেল্লাই চেহারার লোক ছেঁড়া চুল, ফোলা চোখ, নড়া দাঁত আর রক্তমাখা ঠোঁটে উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে যে যার বাড়ি চলে গেল। নিরাপদর দিকে ফিরেও তাকাল না।

কিন্তু কী নিয়ে দু'জনের মধ্যে ঝগড়াটা লাগল, সেটা নিরাপদ বুঝতেই পারল না। তবে সে মনের আনন্দে রাত্রিবেলা ডাল-ভাত রান্না করে খেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোল।

পরদিন সকালেই পশুপতি রায় সদলবলে এসে হাজির। চোখ পাকিয়ে হুংকার ছেড়ে বলল, "তুই নাকি আমার পাইকদের মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিস! এত আস্পদ্দা তোর হয় কী করে?"

নিরাপদর একগাল মাছি। সে হাঁ করে কিছুক্ষণ সভয়ে চেয়ে থেকে বলল, "কর্তাবাবু, আপনার পাইকদের মারধর করার মতো অবস্থাই আমার নয়। আমি তাদের ভয়ে দরজায় খিল এঁটে ছিলাম।"

পশুপতি ফের হুংকার দেয়, "মিথ্যে কথা। পাঁচজনে দেখেছে, তুই দুটো পাইককে উস্তমফুস্তম করে মেরেছিস। একজনের একটা চোখই বোধ হয় গেছে। পটার দুটো দাঁত পড়ে গেছে। আমি থানায় এত্তেলা দিয়ে এসেছি, তোকে তারা এসে হাতে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাবে। সাতটি বছর যাতে জেলের ঘানি টানতে হয় তার ব্যবস্থা করে রাখছি।"

নিরাপদ ভয়ে একেবারে সিঁটিয়ে গেল। মিনমিন করে তবু বলল, "আজ্ঞে, তারা যে নিজেদের মধ্যেই মারপিট করছিল, নিজের চোখে দেখা।"

"এখন নিজের পিঠ বাঁচাতে গল্প ফাঁদছিস? যাকগে, যা বলার আদালতে দাঁড়িয়ে বলিস। বাঘা উকিলের জেরায় সব কথা বেরিয়ে পড়বে। আজ থেকে চারজন পাইক এ বাড়িতে মোতায়েন থাকবে। গড়বড় দেখলেই লাঠিপেটা করার হুকুম দিয়ে যাচ্ছি।"

এবার আরও বড় মাপের চারজন পাইক বহাল হল। তাদের চেহারা দৈত্য-দানবের মতো। তারা বড় বড় সড়কি আর রামদা হাতে নিয়ে সামনের বারান্দায় এঁটে বসল।

নিরাপদ ফের কাঁপতে কাঁপতে দরজায় খিল তুলে ভিতরের বারান্দায় বসে রইল। কী যে হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

একটু বাদেই বাইরের দিকে প্রবল হুটোপাটি আর চেঁচামেচির শব্দ পেয়ে চমকে উঠল সে। দৌড়ে গিয়ে জানলায় উঁকি মেরে যা দেখল, তাতে শরীর হিম হয়ে গেল তার। দেখল, একটা কুড়ি-একুশ বছরের রোগাভোগা চেহারার ছেলে চারজন দৈত্য-দানবের মতো পাইককে দমাদম লাঠিপেটা করছে। পাইকরাও লাঠি, সড়কি, দা চালাচ্ছে বটে, কিন্তু ছেলেটার তাতে কিছুই হচ্ছে না। বরং উলটে ছেলেটার লাঠির ঘায়ে পাইকদের কারও মাথা ফাটছে, কারও কনুই ভাঙছে, কেউ হাঁটু মুড়ে বসে পড়ছে, আর সবাই মিলে আর্ত চিৎকার করছে, "বাঁচাও, বাঁচাও, মেরে ফেললে, কেটে ফেললে...!"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই লড়াই শেষ। চারটে পাইক চিতপটাং হয়ে পড়ে রইল, সাড়া নেই। ছোকরাটাকে ভারী চেনা চেনা ঠেকল নিরাপদর, কিন্তু ঠিক চিনতে পারল না। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে এসে সে বলল, "তুমি কে ভাই?"

কিন্তু কোথায় কে? ছোকরার চিহ্নমাত্র নেই, শুধু তার পরিত্যক্ত লাঠিটা পড়ে আছে বারান্দায়। লাঠিটা তুলে নিয়ে নিরাপদ হাঁ করে চেয়ে রইল। হঠাৎ শিউরে উঠে সে বুঝতে পারল, ছোকরাটা হুবহু তারই মতো দেখতে। আয়নায় সে নিজের চেহারাটা যেমন দেখেছে, অবিকল সেই চেহারা। তাই অত চেনা চেনা ঠেকছিল বটে!

স্তম্ভিত হয়ে সে যখন দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক সেই সময়ই একটা পুলিশের জিপ এসে বাড়ির সামনে থামল। দারোগাবাবু এবং জনাচারেক সেপাই নেমে এসে থমকে দাঁড়াল। চারজন ভূপতিত পাইক আর তার দিকে পর্যায়ক্রমে চেয়ে দারোগাবাবু বললেন, "ওঃ, তা হলে যা শুনেছি তা মিথ্যে নয়!"

তাড়াতাড়ি লাঠিটা ফেলে দিয়ে নিরাপদ হাতজোড় করে বলল, "আজ্ঞে দারোগাবাবু, কোথা থেকে উটকো ছেলে এসে এই কাকুদের খুব মারধর করে গেছে। আমার কিন্তু কোনও দোষ নেই।"

দারোগাবাবু থমথমে মুখ করে বললেন, "বটে? তা, ছোকরাটা কে?"

"চিনি না।"

"তুমি না চিনলেও আমরা যে তাকে বিলক্ষণ চিনি হে। তার নাম নিরাপদ সরকার, তাই না?"

নিরাপদ কাঁপতে কাঁপতে বলল, "বিশ্বাস করুন দারোগাবাবু, এই পাইক কাকুদের ধারেকাছেও আমি আসিনি। আমি দরজায় খিল দিয়ে..."

দারোগা হাত তুলে বললেন, "আর বলতে হবে না। এবার আমার সঙ্গে লক্ষ্মী ছেলের মতো থানায় চলো তো। তোমাকে অবশ্য বিশ্বাস নেই। আমাদের উপরেও হামলা করতে পারো। তাই আগেই সাবধান করে দিচ্ছি। বেগড়বাঁই দেখলে কিন্তু গুলি চালিয়ে দেব।"

অগত্যা থানাতেই যেতে হল নিরাপদকে।

থানায় একজন মস্ত গোঁফওয়ালা হোমরাচোমরা

গোছের লোক বসে ছিলেন। চোখে ভ্রুকুটি, আর খুব রাশভারী মুখ। দারোগাবাবু তাঁকে দেখেই লম্বা স্যালুট দিয়ে বললেন, ''স্যার, আপনি এখানে?''

''হ্যাঁ, আমি। ফোনে বড়কর্তার জরুরি হুকুম পেয়ে আসতে হল। তা, এই ছেলেটা কে? ধরেই বা এনেছেন কেন?''

দারোগাবাবু তখন সবিস্তার নিরাপদর গুন্ডামির কথা বলে গেলেন। শুনে রাশভারী লোকটা আপাদমস্তক নিরাপদকে একবার দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ''বয়স কত?''

ভয়ে নিরাপদর গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না। ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, ''আজ্ঞে, কুড়ি-একুশ হবে।''

''বলি, পুলিশে চাকরি করবে?''

নিরাপদ ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে গোলমেলে মাথা নিয়ে চুপ করে রইল। ভুলই শুনে থাকবে। সে আজকাল ভুল শুনছে। ভুল দেখছেও।

রাশভারী লোকটা বলল, ''পুলিশে আজকাল ডাকাবুকো লোকের খুব অভাব। আমরা তোমার মতো বাহাদুর ছেলেই চাই। দেরি নয়, আজকেই জয়েন করো। আজই সদরে গিয়ে তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাঠিয়ে দিচ্ছি।''

সবাই এমন হাঁ করে রইল যে, সুচ পড়লে শোনা যায়।

পরদিন সকালেই পশুপতি রায় এসে হাজির। গোঁফ ঝুলে গেছে। চোখে করুণ দৃষ্টি। জোড়হাতে বলল, ''বাবা নিরাপদ, এবারের মতো মাপ করে দে বাপ। জালিয়াতির দায়ে যদি জেল খাটাস, তা হলে এই বুড়ো বয়সে কি বাঁচব? মাপ করে দে বাপ। এই তোর বাপের ধারের কাগজ ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছি!''

নিরাপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, ''লে হালুয়া!''

২ মে ২০০৫

অলংকরণ: সমীর সরকার
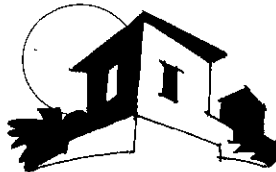
চৌধুরীবাড়ির অয়েলপেন্টিং

অশোক বসু

আমার বন্ধু মানিকের সঙ্গে গিয়েছিলাম ওর দেশের বাড়ি সেই গোকুলগঞ্জ। জমিজমার কী একটা গণ্ডগোলের ব্যাপার ছিল। মানিকের এক মেসো সেখানে থাকেন। তাঁর কাছেই উঠেছিলাম।

জমির সমস্যা মিটতে মিটতে দিন তিনেক লেগে গেল। পরের দিন ফিরব। ট্রেন সন্ধে সাতটায়। তাও গোকুলগঞ্জ থেকে এক ঘণ্টা বাসে। বিশ-পঁচিশ মিনিট রিকশায় গেলে তবে রেল স্টেশন। সন্ধের মুখে আমরা যখন স্টেশনে এসে পৌঁছলাম, তখন চারদিক রাতের মতো অন্ধকার হয়ে এসেছে। সময়টা ভরা বর্ষার। সকাল থেকেই আকাশে কালো মেঘ এখন-তখন করছিল। আমরাও স্টেশনে পৌঁছলাম, বৃষ্টিও নামল।

বেশি পয়সা দেব বলে রিকশাচালককে স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে যেতে রাজি করিয়েছিলাম। ভাড়া পেয়েই সে ওই বৃষ্টি আর অন্ধকারের মধ্যেই রিকশা ছুটিয়ে ফিরে গেল।

আসল অসুবিধেটা কী অপেক্ষা করছে, তখনও জানতাম না। জানলাম, স্টেশনে এসে। বৃষ্টি না হয় মানা গেল। বর্ষার মাসে বৃষ্টি তো হবেই। অসুবিধেয় পড়লাম, মাথা বাঁচানোর জন্য প্ল্যাটফর্মে কোনও টিনের শেড নেই বলে। স্টেশনে ঘর বলতে পাশাপাশি দেড়খানা ঘর। একটা স্টেশনমাস্টারের, অর্ধেকটা বোধ হয় টিকিট কাটার জন্য। আগেকার দিয়ে বাংলা সিনেমায় যেমন দেখা যেত— কৃষ্ণচূড়া কিংবা অন্য কোনও বড় গাছের নীচে লাল রঙের স্টেশনঘর, কুচিপাথরের একটুখানি প্ল্যাটফর্ম, চারদিকে জনবসতিহীন ফাঁকা মাঠ, ঠিক সেই রকম। প্যাসেঞ্জার বলতে আমি আর মানিক, সাকুল্যে এই দু'জন। বৃষ্টি বেশ জোরেই পড়ছিল। বৃষ্টি থেকে বাঁচতে বাধ্য হয়েই স্টেশনমাস্টারের ঘরে ঢুকে পড়লাম। এদিকে ইলেকট্রিক লাইট এখনও আসেনি। স্টেশনমাস্টারের ঘরে হ্যারিকেনের আলো জ্বলছে! দু'জন মানুষকে ঘরে দেখলাম বসে থাকতে। পোশাক দেখে বুঝলাম, একজন স্টেশনমাস্টার, অন্যজন স্টেশনমাস্টারের স্টাফ-টাফ কেউ হবে।

স্টেশনমাস্টার কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমাদের দেখলেন। সুটপ্যান্টপরা শহুরে যাত্রী এই স্টেশন দিয়ে খুব বেশি যাতায়াত করে না বোধ হয়! মানিক তাঁকে বলল, ''খুব বৃষ্টি হচ্ছে তো, বাইরে থাকলে ভিজে যাব, তাই। আমরা সাতটার ট্রেনটা ধরব।''

স্টেশনমাস্টার বললেন, ''কী বললেন, সাতটার ট্রেন ধরবেন?''

মানিক রুমাল দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে বলল, ''আজ্ঞে হ্যাঁ।''

''পাবেন না। শুধু সাতটার ট্রেন কেন, আপ-ডাউন কোনও ট্রেনই কাল সকালের আগে পাবেন না।''

''সে কী! ট্রেন পাব না?''

''না, লাইন বন্ধ। আগের স্টেশনে একটা গুডস ট্রেন ডিরেলড হয়েছে।''

মানিক আমার দিকে তাকাল। বুঝলাম, আতান্তরে পড়ে গিয়েছি। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। ট্রেন না পেলে এই দুর্যোগে কোথায়

কাটাব, কে জানে! মানিকও বহু বছর দেশছাড়া। এদিককার কিছুই এখন সে জানে না। গোকুলগঞ্জে যে ফিরে যাব, তারও উপায় নেই। যে রিকশায় এসেছিলাম, সেটাও ফিরে গিয়েছে। তা ছাড়া রাতে নাকি এদিকে বাসও চলে না।

মানিক বলল, "ভারী মুশকিল হল তো। এই বৃষ্টিতে সারারাত থাকব কোথায়? কী করব?"

স্টেশনমাস্টার বললেন, "সে তো বুঝতেই পারছি। স্টেশনঘরে যে থাকবেন, দেখতেই পাচ্ছেন কেমন স্টেশন। থাকার কোনও ব্যবস্থা নেই।"

দ্বিতীয় লোকটি এতক্ষণ কথাবার্তা শুনছিলেন। এবার বললেন, "একটা কাজ করতে পারেন। আধ মাইল দূরে চৌধুরীদের একটা পুরনো বাড়ি আছে। কেউ থাকে না। ওই বুড়ো ভবানীখুড়োই দেখাশোনা করেন। দেখুন, তাঁকে বলে-কয়ে, যদি কোনও ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। আমিই না হয় সঙ্গে গিয়ে বাড়িটা দেখিয়ে দেব। ভবানীখুড়োকেও বলব। বৃষ্টিটা থামুক। আপনাদের সঙ্গে তো ছাতাও দেখছি না।"

স্টেশনমাস্টার বললেন, "ব্রিজমোহন ঠিক কথাই বলছে। ওই বাড়িতে থাকতে পারেন। বাড়িটার অবশ্য বদনাম আছে। তা, আপনারা ইয়ং ম্যান, ওসব ভুতুড়ে গালগপ্পো বিশ্বাস করবেন কেন?"

একটু পরেই বৃষ্টি থেমে গেল। শুধু বৃষ্টিই থামল না, মেঘও সরে গেল। আকাশে চাঁদ দেখা গেল। চৌধুরীবাড়িতেই থাকা ঠিক করে আমরা ব্যাগ হাতে করে চললাম ব্রিজমোহনের পিছুপিছু। আলাপ-পরিচয়ে জানলাম, ব্রিজমোহন স্টেশনের টিকিটবাবু। বিহারের লোক, কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই পশ্চিমবাংলায় আছেন। কথাবার্তায় আলাপী, ভালমানুষই মনে হল। বাংলা বলেন রাঙালিদের মতোই।

তিথিটা সম্ভবত কৃষ্ণপক্ষের শেষের দিকের। বৃষ্টিভেজা মেঠোপথ চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। ব্রিজমোহনের হাতে টর্চ ছিল, কিন্তু জ্বালানোর কোনও দরকারই হল না।

জল-কাদার রাস্তা পার হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা চৌধুরীদের সেই বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। এত রাস্তা পার হলাম, কিন্তু পথে একটা লোকেরও দেখা পেলাম না। এখানে কেউ থাকে না নাকি?

রাস্তার ঠিক পাশেই একটা পুরনো একতলা বাড়ি। সময়ের ভাঙাগড়ায় অনেক কিছুই পুরনো, ঝুরঝুরে হয়ে গেলেও বাড়িটা এখনও ভেঙে পড়েনি। বট-অশথ শেকড় ছড়ালেও বাড়ির ছাদ-দেওয়াল অটুট আছে। আশপাশে আর কোনও ঘরবাড়ি চোখে পড়ল না। এককালে হয়তো ঘরবাড়ি ছিল, এখন নেই। চাঁদের আলোয় যত দূর দেখা গেল, বহু দূর ছড়ানো জনহীন ধূ ধূ প্রান্তর ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না।

আমি আবার বাড়িটার দিকে তাকালাম। তাকাতেই বুকের মধ্যে ছাঁৎ করে উঠল। মনে হল, বাড়িটা যেন হিংস্র চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি মানিকের গা ঘেঁষে দাঁড়ালাম।

ব্রিজমোহন বেশ জোরে ডাক দিলেন, "ভবানীখুড়ো, ও ভবানীখুড়ো?"

বাড়ির ভিতর থেকে ঘড়ঘড়ে গলায় উত্তর এল, "কে?"

"আমি গো, আমি," বললেন ব্রিজমোহন।

একটু পরেই লণ্ঠন হাতে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধ মানুষ। একমুখ সাদা গোঁফ দাড়ি, উলোঝুলো চুল, কোটরাগত চোখ, ভগ্নস্বাস্থ্য, শীতল, স্থবির মুখ। ভাঙাচোরা বিবর্ণ বাড়ির সঙ্গে ভবানীখুড়োকে বেশ মিলিয়ে নেওয়া যাচ্ছিল। তিনি লণ্ঠনটা তুলে ধরে ব্রিজমোহনকে দেখলেন, দেখলেন আমাদেরও। তারপর থমথমে গলায় বললেন, "এরা?"

কেমন যেন বহু দূর থেকে ভেসে এল তাঁর গলার স্বর!

ব্রিজমোহন বললেন, "খুড়ো, তোমার বাড়িতে এক রাতের জন্য এই দু'জনকে একটু আশ্রয় দিতে হয় যে। খুব মুশকিলে পড়েছেন এঁরা। সেই গোকুলগঞ্জ থেকে ট্রেন ধরতে স্টেশনে এসেছিলেন, কিন্তু তা আজ পাওয়া যাবে না। এই বৃষ্টিবাদলায় কোথায় যাবেন। কী, থাকা যাবে তো?"

ভবানীখুড়ো সামান্য সময় চুপ করে থেকে বললেন, ''যাবে।''

প্রথম থেকেই লক্ষ করেছিলাম, ভবানীখুড়ো কম কথা বলেন। যেটুকু দরকার, শুধু সেটুকুই বলেন।

বাড়িতে ইলেকট্রিক লাইট নেই। মানিক বলল, ''আমাদের কাছে টর্চ আছে। মোমবাতি কিনতে পাওয়া যাবে এখানে?''

ব্রিজমোহন বললেন, ''এখানে আধ ক্রোশের মধ্যে কোনও দোকান নেই। খুড়োর কাছে অবশ্য দু'-একটা মোমবাতি থাকতে পারে। কী খুড়ো, আছে তো?''

ভবানীখুড়ো বললেন, ''আছে।''

মানিক বলতে গেল, ''দামটা অবশ্য আমরা...''

তাকে থামিয়ে দিয়ে ভবানীখুড়ো বললেন, ''দাম লাগবে না।''

ব্রিজমোহনের আর থাকার দরকার ছিল না। বললেন, "আমি তা হলে স্টেশনে ফিরে যাই। রেলের অফিসাররা আসতে পারেন। আগের স্টেশনে মালগাড়ি উলটে গিয়েছে যখন!"

আমি আর মানিক হাত তুলে ব্রিজমোহনকে জানালাম, "ঠিক আছে।"

"আসুন," ভবানীখুড়ো বললেন। আমাদের নিয়ে গেলেন একটা ঘরে। লণ্ঠন উঁচিয়ে দেখালেন। ঘরটা বেশ বড়ই। একটা তক্তপোশ রয়েছে ঘরের এক পাশে, উপরে শতরঞ্চি পাতা। মোটামুটি পরিষ্কার ঘর। ঘরের দেওয়ালে দেখলাম, একটা অয়েল পেন্টিং টাঙানো আছে। লণ্ঠনের অল্প আলোতেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল একজন খুব অল্প বয়সের মেয়ের একটি শাড়িপরা ছবি। হাসিহাসি মুখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। এমন জীবন্ত ছবি আগে কখনও দেখিনি। মনে হল, এখনই যেন কথা বলে উঠবে!

তখনই আমাদের চমকে দিয়ে আকাশে কড়কড় শব্দ করে ঝিলিক দিল বিদ্যুৎ। মেঘ আবার জমতে শুরু করেছে। রাতে অঝোর ধারায় বৃষ্টি হবে।

মানিক বলল, "ঠিক আছে খুড়ো। এই ঘরেই তক্তপোশের উপর রাতটা দিব্যি কাটিয়ে দিতে পারব। আমাদের সঙ্গে খাবারও আছে। আসার সময় মাসি দিয়েছে, ট্রেনে খাওয়ার জন্য। জলও আছে এক বোতল।"

ভবানীখুড়ো বললেন, "মোমবাতি?"

"ও, হ্যাঁ, মোমবাতি। থাকলে একটা দিতে পারেন।"

ভবানীখুড়ো লণ্ঠনটা ঘরের মেঝেয় রেখে, অন্ধকারে চলে গেলেন মোমবাতি আনতে।

আমি বললাম, "লোকটা কেমন! ঠিক তোর-আমার মতো এই জগতের কোনও মানুষ নন যেন! এই জনমানবহীন জায়গায় এমন একটা পোড়ো বাড়িতে কীসের জন্য একা একা পড়ে আছেন, কে জানে?"

মানিক বলল, "চৌধুরীরা বোধ হয় এই অঞ্চলের জমিদার-টমিদার ধরনের কেউ ছিলেন এককালে। এখন জমিও নেই, জমিদারও নেই। লোকজন যারা থাকত, তারাও চলে গিয়েছে অন্য জায়গায়। পড়ে আছে শুধু এই বাড়িটা। ভবানীখুড়ো বোধ হয় বাড়িটার কেয়ারটেকার।"

ভবানীখুড়ো মোমবাতি নিয়ে এলেন। উনি নিঃশব্দে আসেন, নিঃশব্দে যান। পায়ের শব্দ পাওয়া যায় না। একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে ঘরের মেঝেয় রেখে বললেন, "আমি আসি।"

কিন্তু যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, "রাতটা সাবধানে থাকবেন।"

মানিক বলল, "কেন বলুন তো?"

ভবানীখুড়ো লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে বললেন, "বিদেশ-বিভুঁইয়ে সাবধানে থাকাই উচিত।"

ভবানীখুড়ো চলে যাচ্ছিলেন। কী মনে হল, বললাম, "আচ্ছা, দেওয়ালের ওই ছবিটা কার?"

ভবানীখুড়ো দাঁড়িয়ে পড়লেন। কাঁপা-কাঁপা মুখে ছবিটার দিকে তাকালেন। একটু সময় তাকিয়েই রইলেন। তারপর চোখ নামিয়ে শীতল গলায় শুধু বললেন, "ও হল টুসকি।"

বলে আর দাঁড়ালেন না। লণ্ঠন হাতে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

ভবানীখুড়োর আচরণটা অদ্ভুত ঠেকল। আমি মানিকের দিকে তাকালাম। দেখলাম, সে-ও অবাক হয়ে ভবানীখুড়োর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে আছে।

বললাম, "লোকটা অদ্ভুত ধরনের। ছবিটার কথা বলতে কেমন যেন হয়ে গেলেন!"

মানিক বলল, "এরকম জায়গায়, এরকম বাড়িতে অদ্ভুত মানুষ ছাড়া আর কাকে পাবি বল? বাদ দে তো। ওসব ভেবে কী লাভ? আমাদের দরকার রাতের মতো একটা আশ্রয়। পেয়ে গিয়েছি, ব্যস। সকাল হলেই তো চলে যাব।"

বাইরে তখন রাত আরও নিঝুম হয়ে এসেছে। মাঝে-মাঝে আকাশে মেঘের ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। ঘরে মোমবাতির ক্ষীণ আলোর শিখা থরথর করে কাঁপছে। এখনই বুঝি নিভে যাবে। চারপাশে কোনও জনমানুষের সাড়া নেই। শুধু আমরা দু'জনেই যেন প্রেতপুরীতে জেগে আছি।

একটু পরেই আবার শুরু হল বৃষ্টি। সেইসঙ্গে হাওয়া। মোমবাতিটা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। খানিক পরেই নিভে যাবে। হাতঘড়িতে সময় দেখলাম। পনেরো মিনিট বাকি আছে দশটা বাজতে। গাঁ-গঞ্জের হিসেবে অনেক রাত। আমাদের আর কিছুই করার ছিল না। সঙ্গের খাবার খেয়ে নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ব্যাগ দুটো মাথার নীচে থাকল বালিশের মতো করে।

কতক্ষণ শুয়ে ছিলাম জানি না। চোখেও ঘুম জড়িয়ে এসেছিল। মানিকের কথায় তন্দ্রা কেটে গেল।

"বিকাশ, বিকাশ, দেখ! অদ্ভুত ব্যাপার!"

মোমবাতি তখন শেষ হয়ে নিভে গিয়েছে। ঘরের মধ্যে ঘোর অন্ধকার। বাইরে বৃষ্টি আর হাওয়ার শব্দ। মনে হল, মানিক বিছানার উপর উঠে বসে আছে।

বললাম, "কী হয়েছে? কী দেখব?"

মানিক বলল, "দেওয়ালের ছবিটার দিকে দেখ। অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।"

ছবিটার দিকে তাকিয়েই ভয়ানক চমকে উঠলাম। এ কী অবিশ্বাস্য ব্যাপার! অন্ধকার ঘরে আর কিছু দেখা না গেলেও ছবিটা কিন্তু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এতটাই পরিষ্কার, যেন দিনের আলোয় ছবিটা দেখছি। তেমনই উজ্জ্বল, তেমনই স্পষ্ট। চারধার অন্ধকার, শুধু ছবির জায়গায় অন্ধকার নেই। এ কেমন করে সম্ভব!

মানিক বরাবরই যথেষ্ট সাহসী ছেলে। কিন্তু সে-ও দেখলাম এমন অবিশ্বাস্য ঘটনায় যথেষ্ট ঘাবড়ে গিয়েছে। বলল, "ছবির দিকে তাকানোর দরকার নেই। আয়, দু'জনে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকি। রাত কেটে যাবে এক সময়।"

তখনই দূরে কোথায় একটা কুকুর কান্নার মতো করে ডেকে উঠল। কিছুক্ষণ সেই ডাকটা একটানা চলতেই থাকল। তারপর আস্তে আস্তে বৃষ্টি আর হাওয়ার শব্দের মধ্যে ডাকটা মিশে গেল এক সময়। ঘরের সামনে দিয়ে কী যেন একটা ছুটে গেল। শিয়াল-কুকুর হবে!

আমি আর মানিক পাশাপাশি শুয়ে ছিলাম। ঘুমনো তো যাবে না। চোখ বন্ধ করে কোনওমতে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া আর কী। যে দিকের দেওয়ালে ছবিটা, আমরা পাশ ফিরে তার উলটো দিকে মুখ রেখে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকলাম।

বাইরে বৃষ্টি পড়েই চলেছে। দুর্যোগের রাত আস্তে

আস্তে গভীর হচ্ছে। এক অপার্থিব পরিবেশে আমরা বিনিদ্র হয়ে শুয়ে থাকলাম।

তখন অনেক রাত। মানিককে ফিসফিস করে বলতে শুনলাম, "ঘরের মধ্যে কেউ আছে। নিশ্চয়ই আছে। হেঁটে চলে যাচ্ছে কোনও মহিলা। আমি স্পষ্ট টের পাচ্ছি।"

আমি কান খাড়া করে শুয়ে রইলাম। প্রথমে কিছু না বুঝলেও একটু পরেই টের পেলাম। হ্যাঁ, আমরা দু'জন ছাড়া আর-একজন কেউ আছে এই ঘরে। খসখস করে খুব ক্ষীণ একটা শব্দ হচ্ছে। শাড়ি পরে চললে যেমন শব্দ হয়, সেরকম। শুধু শব্দ নয়, অন্যরকম একটা গন্ধও ভাসছে এই ঘরে! যেন কোনও অজানা লোকের কাছ থেকে ভেসে আসছে গন্ধটা।

কী মনে হল, আমি ছবিটার দিকে তাকালাম। আর তাকাতেই অবাক হয়ে গেলাম। কী আশ্চর্য, ছবিটা তো আর দেখা যাচ্ছে না। সব কিছুর মতো ছবিটাও অন্ধকার ঘরের দৃষ্টির অগোচর হয়ে আছে। আমার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা হিমেল স্রোত নেমে এল। তবে কি ওই ছবির সঙ্গে এই ঘরে কারও থাকার কোনও সম্পর্ক আছে!

বললাম, "মানিক, দেখ, দেখ, ছবিটা কিন্তু অন্ধকারে আর দেখা যাচ্ছে না।"

মানিক ছবিটার দিকে তাকাল। বুঝলাম, সে-ও ছবিটা দেখতে পাচ্ছে না। কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "অদ্ভুত ব্যাপার তো! দাঁড়া টর্চ জ্বালিয়ে দেখি।"

তখনই খিলখিল করে মেয়েলি হাসির শব্দ শোনা গেল। কে যেন দৌড়ে গেল দরজার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে মানিকের টর্চ জ্বলে উঠল। দরজা খুলে যে এইমাত্র বাইরে গেল, তার শাড়ির আঁচলের প্রান্তটা নিমেষের জন্য দেখা গেল। অবিকল একই শাড়ি, ছবির মেয়েটা যে শাড়ি পরে আছে!

মানিকের টর্চের আলো এবার এসে পড়ল ছবিটার উপর। এ কী! ছবি কোথায়? একটা সাদা কাগজ শুধু ছবির ফ্রেমে আটকানো রয়েছে। কোনও ছবি নেই।

টর্চ নিভিয়ে আমরা দু'জনে ঘেঁষাঘেঁষি করে হিম হয়ে বিছানায় বসে রইলাম।

সারারাত অবশ্য আর কোনও ভৌতিক ব্যাপার ঘটল না।

ভোরের আলো ফুটতেই এক মুহূর্ত দেরি না করে ব্যাগ নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম চৌধুরীবাড়ি থেকে। যাওয়ার সময় ভবানীখুড়োকে বলে যাওয়াও হল না। কাছেপিঠে কোথাও দেখলাম না তাঁকে। মনে হল, তখনও ঘুম থেকে ওঠেননি। কিন্তু তাঁর জন্য তো আর দেরি করা চলে না। সকালের ট্রেনটা ধরতেই হবে।

তখন আর বৃষ্টি নেই। যদিও আকাশ মেঘে ঢেকে আছে। আধমাইল রাস্তা হনহন করে হেঁটে সকাল-সকালই স্টেশনে পৌঁছে গেলাম।

স্টেশনমাস্টার স্টেশনেই ছিলেন। আমাদের দেখে বললেন, "এই যে, আসুন, আসুন। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাদের ট্রেন এসে যাবে। লাইন ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে। বসুন, চা খান।"

টেবিলের উপর একটা বড় ফ্লাস্ক ছিল। সেখান থেকে দুটো কাপে চা ঢেলে আমাদের দিলেন। সকালে গরম গরম চা খেয়ে ভালই লাগল।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মানিক বলল, "চৌধুরীবাড়ির ব্যাপারস্যাপার কী বলুন তো? অদ্ভুত অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে দেখলাম কাল রাতে।"

স্টেশনমাস্টার বললেন, "বলব, বলব। বলব বলেই তো আপনাদের বসতে বললাম। আপনারা তো দিব্যি একটা রাত কাটিয়ে এলেন। কিন্তু রাতে থাকা তো দূরের কথা, দিনের বেলাতেও কেউ পা দেয় না ওই বাড়িতে।"

আমি বললাম, "কেন বলুন তো?"

"সে অনেক কথা। যতটুকু জানি, বলছি।"

স্টেশনমাস্টার ডিবে থেকে একটিপ নস্যি নিয়ে নাকে দিলেন। রুমাল দিয়ে নাক মুছলেন। তারপর আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, "তা হলে শুনুন।"

স্টেশনমাস্টার যা বললেন, তা এরকম—

অনেক বছর আগে চৌধুরীরা ওই অঞ্চলের সম্পন্ন জোতদার ছিলেন। কিন্তু পরপর কয়েক বছর ভয়ানক অজন্মা হওয়ায় তাঁরা জমিজমা ছেড়ে চলে যান। থেকে গেলেন শুধু তাঁদের এক বংশধর ভবানী

চৌধুরী, যাঁকে সবাই এখন ভবানীখুড়ো বলে চেনে। তিনি গেলেন না শুধু একটা কারণে, নিজের একমাত্র সন্তান আদরের কন্যা টুসকির জন্য। অকালে স্ত্রী গত হওয়ার পর ভবানীখুড়ো ওই মেয়েকে নিয়েই থাকতেন। হাসিখুশি, চঞ্চল। দেখতেও খুব সুন্দর ছিল টুসকি। তো, এই মেয়ের যখন বিয়ের বয়স হল, পাত্রের খোঁজখবর চলছে, এমন সময় একদিন বাড়ির বাগানে সাপে কামড়াল টুসকিকে। আর, তাতেই তার মৃত্যু হল। মৃত্যুর এই আঘাতকে মেনে নিতে পারলেন না ভবানীখুড়ো। কোথাও গেলেন না। আদরের মেয়ের স্মৃতি আগলে পড়ে রইলেন এই বাড়িতে। কেমন যেন পাগল-পাগল হয়ে গেলেন মানুষটা। ভাল করে খাওয়াদাওয়া করেন না। বাইরে বের হন না। বাড়ির মধ্যে প্রেতগ্রস্তের মতো গুম মেরে বসে থাকেন।

''ঘটনা কি শুধু এই?''

মানিকের প্রশ্নে স্টেশনমাস্টার মাথা নাড়লেন, ''না, ঘটনা শুধু এই নয়। আর-একটু আছে। সেটাই আসল। নিশ্চয়ই দেখেছেন, টুসকির একটা ছবি আছে চৌধুরীবাড়ির একটা ঘরে। লোকে বলে, প্রত্যেক বছর আষাঢ় মাসের সাতাশ তারিখে সেই ছবি নাকি জীবন্ত হয়ে ওঠে। গভীর রাতে ছবি থেকে নেমে আসে টুসকি। একটা আশ্চর্যের ব্যাপার, সেই রাতে নাকি কালঘুম নেমে আসে ভবানীখুড়োর চোখে। অনেক চেষ্টা করেও জেগে থাকতে পারেন না। অনেক বেলা পর্যন্ত নাকি অঘোরে ঘুমোন! শোনা কথা সব, সত্যি-মিথ্যে বলতে পারব না। তবে, ওই দিনই, সাতাশ আষাঢ় টুসকিকে সাপে কেটেছিল।''

চকিতে একটা কথা মনে এল। বললাম, ''কাল বাংলা মাসের কত তারিখ ছিল?''

অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে স্টেশনমাস্টার বললেন, ''সাতাশ। আষাঢ় মাসের সাতাশ তারিখ। নিন, তৈরি হয়ে নিন। আপনাদের ট্রেন এখনই এসে যাবে।''

২ মার্চ ২০০৬

অলংকরণ: সুব্রত চৌধুরী
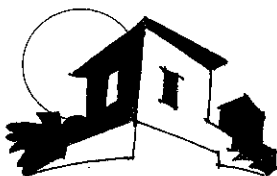
টমটমপুরের বুড়ি

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

এখন চিত্তদারোগা টমটমপুর থানায়। এই নামে পশ্চিমবঙ্গে কোনও জায়গা আছে কি না বদলির আগে পর্যন্ত দারোগা নিজেই জানতেন না। অজ পাড়াগাঁ বলতে যেমনটা বোঝায়, তেমন নয়। আরও একটু বেশি কিছু।

নিরীহ ভাল মানুষ বলেই চিত্তদারোগাকে এখানে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। নয়তো দারোগাবাবুর যেসব রেকর্ড আছে, অনায়াসে কলকাতার কাছাকাছি অপরাধপ্রবণ এলাকায় তিনি বদলি হতে পারতেন। একটা সফল অভিযানে খবরের কাগজে নাম পর্যন্ত উঠে গিয়েছিল দারোগাবাবুর।

এখানে সেরকম কেস ঘটার সম্ভাবনা নেই। থানায় নালিশ বা সালিশির জন্য বড় একটা কেউ আসে না। জয়েন করার পর থেকে চুরি, ডাকাতির কোনও খবর কানে আসেনি। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার যেটা, অঞ্চলের বাসিন্দারা পুলিশকে পুলিশ বলে গ্রাহ্যই করে না। পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে এতটুকু সরে দাঁড়ায় না কেউ। এরকম অদ্ভুত আচরণের কারণ খুঁজতে গিয়ে দারোগাবাবু লক্ষ করেছেন, অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে এই এলাকার বেশ কিছু তফাত আছে। বাসিন্দারা কথা বলে কম। ঝগড়া তো নয়ই। হাসিঠাট্টা বড় একটা শোনা যায় না। এখানে একটাই স্কুল, এত নিস্তব্ধ, পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে মনে হবে ধর্মঘট চলছে। প্রতি শনিবার হাট বসে হাটতলায়। কোনও হইচই ভেসে আসে না। পশুপাখিরা হাঁকডাক করে কম। মাঠ থেকে গোরুর হাম্বা ডাক কদাচিৎ শোনা যায়। সন্ধেবেলা পাখিরা গাছে ফিরে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে।

এরকম একটা শান্ত এলাকা সামলাতে থানায় মাত্র পাঁচজন পুলিশ। দারোগাবাবু ছাড়া দু'জন কনস্টেবল, দু'জন হাবিলদার। অস্ত্র বলতে ছ'টা লাঠি, চিত্তদারোগার কোমরে একটা রিভলভার, একটা রাইফেল আছে আলমারিতে তোলা। জিপ গাড়ি যেটা আছে, স্টার্ট নিতে এত সময় লাগে, থানার কর্মীরা সাইকেলেই কাজ চালান। কনস্টেবল, হাবিলদাররা হাজিরা খাতায় সই করে চলে যান চাষবাসের কাজে। থানায় একা চিত্তদারোগা। অখণ্ড অবসর। চেহারা কোথায় ভাল হবে দারোগাবাবুর তা নয়, কোমরের বেল্ট শেষ ঘর ছুঁয়েছে। বউ, ছেলেমেয়ে থাকেন কলকাতায়। কখনও আসতে বলেননি ওঁদের। জানেন, একদিনও ওঁরা মন টেকাতে পারবেন না এখানে।

টমটমপুর সম্বন্ধে বিশদ জানতে চিত্তদারোগা একবার গিয়েছিলেন এখানকার প্রবীণ ইতিহাস-শিক্ষকের কাছে। জিজ্ঞেস করেছিলেন, ''আপনাদের এলাকার এরকম অদ্ভুত নাম কেন? টমটমপুর! আগে কি খুব ঘোড়ার গাড়িটাড়ি চলত?''

বৃদ্ধ বলেছিলেন, ''না মশাই। এই জায়গার আসল নাম ছিল থমথমপুর। ইংরেজ আমলে সাহেবদের উচ্চারণে সেটা বদলে গিয়েছে। আসলে হয়েছে কী, জমিদার জয়নারায়ণ ঘোষালের এমন প্রতাপ ছিল, এলাকাটা ভয়ে থমথম করত। সেই কারণে এই নাম। তার আগে কী নাম ছিল আমার জানা নেই।''

কপাল কুঁচকে চিত্তদারোগা জানতে চেয়েছিলেন, ''জমিদার তো মারা গিয়েছেন সেই কবে। এলাকার মানুষজন, পশুপাখি কেন এখনও এত চুপচাপ?''

উত্তরে বৃদ্ধ বললেন, ''শুধু প্রাণিজগতের কথা কেন বলছেন, ভাল করে খেয়াল করে দেখবেন, এখানকার রোদ ঝকঝক করলেও তাপ লাগে না গায়ে। গাছের ছায়া কী মোলায়েম! মেঘলা দিনে হাওয়ায় ভেজা ভাব নেই। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে কোনওদিন তুমুল ঝড়বাদলা হতে দেখিনি। খুব শীত পড়লেও শরীরে কনকনানি ধরে না। কোনও কিছুর মধ্যেই উদগ্র ভাব নেই, ছমছমে ধরনের। তা হলেই বুঝুন, কী প্রতাপশালী ছিলেন জমিদার। উনি নেই, তবু ওঁর উপস্থিতি রয়ে গিয়েছে আবহাওয়ায়।''

শিক্ষকের মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছে ধরে নিয়ে দারোগাবাবু উঠে এসেছিলেন তাড়াতাড়ি। কথাটা কিন্তু ভোলেননি। মাঝেমধ্যেই ভাবেন। এখন যেমন থানার উঠোনের দিকে চেয়ে অন্যমনস্ক হয়ে আছেন। রোদে এসে বসল এক শালিক। মনটা খচখচ করছে। আগে এসব সংস্কার ছিল না। কাজ না থাকার দরুন অন্ধ বিশ্বাস পেয়ে বসছে। দ্বিতীয় শালিকটাকে খোঁজেন দারোগা। তখনই চোখে পড়ে থানার গেট খুলে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকে আসছেন এক মহিলা। নড়েচড়ে বসলেন চিত্তদারোগা। নিশ্চয়ই কোনও কেস আসছে। মহিলার চোখে-মুখে একরাশ বিরক্তি। কারও বিরুদ্ধে নালিশ আছে গুরুতর।

বারান্দায় উঠে মহিলা সরাসরি চলে এলেন দারোগাবাবুর টেবিলের সামনে। মুঠোর মধ্যে কী যেন আছে, ঝড়াস করে টেবিলে রেখে বললেন, ''এই নিন।''

হকচকিয়ে গিয়ে চিত্তদারোগা জানতে চাইলেন, ''কী এটা?''

''আপনিই দেখুন।''

একটা হার। পাথরটাথর দেওয়া বেশ কড়সড়। সোনার বলেই তো মনে হচ্ছে। দারোগাবাবু বললেন, ''ব্যাপারটা কী খুলে বলুন।''

''এর একটা বিহিত করুন আপনি। এটার জন্য তিনি আমার মেয়ের পিছু ছাড়ছেন না।''

''কিনি?'' 'কে' জিজ্ঞেস করার বদলে বলে ফেললেন চিত্তদারোগা।

মহিলার বুঝতে কোনও অসুবিধে হল না। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, ''মেয়ে গিয়েছিল পুকুরে মাছ ধরতে। ছিপে উঠে এসেছে এটা। তারপর থেকেই উনি মেয়ের পিছু-পিছু ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর বললেন, 'দে না, দে। ফেরত দে।' ''

দারোগাবাবু এবার স্পষ্টত বিরক্ত। বললেন, ''আরে, উনিটা কে বলবেন তো!''

''আমি কী করে বলব! দেখতে পাচ্ছি নাকি আমি? মেয়ে একলা থাকলেই দেখছে, সাদা থান পরা বুড়ি, একই কথা ঘ্যানঘ্যান করে যাচ্ছে।''

চিত্তদারোগা পুরোপুরি থ। আলগোছে প্রশ্ন করলেন, ''আপনি কি ভূত-টুত জাতীয় কোনও কিছুর কথা বলছেন?''

থম মেরে গেলেন মহিলা। ঘাড় কাত করে উত্তরটা দিলেন। দারোগা বললেন, ''ভূত-প্রেতের ব্যাপারে পুলিশ কী করবে?''

''তা হলে কে করবে? আপনারা আছেন কী করতে! বিপদে পড়লে আমরা কার কাছে যাব?''

দারোগাবাবু ভাবলেন, ঠিকই তো, হাওড়া ব্রিজের টঙে পাগল উঠে পড়লে দমকল ডিপার্টমেন্টকে ডাকে পাবলিক। এই গণ্ডগ্রামে ভূত ধরতে কেন পুলিশকে ডাকবে না! মহিলার কথা থামেনি। দম নিয়ে ফের বললেন, ''আমার একরত্তি মেয়ে। মাছ ধরতে কী ভালবাসে! স্কুল থেকে ফিরেই দৌড়য় বাড়ির পিছনে পুকুর ধারে। কাল থেকে সেই যে ঘরে সিঁটিয়ে আছে, আজ স্কুলে পর্যন্ত যায়নি। মুখেও কিছু তুলতে চাইছে না। এমন বিপদে যদি আপনারা...''

মহিলাকে মাঝপথে থামিয়ে দারোগা বললেন, ''মেয়ের বাবা কোথায়? তিনি এলেন না কেন?''

''তিনি আর-এক ভিতুর ডিম। ভাল করে তাকাচ্ছেনইনা গয়নাটার দিকে। বলছেন, 'যেখানকার জিনিস সেখানে ফেলে দাও।' তাই দিতাম, তাতে কি উনি মেয়ের থেকে নজর সরাবেন? সেই ভরসা কে দেবে আমায়?''

জটিল সমস্যা। টেবিলে রাখা জলের গ্লাস তুলে

এক ঢোক খেলেন চিত্তদারোগা। মহিলাকে চেয়ার দেখিয়ে বললেন, "বসুন।"

"না, আমি এখানেই ঠিক আছি। জিনিসটা চোরাই নয়। সরকারের ঘরে জমা দিয়ে সেটা আমি প্রমাণ করে দিলাম। যদি কোনও কাগজপত্তরে সই করতে হয়, দিন। এর পর থেকে মেয়ের ভাল-মন্দর দায়িত্ব আপনাদের।"

এরকম অদ্ভুত আবদারে যে-কোনও দারোগা খেপে লাল হয়ে যেতেন। চিত্তদারোগা হলেন না। তবু তো এত দিন পর একজন বিপদে পড়ে থানায় এসেছে। মাথা ঠান্ডা রেখে দারোগা বললেন, "দেখুন, ভূত-টুত বলে তো কিছু হয় না! ওসব আদ্যিকালের ব্যাপার। আপনার মেয়ে মনের ভুলে উলটোপালটা দেখেছে। অথবা মুখে রুচি নেই, গল্প ফাঁদছে খাওয়াদাওয়া এড়াতে। মেয়েকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত ছিল আপনার।"

"ডাক্তার মানে তো সেই সদরের হাসপাতাল। মেয়ে আমার চৌকাঠ ডিঙোতে চাইছে না।"

"কেন? এ গ্রামে কি ডাক্তার নেই?"

"আছে। ওঝা, হোমিওপ্যাথ সবই আছে। কিন্তু তাদের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত বললে, সারা গ্রাম রাষ্ট্র হয়ে যাবে, আমরা গুপ্তধন পেয়েছি। মেয়ের চিকিৎসা মাথায় উঠবে, হাজারটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে আমাদের। তার চেয়ে জিনিসটা আপনার কাছে রইল। আপনি যা ভাল বোঝেন করবেন।" কথা শেষ করেই ঘুরে গিয়ে হাঁটা দিলেন মহিলা। চিত্তদারোগা আর কিছু বলার সুযোগই পেলেন না।

টেবিলের উপর পড়ে আছে সীতাহারটা। খানদানি ডিজাইন। জলের তলায় থাকার দরুন একটু অনুজ্জ্বল। কেসটা কীভাবে হ্যান্ডলিং করবেন ভাবতে ভাবতে অনেকটা সময় গেল। দারোগাবাবু হঠাৎ খেয়াল করলেন, হাবিলদার শম্ভু খাকি শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে বারান্দায় উঠে আসছে।

গয়নাটা ঝপ করে তুলে নিয়ে প্যান্টের পকেটে পুরলেন দারোগা। শম্ভু সামনে এসে বলল, "মাঠ থেকে দেখলাম, মিত্তিরদের বউ থানা থেকে বেরোচ্ছে। কেন এসেছিল স্যার?"

"তুমি ওদের চেনো?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"ঠিকানাটা বলো।"

শম্ভু বলতে থাকে। চিত্তদারোগা ততক্ষণে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছেন। বারান্দা থেকে সাইকেল নামিয়ে উঠতে যাবেন, শম্ভু জানতে চাইল, "বললেন না তো, বউটা কেন এসেছিল?"

না শোনার ভান করে দারোগা বললেন, "থানায় একটু থেকো। আমি ঘুরে আসছি।"

উঠোনে থানার নিথর জিপ। সামনে দিয়ে সাইকেল চালিয়ে বেরিয়ে গেলেন দারোগাবাবু।

হাটতলার কাছে দেখা হল পিয়ালডাক্তারের সঙ্গে। চোখাচোখি হতে ডাক্তার রোজ যা বলেন, আজও তাই বললেন, "দারোগাবাবু, আমার দিকটা একটু দেখবেন।"

নকল হাসি হেসে চিত্তদারোগা প্যাডেল করে এগিয়ে গেলেন। যেতে যেতে একটা কথা খেয়াল হল, পিয়ালডাক্তারের নামটা একবারও মনে পড়ল না মিত্তিরদের বউয়ের সামনে। মেয়েকে পিয়ালের কাছে দেখালে পারত। পিয়াল ছেলে ভাল। গ্রামের লোকের সেবা করবে বলে কলকাতা থেকে এসেছে। পসার জমেনি। ডিসপেনসারিতে একা একা বসে থাকে। চিত্তদারোগার সঙ্গে দেখা হলেই বলে, "একটু দেখবেন।" অর্থাৎ ওর নামটা প্রচার করতে বলে। চিত্তদারোগাকে কে দেখে তার ঠিক নেই!

হাটতলার পরে এবড়োখেবড়ো মাঠ। দূরে পাঁচ-ছ' ঘর বসতবাড়ি। টমটমপুরের দক্ষিণ পাড়া। ওখানেই মিত্তিরবাড়ি।

মাঠের মাঝে পায়েচলা পথরেখা। তার উপর দিয়ে সাইকেল চালাচ্ছেন দারোগা। পকেটে রাখা সীতাহারটা খোঁচা মারছে থাইয়ে। মাথার উপর ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। অথচ গায়ে তেমন তাপ লাগছে না। যেমনটা বলেছিলেন ইতিহাস-শিক্ষক। খুব একটা ভুল কিছু বলেননি। তবে কারণ হিসেবে যেটা বলেছিলেন, ঠিক মেনে নেওয়া যায় না। ভাবনার

মাঝে চিত্তদারোগার কানে কানে কে যেন বলল, ''দে না, ফেরত দে। দে না বাবা!''

দুটো ব্রেক একসঙ্গে টিপে সাইকেল থামালেন। কে বলল কথাটা? আশপাশে দেখলেন, কেউ কোথাও নেই। দূরে একটা গোরু চরে বেড়াচ্ছে। স্পষ্ট শুনলেন, কোনও বুড়ির গলা। হয়তো মনের ভুল। মিত্তিরবাড়ির বউয়ের কথাগুলো এখনও মাথায় থেকে গিয়েছে। প্যাডেলে চাপ দিয়ে এগোলেন দারোগাবাবু। ফের কানের কাছে ফিসফিস, ''দে না বাবা, ফেরত দে!''

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল দারোগাবাবুর। এরকম শুনছেন কেন? সাইকেলের স্পিড বাড়ালেন, ফিসফিসানি পিছু ছাড়ল না। একই কথা বলে যাচ্ছে বারবার। রীতিমতো ঘাবড়ে গেলেন চিত্তদারোগা। প্রাণপণে প্যাডেল করছেন। ডাকটা একবার বাঁ দিক, একবার ডান দিক থেকে আসছে। মাঠ ফুরোচ্ছে না। চারপাশে ঝিমধরা রোদ। এ কী প্যাঁচে পড়লেন চিত্তদারোগা, রাস্তা গুলিয়ে না যায়। মন কিছুতেই মানতে চাইছে না

ভূতের অস্তিত্ব, এদিকে শব্দটাও পিছু ছাড়ছে না, "দে না, ফেরত দে..."

জীবনে সবচেয়ে জোরে সাইকেল চালিয়ে চিত্তদারোগা দক্ষিণ পাড়ার একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। বড় বড় শ্বাস নিচ্ছেন, ঘেমে-নেয়ে একশা। রোগা শরীরে এত ধকল সহ্য হয়!

হাবিলদারের কথামতো এই বাড়িটাই মিত্তিরদের হওয়া উচিত। একতলা, সামনে বাগান, বাংচিতার বেড়া।

মিত্তিরবউ হয়তো কোনও কাজে বাড়ির বাইরে এসেছিলেন। দারোগাবাবুকে দেখে অবাক, "এ কী, আপনি! আসুন-আসুন!" বলে বাড়ির ভিতর ডেকে নিলেন।

চিত্তদারোগা সোজা চলে এসেছেন ভয়ে সিঁটিয়ে যাওয়া মেয়েটার ঘরে। বিছানার এক ধারে টানটান হয়ে শুয়ে আছে মেয়েটা। মাথার কাছে ওর বাবা। মেয়ের দৃষ্টি এখন দারোগাবাবুর দিকে। শুকনো মুখটা দেখেও বোঝা যায়, এমনিতে ভারী দুষ্টু। ভূত না কি

পেতনির খপ্পরে পড়ে থতমত খেয়ে গিয়েছে। সে যে কী খপ্পর, মাঠ পেরোতে গিয়ে চিত্তদারোগাও টের পেয়েছেন। তবু কেন জানি ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। ভুল হচ্ছে কোথাও। মেয়েটার বাবা-মায়ের উদ্দেশে চিত্তদারোগা বললেন, ''কলকাতার এক পাশ-করা ডাক্তার তো আপনাদের গ্রামেই আছেন। মেয়েকে একবার তাঁকে দেখিয়ে নিন। আমার কথা বলবেন, গয়না পাওয়ার ব্যাপারটা পাঁচকান করবেন না।''

''কে, পিয়ালডাক্তার?'' এটা বললেন মেয়ের বাবা।

দারোগাবাবু মাথা হেলিয়ে হ্যাঁ বললেন।

মেয়ের বাবা বললেন, ''ওই ডাক্তার কোনও কম্মের নয়। রোগী নিয়ে গেলে সদর হাসপাতালে চালান করে দেয়। নয়তো কলকাতা থেকে ওষুধ কিনে আনতে বলে। তার কাছে যন্ত্রপাতি, ওষুধপত্তর কিছুই নেই।''

মেয়ের বাবার কথা শেষ হতে না হতে মেয়ের মা বললেন, ''আমার মনে হয়, ওই ডাক্তার কলকাতায় রুগি মেরে এখানে এসে লুকিয়ে আছে। না হলে কেউ শহর ছেড়ে গ্রামে এসে পড়ে থাকে?''

পিয়ালডাক্তারের এহেন অখ্যাতি শুনে দুঃখ পান দারোগাবাবু। সত্যি, কী সময় এসেছে! বেচারা সেবা করতে চায়, লোকে বিশ্বাস করছে না। আপাতত পিয়ালের চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে চিত্তদারোগা রহস্যটায় মন দেন। আলাপের ঢঙে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করেন, ''তোমার নাম কী? কোন ক্লাসে পড়ো?''

''ওর এখন ফাইভ। নাম পলা।'' উত্তর দিলেন মেয়ের মা।

চিত্তদারোগা ফের মেয়েটিকে বললেন, ''পলারানি, তুমি একবার আমাকে পুকুর ধারে নিয়ে যাবে? কোথায় তুমি মাছ ধরো? কোনখান থেকে হারটা ছিপে উঠে এসেছে...''

পলা নিশ্চুপ। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে দারোগাবাবুর দিকে। পলার বাবা বললেন, ''ও আর কিছুতেই পুকুর ধারে যাবে না। যা ভয় পেয়েছে।''

কথা কানে নিলেন না দারোগাবাবু। বেল্টের খাপ থেকে বন্দুক বের করে পলাকে দেখালেন। বললেন, ''এই দেখো, যদি কোনও ভূত আমাদের পিছনে লাগে না, এক গুলিতে সাবাড় করে দেব।''

কথাটা নিজের কানেই বেখাপ্পা শোনাল দারোগার। মানুষ সাবাড় হয়েই তো ভূত হয়, আর অশরীরীকে গুলি মারা মানে সরকারি পয়সার অপচয়। তবে মেয়েটা যেন একটু সাহস পেয়েছে। উঠে বসেছে বিছানায়। চিত্তদারোগা মেয়ের বাবার উদ্দেশে বললেন, ''আপনি ওর ছিপটা সঙ্গে নিন তো।''

বাড়ির পিছনের পুকুরটাকে ঝিলও বলা যায়। বিশাল বড়, আর টলটলে জল। পুকুরের পাশ দিয়ে চিত্তদারোগার হাত ধরে হেঁটে যাচ্ছে পলা। মা-বাবা পিছনেই আছেন। পুকুর ধারে একটা উঁচুমতো জায়গায় পৌঁছে পলা বলল, ''আমি এখানে দাঁড়িয়ে ছিপ ফেলি রোজ। কাল একটাও মাছ উঠছিল না। অন্যদিন পটাপট ওঠে। তাই আমি ঘোষালদের ঘাটের কাছে গিয়েছিলাম।''

হাত দিয়ে ঘোষালদের ঘাট দেখাল পলা। পোড়োবাড়ির পিছনে জরাজীর্ণ ঘাট। ওখানে যেতে গেলে ভাঙা পাঁচিল, ঝোপঝাড় ডিঙোতে হবে। চিত্তদারোগা বললেন, ''চলো, যাওয়া যাক।''

ঘাটের খানিক আগে কাদা-মাটিতে দাঁড়িয়ে পড়ল পলা। বলল, ''এখান থেকে ছিপ ফেলার পর গয়নাটা উঠে এসেছিল।''

চিত্তদারোগা সঙ্গে সঙ্গে পলার বাবার হাত থেকে ছিপটা নিলেন। ছোট্ট ছিপ। পলার হাতে দিয়ে বললেন, ''তুমি একবার ছিপ ফেলে দেখাও তো!''

পলা দারোগাবাবুর কথামতো রোজ যেভাবে বড়শি, সুতো, ফাতনা হাতে দুলিয়ে ছিপ ফেলে, সেভাবেই ফেলল। ছোট্ট হাত, সুতো বেশি দূর গেল না। ফাতনার দিকে তাকিয়ে চিত্তদারোগা আন্দাজ করতে পারছেন, বড়শি মাটিতে ঠেকে আছে। গয়নাটা ওখানেই পড়ে ছিল, উঠে এসেছে বড়শিতে। কিন্তু সীতাহারটা এখানে এল কী করে? কেউ কি ছুড়ে ফেলেছে? কথাটা মাথায় আসতেই মাটির দিকে তাকিয়ে একটা ইটের টুকরো খুঁজে

[illegible] চিত্তদারোগা। ঢেলাটা পলার হাতে দিয়ে বললেন, ''ছুড়ে দাও তো জলে।''

ছিপ মাটিতে রেখে পলা দারোগাবাবুর নির্দেশমতো ঢিলটা ছুড়ে দেয় জলে। অনেক দুরে গিয়ে পড়ে সেটা।

ভ্রু কুঁচকে যায়। কপালে চার থাক ভাঁজ পড়ে চিত্তদারোগার। ঘাটের এত কাছে কে ফেলল হারটা? এত দামি জিনিস।

ঠোঁটে আঙুল রেখে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন দারোগাবাবু। সামনে এখন পোড়োবাড়িটার পিছন দিক। দোতলার জানলায় চোখ পড়ে। শুধু শিকগুলো অবশিষ্ট আছে, ঝুলে পড়েছে খড়খড়ি দেওয়া পাল্লা। নিমেষে কপালের ভাঁজ মিলিয়ে যায়। চিত্তদারোগা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারলেন, হারটা কোথা থেকে ছুড়ে ফেলা হয়েছে। পলার মা-বাবার উদ্দেশে বললেন, ''এই বাড়িটা কাদের?''

পলার বাবা বললেন, ''ঘোষালদের। আমাদের গ্রামের জমিদার ছিলেন ওঁরা।''

ইতিহাস-শিক্ষকের কথা মনে পড়ে যায় চিত্তদারোগার। এই বাড়িটা তা হলে জয়নারায়ণ ঘোষালের বাড়ি। যাঁর প্রতাপে গোটা গ্রাম থমথম করত। দারোগাবাবু ফের জানতে চান, ''এ বাড়িতে এখন কেউ থাকেন?''

''তিনজন। জমিদার বংশের শেষ পুরুষ সুরঞ্জন ঘোষাল আর তাঁর স্ত্রী। ওঁদের কোনও সন্তান নেই। বুড়োবুড়িকে দেখাশোনা করে একজন কাজের লোক।''

''আমি একবার ওঁদের সঙ্গে দেখা করব।'' বলে খিড়কির দিকে হাঁটা দিচ্ছিলেন দারোগাবাবু।

পলার বাবা বললেন, ''বুড়ো ভীষণ বদরাগি। আপনি সদর দরজায় জানান দিয়ে ঢুকুন।''

চিত্তদারোগাকে ঘোষালবাড়ির সদরে পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেলেন পলার বাবা। বোঝাই যায়, প্রতিবেশীরা এই বাড়িটা এড়িয়ে চলে। বাড়ি না বলে প্রাসাদ বলাই উচিত। তবে প্রায় ধ্বংসস্তূপ। বিশ্বাসই করা যায় না, এ বাড়িতে কেউ বসবাস করেন।

''ঘোষালবাবু, ঘোষালবাবু।'' ডাক দিয়ে যখন কারও সাড়া পাওয়া গেল না, দরজা ঠেলে ঢুকেই পড়লেন চিত্তদারোগা। আবছা অন্ধকার বিশাল বৈঠকখানা। আসবাবপত্র এলোমেলো। গুমসানি গন্ধ। শেষ কবে ঝাড়পোঁচ হয়েছিল কে জানে! দু'পা এগোতেই দারোগার কানে ফিরে আসে সেই গলা, ''দে না, ফেরত দে বাবা!''

ঝট করে প্যান্টের পকেটে হাত বুলিয়ে নেন দারোগাবাবু, জিনিসটা আছে। বুড়ির গলা শুনে আগের মতো আর ভয় করছে না। রাগ হচ্ছে পলার মায়ের উপর। কেমন চালাকি করে ঝামেলাটা ঘাড়ে দিয়ে গেল। অশরীরীর গলা এড়াতেই চিত্তদারোগা ফের ডেকে ওঠেন, ''ঘোষালবাবু, ঘোষালবাবু!''

শেষের ডাকটায় গলাটা সামান্য কেঁপে গেল। এতক্ষণ পর বিশাল ঘরটার কোণের দরজায় দেখা দিল একজন মানুষ। দোরগোড়ায় চকচকে রোদ। লোকটাকে ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছে না। ওখান থেকেই মানুষটি জানতে চায়, ''কাকে চাই?''

যতটা সম্ভব গলাটা ভারী করে চিত্তদারোগা বললেন, ''এ বাড়ির কর্তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।''

মানুষটা পায়ে পায়ে এগিয়ে এল। চেহারা দেখে দারোগাবাবু বুঝলেন, কাজের লোক। পুলিশ দেখে লোকটা থমকেছে। বলল, ''বাবু তো বাইরের কারও সঙ্গে দেখা করেন না। তবে আপনার সঙ্গে বোধ হয় করবেন।''

লোকটাকে অনুসরণ করে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠছেন দারোগাবাবু। জানতে চান, ''বাবু কারও সঙ্গে দেখা করেন না কেন?''

''বয়স হয়েছে। বাইরের ঝামেলা এড়িয়ে থাকতে চান।''

কাজের লোক দারোগাবাবুকে শোওয়ার ঘরে নিয়ে এল। জমিদারি চেহারার এক পক্ককেশ বৃদ্ধ আরামকেদারায় বসে ঝিমোচ্ছেন। পিছনের পালঙ্কে শুয়ে আছেন এক বৃদ্ধা। সম্ভবত জমিদারগিন্নি। দেখে মনে হচ্ছে অসুস্থ।

পুলিশ দেখে ঘোষালবাবুর চোখেমুখে ফুটে

উঠেছে বিরক্তি, অসন্তুষ্টির ছাপ। চিত্তদারোগা নিজের পরিচয় দিয়ে সবিনয়ে বললেন, "আমি একবার আপনাদের পুকুরের দিকে দোতলার ঘরটায় যেতে চাই।"

স্বাভাবিক কারণে বৃদ্ধ জানতে চাইলেন, "কেন, হঠাৎ!"

"ঘরটা থেকে ঘুরে এসে বলছি।" বললেন চিত্তদারোগা।

নিমরাজি ভঙ্গিতে বৃদ্ধ কাজের লোকটিকে নির্দেশ দিলেন, বাবুকে ঘরটা দেখিয়ে দিতে।

লোকটির সঙ্গে দারোগাবাবু পৌঁছলেন নির্দিষ্ট ঘরের সামনে। এটাও অব্যবহৃত হয়ে পড়ে আছে। মেঝেতে পুরু ধুলো। আসবাবগুলো ভাঙাচোরা। লোকটি দাঁড়িয়ে রইল দরজার বাইরে। ঘরে ঢুকে চিত্তদারোগা সোজা চলে গেলেন জানলার কাছে। টলটলে পুকুর, গাছপালা, পলাদের বাড়ি, সব দেখা যাচ্ছে।

মেঝেতে পড়ে ছিল পলেস্তরা খসা টুকরো। তুলে নিলেন চিত্তদারোগা। তারপর ছুড়ে দিলেন পুকুর লক্ষ করে।

আন্দাজ মিলে গেল। সীতাহারটা যেখানে পড়ে ছিল, কাছাকাছি গিয়ে পড়ল ঢিলটা। প্রসন্ন চিত্তে দারোগাবাবু জানলার সামনে থেকে সরে এলেন। কাজের লোকটিকে এখন আর দরজার কাছে দেখা যাচ্ছে না। চিত্তদারোগা একাই এগোলেন শোওয়ার ঘরের দিকে।

ঘোষালবাবু একই রকমভাবে আরামকেদারায় বসে আছেন। মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে কাজের লোকটা। কী যেন বলছে তার বাবুকে। চিত্তদারোগা ঘরে ঢুকতেই সুরঞ্জন ঘোষাল বললেন, "সে কী মশাই, শুনলাম, আপনি নাকি জানলায় দাঁড়িয়ে ঢিল ছোড়া প্র্যাকটিস করছিলেন!"

কটাক্ষ গায়ে মাখলেন না দারোগাবাবু, মিটিমিটি হাসলেন। কাজের লোকটি বাবুর মাথার সামনে সরে গেল। লোকটি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর চিত্তদারোগা প্যান্টের পকেট থেকে সীতাহারটা বের করলেন। সুরঞ্জন ঘোষালের সামনে এনে বললেন, "দেখুন তো, এটা চিনতে পারেন কি না?"

আরাম-কেদারার লাগোয়া টেবিল থেকে চশমা তুলে চোখে দিলেন ঘোষালবাবু। সেকেন্ডের মধ্যে চোখ বড় বড়। বিষম বিস্ময়ে বলে উঠলেন, "এই হার আপনি কোথা থেকে পেলেন? এটা তো আমার মায়ের গয়না!"

"আমি তেমনটাই আন্দাজ করেছি। তবে উপযুক্ত প্রমাণ, সাক্ষী ছাড়া এটা আপনাকে দিতে পারব না।"

গলা তোলেন সুরঞ্জন ঘোষাল, "আমার মা'র গয়না আমি চিনব না! আমিই সবচেয়ে বড় সাক্ষী।"

"কিন্তু জিনিসটা পাওয়া গিয়েছে আপনার বাড়ির বাইরে। পেয়েছেন অন্য একজন। দাবি তাঁরও কিছু কম নয়। নেহাত সৎ ভদ্রলোক বলেই থানায় জমা দিয়েছেন।"

দারোগার কথা শুনে একটু দমে গেলেন ঘোষালবাবু। কী একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "জিনিসটা আমার স্ত্রীকে দেখান, দেখবেন, ও ঠিক চিনতে পারছে শাশুড়ি গয়না।"

"কথাটা খুব একটা মন্দ বলেননি।"

বলে পালঙ্কের দিকে এগোলেন চিত্তদারোগা। পক্ষাঘাত রুগির মতো নিথর হয়ে সিলিংয়ের দিকে চেয়ে শুয়ে আছেন ভদ্রমহিলা।

সীতাহারটা আঙুলে ঝুলিয়ে মহিলার দৃষ্টির সামনে ধরলেন চিত্তদারোগা। জানতে চাইলেন, "চিনতে পারছেন, কার গয়না?"

হারে চোখ বুলিয়ে মহিলা মাথা নাড়েন। অর্থাৎ চিনতে পারছেন না। ঘোষালবাবু উঠে এসেছিলেন দারোগাবাবুর ঘাড়ের কাছে। বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠলেন, "রোগে ভুগে ওর মাথার ঘিলু শুকিয়ে গিয়েছে, তাই চিনতে পারছে না। আমি আপনাকে বাড়ির পুরনো অ্যালবাম দেখাচ্ছি, ফোটোয় দেখবেন মায়ের গলায় এই হারটাই ঝুলছে।"

হন্তদন্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন সুরঞ্জন ঘোষাল। অ্যালবাম আনতে গেলেন নিশ্চয়ই। ঠিক তখনই ক্ষীণ স্বরে বলে উঠলেন ঘোষালগিন্নি,

"হারটা নিতে আপনি দেবেন না। সত্যিই এটা আমার শাশুড়ির গয়না। মারা যাওয়ার আগে শাশুড়ি আমায় বলেছিলেন, 'ছেলে তো সমস্ত টাকাপয়সা, সোনাদানা উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, এই হারটা বিক্রি করতে দিয়ো না। পারলে পুকুরের জলে ফেলে দেবে। হারটা জমিদারির শেষ স্মারক।' শহরের হাসপাতাল থেকে ডাক্তার নিয়ে আসতে অনেকটা সময় চলে গেল। শাশুড়ি মা মারা গেলেন। পাছে গয়নাটা আমার স্বামী কেড়ে নেন, তাই মায়ের গলা থেকে হারটা খুলে আমি পুকুরের জলে ফেলে দিয়েছিলাম।"

বৃদ্ধার কথা শেষ হল, ঢাউস অ্যালবাম হাতে ঘরে ঢুকলেন ঘোষালবাবু, "এই দেখুন, আমার মায়ের গলায় একই হার।"

অ্যালবামের ফোটোটা মন দিয়ে দেখতে থাকলেন দারোগাবাবু। আসলে ভান। যা বোঝার তাঁর বোঝা হয়ে গিয়েছে। অ্যালবাম থেকে মুখ তুলে বললেন, "দেখুন ঘোষালবাবু, এই ডিজাইনের গয়না একটা তৈরি হয়নি। আরও অনেক হয়েছে। আপনার ছবির প্রমাণ তেমন জোরালো নয়। তা ছাড়া আপনার স্ত্রীই যখন হারটা চিনতে পারছেন না, অনিশ্চয়তা থেকেই যায়। আপনি আরও ঠাস প্রমাণ সংগ্রহ করুন। আমিও বিষয়টা খতিয়ে দেখি।"

"তা হলে জিনিসটা আপনি আমাকে দিচ্ছেন না?" ঘোষালবাবুর গলায় জমিদারি হুমকির সুর।

চিত্তদারোগা গ্রাহ্য করলেন না। বললেন, "আজ চলি।"

ঘোষালবাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন দারোগাবাবু, কে যেন পায়ের কাছে হুড়মুড়িয়ে পড়ল। চমকে লাফিয়ে উঠে দেখেন, কাজের লোকটা গড়িয়ে পড়েছে মেঝেতে। চিত্তদারোগা তড়িঘড়ি নেমে আসেন লোকটার সামনে।

হতভম্ব দৃষ্টিতে লোকটা একবার দারোগাকে দেখছে, আর-একবার সিঁড়ির দিকে। লোকটার হাতে হাতুড়ি।

"কী হল তোমার হঠাৎ?" লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন চিত্তদারোগা।

"আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না বাবু। আপনাকে এগিয়ে দিতে আসছিলাম, হঠাৎ কে যেন ধাক্কা মারল আমাকে।"

খুবই চিন্তার বিষয়! তার চেয়েও বেশি চিন্তার, কাজের লোকটার হাতে হাতুড়ি। দারোগাবাবু বললেন, "ওটা তোমার হাতে কেন? আমাকে এগিয়ে দিতে হাতুড়ির কী প্রয়োজন?"

আচমকাই লোকটি কেঁদেকেটে পা ধরে ফেলল দারোগাবাবুর। বলল, "বাবু, আমার অন্যায় হয়ে গিয়েছে। মনিবের কথামতো...'

"বুঝেছি, বুঝেছি।" বলে, পা ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন চিত্তদারোগা। জমিদারি নিঃশেষ হলেও বদগুণগুলো রয়ে গিয়েছে ঘোষালবাবুর মধ্যে। একটুর জন্য বেঁচে গেলেন চিত্তদারোগা। কিন্তু বোঝা গেল না, কে ধাক্কাটা মারল কাজের লোকটিকে?

অন্ধকার বৈঠকখানা পার হওয়ার সময় আবার সেই ডাক, "দে না, ফেরত দে বাপ...!" তা হলে কি ধাক্কা ইনিই মারলেন?

বিকেল, সন্ধে, রাত, কানের কাছে একই ডাক। ঘুম হল না চিত্তদারোগার। ইতিমধ্যে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ঘোষালবাবুর মতো পাষণ্ডের হাতে হারটা কিছুতেই তুলে দেওয়া যাবে না। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে দারুণ যুক্তি এল মাথায়। প্রজাদের খাজনার পয়সায় এই গয়না গড়িয়েছিলেন ঘোষালবাবুর পূর্বপুরুষ, এটা প্রজাদের উত্তরপুরুষের সেবায় লাগুক।

হারটা নিয়ে তিনি সোজা চলে গেলেন পিয়ালডাক্তারের ডিসপেনসারিতে। বললেন, "ডাক্তার, সবাই তোমার খুব বদনাম করে। যন্ত্রপাতি, ওষুধপত্র কিচ্ছু থাকে না। সমস্ত রুগিকে পাঠাও সদরের হাসপাতালে অথবা কলকাতায়।"

পিয়াল বলল, "কী করব স্যার, ডিগ্রি ছাড়া আর কোনও সম্পদ নেই আমার। ভেবেছিলাম ওতেই কাজ চলে যাবে। চলছে না।"

দারোগাবাবু হারটা দিয়ে বললেন, "এটা বিক্রি করে, ডিসপেনসারিটাকে সাজিয়েগুছিয়ে বোসো।

কোনও রুগি যেন ফেরত না যায়। এটা যাঁর গয়না, তিনি সময়মতো চিকিৎসা না পেয়ে মারা গিয়েছিলেন।''

দিন পনেরো গেল। পিয়ালডাক্তার হার বিক্রির টাকায় নিজের ডিসপেনসারিকে ছোটখাটো হাসপাতাল বানিয়ে ফেলেছে। সেই অদৃশ্য বুড়ি, দারোগার কানের কাছে আর ফিসফিস করে না। থানায় একা একা বসে চিত্তদারোগা অপেক্ষা করেন নতুন কেসের।

পুরনো কেসই এল আবার। পলার বাবা এসে বললেন, ''দারোগাবাবু, তিনি ফের মেয়ের উপর নজর দিয়েছেন।''

''কীরকম?''

''মেয়ের কাল থেকে জ্বর। ডাক্তার দেখাব-দেখাব করছি, পিয়ালডাক্তার নিজেই হাজির। বললেন, কোনও এক বুড়ি নাকি ওঁকে খবর দিয়ে পথ চিনিয়ে এনেছে।'' একটু থেমে পলার বাবা বললেন, ''আমার মনে হয়, সেই বুড়িটাই।''

''তাতে আপনার মেয়ের ক্ষতি হয়েছে, না ভাল হয়েছে?''

''ভাল হয়েছে স্যার। পিয়ালডাক্তারের ওষুধে মেয়ে এখন পুরো সুস্থ।''

''তা হলে কেন খামোকা চিন্তা করছেন? তিনি যদি নজর দিয়েই থাকেন, সুনজর দিয়েছেন।''

''তা অবিশ্যি ঠিক।'' বলে নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে চলে গেলেন পলার বাবা।

চিত্তদারোগা চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। পিয়ালের কাছে একবার যেতে হবে।

পিয়াল ডিসপেনসারিতে রুগি দেখছিল। একটু ফাঁকা হতে দারোগাবাবু সামনে গিয়ে বসলেন, ''কেমন চলছে পিয়াল?''

''আপনার আশীর্বাদে ভালই। টুকটাক রুগি আসছে। কল-এ যাচ্ছি মাঝেমধ্যে।''

''এক বুড়ি নিয়ে যাচ্ছে, তাই না?''

ভীষণ অবাক হয়ে পিয়াল বলল, ''আপনি কী করে জানলেন? চেনেন মহিলাকে?''

''না, চিনি না। চিনতেও চাই না।''

একটু থেমে দারোগাবাবু বললেন, ''তুমি, আমি দু'জনেই টমটমপুরে এত দিন ধরে আছি, কতটুকু চিনি, জানি জায়গাটাকে? তুমি কি জানো এই গ্রামটার আসল নাম থমথমপুর?''

''না স্যার। জানতাম না। এরকম নাম কেন স্যার?''

''যেমনই নাম হোক, তোমার-আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। তেমনই অচেনা বৃদ্ধা মহিলা তো তোমার কোনও অপকার করছেন না।''

''অপকার কী বলছেন স্যার, বরং উনি যা করছেন...''

পিয়ালের কথার মাঝে উঠে পড়লেন চিত্তদারোগা। বললেন, ''থমথমপুরে এক-দু'জন রহস্যময় মানুষ থাকা ভাল, না হলে ঠিক যেন মানায় না!''

ডিসপেনসারির বাইরে এসে সাইকেলে উঠে পড়েছেন দারোগাবাবু। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ অথচ তাপ লাগছে না গায়ে। গাছের ছায়া কী মোলায়েম!

২ মার্চ ২০০৬

অলংকরণ: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

টিসট ঘড়ি

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

পার্ক স্ট্রিটের ফুটপাথ ধরে হাঁটছিলেন মৃণাল মাইতি। কেমন যেন ঘোর লাগা চোখ। কখন যে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েছেন হুঁশই নেই। কোথায় যাচ্ছেন, তাও যেন জানেন না। পথচলতি লোকজনকেও খেয়াল করছেন না সেভাবে, হেঁটেই চলেছেন একটানা। মল্লিকবাজারের মোড়ে পৌঁছেও থামলেন না মৃণালবাবু। শেষ বিকেলে সামনের বড় রাস্তা মানুষ আর গাড়িতে থিকথিক করছে, কোনও কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ না করে লম্বা লম্বা পায়ে চলে গিয়েছেন ওপারে।

হঠাৎই সম্বিৎ ফিরল। এ তিনি কোথায় ঢুকে পড়লেন? পার্ক স্ট্রিট সমাধিস্থানে! আজ আবার? এই নিয়ে পর পর তিন দিন হল না?

মৃণাল মাইতি হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন একটুক্ষণ। কী হচ্ছে ব্যাপারখানা? রোজ রোজ এই বেভুল দশা কেন? এমনিতে অবশ্য পুরনো ইতিহাস-টিতিহাসের উপর তাঁর একটু ঝোঁক আছে। সমাধিস্থানে টানা ঘুরে ঘুরে দেখতে তিনি ভালইবাসেন। তাই প্রথম দিন ঘটনাকে তেমন আমল দেননি। কাল খানিকটা অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু আজ তিনি পুরোপুরি স্তম্ভিত। তিনি তো এত আনমনা মানুষ নন!

মাথাটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সমাধিস্থান থেকে বেরিয়ে আসছিলেন মৃণালবাবু, হঠাৎ হাতঘড়িতে চোখ পড়তেই বেদম চমকেছেন। কী আশ্চর্য, ঘড়িটা আজও বন্ধ হয়ে গিয়েছে! ঠিক পাঁচটা সাতাশে। কাল, পরশু, দু'দিনই অবিকল এই সময় ঘড়িটা বন্ধ হয়েছিল না? দম দেওয়ার পর ঠিকই চলছে, কিন্তু এ কী আজব রোগ? রোজ একই সময়ে বন্ধ হবে? কেন?

দুটো ঘটনারই থই খুঁজে পাচ্ছিলেন না মৃণালবাবু। তাঁর এই সাময়িক বেভুল দশা, আর নির্দিষ্ট একটা সময় ঘড়িটার থেমে যাওয়া। একবার মনে হচ্ছে দুটো ঘটনার মধ্যে একটা ক্ষীণ যোগসূত্র থাকলেও থাকতে পারে। আবার পরক্ষণে মগজ বলছে, ধুস, এ স্রেফ কাকতালীয়। এসব নিয়ে বেশি ভাবলে অযথা মাথা বিগড়ে যায়।

তবু মৃণালবাবু ঘড়িটা দেখলেন আর-একবার। পুরনো জিনিস, মাত্র গত সপ্তাহেই কিনেছেন পার্ক স্ট্রিটের নিলামঘর থেকে। এমনিই ঢুকেছিলেন অকশন শপটায়, ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন এটা ওটা সেটা। আগেকার আমলের আসবাবপত্র, কারুকাজ করা জার্মান সিলভারের ছুরি-কাঁটা-চামচ, স্ফটিকের ফুলদানি, আদ্যিকালের গ্রামোফোন, পিয়ানো...। হঠাৎই চোখ পড়েছিল ঘড়িটায়। বাহ, ভারী সুন্দর তো! গোল চাকার মতো ডায়াল, ধবধবে সাদা। বাঁকা বাঁকা হরফে লেখা কুচকুচে কালো সংখ্যাগুলোও কী বাহারি। ঘণ্টার কাঁটা আর মিনিটের কাঁটার ডগায় টুকটুকে লাল দুটো ফুটকি আরও যেন সৌন্দর্য বাড়িয়েছে কিছুটা। আজকাল বাজারে তো সব কোয়ার্টজ ঘড়ি, এরকম চমৎকার দম দেওয়া ঘড়ি আর দেখতে পাওয়া যায় কোথায়!

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ঘড়িটার দাম কত ফেলেছেন?"

বয়স্ক কর্মচারীটি হেসে বলেছিলেন, "জলের দরে দিচ্ছি স্যার। মাত্র পাঁচশো।"

"বলেন কী? কবেকার জিনিস... বন্ধ হয়ে পড়ে আছে...!"

"তাতে কী! হাতি মরলেও তার লাখ টাকা দাম। এ হল গিয়ে খাঁটি টিসট। যে-কোনও পুরনো ঘড়ির দোকানে দেখাবেন, তারা লাফিয়ে উঠবে। আর বন্ধ তো রয়েছে তেল-ফেল পড়েনি বলে। অয়েলিং করে চালান, এখনও পঞ্চাশ বছর নিখুঁত টাইম দেবে।"

মনে ধরেছে বলে খানিকটা দোনামোনা করেও মৃণালবাবু কিনেই ফেললেন ঘড়িটা। এরকম একখানা অ্যান্টিক ঘড়ি কবজিতে বাঁধা থাকলে খানিকটা আভিজাত্য তো বাড়েই।

কেনার পর মনটা আরও খুশি-খুশি। পাড়ার দোকানদার ছেলেটি তো ঢালাও সার্টিফিকেট দিল, "জব্বর দাঁও মেরেছেন দাদা। এ জিনিস এখন আর আপনি মাথা খুঁড়লেও পাবেন না। এর হেয়ার স্প্রিং থেকে শুরু করে প্রতিটি সূক্ষ্ম কলকবজা একেবারে এ ওয়ান। এখনকার ভেজালের যুগে এই ঘড়ি দেখলে প্রাণে আরাম হয়।"

সেই ঘড়ি কিনা পরার পর থেকে এই খেল দেখাচ্ছে? পাড়ার দোকানদারটাও তো চালু করে দেওয়ার সময়ে গন্ডগোলটার কথা বলেনি? উলটে তো বলল, "তিন বছরের জন্য নিশ্চিন্ত থাকুন। এই ঘড়ি এখন টগবগিয়ে ছুটবে।"

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে বেজার মুখে বাড়ি ফিরলেন মৃণাল মাইতি। ঘড়ি কিংবা বেখেয়ালে সমাধিস্থানে চলে যাওয়া, কোনও গল্পই স্ত্রী নীলিমাকে করলেন না। এক কাঁড়ি টাকা খরচ করে মৃণালবাবু একটি পুরনো ঘড়ি কিনেছেন, এই নিয়ে বিস্তর হাসাহাসি করেছেন নীলিমা। ঘড়ি রোজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে শুনলে নীলিমা তাঁকে খেপিয়ে মারবেন।

রাতে ভাল ঘুম হল না মৃণালবাবুর। পরদিন কী ভেবে অফিসে আর পরে গেলেন না ঘড়িটা। সতর্ক রইলেন সারাদিন, যেন বেখেয়াল অবস্থাটা আজও না হয়! অদ্ভুত কাণ্ড! বিকেলটা পুরো স্বাভাবিক ছন্দে কাটল। সওয়া ছ'টা অবধি অফিস করলেন, তারপর রিক্রিয়েশান ক্লাবে গিয়ে ক্যারমও খেললেন খানিকক্ষণ।

ঘড়ির কথা মৃণালবাবু প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরেই মনে পড়ল। শোওয়ার ঘরে ঢুকে ঘড়িটা হাতে তুলে নিয়েই হাসি ফুটল মুখে। বন্ধ হয়নি, বন্ধ হয়নি, একদম ঠিকঠাক চলছে টিসট।

তবু নীলিমাকে একবার জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি ঘড়িটায় আজ বিকেলে দম দিয়েছিলে?"

নীলিমা নাক কুঁচকোলেন, "আমি এতে হাতও দিইনি। কেন?"

"এমনিই। মানে, আমি আজ দম দিতে ভুলে গিয়েছি তো!"

"ও। তা লাগাও এখন দম।"

রিস্টওয়াচটার চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে মনটা আরও ভাল হয়ে গেল মৃণালবাবুর। নাহ, এক-দু'দিনের উৎপটাং কাণ্ড নিয়ে মন উচাটন করার কোনও মানেই হয় না। বহু দিন বন্ধ ছিল তো, চলতে গিয়ে তাই হয়তো একটুআধটু হোঁচট খাচ্ছিল ঘড়ি। এবার ঠিকঠাক দৌড়োবে। এমনও তো হতে পারে, মৃণালবাবু নিজেই দম দিতে ভুলে গিয়ে মিছিমিছি চিন্তিত হয়েছেন।

পরদিন ফের টিসটখানা কবজিতে বেঁধে অফিস। দিনভর ঘড়িও চলছে মেজাজে, মৃণালবাবুরও মেজাজ শরিফ। কিন্তু বিকেল গড়াতেই কোথা থেকে যেন আবার সেই ঘোর ঘোর ভাব। কাউকে কিছু না বলে, টেবিলে ফাইল ছড়িয়ে রেখে, বেরিয়ে পড়লেন অফিস থেকে। আচ্ছন্নের মতো হাঁটছেন এবং যাত্রা শেষ পার্ক স্ট্রিটের সেই সমাধিস্থানে। ঘড়িও আটকে গিয়েছে। সেই একই সময়ে। পাঁচটা সাতাশ।

মৃণালবাবু ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এটা কী হল? কাল রাতেই দম দেওয়ার পর ঘড়ি বন্ধ হয় কী করে? অথচ আগের দিন তো দিব্যি চলেছে। তিনিই বা সমাধিস্থানে চলে এলেন কেন? কাল তো সমস্যা হয়নি!

উঁহু, কার্যকারণ সম্পর্ক পাওয়া যাচ্ছে না। মাথা চুলকোতে চুলকোতে সমাধিস্থানের একটা বেঞ্চিতে ধপ করে বসে পড়লেন মৃণালবাবু। ভাবছেন...

ভাবছেন... চিন্তায়-চিন্তায় জট পড়ে যাচ্ছে মগজে, তবু ভেবেই চলেছেন। এক দল শোকার্ত মানুষ কাকে যেন সমাধি দিতে এসেছিল, নীরবে চলে গেল সামনে দিয়ে। মৃণালবাবু বসে আছেন তো বসেই আছেন। দিন ফুরিয়ে কখন যে সন্ধে নেমে গেল, মৃণাল মাইতি টেরও পেলেন না। সমাধিস্থান ক্রমে শুনশান, তবু মৃণালবাবু বসে আছেন স্থির।

হঠাৎই এক ভারী গলা। কাটা কাটা ইংরেজিতে প্রশ্ন, ''আমি কি এখানে একটু বসতে পারি?''

মৃণাল মাইতি চমকে তাকালেন। তাঁর বেঞ্চির পিছনটায় এসে দাঁড়িয়েছেন ভদ্রলোক। পরনে কালো সুট, মাথায় কালো হ্যাট। কপালের উপর টুপিটা অনেকটাই নামানো। আধো অন্ধকারে মুখটা প্রায় দেখা যাচ্ছে না।

ভদ্রলোক ফের সবিনয়ে বললেন, ''দয়া করে যদি অনুমতি করেন, এখানে একটু...''

''হ্যাঁ হ্যাঁ, বসুন না প্লিজ।''

''ধন্যবাদ।'' ভদ্রলোক বসেছেন বেঞ্চিতে, তবে সামান্য তফাত রেখে। দু'-চার সেকেন্ড চুপচাপ থেকে বললেন, ''এই বেঞ্চিটায় আমি রোজই এসে বসি।''

মৃণালবাবু আলগাভাবে বললেন, ''তাই বুঝি?''

''হ্যাঁ। বসে বসে লোকজন দেখি। আপনাকেও দেখেছি। আপনি তো এই নিয়ে চতুর্থ দিন এলেন, তাই না?''

মৃণালবাবু ছোট করে ঘাড় নাড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে করার চেষ্টা করলেন, তিনি ভদ্রলোককে দেখেছেন কি না। নাহ, স্মরণে এল না।

ভদ্রলোক নিচু গলায় বললেন, ''দেখে মনে হয়, আপনি খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। ঠিক বলছি?''

মৃণালবাবু অস্ফুটে বললেন, "হ্যাঁ... মানে...।"

"দুশ্চিন্তার কারণটা কী জানতে পারি?"

বলতে গিয়েও মৃণাল মাইতি থমকে গেলেন। আচ্ছা গায়ে পড়া লোক তো! তা ছাড়া চেনা নেই, জানা নেই, যাকে তাকে তাঁর সমস্যার কথা তিনি বলবেনই বা কেন?

ভদ্রলোক বুঝি মনের কথা পড়ে ফেলেছেন। বললেন, "অচেনা লোক বলে অস্বস্তি হচ্ছে তো? আসুন না, আমরা পরিচয়টা সেরে ফেলি। আমার নাম রিচার্ড। রিচার্ড গোমস। আপনি?"

"আমি মৃণাল মাইতি।"

"ব্যস, তা হলে আমরা পরস্পরের অপরিচিত রইলাম না, কী বলেন?"

"হুঁ।"

"এবার তা হলে আপনার সমস্যাটার কথা তো বলতে পারেন, ঠিক কি না?"

মৃণালবাবু সন্দিগ্ধ চোখে ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন এক ঝলক। মতলবটা যে কী বোঝা যাচ্ছে না! পাগল-টাগল নয় তো? অনেক সময় তো পাগলরা এসে সমাধিস্থানে পড়ে থাকে।

রিচার্ড খুকখুক হাসছেন, "সংকোচ হচ্ছে তো? বেশ, তবে আগে আমি আমার কথাই বলি। কেন রোজ এখানে বসে থাকি জানতে কৌতূহল হচ্ছে নিশ্চয়ই?"

মৃণালবাবু দায়সারাভাবে বললেন, "বলুন, কী কারণ?"

"আমার এক প্রিয়জন এখানে মাটির নীচে শুয়ে আছেন। খুবই ঘনিষ্ঠ। আত্মার আত্মীয় বলতে পারেন। ডিক।"

"ও।"

"তাকে ছেড়ে থাকতে পারি না, তাই...। বেচারার জন্য আমার ভারী কষ্ট হয়। সে যেই সমাধিতে ঢুকল, অমনি তার ছেলেমেয়ে, নাতিনাতনি সব দুদ্দাড়িয়ে অস্ট্রেলিয়া পাড়ি দিল। ওই বুড়োটার জন্য নাকি তাদের এই শহরে পড়ে থাকতে হচ্ছিল।"

"ও! করে মারা গিয়েছেন আপনার বন্ধু?"

"এই তো, মাত্র বছরখানেক। সঠিক হিসেব করলে আজ এগারো মাস সতেরো দিন। বড় ছেলে দেশ ছাড়ল তার আড়াই মাস পরে। আর ছোটজন সপরিবার গেল এই সেদিন। এখনও পুরো এক মাসও হয়নি। কী সব নচ্ছার ছেলে ভাবুন, বাবা-মা সারাজীবন ধরে যে সংসারটা সাজিয়েছিলেন, সেটা কিনা ভেঙেচুরে তছনছ করে দিল?"

"হুম।" মৃণালবাবুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "সত্যিই খুব দুঃখজনক।"

"ডিকের সাধের জিনিসপত্রগুলো নিয়ে কী করল জানেন? সটান নীলামঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল থোক কিছু টাকা নিয়ে। তার মধ্যে ডিকের খাট, আলমারি, ইজিচেয়ার, চেয়ার- টেবিল, শোকেস, ক্যাবিনেট, এমনকী হাতঘড়িটাও ছিল। অথচ ওরা জানত ওই ঘড়ি ছিল ডিকের প্রাণ। ঘড়িটা বেচে না দিয়ে ওরা কি সেটা বাপঠাকুরদার স্মৃতি হিসেবে রাখতে পারত না?"

মৃণালবাবুর কেমন যেন গা শিরশির করে উঠল। অকশন শপে... হাতঘড়ি...!

রিচার্ড ফিসফিস করে বললেন, "ডিক ঘড়িটাকে কত ভালবাসত শুনবেন? বেচারা ক্যানসারে ভুগছিল। যখন তার মরো-মরো অবস্থা, তখন ছেলেদের বলেছিল, তাকে কফিনে ঢোকাবার আগে ওই ঘড়িটা যেন তার হাতে পরিয়ে দেওয়া হয়। কে কার কথা শোনে! যেই না ডিক পাঁচটা সাতাশে মারা গেল, অমনিই ছেলেরা হাত থেকে ঘড়ি, আংটি খুলে নিল আগে।"

মৃণালবাবুর বুকটা ধড়ফড় করে উঠল। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, "ক'টায় মৃত্যু হয়েছিল বললেন?"

"পাঁচটা সাতাশে। বিকেল। এ কী, আপনার মুখটা হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে কেন?"

ঢোক গিলে মৃণালবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "টিসট ঘড়ি ছিল কি?"

"হ্যাঁ। ঝকঝকে সাদা ডায়াল। সংখ্যাগুলো ইটালিক্সে লেখা। সামান্য হেলানো আর কী।"

"কাঁটা দুটো কালো...।" মৃণালবাবু বিড়বিড় করে উঠলেন, "কাঁটায় দুটো ছোট্ট ছোট্ট লাল ফোঁটা। মনে হচ্ছে ঘড়িটা আমি চিনি।"

"চেনাই তো উচিত।" রিচার্ড আবার খুকখুক করে হাসলেন, "ঘড়িটা যে আপনার হাতেই রয়েছে!" বলতে বলতে হাত বাড়িয়েছেন রিচার্ড, "যদি দয়া করে ঘড়িটা আমায় দিয়ে দেন..."

মৃণালবাবুর শরীর পলকে হিম। গলায় স্বর ফুটছে না কোনও, হাঁটু দুটো কাঁপছে থরথর। চোখ বুজে ফেললেন আতঙ্কে। বোজা চোখেই টের পেলেন, একটা হাত এসে খপ করে চেপে ধরল তাঁর কবজি।

উঁহু, হাত নয়, বরফের মতো ঠান্ডা আঙুল।

পার্ক স্ট্রিটের সমাধিস্থানে ভুলেও আর পা রাখেন না মৃণাল মাইতি। ঘড়িটা খুইয়েছেন বলে তাঁর কোনও আফসোসও নেই। কারণ, তিনি জানেন, প্রিয় টিসট ঘড়িটি ফেরত পেয়ে বড় নিশ্চিন্তে এখন সমাধিতে ঘুমোচ্ছেন ডিক। যাঁর পোশাকি নাম রিচার্ড গোমস।

২ মার্চ ২০০৬

অলংকরণ: নির্মলেন্দু মণ্ডল
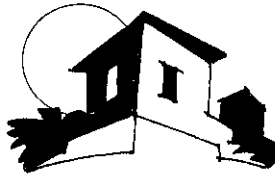
বিনে পয়সার কঙ্কাল

শান্তনু কুণ্ডু

খুট, খুটুর, খুট! ঠুক, ঠকাস, ঠস! এই তো একটু আগেই শুয়েছি। আর শুতে না-শুতেই গা শিউরে ওঠা আওয়াজ! তাড়াতাড়ি মশারি তুলে দরজার দিকে তাকাতেই চমকে উঠলাম! কে যেন বাইরে থেকে দরজার খিল খোলার প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে! এই বাড়িটা একদম সেকেলে। দরজার ক্ষয়ে যাওয়া কাঠের খিলটাও ঢলঢলে। চেপে আঁটা থাকলেও হঠাৎ হাওয়া-বাতাসের ধাক্কায় দু'আঙুল ফাঁক হয়ে যায়।

সেই দু'আঙুলের ফাঁকে ঢুকে কী নড়াচড়া করছে ওটা? বাপ রে! সাদাটে হাড়ের মতো কী একটা! খিলটা লোহার দ-এর উপর থেকে সামান্য উঁচুতে উঠতেই হাট হয়ে খুলে গেল দরজাটা। তখনই শুনতে পেলাম হাঁটুর মটমটানি আওয়াজ। একটা অদ্ভুত আবছা কাঠামো ধীর পায়ে চলে এল ঠিক আমার মাথার কাছে। সেখানে আছে একটা দেওয়াল আলমারি। মোটা মোটা ডাক্তারি বই আর নানা ডাক্তারি সাজ-সরঞ্জামে ঠাসা সেটা। প্রবল অস্বস্তির মধ্যে টের পেলাম, আস্তে করে খুলে গেল আলমারির পাল্লা। আর সেটা খুলতেই একটা ছোট বিলিতি ঘড়ির রেডিয়াম দেওয়া কাঁটা বলে দিল, এখন রাত তিনটে কুড়ি। এর পরেও কি রেহাই আছে? সমানে চলেছে খুটুর-মুটুর, খুটুর-মুটুর!

নির্ঘাত চোর একটা। গায়ে হয়তো তার মাংস নেই, তবু ধরতেই হবে ব্যাটাকে! ভাবামাত্র হাতটা আবার চলে গেল মশারির বাইরে। তারপর খুঁজে-পেতে চাপ দিলাম বেড সুইচে।

নাঃ, আলো জ্বলল না। আজকাল কলকাতায় যা হচ্ছে, ঠিক তাই। বিদ্যুৎ-বিভ্রাট। নদী নিংড়ে-নিংড়ে কত বিদ্যুৎ বের করবে আর! আরও বিকল্প শক্তির উৎস কেন খুঁজছে না সরকার?

পেনসিল-টর্চটা দেওয়াল আলমারিতে, আর ওখানেই তো...! খাটের নীচে আছে একটা ছোট্ট জাপানি লন্ঠন। কিন্তু জ্বালাবে কে ওটা? অগত্যা অন্ধকার হাতড়াতে থাকি। ঢিলে পায়জামার পা-দুটো গুটিয়ে উপরে তুলে পা টিপে টিপে এগোই।

যাঃ, টের পেয়ে গিয়েছে আগন্তুক! হাট করে খোলা দরজাটা দিয়ে পিছন ফিরে পালানোর চেষ্টা করছে! আর সেকেন্ড কয়েক দেরি হলেই সব ফসকে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ ও মন এক জায়গায় জড়ো করে ঝাঁপিয়ে পড়লাম তার উপর।

অজানা অস্তিত্বটা মুহূর্তে পিছলে সরে গেল। আর আমি পড়লাম মুখ থুবড়ে, ফুটিফাটা মার্বেলের মেঝেতে। তবু দু' হাত বাড়িয়ে চেপে ধরলাম তার একটা শুকনো পা। অ্যাঃ, একেবারে কাঠ-কাঠ!

হাত দিয়ে ঝটকা মেরে আমাকে সরিয়ে ককিয়ে উঠল সেই কাঠ-কাঠ পায়ের মালিক। বলল, "ছাঁড়, ছাঁড়। লাঁগছে।"

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার পায়াভাঙা পড়ার টেবিলটা সুন্দর আলোয় ভরে উঠল। বিদ্যুৎ এসে গিয়েছে। তখন আমার হাতের দিকে তাকালে যে-কারও চোখ উলটে যেত। ধরে রাখা খটখটে পায়ের মালিক এক নরকঙ্কাল।

বাঃ, মেঘ না চাইতেই জল। অনেকদিন ধরে

এরকম একটা নিখুঁত তালঢ্যাঙা নরকঙ্কাল খুঁজছিলাম আমি। দু'-একটা পেয়েও ছিলাম। কিন্তু বিক্রেতা যে দাম চেয়েছে, আমি দিতে পারিনি।

আমি সংবৃতা লাহিড়ি। মেডিক্যাল কলেজে এবার আমার শেষ বছর। এখন প্রতিদিন নিরিবিলিতে গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতে হবে আমাকে। প্রয়োজনে সারারাত। শহরের শেষ সীমায় এসে এই ফিরিঙ্গি ভূতের হানাবাড়িটা পেয়েছি। তিনতলার একটা ঘর ভাড়া নিয়েছি খুব সস্তায়। ভাড়া ঠিক করেই অনেক দূর থেকে বিদ্যুৎ-সংযোগ করে নিয়েছি অল্প দিনের জন্য।

প্রচলিত আছে, এই বাড়িতে নাকি রাতে নাকে ভেসে আসে ভাজা ডিমের মনমাতানো গন্ধ। কান খাড়া করলেই শোনা যায় অনেক আঙুল পটপট করে মটকানোর শব্দ। কখনও কখনও বুক কাঁপিয়ে হো হো করে ওঠে পুরনো দিনের সাহেববাড়ির লেঠেল পালোয়ানদের মুখ। মাঝে মাঝে ঘুটঘুটে অন্ধকারে শোনা যায় তাস পেটার শব্দের সঙ্গে ডাগুম্বা, ডাগুম্বা করে উৎকট চিৎকার।

কিন্তু আজ রাতে বিনে পয়সায় যে অতি উৎকৃষ্ট নরকঙ্কালটা পেয়েছি, তার কথা তো এর আগে কখনও লোকমুখে শুনিনি! যাই হোক, এটা আমার খুব কাজে লাগবে। কোনও সঙ্গী থাকলে তিন পাক নেচে নিতাম।

শেষে আমার শোবার ঘরে সাহেবি খাটের মশারি টাঙানোর সরু আবলুস খাটের সঙ্গে ফটফটে কঙ্কালটাকে পিছমোড়া করে বেঁধে রাখলাম।

একজন মেয়েকে এরকম একটা কাজ করতে দেখে ফিক করে হেসে উঠল কঙ্কালটা। হাসতে হাসতে করোটি দুলিয়ে খোনা গলায় বলল, "আমার বয়স কত জানো? তা প্রায় কুড়ি শতক! তোমার তো মোটে বাইশ। নেহাতই কচি মেয়ে! খুকিও বলা যেতে পারে। তা, তুমি আমাকে বেশিদিন এভাবে ধরে রাখতে পারবে না। অসীম, অনন্ত মহাকালের নীরব হাতের **ছোঁয়ায় এই দড়ি আর এই খাট গুঁড়ো হয়ে যাবে। তুমিই বা আর কত দিন? তারপর গায়ের ধুলো ঝেড়ে গটগটিয়ে চলে যাব এই ভূতকুঠির ফাঁদ** থেকে।"

তার অত দার্শনিক কথা। [illegible] [illegible] আমরা ঠান্ডা লাশঘরে মৃত মানুষের দেহ নাড়াচাড়া করি। বাড়ি ফিরে এলেও ফিনাইলের গন্ধ যেন গা থেকে যায় না কিছুতেই।

আলোটা নিভিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়লাম। এটা একটা ভূতকুঠি। মাথার বালিশটা উলটো করে ঘাড় পেতে দিতে দিতেই আবার একটা খটকা লাগল। ঘুমে চোখ বুজে আসছে। তবু শুয়ে শুয়েই বললাম, "শোনো, আমি নিতান্ত গরিব ঘরের মেয়ে। বিদ্যাবতী হাই স্কুল থেকে সব বিষয়ে লেটার নিয়ে তবে এখানে পড়ার সুযোগ পেয়েছি। কঙ্কাল কেনার মতো আমার পয়সাকড়ি নেই। ভাগ্যিস তুমি এই হানাবাড়ির হানাঘরে ঢুকেছিলে! তাই তোমাকে ধরতে পারলাম। কিন্তু একটা ব্যাপার, তোমার বয়স কত যেন বললে! দু'হাজার! এত বছরেও কখনও হাড় নষ্ট হয় না জানি। কিন্তু তাদের জোড়ের মুখ খুলে যায়। অথচ তুমি খুলে যাওনি কেন?"

অন্ধকারে হেসে উঠল কঙ্কালটা। যেন বত্রিশটা মুক্তো ঝকঝক করে উঠল। মনে হল, আমার কথা শুনে কঙ্কালটা নিঃশব্দে হাসছে। হাসি থামতে তার মুখের গহ্বর থেকে ভেসে এল, "বাচ্চা মেয়ে, শোনো তা হলে। আমি বছরের এই সময় নিজেকে মেরামত করতে তোমাদের এই চিকিৎসার পীঠস্থানে আসি। আমার ছেলের রাজত্বের সময় চরক, সুশ্রুত ছিলেন তিন ভুবনের সেরা চিকিৎসক। তাঁরা ভেষজ চিকিৎসা যেমন করতেন, তেমনই তাঁরা ছিলেন শল্য বিশারদও। এই শহরের চিকিৎসার মহাবিদ্যালয়ের অনেক উঁচু ছাদের প্রায় অদৃশ্য চিলেঘরে ওঁরা দু'জন বাসা বেঁধে রয়েছেন। ওই দু'জনই বরাবর আমার হাড়ের চিকিৎসা করেন। তাই আমার কাঠামোর স্থিতিস্থাপকতা এখনও নষ্ট হয়নি।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি আমার এই ভাঙা ঘরে ঢুকলেন কেন? তেমন তো কিছুই নেই এখানে!"

মান্য করে কথা বলছি দেখে কঙ্কালটার গলা **ভারী। গদগদ স্বরে বলল,** "ভেবেছিলাম, তোমার **ভাঙা আলমারিতে** আমার ছেলের মাথা আছে।

কাটা মাথা। কিন্তু নীলাভ সবুজ ওই কাপড়ের ঢাকনা সরিয়ে হাতে নিয়ে বুঝলাম, নিতান্তই প্লাস্টিক। প্লাস্টিকের করোটি। অবশ্য তোমার আসল করোটি কেনার মতো পয়সা কোথায়? না হলে এই ভয়ানক জায়গায় কেউ একা একা থাকে! যতই তুমি ডাকাবুকো হও!"

ছেলের মাথার কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম। গলার কাঁপুনিটা সামলে নিয়ে বললাম, "কে আপনার ছেলে?"

উত্তর এল ধীরে ধীরে, "সম্রাট কনিষ্ক।"

শুনেই আমার মনটা দমে গেল। যেটুকু ইতিহাস পড়েছি তাতে বোঝা যাচ্ছে, উনি বিম কদফিসিস, কনিষ্কের পিতা। কুষাণ বংশের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। ওঁর ফাঁকা বুকের খাঁচায় এত বছরেও পুত্রস্নেহ অটুট!

হয়তো কনিষ্কের আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। অজানা লোক থেকে মস্তকহীন পাথরের পুত্রকে দেখে উনি ভেবে নিয়েছেন, পুত্রের আসল করোটিটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বোধহয় এই ভুল ধারণা থাকার জন্যই আজ উনি আমার হাতে। আমি বুঝতে পারছি, ছোট্ট একটা ভুলের জন্য তাঁকে যেমন এখনও মাশুল গুনতে হচ্ছে, ঠিক তেমনই এই রহস্যটাই আজও তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

পরদিনই রটে গেল খবরটা। আমি নাকি খুব দামি একটা নরকঙ্কাল মওকায় পেয়ে সস্তায় কিনেছি। বলতে গেলে একেবারে জলের দরে। আমাদের স্যার ডা. আত্মবিকাশ চৌধুরী, উর্মিমালা ও আরও তিনজন আমার মতো হবু ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে আমার ভাড়া বাড়ির সিঁড়ির পাথরে লাফ মেরে উঠে এলেন কঙ্কালটা দেখতে। তিনতলায় উঠে স্যার বেশ হাঁফাচ্ছেন। তবু তিনি কঙ্কালটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বললেন, "এত ভাল কঙ্কালটা ওরকমভাবে বেঁধে রেখেছে কেন সংবৃতা? দেওয়ালে কাঠের গোঁজ পুঁতে ঝুলিয়ে দাও।"

"না বাঁধলে পালিয়ে যেতে পারে স্যার!" বললাম আমি।

বলেই বুঝলাম, কথাটা বোকার মতো হয়ে গেল। চারদিকে তাকাতে লাগলাম। তা দেখে ঘরসুদ্ধ লোক হো হো করে হেসে উঠল। সতীর্থরা ভাবল, সংবৃতা লাহিড়ির মতো বেরসিক মেয়েও সময়-সুযোগ পেলে কী চমৎকার রসিকতা করতে পারে। মনে মনে হিসেব করে ডা. চৌধুরী বললেন, "হাজার বিশেক টাকা দেব, দেবে এটা?"

শুনে সবাই উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সমস্বরে বলল, "দিয়ে দে সংবৃতা। সামনে তোর অনেক টাকার দরকার।"

কী একটা হারানোর ভয়ে বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল। অথচ আমার তো সত্যিই টাকার দরকার। তবু সব বুঝেও আমতা আমতা করতে লাগলাম। তাই দেখে বন্ধুদের চোখ আবার বড় বড় হয়ে উঠল। আমার প্রতিক্রিয়া দেখে ডাঃ চৌধুরী বললেন, "বেশ সংবৃতা, আজকের দিনটা তোমায় দিলাম। এই সময়টুকু ভাল করে ভেবে নাও। তারপর সিদ্ধান্তটা জানিয়ো।"

সেদিন মাঝরাতে পড়ার টেবিল থেকে উঠে বিম কদফিসিসের সামনে এলাম। দ্রুত হাতে তাঁর বাঁধন খুলে দিলাম। তারপর আস্তে আস্তে বললাম, "চলে যান।"

বিম কদফিসিস অবাক! রঙিন কাচের ছোট ছোট টুকরো দিয়ে তৈরি ছাদের মাঝখানে উদাস চোখে তাকিয়ে খনখনে গলায় বললেন, "যেতে পারি, কিন্তু কেন যাব সংবৃতা?"

আরে, এ তো আধুনিক কবির মুখের ভাষা! বাংলার সমকালীন কাব্যও তাঁর অজানা নয়। ওফ, কী সাংঘাতিক পর্যবেক্ষণ! কথার খেই ধরে বললাম, "আপনাকে আমি রাখব কোন ভরসায়? দেখানোর মতো কোনও কাগজপত্রই তো আপনার কাছে নেই। প্রশাসনের কাছে যে-কোনও সময় আপনি বেআইনি হয়ে যেতে পারেন।"

আমার আইনি কথা কানে তুললেন না কদফিসিস। যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এল তাঁর গলা, "যৌবনে আমি পুরুষপুর আর গান্ধারে শত লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমার কাছে একটাও রৌপ্য বা তাম্র মুদ্রা নেই। কী দেব তোমাকে

সংবৃতা? তুমি বরং আমাকে আত্মবিকাশবাবুর কাছে একটু দর বাড়িয়ে বেচে দাও। তা হলে তোমার আর্থিক কষ্ট অনেকটা মিটে যাবে। আমি একদিনেই বুঝতে পেরেছি, তুমি খুব মেধাবী মেয়ে। তা ছাড়া তোমার এখন অনেক টাকার দরকার। হয়তো কতদিন তোমাকে পেটের খিদে পেটেই রেখে পড়াশোনা করতে হয়েছে! আমার সময়ে আমি শল্য বিশারদদের অর্থ সাহায্য করতাম। তুমি যথার্থ সেবিকা হয়ে মানুষের মঙ্গল করলে, আমাকে বিক্রি করার সব ঋণ শোধ হয়ে যাবে। ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য অন্য লোক থেকে এসে তোমাকে এটুকু সাহায্য কি করতে পারি না?"

একটু থেমে কদফিসিস আবার বললেন, "জানো তো, আমি শিবের উপাসক। জীবজ্ঞানে শিবসেবা ভালবাসি। তাই সেই সময় প্রজারা আমাকে মহেশ্বর বলে ডাকত। তবে ভয় নেই সংবৃতা! আত্মবিকাশবাবুর কাজ মিটে গেলে আমি তাঁর ঘর থেকে হারিয়ে যাব। উনি ধরে নেবেন, চুরি হয়ে গিয়েছি আমি।"

আমি কোনওদিন কাউকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করিনি। দেবতাকেও নয়। কিন্তু আজ কে যেন আমার ভিতরটা নাড়া দিয়ে চলে গেল। বিচিত্র এই অতিথির সামনে সাষ্টাঙ্গে তাঁর পায়ের হাড়ে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম।

উঠে দাঁড়ালাম। আমার গলার ভিতরে উথলে আসছে একটা চাপা কষ্ট। কোনওমতে সেটা সামলে বললাম, "হে আমাদের উপমহাদেশের পূর্বপুরুষ, আমি আমার শিক্ষাগুরুকে ভুলেও ঠকাতে পারব না। তা ছাড়া আমার আর নরকঙ্কালের প্রয়োজন নেই।

আপনার হাড়ের কাঠামো আমার মস্তিষ্কে গেঁথে গিয়েছে। সব কিছুর অবস্থান আমি চোখ বুজে যে-কোনও সময়ে এখন বলে দিতে পারি। তাই এখন আপনি চলে যেতে পারেন।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ শুনতে পেলাম। মুখ তুলে তাকাতে দেখলাম, বিম কদফিসিসের চোখের গর্ত চকচক করছে। তিনিও কান্নার তীব্র দমক চেপে রাখতে পারছেন না।

কোনওরকমে কদফিসিস বললেন, "তুমি তা হলে সত্যিই মানুষ! আমার কনিষ্ক ছিল ঠিক তোমারই মতো। এখন বুঝতে পারছি, আমার কনুর মাথা কখনও হারায়নি। তোমাদের মধ্যে ও এখনও বেঁচে আছে। আঃ, কী শান্তি! আমাকে পুত্রের পাথুরে মাথা তৈরি করে দেওয়ার জন্য আর হন্যে হয়ে ঘুরতে হবে না। না পাওয়ার দুঃখে বুক চাপড়ে হাহাকার করতে হবে না। এবার আমি চিরঘুম ঘুমোতে পেশোয়ারে চললাম সংবৃতা।"

হারিয়ে যাওয়া অতীতের ওই কঙ্কাল পিছন ফিরে বেতের ঘোড়ার মতো ঘুরে দাঁড়াল। অজান্তে নিজের পায়ে টপ করে পড়ে গেল একটা গরম ফোঁটা। তারপর দেখি, আমার বুকের ভিতরটা তেপান্তর মাঠের মতো ধু ধু করে দিয়ে সাহেববাড়ির বাইরে জমাট কুয়াশার ঘুপচিতে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেলেন সেই জ্যান্ত নাটকের মহান সম্রাট। হঠাৎ খোলা জানলা দিয়ে ছুটে এল এক ঝলক বাতাস।

২ মার্চ ২০০৬

অলংকরণ: নির্মলেন্দু মণ্ডল

ভূতবাংলো

দুলেন্দ্র ভৌমিক

অনেকদিন পর মেজোমামার কাছ থেকে একটা চিঠি এল। যেমন-তেমন চিঠি নয়, একেবারে রেজিস্ট্রি চিঠি। রীতিমতো সইসাবুদ করে নিতাইকে চিঠিটা নিতে হল। চিঠিটা পেয়ে নিতাই একটু অবাক হল। মেজোমামার চিঠি পাওয়া তো লটারি পাওয়ার মতো ব্যাপার নয় যে, অবাক হতে হবে। আসলে বছরে দু'বার মেজোমামা চিঠি দেন এবং নিতাই তখন মেজোমামার চিঠির উত্তর দেয়। সেই দুটো দিন হল, পয়লা বৈশাখ এবং বিজয়া দশমী। চিঠিটা আসে নিতাইয়ের মা'র নামে। কিন্তু মা'র জবানিতে চিঠিটার উত্তর দেয় নিতাই। এবার চিঠিটা এল পৌষের গোড়ায় এবং নিতাইয়ের নামে। এমন অসময়ে মেজোমামার চিঠি কখনও আসেনি। অবাক হওয়ার ব্যাপারটা হল এইখানে।

মেজোমামার চিঠিটা খুলে পড়ার পর প্রথমে নিতাই রোমাঞ্চিত হল। পরে নিজেই নিজের ভিতরে অন্য এক ধরনের উত্তেজনা বোধ করতে লাগল। মেজোমামা লিখেছেন:

স্নেহের নিতাই,

আশা করি তোমরা সকলে কুশলেই আছ। দিদির শরীর কেমন, তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়। নিজে যাইতে পারি না বলিয়া নিজেকেই অপরাধী মনে হয়। সবই কপালের লিখন। যাই হোক, এতক্ষণে তোমাকে যে কারণে এই জরুরি পত্রটি প্রেরণ করিলাম, তাহা মন দিয়া পড়িয়া দু'-একদিনের মধ্যেই কর্তব্য স্থির কোরো। সেই কিশোরকাল হইতে তোমার ভূত দেখিবার প্রচণ্ড শখ। তোমার স্বর্গত পিতৃদেব, আমার জামাইবাবুও জীবিতকালে ভূত দর্শনে অভিলাষী ছিলেন। বহুবার ভূত দেখিবার জন্য বায়না করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখাইতে পারি নাই বলিয়া সেই দুঃখ অদ্যাবধি আমাকে পীড়িত করে। এতক্ষণে একটি সুযোগ আসিয়াছে। যদি তোমার মধ্যে ভূত দেখিবার বাসনা এখনও জাগ্রত থাকে, তবে পত্রপাঠ আমার বাড়িতে চলিয়া আসিও। যদি বাসনা পূর্বাপেক্ষা স্তিমিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই বাসনাকে জাগ্রত করো। পিতার অপূর্ণ সাধ পুত্রের মধ্য দিয়াই পূর্ণ হয়। ইহাই পিতৃভক্তির নিদর্শন। তুমি ভূত দর্শন করিলে তোমার পিতা অর্থাৎ আমার জামাইবাবুর আত্মা তৃপ্তিলাভ করিবে। অতএব, আমার একান্ত ইচ্ছা, মনে কোনওরূপ দ্বিধা না রাখিয়া অতি সত্বর চলিয়া আসিও। আমি তোমার ভূত দর্শনের সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়া রাখিব।

ইতি
তোমার মেজোমামা

মেজোমামার কাছ থেকে এমন চিঠি পাওয়ার পর চুপ করে বাড়িতে বসে থাকার কোনও মানে হয় না। বড়মামা নাকি অনেকরকম ভূতের সঙ্গে ওঠা-বসা করেছেন। তাঁর বসবার ঘরটা ছিল উঠোনের

একধারে। মস্ত বড় উঠোনটা পেরিয়ে তবে শোওয়ার ঘরে বা মূল বাড়িতে আসতে হত। তখনও মামার বাড়ির সামনের রাস্তা পাকা হয়নি। কাঁচা রাস্তার পাশেই বড়মামার বসবার ঘর। সন্ধে সাতটা, বড়জোর আটটার পর এই পথ দিয়ে লোক চলাচল কমে যেত। গ্রামের দিকে কেউ তো বেশি রাত পর্যন্ত বাড়ির বাইরে থাকে না। সেইসব সময় নাকি ভূতেরা আসত বড়মামার সঙ্গে দাবা খেলতে। আস্তে করে ঠেলা মেরে বসবার ঘরের ভেজানো দরজা খুলে দিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ভূত বলত, "কেষ্টা, এলুম। দু' হাত খেলে যাই।"

বড়মামার নাম ছিল কৃষ্ণপদ, মেজোমামার নাম রামপদ। লোকে যে বলে ভূতের মুখে রামনাম বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার, কিন্তু "বড়ই অদ্ভুত' বলে নিতাইয়ের মনে হয় না। মামার বাড়িতে ভূতেরা এসে মেজোমামাকেও নাকি অনেকবার "রাম রাম' বলে ডেকেছে। দু'-তিনবার দাবাও খেলে গিয়েছে। কোনও অঘটন তো ঘটেনি। যদিও এতসব বৃত্তান্ত নিতাই নিজে কখনও দেখেনি, শুনেছে। কিছু শুনেছে মেজোমামার মুখে, কিছু শুনেছে মা'র কাছ থেকে। মা'র কাছ থেকে নিতাই এও শুনেছে যে, তার মা'র বিয়েতে বড়মামার বিশিষ্ট কয়েকজন ভূত-বন্ধুও নিমন্ত্রিত ছিলেন। তাঁরা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে একটু অধিক রাত্রে এসেছিলেন।

চিঠিটা পকেটে নিয়ে নিতাই মা'র কাছে এল। মাকে বলল, "মা, মেজোমামা আমাকে রেজিস্ট্রি করে চিঠি পাঠিয়েছেন।"

নিতাইয়ের মায়ের নাম প্রিয়বালা। নিতাইয়ের কথা শুনে হাতের কাজ থামিয়ে তিনি ছেলের মুখের দিকে তাকালেন। নিতাই দেখল, তার মায়ের সামনে পানের বাটা, চুন, কুচো সুপুরি আর জর্দার কৌটো। নিতাইয়ের কথা শুনে পান বানানো থামিয়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললেন, "এই অসময়ে রামুর চিঠি এল কেন? তাও আবার রেজিস্ট্রি করে! কী ব্যাপার?"

নিতাই চিঠির বিষয়টা মাকে বলতেই প্রিয়বালা লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "সেই ভূত দেখার ডাক এল। কিন্তু একদিন পরে যে। তোর বাবা দেখে যেতে পারলেন না। দাদাকে তোর বাবাও কতবার বলেছেন, 'দাদা, একবার দেখান না।' সবই কপালের ব্যাপার। তোর বাবার কপালে ছিল না।"

নিতাইয়ের মনে হল, মা যেভাবে দুঃখপ্রকাশ করলেন, যেন ভোররাতে উঠে ঠান্ডায় দাঁড়িয়ে থেকেও টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখা হল না কিংবা আগ্রার তাজমহল দেখার সাধ পূর্ণ হল না। নিতাই মা'র মুখের দিকে একটু দেখে নিয়ে বলল, "আমি আগামীকাল দুপুরেই মামার বাড়ি রওনা দেব।"

শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ট্রেন। বনগ্রাম স্টেশনে নেমে অটো করে যেতে হবে কুঠিঘাটের কাছে। একেবারে ইছামতীর পাড়ে। নিতাই ছেলেবেলায় স্টেশনের কাছে রিকশা দেখতে পেত। তাতে করেই দিব্যি মামার বাড়ি চলে যাওয়া যেত। সেসময়, তার মায়েদের ছেলেবেলায় ছিল গোরুর গাড়ি। এখন অবশ্য রিকশা, অটো, সাইকেল-রিকশা-ভ্যান, যাতায়াতের নানারকম ব্যবস্থা হয়েছে।

কিন্তু নিতাইয়ের যাত্রাটা শুভ হল না। স্টেশনে এসে দেখল, ট্রেন চলে গিয়েছে। অতএব, টিকিট কেটে পরের ট্রেনের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। ট্রেনে উঠে পড়ার পর ঘড়ি দেখে নিতাই অনুমান করল, সব ঠিকঠাক চললে বেলা চারটে নাগাদ সে মামার বাড়ি পৌঁছে যাবে। গোড়াতেই নিতাই টের পেয়েছিল তার যাত্রা শুভ ছিল না। ফলে কিছুই ঠিকঠাক চলল না। মছলন্দপুর স্টেশনে পৌঁছবার আগেই লাইনের ওপর গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রথমে অন্যদের মতো নিতাইও ভেবেছিল সিগনালের জন্য দাঁড়িয়ে পড়েছে। এখনই ছাড়বে। কিন্তু একটু পরেই জনৈক হকার মারফত খবর পাওয়া গেল, সামনে অবরোধ আছে বলে আগের ট্রেনটাও স্টেশনের বাইরে লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেন যে কখন যাবে তা কেউ জানে না। কিন্তু এক্ষেত্রে নিতাইয়ের কী-ই বা করার আছে।

ট্রেনের কামরার মধ্যে বসে থাকতে থাকতেই সে টের পেল, বাইরে দিনের আলো কমে গিয়ে চারপাশে মলিন বিকেল স্পষ্ট হচ্ছে। নিতাই যে ভেবেছিল

দিনে দিনে পৌঁছবে, সেটি হওয়ার আশা [illegible] হয়ে এল। অবশেষে নিতাই যখন স্টেশনে পৌঁছল, তখন শীতের সন্ধে উতরে গিয়ে রাত দশ হচ্ছে। মাত্র জনাকয়েক যাত্রী স্টেশনে নামল। স্টেশনের বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। খানকয়েক দোকানে হ্যারিকেন, লম্ফজাতীয় কিছু জ্বলছে। বোধহয় এই এলাকা জুড়ে এখন লোডশেডিং। নিতাই স্টেশনের বাইরে এসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে কোনও অটো বা রিকশা দেখতে পেল না। এই অন্ধকারে পথ চিনে যাওয়া তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব বলে মনে হল। রেললাইনে অবরোধ না থাকলে এতক্ষণ সে দিব্যি পৌঁছে যেতে পারত। কিন্তু এখন কী হবে?

ভাবতে ভাবতেই সে একটা ভ্যাঁপো-ভ্যাঁপো আওয়াজ শুনে বুঝল, নির্ঘাত কোনও রিকশা আসছে। যদি যেতে রাজি হয় তা হলেই তার কষ্ট লাঘব। অন্ধকারের মধ্যে যেটি তার সামনে এসে দাঁড়াল, সেটি রিকশা নয়, রিকশাভ্যান। ভ্যানটা এসে তার সামনে দাঁড়াতেই নিতাই বলল, ''যাবেন?''

ভ্যানচালক জিজ্ঞেস করল, ''কোথায়?''

নিতাই বলল, ''কুঠিঘাট।''

নিতাই শুনেছে, এইরকম রিকশাভ্যানে করে এই অঞ্চলে শুধু মালপত্র নয়, মানুষজনও যাতায়াত করে। নিতাই অন্ধকারে ভ্যানচালকের মুখটা দেখতে পাচ্ছিল না। চালকের মাথায় একটা লাল রঙের টুপি। সম্ভবত উলের। ভ্যানচালক বলল, ''পিছনে উঠে পড়ুন।''

নিতাই জানতে চাইল, ''কত লাগবে?''

চালক বলল, ''এখন এই রাতেরবেলায় তো কোনও প্যাসেঞ্জার পাব না। কুঠিঘাট খুব কাছের পথও নয়। পৌঁছবার পর যা বিবেচনা করবেন তাই দেবেন।''

নিতাই যেন বর্তে গেল। চালকের সামনে থেকে পিছনের দিকে এসে দেখল, ভ্যানের ওপর একটা বস্তা আড়াআড়িভাবে শোওয়ানো। বোধহয় কোনও আনাজের বস্তা। নিতাই ভ্যানের ওপর বসে নিজের ব্যাগটা ওই বস্তাটার পিছনে রেখে বলল, ''চলুন।''

ভ্যান চলতে লাগল। স্টেশনের বাইরের দোকানগুলোতে টিমটিমে আলো জ্বলছিল। কিন্তু স্টেশন চত্বর পেরিয়ে আসতেই সেটুকু আলোও হারিয়ে গেল। নিতাইয়ের মনে হল, একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে তাকে নিয়ে ভ্যানটা এগিয়ে যাচ্ছে। সামনে-পিছনে ডাইনে-বাঁয়ে শুধু অন্ধকার। রাস্তার দু'পাশে বড় বড় গাছের পাতাগুলো রাস্তার মাথার ওপরে এমনভাবে ছেয়ে আছে যে, ওপরের আকাশটাকেও দেখা যাচ্ছে না। ভ্যানচালক ভ্যান চালাতে চালাতেই বলল, ''ইদিকের রাস্তা ভাল না। ভ্যানগাড়ি শুধু লাফাবে। আপনি ওই বস্তাটা ধরে বসুন।''

নিতাই একটু পিছনে সরে এসে বস্তাটার ওপর কনুইয়ের ভর দিয়ে বসতে যাওয়ার আগে জিজ্ঞেস করল, ''কী আছে বস্তার মধ্যে? কেমন একটা গন্ধ বেরোচ্ছে!''

ভ্যানচালক বিরক্ত গলায় বলল, ''তা তো বেরোবেই। সকালের মড়া, এখন নিয়ে যাচ্ছি থানায়। ডেডবডি তো পচতে শুরু করেছে। পুলিশের হুকুমে থানায় নিয়ে যাচ্ছি। তারপর সেখান থেকে যদি মর্গে নিয়ে যেতে বলে তাই নিয়ে যাব।''

নিতাই সোজা হয়ে বসল। সে টের পেল, পৌষের শীতেও তার শরীর ঘামছে। সে কঠিন গলায় বলল, ''ভ্যান থামান। আমি নেমে যাব।''

ভ্যানটা থামাতেই নিতাই তার ব্যাগটা নিয়ে লাফ দিয়ে নামতে যাওয়ার আগে ওই বস্তার ভিতর থেকে ভারী অদ্ভুত গলায় কে যেন বলল, ''নেমে গেলে আর গাড়ি পাবি না। কত অসৎ লোকের সঙ্গে ওঠাবসা করছিস, আর আমার মতো নিরীহ একটা ডেডবডির সঙ্গে কিছুটা পথ যেতে তোর এত আপত্তি?''

নিতাই মুহূর্তমাত্র দেরি না করে লাফ দিয়ে নীচে নেমে পড়ল। আর তখনই চালক খপ করে তার হাতটা ধরে বলল, ''যতটুকু এসেছেন তার ভাড়াটা অন্তত দিন।''

নিতাই পকেটে হাত ঢোকাতে ঢোকাতে বলল, ''কত?''

চালক বলল, ''পাঁচ টাকা দিন।''

নিতাই পাঁচ টাকার একটা কয়েন বের করে লোকটার হাতে দিয়ে বলল, ‘‘আপনার আগে বলা উচিত ছিল।’’

চালক কোনও কথা না বলে ভ্যান চালিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই অন্ধকারে হারিয়ে গেল। অন্ধকার রাস্তায় একা দাঁড়িয়ে তার মনে হল, ভ্যান থেকে নেমে সে কি ভুল করল? সে যদি বস্তার মধ্যে কী আছে সেটা না জানত, তা হলে কোনও ব্যাপার ছিল না। জানবার পর বস্তাবন্দি একটা মৃতদেহের সঙ্গে কী করে এতটা পথ যাওয়া যায়! মৃতদেহটা বন্ধ বস্তার ভিতর থেকে তাকে যতই অভয় দিক, তার কি কোনও মূল্য আছে? নিজের বাবা মারা গেলে তাঁকে যখন চিতায় শোওয়ানো হয়, তখন যদি বাবা চিতার ওপর উঠে বসে নিজের ছেলের নাম ধরে ডাকেন, তা হলে কি কোনও পিতৃভক্ত ছেলে সেই ডাকে সাড়া দেবে? সে তো ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় লাগাবে।

নিতাই রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে এইসব ভাবছিল আর এদিক-ওদিক তাকিয়ে কোনও গাড়ি আসছে কি না দেখছিল। রাস্তা দিয়ে হুটহাট করে এক-একটা গাড়ি চলে যাচ্ছিল। হাত দেখালেও থামছে না। যতদুর চোখ যায় ততদূর পর্যন্ত শুধুই অন্ধকার। কোনও দোকান অথবা লোকজনের বাড়ি আছে কি না বোঝা যাচ্ছিল ছিল না। ঠিক এইরকম সময় তার পিছন দিক থেকে রিং রিং শব্দে বেল বাজাতে বাজাতে কিছু একটা আসছিল। নিতাইয়ের মনে হল, রাস্তার দু'ধারে তো ঘন মাঠ। ধান কাটার পর সেই শূন্য মাঠে তো কোনও রাস্তা নেই। না কি মাঠের মধ্যে দিয়ে ইদানীং রাস্তা হয়েছে? নিতাই পেছন ফিরে অন্ধকারে স্পষ্ট করে কিছুই দেখতে পেল না। তবে মনে হল, কিছু একটা আসছে। হ্যাঁ, একটু পরেই একটা রিকশা এসে তার সামনে দাঁড়াল। নিতাই যেন হাতে চাঁদ পেল। সে বলল, ‘‘ভাড়া যাবেন?’’

রিকশাচালক বলল, ‘‘বোসো।’’

নিতাই রিকশায় উঠে বসতে বসতে বলল, ‘‘আমি যাব...’’

কিন্তু নিতাই কথা শেষ করার আগে রিকশাচালক বলল, ‘‘জানি। তুমি কুঠিঘাটে তোমার মামা রামপদ ঘোষালের বাড়ি যাবে। আমি তো তোমাকে নিতেই এলাম। আজ এখানে একদিনের জন্য বাস, অটো, রিকশা সব ধর্মঘট। ভাগনে আসবে কেমন করে? এই ভেবেই তোমার মেজোমামা উতলা। তাই তো আমার আসা।’’

নিতাই বুঝল, তার মেজোমামাই নির্ঘাত এই রিকশাওলাকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু লোকটা এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঠিক তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কেমন করে তাকে চিনল? নিতাই মনে মনে ভাবল, আগে মামার বাড়ি যাই, তারপর সব জানা যাবে। এখন রাত হয়তো বেশি নয়, তবু তার চলার পথে যেন মধ্যরাতের নির্জনতা। খানিক পর একটা বাড়ির সামনে এসে রিকশাটা থামল। রিকশা থেকে নামার আগে নিতাই মামার বাড়ির দিকে তাকাল। বাড়িটা অন্ধকারে ডুবে আছে। নিতাই ভাবল, এখানেও লোডশেডিং! মামার বাড়ির কোনও ঘরেই কি কোনও আলো জ্বলছে না? জানলা বা দরজার ফাঁক দিয়ে একটু আলোও তো বাইরে আসতে পারে। কিন্তু এ কী অবস্থা! নিতাই অন্ধকারেই রিকশাওলার দিকে তাকাল। অন্ধকারে লোকটাকে ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। নিতাই বলল, ‘‘বাড়িতে কেউ নেই নাকি?’’

রিকশাওলা কোনও কথা না বলে জোরে জোরে রিকশার বেল বাজাল। এবার দরজা খোলার আওয়াজ শোনা গেল। একটু পরেই একটা টর্চের আলো এসে পড়ল মামাবাড়ির মস্ত উঠোনে। রিকশাওলা এবার বলে উঠল, ‘‘ওই যে তেনারা বেরোচ্ছেন। এবার আমায় ছাড়ো।’’

নিতাই রিকশা থেকে নেমে ভাড়া দিতে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘‘কত দেব?’’

রিকশাওলা বলল, ‘‘যা হয় দাও।’’ এই বলে নিতাইয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। মামার বাড়ির আলোটা এতক্ষণে ঘরের দরজা থেকে এগিয়ে এসে রিকশার ওপর পড়েছে। নিতাই দেখল, যে রিকশা করে সে এসেছে সেই রিকশাওলার বাড়ানো হাতটা সাধারণ মানুষের হাতের মতো নয়। রক্তমাংসহীন একটা কঙ্কাল হাত। এবার ভাল করে তাকিয়ে

দেখাল, [illegible]
মানুষ বলা যায়। একটা কঙ্কাল কি রিকশা চালাতে পারে। নিশ্চয়ই পারে। না পারলে সে এল কেমন করে!

নিতাই নিজের পকেটে হাত ঢুকিয়েছিল রিকশা ভাড়া দেবে বলে, কিন্তু রিকশাওলার হাত এবং শরীরের দিকে তাকিয়ে সে যেন পাথর হয়ে গেল। পকেট থেকে আর হাতই বের করতে পারছে না। টর্চ হাতে নিয়ে একটা লোক এসে দাঁড়িয়েছিল রিকশার কাছে। সেই লোকটাকে দেখে নিতাই খানিকটা ভরসা পেয়ে পকেট থেকে হাত বের করল। হাতে কুড়ি টাকার নোট। এই রিকশাওলা মানুষ নিশ্চয়ই নয়। তবে কি ভূত! ভূতেদের সঙ্গে নিতাই কখনও লেনদেন করেনি। কিছু কেনাকাটার সুযোগও পায়নি। অতএব, সে জানে না, ভুতেরা প্রাপ্য টাকা নিয়ে ব্যালেন্স ফেরত দেয় কি না। নিতাই কুড়ি টাকার নোটটা ওই কঙ্কাল হাতে দেওয়ার পর ওই ভূত অথবা কঙ্কালসার আজব মানুষটা বলল, ''ঠিক আছে।''

যেভাবে কর্পূর উবে যায়, ওই রিকশাওলাও ঠিক সেইভাবে উবে গেল। এবার নিতাই টর্চ হাতে লোকটার দিকে সন্দেহজনক দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে ভাবল, এ মানুষ তো? না কি...

নিতাই লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল, ''আমি কলকাতা থেকে আসছি। আমার নাম নিতাই চক্রবর্তী। আমার মেজোমামা...''

টর্চ হাতে লোকটা বলল, ''আসুন। তিনি তো আপনার জন্যই অপেক্ষা করছেন আর চিন্তা করছেন। আমি তো মেজোবাবুকে বললাম, 'ভয় নেই। ছোটবাবু নিজে যাবেন ভাগনেকে আনতে।'''

নিতাই অবাক চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল, ''ছোটবাবু মানে? আমার ছোটমামা? তিনি তো কবেই মারা গিয়েছেন!''

লোকটা এবার নিতাইকে নিয়ে বাড়ির দিকে যেতে যেতে বলল, ''হাজার হোক, ঘোষাল বাড়ির ছোট ছেলে। অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে বলে তো ভূত হয়ে গিয়ে বনেবাদাড়ে ঘুরতে পারে না। [illegible] কদিন ধরে এ বাড়িতেই [illegible] খাবে না বলে নিজেই রোজগার করে। দিনে অসুবিধে, তাই রাতে রিকশা চালায়। সরকারের বেজায় দয়া। তাই প্রায় রাতেই লোডশেডিং হয়। তখন ছোটবাবুর ভাল রোজগার।''

উঠোন পেরিয়ে ঘরের মধ্যে আসার পর দেখা গেল মেজোমামা সারা গায়ে চাদর জড়িয়ে একটা চৌকির ওপর বসে। তাঁর কোমর পর্যন্ত লেপ দিয়ে ঢাকা। নিতাইকে দেখে মেজোমামা বললেন, ''আসতে কোনও কষ্ট হয়নি তো? বাস আর অটো ধর্মঘট, তার ওপর অন্ধকার রাত, তাই তোর ছোটমামা হরিপদ গিয়েছিল তোকে আনতে। তুই ট্রেনে ওঠার পরই হরি আমাকে খবর দিয়েছিল তুই আসছিস। ওরা চেষ্টা করলে সবই জানতে পারে তো!''

নিতাই ধপাস করে মেজোমামার পাশে বসে পড়ে বলল, ''ছোটমামার রিকশাতেই তো এলাম। কুড়ি টাকা ভাড়াও দিলাম।''

মেজোমামা অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, ''হরি তোর কাছ থেকে ভাড়া নিল? নিজের ভাগনেকে চিনতে পারেনি?''

নিতাই বলল, ''চিনেছে ঠিকই। নইলে আমায় আনল কেমন করে? বরং আমিই ছোটমামাকে চিনতে পারিনি।''

মেজোমামা আক্ষেপের গলায় বললেন, ''কী করে চিনবি বল? ওর তো আর আগের চেহারা নেই। এ বাড়িতে যাতায়াত আছে বলে আমরা দিব্যি চিনি।''

একটু চুপ করে থেকে নিতাই বলল, ''ভূত দেখার কথাই যদি বলো, তবে তো ছোটমামার মধ্যেই তার দর্শন পেয়ে গেলাম।''

মেজোমামা বললেন, ''তা অবশ্য ঠিক। তবে হরি হচ্ছে আমাদের ভাই। নিজের আত্মীয়, জ্ঞাতি, কুটুম, এদের ঠিক জেনুইন ভূত হিসেবে মেনে নেওয়া যায় না। এই হরি সেই অপঘাতে মরল, যদি আরও কয়েক বছর আগে মারা যেত, তা হলে জামাইবাবুর ভূত দেখার বাসনা কিছুটা হলেও পূর্ণ হত।''

নিতাই বলল, "কিছুটা কেন?"

মেজোমামা একটু হাসলেন। বেশ বিষণ্ণ হাসি। তিনি বললেন, "মানুষের মধ্যেও যেমন সবাই পূর্ণ মানুষ নয়, ভূতেদের মধ্যেও তেমনই সবাই পূর্ণ ভূত নয়। হরি এখনও পৈতৃক ভিটের মায়া ছাড়তে পারল না। মানুষের সঙ্গেই ওর মেলামেশা বেশি। ভূতেদের সঙ্গে ওর তেমন মাখামাখি নেই। ভূতেদের কোনও অনুষ্ঠানে, সমাবেশে বা জলসায় হরি বিশেষ যায়-টায় না। ফলে ভূত হলেও ভূতসমাজ ওকে এখনও পূর্ণ ভূতের মর্যাদা দেয়নি। তোকে দেখাব অন্যরকম ভূত। যাঁরা ভূতসমাজে কুলীন এবং নেতা গোছের।"

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে যাওয়ার পর নিতাই জানতে চাইল, "সেই কুলীন আর নেতা গোছের ভূতেরা কোথায় থাকে?"

মেজোমামা বললেন, "আর থাকাথাকি! ওই নিয়েই তো বেজায় সমস্যা!"

নিতাই বিষম খাওয়ার ভঙ্গি করে বলল, "সমস্যা! ভূতেদেরও সমস্যা হয়?"

মেজোমামা বললেন, "হয় না আবার! খুব হয়। নগরায়নের ধাক্কায় দেদার ভূত এখন উদ্বাস্তু। তাদের পুনর্বাসনের কোনও ব্যবস্থাই নেই। তার ফলে যে সব্বোনাশটি হচ্ছে সেটি বড় মারাত্মক।"

নিতাই চমকে উঠে মামার দিকে তাকাল। প্রশ্ন করল, "মারাত্মক কেন?"

মেজোমামা লেপের নীচে পা ঢোকাতে ঢোকাতে বললেন, "ভূতগুলো আস্তে আস্তে মানুষের সঙ্গে সমাজে মিশে যাচ্ছে। এমনভাবে মিশে গিয়ে ঘোরাঘুরি করছে যে, ভূত আর মানুষকে আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। তার ফলে প্রায়ই নানারকম ভুতুড়ে কাণ্ড ঘটছে। সেইসব কাণ্ডের মোকাবিলা করতে পুলিশ পড়ছে মহাবিপদে। প্রশাসনেরও কিছু করার নেই। ভূত ধরার বা উৎখাত করার কোনও পরিকাঠামো প্রশাসনের নেই।"

নিতাই মেজোমামার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তা হলে আমার কি পূর্ণ ভূত দেখা হবে না?"

মেজোমামা বললেন, "পূর্ণ ভূত মানে কমপ্লিট ভূত? তোকে সেই ভূত দেখাব বলেই তো জরুরি চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠালাম। এখান থেকে একটু দূরে সাহেবকুঠি বলে বড় একটা বাড়ি আছে। অব্যবহারে প্রায় পোড়োবাড়ি। সেই সাহেবকুঠি কয়েকদিনের মধ্যেই ভাঙা হবে। ওখানে নাকি কীসের ফ্যাক্টরি হবে। এবার ভেবে দেখ, সাহেবকুঠির অত ভূত যাবে কোথায়? সেই কারণেই ভূতেরা বেজায় চিন্তিত। আগামীকাল ওদের প্রতিবাদসভা। আমি তোকে ওই সভায় নিয়ে যাব। ওই সভায় একসঙ্গে অনেক কমপ্লিট ভূত দেখবি। অত কমপ্লিট মানুষও বোধহয় তুই দেখিসনি।"

মেজোমামিমা তাকে নিয়ে এসে বললেন, "নিতাই, এই খাটে তুমি শোবে। মশারি টাঙিয়ে দিয়েছি।"

নিতাই মশারির মধ্যে ঢুকে পড়ার পর দেখল, তার খাটের ওপাশে আর-একটা চৌকি। তাতে চমৎকার করে বিছানা পাতা, কিন্তু কোনও মশারি টাঙানো নেই। নিতাই মেজোমামিকে জিজ্ঞেস করল, "ওই বিছানায় কে শোবে? ওখানে তো মশারি টাঙানো নেই!"

পান চিবোতে চিবোতে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে মেজোমামি বললেন, "ওটা ঠাকুরপো'র জন্য। ওর খাবার ঢাকা দেওয়া আছে। ওর জন্য চিন্তা নেই। বসে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়বে। ঠাকুরপো'র মশারি লাগে না। শরীর বলতে তো শুধু হাড়। ওই হাড়ে মশার হুল ফোটে না।"

নিতাই দেখল মেজোমামি চলে যাচ্ছেন। সে একটা ঢোক গিলে কাতর চোখে ওই শূন্য বিছানাটার দিকে তাকিয়ে রইল। এমন একটা খবর জানার পর কেউই নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে না। নিতাইও পারল না। মেজোমামা তাঁর ভাইকে যতই ইনকমপ্লিট ভূত বলুন না কেন, তিনি যে আদ্যন্ত ভূত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ঘুমের ভান করে লেপের তলায় শুয়ে নিতাই কিন্তু ঘেমে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার মনে হল, ঘরের মধ্যে একটা উষ্ণ ভাব। তবে কি ছোটমামা এলেন? কিন্তু অন্ধকার ঘরে কিছুই দেখা না গেলেও খুটখাট আওয়াজ শুনে মনে হল,

[illegible] এসেছেন। নিতাই চুপ করে রইল। ভূতেরা কি অন্তর্যামী! [illegible] ছোটমামা বলে উঠলেন, "কী রে নিতাই, ঘুমোলি?"

লেপের তলায় কেঁপে উঠলেও সে কোনও কথা বলল না। কোন কথায় কী বলে ফেলে বিপদ বাড়বে তার চাইতে চুপ করে থাকাই ভাল! জীবনে তো এর আগে কখনও কোনও ভূতের সঙ্গে একঘরে রাত কাটায়নি। ভূত দেখার অভিজ্ঞতা এমন হবে সেটা জানা থাকলে সে ভূত দেখতে আসত না। কিন্তু ঘরের মধ্যে এসব কী হচ্ছে? জোনাকির মতো ছোট ছোট কয়েকটা আলো ঘরের মধ্যে ঢুকল। নিতাই প্রথমে জোনাকিই ভেবেছিল। কিন্তু আলোগুলো হঠাৎ বড় হয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে পাক খেতে আরম্ভ করল। কে একজন যেন ছোটমামাকে জিজ্ঞেস করল, "হরিপদ, মশারির মধ্যে কে শুয়ে রে? গন্ধটা তো ভাল ঠেকছে না!"

ছোটমামা জবাব দিলেন, "আমার ভাগনে। আজই কলকাতা থেকে এসেছে।"

তারপর ওরা ছোটমামার সঙ্গে ফিসফিসিয়ে অনেকক্ষণ কথা বলল। তারপর কখন যে কী হল তা আর মনে পড়ছে না নিতাইয়ের। সকালে ঘুম ভাঙার পরই ছোটমামার বিছানাটার দিকে সে তাকাল। বিছানাটা খালি। তার মানে ছোটমামা ঘুম ভেঙে উঠেই চলে গিয়েছেন।

দুপুরের পর মেজোমামার সঙ্গে সাহেবকুঠিতে এসে নিতাই দেখল, কোথাও কোনও মিটিংয়ের আয়োজন নেই। মেজোমামাকে বলতেই মেজোমামা বললেন, "এটা কি মানুষের মিটিং যে, রাজ্যের লোককে জানাতে জানাতে এবং জ্বালাতে জ্বালাতে মিটিংয়ের মিছিল চলবে? এখানে সব হয় নিঃশব্দে এবং সাবলীলভাবে। মনস্থির করে দেখবার চেষ্টা কর।"

নিতাই মনস্থির করে দাঁড়িয়ে থাকলেও কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। হঠাৎ তার কানের কাছে কে যেন ফিসফিস করে বলল, "নিতাই, তোর বাবাকে দেখ। মঞ্চের ওপর। দেখতে পাচ্ছিস?"

নিতাই বলল, "না।"

[illegible] গলা শোনা গেল, "আমি তোর ছোটমামা। তোকে ছুঁয়ে রইলাম। এবার তুই সব দেখতে পাবি। আমার বড়দা ছুঁয়ে আছে মেজদাকে, তাই মেজদা সব দেখতে পাচ্ছে।"

মানুষের হাতের স্পর্শ কেমন তা নিতাই জানে। জীবনে এই প্রথম একটা ভূতের কঙ্কালসার হাতের স্পর্শ পেয়ে তার মনে হল, ভিড়ের সময় ট্রামে, বাসে, রেলে, নানা অফিসে এরকম স্পর্শ সে আগেও পেয়েছে। এবার সে সবই দেখতে পাচ্ছে। সবই শুনতে পাচ্ছে। মঞ্চের ওপর বাবাকে দেখে সে একেবারে অভিভূত হয়ে গেল। মানুষ হয়ে বেঁচে থেকে যে সম্মান বাবা পাননি, আজ এত কমপ্লিট ভূত তার বাবাকে সেই সম্মান দিচ্ছে। গলায় মালা পরিয়ে অনুষ্ঠানের সভাপতি করেছে। তার মানে তার বাবাও কমপ্লিট ভূত। একজন ভূত বক্তৃতা দিচ্ছে, "আমরা শিবানুচর। অভিধানের ভাষায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহের মূল উপাদান অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম। কার্তিক মাসের কৃষ্ণচতুর্দশী মানবসমাজে ভূতচতুর্দশী নামেই বিখ্যাত। স্বর্গ ও মর্ত্য, উভয়লোকে আমাদের অবাধ যাতায়াত। অথচ আমাদের উৎখাত করার চক্রান্ত চলছে তো চলছেই। এই সমাজে, ভুতুড়ে ভোটার আছে, ভুতুড়ে অফিসকর্মী আছে, ভুতুড়ে রেশনকার্ড আছে, ভুতুড়ে মেডিকেল বিল, টেলিফোন বিল, ক্রেডিট কার্ডের বিল সবই আছে, অথচ ভূতেদের কোনও স্থায়ী নিবাসই নেই। তাই আমাদের দাবি, নিউ টাউনে একটি ভূতবাংলো চাই। আমরা অকৃতজ্ঞ নই। প্রশাসনের সব কাজে আমরা সহযোগিতা করব।"

নিতাই দেখল, হলঘর ভর্তি ভূত। সবাই হাততালি দিল। কিন্তু হাততালির শব্দটা মানুষের হাততালির মতো শোনাল না। কেমন যেন খটাখট খটাখট আওয়াজ। এত ভূত একসঙ্গে দেখতে পাওয়া খুবই ভাগ্যের ব্যাপার। ছোটমামা বললেন, "এত ভূত দেখে অবাক হচ্ছিস তো! গোটা ভারতের কথা বাদ দে। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই কমপ্লিট ভূতের সংখ্যা দু' কোটি। মনে রাখিস, মানুষ মরে। কিন্তু ভূত

মরে না। কেবলই বাড়ে। তাই আগামী দিনে সারা পৃথিবীতে ভূতের সংখ্যাই বেশি হবে। মানুষের তুলনায় অনেক বেশি।''

এইসময় নিতাইকে দেখতে পেয়ে নিতাইয়ের বাবা মঞ্চ থেকে নেমে এসে বললেন, ''বাবা নিতু, কেমন আছিস? অফিসে যে উপরি ইনকাম ছিল, সেটা এখনও চালিয়ে যাচ্ছিস? আজও অবধি কমপ্লিট মানুষ হলি না? মাকে যে দু'বেলা খেতে দিচ্ছিস, তা তো ঢের! যতদিন মানুষ ছিলুম ততদিন ভাবতুম, মানুষই সর্বোত্তম প্রাণী। কিন্তু ভূত হয়ে যাওয়ার পর ধারণা বদলাল। ভূতেদের মধ্যে কমপ্লিট ভূতের সংখ্যা বাড়ছে অথচ মানুষের মধ্যে কমপ্লিট মানুষের সংখ্যা কমেই চলেছে। তুই একটা ইনকমপ্লিট মানুষ। এ আর সহ্য হয় না।''

নিতাইকে বাবা ভর্ৎসনা করে চলে যাওয়ার আগে নিতাইয়ের কানটা এমনভাবে মলে দিয়ে গেলেন, যার যন্ত্রণা আজও টের পায় নিতাই। তার সবচেয়ে বড় দুঃখ— বাবা, কাকা, মাস্টারমশাই, এঁরা কেউ নন, কানটা মলে দিয়ে গেলেন তার ভূতবাবা। ভূতের হাতে কানমলা খাওয়াটা নিতাই আজও মেনে নিতে পারছে না।

মার্চ ২০০৬
অলংকরণ: অনুপ রায়
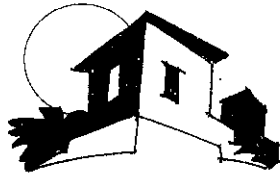
রাতবিরেতেই হয়ে থাকে

সমরেশ মজুমদার

নিউ ইয়র্ক শহরে গত একুশ বছরে বারদশেক যেতে হয়েছে কাজকর্মে। শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে পাতাল রেলই ব্যবহার করেছি। ভাড়া কম এবং সময়ও বেশি লাগে না। মাঝেমধ্যে বন্ধুদের গাড়িতেও গিয়েছি এখানে-ওখানে, কিন্তু গাড়িতে বসে থাকলে রাস্তাঘাট ঠিকঠাক চেনা যায় না। তার ফলে, আমি নিউ ইয়র্কের জটিল পাতাল রেলপথ চমৎকার চিনে গিয়েছিলাম। কিন্তু উপরের পথঘাট প্রায় অচেনা ছিল।

বারবার যেতে যেতে প্রচুর বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। দেখলাম, তাঁরা আমাকে দাদা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। জ্যাকসন হাইটের রাস্তায় অপরিচিত বাংলাদেশের যুবক এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করেন, ''কেমন আছ দাদা? কবে আসলেন? ভাল লাগছে।''

এই ডিসেম্বরে একটি বইকে উপলক্ষ করে যেতে হল নিউ ইয়র্কে। উঠলাম কুইন্স-এর ইউনিয়ন টার্নপাইক স্টেশনের কাছে একজন বাংলাদেশের মানুষের বাড়িতে। আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন কলকাতার তরুণ প্রকাশক গৌতম দাস। পাতাল রেলেই ঘুরছি আমরা। সেদিন কোনও কাজ নেই, গৌতম প্রস্তাব দিল অতলান্তিক সিটিতে যাওয়ার জন্য। নাম শুনেছে খুব। শহরটা নিউ ইয়র্ক থেকে ঘণ্টাদুয়েক দূরে। মানহাটনের পোর্ট অথরিটি বাস টার্মিনাল থেকে গ্রে হাউন্ড বাসে উঠে যেতে হয়। আমাদের স্টেশন থেকে পোর্ট অথরিটি পৌঁছতে মিনিট চল্লিশেক লাগে।

অতলান্তিক সিটিকে বলা হয় ক্যাসিনো শহর। বিরাট বিরাট ক্যাসিনোয় প্রতিদিন অনেক লোকজন যায়। রাস্তাঘাট শুনশান, কিন্তু ক্যাসিনোতে ভিড় উপচে পড়ছে। গোটাতিনেক ক্যাসিনো ঘুরে, দেখে গৌতম আর আমি ঢুকলাম সিজার ক্যাসিনোয়। দুটো বড় ফুটবলমাঠ এক হলে যে জায়গা দাঁড়ায়, তাই জুড়ে স্লট মেশিন। টুরিস্টরা তার সামনে বসে বোতাম টিপছে। পাঁচ সেন্ট থেকে একশো ডলার একবার ফেলা যায় মেশিনে। ভাগ্যে থাকলে দশ হাজার ডলারও পাওয়া যায়।

আমরা দু'জনে দুটো মেশিনের সামনে বসলাম। পঁচিশ সেন্টের মেশিন। এক ঘণ্টা খেলার পর দেখা গেল, আমি দু' ডলার হারছি, আর গৌতম এক ডলার জিতছে। গৌতম বলল, ''ধুৎ, এতে পোষাচ্ছে না। চলুন, এক ডলারের মেশিনে বসি।''

বিদেশে গেলে বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের পকেটে বেশি থাকে না। আমাদের পঁয়তাল্লিশ টাকা দিয়ে আমেরিকার এক ডলার কিনতে হয়। তাই ওদেশে গিয়ে খরচ করি বেশ হিসেব করে। স্লট মেশিনে এক ডলার ফেলা তো বেশ বিলাসিতা। কিন্তু লোকে যেখানে স্বচ্ছন্দে এক, পাঁচ, দশ ডলার স্লট মেশিনের গর্তে ফেলে হ্যান্ডেল ধরে টানছে, তখন আমরা তো দু'জনে মিলে গোটাদশেক ডলার ফেলতেই পারি।

প্রতিটি স্লট মেশিনের সামনে একটা টুল থাকে। তাতে বসে গর্তে ডলার ফেলে হ্যান্ডেল ধরে টানলে মেশিনের রোলার ঘুরতে থাকে। ঘুরতে ঘুরতে যখন স্থির হয়, তখন ছবি ভেসে ওঠে। সেই ছবিগুলো

নানা ধরনের। তিনটে ছবি এক হলেই ডলার পাওয়া যাবে। বিভিন্ন ছবির জন্য ডলারের পরিমাণ সামনেই লেখা আছে।

টুলে বসে ডলার ফেলামাত্র অবাক হয়ে দেখলাম, রোলার ঘুরতে শুরু করেছে, অথচ আমি হ্যান্ডেল টানিনি। গৌতমকে বললাম। সে দেখে বলল, "বোধ হয় ওই মেশিনটা খারাপ। আপনি পাশেরটায় বসুন।"

যেহেতু হ্যান্ডেল টানিনি তাই 'কয়েন আউট' বোতাম টিপতেই আমার ডলার বেরিয়ে এল। কিন্তু পাশের মেশিনে বসে ডলার ফেলতে একই কাণ্ড। রোলার ঘুরে যে তিনটে ছবি এল, তাতে আমার প্রাপ্য তিরিশ ডলার। অথচ আমি হ্যান্ডেল টানিনি। আমার ডলার মেশিনের গর্তে আছে, ভিতরে যায়নি। না গেলে ওই তিরিশ ডলার মেশিন আমাকে দেবে না। ক্যাসিনোর একজন অফিসারকে ডেকে সমস্যাটা জানালাম। তিনি ব্যাপারটা বিশ্বাসই করতে চাইলেন না। ডলারটা বের করে তিনি আবার মেশিনের গর্তে সেটাকে ঢুকিয়ে হ্যান্ডেল টানতে বললেন। অবাক কাণ্ড, ওঁর সামনে রোলার স্থির হয়ে আছে। হ্যান্ডেল টানলে সেটা ঘুরল। থামলে দেখা গেল, একটাও ছবি নেই। অফিসার "উইশ ইওর গুড লাক," বলে চলে গেলেন তাঁর কাজে।

কিন্তু যেই আবার ডলার ফেললাম, তখনই রোলার ঘুরতে লাগল, হ্যান্ডেলে হাত না দিতেই। মেশিনটা যেন আমার সঙ্গে রসিকতা করছে। অফিসার সামনে এলে গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। গৌতমও এর ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত রোলার ঘোরার সময় হ্যান্ডেল টানল। সঙ্গে সঙ্গে রোলার থেমে গেল, কিন্তু যে ছবি ফুটল, তার জন্য আমি এক ডলার ফেরত পেলাম। কোনও লাভ হল না, লোকসানও নেই। তারপর প্রায় এক ঘণ্টা ধরে যতবার ডলার ফেলছি, এই একই কাণ্ড।

হঠাৎ কানের কাছে একটা খনখনে গলা বাজল, "মাই ডিয়ার বয়, তুমি আর খেলো না। ক্যাসিনোর ঘোস্ট তোমাকে খেলতে নিষেধ করছে।"

চমকে তাকালাম। শীর্ণ, আশির উপর বয়স, লাঠি হাতে কখন যে বৃদ্ধ আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, আমরা দু'জনে টের পাইনি।

গৌতম জিজ্ঞেস করল, "ক্যাসিনোর ঘোস্ট মানে?"

"এই ক্যাসিনোয় খেলে সর্বস্বান্ত হয়ে আত্মহত্যা করেছে, এমন অনেক ঘটনা আছে। তারাই ঘোস্ট হয়ে এখানে থেকে গিয়েছে। মাঝে-মাঝে এইভাবে তারা আপত্তি জানায়। তোমাদের আর খেলা উচিত নয়।" বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন।

কীরকম শিরশিরানি ছড়িয়ে পড়ল শরীরে। টুল ছেড়ে উঠে আমরা ঠিক করলাম, ক্যাসিনোর কর্তৃপক্ষকে ব্যাপারটা জানাব। কয়েক পা এগিয়ে খেয়াল হল, অভিযোগ জানাতে হলে বৃদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু বৃদ্ধ কোথায়? যেখানে ছিলেন সেখানে তো বটেই, তামাম ক্যাসিনোয় ওঁকে খুঁজে পেলাম না। অথচ লাঠির উপর নির্ভর করে হাঁটা ওই বয়সের মানুষের পক্ষে ওই সময়ের মধ্যে হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই। কিন্তু ওই মেশিনে এখন অন্য লোক বসে দিব্যি খেলে যাচ্ছে। মেশিন কোনও পাগলামো করছে না। আমার বেলায় ওরকম হচ্ছিল কেন? আমরা কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনি। ক্যাসিনোর বাইরে এসেও বৃদ্ধকে দেখতে পেলাম না।

এই সময় ঠান্ডা জিরোর অনেক নীচে নেমে গিয়েছে। রাত দশটায় গ্রে হাউন্ড বাসে উঠে বসলাম। বাসের ভিতরে তাপযন্ত্রের কল্যাণে ঠান্ডা নেই।

মানহাটনের পোর্ট অথরিটি বাস টার্মিনাসের সঙ্গেই পাতাল রেলস্টেশন। ঘড়িতে বারোটা দশ। ঠান্ডার জন্য বেশি লোক নেই টার্মিনাসে। পাতালরেল ধরতে গিয়ে জানলাম, লাইন মেরামত হচ্ছে। কুইন্সে যেতে হলে আমাদের মিনিট দশেক হেঁটে অন্য লাইনের ট্রেন ধরতে হবে। এবার গৌতম বলল, "দূর, এত রাতে ঠান্ডায় হাঁটতে ইচ্ছে করছে না। ট্যাক্সি নিয়ে চলুন।"

প্রথমত, ভাড়া অনেক। দ্বিতীয়ত, অচেনা শহরের নিশুতি রাতের রাস্তায় ট্যাক্সিওলাকে বিশ্বাস করা

মুশকিল। মানহাটন থেকে কুইন্সে পাতালরেলের সব স্টেশন মুখস্থ, কিন্তু উপরের রাস্তাটা যে চিনি না। তবু গৌতমের জন্য রাজি হতে হল। উপরে উঠে দেখলাম, গোটা দশেক ট্যাক্সি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে সবচেয়ে রোগা এবং খাটো চেহারার নিরীহ ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম, সে কুইন্সে যাবে কি না? দরজা খুলে দিয়ে ঠিকানা চাইল লোকটা। বলতেই একটা কাগজে নোট করে নিয়ে ইঞ্জিন চালু করল। রাত তখন সাড়ে বারোটা।

দিনের মানহাটন যেরকম দেখতে, মাঝরাতে তা যে অচেনা হয়ে যায়, গাড়ি চলতে শুরু করলে বুঝতে পারলাম। নিয়নগুলোকে কুয়াশায় ভৌতিক দেখাচ্ছে। রাস্তায় লোকজন দিনের বেলায় খুব কম হাঁটে, এই মাঝরাতের শীতে তো থাকবেই না। এমনকী, গাড়িও কমে গিয়েছে। ট্রাফিক লাইট ছাড়া মনে হয় কেউ জেগে নেই।

ট্যাক্সি চলছে। আমরা স্লট মেশিনের ভৌতিক আচরণ নিয়ে আলোচনা করছিলাম। কোনও ব্যাখ্যা নেই, কিন্তু একটা উপকার হয়েছে— আমাদের পকেটের ডলার পকেটেই থেকে গিয়েছে।

ইতিমধ্যে একটা বেজে গিয়েছে। ট্যাক্সিওলাকে জিজ্ঞেস করলাম, তার দেশ কোথায়? সে গর্বের সঙ্গে জানাল, ‘‘আমি মারাদোনার দেশের লোক, তোমরা নিশ্চয়ই মারাদোনার নাম শুনেছ?’’

তাকে বুঝিয়ে দিলাম, মারাদোনা আমাদের দেশে কীরকম জনপ্রিয়! লোকটা খুশি হয়ে গুনগুন করে গান ধরল।

দেড়টা বাজল। হঠাৎ চোখে পড়ল, বাঁ দিকে যেন সমুদ্র দুলছে। কুইন্সে যেতে তো সমুদ্র পড়ার কথা নয়! জিজ্ঞেস করলাম, ‘‘আপনি ঠিক রাস্তায় যাচ্ছেন তো?’’

ড্রাইভার হাত নাড়ল। বুঝিয়ে দিল, ঠিক আছে।

কিন্তু আমাদের সন্দেহ হতে লাগল। দু'জন বিদেশিকে মাঝরাতে নিশ্চয়ই উলটোপালটা

ঘুরিয়ে মিটার বাড়ানোর প্রলোভন পৃথিবীর অনেক ড্রাইভারেরই থাকে। ইনিও সেই কর্ম করছেন না কি?

রাত যখন দুটো, তখন একটা জঙ্গুলে জায়গায় গিয়ে ট্যাক্সি দাঁড়াল। এবার ভয় হল আমাদের। লোকটার পরিচিত গুন্ডা যদি আশপাশে থাকে, তা হলে পকেটে যা আছে, তাকে দিয়ে দিতে হবে।

গৌতম খুব রেগে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এখানে এসেছ কেন?"

লোকটা বিড়বিড় করল, "আমার দোষ, আমার দোষ। আমি পথ হারিয়েছি।"

সর্বনাশ। বলে কী? বললাম, "তুমি তোমার ট্যাক্সি-সেন্টারে ফোন করে জেনে নিচ্ছ না কেন, কোন পথে যাবে?"

"আমি তো সেন্টারের মেম্বার নই, বেশি খরচ পড়ে, তাই।"

"ওঃ, তা হলে পুলিশকে ফোন করো।"

"প্লিজ স্যার, পুলিশকে ফোন করতে বলবেন না। ওরা যদি শোনে ট্যাক্সি ড্রাইভার হয়েও আমি রাস্তা চিনি না, তা হলে লাইসেন্স কেড়ে নেবে। না খেয়ে মরব আমি।" করুণ গলায় বলল সে।

"বাঃ, চমৎকার! তুমি কী চাইছ?"

"তোমরা আমাকে একটু সাহায্য করো, প্লিজ!" বলতে বলতে একটা ম্যাপ বের করল সে। নিউ ইয়র্ক শহরের ম্যাপ। আলো জ্বেলে সামনে ধরল ম্যাপটা, "তোমরা কোথায় যাবে?"

মাঝ সমুদ্রে দিগভ্রান্ত নাবিকের মতো আমরা কিছুক্ষণ ম্যাপ দেখতে দেখতে কুইন্স শব্দটাকে খুঁজে পেলাম। দেখা গেল, কুইন্সের বিপরীত দিকে আমরা চলে এসেছি।

রাত যখন আড়াইটে তখন আমরা কুইন্সে ঢুকেছি, কিন্তু ইউনিয়ন টার্নপাইক কোথায়, বুঝতে পারছি না। ওটা নাকি মেট্রোর ম্যাপে পাওয়া যাবে। শেষ পর্যন্ত লোকটা বলল, "আমি একটা কথা বলি স্যার। রাস্তায় লোকজন দূরের কথা, একটা ইঁদুর পর্যন্ত নেই। এভাবে না ঘুরে আমরা এখানে দাঁড়াই। আপনারা কষ্ট করে একটু ঘুমিয়ে নিন। সকাল হলে ঠিক পৌঁছে দেব আমি।" গাড়ি দাঁড় করাল সে।

ওরকম কুয়াশা আমি কখনও দেখিনি। রাস্তার আলো এখন ঝাপসা। ট্যাক্সির পিছনের সিটে বাকি রাতটা কাটাতে হবে? এই ঠান্ডায় কি ছিনতাইবাজ বা গুন্ডারা রাস্তায় ঘুরবে? নিউ ইয়র্কের রাস্তায় কুকুর ঘোরে না। ইঁদুরগুলোর দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। গৌতম বলল, "আমি ট্যাক্সির কথা না বললে এরকম হত না।"

"দোষ তোমার নয়, ড্রাইভারের।"

"এরকম সরল ড্রাইভার কখনও দেখিনি। বলে কিনা, পথ চিনি না!"

"স্যার, একটা প্রবলেম। হিটারটা মাঝে-মাঝে বন্ধ রাখতে পারি?"

"অসম্ভব।" চেঁচিয়ে উঠলাম, "বাইরে মাইনাস কত হবে জানি না। হিটার বন্ধ করলে নির্ঘাত মারা পড়ব। তোমার কি মাথা খারাপ?"

"ঠিক আছে।"

দূরে, একটা দোকানের নিয়ন সাইন নিভে গেল। তারপরই লোকটাকে চোখে পড়ল, ঝাপসা। পা থেকে মাথা পর্যন্ত গরম কাপড়ে মুড়ে হনহনিয়ে হাঁটছে। গৌতম যেন দূরে দ্বীপ দেখতে পেয়েছে, এমনভাবে চিৎকার করে ডাকল লোকটাকে। তারপর বুঝতে পারল, বন্ধ জানলার বাইরে আওয়াজ যাচ্ছে না। সে জানলা নামিয়ে চিৎকার করল, "হ্যালো স্যার, হ্যালো! প্লিজ কাম হিয়ার, হেল্প আস।"

ততক্ষণে বাইরের ঠান্ডা হুড়মুড়িয়ে ঢুকে আমাকে কাঁপিয়ে দিল।

লোকটা প্রথমে সন্দেহের চোখে তাকাল। তারপর এগিয়ে এল কয়েক পা, "কী ব্যাপার?"

ইংরেজিতে প্রশ্নের উত্তর গৌতম দিল ইংরেজিতেই, "আমরা রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি।"

লোকটা আর-এক পা এগিয়ে এল। ওর মুখ মাঙ্কিক্যাপে ঢাকা! আমার দিকে তাকিয়ে লোকটির গলার স্বর বদলে গেল, "আরে, আপনি? এত রাতে এখানে!" প্রশ্ন এল বাংলায়।

বুঝলাম, লোকটা নির্ঘাত অন্য কারও সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলেছে। বললাম, "রাস্তা না চিনে ড্রাইভার ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাক দিচ্ছে!"

‘‘কোথায় যাবেন?’’

ঠিকানা বলতেই লোকটা ড্রাইভারকে ইংরেজিতে বলল, ‘‘এখান থেকে মিনিট দশেকের পথ। আচ্ছা, আমি কি তোমার পাশে বসতে পারি?’’

‘‘অবশ্যই।’’ ড্রাইভার যেন বেঁচে গেল।

গৌতম জিজ্ঞেস করল, ‘‘আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন?’’

‘‘বাসায়। কাজ শেষ হল। টিউব ধরতাম।’’

‘‘আমাদের জন্য...’’

‘‘ছি, ছি! এ কী বলতেছেন? দাদার কামে লাগতে পারলাম, এ আমার সৌভাগ্য! কত বই পড়ছি ওঁর।’’ লোকটা হাসল।

ঠিক আমাদের আস্তানার সামনে ট্যাক্সি দাঁড় করাল লোকটা। মিটারে তখন আড়াইশো ডলার ফুটে উঠেছে। কিন্তু ড্রাইভার আমাদের কাছ থেকে ত্রিশ ডলারের বেশি নিল না। ট্যাক্সি থেকে নেমে ঘুমন্ত বাড়ির বেল টিপছি। কেউ উঠছে না। ড্রাইভার নেমে এসে জিজ্ঞেস করল, ‘‘এই বাড়ির ফোন নম্বর কত?’’ সে মোবাইল বের করল। নম্বর বলতে সে বোতাম টিপল। তারপর সেটটা আমার হাতে দিল। বন্ধুর ঘুমজড়ানো গলা পেয়ে বললাম, ‘‘সরি, তোমাকে বিরক্ত করছি। আমরা এসে গিয়েছি।’’

মোবাইলটা ফেরত নিয়ে ড্রাইভার ট্যাক্সির কাছে ফিরে গিয়ে চারপাশে তাকিয়ে বলল, ‘‘আরে, ওই লোকটা গেল কোথায়?’’

আমরাও খুঁজলাম। কুয়াশা চারপাশে। কোথাও মানুষটির চিহ্ন নেই। ভাবলাম, প্রাকৃতিক প্রয়োজনে আশপাশে যেতে পারে। কিন্তু ডাকাডাকিতে তো সাড়া দেবে! বন্ধু দরজা খুলে সব শুনে বলল, ‘‘তোমরা ভাগ্যবান। কয়েকদিন আগে একজন বাংলাদেশের মানুষ মাঝরাতে কাজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে খুন হয়েছে। হয়তো সে তোমার বই পড়ত। এসো, ভিতরে এসো।’’

আমরা ভিতরে ঢুকলাম। সেই ট্যাক্সিচালকও। দিনের আলো না ফুটলে সে কিছুতেই ট্যাক্সি চালাবে না। কাঁপতে কাঁপতে বলল, ‘‘প্লিজ স্যার, রাতটা থাকতে দিন। আমি তখন বলিনি, লোকটার শরীর থেকে বিশ্রী পচা গন্ধ বের হচ্ছিল।’’

২ মার্চ ২০০৬
অলংকরণ: সুব্রত চৌধুরী

আয়নার মানুষ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

শক্তপোক্ত মানুষ হলে কী হয়, গদাধর আসলে বড় হা-হয়রান লোক। তিন বিঘে পৈতৃক জমি চাষ করে তার কোনওক্রমে চলে, বাস্তুজমি মোটে বিঘেটাক। তাতে তার বউ শাকপাতা, লাউ-কুমড়ো ফলায়। দুঃখে কষ্টে চলে যাচ্ছিল কোনওক্রমে। কিন্তু পরানবাবুর নজরে পড়েই তার সর্বনাশ।

পরানবাবু ভারী ভুলো মনের মানুষ। জামা পরেন তো ধুতি পরতে ভুলে যান, হাটে পাঠালে মাঠে গিয়ে বসে থাকেন, জ্যাঠামশাইকে 'ছোটকাকা' ডেকে বিপদে পড়েন। লোকে আদর করে বলে 'পাগলু পরান'। তবে পরানবাবু মাঝে-মাঝে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে ফেলেন। একদিন গুরুপদকে বললেন, ''ওরে সাধুচরণ, চারদিকে চোর। খুব চোখ রাখিস বাপু!''

তা সত্যিই সেই রাতে গুরুপদর বাড়িতে চোর ঢুকে বাসনপত্র নিয়ে গেল।

আর একদিন লক্ষ্মীকান্তকে বলে বসলেন, ''রজনীকান্ত যে! তা বিষ্ণুপুরে বেশ ভাল আছ তো ভায়া!''

লক্ষ্মীকান্তর বিষ্ণুপুরে যাওয়ার কথাই নয়, যায়ওনি কোনওদিন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এর কিছুদিনের মধ্যেই বিষ্ণুপুরে একটা মাস্টারির চাকরি হয়ে লক্ষ্মীকান্ত চলে গেল। যাওয়ার আগে সবাইকে বলে গেল, ''পরানবাবু ছদ্মবেশী মহাপুরুষ।''

অনেকেরই সে কথা বিশ্বাস হল। গাঁয়ের মাতব্বর শশিভূষণ একবার পরানবাবুর খোঁড়া কুকুর ভুলুকে প্রকাশ্যে 'ল্যাংড়া' বলায় খুব রেগে গিয়ে পরানবাবু বলেছিলেন, ''দেখো নিশিবাবু, সব দিন সমান যায় না। ভুলু যদি ল্যাংড়া হয় তো তুমিও ল্যাংড়া।''

অবাক কাণ্ড হল, দিনসাতেক বাদে শশীবাবু গোয়াল ঘরের চালে লাউডগা কাটতে উঠে একটা সবুজ সাপ দেখে আঁতকে উঠে চাল থেকে পড়ে বাঁ পায়ের গোড়ালি ভাঙেন। মাসটাক তাঁকে নেংচে-নেংচে চলতে হয়েছিল।

তা সেই পরানবাবু একদিন গদাধরকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, ''তুমি যেন কে হে! মুখখানা চেনা-চেনা ঠেকছে!''

''আজ্ঞে, আমি গদাধর লস্কর। চেনা না ঠেকে উপায় কী বলুন! এই গাঁয়েই জন্ম-কর্ম, ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছেন। আপনার বাড়ির বাগান পরিষ্কার করতে কতবার গেছি, মনে নেই? পথেঘাটে হরদম দেখাও হচ্ছে।''

খুবই অবাক হয়ে পরানবাবু বললেন, ''বটে! তা তুমি করো কী হে বাপু?''

''আজ্ঞে, এই একটু চাষবাস আছে। তিন বিঘে জমিতে সামান্যই হয়।''

নাক কুঁচকে পরানবাবু বললেন, ''এঃ, মোটে তিন বিঘে! ছ্যাঃ ছ্যাঃ, ও বেচে দাও।''

''বলেন কী বাবু! বেচলে খাব কী?''

ভারী বিরক্ত হয়ে ভ্রু কুঁচকে পরানবাবু বললেন, ''খাবে? কত খাবে হে হলধর? খেয়ে শেষ করতে পারবে ভেবেছ! হুঁঃ, খাবে!''

কথাটা অনেকের কানে গেল। গাঁয়ের মুরুব্বিরা বললেন, ''ওরে গদাধর, পরান হল বাকসিদ্ধাই। যা

বলে, তাই ফলে। ভালয় ভালয় জমিজমা বেচে দে বাবা।"

শুনে ভারী দমে গেল গদাধর। শুধু একটা খ্যাপাটে লোকের কথা শুনে এরকম কাজ করাটা কি ঠিক হবে? জমি সামান্য হোক, বছর বছর সামান্য যে ফসলটুকু দেয়, জমি বেচলে যে তাও জুটবে না!

তার বউ ময়না ভারী ধর্মভীরু মেয়ে। ঘরে লক্ষ্মীর পট বসিয়েছে, ষষ্ঠী, শিবরাত্রি ব্রত-উপবাস সব করে। সেও শুনে বলল, "পরানবাবু কিন্তু সোজা লোক নয়। যা বলে তাই হয়।"

এসব শুনে ভারী ধন্দে পড়ে গেল গদাধর। তার মাথায় যথেষ্ট বুদ্ধি নেই, দূরদর্শিতা নেই, জমি চাষ করা ছাড়া আর কোনও কাজও সে পারে না। একটা পাগল লোকের কথায় ঝুঁকি নেওয়াটা ভারী আহাম্মকি হয়ে যাবে নাকি?

কিন্তু গাঁয়ের পাঁচজনের তাড়নায় আর বউ ময়নার তাগাদায় অবশেষে সে জমি বেচে এক পোঁটলা টাকা পেল। তারপর মাথায় হাত দিয়ে দাওয়ায় বসে আকাশপাতাল ভাবতে লাগল। এই ক'টা টাকা কয়েক মাসের মধ্যেই ফুরোবে। তারপর কী যে হবে! ভেবে বুক শুকিয়ে গেল তার।

বিপদ কখনও একা আসে না। জমিবেচা কয়েক হাজার টাকা বালিশের নীচে রেখে রাতে ঘুমিয়ে ছিল গদাধর। খাটিয়ে পিটিয়ে মানুষ, ঘুমটা বটে একটু গাঢ়ই হয় তার। কিচ্ছু টের পায়নি। সকালে উঠে বালিশ উলটে দেখল, তলাটা ফাঁকা। দরজার খিলও ভাঙা।

ফের মাথায় হাত দিয়ে দাওয়ায় বসে পড়ল সে।

থানা-পুলিশ করে কোনও লাভ নেই। থানা পাঁচ মাইল দূর। তার মতো চাষাভুষো থানায় এত্তেলা দিলে কেউ পুঁছবেও না। তার কাছে টাকাটা অনেক বটে, কিন্তু পুলিশ শুনে নাক সিঁটকোবে।

ময়নারও মুখ শুকিয়ে গেছে। সে মোলায়েম গলায় বলল, "ভেঙে পড়ার কী আছে। আমার লক্ষ্মীর ঘট ভেঙে দু'দিন তো চলুক।"

নুন-ভাত, শাক-ভাত খেয়ে ক'টা দিন কাটল বটে, কিন্তু তারপর আর চলছে না।

ময়না বলল, "চলো, অন্য গাঁয়ে যাই। দরকার হলে তুমি মুনিশ খাটবে। আমি লোকের বাড়িতে কাজ করব। এ গাঁয়ে ওসব করলে তো বদনাম হবে।"

"বাপ-পিতেমোর গাঁ ছেড়ে যাব?"

"তবে কি মরবে নাকি?"

কাহিল গলায় গদাধর বলল, "তাই চলো।"

পাছে কেউ দেখতে পায়, সেই ভয়ে সন্ধের পর দু'টি পোঁটলা নিয়ে দু'জন গাঁ ছেড়ে রওনা হল।

গাঁ ছেড়ে বেরোতে না বেরোতেই প্রচণ্ড কালবোশেখির ঝড় ধেয়ে এল। আকাশে ঘন বিদ্যুতের চমক, বাজ পড়ার পিলে চমকানো আওয়াজ আর তুমুল হাওয়া। দু'জনে হাত ধরাধরি করে পড়ি কি মরি ছুটতে লাগল। অন্ধকারে পথের মোটে হদিশই পেল না। শুধু টের পাচ্ছিল, হাওয়া তাদের প্রায় উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। ঝোপ, জঙ্গল, মাঠঘাট পেরিয়ে তারা দিগ্বিদিকশূন্য হয়ে ছুটছে। বৃষ্টির তোড়ে তাদের জামাকাপড়, পোঁটলাপুঁটলি ভিজে জবজব করছে। দমসম হয়ে যাচ্ছে তারা। বাতাসের শব্দে আর বাজের আওয়াজে কেউ কারও সঙ্গে কথা বলারও সুযোগ পাচ্ছে না। হাঁ করলেই মুখের কথা কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে বাতাস।

কালবোশেখির নিয়ম হল, সে বেশিক্ষণ থাকে না। আধঘণ্টা পরে ঝড় থামল, বৃষ্টি কমল। কিন্তু চারদিক ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। কোথাও কোনও আলো দেখা যাচ্ছে না।

দু'জনে একটা জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

গদাধর বলল, "এ কোথায় এলুম!"

ময়না বলল, "কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না। আমার ভয় করছে।"

জমিজমা আর টাকাপয়সা সব হাতছাড়া হওয়ায় গদাধরের আর ভয়ডর নেই। সে ময়নার হাতখানা শক্ত করে চেপে ধরে বলল, "আর ভয়টা কীসের?"

ময়না বলল, "চলো, ফিরে যাই।"

গদাধর একটা শ্বাস ফেলে বলল, "ফিরব বললেই কি ফেরা যায়? এ কোন জায়গাটায় এসে

পড়লুম তাই বা কে জানে? পথঘাট আন্দাজ করা কি সোজা? ঝড়ের ধাক্কায় অনেকটা এসে পড়েছি। চলো, দেখি একখানা গ্রাম-ট্রাম পাওয়া যায় কি না!''

অন্ধকারে ঝোপজঙ্গল ভেঙে তারা ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। গ্রাম বা লোকবসতি পেলেই যে আশ্রয় মিলবে এমন ভরসা নেই। উটকো লোককে কেই বা আদর করে ঘরে জায়গা দেয়? আজকাল যা চোর ডাকাতের উপদ্রব!

একটা জঙ্গলমতো জায়গা পেরোতেই সামনে একটা আলো দেখতে পেল গদাধর। বলল, ''ওই তো আলো দেখা যাচ্ছে! চলো, দেখা যাক, মাথা গোঁজার জায়গা মেলে কি না!''

সামনে এগিয়ে একখানা মাটকোঠা দেখা গেল বটে, তবে তার বেশ দৈন্যদশা। সামনের ঘরে একখানা হ্যারিকেন জ্বলছে। বন্ধ দরজায় খুটখুট শব্দ করে গদাধর ভারী বিনয়ের গলায় বলল, ''আমরা বড় দুঃখী মানুষ। মশাই, একটি মাথা গোঁজার ঠাঁই পাওয়া যাবে?''

ভিতর থেকে বাজখাঁই গলায় কে যেন বলে উঠল, ''ভিতরে এসো, দরজা ভেজানো আছে।''

দু'জনে ভারী জড়সড়, ভয়ে ভয়ে ভিতরে ঢুকল। ঘরের কোণে রাখা হ্যারিকেনের আলোয় দেখা গেল, সামনে একটা তক্তপোশ, তাতে গোটানো বিছানা, কয়েকটা বাক্স-প্যাঁটরা, কিছু হাঁড়িকুড়ি। কিন্তু ঘরে কেউ নেই।

গদাধর গলাখাঁকারি দিয়ে ভারী নরম সুরে বলল, "আজ্ঞে, অপরাধ নেবেন না। উৎপাত করতেই এসেছি বলতে পারেন। তবে বিপদে পড়েই আসা। আমরা বড় দুর্দশায় পড়েছি কিনা!"

কে যেন ভরাট গলায় বলে উঠল, "দুর্দশার তো কিছু দেখছি না হে! কে বলল দুর্দশায় পড়েছ? একটু হাওয়া ছেড়েছিল আর দু'ফোঁটা বৃষ্টি পড়েছে, এই তো। তা চাষিবাসিকে তো ঝড়ে-জলে কতই কাজ করতে হয়।"

"তা বটে," বলে গদাধর হাত কচলাতে কচলাতে বলল, "যদি দয়া করে একটু আশ্রয় দেন তো দাওয়াতে বসেই রাতটা কাটিয়ে দেব'খন।"

"দাওয়ায়। দাওয়ায় কেন হে? দিব্যি ঘরদোর রয়েছে, দাওয়ায় থাকবে কোন দুঃখে? ভিতরের ঘরে যাও, শুকনো কাপড়টাপড় পাবে। পরে নাও গে। উনুনে আঁচ দেওয়া আছে, খিচুড়ি চাপিয়ে দিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকো।"

ময়না ফিসফিস করে বলল, "গলা পাচ্ছি বটে, কিন্তু কাউকে দেখতে পাচ্ছি না কেন বলো তো!"

গদাধরও ভড়কে গিয়ে বলল, "তাই তো!"

ময়না বলল, "জিজ্ঞেস করো না!"

গদাধর ফের হাত কচলে বলল, "আপনি কোথা থেকে কথা বলছেন আজ্ঞে? সামনে এলে একটু পদধূলি নিতুম।"

"ও বাবা, পদধূলি বড় কঠিন জিনিস। খুঁটির গায়ে একটা হাতআয়না ঝুলছে, দেখতে পাচ্ছ?"

গদাধর ইতিউতি তাকিয়ে দেখল, ভিতরের

দরজার পাশে কাঠের খুঁটিতে একটা ছোট্ট হাতআয়না ঝুলছে বটে।

"আয়নাখানা পেড়ে ওর ভিতরে তাকাও।"

গদাধর অবাক হয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে আয়নাটা পেড়ে তুলে ধরতেই এমন আঁতকে উঠল যে, একটু হলেই সেটা পড়ে যেত হাত থেকে। আয়নার ভিতরে একখানা সুড়ুঙ্গে লম্বা মুখ। গোঁফ আছে। জুলজুলে চোখ। মাথায় বাবরি চুল। ভয়ের কথা হল, সে মুখের ঠোঁট নড়ছে আর কথা বেরিয়ে আসছে।

দু'জনের ভিরমি খাওয়ার অবস্থা।

আয়নার লোকটা বলল, "ওরে বাপু, আগে তো প্রাণ রক্ষে হোক, তারপর দাঁতকপাটি লেগে পড়ে থাকলে থেকো।"

ময়না আর গদাধর কিছুক্ষণ বাক্যহারা হয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে রইল। এর পর ময়নাই প্রথম কথা কয়ে উঠল, "আমরা বড্ড ভয় পাচ্ছি যে।"

"বলি ভয়টা কীসের, অ্যাঁ! এই জন্যই বলে, লোকের উপকার করতে যাওয়াটাই আহাম্মকি।"

গদাধর সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বলল, "না না, ওর উপর কুপিত হবেন না, আমরা না হয় ভয়ডর সব গিলে ফেলছি।"

"ভাল। টপ করে ওসব ফালতু জিনিস গিলে পেটে চালান করে দাও। দিয়েছ?"

ময়না আর গদাধর ঘনঘন ঢোক গিলে যেন একটু সামলে নিল। গদাধর বলল, "নাঃ, এখন আর তেমন বুক ঢিবঢিব করছে না। তোমার করছে ময়না?"

"নাঃ। মাথাটা একটু ঝিমঝিম করছে, এই যা!"

আয়নার লোকটা বলল, "ওতেই হবে। এখন গিয়ে রান্নার জোগাড়যন্তর করে ফ্যালো।"

গদাধর আমতা-আমতা করে বলল, "ফস করে অন্দরমহলে ঢুকব? কেউ যদি কিছু বলে?"

লোকটা হাঃ হাঃ করে হেসে বলল, "বলার মতো আছেটা কে হে? এই আমি ছাড়া এ বাড়িতে আর জনমনিষ্যি নেই। যাও যাও, ভেজা কাপড়ে বেশিক্ষণ থাকলে নিউমোনিয়া ধরে ফেলবে।"

কথা না বাড়িয়ে তারা ভিতরের ঘরে এসে দেখল, দিব্যি ব্যবস্থা। আলনায় কয়েকখানা ডুরে শাড়ি, দুটো ধোয়া ধুতি আর মোটা কাপড়ের কামিজ রয়েছে।

কুয়ো থেকে জল তুলে হাতমুখ ধুয়ে, ভেজা কাপড় বদল করে রান্নাঘরে গিয়ে দেখল, উনুনে আঁচ উঠে গেছে। চালডাল খুঁজতেই বেরিয়ে পড়ল। আলু, লঙ্কা, ফোড়ন, তেল সবই অল্পস্বল্প রয়েছে।

ময়না বলল, "হ্যাঁ গা, আয়নার জ্যাঠামশাইকে জিজ্ঞেস করো না, উনি আমাদের সঙ্গে খাবেন কি না।"

গদাধর গিয়ে আয়নাটা নিয়ে এল, তারপর সুড়ুঙ্গে মুখখানার দিকে চেয়ে কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, "আজ্ঞে, আপনি পেরসাদ করে না দিলে কোন মুখে খিচুড়ি খাই বলুন! ময়নার বড় ইচ্ছে আপনাকেও একটু ভোগ চড়ায়।"

"না হে বাপু, ওসব আমার সহ্য হয় না। আমার অন্য ব্যবস্থা আছে। তোমরা খাও।"

কী আর করা, অন্যের বাড়িতে ঢুকে এরকম রেঁধেবেড়ে খাচ্ছে বলে ভারী সংকোচ হচ্ছে তাদের। তবে খিদেও পেয়েছে খুব। তাই তারা লজ্জার সঙ্গেই পেটপুরে খেয়ে নিল।

তারপর দু'জনে ক্লান্ত শরীরে আর ভরা পেটে মড়ার মতো ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙার পর গদাধরের মনে হল, গত কাল ঝড়ে-বৃষ্টিতে পড়ে তার মাথাটাই গুলিয়ে গিয়েছিল। তাই বোধ হয় একটা আজগুবি স্বপ্ন দেখেছে। ময়নাকে ডেকে তুলে জিজ্ঞেস করতে ময়না বলল, "দু'জনে কি একই স্বপ্ন দেখতে পারে?"

"তা হলে ব্যাপারটা কী?"

"তার আমি কী জানি!"

বাইরে কে যেন "কে আছ হে! কে আছ?" বলে চেঁচাচ্ছিল। গদাধর তাড়াতাড়ি উঠে সদর দরজা খুলে দেখল, নাদুসনুদুস একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। দড়িতে বাঁধা দুটো হালের বলদ, একটা দুধেল গাই, আর-একটা হাল।

লোকটা গম্ভীর হয়ে বলল, "এই নাও ভাই, ষষ্ঠীপদর গচ্ছিত হাল-গোরু সব বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।

আর এই নাও, [illegible] ভাড়া আর দুধ বাবদ দাম। সাতশো টাকা আছে।''

গদাধর জিভ কেটে পিছিয়ে গিয়ে বলল, ''না না, ছিঃ ছিঃ, এসব আমার পাওনা নয়। আমাকে কেন দিচ্ছেন?''

লোকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ''না দিলে কি রেহাই আছে হে! ষষ্ঠীপদ ঘাড় মটকাবে। বুঝে নাও ভাই, কাল রাতেই ষষ্ঠীপদ হুকুম দিয়ে গেছে।''

''আজ্ঞে, ষষ্ঠীপদ কে বটেন?''

''কেন, পরিচয় হয়নি নাকি? বলি, সে এখন আয়নার মধ্যে ঢুকেছে বলে তো আর গায়েব হয়ে যায়নি। তার দাপটে এখনও সবাই থরহরি কাঁপে। ওই পুবে খালধারের জমিটা তোমার। দশ বিঘে আছে।''

কিছুই বুঝতে পারল না গদাধর। লোকটা চলে যাওয়ার পর গোরু আর বলদদের নিয়ে গোয়ালে বেঁধে টাকাগুলো ট্যাঁকে গুঁজে সে গিয়ে আয়নাটা পেড়ে আনল। কিন্তু দিনমানে আয়নায় আর সেই সুড়ুঙ্গে মুখখানা দেখা গেল না। নিজের বোকা-বোকা হতভম্ব মুখখানাই দেখতে পেল সে।

এর পর আর-একজন রোগাপানা লোক এসে হাজির। সঙ্গে মুটের মাথায় দুটো ভরা বস্তা।

''এই যে ভায়া, আমি হচ্ছি শ্যামাপদ মুদি। দু'বস্তা চাল দিয়ে গেলুম। ষষ্ঠীপদর হুকুম তো আর অমান্যি করতে পারি না। এই দু'বস্তাই পাওনা ছিল তোমাদের। আর এই হাজারটা টাকা।''

গদাধর কথা কইতে পারছে না। কেবল ঢোক গিলছে। জিভ, টাগরা সব শুকনো।

একটু বেলার দিকে একজন বউমানুষ এসে পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে সোজা ময়নার কাছে হাজির। একটা পোঁটলা খুলে কিছু সোনার গয়না বের করে বলল, ''নাও বাপু। তোমার জিনিস বুঝে নাও। মোট আট গাছা সোনার চুড়ি, বাঁধানো নোয়া, বিছেহার, এক জোড়া বালা আর ঝুমকো দুল।''

ময়না অবাক হয়ে বলল, ''এসব আমার হবে কেন?''

''তা জানি না, ষষ্ঠীপদ গচ্ছিত রেখেছিল। এখন হুকুম হয়েছে, তাই দিয়ে যাচ্ছি।''

''কিন্তু আমি তো ষষ্ঠীপদবাবুকে চিনিই না।''

''চিনবে বাপু, এ গাঁয়ে থাকলে তাকে না চিনে উপায় আছে? তা তোমাদের কপাল ভাল যে, তার নেকনজরে পড়েছ। তার ভয়ে আমরা কাঁটা হয়ে থাকি কিনা।''

সারাদিনে আরও অনেকে এসে অনেক জিনিস দিয়ে গেল। কেউ দা আর কুড়ুল, কেউ শীতলপাটি, কেউ কুয়োর বালতি আর কাঁটা, কেউ কাঠের টুল, কেউ বাসনকোসন বা কড়াই আর হাতা, এমনকী একগাছ ঝাঁটা অবধি। সবই নাকি ষষ্ঠীপদর গচ্ছিত রাখা জিনিস।

গদাধর আর ময়নার দিশেহারা অবস্থা। গরিব হলেও তারা লোভী লোক নয়। এসব জিনিস তাদের ঘরে ছিল না। তার উপর ষষ্ঠীপদর রহস্যটাও তাদের মাথায় সেঁধোচ্ছে না।

খুব ভাবনাচিন্তার মধ্যেই দিনটা কাটল তাদের। সন্ধে হতেই হঠাৎ সেই বাজখাঁই গলা, ''সব জিনিস ফেরত দিয়ে গেছে তো?''

গদাধর তাড়াতাড়ি আয়নাটা পেড়ে দেখল, সেই সুড়ুঙ্গে মুখ। কাঁপা গলায় বলল, ''এসব কী হচ্ছে বলুন তো মশাই? আমরা যে কিছুই বুঝতে পারছি না।''

লোকটা ধমক দিয়ে বলল, ''বেশি বুঝবার দরকার কী তোমার? কাল থেকে তেঁতুলতলার জমিতে হাল দিতে শুরু করো।''

''আমরা কি তবে এখানেই থাকব?''

''তবে যাবে কোন চুলোয়?''

ময়না পিছন থেকে ফিসফিস করে বলল, ''ওগো, রাজি হয়ে যাও।''

গদাধর গদগদ হয়ে বলল, ''যে আজ্ঞে!''

২ মার্চ ২০০৭
অলংকরণ: নির্মলেন্দু মণ্ডল

ড্রাগন-লুডো

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর বনবাংলোর সামনের লনটায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল তিন বন্ধু। রনি, পিকলু আর জোজো। চৌকিদার কাছেই থাকে, এইমাত্র বাড়ি গেল সে। ফিরবে কাল সকালে। বাংলোর এই চত্বরটায় তারা তিনজন ছাড়া এখন আর কেউ নেই।

সাতকোশিয়ার এই জঙ্গলে পৌঁছতে তিন বন্ধুকে ঘাম ঝরাতে হয়েছে বিস্তর। সেই কাল রাত্তিরে হাওড়া থেকে ট্রেন ধরে সকালে কটক, একপেট শিঙাড়া-জিলিপি সাঁটিয়ে বাসে চেপে চার ঘণ্টা পর আঙুল। ছোট্ট জমজমাট শহরটায় একে-ওকে-তাকে জিজ্ঞেস করে খুঁজে বের করতে হল বনদপ্তরের অফিস। সরকারি কাগজপত্র নিয়ে মধ্যাহ্নভোজন সেরে ফের বাস। অবশেষে ওড়িশার এই জঙ্গলটায় তিন মূর্তি যখন এসে নামল, সূর্য ডুবে গিয়েছে, সন্ধে প্রায় হয়-হয়।

তবে হ্যাঁ, পরিশ্রম সার্থক। জায়গাটায় এসে প্রাণ জুড়িয়ে গিয়েছে। তিন দিক জঙ্গল দিয়ে ঘেরা বনবাংলোটি পাহাড়ের একদম প্রান্তে। অনেক নীচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মহানদী। আধো অন্ধকারে নদী তেমন দেখা গেল না বটে, তবে তার কলকল অতি স্পষ্ট। এমন চমৎকার নিসর্গ ভাল না লেগে পারে?

অভ্যর্থনাও এখানে মন্দ হয়নি। থাকার ঘরটি বেশ পছন্দসই। আছে চার-চারখানা সিঙ্গল খাট, আলমারি, আয়না, চেয়ার, একটা বড়সড় টেবিল...। লাগোয়া বাথরুমও আছে। আর দেখভাল করার চৌকিদারটি তো ম্যাজিক জানে। ঘরে ঢুকে স্নান সেরে তরতাজা হতে না হতেই সে একথালা পেঁয়াজি আর আলুর চপ নিয়ে হাজির। রাতেও দারুণ মুরগি বানিয়েছিল। কষা-কষা, ঝাল-ঝাল। ঠিক যেমনটা রনি-পিকলু-জোজো পছন্দ করে। লোভে পড়ে আট-দশটা করে রুটি খেয়ে ফেলেছে এক-একজন, পেট এখন একেবারে আইঢাই।

সেই হাঁসফাঁস ভাব কাটাতেই চলছে এখন পদচারণা। উত্তেজনাতেও ফুটছে তিনজন। সবে হায়ার সেকেন্ডারি দিয়ে জীবনে এই প্রথম শুধু বন্ধুরা মিলে বেড়ানোর ছাড়পত্র পেয়েছে। তাদের খুশি যেন আর ধরছে না। তার উপর এমন এক রোমাঞ্চকর পরিবেশ! চারদিকে ছমছম করছে অন্ধকার, লাখ-লাখ ঝিঁঝিপোকার ডাক, অসংখ্য জোনাকি জ্বলছে-নিভছে, বৈশাখের বাতাস শিরশির শব্দ তুলছে জঙ্গলে। গাঢ় নীল আকাশে ঝকঝকে তারার মেলা। এমনটি তারা আগে কখনও দেখেইনি।

পিকলু তো আনন্দে গান গেয়ে উঠল। রনিও গলা মিলিয়েছে। জোজো কোত্থেকে একটা শুকনো ডাল কুড়িয়ে নিয়েছিল। সেটাকে ঘোরাচ্ছে তলোয়ারের ভঙ্গিতে। হঠাৎ বলে উঠল, ''অ্যাই, এখন একটা অভিযান চালাবি?''

গান থেমেছে। পিকলু জিজ্ঞেস করল, ''কোথায়?''

''জঙ্গলে। চল, টর্চ নিয়ে একটা পাক খেয়ে আসি।''

''এই রাতদুপুরে? হেঁটে হেঁটে? মাথা খারাপ?'' রনি চোখ ঘোরাল, ''শুনলি না, চৌকিদার কী বলে গেল। হাতি, বুনো শুয়োর, ভল্লুক, কোনও কিছুর

কমতি নেই এই সাতকোশিয়ায়। বাঘও নাকি আছে দু'-চার পিস।''

''সো হোয়াট? চোখে আলো ফেললে জন্তু-জানোয়ার কাছে ঘেঁষে না, আমি জানি।''

''তোর বই-পড়া জ্ঞান বন্ধ রাখ।'' পিকলু ফোড়ন কাটল, ''ভুলে যাস না, অন্ধকারে সাপখোপও বেরোয়।''

''হ্যাঁ, এটা একটা যুক্তি বটে। টর্চ মেরে সাপকে বাগে আনা যাবে না।'' জোজো মাথা নেড়ে বলল, ''তা হলে নদীর পারে নামি চল। পাথর বেয়ে বেয়ে।''

''অসম্ভব। অন্ধকারে পা পিছলে হাড়গোড় ভাঙি আর কী!'' পিকলু অন্য প্রস্তাব দিল, ''তার চেয়ে বরং রুমে গিয়ে তাস খেলি। ব্রে, দেখি কে আগে গাধার ডাক ডাকে!''

কথাটা রনি-জোজোরও মনে ধরেছে। কিন্তু ঘরে এসে কপালে হাত। যাঃ, তাসের প্যাকেট আনাই হয়নি।

রনি বেজার মুখে বলল, ''তা হলে আর কী, আড্ডাই হোক। আমি তোদের একটা জব্বর ভূতের গল্প শোনাতে পারি।''

জোজো তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, ''ধুৎ, ভূতে আমার ইন্টারেস্ট নেই। আমি ভূত বিশ্বাসই করি না।''

''সে তো আমরাও করি না। তা বলে গল্প শুনতে দোষ কী? চারদিক শুনশান, ঘরে হ্যারিকেন জ্বলছে, ভূত কিন্তু এখন জমবে ভাল।''

''অবাস্তব গল্প শুনবই না। তার চেয়ে শুয়ে পড়া ঢের ভাল। কাল তা হলে কাকভোরে উঠে বেরোতে পারব।''

অগত্যা বিছানায় লম্বা হওয়ার তোড়জোড়। পিকলু আর জোজো মশারি টাঙাচ্ছিল, হঠাৎই রনি চেঁচিয়ে উঠল, ''এই দেখ, এখানে কী রয়েছে!''

অবাক হওয়ার মতোই জিনিস বটে। টেবিলের ড্রয়ারে বড়সড় সাইজের একখানা লুডোর বোর্ড! ঘুঁটি-ছক্কাও মজুত সঙ্গে।

ব্যস, আর তিন মূর্তিকে পায় কে। বসে গেল লুডো নিয়ে। বোর্ডটা একটু অদ্ভুত, শুধু সাপলুডোই আছে। উঁহু, ঠিক সাপও নয়, সাপগুলোর মুখ অনেকটা যেন ড্রাগনের মতো। লেজের কাছটাও কাঁটা-কাঁটা। মইয়ের বদলে ছোট-বড় গাছ। ছবিগুলো আঁকাও হয়েছে ভারী নিপুণ হাতে। কেমন জ্যান্ত-জ্যান্ত দেখায়!

চালু হয়ে গিয়েছে খেলা। টপাটপ ছক্কা গড়াচ্ছে বোর্ডে। টুপটুপ এগোচ্ছে ঘুঁটি। গাছের ঘরে দান পড়তে সাঁই উপরে উঠে গেল, সাপের মুখে পড়ে সাঁৎ নেমে এল লেজে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দারুণ জমে গেল খেলা। বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে বোর্ডের উপর প্রায় ঝুঁকে পড়েছে তিন মূর্তি।

তখনই শুরু হল ঘটনাটা।

হঠাৎই একটা রাতচরা পাখি ডেকে উঠল। কাছেই আওয়াজটা এত জোর, মনে হল যেন ঘরেই ঢুকে পড়েছে পাখিটা। মুহূর্তের জন্য চমকেছিল তিন খেলুড়ে, পরক্ষণে ফের মন দিয়েছে ঘুঁটিতে। পিকলু বোর্ডে ছক্কা গড়িয়ে দিয়ে বলল, ''পাঁচ পড়েছে। এবার আমি বড় গাছ বেয়ে টঙে যাব।''

জোজো খপ করে ছক্কাটা তুলে ভরে নিয়েছে কলকেতে। ভুরু কুঁচকে বলল, ''কোথায় পাঁচ! তোর তো তিন পড়েছিল!''

রনিও সঙ্গে-সঙ্গে সায় দিয়েছে, ''হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমিও স্পষ্ট তিন দেখেছি।''

পিকলু অবাক মুখে বলল, ''যাঃ বাবা, আমি কি মিথ্যে বলছি?''

''সে তুইই জানিস।''

''তুই পড়েছিস ড্রাগনের মুখে। যা, একদম নীচে চলে যা।''

অগত্যা পিকলুকে মেনে নিতেই হয়। তিনজনের দু'জন যখন বলছে, সে নিজেই নিশ্চয়ই ভুল দেখেছে। ড্রাগনের লেজে নেমে এল পিকলুর নীল ঘুঁটি।

এবার জোজোর দান। কলকে নেড়ে ফেলেছে ছক্কা। উল্লসিত স্বরে বলল, ''আমার পড়েছে চার। গাছে চড়ব আমি। সোজা তিরানব্বইতে পৌঁছে যাব।''

ছক্কাটা কলকেতে ভরে রনি বলল, ''তুইও

পিকলুর **মতো গুল মারছিস?** [illegible]
বলছিস চার?''

পিকলু ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, ''কেন চালাকি করছিস জোজো? দেখাই তো গেল দুই পড়েছে!''

''এটা কিন্তু তুই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বলছিস।'' জোজো তেতে গেল, ''আমি ভুল দেখতেই পারি না।''

''বললেই হল? তুই তো ইচ্ছে করে ভুল দেখছিস।''

''চালাকি ছাড়ো চাঁদু। সুড়সুড় করে ড্রাগনের মুখে যাও।''

জোজো নেমে এল বটে, তবে গজগজ করছে, ''এটা কিন্তু অন্যায় হল, এটা কিন্তু অন্যায় হল...''

হ্যা-হ্যা হেসে রনি কলকে নাড়ল জোরে জোরে। ছক্কা চেলে বলল, ''হুররে, পুট পড়েছে। এবার আমি সাঁইসাঁই উপরে উঠব।''

পিকলু ছক্কাটা পুরে নিল কলকেয়। বাঁকা সুরে বলল, ''তুইও জোজোর লাইন ধরলি? পড়ল তিন, আর বলছিস এক?''

জোজো আঙুল নেড়ে বলল, ''নো চালাকি রনি। তিনকে তুই এক বানিয়ে দিলি?''

রনি দপ করে জ্বলে উঠল, ''চালাকি তো তোরা করছিস! নিজেদের চালাকি ধরা পড়ে গিয়েছে তো, তাই এখন আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা।''

পিকলু গরগর করে উঠল, ''একদম বাজে বকবি না। প্ল্যান করে তোরা আমাকে হারাতে চাইছিস।''

''শাটআপ।'' জোজো হুংকার দিয়ে উঠল, ''মোটেই আমাকে জড়াবি না। তোরাই প্ল্যান করে আমাকে ডাউন দিচ্ছিস।''

''অ্যাঅ্যাহ, চুরি করে আবার তেজ দেখো! হাজার বার বলব, তুই, রনি দু'জনেই চালাকি করছিস।''

''চোপ, চোপ। তুই একটা চাতুরির মন্ত্রী, আর জোজো শয়তানির রাজা!''

''মুখ সামলে, রনি। আমি কিন্তু তোর দাঁত ভেঙে দেব।''

''আমার হাত নেই? আমি চালাতে জানি না?''

''ভেবেছিস কী, অ্যাঁ? দুটোকেই **এমন মারব না।**''

ব্যস, বেধে গেল ধুন্ধুমার। যে যাকে পারছে হাত চালাচ্ছে। রনির পাঞ্চ খেয়ে ঘরের কোণে ছিটকে পড়ল পিকলু। কোনওক্রমে উঠে ষাঁড়ের মতো তেড়ে গিয়ে জোজোর পেটে লেফট হুক মারল একখানা। জোজোর আপার কাটে রনি বিছানায় চিৎপাত। চুলের মুঠি ধরে তাকে টেনে তুলল পিকলু। রনি এলোপাথাড়ি ঘুসি ছুড়ছে অবিরাম।

জোজো একখানা রামগাঁট্টা মারল পিকলুর চাঁদিতে। সঙ্গে রনিকে ছেড়ে জোজোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে পিকলু। বক্সিংয়ের পর এবার মল্লযুদ্ধ। কে যে কখন কাকে ধরাশায়ী করছে, বোঝে কার সাধ্যি!

হঠাৎই আবার সেই রাতচরা পাখির ডাক। আওয়াজটা এবার আরও আজব, যেন খ্যাকখ্যাক হাসছে। থেমেও গেল ঝুপ করে। অমনি চরাচর পলকে নিঝুম।

কী কাণ্ড, দক্ষযজ্ঞও স্তব্ধ সহসা। তিন যুযুধান নিশ্চুপ কয়েক পল। খানিক পরে রনি মিনমিন করে উঠেছে, "এই, আমরা মিছিমিছি মারামারি করছিলাম কেন রে?"

পিকলু কাতর গলায় বলল, "আমি জীবনে কোনও দিন কারওর সঙ্গে ঝগড়া করিনি... আজ আমিই কিনা তোদের গায়ে হাত তুললাম!"

জোজোর স্বরও করুণ, "ছি ছি, খুব খারাপ কাজ হল। শেষে কিনা সামান্য লুডো খেলা নিয়ে মারপিট!"

অনুতপ্ত তিন বন্ধু বসল যে যার খাটে। আফসোস চলছে কৃতকর্মের জন্য। পিকলু বলল, "হঠাৎ আমাদের মাথা খারাপ হয়ে গেল কেন বল তো?"

জোজো বলল, "এই ড্রাগনমার্কা বোর্ডটাই যত নষ্টের মূল।"
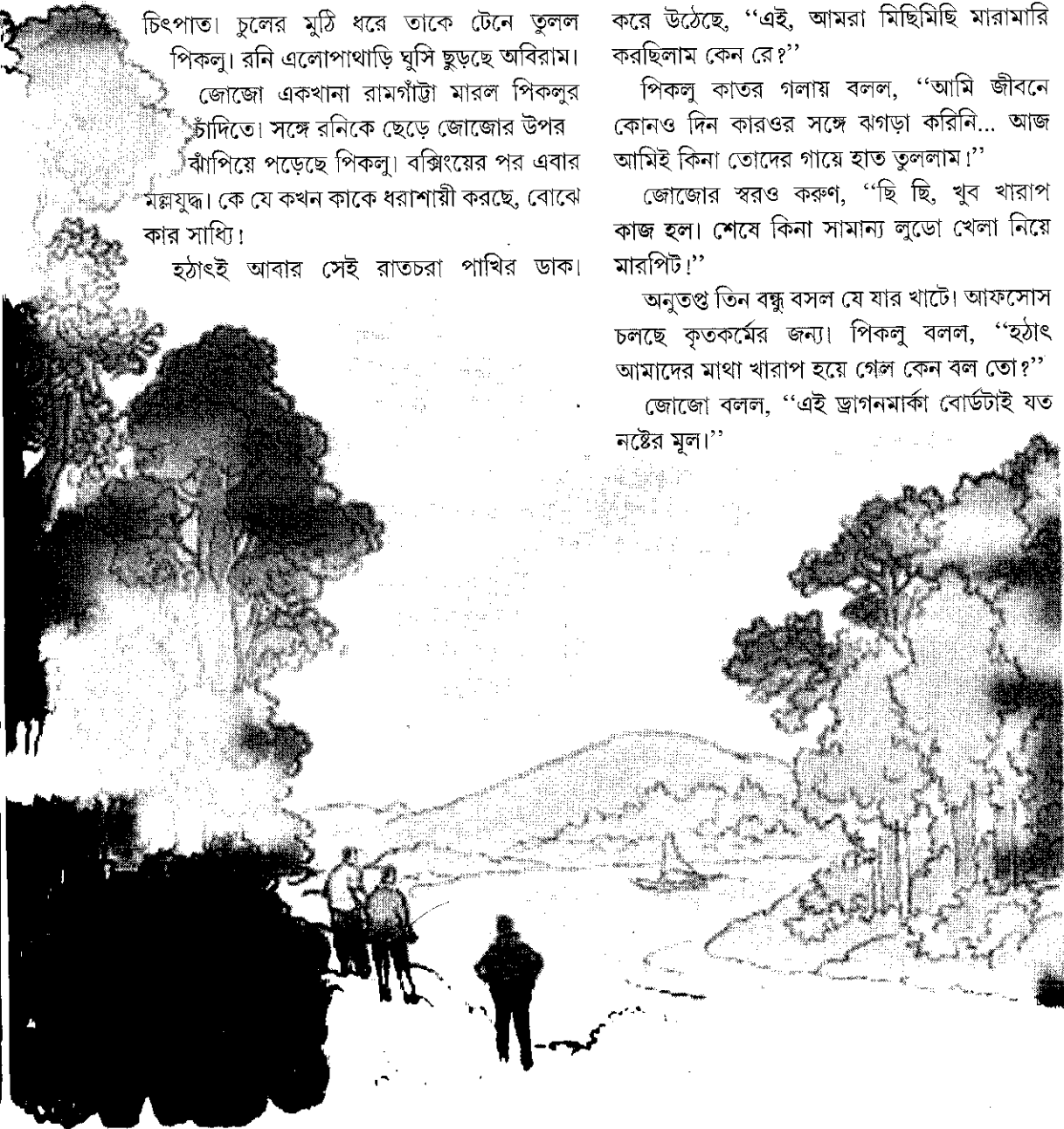
রনিও একমত, ''নিশ্চয়ই ওই বোর্ডটার কোনও অশুভ শক্তি আছে। ছক্কা আর ঘুঁটিগুলোরও।''

''যা বলেছিস! কিছু একটা গড়বড় আছেই। নইলে আমরা তিনজনই ভুলভাল দেখা শুরু করলাম কেন?''

''ওটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলা যায় না?''

''খুব যায়।''

ভাবামাত্র কাজ। জোজো গিয়ে হেঁচকা টানে দু'টুকরো করেছে বোর্ড। রনি আর পিকলুও ছিঁড়ছে মহোৎসাহে। ঘুঁটিগুলোকেও মটমট করে ভাঙল, প্লাস্টিকের কলকেটা পিষল পায়ে। ছক্কার ফুটকিগুলো নখ দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মুছে দিল। তারপর সবসুদ্ধু জানলার বাইরে ছুড়ে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল তিন সঙ্গী।

বিছানায় পড়তে না পড়তেই ঘুম। পরদিন সকালে যখন ঘুম থেকে উঠল, শরীর-মন ঝরঝরে, তাজা। এমনকী গা-হাত-পায়েও এতটুকু ব্যথা নেই। দাঁত-টাঁত মেজে তিন মূর্তি বেরিয়েছে ঘরথেকে। দিনের আলোয় বাংলোর লন থেকে নদী দেখে তারা তো মুগ্ধ। বেশ চওড়া নদী, স্রোতও আছে, জলটাও ভারী টলটলে। নদীর ওপারেও পাহাড়, জঙ্গল। দুই সবুজ পাহাড়ের মধ্যিখান দিয়ে বয়ে চলা মহানদীতে নৌকোও চলছে দিব্যি। খানিক গিয়ে বাঁক নিয়েছে নদী, ওপারের পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে গিয়েছে।

তিন বন্ধু বেশ কিছুক্ষণ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করল দৃশ্যটা। চৌকিদার এসে গিয়েছে বহুক্ষণ, আলুপরোটা রেডি, গপাগপ খেয়েই ছুটেছে পাশের কুমিরপ্রকল্প দর্শনে। নানান সাইজের মেছোকুমির আছে খাঁচায়। এদের নাম যে ঘড়িয়াল, তাও জানা হয়ে গেল। পিকলু ক্যামেরা এনেছে, ছুঁচলোমুখ ঘড়িয়ালদের ফোটো তুলল পটাপট। তারপর মহানদীতে হুটোপুটি করে স্নান। বাংলোয় ফিরে চৌকিদারের রাঁধা সুস্বাদু ডিমের ঝোল, ভাত খেয়ে আবার হইহই করে ঘুরতে বেরনো। এবার অরণ্যে।

হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা ভিতরে চলে গিয়েছিল তিনজনে। যত এগোয়, ততই যেন টানে জঙ্গল। দু'ধারে শাল, সেগুন, শিমুল, মহুয়া, জারুল, আরও কত নাম না জানা গাছের ভিড়। অচেনা এক বুনো গন্ধে ম ম করছে বাতাস। পাতা ঝরছে টুপটাপ। মাঝে-মাঝে পিকপিক ডেকে উঠছে পাখি। বাকি সময়টা বন অদ্ভুত রকমের নিস্তব্ধ। কোথাও চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়লেই গায়ে যেন কাঁটা দেয়। মনে হয়, জঙ্গলের প্রাণীরা যেন তাদের আড়াল-আবডাল থেকে দেখছে।

জীবজন্তুর দেখা অবশ্য মিলল না বিশেষ। ওয়াচ টাওয়ারে উঠে দুটো-চারটে হরিণ দেখে ফিরতে হল। যাকগে যাক, বাঘ-ভল্লুক নয় নাই দেখা হল, জঙ্গল ভ্রমণের শিহরণ বা মন্দ কী!

সন্ধেবেলা বাংলোয় ফিরে শুরু হয়েছে আড্ডা। সারা দিনের স্মৃতি রোমন্থন। ডিজিট্যাল ক্যামেরায় তোলা ফোটোগুলো দেখাচ্ছিল পিকলু, পুটুস-পুটুস মন্তব্য করছিল রনি আর জোজো। রাত ন'টা নাগাদ চৌকিদার খেতে ডাকল। আহারপর্ব শেষ হওয়ার পরে কালকের মতোই চলে গেল চৌকিদার।

আবার বাংলোয় শুধু তারা তিনজন। রনি, পিকলু, জোজো। আর আছে ছমছমে অন্ধকার। ঝিঁঝিঁপোকার ডাক। লক্ষ-লক্ষ জোনাকি। নদীর কুলকুল শব্দ। এবং বিদ্যুৎহীন ঘরে হ্যারিকেনের টিমটিমে আলো।

খানিকক্ষণ বাংলোর লনে ফুরফুরে হাওয়া খেয়ে ঘরে এসেছে তিন বন্ধু। ঢুকেই জোজো বলল, ''কাল সকালেই তো ফেরা, আজ এখন কী করা যায়?''

রনি বলল, ''সেই ভূতের গল্পটা বলি? দারুণ ইন্টারেস্টিং। আমার কাকা যখন অসমে ছিলেন...''

কথার মাঝখানেই হঠাৎ টেবিলের সামনে থেকে চেঁচিয়ে উঠল পিকলু, ''অ্যাই রনি, অ্যাই জোজো, এদিকে আয়।''

দৌড়ে গেল দু'জনে। পিকলু টেবিলের ড্রয়ারটা খুলেছিল, ভিতরে চোখ পড়তেই কেঁপে উঠল রনি, জোজো।

কালকের সেই লুডোর বোর্ডটা। ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলে দেওয়ার পরেও আবার সেটা বিরাজ করছে স্বস্থানে। ঘুঁটি, কলকে, ছক্কা সমেত।

জোজো অস্ফুটে বলল, ''এটা কী করে সম্ভব?''

পিকলু কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, ‘‘আমিও তো তাই ভাবছি।’’

রনি বলল, ‘‘ছুঁস না ওটাকে। ধরিস না।’’

তবু কী যেন ঘটে গেল। সম্মোহিতের মতো বোর্ডটা হাতে তুলে নিয়েছে জোজো। ফিসফিস করে বলল, ‘‘চল না, খেলি।’’

পিকলু বিড়বিড় করে বলল, ‘‘খেললে হয়।’’

রনির ঠোঁট নড়ল, ‘‘খোল তবে। শুরু কর।’’

ড্রাগন-লুডোয় ফের মেতেছে তিন বন্ধু। তাদের ছায়া পড়েছে দেওয়ালে। ছায়াগুলো তিরতির করে কাঁপছে।

ঠিক তখনই রাতচরা পাখিটা আবার ডেকে উঠল বিশ্রীভাবে। হুবহু কালকের মতো!

২ মার্চ ২০০৭
অলংকরণ: দেবাশিস দেব

মাধবীকুঞ্জ

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

ছোট্ট একফালি স্টেশন বড়ডিহা। ড্রাইভার যদি অন্যমনস্ক থাকেন, সম্ভাবনা আছে স্টেশন ছেড়ে এগিয়ে যাওয়ার। এখন তা হল না। প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে কম্পার্টমেন্টের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছিলেন বিকাশবাবু। প্ল্যাটফর্ম এতটাই নিচু, সিঁড়ি শেষ হওয়ার পর খানিকটা লাফাতে হল।

ট্রেনটি বেশি সময় নষ্ট করল না এখানে। হুইসল দিতে দিতে এগিয়ে চলল। এখন মাঝদুপুর। চারপাশটা ফাঁকা বলেই রোদে মিশে আছে চোরা ঠান্ডা। কলকাতায় এবার তো শীতের নামগন্ধ নেই। বড়ডিহার আবহাওয়ায় বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে বিকাশবাবু প্ল্যাটফর্মের চার দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন। তাঁর মতো শহুরে কাউকে দেখছেন না। প্যাসেঞ্জার বলতে সকলেই গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা। মাথায় কাঠকুটোর বোঝা, হাতে ছাগল বাঁধা দড়ি, কারওর কাঁধে পুঁটুলি... ধীরে ধীরে স্টেশন ছেড়ে রেললাইন ডিঙিয়ে মাঠে নেমে যাচ্ছে তারা। বিকাশবাবু এখন কাকে জিজ্ঞেস করবেন 'মাধবীকুঞ্জ' বাড়িটি কোথায়?

দুশ্চিন্তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। বিকাশবাবু দেখলেন, টিকিট ঘর থেকে বেরিয়ে একটি লোক হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসছেন। চেকার নিশ্চয়ই। এঁর থেকেই জেনে নিতে হবে ঠিকানা। পকেট থেকে টিকিট বের করলেন বিকাশবাবু। ভদ্রলোক দূর থেকেই বললেন, "হয়েছে, হয়েছে। বের করতে হবে না। চেহারা দেখেই বোঝা যায়, কে টিকিট কেটেছে, কে কাটেনি।"

বিকাশবাবু খুব খুশি হলেন ভদ্রলোকের আপ্যায়নে। বড়ডিহায় মনে হচ্ছে ক'দিন খারাপ কাটবে না। মানুষটি সামনে এসে বললেন, "আমি হচ্ছি এই স্টেশনের সিগনালম্যান কাম বুকিং ক্লার্ক কাম স্টেশনমাস্টার কাম চেকার, এটসেট্রা এটসেট্রা। এখন বলুন, যাবেন কোথায়? অফিসঘরে বসে আপনাকে দেখছিলাম ঠিকানা জানার জন্য লোক খুঁজছেন।"

বিকাশবাবু নিজের গন্তব্য বললেন। একবারেই চিনতে পারলেন ভদ্রলোক। বললেন, "মাধবীকুঞ্জ, মানে পরিমল চৌধুরীর বাড়ি তো?"

ঘাড় হেলিয়ে হ্যাঁ বলে নিশ্চিন্ত হলেন বিকাশবাবু। স্টেশনমাস্টার বললেন, "হাঁটতে হবে অনেকটা। এখানে রিকশা, ভ্যানগাড়ি কিছুই পাবেন না। একটা লোকও দিতে পারব না, যে আপনার ব্যাগ বয়ে দেবে।"

"দরকার নেই। এই একটা লাগেজ আমি একাই বইতে পারব। কাইন্ডলি রাস্তার ডিরেকশনটা যদি বলে দেন।" বললেন বিকাশবাবু।

স্টেশন চত্বরের বাইরে আঙুল দেখালেন ভদ্রলোক। বললেন, "ওই সোজা রাস্তাটি ধরে আধ ঘণ্টা হাঁটতে হবে। পৌঁছবেন ন্যাশনাল হাইওয়েতে। বাঁ দিক ধরে আরও মিনিট পনেরো হাঁটা। ওখানেই দেখবেন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বেশ কিছু একতলা পাকা বাড়ি। শহরের মানুষ শখে বাড়ি বানিয়ে তালা মেরে রেখেছেন। একমাত্র পরিমলবাবুই অনেক দিন ধরে আছেন। আপনি পরিমলবাবুর কে হন?"

"হ্যাঁ সেই স্কুলবেলা থেকে।" বললেন বিকাশবাবু।

"আগে কখনও এখানে আসেননি, না? খবরটা পেয়েই এলেন?"

স্টেশনমাস্টারের কথায় হোঁচট খেলেন বিকাশবাবু। ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, "কোন খবরটার কথা বলছেন?"

"বউদির চলে যাওয়া।" মন খারাপের গলায় বললেন ভদ্রলোক।

"মানে?" ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট করে জানতে চাইলেন বিকাশবাবু।

স্টেশনমাস্টার বললেন, "ও, আপনি বুঝি জানেন না! তা হলে তো খুব খারাপ লাগবে শুনে। পরিমলবাবুর স্ত্রী এক মাস হল মারা গিয়েছেন।"

শুনেই বুকটা হায়-হায় করে উঠল বিকাশবাবুর। বললেন, "সে কী? কেন, কী হয়েছিল?"

"ম্যালেরিয়া। খুব খারাপ ধরনের। দু'দিনের জ্বরে চলে গেলেন। সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সুযোগই পাওয়া যায়নি।"

বিকাশবাবুর মন এতটাই দমে গেল, ভাবলেন জিজ্ঞেস করবেন, কলকাতায় ফেরার ট্রেন ক'টায়? কিন্তু ফিরে গেলে এই মানুষটি পরিমলের কানে ঠিক তুলে দেবেন, কলকাতার এক বন্ধু বড়ডিহায় এসেও ফিরে গিয়েছেন। চেহারার বর্ণনা দিলে বাল্যবন্ধুকে চিনতে অসুবিধে হবে না পরিমলের।

স্টেশনমাস্টার হাঁটছেন। সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন বিকাশবাবু। মাস্টারমশাই কথা বলার লোক পান না। তাই কথা বলে চলেছেন প্রাণ খুলে, "আমরা তো ভেবেছিলাম, বউদি মারা যাওয়ার পর পরিমলদা এখানকার বাড়ি বিক্রি করে চলে যাবেন। উনি অসুস্থ মানুষ, এখানে ওঁকে দেখবে কে? কিন্তু গেলেন না। দিব্যি কাজের মানুষের ভরসায় থেকে গেলেন। আসলে ভালবেসে ফেলেছেন জায়গাটা। না বেসেও উপায় নেই, এত শান্তশিষ্ট প্রকৃতি..." কথা বলতে বলতে বেখেয়ালে স্টেশনমাস্টার রাস্তায় এসে পড়েছেন।

বিকাশবাবু বললেন, "এবার আমি যেতে পারব। আপনাকে তো পরের ট্রেনের সিগনাল দিতে হবে।"

"ও হ্যাঁ, তাই তো।" বলে স্টেশনের দিকে ঘুরে গিয়ে হাঁটা দিলেন মাস্টারমশাই।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বিকাশবাবু চলেছেন বন্ধুর বাড়ি। এখানকার প্রকৃতি সত্যিই বড় মনোরম। লাল মাটির চওড়া রাস্তা। কিছু দূর অন্তর বড় বড় গাছ। দূরে খেতজমি, মাটি নিকনো কুঁড়েঘর। আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে আছে আবছা টিলা। কিন্তু কোনও কিছুই বিকাশবাবুর মনটাকে চাঙা করতে পারছে না। অনেক উৎসাহ নিয়ে এসেছিলেন পরিমলবাবুর কাছে। ক'টা দিন প্রচুর আড্ডা মেরে কাটাবেন। বন্ধুর স্ত্রী মাধবীও খুব হাসিখুশি, গল্প-বলিয়ে মেয়ে। আসর জমাতে ওঁর জুড়ি মেলা ভার। অদৃষ্টের এমনই পরিহাস, বন্ধুকে এখন সান্ত্বনা দিতে যেতে হচ্ছে।

বড়ডিহায় আসার ইচ্ছে অনেক দিন ধরেই ছিল। পরিমল বহুবার চিঠি লিখে আসতে বলেছেন। সময় করে উঠতে পারছিলেন না বিকাশবাবু। চাকরিতে উঁচু পদে ছিলেন। কাজের ভীষণ চাপ। এক মাস হল রিটায়ার করেছেন। ভাবছিলেন, কোথাও ঘুরে এলে হয়। মনে পড়ে গেল পরিমলের কথা।

বিকাশবাবু বিয়ে-থা করেননি। দাদার সংসারে ভাইপো ভাইঝিদের নিয়ে থাকেন। বাড়িতে বলেছেন, "বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি। ক'দিন পর ফিরব, বলা যাচ্ছে না।"

ভাইপো বলেছে, "যাও, ঘুরে এসো। রিটায়ার্ড লাইফের এটাই তো মজা।"

কিন্তু মন বলছে, টুরটা বেশি দিনের হবে না। পরিমলের বুকে এখন শোকের পাথর। কেন যে এখনও এখানে পড়ে আছে কে জানে! কলকাতায় ওদের পৈতৃক বাড়ি। যৌথ সংসার। পরিমল অনায়াসে ওখানে গিয়ে থাকতে পারে। বড়ডিহায় পরিমল এসেছিল শরীর সারাতে। চাকরি করতে করতে স্ট্রোক হয়েছিল পরিমলের। শরীরের এক সাইড প্যারালিসিস হয়ে যায়। বেশ কয়েক মাস ফিজিওথেরাপি করার পর হাঁটাচলা শুরু করে। শুধু বাঁ হাতটি অকেজো হয়ে যায়। ওই অবস্থায় পরিমল,

মাধবী হাওয়া বদল করতে আসে বড়ডিহায়। এতই ভাল লেগে গেল এখানকার জলহাওয়া, তাই বাড়ি কিনে থেকে গেল বরাবরের মতো। পরিমলের পয়সাকড়ির অভাব নেই। নামী উকিল ছিল। ছেলে ডাক্তার হয়ে এখন আমেরিকায়। শেষ জীবনটা স্বামী-স্ত্রী মিলে শান্তিতে প্রকৃতির কোলে কাটিয়ে দেবে ভেবেছিল। হল না। বড্ড তাড়াতাড়ি চলে গেল মাধবী।

একথা সেকথা ভাবতে ভাবতে বিকাশবাবু কখন যেন পৌঁছে গেলেন গন্তব্যে। বেশ বড় বাগান, বারান্দা নিয়ে একতলা বাড়ি। গেটের থামে 'মাধবীকুঞ্জ' নামটি পাথরে বাঁধানো। বিকেলের ঢলে পড়া হলুদ রোদে বাড়িটি বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।

গেট খুলে হেঁটে গেলেন বিকাশবাবু। বারান্দায় উঠে দরজায় টোকা মারলেন। ভিতর থেকে গলা ভেসে এল পরিমলের, ''কে?''

''আমি।'' বলতে গিয়ে গলা কেঁপে গেল বিকাশবাবুর। কত দিন পর দেখা হবে বন্ধুর সঙ্গে। আনন্দের সাক্ষাৎ নয়। পরিমল এখন বড় একা।

ঘটল ঠিক উলটো। দরজা খুলে বিকাশবাবুকে দেখে পরিমলবাবু আনন্দ উচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন, ''আরে, তুই! একেবারে না বলে-কয়ে? আয় আয়...''

একটা হাত সাড়হীন নেতিয়ে আছে পরিমলবাবুর। ডান হাত বন্ধুর কাঁধে রেখে ঘরে নিয়ে এলেন। আরও ভিতরের কোনও ঘরের দিকে গলা তুলে বললেন, ''মাধবী, দেখবে এসো, কে এসেছে।''

বিকাশবাধু তো হতবাক। স্টেশনমাস্টার কি ভুল খবর দিলেন? কেনই বা তিনি এরকম অলক্ষুনে কথা জুড়ে দেবেন পরিমলের সঙ্গে! কোনও শত্রুতা আছে কি?

ড্রয়িংরুমের সোফায় বসলেন দু'জনে। অপ্রত্যাশিতভাবে বন্ধুকে পেয়ে পরিমলবাবু খুবই উত্তেজিত। অনর্গল কথা বলে চলেছেন। বিকাশবাবু অপেক্ষা করছেন বন্ধুর স্ত্রীর। এক সময় বলেই ফেললেন, ''হ্যাঁ রে, মাধবী আসছে না যে!''

''আসবে। হয়তো রান্নাটান্না নামাচ্ছে।''

বলেই যেন কোনও শব্দ শুনতে পেয়ে ঘাড় ফেরালেন পরিমলবাবু। ড্রয়িংরুমের ভিতরের দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন, ''ওই তো এসে গিয়েছে। দেখো মাধবী, বিকাশ কিন্তু একই রকম আছে। চেহারা দেখলে কে বলবে, রিটায়ার করেছে চাকরি থেকে।''

বিকাশবাবুর চোখ বিস্ময়ে বড় বড়, কাউকে দেখতে পেলেন না উনি। কেউ আসেনি এ ঘরে। দরজার পরদাটা নড়েনি এতটুকু। শূন্যের উদ্দেশে কথা বলে চলেছেন পরিমল। বিকাশবাবুর কোনও সাড়া নেই দেখে পরিমলবাবু বন্ধুর দিকে ফিরে বললেন, ''কী রে, তুই চুপ করে আছিস কেন? এমন ভাব করছিস, যেন চিনতে পারছিস না মাধবীকে!''

বিকাশবাবু কী বলবেন ভেবে পেলেন না। ভীষণ অপ্রস্তুত, অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়েছেন। কোনওক্রমে বললেন, ''আমি তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না পরিমল।''

''তুইও পাচ্ছিস না! আমি ভেবেছিলাম তুই অন্তত পাবি দেখতে।'' হতাশ ভঙ্গিতে কথা শেষ করলেন পরিমলবাবু। বিকাশবাবু হাঁ করে তাকিয়ে আছেন বন্ধুর দিকে, ঠিক কী বলতে চাইছেন বোঝা যাচ্ছে না।

আবার দরজার দিকে তাকালেন পরিমলবাবু। বললেন, ''চলে যাচ্ছ। আচ্ছা যাও। আমাদের চা, খাবারটাবার কিছু দিয়ো।''

চোখের পলক ফেলতে ভুলে গিয়েছেন বিকাশবাবু। পরিমল কি উপহাস করছে? সদ্যপ্রয়াত স্ত্রীকে নিয়ে ঠাট্টা মোটেই শোভা পায় না। যদিও পরিমলের মুখে মশকরার চিহ্নমাত্র নেই। মনমরা গলায় বললেন, ''তুই চিনলি না বলে মাধবীর খুব অভিমান হয়েছে। খাতির-যত্নের খামতি হলে আমাকে দোষ দিস না।''

ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে বিকাশবাবুর। একটু ধমকে বলে উঠলেন, ''চুপ কর পরিমল, তখন থেকে কী উলটোপালটা বকছিস? ঘরে কেউ আসেনি, কথা বললি কার সঙ্গে? তা ছাড়া মাধবীর মৃত্যুর খবর আমি জানি। ও এখানে আসবে কোথা থেকে।''

বন্ধুর মুখের দিকে খানিকক্ষণ অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকলেন পরিমলবাবু। হঠাৎই বলে উঠলেন, ''মাধবী মারা গিয়েছে আমিও জানি। দিঘির মাঠে দাহ করার সময় আমি ছিলাম। শ্মশান থেকে ফিরে বাড়ির দরজা খুলে দেখি, মাধবী বসে আছে সোফায়। চেহারায় অসুস্থতার কোনও ছাপ নেই। অবাক হয়ে বললাম, 'এ কী তুমি!' বলল, 'কী ভেবেছিলে, পুড়িয়ে দিলেই ফুরিয়ে যাব। তোমার দেখাশোনা করবে কে?' তারপর যেমনকার তেমন বাড়ির কাজে লেগে গেল। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে মাধবীকে আমিই শুধু দেখতে পাই। বাড়ির কাজের লোকেরা পায় না।''

এতক্ষণে একটা দিশা পেলেন বিকাশবাবু, মাধবীর মৃত্যুশোক একা বইতে গিয়ে মাথার গোলমাল হয়ে গিয়েছে পরিমলের। আত্মীয়স্বজনরা কি জানে ওর এই অবস্থার কথা? জানলে এভাবে একা ফেলে রাখতে পারত না।

ভাবনার মাঝে বন্ধুকে হঠাৎ সোফা ছেড়ে উঠে যেতে দেখলেন বিকাশবাবু। হেঁটে যাচ্ছে সম্ভবত রান্নাঘরের দিকে। পা টেনে টেনে হাঁটছে। বাঁ হাত লেপটে আছে শরীরের সঙ্গে। বন্ধুর এই করুণ হেঁটে যাওয়া দেখে ভীষণই কষ্ট হল বিকাশবাবুর। ঠিক করলেন, বন্ধুকে বলবেন, তাঁর সঙ্গেই কলকাতায় ফিরে যেতে।

বেশ কিছুটা সময় গেল। পরিমলবাবু ফিরছেন না। একা বসে আছেন বিকাশবাবু। বাড়িটি খুবই নির্জন জায়গায়। পাখির কিচকিচ ডাক ছাড়া কোনও শব্দই আসছে না বাইরে থেকে। রান্নাঘরের টুং টাং আওয়াজ অবশ্য আসছে। চোখ যায় দেওয়াল ঘড়ির উপর, বন্ধ হয়ে আছে। পরিমল বেচারা একা মানুষ, সব দিকে খেয়াল রেখে উঠতে পারছে না। কী করছে এতক্ষণ ধরে ভিতরে? সোফা ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিলেন বিকাশবাবু, পরদা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন পরিমলবাবু। এক হাতে ট্রে, তাতে দু'কাপ

চা, স্ন্যাকস, সেন্টারটেবিলে রাখলেন ট্রে-টা। নিজে সোফায় এসে বসলেন। একটু পরে বিকাশবাবুকে বললেন, ''নে, কাপ তোল। চা-পাতা অনেকক্ষণ ভিজিয়ে চা-টা করল মাধবী। ওর সেই বিখ্যাত চা। তোরা খুব পছন্দ করতিস।''

বিকাশবাবু এবার একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, ''চা তো তুই করে নিয়ে এলি।''

''কখন?''

''কখন মানে! এই তো মিনিট দশেক হল, উঠে গেলি আমার সামনে থেকে। চা নিয়ে ফিরলি।''

হাসতে হাসতে মাথা দুলিয়ে পরিমলবাবু বললেন, ''চা-টা খা আগে। ভারী চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর তোর মাথাটা দেখছি গিয়েছে।''

কার মাথা গিয়েছে বোঝাই যাচ্ছে। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। কাপ তুলে নিলেন বিকাশবাবু। কাপে চুমুক দিতেই অবাক হয়ে গেলেন। দারুণ চা বানিয়েছে পরিমল! অবিকল মাধবীর মতো।

চা পানের পর দু'বন্ধু এসে বসেছেন বারান্দার চেয়ারে। বিকেল এখনও ফুরোয়নি। এ বাড়ির বাগানে ফুটে আছে গাঁদা, জিনিয়া আরও নানারকম ফুল। নিয়মিত না হলেও পরিচর্যার ছাপ আছে। পাঁচিলের বাইরে ইতস্তত বড় বড় গাছ। ডালপালা, গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু একতলা বাড়ি। আন্দাজ করা যায়, এগুলোই শহুরে শৌখিন মানুষের অবসর যাপনের আস্তানা। বিকাশবাবু গল্পের ফাঁকে ভুলেও আর মাধবীর প্রসঙ্গ আনছেন না। ঠিক করে নিয়েছেন, আজ রাতটা এ বাড়িতে থেকে, কালই পরিমলকে নিয়ে কলকাতায় যাবেন। এখনই একজন মানসিক ডাক্তার দেখানো বড় প্রয়োজন।

কথার ফাঁকে বিকাশবাবু জানতে চাইলেন, ''হ্যাঁ রে, তুই যে তখন কাজের লোকের কথা বলছিলি, তাদের তো কাউকে দেখছি না?''

''আছে। বাজার গিয়েছে লক্ষ্মণ। চলে আসার সময় হল। আর-একজন আছে লকাইয়ের মা। সে দিনে একবারই আসে। ঘরদোর মুছে, বাসন মেজে চলে যায়।''

''রাতে কেউ থাকে না?''

''থাকে, একজন থাকে।''

পরিমলবাবুর কথা শেষ হতে না হতে গেটের কাছে কে যেন এসে দাঁড়াল। হাতে বাজারের ব্যাগ। পরিমলবাবু বললেন, ''ওই যে লক্ষ্মণ এসে গিয়েছে।''

বাগানের রাস্তা ধরে বারান্দায় উঠে এল লক্ষ্মণ। বয়স তিরিশের নীচে। পরিমলবাবু লক্ষ্মণকে বললেন, ''গিন্নিমা যা-যা আনতে বলেছিল, এনেছিস?''

ঘাড় হেলায় লক্ষ্মণ। পরিমলবাবু ফের বললেন, ''তাড়াতাড়ি ভিতরে যা, গিন্নিমাকে গিয়ে হেল্প কর। আজ বড্ড দেরি করে ফেললি।''

লক্ষ্মণ যাওয়ার আগে অদ্ভুত চোখে বিকাশবাবুর দিকে তাকাল। বড় একটা খটকা লেগে গেল বিকাশবাবুর, লক্ষ্মণ কী করে মেনে নিল, গিন্নিমার ফরমাশমতো বাজার এনেছে? পরক্ষণেই মাথায় এল আসল কারণটা, চাকরি টিকিয়ে রাখার খাতিরে মালিকের পাগলামিতে সায় দিচ্ছে লক্ষ্মণ।

তারপর দু'বন্ধু মেতে গেলেন স্কুল-কলেজবেলার স্মৃতি রোমন্থনে। গল্প বেশি দূর গড়াল না। দরজার দিকে মুখ ফেরালেন পরিমলবাবু। পরদার দিকে তাকিয়ে বললেন, ''কিছু বলবে?''

বিকাশবাবু বুঝতেই পারছেন, স্ত্রীর উদ্দেশে প্রশ্ন করলেন তাঁর বন্ধু। স্বাভাবিকভাবেই শূন্য থেকে কোনও কথা ভেসে এল না। পরিমলবাবু যেন শুনতে পেলেন। বিকাশবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, ''মাধবী জানতে চাইছে, রাতে রুটি খাবি, না ভাত?''

খামোকা জটিলতায় না গিয়ে বিকাশবাবু বললেন, ''ভাত।''

''তার সঙ্গে রুই-পোস্ত করতে বলি? তুই তো ভালবাসতিস।''

'ওই হলেই হল।'' দায়সারা উত্তর দিলেন বিকাশবাবু।

পরদার দিকে তাকিয়ে পরিমলবাবু বললেন, ''শুনলে তো, জমিয়ে রাঁধো। আমার জন্য আজ ভাতই করো।''

বিকাশবাবু দরজার দিকে তাকাচ্ছেন না। ক্রমশ অসহ্য ঠেকছে এই অবাস্তব পরিস্থিতি।

"হ্যাঁ, মা বলছিলাম।" বলে এমনভাবে কথায় ফিরলেন পরিমলবাবু, যেন এইমাত্র তাঁর স্ত্রী ঘরে ঢুকে গেলেন।

সন্ধে পড়তে ঠান্ডা বাড়ল। বারান্দায় আর বসে থাকা গেল না, তাই দু'বন্ধু এসে বসলেন ড্রয়িংরুমে। কথা বলতে বলতে কত সময় গেল দু'জনেরই হুঁশ নেই। দেওয়াল ঘড়িটাও বন্ধ। ঘড়ির কথা তুলতে যাবেন বিকাশবাবু, ঠিক সেই সময় লক্ষ্মণ এসে বলল, "বাবু, মা আপনাদের খেতে ডাকছেন।"

"হ্যাঁ, যাই।" বলে পরিমলবাবু উঠলেন সোফা ছেড়ে। বন্ধুকে বললেন, "কী হল, বসে রইলি কেন? চল।"

বিকাশবাবুর এখন বেশ রাগ হচ্ছে, পরিমলের বিচার-বুদ্ধি কি একেবারেই লোপ পেল! কাজের লোকের মিথ্যে তোষামোদ ধরতে পারছে না। প্রশ্ন করতে বাধ্য হলেন বন্ধুকে, "হ্যাঁ রে, তুই যে বলছিলি, মাধবীকে তুই একাই দেখতে পাস, কাজের লোকেরা পায় না। তোর লক্ষ্মণ তো দেখছি দিব্যি মাধবীর অর্ডার অনুযায়ী কাজ করছে।"

পরিমলবাবু সরলভাবে হেসে বললেন, "না, ওরা এখনও দেখতে পায় না, উপস্থিতিটা টের পায়। আমার ভাগ্য ভাল, মাধবীকে ভূত ভেবে পালিয়ে যায়নি ওরা।"

বিকাশবাবু বুঝতে পারলেন, তাঁর বন্ধু যুক্তি-বুদ্ধির নাগালে নেই। বাক্য ব্যয় করার মানেই হয় না। নিরুপায়ভাবে বন্ধুকে অনুসরণ করে ডাইনিংরুমে এলেন বিকাশবাবু।

টেবিলে সুন্দর করে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে খাবার। ধোঁয়া উঠছে, দু'জনে চেয়ারে বসলেন। কাজের লোক লক্ষ্মণ এসে দাঁড়াল, চেহারায় কাঁচুমাচু ভাব। পরিমলবাবু ওকে দেখে বললেন, "কিছু বলবি মনে হচ্ছে?"

"হ্যাঁ, মানে বাবু, আজ রাতে একটু বাড়ি যাব। কাল সকালেই চলে আসব। বাজারে গিয়ে আমাদের পাড়ার একজনের সঙ্গে দেখা হল। বলল, আমার দাদার শরীরটা খারাপ হয়েছে।"

"গিন্নিমাকে বলেছিস?" জানতে চাইলেন পরিমলবাবু।

"বলেছি। উনি বললেন, আপনাকে জিজ্ঞেস করতে।"

"নো প্রবলেম। সকালেই চলে আসিস কিন্তু! বাড়িতে গেস্ট আছে। কখন কী দরকার লাগে।"

লক্ষ্মণ এক মুহূর্ত দেরি করল না। হাঁটা দিল সদর লক্ষ করে।

বিকাশবাবু চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছিলেন। একটু আগের নাটুকে কথাবার্তা কানে এলেও গুরুত্ব দিলেন না। বন্ধুর মেজাজ যে ভাল নেই বুঝতে অসুবিধে হল না পরিমলবাবুর। বললেন, "আমি জানি, তুই কিছুতেই মেনে নিতে পারছিস না মাধবীর উপস্থিতি। আমি কিন্তু প্রমাণ দিতে পারি মাধবী আছে।"

এই সময় একবার মুখ তোলার কথা বিকাশবাবুর, কিন্তু এতই বিরক্ত যে তুললেন না। পরিমলবাবু বলে চলেছেন, "মেনুটা লক্ষ কর, ভাত বলেছিলাম, হয়েছে। আমি কিন্তু অন্য দিন রুটি খাই। রুই-পোস্তও হয়েছে। তোর সামনে মাধবীকে এইগুলোই আমি রাঁধতে বলেছিলাম, লক্ষ্মণকে বলিনি। তুই ভাবছিস লক্ষ্মণের রান্না খাচ্ছিস।"

এবারও কোনও জবাব দিলেন না বিকাশবাবু। মনে মনে যুক্তি সাজাচ্ছেন, পরিমল যখন পরদার দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলছিল, দূরে দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনে নিয়েছিল লক্ষ্মণ অথবা এই পদ রান্না হওয়ার কথাই ছিল আজ। পরিমল শুধু মেনুটা আবার বলেছে। নিজের যুক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে বিকাশবাবু একটা ছোট্ট খোঁচা দিয়ে বন্ধুকে বললেন, "মাধবী তো আমাদের সঙ্গেই খেয়ে নিতে পারত। পরে একা-একা খাবে!"

বিষণ্ণ গলায় পরিমলবাবু বললেন, "ওর তো আর খাওয়ার দরকার পড়ে না। শরীরই নেই যখন। প্রথম দিকে আমি বলতাম বসতে। বসত। মিছিমিছি নষ্ট হত খাবার।"

একথা যদি শহরে বসে বলতেন পরিমলবাবু, বিকাশবাবু নিশ্চয়ই হেসে উড়িয়ে দিতেন। কিন্তু

বড়ডিহার নির্জনতা এতই ভারী, দমচাপা, বুকটা যেন একটু ছমছম করে উঠল।

রাতে গেস্টরুমে শুয়েছেন বিকাশবাবু। ঘুম আসতে চাইছে না। বাড়ির বাইরে হঠাৎই শুরু হচ্ছে ঝিঁঝির কোরাস, আবার আচমকা থেমেও যাচ্ছে। তখন কী গভীর নিস্তব্ধতা। সেই সময় ধীরে ধীরে কার যেন পায়ের আওয়াজ ভেসে উঠছে। কেউ যেন হাঁটছে সারা বাড়ি জুড়ে। ভাল করে কান পাতলেন বিকাশবাবু, মনে হচ্ছে পায়ের শব্দ নয়। বন্ধ ঘড়িটা বুঝে চলতে শুরু করেছে। কিন্তু তা কী করে সম্ভব! পরিমল তো সারাক্ষণ চোখের সামনেই ছিল, ঘড়িটা চালু করতে দেখা যায়নি। ফের ঝিঁঝির ডাক সমস্ত সংশয় মুছে দিল। বিকাশবাবু শেষ কবে এরকম পরিবেশে ঘুমিয়েছিলেন মনে পড়ছে না। আজ বন্ধুর সঙ্গেই শুতে গিয়েছিলেন। পরিমল বলেছেন, এখানে তো আমি আর মাধবী শোব। তুই গেস্ট রুমে শো। রাতে কোনও দরকার পড়লে ডাকবি।

এই আজগুবি কথার কোনও বিরুদ্ধাচরণ করেননি বিকাশবাবু, গেস্টরুমে এসে শুয়ে পড়েছিলেন। একটি বিষয় ইতিমধ্যেই বুঝে গিয়েছেন, একার পক্ষে পরিমলকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। ওর আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করে সবিস্তার পরিমলের মানসিক অবস্থার কথা বলে দু'-তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। তবে যদি পরিমলকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া যায়। বিকাশবাবু কাল সকালেই চলে যাবেন। বন্ধুকে বলেছেন সে কথা। সহজে রাজি হয়নি, অনেক করে বোঝাতে হয়েছে। নানা কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বিকাশবাবু। কে যেন ধাক্কা দিয়ে ডেকে দিল। ধড়মড় করে উঠে বসলেন বিছানায়। চোখ কচলে দেখলেন, দরজা অর্ধেক খোলা। ভোরের আলো ঢুকে পড়েছে ঘরে। কেউ ডেকে দিল বোঝা যাচ্ছে। ঘরে কেউ নেই। বিছানা থেকে নামতে গিয়ে দেখলেন, টেবিলে ধূমায়িত কাপ। তার মানে পরিমলের ঘুম ভেঙে গিয়েছে আগে। চা রেখে ডেকে দিয়ে গেল। বন্ধুর জন্য খারাপ লাগে বিকাশবাবুর। অসুস্থ শরীর নিয়ে আতিথেয়তা করে যাচ্ছে। কাপে চুমুক দিতে দিতে বন্ধুর ঘরে এলেন বিকাশবাবু। পরিমলকে ঘুমোতে দেখে এতটুকুও অবাক হলেন না। জানেন, বন্ধুর ঘুমটা আসলে ভান।

পরিমলের বিছানায় বসলেন বিকাশবাবু। আস্তে করে ডাকলেন বন্ধুকে। পরিমলবাবু চোখ খুলে বললেন, "উঠে পড়েছিস? চা দিয়েছে মাধবী? তোর ট্রেন কিন্তু সেই সাড়ে আটটায়।"

বিকাশবাবু স্মিত হাসলেন। হাসিতে কোথায় যেন একটু বন্ধুর প্রতি করুণা লেগে আছে। বললেন, "তুই খাবি না?"

"না। সকালে চা দেয় না মাধবী। এখনই দুধওলা আসবে। দুধের সঙ্গে দেবে বিস্কুট।"

ডোরবেল বেজে উঠল। পরিমলবাবু বললেন, "ওই যে দুধওলা এল।"

বিকাশবাবু দরজা খোলার জন্য উঠতে যাচ্ছিলেন। পরিমল বললেন, "তুই উঠছিস কেন? মাধবী খুলে দেবে।"

বসে পড়লেন বিকাশবাবু। সেকেন্ডখানেক পর সত্যি যেন শুনতে পেলেন দরজা খুলে দেওয়ার আওয়াজ। মাথাটা কেমন ঘুলিয়ে গেল বিকাশবাবুর।

কতক্ষণ পর সম্বিৎ ফিরল বোঝা যাচ্ছে না। দেখলেন, আগের মতোই বিছানায় বসে আছে পরিমল। শুধু সামনের দৃশ্যটা একটু বদলে গিয়েছে। বড় মগে চুমুক মারছে পরিমল। মাঝের সময়টা কী ঘটল! কিছুতেই মনে করতে পারলেন না। নিজেকে সুস্থির করতে অন্য প্রসঙ্গে গেলেন বিকাশবাবু। বন্ধুকে বললেন, "অনেক দিন তো হল এখানে। এবার কলকাতায় চল। আত্মীয়-বন্ধুদের কাছাকাছি থাকতে পারবি।"

পরিমলবাবু বললেন, "না রে, এখানেই বেশ আছি দু'জনে। কোনও অসুবিধে তো হচ্ছে না। কলকাতায় যাওয়ার ব্যাপারে মাধবীর ঘোর আপত্তি।"

বন্ধুর আবোল তাবোল কথা শুনতে শুনতে বিকাশবাবু কিছুক্ষণ আগের সময়টা খুঁজে পেলেন।

মনে পড়ল, দুধওলাকে তিনিই দরজা খুলে দিয়েছিলেন। দুধ গরম করে পরিমলকে দিয়েছিলেন। একই সঙ্গে মনে পড়ল গ্যাস ওভেন অফ করা হয়নি। আসলে অভ্যেস নেই তো!

ওভেন বন্ধ করবার জন্য বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন বিকাশবাবু। পরিমলবাবু জানতে চাইলেন, ''কোথায় যাচ্ছিস?''

''ওভেনটা জ্বালানোই আছে। ভুলে গিয়েছি অফ করতে।''

রহস্যময় হাসি হেসে পরিমলবাবু বললেন, ''মাধবী খুব সাবধানী। ওভেন ঠিক অফ করেছে। গিয়ে দেখে আয়।''

বন্ধুর কথায় নয়, নিজের আগ্রহে রান্নাঘরে গেলেন বিকাশবাবু। আশ্চর্য ব্যাপার, ওভেন কিন্তু অফ করাই আছে। হয়তো নিজেই করেছেন। ঠিক মনে করে উঠতে পারছেন না।

অবশেষে বিদায়ের সময় এল। একটু আগেই বেরিয়ে পড়লেন বিকাশবাবু। পরিমলবাবু বললেন, ''ট্রেনের তো এখনও দেরি আছে। একটু পরে বেরোলে পারতিস। লক্ষ্মণ এসে ব্যাগ বয়ে দিত তোর।''

''যাই, ধীরেসুস্থে। নিজের দিকে খেয়াল রাখিস, ভাল থাকিস।'' বলে ব্যাগ হাতে বারান্দা থেকে নেমে এলেন বিকাশবাবু। গেট খুলে রাস্তায় চলে গিয়েছেন। দু'-চার পা যাওয়ার পর বন্ধুর দিকে ফিরে হাত নাড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখলেন, অবিশ্বাস্য এক কাণ্ড! পরিমল দুটো হাত তুলে বিদায় জানাচ্ছে।

কী করে সম্ভব? পরিমলের একটা হাত প্যারালিসিস, লেপটে থাকে শরীরের সঙ্গে। ওই হাতটা কীভাবে তুলল ও! অবাক বিস্ময়ে বন্ধুর দিকে চেয়ে আছেন বিকাশবাবু, মাধবীর হয়ে বাঁ হাতটা নাড়াচ্ছে পরিমল। নাকি মাধবীই তুলে ধরেছে ওর অকেজো হাত? মাথায় আসছে না কিছুই। তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন বিকাশবাবু। উনি জানেন, ওদিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে পরিমলবাবুর মতো উনিও মাধবীকে দেখতে পাবেন।

২ মার্চ ২০০৭
অলংকরণ: নির্মলেন্দু মণ্ডল
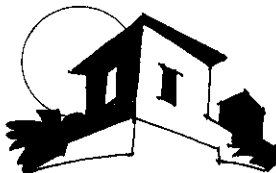
রবিনসন ক্রুসোর ভূত

অমিতাভ পাল

ঘরে ঢুকতেই মেজাজটা গেল বিগড়ে। চেঁচিয়ে ডাকলাম, ''রঞ্জিত।''

কাছেপিঠে কোথায় ছিল। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল, ''দাদা, ডাকছ?''

আমি চেঁচিয়ে বললাম, ''এসব কী?'' বসার চেয়ারটা যেখানে থাকার কথা, সেখানে নেই। উলটো দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে চলে গিয়েছে ঘরের এক কোণে। টেবিলটা নিয়েও কেউ টানাহেঁচড়া করেছে। সোজা নেই। জানলার দিকে টেরিয়ে আছে। টেবিলের বইপত্র এলোমেলো। কলমটা আছে কিন্তু ঢাকনাটা গড়াগড়ি খাচ্ছে মেঝেয়। রঞ্জিত মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, ''তাই তো, তাই তো...''

''কত দিন না তোকে বলেছি, আমার জিনিসপত্র এদিক-ওদিক করবি না?''

রঞ্জিত আবার কোনও অজুহাত খাড়া করার চেষ্টা করল, ''আমি তো, আমি তো...''

মেজাজটা তো এমনিতেই বিগড়ে ছিল। তার উপরে আগুনে যেন ঘিয়ের ছিটে পড়ল, ''তুই করিসনি, তবে কি ভূতে করল?''

সে আর কথা বাড়াল না। ঘরের কাজে মন দিল। বেশিক্ষণ নয়। মিনিট দু'য়েক লাগল ঘরটাকে ঠিকঠাক করতে। তারপর সে ঘাড় নিচু করে চলে গেল।

আমি বুঝতে পারলাম, মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে সে।

মনঃক্ষুণ্ণ সে হতেই পারে, রঞ্জিত এখন আর ঠিক আমার কাজের লোক নয়। যদিও কাজের লোক হিসেবে সে একদিন এসেছিল, এখন ঘরের লোক হয়ে গিয়েছে। আমার কাছে অনেক দিন আছে। আমাকে 'দাদা' বলে ডাকে।

আমার ঘরের বাইরে একটা বকুল গাছ। গাছে ফুল এসেছে। গন্ধে ম-ম করছে চার দিক। জানলা দিয়ে বকুলের গন্ধ ডাকাতের মতো হানা দিচ্ছে আমার ঘরে।

মফস্‌সল শহর। রাত হয়তো বেশি নয়, কিন্তু ইতিমধ্যে পাড়াটা নিঝুম হয়ে গিয়েছে। টেবিলের উপরে ঘাড় গুঁজে জেমস টডের 'অ্যানালস অ্যান্ড অ্যান্টিকুইটিজ় অফ রাজস্থান' পড়ছি।

ঘরের দরজা আগলে রঞ্জিত। কাজ না থাকলে, আমি যখন পড়াশোনা করি, সে আমার ঘরের চৌকাঠের উপরে চুপ করে বসে থাকে। বেশি রাত হলে ঢুলতে ঢুলতে ঘুমিয়েও পড়ে।

জেমস টডের কলমে জাদু আছে। জীবন্ত হয়ে উঠেছে রাজস্থানের রানা-মহারানাদের ইতিহাস।

ঢুলতে ঢুলতে দু' হাঁটুর উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে রঞ্জিত। মনে হল, যেন নিজের কানে শুনলাম। কেউ ফিসফিস করে বলে উঠল, ''ম্যায় ভুখা হুঁ।''

চিতোর অবরোধ করেছেন আলাউদ্দিন। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার। প্রথমবারেই মেবারের বেশিরভাগ যোদ্ধা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। যাঁরা বাকি ছিলেন, তাঁরা এবারে দিলেন। বীরশূন্য চিতোর। অসহায় রানা লক্ষ্মণ সিংহ। নিজে এবং নিজের ছেলেরা ছাড়া আর কেউ নেই যুদ্ধে যাওয়ার মতো।

''কে? এ কার কণ্ঠস্বর?''

''আমি চিতোরের ফুলদেবী।''

''এত খেয়েও তোমার সাধ মেটেনি, মা?''

''তোমার বারোটি পুত্রকে না খাওয়া পর্যন্ত আমার খিদে মিটবে না।''

''কী করতে হবে, মা?''

''প্রতিটি রাজকুমার চিতোরের রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তিন দিন রাজত্ব করবে। চতুর্থ দিনে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ উৎসর্গ করবে। বারোজন রাজকুমার জীবন আহুতি দিলে, তবেই আমার খিদে মিটবে।''

বংশ রক্ষার জন্য রইলেন শুধু রাজপুত্র অজয় সিংহ। বাকি সবাই স্বেচ্ছায় যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করলেন।

দেশপ্রেমের এক অনন্য নজির গড়লেন চিতোরের রাজকুমাররা।

ধপ করে একটা শব্দ হল। উঁচু থেকে কেউ কি লাফিয়ে পড়ল মেঝেয়? ঘুমের মধ্যেই চমকে উঠল রঞ্জিত, ''কে, কে?''

দুদ্দাড় করে কয়েকটা ভারী বই উপরের র‍্যাক থেকে আছড়ে পড়ল মেঝেয়।

দেওয়ালের ধার ঘেঁষে সারি সারি র‍্যাক। পাল্লাবিহীন র‍্যাকে ঠাসাঠাসি বই। এসব বইয়ের বেশিরভাগ পুরনো। পুরনো বইয়ের দোকান ঘেঁটে বা নিলামে-চড়া কারও ব্যক্তিগত লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করে আনা।

একেবারে শেষের লটটি এসেছে মাত্র দিন দশেক আগে। শিবপুরের একটি বর্ধিষ্ণু পরিবারের ব্যক্তিগত লাইব্রেরি থেকে।

অবাক হয়ে রঞ্জিত বলল, ''কী হল, দাদা?''

''দেখ, হয়তো কোনও হুলো বিড়াল-টিড়াল হবে।''

রঞ্জিত তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখল। র‍্যাকের সামনে, পিছনে, এমনকী টর্চ জ্বেলে র‍্যাকের তলাতেও। বিড়াল তো দূরের কথা, একটা নেংটি ইঁদুরেরও দেখা মিলল না।

মেঝে থেকে বইগুলো কুড়িয়ে রাখল সে। তারপর আমার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলল, ''দাদা?''

আমি নিজেই আশ্বস্ত হতে পারছি না, তো তাকে আশ্বস্ত করব কী? তবুও বললাম, ''ও কিছু না। অনেক রাত হয়েছে। চল, এবার খেয়ে শুয়ে পড়ি।''

পরপর তিন দিন। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল।

রাত বাড়ল। পাড়া নিঝুম হয়ে গেল। বকুলের গন্ধে ভারী হয়ে উঠল বাতাস। আমি ধীরে ধীরে ডুবে গেলাম ইতিহাসের অতীতে। বাতাসে ফিসফিস করে ভেসে বেড়াল চিতোরের ফুলদেবীর দীর্ঘশ্বাস, ''ম্যায় ভুখা হুঁ, ম্যায় ভুখা হুঁ।''

ঠিক তখনই আমাকে কেউ ধাক্কা মেরে ফিরিয়ে আনল অতীত থেকে বর্তমানে। কেউ যেন দুপদাপ করে ঘুরে বেড়াল আমার ঘরের মধ্যে। বইয়ের র‍্যাক হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে বেড়াল কিছু। খুঁজে হয়তো পেল না। তাই রাগ করে র‍্যাকের দু'-একটা বই ছুড়ে ফেলে দিল মেঝেয়।

এই তো গত কাল, সে একটা বই এত জোরে ছুড়ে মারল যে, বইটা গিয়ে লাগল দরজা আটকে বসে থাকা রঞ্জিতের কপালে। সে বেচারার কপাল ফুলে ছোটখাটো একটা আব গজিয়ে গেল। কপালে দু' হাত চেপে রঞ্জিত বলল, ''দাদা, আমাকে মারল।''

কার উপরে রাগ করছি কিছু না বুঝেই আমি রাগে ধমকে উঠলাম, ''স্টপ ইট। এসব বন্ধ কর।''

এক ধমকেই স্তব্ধ। সব চুপচাপ। তারপরেই একটা চাপা শব্দ। শব্দটা ঘুরে বেড়াতে লাগল ঘরের বাতাসে। অনেকটা ফুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে বেড়ানো ভোমরার মতো। ঘরের মধ্যে কোথাও কি উড়ছে একটা ভোমরা, না কি কেউ চাপা স্বরে বিনবিন করে কাঁদছে?

পরের কয়েকটা দিন কাটল ভালভাবে। নতুন করে কোনও উপদ্রব হয়নি। আমি একটু বুক চাপড়ানো গোছের ভঙ্গিতে রঞ্জিতকে বললাম, ''সে যে-ই হোক, দেখলি তো, আমার এক ধমকেই চুপ করে গিয়েছে।''
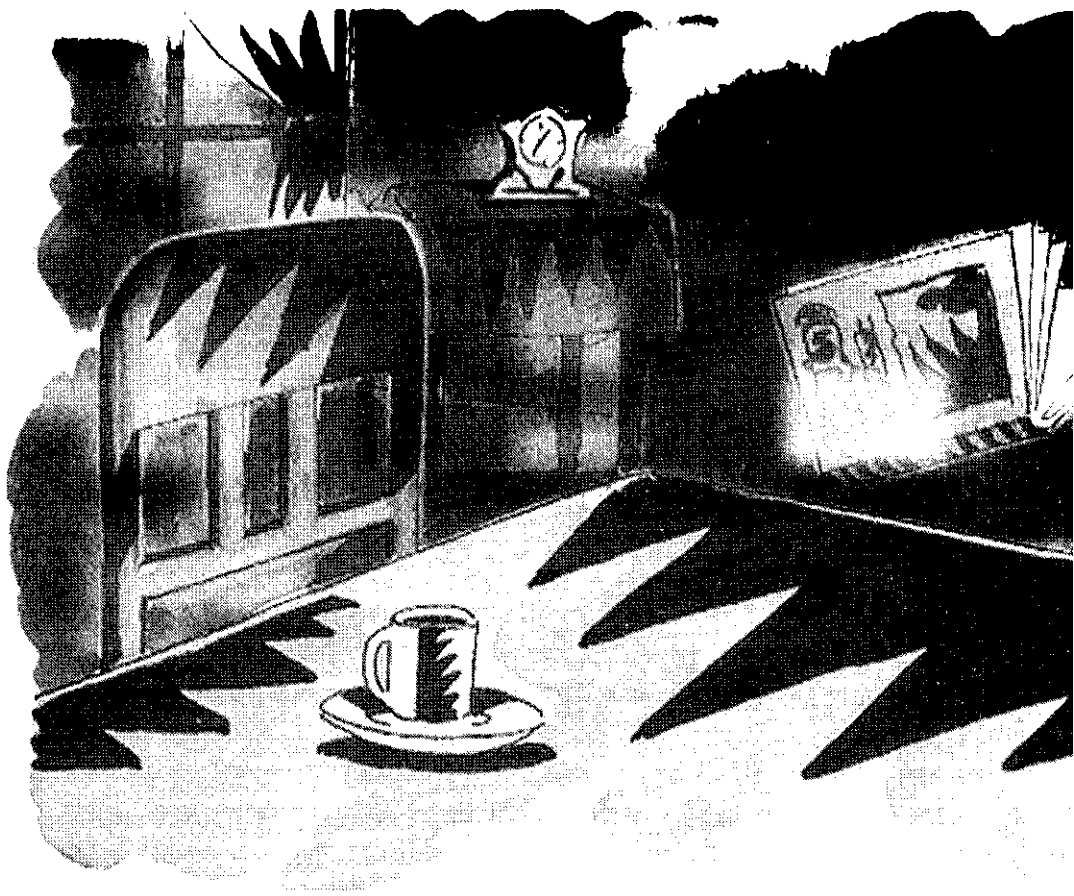
উপদ্রবটা বিদেয় হয়েছে। আমি নিশ্চিন্ত মনে গিয়ে বসলাম পড়ার টেবিলে। গত কাল জেমস টডের বইটা পড়তে পড়তে পাতায় পেজমার্ক লাগিয়ে উঠে গিয়েছিলাম।

কোথায় গেল বইটা? আমি চেঁচিয়ে বললাম, ''রঞ্জিত, তোকে না কত দিন বলেছি, আমার টেবিলের বইপত্র সরাবি না?''

সে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকল। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে আমার রাগ চড়ে গেল, ''কী রে, জবাব দিচ্ছিস না যে?''

সে ভয়ে ভয়ে বলল, ''আমি তো সরাইনি।''

''সরাসনি মানে, তবে কি বইটা ডানা মেলে উড়ে গেল?''

জেমস টডের বইটা ডানা মেলে উড়ে গিয়েছে কি না জানি না। তবে সত্যি সত্যি একটা বই উড়ে এসে পড়ল আমার টেবিলে। বলাটা বোধ হয় ঠিক হল না। বইটা যেন কেউ র‍্যাক থেকে টেনে নামিয়ে এনে ধপাস করে রাখল আমার সামনে। ঠিক দেখলাম তো, না কি চোখের বিভ্রম?

ঝিম মেরে বসে থাকলাম কিছুক্ষণ। তারপর হাতের কাছে টেনে নিলাম বইটা। বইটা বেশ পুরনো। পাতা লালচে হয়ে গিয়েছে। হাতে নিয়ে টাইটেল পেজটা উলটে দেখি, ১৭১৯ সালের ড্যানিয়েল ডিফোর লেখা 'রবিনসন ক্রুসো'। প্রথম সংস্করণের বই।

আমার আগ্রহ মূলত ইতিহাসে। ক্লাসিক

লিটারেচারের বইও আছে কিছু। তবে সবই বড়দের। ছোটদের বই তো আমার সংগ্রহে থাকার কথা নয়। আমি একটু অবাক হলাম, ''হ্যাঁ রে রঞ্জিত, এ বইটা এল কোত্থেকে?''

বিহ্বল ভাবটা কাটিয়ে একটু ধাতস্থ হল সে, ''কোত্থেকে আবার? পাঁজা-পাঁজা বই কিনে আনো। কী কিনে আনো, দু' দিন পরে নিজেই ভুলে যাও।''

''আমি কিনে এনেছি? ছোটদের বই আমি কিনব কেন?''

''কেন কিনবে, সে তুমিই ভাল জানো। তোমার যা ভুলো মন। এই তো ক'দিন আগে র‍্যাক থেকে নিজেই টেনে বের করলে একই বইয়ের তিন-তিনটি কপি।''

''বেশ, তা না হয় হল। কিন্তু আগে চোখে পড়েনি কেন?''

মাথা চুলকে রঞ্জিত বলল, ''আগে হয়তো ছিল না, এখন এসেছে।''

রঞ্জিতের কথা শেষ হতে না হতেই ফরফর করে বইয়ের পাতা ওলটাতে শুরু করল। আমার মাথার মধ্যেও যেন ফরফর করে উড়ছে একটা ফড়িং। কী যে হচ্ছে, বুঝতে পারছি না কিছু।

''রঞ্জিত, দেখ, কী অবাক কাণ্ড! বইয়ের পাতা কেমন নিজে থেকেই উলটে যাচ্ছে।''

সে একবার ভাল করে দেখল, ''উলটে যাচ্ছে, না হাতি। মাথার উপরে ফ্যান ঘুরছে। তাই ফরফর করে উড়ছে বাতাসে।''

সে গিয়ে ফ্যানের সুইচটা অফ করে দিল। ফ্যানটা ধীরে ধীরে থেমে গেল, কিন্তু বইয়ের পাতা আগের মতো উলটে যেতে লাগল।

আমরা হাঁ করে তাকিয়ে আছি। কেউ যেন বইয়ের পাতা উলটে যাচ্ছে আপন খেয়ালে। শেষে থামল। যেখানে থামল, সেখান থেকে শুরু হয়েছে একটা নতুন চ্যাপ্টার, 'আই ফাউন্ড দ্য প্রিন্ট অফ আ ম্যান'স নেকেড ফুট'।

মেবারের ইতিহাস আমাকে টানছে। সে এক অমোঘ টান দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের। বইটা পড়ার জন্য আমি ছটফট করছি।

আমি খুঁজছি। রঞ্জিতও খুঁজছে। আমার সঙ্গে হাত লাগিয়েছে। সমস্ত বইয়ের র‍্যাক আঁতিপাঁতি করে খুঁজলাম। প্রতিটি বই সরিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজেও জেমস টডের বইটা উদ্ধার করতে পারলাম না।

হতাশ হয়ে বসে পড়লাম চেয়ারে। আমার সামনে টেবিলের উপরে রবিনসন ক্রুসো। নিরীহ বইটা যেন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি করে হাসছে। আমি বইটা টেনে নিলাম হাতের কাছে। বইটায় একটা পেজমার্ক লাগানো। আমি পেজমার্কের পাতাটা খুলতেই বেরিয়ে পড়ল, 'আই ফাউন্ড দ্য প্রিন্ট অফ এ ম্যান'স নেকেড ফুট'।

এই পেজমার্কটা এখানে এল কী করে? এই তো সেই পেজমার্ক। দু'দিন আগে জেমস টডের বইটা পড়তে পড়তে উঠে যাওয়ার সময় এই পেজমার্কটাই তো লাগিয়ে উঠে গিয়েছিলাম আমি।

পিত্তি জ্বলে গেল আমার। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল বইটার উপর। আমি টান মেরে ছুড়ে ফেলে দিলাম বইটা। বইটা উড়ে গিয়ে পড়ল মেঝেয়। একটা তিরবেঁধা পাখির মতো ডানা ছড়িয়ে।

রঞ্জিত বলল, "দাদা, মাথা গরম কোরো না তো! বইটা যাবে কোথায়? আছে কোথাও। আমি কাল দিনের বেলা ঠিক খুঁজে বের করব। তুমি ছাড়া এ বাড়িতে তো বই পড়ার মতো কেউ নেই।"

আমি অসহায়ভাবে বললাম, "নেই বলছিস?"

রঞ্জিত আর কোনও কথা বাড়াল না। রবিনসন ক্রুসোর বইটা তুলে গুছিয়ে রাখল [illegible] র‍্যাকে। তারপর চলে গেল কিচেনে আমার জন্য কফি বানাতে। সে ঠিক বুঝতে পেরেছে, মাথা ঠান্ডা করতে এখন আমার চাই এক মগ গরম কফি।

পেজমার্কটা পড়ে আছে মেঝেয়। যেখানে বইটা পড়েছিল, তার চেয়ে একটু তফাতে। বইটে ছুড়ে ফেলার সময় পেজমার্কটা খুলে গিয়েছে।

আমি উঠে গিয়ে মেঝে থেকে তুলে নিলাম পেজমার্কটা। ভাল করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলাম, একটা সার্কাসের টিকিট, 'গ্রেট ইন্ডিয়ান সার্কাস'। তারিখটা অস্পষ্ট। সালটা কোনওরকমে পড়তে পারি। একান্ন বছর আগের একটা টিকিট।

একান্ন বছর আগে তখন আমিও তো নিতান্ত শিশু। সেই বয়সে আমি কি কোনও সার্কাস দেখেছিলাম? হয়তো দাদু কিংবা বাবার হাত ধরে গিয়েছিলাম কোনও সার্কাস দেখতে। এখন আমার আর মনে নেই।

এত দিন সেই টিকিট কি আমি সযত্নে গুছিয়ে রেখেছিলাম? একান্ন বছর পরে কোনও বইয়ের পেজমার্ক করব বলে, না কি একান্ন বছর আগে কোনও বইয়ে কেউ পেজমার্কটা লাগিয়েছিল? একান্ন বছর পরে আমি কি তবে ভুল করে খুলে ফেলেছি সেই বই?

প্রশ্নগুলো জট পাকাল আমার মাথার মধ্যে। স্থির কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারলাম না। ব্যাপারটাকে কেমন যেন রহস্যময় মনে হল। দূর অতীতের স্মৃতির মতো জানলা দিয়ে বকুল ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। আমি ধীরে ধীরে হেঁটে গেলাম বইয়ের র‍্যাকের দিকে।

দুটো বইয়ের মাঝখানে অসহায়ভাবে হেলান দিয়ে আছে রবিনসন ক্রুসো। মিটমিট করে তাকাচ্ছে যেন আমার দিকে। বইয়ের কি প্রাণ আছে? বই কি দীর্ঘশ্বাস ফেলে?

একান্ন বছরের না-ছোঁয়া অতীত কি এত দিন দমবন্ধ করে ছিল দু' মলাটের মধ্যে? সামনে গিয়ে দাঁড়াতে কার যেন দীর্ঘশ্বাস পড়ল। উষ্ণ বাতাসের ঝলক এসে লাগল আমার চোখে-মুখে। আমি

[illegible]

আ[illegible]তো।

[illegible] গিয়েছে। বিশ্বচরাচর লোপ পেয়ে গিয়েছে আমার সামনে থেকে। নির্জন ঘরে শুধু একলা আমি আর আমার হাতে রবিনসন ক্রুসো।

কতক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম, আমার খেয়াল নেই। আমার কোনও হুঁশ ছিল না। আমার হুঁশ ফেরে রঞ্জিতের ডাকে, ''দাদা?''

বইটা আমি সযত্নে তুলে রাখলাম বইয়ের র‍্যাকে। তারপর ফিরে এলাম পড়ার টেবিলে।

রঞ্জিত কখন কফিভর্তি মগ আমার টেবিলে রেখে গিয়েছিল, আমি জানতেও পারিনি। গরম কফি জুড়িয়ে জল হয়ে গিয়েছে। কফির মগটা তুলে আমি চুমুক দিতে গেলাম। রঞ্জিত বলল, ''অনেক রাত হয়েছে। এবার রাতের খাবার খেতে চলো।''

শিবপুর ট্রাম ডিপো ছাড়িয়ে একটা গলির মধ্যে বাড়িটা। লাল রঙের ইট বের করা পুরনো আমলের বাড়ি।

দরজায় কড়া নাড়তেই ফিনফিনে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক এসে দরজা খুললেন। নমস্কার করতেই ভদ্রলোক বললেন, ''আপনি?''

''কয়েক দিন আগে আপনাদের পারিবারিক সংগ্রহ থেকে কিছু বই আমি কিনে নিয়ে গিয়েছি।''

আমাকে চিনতে পেরে ভদ্রলোক বললেন, ''আসুন।''

আমরা গিয়ে বসলাম বাড়ির ড্রয়িংরুমে। ভদ্রলোক আমাকে বললেন, ''বলুন, কী ব্যাপার?''

আমি সরাসরি কাজের কথায় এলাম, ''আপনাদের পারিবারিক সংগ্রহটা আসলে কার?''

''আমার দাদুর। দাদু ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। সাহিত্য ছাড়াও নানা ধরনের বই সংগ্রহের নেশা ছিল তাঁর। নিজে পড়তেন এবং আমাদের পড়তে উৎসাহ দিতেন।''

''আপনাদের বোধ হয় খুব একটা উৎসাহিত করতে পারেননি।''

ভদ্রলোক মৃদু হাসলেন, ''কেন বলুন তো?''

''বাড়িতে উৎসাহী পাঠক থাকলে দাদুর এমন মূল্যবান সংগ্রহ জলের দরে আপনারা কি বেচে দিতে পারতেন?''

''আমার বাবা হাইকোর্টে ওকালতি করতেন। বাবাও খুব পড়তেন। তবে সাহিত্য নয়, আইনের বই।''

''আর আপনি?''

''আমি ব্যাঙ্কে কাজ করি। একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের ধর্মতলা শাখার ম্যানেজার। টাকাপয়সার হিসেবনিকেশ যতটা বুঝি, সাহিত্য-টাহিত্য ততটা বুঝি না। আগ্রহও ছিল না কোনও দিন।''

''আপনার দাদু কি বড়দের সঙ্গে সঙ্গে ছোটদের বইও পড়তেন?''

''কেন বলুন তো?''

''ওই সংগ্রহের মধ্যে ড্যানিলেস ডিফোর এক কপি রবিনসন ক্রুসো আছে।''

ভদ্রলোক চুপ করে বেশ কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, ''থাকতে পারে। তবে বইটা হয়তো দাদুর নয়, আমার দাদার।''

''আপনার দাদা আছেন নাকি?''

''আছেন নয়, ছিলেন। সে তো আজ থেকে পঞ্চাশ-একান্ন বছর আগের কথা।''

''দাদাকে আপনার মনে পড়ে?''

ভদ্রলোক আবার কিছুক্ষণ বসে রইলেন চুপ করে। তারপর উঠে গেলেন। একটু পরে ফিরে এলেন। হাতে একটা পুরনো দিনের পারিবারিক অ্যালবাম।

কোলের উপর রেখে ঝুঁকে পড়ে নিজেই অ্যালবামের পাতা ওলটাতে লাগলেন। ওলটাতে ওলটাতে এক জায়গায় এসে থামলেন। একটা ফোটোর দিকে তাকিয়ে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর অ্যালবামটা এগিয়ে দিলেন আমার দিকে।

আমি ভাল করে দেখলাম। দশ-এগারো বছরের একটি ছেলের ফোটো। বহু দিনের পুরনো। তাই লালচে ও ঝাপসা হয়ে এসেছে। তবুও তার চোখ দু'টি আমাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করল। আশ্চর্য বুদ্ধিদীপ্ত এবং দুষ্টুমিতে ভরা সেই চোখ।

ফোটোর নীচে ছোট্ট করে লেখা ক্যাপশন, 'এগারো বছরের জন্মদিনে টুবলু'।

সে গিয়ে ফ্যানের সুইচটা অফ করে দিল। ফ্যানটা ধীরে ধীরে থেমে গেল, কিন্তু বইয়ের পাতা আগের মতো উলটে যেতে লাগল।

আমরা হাঁ করে তাকিয়ে আছি। কেউ যেন বইয়ের পাতা উলটে যাচ্ছে আপন খেয়ালে। শেষে থামল। যেখানে থামল, সেখান থেকে শুরু হয়েছে একটা নতুন চ্যাপ্টার, 'আই ফাউন্ড দ্য প্রিন্ট অফ আ ম্যান'স নেকেড ফুট'।

মেবারের ইতিহাস আমাকে টানছে। সে এক অমোঘ টান দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের। বইটা পড়ার জন্য আমি ছটফট করছি।

আমি খুঁজছি। রঞ্জিতও খুঁজছে। আমার সঙ্গে হাত লাগিয়েছে। সমস্ত বইয়ের র‍্যাক আঁতিপাঁতি করে খুঁজলাম। প্রতিটি বই সরিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজেও জেমস টডের বইটা উদ্ধার করতে পারলাম না।

হতাশ হয়ে বসে পড়লাম চেয়ারে। আমার সামনে টেবিলের উপরে রবিনসন ক্রুসো। নিরীহ বইটা যেন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি করে হাসছে। আমি বইটা টেনে নিলাম হাতের কাছে। বইটায় একটা পেজমার্ক লাগানো। আমি পেজমার্কের পাতাটা খুলতেই বেরিয়ে পড়ল, 'আই ফাউন্ড দ্য প্রিন্ট অফ এ ম্যান'স নেকেড ফুট'।

এই পেজমার্কটা এখানে এল কী করে? এই তো সেই পেজমার্ক। দু'দিন আগে জেমস টডের বইটা পড়তে পড়তে উঠে যাওয়ার সময় এই পেজমার্কটাই তো লাগিয়ে উঠে গিয়েছিলাম আমি।

পিত্তি জ্বলে গেল আমার। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল বইটার উপর। আমি টান মেরে ছুড়ে ফেলে দিলাম বইটা। বইটা উড়ে গিয়ে পড়ল মেঝেয়। একটা তিরবেঁধা পাখির মতো ডানা ছড়িয়ে।

রঞ্জিত বলল, "দাদা, মাথা গরম কোরো না তো! বইটা যাবে কোথায়? আছে কোথাও। আমি কাল দিনের বেলা ঠিক খুঁজে বের করব। তুমি ছাড়া এ বাড়িতে তো বই পড়ার মতো কেউ নেই।"

আমি অসহায়ভাবে বললাম, "নেই বলছিস?"

রঞ্জিত আর কোনও কথা বাড়াল না। রবিনসন ক্রুসোর বইটা তুলে গুছিয়ে রাখল বইয়ের র‍্যাকে। তারপর চলে গেল কিচেনে আমার জন্য কফি বানাতে। সে ঠিক বুঝতে পেরেছে, মাথা ঠান্ডা করতে এখন আমার চাই এক মগ গরম কফি।

পেজমার্কটা পড়ে আছে মেঝেয়। যেখানে বইটা পড়েছিল, তার চেয়ে একটু তফাতে। বইটে ছুড়ে ফেলার সময় পেজমার্কটা খুলে গিয়েছে।

আমি উঠে গিয়ে মেঝে থেকে তুলে নিলাম পেজমার্কটা। ভাল করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলাম, একটা সার্কাসের টিকিট, 'গ্রেট ইন্ডিয়ান সার্কাস'। তারিখটা অস্পষ্ট। সালটা কোনওরকমে পড়তে পারি। একান্ন বছর আগের একটা টিকিট।

একান্ন বছর আগে তখন আমিও তো নিতান্ত শিশু। সেই বয়সে আমি কি কোনও সার্কাস দেখেছিলাম? হয়তো দাদু কিংবা বাবার হাত ধরে গিয়েছিলাম কোনও সার্কাস দেখতে। এখন আমার আর মনে নেই।

এত দিন সেই টিকিট কি আমি সযত্নে গুছিয়ে রেখেছিলাম? একান্ন বছর পরে কোনও বইয়ের পেজমার্ক করব বলে, না কি একান্ন বছর আগে কোনও বইয়ে কেউ পেজমার্কটা লাগিয়েছিল? একান্ন বছর পরে আমি কি তবে ভুল করে খুলে ফেলেছি সেই বই?

প্রশ্নগুলো জট পাকাল আমার মাথার মধ্যে। স্থির কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারলাম না। ব্যাপারটাকে কেমন যেন রহস্যময় মনে হল। দূর অতীতের স্মৃতির মতো জানলা দিয়ে বকুল ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। আমি ধীরে ধীরে হেঁটে গেলাম বইয়ের র‍্যাকের দিকে।

দুটো বইয়ের মাঝখানে অসহায়ভাবে হেলান দিয়ে আছে রবিনসন ক্রুসো। মিটমিট করে তাকাচ্ছে যেন আমার দিকে। বইয়ের কি প্রাণ আছে? বই কি দীর্ঘশ্বাস ফেলে?

একান্ন বছরের না-ছোঁয়া অতীত কি এত দিন দমবন্ধ করে ছিল দু' মলাটের মধ্যে? সামনে গিয়ে দাঁড়াতে কার যেন দীর্ঘশ্বাস পড়ল। উষ্ণ বাতাসের ঝলক এসে লাগল আমার চোখে-মুখে। আমি

রবিনসন ক্রুসোর বইটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম অভিভূতের মতো।

রাত বেড়ে গিয়েছে। বিশ্বচরাচর লোপ পেয়ে গিয়েছে আমার সামনে থেকে। নির্জন ঘরে শুধু একলা আমি আর আমার হাতে রবিনসন ক্রুসো।

কতক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম, আমার খেয়াল নেই। আমার কোনও হুঁশ ছিল না। আমার হুঁশ ফেরে রঞ্জিতের ডাকে, "দাদা?"

বইটা আমি সযত্নে তুলে রাখলাম বইয়ের র‍্যাকে। তারপর ফিরে এলাম পড়ার টেবিলে।

রঞ্জিত কখন কফিভর্তি মগ আমার টেবিলে রেখে গিয়েছিল, আমি জানতেও পারিনি। গরম কফি জুড়িয়ে জল হয়ে গিয়েছে। কফির মগটা তুলে আমি চুমুক দিতে গেলাম। রঞ্জিত বলল, "অনেক রাত হয়েছে। এবার রাতের খাবার খেতে চলো।"

শিবপুর ট্রাম ডিপো ছাড়িয়ে একটা গলির মধ্যে বাড়িটা। লাল রঙের ইট বের করা পুরনো আমলের বাড়ি।

দরজায় কড়া নাড়তেই ফিনফিনে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক এসে দরজা খুললেন। নমস্কার করতেই ভদ্রলোক বললেন, "আপনি?"

"কয়েক দিন আগে আপনাদের পারিবারিক সংগ্রহ থেকে কিছু বই আমি কিনে নিয়ে গিয়েছি।"

আমাকে চিনতে পেরে ভদ্রলোক বললেন, "আসুন।"

আমরা গিয়ে বসলাম বাড়ির ড্রয়িংরুমে। ভদ্রলোক আমাকে বললেন, "বলুন, কী ব্যাপার?"

আমি সরাসরি কাজের কথায় এলাম, "আপনাদের পারিবারিক সংগ্রহটা আসলে কার?"

"আমার দাদুর। দাদু ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। সাহিত্য ছাড়াও নানা ধরনের বই সংগ্রহের নেশা ছিল তাঁর। নিজে পড়তেন এবং আমাদের পড়তে উৎসাহ দিতেন।"

"আপনাদের বোধ হয় খুব একটা উৎসাহিত করতে পারেননি।"

ভদ্রলোক মুচকি হাসলেন, "কেন বলুন তো?"

"বাড়িতে উৎসাহী পাঠক থাকলে দাদুর এমন মূল্যবান সংগ্রহ জলের দরে আপনারা কি বেচে দিতে পারতেন?"

"আমার বাবা হাইকোর্টে ওকালতি করতেন। বাবাও খুব পড়তেন। তবে সাহিত্য নয়, আইনের বই।"

"আর আপনি?"

"আমি ব্যাঙ্কে কাজ করি। একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের ধর্মতলা শাখার ম্যানেজার। টাকাপয়সার হিসেবনিকেশ যতটা বুঝি, সাহিত্য-টাহিত্য ততটা বুঝি না। আগ্রহও ছিল না কোনও দিন।"

"আপনার দাদু কি বড়দের সঙ্গে সঙ্গে ছোটদের বইও পড়তেন?"

"কেন বলুন তো?"

"ওই সংগ্রহের মধ্যে ড্যানিলেস ডিফোর এক কপি রবিনসন ক্রুসো আছে।"

ভদ্রলোক চুপ করে বেশ কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, "থাকতে পারে। তবে বইটা হয়তো দাদুর নয়, আমার দাদার।"

"আপনার দাদা আছেন নাকি?"

"আছেন নয়, ছিলেন। সে তো আজ থেকে পঞ্চাশ-একান্ন বছর আগের কথা।"

"দাদাকে আপনার মনে পড়ে?"

ভদ্রলোক আবার কিছুক্ষণ বসে রইলেন চুপ করে। তারপর উঠে গেলেন। একটু পরে ফিরে এলেন। হাতে একটা পুরনো দিনের পারিবারিক অ্যালবাম।

কোলের উপর রেখে ঝুঁকে পড়ে নিজেই অ্যালবামের পাতা ওলটাতে লাগলেন। ওলটাতে ওলটাতে এক জায়গায় এসে থামলেন। একটা ফোটোর দিকে তাকিয়ে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর অ্যালবামটা এগিয়ে দিলেন আমার দিকে।

আমি ভাল করে দেখলাম। দশ-এগারো বছরের একটি ছেলের ফোটো। বহু দিনের পুরনো। তাই লালচে ও ঝাপসা হয়ে এসেছে। তবুও তার চোখ দু'টি আমাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করল। আশ্চর্য বুদ্ধিদীপ্ত এবং দুষ্টুমিতে ভরা সেই চোখ।

ফোটোর নীচে ছোট্ট করে লেখা ক্যাপশন, 'এগারো বছরের জন্মদিনে টুবলু'।

অ্যালবামটা হাত বাড়িয়ে নিতে নিতে ভদ্রলোক বললেন, "এই ফোটোটা দেখলে তবেই শুধু আবছাভাবে মনে পড়ে। দাদা যখন মারা যায়, তখন আমার বয়স মাত্র তিন।"

"মৃত্যুটা কীভাবে হয়েছিল?"

"শুনেছি, দাদা খুব দুরন্ত ছিল। হয়তো বইয়ের র‍্যাকে চড়তে গিয়েছিল। বইসুদ্ধ ভারী র‍্যাক ঘাড়ের উপর এসে পড়ল, আর তাতেই সে মারা গেল। তারপর দাদুও আর বেশি দিন বাঁচেননি।"

ঠিক সন্ধের মুখে আমি বাড়ি ফিরে এলাম। রঞ্জিতকে বললাম, "আমার পড়ার টেবিলের সামনে আর-একটা চেয়ার লাগাতে এবং দু' মগ কফি বানাতে।"

সে একটু অবাক হল। তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে, "দু' মগ কফি?"

আমি তার কথার কোনও জবাব না দিয়ে চটপট তৈরি হয়ে নিলাম। হাত-মুখ ধুয়ে ঢুকলাম আমার পড়ার ঘরে।

আজ আর কারও জন্য অপেক্ষা করলাম না। বইয়ের র‍্যাক থেকে নিজের হাতে রবিনসন ক্রুসো বইটা নিয়ে পড়ার টেবিলে এসে বসলাম।

টেবিলের ওপারে একটা শূন্য চেয়ার। ঠিক আমার মুখোমুখি। চেয়ারটা আগে ছিল না। অন্য ঘর থেকে এনে রঞ্জিত লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছে।

বইটা হাতে নিয়ে আমি তাকিয়ে থাকলাম শূন্য চেয়ারটার দিকে।

একটু পরেই মনের মধ্যে খসখস আওয়াজ। চেয়ারটা নড়ে উঠল। ধপাস করে একটা শব্দ। আমি দেখতে পাচ্ছি না কিছুই, কিন্তু বুঝতে পারছি। কেউ যেন এসে বসল খালি চেয়ারটায়, ঠিক আমার মুখোমুখি।

আমি বইটা খুলে প্রথম পরিচ্ছেদ থেকেই পড়তে শুরু করলাম, "আই ওয়াজ বর্ন ইন দ্য ইয়ার ১৬৩২।"

বইটা ছিটকে সরে গেল আমার হাত থেকে। ঘুরে গেল খালি চেয়ারটার দিকে। ফরফর করে পাতা ওলটাতে শুরু করল। থামল সেই, আই ফাউন্ড দ্য প্রিন্ট অফ এ ম্যান'স নেকেড ফুট-এ।

বইটা আবার চলে এসেছে আমার হাতের নাগালে। আমি বুঝতে পারলাম, এখান থেকেই শুরু করতে হবে। শুরু করতে যাচ্ছি, রঞ্জিত এসে ঢুকল। তার দু' হাতে দু' মগ কফি। মগ দুটো নামিয়ে রাখল আমার টেবিলের উপর। গরম কফি। ধোঁয়া উঠছে। কফির সুঘ্রাণে চনমনে হয়ে উঠল ঘরের বাতাস। আমি রঞ্জিতকে বললাম, "এখন তুই কী করবি?"

"আমিও তোমার গল্প শুনব।"

"কিন্তু আমি তো বইটার মাঝখান থেকে পড়তে শুরু করব।"

"এখন মাঝখান থেকে শুনি। পরে না হয় তুমি আমাকে গল্পের গোড়ার দিকটা মুখে-মুখে শুনিয়ে দিয়ো।"

"বেশ, তবে শোন।"

কফিতে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে আমি পড়তে শুরু করলাম। আমি নিজে পড়ি, সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় তর্জমা করে শোনাই, "সমুদ্রের ধারে নৌকোটা নোঙর করা আছে। বেলা দুপুর। আমি হেঁটে যাচ্ছি সেই দিকে। নির্জন সমুদ্র সৈকত। সহসা আমি অবাক হয়ে দেখলাম, নরম বালির উপরে কীসের যেন ছাপ। একজন মানুষের খালি পায়ের চিহ্ন..."

রাত গড়িয়েছে গভীর রাতের দিকে। কোনও দিকে আমার খেয়াল ছিল না। গল্প তার অমোঘ টানে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছে শেষ পর্যন্ত। এক সময় গল্পটা শেষ হল।

আগে খেয়াল করিনি। এখন করলাম। বইয়ের শেষ পৃষ্ঠায় গল্পটা যেখানে শেষ হয়েছে, ঠিক তার নীচেই কাঁচা হাতের আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা, 'টুবলু'।

আটান্ন বছর বয়সে ড্যানিয়েল ডিফো লিখেছিলেন রবিনসন ক্রুসোর গল্প। প্রায় পৌনে তিনশো বছর ধরে সেই গল্প আকৃষ্ট করেছে সারা পৃথিবীর অসংখ্য ছেলেমেয়েকে। মুগ্ধ রেখেছে তাদের।

এমন যে গল্প, তার অর্ধেকটা সে শুনেছিল দাদুর মুখে। বাকি অর্ধেকটা শোনার জন্য টুবলু যে একাগ্র

বছর ধরে অপেক্ষা করে থাকবে, তাতে অবাক হওয়ার কী আছে?

রঞ্জিত বলে উঠল, ''দারুণ!''

আমি তার দিকে ঘুরে তাকাতে গিয়েও ফিরে তাকালাম শূন্য চেয়ারটার দিকে। তাজা বকুলের গন্ধে ঘরের বাতাস ভারী হয়ে আছে। চেয়ারটা নড়ে উঠল। কেউ কি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল?

মেঝেয় খসখস শব্দ। শব্দ কি হেঁটে যায়? ক্ষীণ হতে হতে রঞ্জিতকে পাশ কাটিয়ে খোলা দরজা দিয়ে শব্দটা বাইরের অন্ধকারে মিশে গেল।

আমি বইটা এক পাশে সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালাম। নজর পড়ল কফির মগের দিকে। একটুও তলানি পড়ে নেই। দু'টি কফির মগই বেমালুম খালি।

পরের দিন। বকুল গাছটা গন্ধ ছড়াতে শুরু করতেই আমি এসে বসলাম পড়ার টেবিলে।

কোথায় ছিল? কে রাখল বইটা? আমার পড়ার টেবিলে ফিরে এসেছে জেমস টডের 'অ্যানালস অ্যান্ড অ্যান্টিকুইটিজ অফ রাজস্থান'।

বইটা পড়তে পড়তে যেখানে ছেড়েছিলাম, পেজমার্ক লাগিয়ে উঠে গিয়েছিলাম, সেই পেজমার্কটা আজও আছে সেইখানেই।

আমি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি পেজমার্কটার দিকে। সেই পেজমার্ক, একান্ন বছর আগের একটি সার্কাসের টিকিট।

২ মার্চ ২০০৭

অলংকরণ: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

পাহাড়ি উইলসন

ইন্দ্রনীল সান্যাল

বাঁদিকের বাটন দাবাও, বুম! উড়ে গেল শত্রুপক্ষের লোকালয়। ডান দিকের বাটন দাবাও, আবার বুম! উড়ে গেল একটা হাসপাতাল। ফরোয়ার্ড বাটন দাবাও, এগোও, এগোও... বিপক্ষ ঝপাঝপ বানিয়ে ফেলছে নতুন নতুন অস্ত্র কারখানা। সেখানে তৈরি হচ্ছে মিসাইল, রকেট, গ্রেনেড, রকেট লঞ্চার, সুইসাইড-বম্বার। ডাইনে চলো, বুম বুম! বাঁয়ে চলো, বুম বুম বুম! আগে বাড়ো, ছোড়ো রকেট, বুম বুম বুম বুম! স্কোর বাড়ছে, বাড়ছে... হঠাৎই বিপক্ষের ছোড়া স্মোক বম্বের ধোঁয়ায় ঢেকে গেল পুরো স্ক্রিন। তার মধ্যে থেকে একটা বাজুকা হাতে সাক্ষাৎ যমের মতো বেরিয়ে এল একটা সাইবারনেটিক অর্গানিজ়ম বা সাইবর্গ। সরাসরি রুরুর দিকে বাজুকা তাক করল সে। গাম্‌ম্‌ম...!

''গেম ওভার। ইউ লস্ট। স্কোর— জিরো:ওয়ান। রিজ়িউম নিউ গেম অর কুইট?'' ভিডিওগেমিং কনসোলের স্ক্রিনের নিউ গেম অপশনে গিয়ে ক্লিক করল রুরু। এবার পরের খেলা। হঠাৎই বসার ঘরে টিভি দেখতে থাকা মায়ের গলা শোনা গেল, ''রুরু, খেতে এসো।''

''রুরু, খাবে না?''

''বো।''

''রুরু, হোমটাস্ক কমপ্লিট?''

''প্লিট।''

''ম্যাথ্‌স রেডি? বাংলা ডেফিনিশন মুখস্থ?'

''স্থ।''

''বলো তো, অচেনার আনন্দ বলতে কী বোঝো?''

বাটনের দাপটে ফাইটার প্লেন ডাইনে-বাঁয়ে উড়ছে, আগুপিছু করছে বিশাল চেহারার কামান, দমাদ্দম বোমার ঘায়ে ভেঙে যাচ্ছে ব্যারিকেড, অস্ত্রশস্ত্র, বাঙ্কার ও হেলিপ্যাড, লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লের প্রতিটি পিক্সেল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে ভিডিওগেমের ওয়র ক্রাই... বুম বুম বুম বুম!

''কনগ্র্যাচুলেশন্‌স। ইউ ওন। স্কোর— ওয়ান:ওয়ান। রিজ়িউম নিউ গেম অর কুইট?'' রুরুর ঘাম গড়াচ্ছে, হার্টবিট যেন পি টি ঊষা। রুরু উত্তর দিল, ''অনধিগত সত্যের সন্ধান লাভ করে, নবীনতার আস্বাদনের মধ্য দিয়ে, জ্ঞানার্জনী বৃত্তির চরিতার্থতায়, আত্মোপলব্ধির যে রসগোল্লা, তাই অচেনার আনন্দ।''

টিভি দেখতে দেখতে হাসিতে ফেটে পড়লেন রুরুর বাবা, ''ওরে কাউচ পোট্যাটো। ওটা রসগোল্লা নয়, রসোল্লাস। আত্মোপলব্ধির রসোল্লাস। নিজের জানার আনন্দ। ব্যায়াম না করে, জাঙ্ক ফুড খেয়ে আর ভিডিও গেমস খেলে গত তিন বছরে তোমার তেরো কেজি ওজন বেড়েছে। এর পরে প্রশ্নের উত্তরে রসগোল্লা লিখলে, নম্বরেও রসগোল্লাই আসবে। বুঝলে ভিডিয়ট?''

''লাম।''

রুরু অপশনে গিয়ে নিউ গেমে ক্লিক করল।

এই সেই সময়। যখন রুরুর মা চোখ গোলগোল করে, মুখটা অল্প খুলে, ঘাড়টা এক দিকে বাঁকিয়ে টেলিভিশনের পরদার দিকে তাকিয়ে থাকবেন। আর থেকে থেকেই বলে উঠবেন, ''এম্‌মা। শাশুড়িটা

আবার কোমায় চলে গেল?'' কিংবা, ''যাঃ! মেজোবউটার মুখেও প্লাস্টিক সার্জারি হল?'' কিংবা, ''হায় হায়! তৃতীয় পক্ষের বরটাও গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মরে গেল?'' কেবল বিজ্ঞাপনের বিরতির সময় খুবই বিরক্তির সঙ্গে, রিমোট কন্ট্রোলের বোতাম টিপে রুরুর বাবাকে খেলা কিংবা খবরের চ্যানেলটা কিছুক্ষণের জন্য দেখিয়ে দেবেন। তবে রিমোটটা হাতছাড়া করবেন না। কেননা, কে না জানে, রিমোট যার টিভি তার।

এই সেই সময়! যখন রুরুর বাবা অফিস থেকে ফিরে, বড়কর্তার নিন্দে করতে করতে জামাকাপড় পালটাবেন। তারপর ফুল-ফুল সিল্কের একটা লুঙ্গি পরে চেঁচিয়ে স্বগতোক্তি করবেন, ''ওফ! খেটে খেটে জান কয়লা হয়ে গেল। হ্যাঁ গো, এক কাপ কফি হবে নাকি?''

তারপর মায়ের তরফে কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে টিভির সামনে বসে পড়বেন। আর থেকে-থেকেই ফুট কাটবেন, ''ধুস! এই জন্যই দেশটার কিছু হল না।'' কিংবা, ''সত্যি, আজকালকার ছেলেমেয়েগুলো গোল্লায় গ্যাসে।'' কিংবা, ''ধ্যাত্তেরি, এই টিম নিয়ে ইন্ডিয়া জিতবে ওয়ার্ল্ড কাপ?''

অবশ্য তার আগে রুরুর ঘরে ঢুকে মোবাইল ফোনটা চার্জে দিয়ে, রুরুর ফোলা গাল দুটো টিপে বলবেন, ''হ্যাঁ রে মোটুরাম, হ্যাঁ রে কাউচ পোট্যাটো, হ্যাঁ রে রসগোল্লা, ফার্স্ট গ্রেড ওবেসিটিতে ভুগছিস। এবার একটু ব্যায়াম-ফ্যায়াম কর।''

এই সেই সময়। যাকে টেলিভিশনের ভাষায়, ইংরেজিতে, 'প্রাইম টাইম' বলা হয়।

যখন রুরু বাবা-মা'র যাবতীয় দুষ্টুমি সহ্য করবে। বদলে নিজেও নানারকম দুষ্টুমি করবে। যেমন প্লে স্টেশনে ভিডিওগেম খেলতে খেলতে এক বোতল কোলা সাবড়ে দেবে। মা'র কাছে রাত দুটো পর্যন্ত টিভি দেখার পারমিশন আদায় করে নিতে নিতে এবং ইন্টারনেট খুলে সাইবারস্পেসের বন্ধুর সঙ্গে চ্যাট করতে করতে দু' প্যাকেট পোট্যাটো চিপস সাঁটিয়ে দেবে! বাবার মোবাইলে 'আকাশ ভরা সূর্য তারা' কলার টিউনটা বদলে 'ধুম মচালে ধুম' করে দিতে দিতে, কিংবা মেসেজের ইনবক্সে গিয়ে জোকসগুলো পড়ে হাসতে হাসতে একটা বার্গার খেয়ে নেবে। ওগুলো তো রুরু জানেই। ওগুলো যে বাবাও জানেন, হাসিটা এই জন্য। এবং এই সব করতে করতেই হিস্ট্রির 'সিপাহি বিদ্রোহের চ্যাপ্টার'টাও মুখস্থ করে নেবে। পরীক্ষায় ওটা আসছেই।

আজকের প্রাইম টাইমটা অবশ্য আলাদা। এবং ব্যাপক বোরিং। কেননা, সময়টা এক হলেও, লোকগুলো এক হলেও, জায়গাটা একদম আলাদা। এটা বাড়ি নয়, গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের হোটেল। এটা পশ্চিমবাংলা নয়, উত্তরাঞ্চল। এটা কলকাতা নয়, ভৈরবঘাঁটি বা স্থানীয় উচ্চারণে ভৈরোঁঘাটি। কলাকাতা থেকে দুন এক্সপ্রেসে চেপে হরিদ্বার। সেখান থেকে হৃষীকেশ। সেখান থেকে ভাড়া করা অ্যাম্বাসাডারে চেপে গঙ্গোত্রী যেতে গিয়ে রাস্তায় ধসের খবর শুনে হরশিল উপত্যকায় আটকে পড়া। রাস্তা সারাতে দু'দিন লাগবে শুনে গাড়ি ঘুরিয়ে এই ভৈরোঁঘাটি। নাকের বদলে নরুন। গঙ্গোত্রীর বদলে ভৈরোঁঘাটি।

ফল হিসেবে বাবা ল্যাগব্যাগার্নিসের মুখোশ পরে নিয়েছেন। আর মা গোমড়াথেরিয়ামের। ছেলের অ্যানুয়াল পরীক্ষার পর চার ধাম বেড়াতে বেরিয়ে মাঝরাস্তায় আটকে পড়তে কারই বা ভাল লাগে! রুরুও চুপচাপ। কেননা, তার চার ধাম— ইন্টারনেট, গেমিং কনসোল, মোবাইল বা টিভি, কোনওটাই হাতের নাগালে নেই। প্রথম দুটো তো এই ভূতেপাওয়া জায়গায় ভুলে যাওয়াই ভাল। মোবাইলের টাওয়ার পাওয়া যাচ্ছে না। আর টিভিটা রোজকার মতো মা-বাবার দখলে।

বিকেলে তিনজনে চড়াইয়ের রাস্তা ধরে হাঁটতে বেরিয়েছিলেন। আকাশের রং 'মেরাওয়ালা ব্লু'। মাঝেমধ্যে স্থানীয় মানুষেরা ঘোড়া বা খচ্চরে চড়ে যাচ্ছে। ছোটরা যাচ্ছে টাট্টু ঘোড়া বা পনিতে। পরনে ধুতি-কামিজ। পায়ে মোচড়ি বা চামড়ার নাগরা।

''বাবা, ওটা কী পাখি?'' প্রশ্ন করল রুরু।

গাছের ডালে একটা কালো রঙের পাখি বসে। কাকের মতোই দেখতে, কিন্তু ঠোঁটটা হলদেটে।

বাবা একগাল হেসে বললেন, "ওরে রসগোল্লা, ওটা কাক। স্থানীয় লোকদের ভাষায় 'চো'। এরা পাখিটাকে অশুভ লক্ষণ বলে মনে করে। আমিও সকালে দেখে চিনতে পারিনি। চৌকিদার গোপাল দুবেকে জিজ্ঞেস করতে, ও-ই আমাকে এই কথা বলল।"

বাঁ দিকে অনেক নীচে ভাগীরথী নদীর থেকে ভাগ হয়ে গিয়েছে তার শাখা জড়গঙ্গা। সেখান থেকে উঠে আসছে থোকা থোকা সাদা কুয়াশা। মা শালটা গায়ে ভাল করে জড়িয়ে বললেন, "তুমি বাপু অলক্ষুনে কথা বোলো না তো! চলো, হোটেলে ফিরি।"

রুরু মোটাসোটা চেহারাটা নিয়ে বাবা-মা'র সঙ্গে তাল রাখতে পারছিল না। কোনও রকমে থপথপ করে হাঁটতে হাঁটতে বলল, "চৌকিদার গোপাল আঙ্কল বলেছিল, হোটেল থেকে উতরাই রাস্তায় একটা বুড়ি নাকি সন্ধেবেলা জিলিপি ভাজে। দুধে ডুবিয়ে খেতে হয়। আমরা খাব না?"

বাবা কিছু বলার আগেই মায়ের কড়া গলার উত্তর শোনা গেল, "গোপাল এও বলেছে যে, এখানে কী একটা সাহেব ভূত আছে। রাত্তিরে সে নাকি ঘোড়ায় চড়ে চার দিকে পাহারা দেয়। সন্ধের পর কোথায় যাওয়া যাবে না।"

শুনে রুরুর বেদম হাসি পেল। ভূতের পাহারা তো ভাল জিনিস, মা মিষ্টি খেতে না দেওয়ার জন্য অন্য কোনও অজুহাত দিতে পারতেন।

বড়রা খুব বেশি বদলান না। ডিনারের পরে বাবা আর মা টিভির রিমোট নিয়ে ঠান্ডা লড়াইটা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই ফাঁকে নীল জিনসের উপর নীল পুলওভার পরে একটা দশ টাকার নোট নিয়ে রুরু হোটেল থেকে বেরোল। বিকেলে যে রাস্তা ধরে গিয়েছিল, তার উলটো দিকে উতরাই বরাবর হেঁটে নেমে এল অনেকটা নীচে। হ্যাঁ, গোপাল আঙ্কেলের কথামতো দোকানটা সত্যিই আছে। রুরু ছ'টা জিলিপি আর এক ভাঁড় দুধ খেল। এক গাল ফোকলা হাসি হেসে বুড়ি একটা শতছিন্ন এক টাকার নোট ফেরত দিল। টাকাটা নিয়ে রুরু চড়াইয়ের পথ ধরল।

হঠাৎই একটা অজানা গুড়গুড় শব্দে চমকে উঠল রুরু। শব্দটা অনেক উপরে পাহাড়ের গা বেয়ে আসছে। কীসের আওয়াজ কে জানে বাবা। রুরু জোর কদমে হাঁটতে লাগল। বাবা-মাকে লুকিয়ে এই লুভিষ্টিরগিরি ঠিক হয়নি। বিকেলে দেখা কাকটার কথা মনে পড়ে গেল রুরুর। মনে পড়ে গেল বাবার বলা কুসংস্কারের কথাটাও। মৃদু গুড়গুড় আওয়াজটা হোম থিয়েটারের কায়দায় চার দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। উপর থেকে নীচের দিকে নেমেও আসছে খুব তাড়াতাড়ি। রুরু দৌড় লাগাল। একে জাঙ্কফুড খাওয়া, ব্যায়াম না করা চর্বিতে থলথলে শরীর; তার সঙ্গে চড়াই বরাবর দৌড়। রুরু যেন আর পারে না। হোটেল থেকে কতটা দূর এসেছিল সে? কতটা? পায়ের নীচে মাটি কাঁপছে, গুড়গুড় আওয়াজটা বদলে গুমগুম হয়ে যাচ্ছে, টুপটাপ ধুপধাপ করে উপর থেকে বৃষ্টি হচ্ছে ছোট থেকে মেজো থেকে বড় সাইজের নুড়ি পাথর ও বোল্ডার... রুরু দৌড়য়। আর দুটো বাঁক? তারপরে হোটেলের আলো দেখা যাবে কি?

অকস্মাৎ পাহাড়, রাস্তা, উপত্যকা, গাছপালা, আকাশ সবকিছু এক ধাক্কায় ভাসিয়ে দিল একটা সর্বস্বপ্লাবী জলস্রোত। ধসের কারণে গতিপথ বদলে যাওয়ায় ধরিত্রীর পেট চিরে উঠে আসা জলের তোড়ের আদিম উচ্ছ্বাসে, হড়কা বানের স্রোতে, সব কিছু ভেসে গেল মুহূর্তের মধ্যে। সঙ্গে রুরুও।

"মা গো!" কারও একটা শক্ত হাতের চাপ একটা নির্দিষ্ট ছন্দে বারবার বুকে আঘাত করছে। আর ছন্দ মিলিয়ে নাক-মুখ দিয়ে ভলভল করে বেরিয়ে আসছে পেঁকো, লোনা জল। কষ্টে ছাতি ফেটে যাচ্ছে, "মা গো!"

"সিমস টু বি ফ্রম বেঙ্গল।" যে চওড়া সাদা হাত দুটো এতক্ষণ রুরুর বুক থাবড়ে জল বের করছিল, তার মালিক কথাটা বলল। প্রায় সাড়ে ছ' ফুট লম্বা শীর্ণ চেহারার এক সাহেব। বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। পরনে ডার্ক ট্যান রঙের রাইডিং জ্যাকেট, দুধসাদা ব্রিচেস বা ঘোড়ায় চড়ার চোঙা প্যান্ট, কালো চামড়ার রাইডিং বুট। মাথায় একটা

কালো বোলার হ্যাট। সাহেবের চেহারা দেখে সম্ভ্রম জাগে। পাশে দাঁড়িয়ে একটা খয়েরি রঙের আরবি ঘোড়া। এদিকের কড়া রোদ্দুরে সাহেবের গায়ের রং যে কয়েক পোঁচ কালো হয়ে গিয়েছে, তা এই জ্যোৎস্না রাতেও বোঝা যাচ্ছে। কাশতে কাশতে ঘাড় নেড়ে রুরু হ্যাঁ বলল।

"আই নো বেঙ্গলি। তোমার নাম কী?"

রুরু নাম বলতেই সাহেব বলল, "স্ট্রেঞ্জ নেম! এনিওয়ে, কাম উইথ মি।" তারপর রুরুর বিশাল চেহারাটা এক ঝটকায় ঘোড়ার পিঠে তুলে রেকাবে এক পা দিয়ে তড়াক করে স্যাডলে উঠে বসল। লাগামে টান পড়তেই নাক দিয়ে ফররর শব্দ করে ঘোড়াটা চলতে শুরু করল।

চাঁদের আলো আর জমাট কুয়াশার লুকোচুরির মধ্যে রুরুর সামনে ফুটে উঠল অপার্থিব একটা দৃশ্য। খাদের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত বিস্তৃত, দড়ি আর কাঠ দিয়ে তৈরি একটা ঝুলন্ত সেতু। রুরু জানে এগুলোকে সাসপেনশন ব্রিজ বলে। চাঁদ ও কুয়াশা, আলো ও আঁধার, এপার আর ওপারের মধ্যে বিছিয়ে থাকা সেই সেতুতে ঘোড়াটা প্রথম কদম ফেলতেই দুলে উঠল পুরো সেতু। খট। দ্বিতীয় কদম পড়তেই দুলুনিটা বাড়ল। খট। দড়ি আর কাঠের গ্রন্থি থেকে প্রতিবাদ ভেসে এল, ক্যাঁচ, ক্যাঁচ, ক্যাঁচ—খট খট খট...। ভয়ে কেঁপে উঠে রুরু সাহেবের লাগাম ধরা হাতটা চেপে ধরে প্রশ্ন করল, "তো-তো-তোমার নাম কী?"

"ফ্রেডরিক ই উইলসন। প্রাক্তন অফিসার, থার্টি ফোর্থ ইনফ্যান্ট্রি, ব্যারাকপুর। যেখানে ১৮৫৭ সালের ৮ এপ্রিল মঙ্গল পান্ডেকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয় এবং সিপাহি বিদ্রোহ শুরু হয়।" রুরুর কানে ফিসফিস করে বলতে থাকে উইলসন সাহেব, "আমি বরাবরই নেটিভদের পক্ষে ছিলাম। ব্যারাকপুরের এক মহিলাকে আমি বিবাহও করি। ওর নাম গোলাপি। ওখানে আমার পাংখাপুলার ছিল গোপাল দাস আর সহিস ছিল লছমন দুবে। মিউটিনি শুরু হওয়ার পরপরই গোপাল আর দুবের সঙ্গে আমি আর গোলাপ ট্রেনে করে রানিগঞ্জ পালিয়ে আসি। ১৮৫৪ সালেই হাওড়া থেকে রানিগঞ্জ পর্যন্ত রেল লাইন পাতার কাজ হয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে হেঁটে, গোরুর গাড়িতে, আরও নানারকমভাবে

আমরা পৌঁছই গাড়োয়াল রেঞ্জের তেহরিতে। তেহরির রাজার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। কিন্তু তিনি ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অনুগত। আশ্রয় তো দিলেনই না উলটে কোম্পানিকে খবর দিয়ে দিলেন। আমরা তখন প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে এলাম এই হরশিলে, জঙ্গলের মধ্যে। কাঠের ব্যাবসা শুরু করলাম। কিছুদিন পরে টাকাপয়সা জমলে একটা বাড়িও করলাম। এখানকার লোকেরা খুব গরিব। ওদের জন্য রাস্তাঘাট বানিয়ে দিলাম। ওরা তাই আমাকে খুব মানে। বলে 'রাজা উইলসন'। আমার স্ত্রীকে বলে 'গুলাবি ঠাকুরাইন'। আমি ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াই বলে কেউ কেউ আড়ালে আমাকে 'পাহাড়ি উইলসন' বলেও ডাকে। এই সাসপেনশন ব্রিজটাও আমার নকশায় তৈরি। ওরা প্রথম প্রথম এই ব্রিজ পেরোতে ভয় পেত। আমিই ঘোড়ায় চড়ে বারবার এপার ওপার করে ওদের ভয় কাটিয়েছি।''

রাজা উইলসনের এত গল্পের মধ্যে রুরু টেরও পায়নি কখন যেন সেতুটা শেষ হয়ে এসেছে। অন্য প্রান্তে কুয়াশার মধ্যে লালটেন হাতে কয়েকজন দাঁড়িয়ে। পরনে স্থানীয় পোশাক। হাতে সড়কি আর লাঠি। রাজা চিৎকার করে বলল, ''হুকুমদার?''

শব্দটা পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হতে হতে মিলিয়ে গেল। ওদের মধ্যে একজন বিনীত কণ্ঠে বলল, ''দুবে হুজৌর।''

এক লাফে ঘোড়া থেকে নেমে রুরুকেও ঘোড়া থেকে নামাল রাজা। দুবে ঘোড়াটা নিয়ে আস্তাবলের দিকে চলে গেল। অন্য একজনের হাতে রুরুকে সঁপে দিয়ে রাজা বলল, ''গোপাল, একে সাফসুতরো করে ডাইনিংরুমে নিয়ে এসো। বেচারি ঠান্ডায় কাঁপছে।''

গোপাল নামের মানুষটি রুরুকে কোলে নিয়ে একটা কম্বল জড়িয়ে ধরল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে বলল, ''তুমি বাঙালি? আমিও বাঙালি। আমার নাম গোপাল দাস। তুমি 'গোলাপদাদা' বলে ডেকো।''

বাড়ি তো নয় প্রাসাদ। নাম 'ফ্রেডরিক ম্যানসন'। কাঠের বিশাল দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল দু'জনে। তারপর কার্পেটে মোড়া কাঠের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় পৌঁছল। দো[illegible] সেখানকারই [illegible] গোপালদাদা [illegible] ভিজে জামাকাপড় ছাড়িয়ে গা-মাথা ভাল করে মুছে নতুন ধোতি-কামিজ পরিয়ে পায়ে মোচড়ি গলিয়ে একতলায় নিয়ে এল। অন্য একটা ঘরে গুলাবি ঠাকুরাইন ছোটদের ধমকাচ্ছিলেন। রুরু আন্দাজ করতে পারল, তার পরনের পোষাকগুলো কার। একতলার খাবারঘরেই রাজার সঙ্গে আবারও দেখা হল। রোজ়উড কাঠের বিশাল ডাইনিংটেবিলে এলাহি আয়োজন। ভারতীয় ডাল-চাওল ছাড়াও সাহেবি খাবার বলতে আইরিশ স্টু, ডেভিলড কিডনি, এই সব রয়েছে। সব কিছুই গোগ্রাসে খেল রুরু। তার খাওয়া খর চোখে দেখে নিয়ে রাজা বলল, ''গোপাল, ওকে শুইয়ে দাও। আর কাল ভোরে আখড়ায় নিয়ে এসো।''

বিশাল ফোর-পোস্টার খাটে ঘুমিয়ে পড়ার আগে রুরু প্রশ্ন করল, ''গোপালদাদা, আখড়া কী?''

গোপালদাদা মুচকি হেসে বলল, ''কুস্তির আখড়া। কাল ভোরেই দেখতে পাবে।''

সূর্য ওঠার আগেই রুরুর শত আপত্তি সত্ত্বেও একটা লাল ছোট প্যান্ট পরিয়ে প্রাসাদের পিছনে গাছের আড়ালে আখড়ায় নিয়ে গেল। গাড়োয়ালি ছেলের দল লাল প্যান্ট পরে বৃত্তাকার দাঁড়িয়ে। কারওরই শরীরে চর্বির লেশমাত্র নেই। ঠিক যেখানে যেটুকু পেশি দিলে ভাস্কর্য নিখুঁত হয়, প্রত্যেকেরই সেরকম চেহারা। নিজের গালে, বুকে, পেটে, কোমরে, থাইয়ে চর্বির দুলুনি অনুভব করে রুরু লজ্জা পেয়ে গেল। অবশ্য পালোয়ানরা কেউই রুরুকে ঘুরেও দেখল না। কেননা, তারা দেখছে একটা কুস্তি। রাজা উইলসনের সঙ্গে সহিস দুবের। ত্বকের রঙের ব্যবধান মুছিয়ে দিয়েছে ভৈরোঁঘাটির মিহিন ধুলো। কে সাহেব আর কে নেটিভ, তা বোঝাই যাচ্ছে না। মিনিট তিনেকের ধুলো উড়ানো কুস্তির শেষে ধোবি প্যাঁচে দুবে রাজাকে হারিয়ে দিল। সবাই ফটাফট হাততালি দিতে লাগল। কুস্তির শেষে ধূলিধূসরিত রাজা, গভীর নীল চোখ দিয়ে ভাল করে দেখল রুরুকে। তারপর বলল, ''রসগুল্লা ফ্রম বেঙ্গল।''

কথাটার মধ্যে তার জল ছিল। রুরু চোখ নামিয়ে নিল। রাজা রুরুর কাঁধে একটা থাবড়া মেরে বলল, ''আই উইল ট্রেন দিস চাইল্ড।''

ব্যস, শুরু হয়ে গেল। রোজ ভোরবেলা প্রথমে দৌড়। তারপর আখড়ার মাটি কপালে লেপে মুগুর ভাঁজা, ডন-বৈঠক দেওয়া। প্রথম প্রথম কষ্টে বুক ফেটে যেত। দশ পা দৌড়নোর পর ফুসফুসটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে মনে হত। দেখে পালোয়ানরা হাসত। ডন দেওয়ার সময় মনে হত, হাত দুটো ছেঁড়া কাপড়ে তৈরি। আখড়ার মাটিতে চিবুক ঠুকে পড়লে রক্ত বেরিয়ে যেত। দেখে পালোয়ানরা আরও হাসত। বৈঠক দিতে গিয়ে পাঁচবারের মাথায় হাঁটু দুটোকে মনে হত, ময়দার ড্যালা। রুরুর বসে পড়া দেখে হাসির হর্‌রায় ফেটে পড়ত পালোয়ানরা। রুরুর চোখ দিয়ে জল পড়ত টপটপ করে। কিন্তু রাজার গায়ে ছ্যাঁকা ধরানো, ''কাম অন রসগুল্লা! ট্রাই এগেন!''

শুনে কোথা থেকে যেন শরীরে আসত নতুন উদ্যম। কারও তোয়াক্কা না করে রুরু শুরু করত ডন দেওয়া। থুতনি থেকে ঘাম ঝরলে আখড়ার ঝুরো মাটি শুষে নিত, শুধু লেগে থাকত লোনা দাগ। রুরু গুনত পঁচিশ-ছাব্বিশ-সাতাশ...।

বিকেলবেলায় হর্সরাইডিং। পাক্কা অশ্বারোহীর ইউনিফর্ম পরে সাহেব বেরোত তার খয়েরি রঙের আরবি ঘোড়ায়। সঙ্গে রুরু, পনিতে। ট্রট, ক্যান্টার, গ্যালপ, ঘোড়ার এক-এক রকম চাল এক-এক দিন শেখাত রাজা। সঙ্গে চলত নানারকম মজার খেলা। যেমন রুরু একদিন বলল, ''তাড়াতাড়ি বলো তো দেখি, 'লাল জল নীল নল'।''

টাং টুইস্টারটা বলতে গিয়ে সাহেবের জিভে গিঁট পড়ার জোগাড়। উলটে সাহেব বলল, ''তুমি বলো তো, she sells sea-shells on sea-shore!'' রুরু তো নাস্তানাবুদ। রেকাব, লাগাম, স্যাডল, এই সব সামলে দু'জনে পৌঁছত পাহাড়চূড়ায়। সেখানে একটু বিশ্রাম। দু'জনকে ঘিরে ধরত মুনাল পাখি আর পাহাড়ি ময়নার ঝাঁক। হঠাৎ করে দু'জনকে চমকে দিয়ে রাস্তা পেরোত আইবেক্স বা পাহাড়ি ছাগল। জ্যাকেটের পকেট থেকে ময়নাদের বাদাম ছুড়ে দিয়ে সাহেব বলত, ''ওই দেখো, ওই বাঁ দিকের পাহাড়টার নাম 'সুদর্শন পাহাড়'। আর তার দিকেরটার নাম 'বান্দরপুঞ্ছ'। এই সব গাছ দেওদার আর পাইন। ধুপি বলে আর একরকম গাছ আছে। আরও উঁচুতে হয়।'' পথের ধারে অবহেলায় ফুটে থাকা গঙ্গাতুলসীর পাতা ছিঁড়ে রুরুর হাতে ধরিয়ে বলত, ''শোঁকো, শুঁকলে শক্তি বাড়ে।''

পাহাড়চূড়া থেকে নীচের উপত্যকা খুব সুন্দর। পান্নার মতো সবুজ। অনেক নীচে স্থির নীল জল। দু' পাশে পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট ছোট্ট জনবসতি। পাহাড়ের গা কেটে ধাপে-ধাপে গড়ে তোলা চাষভূমি। সেখানে ধান, গম, অড়হর, ভুট্টা, রামদানার চাষ হচ্ছে। রামদানার হরেক রকম রং। সবুজ, হলুদ, মেরুন। সব মিলে হাতে আঁকা একটা ছবি। আস্তে আস্তে নরম, হলুদ রোদ নামত পাহাড়চূড়ায়। দেওদার পাইনের পাতায় সেই রোদ ক্ষণিকের জন্য থমকে দাঁড়াত। তারপর ঝরে পড়ত। রাজা আপন মনে বলত, ''মাই বয়, জীবন খুব ছোট। অতীত আর ভবিষ্যতের মধ্যে এই একটুখানি বর্তমান। একে ভালবাসতে শেখো। এমব্রেস লাইফ লাইক এনিথিং।''

ফেরার পথে পুরস্কার। এটা রাজার সঙ্গে একটা চুক্তি। রাজার এস্টেটের একটু দূরে একটা ছোট্ট দোকান। সেইখানে একজন খুনখুনে বুড়ি জালেবি ভাজে। পাশে অনেক নীচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে জড়গঙ্গা। সেই রসে টুসটুসে আড়াই প্যাঁচের জিলিপির দাম মেটাতে গিয়ে একদিন রুরুর তো চক্ষু ছানাবড়া। রাজাকে দেখতে পেয়ে সেদিন জালেবিনানি কিছুতেই দাম নেবে না। টাকা ফেরত দিয়ে দিল। টাকাটা হাতে নিয়ে রুরু দেখে, সবুজ রঙের নোটটার একদিকে রাজা উইলসনের মুখের ছবি, অন্যদিকে তার খাসতালুকের মানচিত্র। মাঝখানে জলছাপের মধ্যে লেখা 'ওয়ান রুপি'। তলায় টানা হাতের ইংরেজিতে সই 'ফ্রেডরিক ই উইলসন'। এক কোণে লেখা, 'সন ১৮৮৫'। রুরুর অবাক চোখ দেখে সাহেব বলল, ''তুমি আগে খেয়াল করোনি? আমার

নিজস্ব টাঁকশাল আছে। সেখানে আমার এস্টেটের নোট ছাপা হয়। ইউ কিপ ইট।'' তারপর নোটটা রুরুর হাতে গুঁজে দিল।

আকাশে কুয়াশার চাদর। চাঁদের দেখা নেই। পাহাড়ি রাস্তায় দু' হাত দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না। রুরুর পনি, সাহেবের আরবি ঘোড়ার পিছন পিছন আসছিল। হঠাৎই ডান দিকে পাহাড়ের গা বেয়ে টকাটক করে নেমে এল একদল আইবেক্স। একেবারে পনি-র গায়ের উপর। ভয় পেয়ে পনিটা গা-ঝাড়া দিতেই রুরুর পিঠ থেকে খসে পড়ল। রাজা সামনে থেকে চিৎকার করে উঠল, ''ধরে থাকো, আয়্যাম কামিং!'' পনি-র রেকাবে কিছুক্ষণ আটকে রইল রুরুর পা। তারপর মাধ্যাকর্ষণের টানে ছেড়ে গেল।

রাজা দৌড়ে এল। খাদের ধারের গাছের ডাল ধরে বাড়িয়ে দিল রুরুর দিকে। গঙ্গাতুলসীর গাছ আর কাঁটাঝোপ দু' হাতে ধরে ঝুলতে থাকা রুরুও এক হাত বাড়িয়ে দিল। কিন্তু অন্য হাত ছেড়ে যাওয়ায়, আঙুলে আঙুল ছোঁয়ার দূরত্ব থেকে, পাহাড়ি উইলসনের চওড়া সাদা পাঞ্জাটা সেন্টিমিটার, মিটার, কিলোমিটার ছাড়িয়ে ধীরে ধীরে আলোকবর্ষের ওপারে চলে গেল।

হোটেল থেকে তিন কিলোমিটার দূরে এবং পাঁচশো ফিট উপরে জড়গঙ্গার পাড়ে রুরুর অজ্ঞান দেহটা উদ্ধার করে হোটেলের চৌকিদার গোপাল দুবে। আর্মি এবং উত্তরাঞ্চল পুলিশের যৌথ অভিযান চলাকালীন এবং হড়কা বান আসার আড়াই দিনের মাথায়। রুরুর পরনে ছিল একটা ময়লা সাদা চোঙাটে প্যান্ট। এই যাট ঘণ্টা কলকাতা এবং জাতীয় স্তরের ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ঘাঁটি ছিল ভৈরোঁঘাটি। কাঁদতে থাকা রুরুর মায়ের ছবি প্রতিটি বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি চ্যানেলে কতবার যে দেখানো হয়েছে তা হিসেবের বাইরে। রুরু কি বেঁচে আছে? এই এস এম এস ভোটের বিচারে জীবিত রুরু পেয়েছে ঊনপঞ্চাশ শতাংশ, মৃত রুরু ঊনপঞ্চাশ শতাংশ এবং জানি না/ বলতে পারব না— দুই শতাংশ। এই দুই শতাংশ কোন দিকে সুইং করবে এই নিয়ে রং পেনসিল কোম্পানি প্রযোজিত বিশেষ প্রতিবেদনে বক্তব্য রেখেছেন একজন শিশুচিকিৎসক, একজন শিশুমনস্তত্ত্ববিদ ও জনৈক শিশুসাহিত্যিক। রুরুর বাবাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে যে, ''ছেলেকে হারিয়ে আপনার কেমন লাগছে? রাত্তিরে ছেলে একা বেরিয়ে গেল, এটা কি আপনার গাফিলতি নয়?''

কিডিজ্ শু প্রযোজিত 'ওয়েটিং ফর রুরু' নামক রিয়্যালিটি শো-তে গ্রাফিক্স শিল্পী অ্যানিমেশনের মাধ্যমে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন, জোয়ার-ভাটার নিয়ম মেনে রুরুর দেহটা জড়গঙ্গার তীরে কত ফুট নীচে পাওয়া যাওয়া উচিত।

কিন্তু সমস্ত নিয়ম ভেঙে, চ্যানেলগুলোর দর্শকসংখ্যা আড়াই দিনের জন্য বাড়িয়ে, রুরু বেঁচে ফিরে এল। যেদিকে হড়কা বান এসেছিল তার উলটো দিকে, হোটেল থেকে পাঁচশো ফিট উপরে চড়াই রাস্তায়। ক্যামেরার সামনে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকা ছাড়া উন্নততর কোনও পারফরম্যান্স রুরু দিতে পারেনি। কেননা, সে নিজে ১৮৮৫ সালের ইতিহাসের পাতায় চলে গিয়েছিল, না কি ইতিহাসের পাতা থেকে ১৮৮৫ সালটাই চলে এসেছিল তার কাছে, না কি জলে ডুবে যাওয়ার কারণে পুরোটাই বিভ্রম, তা রুরুর চিন্তা-চেতনার বাইরে। তবে ক্যামেরার সামনে গোপাল দুবে অবশ্য জোর গলায় জানিয়েছে যে, ''এই সবই পাহাড়ি উইলসন নামক সাহেব ভূতের কারসাজি। নেহি তো ও সফেদ প্যান্ট আয়া কাঁহাসে? বোলিয়ে? ও প্যান্ট বাবুয়াকা নেহি হ্যায়!'' তবে এই গল্পটা পাবলিক খাবে না বলে মিডিয়া পাত্তা দেয়নি।

তারপর কেটে দিয়েছে আরও আট মাস।

এই সেই সময়, যখন রুরুর মা বিকেলে চান করে পাটভাঙা শাড়ি পরে টি-পটে দু' কাপ চা বানিয়ে টিকোজি দিয়ে ঢেকে বারান্দায় একটা গল্পের বই নিয়ে বসবেন, আর বাতাসে ভেসে আসবে ভিজে গন্ধ। আর মা অন্য মনে বলবেন, ''বোধহয় বৃষ্টি আসবে, তোর বাবা এখনও এল না তো!''

এই সেই সময়, যখন রুরুর বাবা অফিস থেকে ফিরে চান করে একটা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে দু' কাপ চা ঢেলে রুরুর মায়ের পাশে বসবেন আর

চালিয়ে দেবেন সাউন্ড সিস্টেম, যার থেকে ভেসে আসা রবীন্দ্রসঙ্গীত বর্ষার মতো ছড়িয়ে পড়বে সারা বাড়ি। 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল'। অবশ্য তার আগে রুরুর ঘরে ঢুকে মোবাইলটা চার্জে দিয়ে রুরুর চুলগুলো ঘেঁটে দিয়ে বলবেন, ''কী রে ব্যাটা, আজ কতক্ষণ রাইডিং করলি?''

এই সেই সময়, যখন পড়াশোনার ফাঁকে রুরু প্লে স্টেশনে বসে গেমিং করে নেবে। অথবা মোবাইলের 'ধুম মচালে ধুম' কলার টিউনটা বদলে 'পৃথিবীটা নাকি ছোট হতে হতে... বোকা বাক্সতে বন্দি' করে দেবে। অথবা সাইবার বন্ধুর সঙ্গে চ্যাট করে নেবে। আর হঠাৎ-হঠাৎ পোট্যাটো চিপস, কোলা, বার্গার, আইসক্রিমের দিকে মন গেলে ড্রয়ারের কোণ থেকে বের করে আনবে একটা এক টাকার নোট। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভৈরোঁঘাটির টাঁকশালে তৈরি হওয়া একশো কুড়ি বছরেরও পুরনো নোটটি আবহাওয়ার প্রহারে জর্জরিত। কিন্তু তাও দেখা যাচ্ছে সবুজ রঙের নোটটার একদিকে পাহাড়ি উইলসনের মুখের ছবি, অন্যদিকে তার খাসতালুকের মানচিত্র। মাঝখানে জলছাপের মধ্যে লেখা 'ওয়ান রুপি'। তলায় টানা হাতের ইংরেজিতে সই ফ্রেডরিক ই উইলসন।

বাইরে ঝরঝরে বর্ষা, রুরুর চারদিকে ঝরে পড়ে। রুরু দেখতে পায় কাঠের আর দড়ির তৈরি একটা লম্বা ঝুলন্ত সেতু... সেটা তৎকালীন হিমাচলপ্রদেশ থেকে এখনকার পশ্চিমবাংলা, ভৈরোঁঘাটি থেকে কলকাতা, ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিস্তৃত... আর তার উপর দিয়ে খয়েরি রঙের আরবি ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ি উইলসন সেতুটা পেরোচ্ছে। সেতুটা দুলছে... কিন্তু গাঁওয়ালোর যাবতীয় দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংশয়কে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে পাহাড়ি উইলসন আসছে... আর চিৎকার করছে... ''কাম অন রসগুল্লা, ট্রাই এগেন!''

রুরুর শরীর কাঁপিয়ে বয়ে গেল গাড়োয়ালি হাওয়া। কানে এল পাহাড়ি উইলসনের ঘোড়ার খুরের শব্দ, খট-খট-খট...। টাকাটা সন্তর্পণে ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রুরু পড়ার টেবিল ছেড়ে উঠল। তারপর রান্নাঘরের দিকে না গিয়ে পড়ার ঘরের মেঝেয় শুয়ে ডন দিতে থাকল। পঞ্চান্ন, ছাপ্পান্ন, সাতান্ন, আটান্ন...

বাইরে, তখন অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে।

২ মার্চ ২০০৭

অলংকরণ: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

ললিত ভবন

দুলেন্দ্র ভৌমিক

সদ্য চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর ব্রিগেডিয়ার সৈকত সমাদ্দার ভাবছিলেন অবসরের দিনগুলো কোথায় কেমনভাবে কাটাবেন? চাকরিজীবনে দিন কেটেছে একেবারে ঘড়ির কাঁটা ধরে। একদিনের জন্যও অনিয়ম হয়নি। কখনও-কখনও সীমান্তে গণ্ডগোল বাধলে তখন তো আলাদা ব্যাপার। উত্তেজনা, সীমান্ত রক্ষার তদারকি, ম্যাপ খুলে অধস্তনদের সঙ্গে আলোচনা, এইসব করতে করতেই অনেক বছর কেটে গিয়েছে। এই একঘেয়ে জীবন থেকে যখন মুক্তি মিলল, সৈকত সমাদ্দার ভাবলেন, এবার জীবনটা অন্যরকমভাবে কাটাবেন। কিন্তু সেই 'অন্যরকমটা' কেমন? সেই কথাটা ভাবতে ভাবতেই একদিন কাগজে একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল। সেই বিজ্ঞাপনখানা দেখে তিনি স্ত্রীকে বললেন, ''জানো, দক্ষিণ বারাসাতের একটা জায়গার নাম 'নাইয়ারচক'। ওই নাইয়ারচকে একটা ভুতুড়ে বাড়ি বিক্রি আছে। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। চলো, একবার গিয়ে বাড়িটা দেখে আসি। পছন্দ হলে কিনে নেব।''

সৈকত সমাদ্দারের স্ত্রী সুনন্দা বললেন, ''বাড়ি দেখতে যাওয়ার আগে ভাল করে ভেবে নাও, যদি পছন্দ হয়ে যায় তবে কি সত্যিই কিনবে?''

সৈকত সমাদ্দার উত্তর দিলেন, ''কিনলে ক্ষতি কী?''

সুনন্দা চোখ বড় বড় করে স্বামীর দিকে তাকালেন। পরে বললেন, ''ভূতদের সঙ্গে থাকতে পারবে?''

সৈকত সমাদ্দার বললেন, ''ভূত-টুত সব বাজে ব্যাপার। তা ছাড়া একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে, ভূতের সঙ্গেই তো আমাদের দিন কাটছে। চেহারা বদলে গিয়েছে বলে চিনতে পারছি না। ওই বাড়িটি এক ধরনের হেরিটেজ বিল্ডিং। ওইসব বাড়িও এক অর্থে বিরল প্রজাতির মতো। কেউ কিনে ফেলার আগেই বাড়িটা আমি কিনে রাখতে চাই।''

সুনন্দা বললেন, ''তবে চলো, দেখে আসি।''

অন্য দশজন মহিলার মতো সুনন্দাদেবী আদৌ ভূতে ভীত নন। বরং তাঁর দীর্ঘদিনের শখ, বাঘ-সিংহ, গন্ডার, জলহস্তী ইত্যাদি প্রাণীদের দেখার জন্য যেমন বড় বড় শহরে পশুশালা আছে, তেমনই যদি প্রত্যেক শহরে একটা করে 'ভূতশালা' থাকত তবে টিকিট কেটে সেই ভূতদের চাক্ষুষ করে আসা যেত। ভূত নিয়ে নানা ধরনের বানানো গালগল্প শুনতে হত না। এবার নাইয়ারচকের ভূতওলা বাড়িতে গিয়ে যদি খানকয়েক সত্যিকারের ভূত দেখা যায়।

এক রবিবার সকালে একখানা কোয়ালিস গাড়ি করে ওঁরা রওনা হলেন, সঙ্গে ড্রাইভার হনুমান সিংহ, ভাগনে নিতাই আর বাঘা। বাঘা কোনও সূত্রেই সৈকতবাবুর আত্মীয় নয়। কিন্তু ছেলেটি শক্তিধর ও হরবোলা। যে-কোনও পাখি অথবা জন্তু-জানোয়ারের ডাক ডাকতে পারে। লাদাখ থেকে ছেলেটিকে সৈকতবাবু এনেছিলেন। সেই থেকে এই বাড়িতেই আছে। ওর বাঘের ডাক শোনবার মতো। একেবারে নিখুঁত। এত নিখুঁত যে, একবার সুন্দরবনে সৈকতবাবুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে এমন একখানা ব্যাঘ্রগর্জন গর্জে ছিল যে, উঁচু টঙের উপর

দাঁড়িয়ে থাকা পাহারাদার বন্দুক সমেত গড়িয়ে নীচে পড়ে গিয়ে ঝাড়া এক ঘণ্টা মাটিতে শুয়ে কেঁপেছিল। সৈকতবাবুর মতে, মানবদেহে এত দীর্ঘস্থায়ী কম্পন দেখা তো দূরের কথা, শোনাও যায়নি। ভাল বাঘের ডাক ডাকতে পারত বলে ওর ডাকনাম হয়ে গিয়েছিল 'বাঘা'।

সকালে রওনা দিয়ে দুপুর নাগাদ সেই ভূতের বাড়িতে পৌঁছনো গেল। সাদা রঙের বিশাল বাড়ি। বাড়ি না বলে প্রাসাদ বলাই ভাল। কালো রঙের লোহার গেটের উপর ছোট্ট একটা টিনের বোর্ডে সতর্কবাণী লেখা। যেমন অনেক বাড়িতে থাকে 'কুকুর হইতে সাবধান', তেমনই এই বাড়ির গেটে লেখা, 'ভূত হইতে সাবধান'।

গেটের গায়ে একটা নাইলনের দড়ি ঝুলছে। সৈকতবাবু দড়ি ধরে টান দিতেই বাড়ির মধ্যে ঢং ঢং করে ঘণ্টাধ্বনি হল। তারপরেই দীর্ঘ চেহারার এক ভদ্রলোক দোতলার বারান্দায় এসে গেটের দিকে তাকালেন। সৈকতবাবু এবং তাঁর স্ত্রী, এমনকী গাড়ির ড্রাইভার হনুমান সিংহ, ভাগনে নিতাই আর বাঘা, সকলেই অবাক হয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ফরসা লোক জীবনে অনেক দেখেছেন, কিন্তু এমন চুনকাম করা ফরসা মানুষ কখনও দেখেননি। শখের নাটকে, বিশেষ করে 'মিশরকুমারী' নাটকে মিশরের ফারাও রামেসিসের ঢোলা ওভারকোটের মতো একটা পোশাক।

বারান্দার উপর থেকেই জিজ্ঞেস করলেন, "কাকে চাই?"

সৈকতবাবু বললেন, "আমরা কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে আসছি। এই বাড়িটা নাকি...।"

দোতলার বারান্দায় দাঁড়ানো ভদ্রলোক বলে উঠলেন, "ব্যস, ব্যস, আর বলতে হবে না। আপনি খদ্দের সেটা বললেই মিটে যায়।" এবার দোতলার একটা ঘরের দিকে তাকিয়ে হাঁক দিলেন, "হারু, যা বাবা, গেটটা খুলে দিয়ে আয়। খদ্দের এয়েছে।"

একটি অল্পবয়সি ছেলে এসে লোহার গেটটা খুলে দিতে দিতে বলল, "আমার সঙ্গে আসুন।"

দোতলায় উঠে এসে একটা ঘরের সামনে দাঁড়ালেন। হারু নামের ছেলেটি পাশের ঘরের দরজা খুলে দিয়ে বলল, "বসুন। স্যার আসছেন।"

বেশ বড় সাইজের একটা ঘর। ঘরের আসবাবপত্র সবই সাবেকি আমলের। ঘরের মধ্যে শ্বেতপাথরের গোল টেবিল। টেবিল ঘিরে খানপাঁচেক চেয়ার। হারু যেতে যেতে দরজা থেকে ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী পান করবেন? চা, না শরবত?"

সৈকতবাবু বললেন, "চা।"

হারুর প্রশ্ন, "চিনি ও দুধ সহযোগে, না কি...।"

হারু কথা শেষ করার আগেই সৈকতবাবু বললেন, "চিনি চলবে, কিন্তু দুধ চলবে না।"

হারু চলে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই পাঁচ কাপ চা টেবিলে এসে গেল। এত তাড়াতাড়ি কে চা করল আর কেই-বা দিয়ে গেল, সেটা ঘরের মধ্যে উপস্থিত পাঁচজনের কেউই বুঝতে পারলেন না। সম্ভবত সেই কারণেই সকলে সকলের দিকে তাকালেন। শুধু সৈকতবাবুর ভাগনে নিতাই বলল, "মামা, এত তাড়াতাড়ি পাঁচ কাপ চা তো জংশন স্টেশনেও বানিয়ে দিতে পারে না।"

সৈকতবাবু চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, "আমরা এখন কোথায় বসে আছি তা জানিস? স্থানমাহাত্ম্য বলে একটা কথা আছে, সেটা ভুলিস না।"

একটু পরেই আবার সেই চুনকাম করা দীর্ঘদেহী ভদ্রলোক এলেন। সকলের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে নমস্কার করলেন। হারু ওই ভদ্রলোকের জন্য একখানা চেয়ার এনে পেতে দিল। ভদ্রলোক চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, "বাড়িটা যখন কেনার শখ হয়েছে, তখন উপর-নিচ একটু ঘুরেটুরে দেখবেন না?"

সৈকতবাবু বললেন, "সেসব পরে হবে। আমি আপাতত বায়না করে যেতে চাই। যাতে অন্য কেউ এসে..."

ভদ্রলোক বললেন, "আপনাদের বুঝি ভূত দেখবার শখ হয়েছে? হওয়াই স্বাভাবিক। ওরা সংখ্যায় অনেক, কিন্তু অনেক হলে কী হবে, ওদের যে দেখা যায় না। যা আছে অথচ দেখা যায় না তার প্রতিই মানুষের আকর্ষণ বেশি।"

সৈকতবাবু বললেন, ''আমি কিন্তু বায়না করব বলে কিছু টাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছি।''

ভদ্রলোক বললেন, ''তা বেশ করেছেন। তবে না আনলেও চলত। মানুষের কথার নড়চড় হয়, কিন্তু ভূতদের কথার নড়চড় হওয়ার জো নেই। এতেই বোঝা গেল ভূতেদের সঙ্গে আপনার এই প্রথম কাজ-কারবার। তবু আমার পক্ষে যা জানানো প্রয়োজন, সেগুলো জানিয়ে রাখছি।''

সৈকতবাবু এবং অন্যরা আগ্রহ নিয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন। ভদ্রলোক বললেন, ''এই বাড়িটা তিনতলা। দোতলা আর তিনতলায় মোট আটখানা ঘর। কিন্তু একতলায় অর্থাৎ গ্রাউন্ডফ্লোরে যে পাঁচখানা ঘর আছে সে ঘরগুলো কিন্তু ব্যবহার করা যাবে না।''

সৈকতবাবু প্রশ্ন করলেন, ''কেন? বাড়ি কিনলুম আমি, অথচ একতলার ঘর ব্যবহার করতে পারব না কেন?''

ভদ্রলোক বললেন, ''কলকাতা থেকে এতটা পথ ঠেঙিয়ে এসে যখন ভুতুড়ে বাড়ি কিনতে চলেছেন, তখন কি একবারও ভাববেন না, গোটা বাড়ির সব ঘর আপনাদের দখলে চলে গেলে ওই বেচারাগুলো চোদ্দো পুরুষের আশ্রয় ছেড়ে যাবে কোথায়? হতে পারে ভূত, কিন্তু তাই বলে কি ওদের প্রতি সমাজের কোনও দায়িত্ব নেই? ভূত কি গাছে ফলে? মানুষ থেকেই তো ভূত। কে বলতে পারে ওদের মধ্যে আপনার পূর্বপুরুষদের কেউ নেই?''

সৈকতবাবু ভেবে দেখলেন, কথাটা অগ্রাহ্য করার মতো নয়। তা ছাড়া ভূতসম্প্রদায় খেপে গিয়ে বিদ্রোহ করে কি না, কিংবা ভূত-আন্দোলন, পথ অবরোধ, অর্থাৎ যা যা মানুষ করে, ভূত যদি তাই করতে পারে এবং করতে থাকে, তবে তো ভয়ংকর ব্যাপার। পুলিশ-প্রশাসন আর আইনত তাদের ধরবে না, উলটে তারা এসে ধরবে সৈকতবাবুকে। তবে এটাও তো ঠিক, ভুতুড়ে বাড়িতে যদি ভূতই না থাকে তবে আর ভুতুড়ে বাড়ি কিনে কী লাভ?

এইসব কথা ভাবতে ভাবতেই সৈকতবাবু ভদ্রলোকের দিকে চোখ ফেরালেন। একটু কেশে নিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে সৈকতবাবু বললেন, ''আপনার কথার মধ্যে যুক্তি আছে। বেশ, নীচের ঘরগুলো ছেড়ে দেব। ভূতবাবুরা ওখানে থাকুন। এত কাছাকাছি থাকবে, কিন্তু কোনও অনিষ্ট করবে না তো?''

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, ''কোনও ভয় নেই। বাড়ি বিক্রি হলেও আমি তো পুরো টাকা শোধ না হওয়া পর্যন্ত চিলেকোঠাতেই থেকে যাব। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, মানুষ ছাড়া মানুষের বড় রকমের অনিষ্ট কেউ করতে পারে না। ভূতের সাধ্য কী যে, পৃথিবীজুড়ে দু'-দুটো বিশ্বযুদ্ধ বাধায়?''

সৈকতবাবুর স্ত্রী বললেন, ''আপনি কতদিন ধরে এই বাড়িতে আছেন? আপনার পরিবারের...''

ভদ্রলোক মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, ''আমার পরিবারের কেউ নেই। অর্থাৎ কেউ বেঁচে নেই। সকলেই মারা গিয়েছে। এই বাড়িটা আমি তৈরি করেছিলাম। বাড়িটার নাম 'ললিত ভবন'। আমার ছেলেরা নামটা রেখেছিল। ললিতমোহন রায় অনেককাল আগে গত হয়েছে, কিন্তু আমার ছেলেদের দেওয়া নামটা রয়ে গিয়েছে।''

সৈকতবাবু বড় বড় চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, ''আপনার ছেলেদের দেওয়া নাম মানে?''

সেই ভদ্রলোক বললেন, ''মানে খুব সোজা। আমার নামই ললিতমোহন রায়। একাত্তর বছর পাঁচ মাস চোদ্দো দিনে আমি মারা যাই। মারা যাই কলকাতার বেনেটোলায়। তারপর ফিরে আসি এই ললিত ভবনে। এখানে যারা থাকে তারা কোনও-না-কোনও সূত্রে আমার আত্মীয়, স্নেহভাজন বা জ্ঞাতি। মানুষের মধ্যে একান্নবর্তী প্রথা ভেঙে গেলেও, আমাদের ভূতসমাজে কিন্তু সে প্রথা এখনও লুপ্ত হয়নি। আমরা মিলেমিশে ভালই আছি।''

সুনন্দা দেবী বললেন, ''দেখুন, জীবনে অনেক কিছু দেখেছি, অনেক দেশ, অনেক রকমের মানুষ, অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস, কিন্তু কখনও ভূত দেখিনি। তাই ভূত দেখবার বড্ড শখ।''

ভদ্রলোক, একটু আগে যিনি নিজেই বললেন, একাত্তর বছর পাঁচ মাস চোদ্দো দিনে তিনি মারা

গিয়েছেন, সেই ললিত ভূতমহাশয় বললেন, ''তা কেন হবে? মনে করে দেখুন, অনেক জিনিসই আপনি এবং আপনারা কখনও দেখেননি। অফিস টাইমে ফাঁকা বনগাঁ লোকাল, মন্দিরে-মন্দিরে জাগ্রত ভগবান, এরকম বহু জিনিস আছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ দেখতে পায় না।''

সৈকতবাবু বললেন, ''আমরা এখানে হয়তো সারাজীবন থাকব না। এখন গোড়ার দিকে কিছুদিন থাকব। তারপর কলকাতায় চলে যাব। হয়তো মাঝে মাঝে দু'-তিন দিনের জন্য আসা হবে।''

ললিতবাবু মাথা নেড়ে বললেন, ''পারবেন না। কিছুতেই পারবেন না।''

সৈকতবাবু প্রশ্ন করলেন, ''কেন? পারব না কেন?''

ললিতবাবু বললেন, ''ইন জেনারেল সব ভূতরাই খুব স্নেহপ্রবণ হয়। মানুষকে খুব ভালবাসে। অথচ নানা সময়ে নিতান্ত অকারণে ভূতদের নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা, তাদের কণ্ঠস্বরের বিকৃতি ঘটানো এবং লম্বা লিকলিকে হাত-পা কল্পনা করে তাদের চেহারাকে বিচিত্রদর্শন করার বদমতলব তো মানুষের মাথা দিয়েই বেরিয়েছে। অথচ কত সুন্দর সুন্দর চেহারার ভূত আর ভূতিনি অর্থাৎ পেতনিবোনেরা আছে, সে খবর কি মানুষ রাখে?''

সৈকতবাবু বললেন, ''তা হলে এখানে ভূতের সন্ধান পাব, কী বলেন?''

ললিতবাবু বললেন, ''হায় রে মানুষ! এখনও সন্দেহ গেল না? এই যে আমি আপনার সামনে বসে আছি, এই আমিটা বর্তমানে কে এবং কী? দিন, বায়নার টাকা দিন।''

এবার যেন কুয়াশার মতো একটা পাতলা ভয় ওঁদের পাঁচজনের শরীরকে আস্তে আস্তে জড়িয়ে ধরেছে। সৈকতবাবু নিজের ব্যাগ থেকে টাকার বান্ডিলটা বের করে বললেন, ''বায়নার জন্য দশ হাজার টাকা এনেছি। চলবে তো ললিতবাবু?''

ললিতবাবু ''আঃ'' বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ''কত কাল পরে একজন মানুষের কণ্ঠে 'ললিতবাবু' সম্বোধনটা শুনলুম। প্রাণ-মন জুড়িয়ে গেল। দাঁড়ান, আমি অ্যাডভান্স নেওয়ার রসিদটা নিয়ে আসি।''

এক পলকে উধাও হয়ে গিয়ে একটু পরেই ফিরে এলেন। জামার পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করতে করতে বললেন, ''এইসব রসিদ, সইসাবুদ, দলিল আমাদের সমাজে চলে না। আমরা সব কাজ করি মুখের কথায়। কিন্তু মানুষের সঙ্গে এবার কারবার করতে নেমে সেই মানুষের নিয়ম অনুসারেই করতে হল। অথচ দেখুন, অত লেখাপড়া, দলিল-দস্তাবেজ সব থাকা সত্ত্বেও সম্পত্তি নিয়ে ভাইয়ে-ভাইয়ে মামলা। মা-ছেলেতে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। ছিঃ ছিঃ, এরা আবার মানুষ! যাকগে, টাকাটা দিন...''

ললিতবাবু এবার সৈকতবাবুর দিকে হাত বাড়ালেন। আগেই বলেছি মিশরের ফারাও রামেসিসের ঢোলা ওভারকোটের মতো একটা পোশাকে তাঁর সর্বাঙ্গ ঢাকা ছিল। পোশাকের বাইরে ছিল গলা, মুখ আর মাথার ওইটুকু অংশই দেখে মনে হয় চুনকাম করা। এবার ঢোলা পোশাকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল মেদবর্জিত একটি কঙ্কাল হাত। সেই কঙ্কাল হাতের আঙুলে একটি হিরের আংটি জ্বলজ্বল করছে।

টাকা দিতে গিয়ে সৈকতবাবুর ভিতরটা থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। যদিও ললিতবাবু ইতিপূর্বেই নিজে ঘোষণা করেছিলেন, তিনি একাত্তর বছর পাঁচ মাস চোদ্দো দিনে মারা গিয়েছেন। কিন্তু সেটা কত বছর আগে, সেই হিসেবের চেয়েও জরুরি তথ্য এবং অতি বাস্তব ঘটনা হল, তিনি অর্থাৎ সৈকতবাবু এখন এই মুহূর্তে একটি জ্যান্ত ভূতের সামনে বসে। সেই জ্যান্ত ভূত তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে আছেন বাড়ি বিক্রির অ্যাডভান্স টাকার জন্য। সৈকতবাবু যেই টাকার বান্ডিলটা ওই মেদবর্জিত কঙ্কাল হাতের উপর দিলেন ঠিক তখনই সম্ভবত বিষম ভয় পেয়ে হনুমান সিংহ একটা প্রচণ্ড লাফ দিয়ে প্রথমে ঘরের দরজায়, তারপরেই সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে একেবারে একতলার উঠোনে। সৈকতবাবু অনুমানে বুঝলেন, হনুমান নির্ঘাত সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে নেমেছে। কেননা, সিঁড়ি ভেঙে এত তাড়াতাড়ি নামা সম্ভব নয়।

সৈকতবাবু দোতলা থেকে ঝুঁকে পড়ে হনুমান সিংহকে দেখতে দেখতে বললেন, ''আমার ড্রাইভারটা মরে গেল নাকি?''

ললিতবাবু আশ্বাস দিয়ে বললেন, ''ললিত ভবনে মরা মানুষরাই আসে। এখানে এসে কেউ মরে না। তা ছাড়া একতলায় আমাদের একটা প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র আছে। ওটা হালদার সামলান।''

সৈকতবাবু একটা ঢোক গিলে বললেন, ''এখানে যদি মরা মানুষরাই আসে, তা হলে আমরা এলাম কেমন করে?''

ললিতবাবু বললেন, ''মানুষের কাছে যেমন অতিথি আসে, আমাদের কাছেও তেমনই অতিথি আসে। এখানে এসে বসবাস করলে দেখবেন, ভূত সম্পর্কে অনেক ধারণা বদলে গিয়েছে। যেমন হালদারবাবু, সেই কবে থেকে মরব মরব করছেন, কিন্তু মরণ আর হচ্ছে না। কেন জানেন?''

সৈকতবাবু বললেন, ''কেন?''

ললিতবাবু উত্তর দিলেন, ''এটা হল ভূত-জোন। বাবা ভোলানাথের দৃষ্টি আছে এই বাড়ির উপর। যমরাজের মৃত্যুদূতের সাধ্য নেই এখানে কারও গায়ে হাত দেয়। বাড়ির মেন গেট অতিক্রম করতে পারবে না। বাড়িতে ঢোকা তো দূরের কথা!''

কথা শেষ করেই ললিতবাবু বললেন, ''কলকাতা থেকে বেরিয়েছেন নিশ্চয়ই সকাল-সকাল। যেতেও তো অনেকটা সময় লাগবে। তাই বলি কী, ললিত ভবনে দ্বিপ্রাহরিক আহারটা সেরে গেলে হত না?''

সৈকতবাবুরা সকলেই সকলের দিকে তাকালেন। ভুতুড়ে বাড়ি কেনা এক জিনিস, আর ভূতের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজন করা একেবারে অন্য জিনিস। সৈকতবাবু দেখলেন তাঁর স্ত্রী চোখের ইশারায় তাঁকে ডাকছেন। ডাকছেন মানে, কাছে ডাকছেন। সৈকতবাবু গুটিগুটি পায়ে স্ত্রীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। সুনন্দাদেবী স্বামীর হাতে চিমটি কেটে তাঁর দৃষ্টি নিজের দিকে ফেরালেন। চোখের ইঙ্গিতে বারান্দায় নিয়ে গিয়ে বললেন, ''তোমার দৌলতে দেশ-বিদেশের

কত রান্নাই তো খেয়েছি। কখনও ভূতের রান্না খাইনি। ওদের রেসিপিটা বড্ড জানতে ইচ্ছে করছে। মিসেস গুপ্তর সাপ্তাহিকে আমি তো 'রান্নাঘর' কলমটা লিখি। ওখানে যদি ভূতের রান্নার রেসিপি লিখতে পারি, তা হলে একেবারে ফাটাফাটি ব্যাপার হয়ে যাবে। তুমি দুপুরে ভূতদের সঙ্গে খেতে রাজি হয়ে যাও।''

সৈকতবাবু ভাবলেন। একটু দোনামোনা করে ললিতবাবুকে বললেন, ''আপনার প্রস্তাব উপেক্ষা করতে পারলাম না। আমরা আপনার কথামতো দ্বিপ্রাহরিক আহারটা করেই যাব।''

ললিতবাবু খুশি হয়ে বললেন, ''এই তো খাঁটি মানুষের কথা। ওরে হারু, আরও পাঁচখানা পাতা পাততে হবে। তবে হ্যাঁ, যে বেচারি গিমিকুমড়োর মতো সিঁড়ি দিয়ে উঠোনে গড়িয়ে পড়েছে, তার কারেন্ট কনডিশনটা কেমন, সেটা দেখে পাতা পাতার আয়োজন করো।''

এতক্ষণ পর সকলেই বুঝতে পারলেন, হারুও সম্ভবত মানুষ নয়। সৈকতবাবু নিজের মনেই নিজের ভাবনাটাকে সংশোধন করে নিয়ে মনে মনে বললেন, 'সম্ভবত' শব্দটা এক্ষেত্রে ব্যবহার করার কোনও সুযোগই নেই। হারু নির্ঘাত ভূত। মৃত্যুর আগে যে নাম থাকে, ভূত হওয়ার পর সেই নামেই ভূত রেজিস্টারে ভূতদের নাম তোলা হয়।

হারু চলে গিয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ ফিরে এল। ফিরে এসেই সে মানুষের মতো কাঁপতে লাগল। সৈকতবাবু লক্ষ করলেন, হারু কিছু একটা বলতে চাইছে, কিন্তু সে বলতে পারছে না। ভূতদের কি সেরিব্রাল হয়? ওটি হলেই তো কথা জড়িয়ে যায়। হারুভূতের হল কী?

ললিতবাবু এগিয়ে এসে কম্পনরত হারুকে জোরে একটা ঝাঁকুনি দিতেই হারুর হাড়ে-হাড়ে ধাক্কা লেগে ঠকাঠক শব্দ উঠল। আর তখনই হারু বলে উঠল, ''স্যার, বউদি আসছেন।''

ললিতবাবু অস্ফুটে আর্তনাদ করে বলে উঠলেন, ''কী সর্বনাশ। সে তো তালডাঙায় গিয়েছিল বোনপোর বাড়িতে। আজ তো আসার কথা নয়।''

হারুর সর্বাঙ্গ জুড়ে হাড়ে-হাড়ে ঠোক্কর লেগে জলতরঙ্গ বেজে যাচ্ছিল। ওই শব্দতরঙ্গের মধ্যেই হারু বলল, ''আসার কথা নয়, কিন্তু এসে পড়েছেন। আমি এবার যাই।''

হারু এক দৌড়ে যেন পাখির মতো ফুড়ুৎ করে পালিয়ে গেল। অনুনয়ভরা কণ্ঠে ললিতবাবু বললেন, ''আমাকে একা ফেলে যাস না। একা পেলে আমাকে আর আস্ত রাখবে না।''

কৌতূহল চাপতে না পেরে সৈকতবাবু বললেন, ''এত ভয় কার জন্যে? কে আপনাকে আস্ত রাখবে না?''

ললিতবাবুর কাতর কণ্ঠের উত্তর, ''জগৎ-সংসারে মানুষ টু ভূত, বিড়ালছানা টু হস্তীশাবক সকলেই যাকে ভয় করে।''

সৈকতবাবুর প্রশ্ন, ''কিন্তু তিনি কে?''

ললিতবাবু ধুতির কোচা সামলে দৌড় দেওয়ার আগে উত্তর দিলেন, ''প্রত্যেকের নিজের স্ত্রী। এই একটা ব্যাপারে ভূত আর মানুষে কোনও পার্থক্য নেই।''

সুনন্দাদেবী ভূতের রান্নার রেসিপিটা জানতে না পেরে বড়ই মনমরা হয়ে পড়েছিলেন। ললিতবাবু চিলেকোঠায় তরতর করে উঠে যাওয়ার আগে সুনন্দাদেবীকে বলে গেলেন, ''সরি ম্যাডাম, পরে যখন আসবেন তখন অনেকরকম ভূত-রান্নার রেসিপি বলব। আজ হাতে সময় সংক্ষেপ। শুধু একটা স্পেশ্যাল ব্রেকফাস্টের কথা বলি, পান্তা ভাত, সঙ্গে মিষ্টি দই আর ভূতের গপ্পো লিখিয়েদের ডান হাতের কবজির কাবাব।''

আর কোনও কথা বলার সুযোগ কেউ পেল না। নীচ থেকে সিঁড়ি দিয়ে একটা দপাদপ আওয়াজ উঠে আসছে। সুনন্দাদেবী তাঁর স্বামীর দিকে কঠোর চোখে তাকিয়ে কড়া গলায় বললেন, ''ওখানে দাঁড়িয়ে না থেকে থামের আড়ালে লুকোও।''

সুনন্দাদেবীর কঠিন গলার এই হুকুম অমান্য করার সাহস ব্রিগেডিয়ার সৈকত সমাদ্দারের ছিল না।

ভূত আর মানুষের এই একটা জায়গায় কী আশ্চর্য মিল!

২ মার্চ ২০০৭

অলংকরণ: দেবাশিস দেব

স্লিপি হলোর জঙ্গল

পিনাকী ঘোষ

মার্কোস ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলল, ‘‘কিছু বলবে?’’ ছেলেটি মার্কোসের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, ‘‘না স্যার।’’

‘‘তা হলে... ধন্যবাদ এবং গুডবাই।’’ বলে রুমসার্ভিসের ছেলেটির মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিল মার্কোস।

‘‘গুড ডে স্যার।’’

‘‘গুড ডে! হুঁ... আশা করে দাঁড়িয়ে আছে যে, ট্রাঙ্কটা ঘর অবধি পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমি দশ ডলার টিপ্‌স দেব। হোটেল থেকে যেন এই কাজের জন্য মাইনে দেওয়া হয় না!’’ মেজাজটা ঠিক করার জন্য পরদা দুটো দু'দিকে সরিয়ে দিতেই ঘরটা ঝলমল করে উঠল।

বাফেলো, নিউইয়র্ক। এখানে একদিন বিশ্রাম নিয়েই মার্কোস রওনা দেবে তার দেশের দিকে, মেক্সিকো। বিমানে যাওয়ার অসুবিধে আছে। তাই যেতে হবে কিছুটা সড়কপথে, কিছুটা জলপথে।

মিনিট সাতেক ধরে সমস্ত চাবি দিয়ে ট্রাঙ্কটা খোলার জন্য ধস্তাধস্তি করার পর সে নিশ্চিত হল, ট্রাঙ্কের চাবিটা হারিয়েছে। হোটেল থেকে চাবিওয়ালা চাওয়া মানেই একশো ডলার গচ্চা। সেই রুমসার্ভিসের ছোকরাটিকে ডেকে নিলে কেমন হয়?

ছেলেটি নির্ঘাত ম্যাজিক জানে। একটা জেমস ক্লিপ বেঁকিয়ে-চুরিয়ে যেভাবে ট্রাঙ্কের তালাটা ঠিক তিন মিনিটের মাথায় খুলে দিল, তাতে মার্কোস সুর নরম না করে পারল না।

‘‘বাঃ! তুমি তো ম্যাজিক জানো দেখছি। ভারতীয়?’’

‘‘হ্যাঁ।’’ জবাব দিল স্যাম। আসল নাম সম্বরণ বা স্যামব্যার‍্যান। তার থেকে ছোট করে ‘স্যাম’।

মার্কোস ওয়ালেট থেকে দুটো দশ ডলারের নোট বের করে আবার একটা ওয়ালেটেই ঢুকিয়ে স্যামের হাতে একটা গুঁজে দিয়ে বলল, ‘‘ধন্যবাদ।’’

ভারতীয় হাউসকিপার ছেলেটি ট্রাঙ্ক থেকে বেরনো বড়সড় ঘোড়ার মূর্তিটির দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে মার্কোস মনে মনে বলল, কৌতূহলের জন্যই বিড়াল মরে। মুখে বলল, ‘‘কিউরিও... পুরনো জিনিস কেনাবেচা করা আমার কাজ। মেক্সিকোতে আমার কিউরিওর ব্যাবসা।’’

এই ব্যাবসার জন্যই তাকে অনেক ঘোরাঘুরি করতে হয় ভাল জিনিসের খোঁজে। পুরনো শৌখিন জিনিস, ছবি, মূর্তি অবাক করা দামে বিক্রি হয়ে যায়। এর মধ্যে কিছু কিছু আবার চোরাই জিনিসও থাকে। হয়তো কয়েক বছর আগে কোনও মিউজিয়াম থেকে চুরি গিয়েছিল। বিক্রি হয়ে গেল মেক্সিকোতে, মার্কোসের হাত দিয়ে। এইজন্যেই সব কিছু সোজা পথে নিয়ে যাওয়া যায় না। কিন্তু সেসব কথা তো আর এই ভারতীয় ছোকরাটিকে বলা যায় না।

অবাক হওয়া চাউনি নিয়েই বিদায় নিল ছেলেটি। সন্ধেবেলায় বৃষ্টি নামল। কাচের জানলা দিয়ে দূর দিগন্তে বিদ্যুতের ঝলকানি দেখা যাচ্ছে। সারি-সারি বহুতল বাড়ির ব্লকগুলো ভিজছে। অনেক নীচে চকচকে কালো সাপের মতো রাস্তা দিয়ে ভিজতে

ভিজতে চলা গাড়ির মিছিল। ঘরের আলোগুলো কাঁপছে। মাঝে-মাঝে ভোল্টেজ কমে যাচ্ছে, আবার স্বাভাবিক হচ্ছে। আলোগুলোর এই অদ্ভুত কাণ্ডে অবাক মার্কোস। তড়িঘড়ি ফোন তুলে রুমসার্ভিসকে ডাকল।

ঘোড়ার মূর্তিটির দিকে এতক্ষণ প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকানোর অবকাশ হয়েছে মার্কোসের। দুপুরে পোশাক না পালটেই ঘুম, তারপর বিকেলে হট শাওয়ার নিয়ে এখন একটু নীচে রেস্তরাঁয় যাওয়ার কথা ভাবতেই আলোগুলোর এই অদ্ভুত আচরণ। অন্তত শ'দেড়েক বছর বয়স হবে ঘোড়াটির। কোনও এক নাম না-জানা ওলন্দাজ শিল্পীর হাতের কাজ। ওলন্দাজরা যখন নেদারল্যান্ডস থেকে আমেরিকায় এসে বসবাস করা শুরু করল, সেই সময়কার জিনিস... বলেছেন সেই ওলন্দাজ বৃদ্ধ, যাঁর কাছ থেকে মার্কোস এটা কিনেছে। ব্ল্যাক স্ট্যালোন। অসাধারণ হাতের কাজ। পেশিগুলো যেন জীবন্ত। এটা বেচে কয়েক হাজার ডলার লাভ থাকবে বলে মার্কোসের আশা।

দরজায় ঘণ্টির শব্দ। রুমসার্ভিস।

''গুড ইভনিং স্যার। মে আই হেলপ ইউ?'' সেই ভারতীয় ছেলেটি।

''ভিতরে এসো। কী আরম্ভ হয়েছে দেখো আমার ঘরে। আলোগুলো কেমন কাঁপছে দেখেছ?''

''ওটা ঠিক হয়ে যাবে স্যার। গোটা হোটেলের অনেক ঘরেই এটা হচ্ছে। আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা ওটা মেরামতের জন্য কাজ করছেন।''

''আশা করি দেরি হবে না?''

''না স্যার। মূর্তিটি অনেক পুরনো স্যার?''

''ও... ওটা? হ্যাঁ... দেড়শো তো হবেই।''

''উঁহু। ওটা আরও পুরনো। দুশো সাত বছর।'' বলল স্যাম।

''মানে? তুমি এই মূর্তিটির সঠিক বয়স জানো?'' মার্কোসের হাতের লাইটারটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করতে গিয়ে থেমে গেল।

''আরও অনেক কিছুই জানি। দুপুরে প্রথমবার দেখেই আমি চমকে গিয়েছিলাম। ওটার ছবি আমি একটা ওয়েবসাইটে দেখেছি। ঠিক এই মূর্তিটাই। শুটার সম্পর্কে পড়েওছি ওয়েবসাইট থেকে।''

''তাই নাকি? ফোটো দেখেছ? কোন ওয়েবসাইটে?''

''ফোটো নয়, স্কেচ। ওয়েবসাইটটি ছিল সম্ভবত ট্রুহ্যালুইন ডট কম।''

''হ্যালুইন? মানে... তার মানে তো ভুতুড়ে ব্যাপারস্যাপার। এতে আবার ভুতুড়ে ব্যাপার কোথায়?'' মার্কোসের হাতে ধরা সিগারেটটি কেঁপে গেল। ঘরের আলোটা কমে এল। দূরে বিদ্যুতের ঝলকানি দেখা গেল।

দু'জন স্থির চোখে একে অপরের দিকে তাকিয়ে। কারও চোখের পলক পড়ছে না। তারপর স্যাম শুরু করল, ''এখান থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে একটা ছোট্ট গ্রাম আছে। হাডসন নদীর তীরে। স্লিপি হলো।''

''দাঁড়াও... নামটা শোনা লাগছে!'' বলল মার্কোস।

''এই নামে একটা সিনেমাও আছে। সেইজন্যেই শোনা লাগছে। গ্রামটি জঙ্গলে ঘেরা। জঙ্গলের নাম 'উড্স অফ স্লিপি হলো'। এতই শান্ত যে, মনে হয় সব সময়ই গোটা গ্রামটি ঘুমোচ্ছে। এই শান্ত গ্রামে ১৭৯৯ সালে শুরু হল অদ্ভুত এক ব্যাপার। গ্রামের রাস্তায় এক-এক করে নিরীহ গ্রামবাসীদের মুন্ডুহীন দেহ পড়ে থাকতে দেখা গেল। দেহটা আছে... মুন্ডুটি নেই।''

মার্কোসের হাতে ছ্যাঁকা লাগল। সিগারেটটি শেষ হয়ে গিয়েছে। সিগারেটের বাক্স থেকে আর-একটা বের করে স্যামের দিকে এগিয়ে দিল মার্কোস।

''ধন্যবাদ।''

''কফি? কফি আনাই?'' বলে ফোন তুলে দুটো কফির কথা বলল মার্কোস।

''ধন্যবাদ। অবস্থা এমন হল যে, সন্ধের পর গ্রামবাসীরা জঙ্গলের দিকে তো নয়ই, এমনকী গ্রামের পথে বেরনোও বন্ধ করে দিল। যারা জানলা ফাঁক করে দেখার সাহস করেছিল, তারা বলল, এক বর্মপরা ঘোড়সওয়ারকে গ্রামের পথ দিয়ে সন্ধেরাতে

ঘোড়া ছুটিয়ে দুরন্ত বেগে চলে যেতে দেখেছে। তার চলার পথে যে পড়ে, তলোয়ারের এক কোপে তার মুন্ডু কেটে, মুন্ডুটা নিয়ে চলে যায় সেই ঘোড়সওয়ার। তারা এও দেখেছে যে, বর্মপরা ঘোড়সওয়ারের নিজেরই মুন্ডু নেই। মুন্ডুহীন ঘোড়সওয়ার। শহর থেকে তদন্তে এলেন পুলিশ অফিসার ইশাবড ক্রেন। তিনি তদন্ত করে বের করলেন যে, কুড়ি বছর আগে, ১৭৭৯ সালে এক আমেরিকান সৈনিকের যুদ্ধে মৃত্যু হয়েছিল স্লিপি হলোর কাছেই। শত্রুরা তার মুন্ডু কেটে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে সে উঠে আসে প্রায়ই তার নিজের মুন্ডুর খোঁজে। সঙ্গে তার ঘোড়া। ঘোড়াটার নাম 'ডেয়ারডেভিল'।''

গ্যাঁ-অ্যাঁ-ক করে ডোরবেলের বিকট শব্দে আর-এক দফা কেঁপে উঠল মার্কোস। কফি এসেছে। জানলার কাচ বেয়ে বেয়ে নামছে জলের ধারা। ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে কেঁপে কেঁপে উঠছে জানলার শার্শি।

''ইন্টারেস্টিং গল্প। তারপর কী হল?'' কফিতে চুমুক দিতে দিতে বলল মার্কোস গ্যাব্রিয়েল লোনোভেজ়।

''অফিসার ইশাবড স্লিপি হলো গ্রামের ডানপিটে মেয়ে ক্যাটরিনার সাহায্যে খুঁজে বের করলেন স্লিপি হলোর জঙ্গলের সেই গাছ, যার ভিতর থেকে প্রতি রাতে বেরিয়ে আসত মুন্ডুহীন ঘোড়সওয়ার। গ্রামের পথে খোলা তলোয়ার নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে মস্ত লাফ মেরে সেই গাছের ভিতরেই ফের ঢুকে যেত সে। শেষে নিজের মুন্ডু খুঁজে পেল সে। পেল গ্রামে ডাইনি বলে চিহ্নিত ক্যাটরিনার সৎমাকে হত্যা করে নিজের মুন্ডু ফিরে পাওয়ার পর শেষ হল স্লিপি হলোর মুন্ডুহীন প্রেতের প্রবাদ। ওই গ্রামেই বাস ছিল লেখক ওয়াশিংটন আরভিং-এর। তিনিই এই পুরো ঘটনাবলি উপন্যাস আকারে বের করেন 'দ্য লেজেন্ড অফ স্লিপি হলো' নামে। পরে এই নিয়ে সিনেমাও হয়।''

''বেশ গল্প! এই মূর্তির সঙ্গে গল্পের সম্পর্ক কী?''

''গল্প এখানেই শেষ হয়ে গেলেও তার পরেও অনেক কিছু ঘটে, যা অনেকেই জানেন না।'' বলল স্যাম।

ঝপ করে আলোটা এইসময় নিবে গেল। ''ওঃ, এবার পুরোপুরিই গেল দেখছি।'' বিরক্তি প্রকাশ করল মার্কোস।

''আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা কাজ করছেন স্যার। এক্ষুনিই বিদ্যুৎ ফিরে পাবেন। যা বলছিলাম... সেই ভয়ানক দেখতে গাছটা এরপর গ্রামবাসীরা কাটিয়ে ফেলে। কাটার সময় অবাক করা রক্তধারায় ভেসে যায় গাছটার আশপাশ। এর এক মাসের মধ্যেই অদ্ভুতভাবে মারা যায় পিটার ভ্যান গ্যারেট, সেই কাঠুরিয়া, যাকে দিয়ে গ্রামবাসীরা গাছটা কাটিয়ে ফেলে। কীভাবে মারা যায় শুনবেন? মাথায় বজ্রাঘাতে। বাজ পড়ে মাথাটাই উড়ে গিয়েছিল। অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায়নি সেটার। গ্রামে থাকত এক নাস্তিক শিল্পী, বাল্টাস ভ্যান ট্যাসেল। তিনি ঘোড়ার গাড়ি করে গাছটা নিয়ে যান নিজের বাড়ি, খোদাই করে তৈরি করেন এই ঘোড়ার মূর্তি। উপহার দেন সেই পুলিশ অফিসার ইশাবড ক্রেন ও তাঁর নতুন বউ ক্যাটরিনাকে। ইশাবড ও ক্যাটরিনার বাড়ি থেকে ফেরার পথে জঙ্গলেই মৃত্যু হয় শিল্পী বাল্টাসের। ডাকাতের দল ছিনতাই করে তার মুন্ডুটি কেটে দিয়ে চলে যায়। ১৭৯৯ সাল সেটা। সেই বছরই ক্রিসমাসের ঠিক আগে ঘটে যায় আর-একটি মর্মান্তিক ঘটনা। স্লিপি হলোর পাশেই ট্যারি টাউনে ব্যাঙ্ক ডাকাতদের সঙ্গে যুঝতে গিয়ে মাথায় গুলি লেগে মারা যান তিরিশ বছরের সাহসী অফিসার ইশাবড। গুলিটি তাঁর মাথাটাই ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল তরমুজের মতো।''

বিকট শব্দে খুব কাছেই কোথাও বাজ পড়ল। এই হোটেলের ছাদেই কি? কাচের শার্শি এবং আসবাব থরথর করে কেঁপে উঠল। মার্কোসও কি একটু কেঁপে উঠল?

''ক্যাটরিনা এরপর মূর্তিটি নিজের কাছে রাখতে চাননি। স্লিপি হলোর প্রবীণ, অভিজ্ঞ মানুষরা ক্যাটরিনাকে পরামর্শ দেন অভিশপ্ত মূর্তিটি স্লিপি হলোর জঙ্গলের জলাভূমিতে ফেলে দিয়ে আসতে।

ক্যাটরিনা মূর্তিটি নিয়ে জঙ্গলে ঢোকেন, কিন্তু তারপর থেকে গ্রামবাসীরা আর তাঁকেও দেখেনি, মূর্তিটিকেও না।''

অনেকক্ষণ দু'জনেই চুপ করে বসে রইল। ''অদ্ভুত গল্প।'' অনেকক্ষণ পরে বলল মার্কোস।

ঘুমটা হঠাৎ করে ভেঙে গেল। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল মার্কোস কে জানে? ক'টা বাজে? মাঝরাত পেরিয়ে গিয়েছে নিশ্চয়ই। টিভিটা নিঃশব্দে চলছে, আর তার রঙিন আলোয় ঘরটা মুহুর্মুহু রং পালটাচ্ছে। টিভি দেখতে দেখতে সোফাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল সে।

ওটা কী? দেওয়ালে ঘোড়ার ছায়া কেন? ছায়াটা কাঁপছে! মার্কোসের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়েই নিজের বোকামিতে লজ্জা পেয়ে গেল সে। টিভির আলোয় দেওয়ালে মূর্তিটার ছায়া পড়েছে। মূর্তিটা নিয়ে ভাবতে না চাইলেও অদ্ভুত সব চিন্তা তার মাথায় জট পাকাচ্ছে।

মূর্তিটা কি আজও অভিশপ্ত? গল্পটা কি আদৌ সত্যি? বৃষ্টি থেমে গিয়েছে অনেকক্ষণ। বাথরুম থেকে একটা টপটপ করে জল পড়ার শব্দ আসছে। কলটা বন্ধ করে এসেছিল না সে? না কি... ঠিক মনে পড়ছে না। বাথরুমের দরজায় এসে একটু থমকাল মার্কোস।

''এনিওয়ান দেয়ার?'' বলে সন্তর্পণে বাথরুমে

ঢুকল। লাইটটা জ্বালাল। কেউ নেই। কেন এমন একটা অস্বস্তি হচ্ছে, যেন কেউ আশপাশেই আছে? কলটা বন্ধ করে বেরিয়ে এল সে।

টেনশন তাড়ানোর ভাল দাওয়াই সিগারেট। মার্কোস ঠোঁটে একটা সিগারেট রেখে লাইটার জ্বালাল। তারপরেই লাইটারটা ফেলে দিয়ে ছিটকে দু' হাত সরে এল। সিগারেটটাও মুখ থেকে পড়ে গিয়েছে। ''জিসেস!'' বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে।

মার্কোসের শৌখিন কিউরিও কালেকশনের অন্যতম লাইটারটা। ধাতু এবং কাচ দিয়ে তৈরি জলকন্যা। গত তিন বছর ধরে তার সঙ্গী।

লাইটারটার মাথাটা আর নেই। কাচের জলপরির মুন্ডুটা ভাঙা!

ভিতরে ভিতরে অদ্ভুত একটা কাঁপুনি অনুভব করছে মার্কোস। লাইটারটা সোফা থেকে পড়ে গিয়েছিল কি? নাকি কেউ মুন্ডুটা...

ঘোড়ার মূর্তিটার সামনে এসে দাঁড়াল মার্কোস। স্লিপি হলোর মুন্ডুহীন ঘোড়সওয়ার যে গাছে আশ্রয় নিত, সেই গাছ কেটে তৈরি এই মূর্তি। মার্কোস অনুভব করছে এই ঘরে সে একা নেই। কেন এমন মনে হচ্ছে, সে জানে না... কিন্তু এমনটাই মনে হচ্ছে।

এরপর মার্কোস যা দেখল, তাতে তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেতে লাগল, পেটের মধ্যে গুড়গুড় করে উঠল... আর শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামতে লাগল।

কাঠের ঘোড়ার গায়ে তাজা রক্তের ধারা! মার্কোস জ্ঞান হারাল। দড়াম করে তার ছ' ফুট দেহটা লুটিয়ে পড়ল কার্পেটের উপর।

পরদিন বিকেল পাঁচটা। মনে হচ্ছে যে-কোনও সময় সন্ধে নামবে। ঘন জঙ্গলে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে হেডলাইট জ্বালিয়ে বসে ছিল মার্কোস। কুয়াশা বাড়ছে। কুয়াশায় ঢেকে গিয়ে জঙ্গলটা আরও ভুতুড়ে লাগছে। সে এখন বাফেলো নিউ ইয়র্ক থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে স্লিপি হলোর জঙ্গলে।

স্যাম কোথায়? পাঁচটার সময় তার এখানে থাকার কথা। আজ সকালে তাকে গতকাল রাতের অশরীরী অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছে মার্কোস। আলোচনা করে দু'জনেই একমত হয়েছে, এই মূর্তি স্লিপি হলোর জঙ্গলে জলাভূমিতে ফেলে দেওয়াই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

একটা পেঁচা ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। গায়ে কাঁটা দিল মার্কোসের।

কুয়াশার মধ্যে দিয়ে কে যেন আসছে। স্যাম, ''হ্যালো মিস্টার মার্কোস।''

''ভাবলাম তুমি এলেই না। গাড়িতে ওঠো।'' বলে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল মার্কোস।

সন্ধে নামছে। কুয়াশায় মোড়া জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে মটমট করে ডালপালা ভাঙতে ভাঙতে চলেছে গাড়ি। ড্রাইভ করছে মার্কোস। দু'জনেই চুপ।

''দাঁড়ান। এবার বাঁদিকে। ওদিকেই জলাভূমিটা।'' বলল স্যাম।

গাড়ি ঘুরল। কিছু দূর গিয়ে ব্রেক কষতে হল মার্কোসকে। সামনে ওটা কী চকচক করছে? ওটা না সরালে গাড়ি এগোতে পারছে না। স্যাম গাড়ি থেকে নামল। এগিয়ে গেল সামনে।

''ওটা কী?'' গাড়ি থেকে চেঁচিয়ে বলল মার্কোস। কোনও জবাব নেই। মার্কোস হর্ন দিতে লাগল বারবার।

''দেখে যান।''

মার্কোস গাড়ি থেকে নামল। এগিয়ে যেতে যেতে সে বুঝতে পারছে তার পায়ে বল পাচ্ছে না।

''তলোয়ার!'' বলে সামনে আঙুল দেখাল স্যাম। সত্যিই সামনে খাড়াখাড়িভাবে মাটিতে গাঁথা হয়ে আছে একটা চকচকে তলোয়ার।

মার্কোসের হৃদয়ের একটা স্পন্দন যেন মিস হয়ে গেল। স্যামের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে গাড়ির দিকে দৌড়তে লাগল মার্কোস। ''এখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলো।'' বলল সে।

''না। সামনেই জলাভূমি। আপনি গাড়ির ডিকি খুলুন।'' বলল স্যাম।

ডিকি খুলতেই বেরোল স্লিপি হলোর কাঠের ঘোড়া। দু'জনে ধরাধরি করে নেমে গেল জলের

মধ্যে। অভিশপ্ত মূর্তিটাকে বিসর্জন দিয়ে গাড়িতে ফিরে এসেই ব্যাকগিয়ারে দ্রুত পিছন দিকে চালাতে লাগল মার্কোস। লাল ব্যাকলাইটের আলো পড়ে জঙ্গলটা অদ্ভুত ভুতুড়ে লাগছিল। ঝুমকো গাছগুলো যেন লাল আলোয় হাতছানি দিয়ে তাদের ডাকছে।

"তাড়াতাড়ি... আরও তাড়াতাড়ি..." বলছিল স্যাম।

ভার্জিনের ফ্লাইটে মেক্সিকো ফিরছে মার্কোস। মূর্তিটা নেই, তাই ফ্লাইটে না ফেরারও কোনও কারণ নেই। চোখ বন্ধ করে আই-পডে গান শুনছিল সে। টেনশন থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য গান তাকে খুব সাহায্য করে। তার বুক থেকে গত দু'দিনের অদ্ভুত ঘটনাবলির টেনশন এখনও নেমে যায়নি। হয়তো কোনও দিনই নামবে না।

একটা বালিশ পেলে ভাল হত। ফ্লাইট স্টুয়ার্ডেস নেই। সে হকচকিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। অবাক কাণ্ড... এত বড় বিমানের সারি সারি সিট সব ফাঁকা। একজন যাত্রীও নেই। কিন্তু নিউ ইয়র্ক থেকে তো যাত্রী বোঝাই হয়ে প্লেন ছেড়েছিল। ককপিটের দরজা খোলা। ইতস্তত করে ঢুকে গেল সে। পাইলট তার দিকে ঘুরল। কিন্তু... এ কী! পাইলটের মুন্ডু নেই!

বিষম খেয়ে ঘুমটা ভাঙল। একজন ফ্লাইট স্টুয়ার্ডেস তাকে বলছে, "আপনাকে একটা বালিশ দেব?"

সে তো তার সিটেই বসে আছে। ঘুমিয়ে পড়েছিল মার্কোস। স্বপ্নটা কী অদ্ভুত! কী ভয়ংকর!

সেই সময় স্লিপি হলোর জঙ্গলের জলাভূমির কাছে একটা গাড়ি থামল। দরজা খুলে নামল স্যাম, মানে সম্বরণ বসু। আঙুল থেকে স্টিকিং প্লাস্টারটা খুলে ফেলে দেখল, কাটাটা প্রায় সেরে উঠেছে। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে তলোয়ারটা তুলে নিল। যার জিনিস, সেই হ্যারিকে ফেরত দিতে হবে এটা। হ্যারি এসব টিভি সিরিয়াল নির্মাতাদের ভাড়া দেয়। স্যামও এটা ভাড়া করেই এনেছিল। জলে নেমে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই পেয়ে গেল দেড়শো বছরের পুরনো কাঠের ঘোড়ার মূর্তিটা। স্লিপি হলোর গাছ থেকে তৈরি হওয়া এবং ট্রুহ্যালুইন ডট কম ওয়েবসাইটের গল্প তার বানানো হলেও এটার দাম পাঁচ হাজার ডলারের কম নয়, সে আন্দাজ সম্বরণের আছে।

আসলে মেক্সিকান লোকটির ব্যবহারটাই ছিল খারাপ। টিপ্‌স না দিয়ে মেজাজটা খারাপ না করে দিলে কি আর ভৌতিক গল্পটা বানিয়ে ওকে জব্দ করার কোনও দরকার হত? গল্পটা বিশ্বাস করানোর জন্য স্রেফ দুটো ব্যাপার করেছিল সে। ঘরের আলো নিভে যেতেই কাচের লাইটারটার মুন্ডু ভেঙে দেওয়া এবং পকেটের নেল-কাটার দিয়ে নিজের আঙুল কেটে সামান্য রক্তপাত ঘটিয়ে কাঠের ঘোড়ার গায়ে লেপে দেওয়া।

বাকিটা নিজে থেকেই হয়েছে। শিস দিতে দিতে ডিকি খুলে মূর্তিটা আর তলোয়ারটা রেখে গাড়ি স্টার্ট দিল সম্বরণ। স্লিপি হলোর জঙ্গলের পথ দিয়ে এগিয়ে চলল তার গাড়ি। গন্তব্য, নিউ ইয়র্ক।

২ মার্চ ২০০৭

অলংকরণ: অনুপ রায়

ওলটানো ফোটোগ্রাফ

বিকাশ সরকার

গুয়াহাটির কিছু বাড়িওলা অত্যন্ত খারাপ প্রকৃতির, ভাড়াটেদের এতটুকু সুযোগসুবিধে দেয় না, অকারণে দুর্ব্যবহার করে। ফলে এক বছরে দু'বার বাড়িবদল করতে হল আমাকে। ট্রান্সফার হয়ে কোচবিহার থেকে গুয়াহাটি আসার পরেই শুরু হয়েছে গৃহবিভ্রাট। প্রথম বাড়িটা ছাড়তে হয়েছিল বাড়িওলার ছেলের উৎকট আওয়াজে পশ্চিমি গান শোনার তাণ্ডবে। সারাদিন কানের পাশে শব্দদূষণ চলে, আমার বই পড়া লাটে উঠে গিয়েছে। ছেলেটি বারো ক্লাসে তিনবার ফেল করেছে, চতুর্থবারও যে একই গতি হবে সে-বিষয়ে আর সন্দেহ কী! একদিন তাকে বললাম, ''ভাই, গান শোনো সেটা ভাল কথা। শব্দটা একটু কম কোরো। আমার ডিসটার্ব হয়।''

ছেলেটি পরিষ্কার জানিয়ে দিল, ''বাড়ি ছেড়ে দিন।''

আমি থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। পরদিন ওর মা এসে আরও দু' কথা শুনিয়ে বললেন, ''এ মাসেই বাড়ি ছাড়ুন। ভাড়াটের আবার এত বড় বড় কথা কেন?''

ছেড়ে দিলাম। উঠলাম এই কাহিলিপাড়ার বাড়িতে। এখানে শব্দটব্দ খুব একটা নেই। বেশ নিরিবিলি, আমি দু' মাসেই তেরো-চোদ্দোটা বই মগজে চালান করে দিয়েছি। কিন্তু সমস্যা হল জলের। রানিং ওয়াটার বলে মাসে দু'শো টাকা বেশি দিই, কিন্তু সকাল-সন্ধে যখনই কল খুলি না কেন, টপটপ করে আট-দশ ফোঁটা জলের বেশি পাই না। সকালেও কল টিপে-টিপে জল তুলি। সারাদিন ব্যাঙ্কের লেজার সামলে সন্ধেবেলা ফিরে এসেও ফের বালতি নিয়ে কলতলায় ছুটতে হয়। সেদিন খুব রাগ হল। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে ডোরবেল টিপলাম। বাড়িওলা বাইরে এসে বললেন, ''কী চাই?''

''জল।''

''জল! এখানে জল পাবেন কোথায়?''

''দু'শো টাকা করে ফি মাসে জলের জন্য দিই, কিন্তু জল পাই আট-দশ ফোঁটা। একদিনও বালতি ভরল না।''

''সে কী মশাই! জল তো আমি রোজই দিচ্ছি। আরও তো ভাড়াটে আছে, কই তারা তো কমপ্লেন করে না কখনও।''

''চলুন আমার কিচেনে। এক ফোঁটাও জল নেই।''

''এখন রাত আটটা বাজে। এখন জল পাবেন কোথায়? জল আমরা দিই সকাল এগারোটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত। এনতার জল। জলের ব্যাপারে কোনও কার্পণ্য নেই আমার।''

''সে সময় তো আমি ব্যাঙ্কে থাকি। জল ধরব কী করে?''

''কখন কাকে ধরবেন আর কখন কাকে ছাড়বেন, সেটা তো আপনার ব্যাপার। জল ধরার জন্য লোক রাখুন, নইলে ঘর ছাড়ুন। আমি কালই 'টু লেট' লাগিয়ে দেব।''

পরদিনই গেটে 'টু লেট' লেখা ছোট বোর্ডটা ঝুলছে দেখতে পেলাম। লোকটির অসভ্যতায় আমি স্তম্ভিত। কেমন মানুষ এরা! ব্যাঙ্কে সকলেই আমার

চেয়ে থাক, সহ্য করতে পারি না। ওকে সব কথা খুলে জানালাম, "মুখই দেখতে ইচ্ছে করে না এদের। আজ পেলে আজই ওই নরক ছাড়ব।"

সায়ন বলল, "দেখি কী করা যায়।"

পরদিন বলল, "কাহিলিপাড়ার আশপাশে কোথাও ঘর পেলেই তোমার সুবিধে। ওখান থেকে ব্যাঙ্কটা কাছে। কিন্তু একান্তই যদি না পাও তা হলে আমাদের বাড়িতে একটা রুম আছে। খুবই ছোট রুম। সঙ্গে ছোট একটা কিচেনও। ওটায় উঠতে পারো। সেক্ষেত্রে তোমাকে একটু বেশি জার্নি করতে হবে। তুমি একবার ফাঁক বুঝে দেখে এসো।"

আমার তখন যা পাই তা-ই খাই অবস্থা। বললাম, "দেখাদেখির কী আছে? তুমি আছ তো, চিন্তা কী!"

সায়ন বলল, "না না, দেখে নেওয়া ভাল। পরে এই রুম নিয়ে না বন্ধুত্ব বিচ্ছেদ হয়। আমি ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। তুমি এক ফাঁকে গিয়ে দেখে এসো। আমি তো কাল ডিব্রুগড় চলে যাচ্ছি। আমার বোন সোহাকে তো চেনোই। আমি বলে রাখব। তুমি নিশ্চিন্তে দেখে এসো।"

ও একটা কাগজে ওদের পাঞ্জাবাড়ির ঠিকানাটা লিখে দিল। এমনই কপাল, ঠিক পরের দিনই আমাদের সিকিউরিটি গার্ড শ্রীকান্ত কলিতা একটা বাড়ি দেখিয়ে আনল ব্যাঙ্ক ছুটির পর এবং সেটা কাহিলিপাড়াতেই। সবচেয়ে সুখের কথা এই যে, বাড়ির মালিক ও-বাড়িতে থাকেন না। আমার বেশ পছন্দও হল। কিন্তু সেটা এক্ষুনি পাওয়া যাবে না। বর্তমানে যে ভাড়াটে আছে সে চলে যাবে তিরিশে ডিসেম্বর। আমি পয়লা জানুয়ারিতে সেখানে ঢুকতে পারব। শ্রীকান্তকে বললাম, "সবই তো হল শ্রীকান্তদা, কিন্তু সায়নকে বলি কী করে? বেচারা খুব খারাপ ভাববে আমাকে।"

শ্রীকান্ত বলল, "এক কাজ করুন। আপনি কাল-পরশু গিয়ে দেখে এসে বলুন যে, ঘরটা আপনার পছন্দ হয়নি। ব্যস। সায়নবাবু খুব ভাল মানুষ, রাগ করবেন না।"

দু'দিন অবশ্য যাওয়া হল না। আসলে শ্রীকান্তর দেখানো বাড়িটা এত ভালো লেগেছে যে, অত দূর পাঞ্জাবাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু সেদিনই ডিব্রুগড় থেকে সায়নের ফোন এল, "তোমার খারাপ কিছু হয়নি তো? এখনও রুমটা দেখতে গেলে না যে!"

আমি অজুহাত খাড়া করি, "আসলে এত টায়ার্ড থাকি না, কী বলব!"

সায়ন বেশ রাগ করে বলল, "তা হলে 'না' করে দাও। আমার তো কাউকে না কাউকে ভাড়া দিতেই হবে।"

সায়নের ক্ষোভ বুঝে বলি, "ঠিক আছে, আজই যাব।"

সায়ন বলল, "দেখে নিতে দোষ কী! পছন্দ না হলে নেবে না। যাওয়ার আগে ২২২৩৭৪৫ এই নম্বরে ফোন করে সোহাকে জানিয়ে দিয়ো।"

ব্যাঙ্ক থেকে বেরোতে বেরোতে সন্ধে হয়ে এল। ব্যাগ থেকে সোয়েটার বের করে পরে নিলাম। তারপর মোবাইল থেকে সায়নের বাড়ির নম্বরে রিং করলাম। রিসিভার যিনি তুলেছেন তাঁর গলার স্বর বেশ বয়স্ক, একটু ভারীও, কিন্তু ভাঙা-ভাঙা।

"সোহা আছে?"

"সোহা তো নেই। ও একটু মায়ের সঙ্গে প্রাগজ্যোতি কালচারাল কমপ্লেক্সে গিয়েছে রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠানে। আপনি কে বলুন তো?"

"আমি বিতত মজুমদার, সায়নের কলিগ। বন্ধু।"

"বিতত? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার কথা তো সায়নের কাছে খুব শুনি। তোমার তো একটা রুম দেখতে আসার কথা ছিল।"

"আপনি?"

"আমি সায়নের বাবা।"

"নমস্কার কাকাবাবু। আসলে আমি আজই যেতে চেয়েছিলাম।"

"এসো না। সোহা নেই তো কী হল! আমিই দেখিয়ে দেব। তবে চা করে খাওয়াতে পারব না।" ভদ্রলোক খুব হাসলেন।

পল্টনবাজার থেকে পাঞ্জাবাড়ি যেতে এক ঘণ্টা লেগে গেল। বাস থেকে যখন নামলাম তখন সন্ধে সাতটা। শীতকালে সাতটা মানে বেশ রাত। তাও আবার গুয়াহাটি। এখানে রাত ন'টা হলেই সব দোকানে ঝাঁপ পড়ে যায়। বোমাবাজির ভয়ে রাস্তা শুনশান হয়, শহর চলে যায় আর্মি, সি আর পি এফ আর পুলিশের দখলে। গুয়াহাটির এই শহরতলিটা এমনিতেই বেশ নির্জন। একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন ভাবও আছে, ফলে গা-ছমছম করে আমার। ঠিকানা অনুযায়ী স্টপ থেকে দুটো গলি পরেই রাজু রাভা পথ। রাজু রাভা নিশ্চয়ই কোনও বড় মাপের মানুষ, কিন্তু তাঁর নামাঙ্কিত পথটি ভাঙাচোরা, কঙ্কালসার, যত্রতত্র খানাখন্দ। স্ট্রিটল্যাম্প একটাও নেই। বেশ অন্ধকার, লোকশূন্য। দু' পাশে নম্বর দেখে দেখে এগিয়ে যাচ্ছি। বাঁকের মুখে হঠাৎ এক ছায়ামূর্তি। ভদ্রলোককে ডেকে বললাম, ''দাদা, সায়ন চক্রবর্তীর বাড়িটা চেনেন?''

অন্ধকারে ভদ্রলোকের চেহারা বোঝা যাচ্ছে না, শুধু কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ''ব্যাঙ্কে চাকরি করে তো?''

আমি হ্যাঁ বলায় ভদ্রলোক বললেন, ''এখান থেকে ঠিক চার নম্বর বাড়িটা। গেটে লেখা আছে দেখবেন 'চক্রবর্তী নিবাস'। গেটের দু'পাশে দুটো পাইনগাছ আছে।''

ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানিয়ে আশ্বস্ত হলাম এই ভেবে যে, যাক, বাড়িটা পাওয়া গিয়েছে অন্তত, অন্ধকারে তো বাড়িগুলোর নম্বরই পড়া যাচ্ছে না।

এ পাড়ায় মনে হচ্ছে এখন লো ভোল্টেজ চলছে। গুয়াহাটিতে এটা প্রায়ই হয়। ইলেকট্রিসিটি থাকে, কিন্তু ভোল্টেজ এত কম থাকে যে, বাল্‌বগুলো টিমটিম করে জ্বলে। ইলেকট্রনিক চোক ছাড়া এ শহরে টিউবলাইট জ্বলেই না। কিন্তু চার নম্বর বাড়িতে এসে দেখা গেল, সেটা ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে ঢাকা। অথচ দু'পাশের দুটো বাড়িতেই মৃদু আলো আছে। সেই আলোতেই গেটের উপর আবছা লেখা দেখলাম 'চক্রবর্তী নিবাস'। তবে পাইনগাছ দুটোকে আলাদা করে চেনা যাচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল অন্ধকারের দুটো উঁচু স্তূপ।

গেট [illegible]াম। বেশ বড়সড় বাড়ি। সুরকি দেওয়া রাস্তার দু'পাশে ফুলগাছ। প্রশস্ত বারান্দার দু'পাশে অনেক টপ, সেসবে নানা গাছ-গাছালি, গুল্ম। অভ্যাসবশত ডোরবেলটা টিপে দিলাম। যদিও পরমুহূর্তেই ধাক্কা দিতে দিতে ডাকলাম, ''কাকাবাবু, কাকাবাবু।''

দু'-তিনবার ধাক্কা দেওয়ার পরেই দরজাটা খুলে গেল। মাঙ্কিক্যাপ মাথায়, পরনে পাজামা, গায়ে জড়ানো একখানা নাগা শাল। কাকাবাবু বেরিয়ে এলেন, ''কে? বিতত? এসে গিয়েছ?''

''হ্যাঁ কাকাবাবু। পাক্কা এক ঘণ্টা লাগল সিটিবাসে।''

''এসো, এসো। একটু বসে নাও।''

ড্রয়িংরুমটা বেশ বড়। সায়নের রুচি আছে বলতে হবে। মোটা, বেশ লম্বা একটা মোমবাতি জ্বলছে। আমি সোফায় বসে পড়লাম। একটু ক্লান্তও বোধ করছিলাম। কাকাবাবু উলটোদিকের সোফায় বসলেন। চেহারাটা বেশ সুন্দর। মুখটা অসম্ভব ফরসা, ক্লিনশেভ্‌ন। তবে কেমন যেন একটা বিষাদমাখানো সেই মুখমণ্ডল। আমি ঘরটা দেখছিলাম। দেওয়াল ঘেঁষে বড় টিভি, পাশে ফ্লাওয়ার ভাস। পুব দেওয়ালে দু'খানা পেন্টিং। দক্ষিণ দেওয়ালে একটা ফোটো উলটে রাখা। কেন, কে জানে! উলটে না-রেখে ফোটোখানা সরিয়ে ফেললেই তো হয়! মিছিমিছি ফোটোটা উলটে রেখে ঘরের সৌন্দর্য নষ্ট করার মানে কী?

''তোমাকে তো বাপু কিছু খাওয়াতে পারব না। কিচেনের ব্যাপারে আমি বড় অজ্ঞ।''

''না না, খাওয়ার কী আছে!''

''সোহা আর ওর মা থাকলে অবশ্য তোমাকে না খাইয়ে ছাড়ত না। ওদের ফিরতে ফিরতে অন্তত দশটা বাজবে। তখন তুমি আর কাহিলিপাড়ায় ফিরতে পারবে না।''

কাকাবাবুর কণ্ঠস্বরটা কেমন যেন খসখসে, একটু হাঁপানির ভাবও আছে মনে হয়। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ''চলো, ঘরটা আগে দেখিয়ে আনি। তারপর দু'দণ্ড কথা বলা যাবে।

রিটায়ার্ড জীবন তো, কেউ এলে ভাল লাগে। তুমি মোমটা নিয়ে আমার পিছু পিছু এসো।''

আমি মোমটা নিয়ে কাকাবাবুকে অনুসরণ করলাম। ফের বারান্দায় এসে পুবদিকের সিঁড়ি বেয়ে নেমে একটু টার্ন নিয়ে মূল বাড়ির পিছন দিকটায় একটা ছোট কামরার দরজা ঠেলে ঢুকতে হল। কাকাবাবু ভিতরে গিয়ে আর-একটি দরজা খুলে বললেন, ''এটা কিচেন। রুমগুলো ছোটই, তবে একা থাকার পক্ষে যথেষ্ট।''

কথাটা মিথ্যে নয়। ছোট কিন্তু চমৎকার ঘর। কিচেনটাও দারুণ, বড়সড় চার পাল্লার কাচের জানলার ওপারে মনে হয় সবজিখেত, অন্ধকারে সাদা ফুলকপিগুলো জেগে আছে। কাকাবাবু হাসলেন, ''ইলেকট্রিসিটি থাকলে ভালমতো সব দেখতে পারতে। পছন্দ হল?''

''বেশ তো। আমার জন্য পরম শান্তির।''

ফের কাকাবাবুর পিছু পিছু ড্রয়িংরুমে ঢুকে মোমটা রেখে সোফায় বসলাম। ওলটানো ফোটোটাই শুধু বড় দৃষ্টিকটু লাগছে। কাকাবাবু উলটোদিকে মুখোমুখি বসে লাল ও কালো স্ট্রাইপের চাদরখানা ভালমতো জড়িয়ে নিয়ে বললেন, ''ঘরটা সম্পর্কে সায়ন তোমাকে কিছু বলেনি?''

''বলেছে।''

''কী?''

''অ্যাটাচ্‌ড বাথ নেই। বাথরুম পিছন দিকে। তবে ওটা কোনও সমস্যা হবে না।''

''না না, তা নয়। কোনও উপদ্রবের কথা বলেনি?''

আমি একটু মনে করার চেষ্টা করলাম। না, সায়নের সঙ্গে বস্তুত ঘরটা নিয়ে কোনও কথাই হয়নি। ও শুধু দেখে যেতে বলেছিল। আমি একটু চিন্তিতও হলাম।

চমৎকার ঘর, এতে আবার উপদ্রব কী? কাকাবাবু ফের প্রশ্ন করলেন, "কিছুই বলেনি?"

"না তো!"

"এটা সায়ন খারাপ করেছে। আগেভাগে বলে দিলে তো আর ঝামেলা হয় না। তা ছাড়া ও তো তোমার বন্ধুও বটে!"

আমি একটু ধন্দে পড়লাম। কী হতে পারে? কীসের উপদ্রব ওখানে? জিজ্ঞেস করলাম, "কীসের উপদ্রব একটু খুলে বলুন তো কাকাবাবু।"

"তুমি ভুত বিশ্বাস করো? মানে অতৃপ্ত আত্মায় বিশ্বাস আছে?"

আমি এবার হেসে উঠি শব্দ করেই। তারপর হাসতে হাসতেই বলি, "না কাকাবাবু। আমি হাইস্কুল থেকে ওসবে ডরাই না। কেন, ওঘরে ভুতপ্রেত কিছু আছে নাকি?"

কাকাবাবুর মুখখানা সহসাই ফ্যাকাসে, বিবর্ণ, আরও সাদা হয়ে এল। আমার এই সশব্দ হাসি তিনি খুব একটা পছন্দ করলেন না বলে মালুম হল, তাঁর কঠোর মুখমণ্ডলই তার প্রমাণ। ওই কর্কশ মুখ আর সন্ত্রস্ত চোখের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের হাসি লুকিয়ে ফেললাম। কাকাবাবু একটু ঝুঁকে বললেন, "হ্যাঁ, ওই ঘরে ভুত আছে। পাঁচটা ভাড়াটে পালিয়েছে।"

"ও ঘরেই ভুত কেন? মানে এ ঘরেও তো থাকতে পারত!"

"ওই ঘরেই ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যা করেছিলেন এক ভদ্রলোক। ক্যানসার হয়েছিল তাঁর। ডাক্তাররা জবাব দিয়ে দিয়েছিলেন, আর বেশিদিন বাঁচবেন না তিনি। ভদ্রলোক পরদিনই ফাঁসিতে ঝুলে পরিবারকে অযথা অর্থব্যয়ের আশঙ্কা থেকে মুক্ত করে যান। কিন্তু তাঁরও নিশ্চয়ই কিছু কামনা-বাসনা ছিল। তাই রোজ তিনি ওই ঘরে আসেন। ভাড়াটেরা তাঁকে দেখতে পায়। আর দেখলেই পালায়। ভেবেছিলাম, সায়ন তোমাকে ঘটনাটা জানিয়েছে। এখন দেখছি তুমি কিছুই জানো না।"

এই প্রথম আমার শরীর শিহরিত হল। ভুত-প্রেতে আমার বিশ্বাস নেই, কিন্তু ফাঁসিতে ঝুলছে এক শব, দৃশ্য হিসেবে এটা অত্যন্ত ভীতিকর। কা[illegible] রীতিমতো সন্ত্রস্ত করে দিলেন। সায়নের উপর খুব রাগ হল আমার। এত বড় ঘটনাটা ওর কি জানানো উচিত ছিল না? আমি একটু ঘোরের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম। কাকাবাবু উঠে দাঁড়ালেন, আমি তাঁর দিকে তাকালাম। দেওয়ালঘড়িটা দেখিয়ে তিনি বললেন, "ন'টা বাজতে চলেছে। তুমি এখন বেরিয়ে পড়ো। এরপর বাস পেতে ঝামেলা হবে। পাঞ্জাবাড়ি থেকে কাহিলিপাড়া পর্যন্ত কোনও অটোরিকশাও তুমি পাবে না।"

আমি উঠে দাঁড়ালাম। বারান্দায় এসে তিনি ফের বললেন, "ঘরটা নেওয়ার আগে ভেবে দেখো। তুমিও আমার সন্তানের মতোই। জেনেশুনে তোমাকে বিপদে ফেলতে চাই না।"

কাকাবাবু ভিতরে ঢুকে গেলেন। দরজা বন্ধ হল। আমি গেট খুলে বাইরে আসতেই বারান্দা আর গেটের দু'পাশের বাল্‌ব জ্বলে উঠল। তবে ঘরটা তখনও অন্ধকার। হুটোপুটি করে বাসস্টপে এসে শেষ বাসটায় চাপলাম। খুব শীত করছিল তখন।

ক'দিন বাদে ব্যাঙ্কে গিয়ে দেখি, সায়ন হাজির। আমাকে দেখেই মুখ ঘুরিয়ে নিল। আমি ওর ঘাড়ে হাত রেখে বললাম, "কী হল? মুখ বেজার কেন?"

"কারও উপকার করতে নেই। তোমাকে তো নয়ই।"

"কী হয়েছে বলবে তো?"

"সাত দিনেও তোমার ঘর দেখার সময় হল না?"

"ঘর তো আমি দেখে এসেছি। চমৎকার ঘর।"

সায়ন ঘুরে মুখোমুখি বসে বলল, "দেখে এসেছ মানে? তুমি দেখে এলে সোহা কি লত না?"

"সোহা তো তখন ছিল না। কাকিমাও ছিলেন না। ওঁরা রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন প্রাগজ্যোতিতে। কাকাবাবুই ঘরটা ঘুরিয়ে দেখালেন। অনেকক্ষণ গল্পগুজবও হল।"

"কাকাবাবু মানে!"

"মানে তোমার বাবা। তুমি কিন্তু অবিকল তোমার বাবার মতো দেখতে।"

সায়ন চুপ করে থাকল। আমি বুঝলাম, ফাঁসিতে মারা যাওয়ার ঘটনাটাই ওকে চুপ করিয়ে রেখেছে।

''তুমি কিন্তু একটা খুব খারাপ কাজ করেছ সায়ন।''

''কী খারাপ কাজ?''

''ওই ঘরে একজন ফাঁসিতে মারা গিয়েছে তা আমাকে বলোনি কেন? ভূতে আমি ভয় পাই না, কিন্তু দৃশ্য হিসেবে ঝুলন্ত মৃতদেহ তো আদৌ মজার ব্যাপার নয়। কাকাবাবু বললেন বলেই জানলাম।''

সায়ন চোখ বিস্ফারিত করে বলল, ''বাবা বলেছেন এসব? ওই ফাঁসিতে মারা যাওয়ার কথা?''

''হ্যাঁ। ভদ্রলোকের ক্যানসার ছিল। ভেরি স্যাড ইনসিডেন্ট।''

সায়ন আর কথা বলল না। মনে হল খুব লজ্জিত। ও ক্যাশ কাউন্টারে গিয়ে ঢুকল।

সারাদিন আর সায়নের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা হয়নি। ব্যাঙ্কে খুব ভিড় ছিল। প্রচণ্ড চাপ গেল সারাদিন। ছুটির পর বাইরে বেরিয়ে সায়ন বলল, ''চলো, আমার বাড়ি যাবে?''

''এখন? না না, আই ফিল সো টায়ার্ড।''

''চলোই না। তোমাকে একটা জিনিস দেখাব।''

''ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ?''

আমি হাসতে থাকলাম। ও কঠোর হয়ে বলল, ''ঠিক তাই। চলো।''

ও জবরদস্তি করে আমাকে বাসে তুলল। পাক্কা এক ঘণ্টা পর পাঞ্জাবাড়িতে এলাম। ও বলল, ''এবার আমাকে বাড়িতে নিয়ে চলো। দেখি সত্যিই তুমি এসেছিলে কি না?''

সায়ন আমার কথা বিশ্বাস করছে না দেখে হেসে বললাম, ''আশ্চর্য, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না? এখনও? ঠিক আছে চলো।''

আমি রাজু রাভা পথে ঢুকতে ঢুকতে বললাম, ''ওই মোড়ের পর চার নম্বর বাড়িটা তোমাদের। নাম 'চক্রবর্তী নিবাস'। তোমাদের ড্রয়িংরুমের টিভিটা বড়মাপের। তার পাশে ফ্লাওয়ার ভাস। পুবদিকের দেওয়ালে বড়সড় দুটো পেন্টিং। শিল্পীর নাম অবশ্য মোমের আলোয় দেখা যায়নি। তোমার বাবার পরনে ছিল ব্রাউন মাঙ্কিক্যাপ, নাগা লাল-কালো শাল, সাদা পাজামা। আর হ্যাঁ, দক্ষিণ দেওয়ালে একটা ফোটো ঝুলছিল, সেটা উলটে রাখা। এর কারণ কী?''

সায়ন ততক্ষণ কথা শুনছিল, এবার চমকে বলল, ''উলটে রাখা কোনও ফোটো ড্রয়িংরুমে নেই। ফোটো কি কেউ উলটে রাখে?''

দরজা খুলে দিল সোহা। চোখ নাচিয়ে বলল, ''এতদিনে আসার সময় হল!''

সায়নের পিছু পিছু ড্রয়িংরুমে ঢুকলাম। দক্ষিণ দেওয়ালের ফোটোটা ছিল যথাস্থানেই, তবে আজ আর ওলটানো নয়, রীতিমতো যত্ন করেই দেওয়ালে টাঙানো। লক্ষ করলাম ছবিটা কাকাবাবুর। সুন্দর মুখশ্রী, ক্লিনশেভ্ন। তিনি হাসছেন। ছবির উপর চন্দনের আলিম্পন। আমি সামনে গেলাম। ছবির নীচে লেখা, জন্ম: ১২. ০৭. ১৯৪৫। মৃত্যু: ২০. ১২. ২০০০। আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠল, আমার চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসবে। আমি চোখ সরিয়ে নিয়ে ধপ করে সোফায় বসে পড়লাম। সায়ন আমার পাশে বসে বলল, ''ওই ঘরটায় আসলে বাবাই ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যা করেছিলেন। তুমি সাহসী, তাই বলার প্রয়োজনই মনে করিনি। কিন্তু বাবা এসেই সব তোমাকে খুলে বলে গিয়েছেন।''

আমি সায়নের পরের কথাগুলো আর শুনতে পাইনি। শুধু একটা তিরতিরে চোরা হিমশীতল স্রোত আমার শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল এক অজানা ভৌতিক অতলের দিকে।

২ মে ২০০৭

অলংকরণ: নির্মলেন্দু মণ্ডল

শেষ শান্তিপুর লোকাল

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

অফিসের সহকর্মী দীপক বিশ্বাসের বাড়ি বেড়াতে এসেছিল শ্যামল সরখেল। শান্তিপুরে। ঠিক শান্তিপুরে নয় অবশ্য, শহর থেকে মাইল তিনেক দূরের গ্রাম ধলাশিমলায়। খাওয়া-দাওয়া, গল্প-আড্ডা কম হল না সারাদিন। ছোট্ট একটা পুকুর আছে দীপকদের, ছিপ ফেলে মাছ ধরল দুপুরবেলায়। বিকেলে গোটা গ্রামে চরকি। অবশেষে রাতের আহারটি সেরে শ্যামল যখন বেরোল, ঘড়ির কাঁটা প্রায় দশটা ছুঁইছুঁই।

শ্যামল ভেবেছিল ট্রেন না পেলে বাসেই ফিরবে কলকাতায়। শান্তিপুর থেকে তো সারারাতই দূরপাল্লার বাস মেলে। পথে উলটোডাঙায় নেমে গেলেই হল। তবে আজ কপাল ভাল। ভ্যানরিকশায় টিকুর-টিকুর করে শান্তিপুর স্টেশনে পৌঁছে শ্যামল দেখল, শেষ লোকালটা ছাড়েনি তখনও। মনটা ফুরফুরে হয়ে গেল শ্যামলের। বাসে ঝাঁকুনি খেতে খেতে যাওয়ার চেয়ে ট্রেনের দুলুনি উপভোগ করতে করতে ফেরার সুখ ঢের-ঢের বেশি।

ডিসেম্বরের রাত। ভালই শীত পড়েছে। ট্রেনে যাত্রীও নেই বিশেষ। সব কামরাই ফাঁকা-ফাঁকা। বেছে বেছে সামনের দিক থেকে চতুর্থ বগিটিতে উঠল শ্যামল। আক্ষরিক অর্থেই কামরাটি জনহীন। ছোট্ট বগিতে বাতি জ্বলছে মাত্র দুটো। আবছায়া মাখা এমন নির্জন পরিবেশই শ্যামলের বেশি পছন্দ। দিব্যি আরামে ঢুলতে ঢুলতে একসময় পৌঁছে যাবে উলটোডাঙায়।

ডান ধারের একদম কোনার সিটটিতে গিয়ে বসল শ্যামল। নামিয়ে দিল জানলার কাচ। পেট এখনও লুচি, মাংস আর মিষ্টিতে টইটুম্বুর। সিগনাল দিয়ে ট্রেন ছাড়ার আগেই চোখ জড়িয়ে এসেছে ঘুমে।

খানিক পর আপনাআপনি তন্দ্রা ছিঁড়ে গেল। শ্যামল টের পেল, থেমে আছে ট্রেন। কী ব্যাপার, কোনও স্টেশন নাকি? বাইরে তো প্ল্যাটফর্ম নজরে আসে না! শুধুই ঘুরঘুট্টি অন্ধকার!

তখনই দৃষ্টি পড়েছে সামনের সিটে। মাফলারে মাথা মুড়ে বসে আছে এক গাট্টাগোট্টা লোক। গায়ে একটি আলোয়ানও জড়ানো। পাশেই, সিটের উপর, একটা বড়সড় গাঁটরি।

কখন ট্রেনে চাপল লোকটা? শ্যামলের মনের প্রশ্ন মুখে ফোটার আগে লোকটাই বলে উঠল, "আমি ফুলিয়া থেকে উঠেছি। আপনি তখন নিদ্রা যাচ্ছিলেন!"

"ও!" শ্যামল অল্প হাসল, "তা ট্রেনটার কী হল? থেমে আছে কেন?"

"সামনে কালীনারায়ণপুর স্টেশন। সিগনাল পায়নি।" লোকটা গলা ঝাড়ল, "আপনি যাবেন কদ্দুর? উলটোডাঙা?"

"দারুণ আন্দাজ করেছেন তো!"

"অনুমানে আমার বড় একটা ভুল হয় না। ইদানীং ওই শক্তিটা আমার প্রায় অব্যর্থ হয়ে গেছে।'

"তাই বুঝি?" লোকটার কথার ভঙ্গিতে শ্যামল বেশ মজা পেয়েছে। হাতে হাত ঘষে বলল, "তা আপনি নামবেন কোথায়?"

"আমাকে তো শেয়ালদা অবধিই যেতে হয়।"

"যেতে হয় মানে?"

"আর যে ধুলিয়ান থেকে শাড়িগুলো কিনেছি... এগুলো নিয়ে তো শেয়ালদাতেই নামার কথা।"

ধুলিয়ানের তাঁতের শাড়ির দুনিয়াজোড়া নাম, শ্যামল জানে। জিজ্ঞেস করল, "আপনার শাড়ির ব্যাবসা?"

"ওই আর কী। আগে আমি চালাতাম, এখন ভাই দেখছে।"

"তা হলে আপনি এত শাড়ি নিয়ে...?"

"কপালের ফের ভাই! এ বোঝা আমার বয়ে বেড়াতেই হয়। উপরওয়ালার তাই ইচ্ছে।"

বেশ দার্শনিকের মতো কথা বলে তো লোকটা। শ্যামলের মনে হল, এমন একটা সহযাত্রী পেলে দিব্যি তো গল্পে-গল্পে সময় কাটানো যায়।

জোর হুইসল বাজিয়ে ট্রেন ছেড়েছে। ছোট একটা আড়মোড়া ভেঙে টিমটিমে আলোমাখা কামরাটায় একবার চোখ বোলাল শ্যামল। ট্রেনের গতির সঙ্গে ঝুলন্ত হাতলগুলো নাচানাচি করছে, এ ওর গায়ে ঠোক্কর খেয়ে বাজছে খটাখট। শব্দটায় কেমন গা শিরশির করে।

আলগাভাবে শ্যামল বলল, "কামরাটায় একটু ছমছমে ভাব আছে না?"

"তা আছে অবিশ্যি!" লোকটা সায় দিল, "এমন আলো-আঁধারের খেলা চলছে...!"

"আমার কিন্তু এমনটা দারুণ লাগে। সত্যি বলতে কী, আমি একটু ভৌতিক পরিবেশই লাইক করি। বিশেষ করে ট্রেনের কামরায়।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ মশাই। ট্রেনের কামরায় আমার ভূত দর্শনের অভিজ্ঞতাও হয়েছে।"

"নিশ্চয়ই লোকাল ট্রেনে নয়?"

"না, এক্সপ্রেস।"

"কীরকম?"

"শুনবেন সেই কাহিনি?"

শ্যামল চটি খুলে সিটে বাবু হয়ে বসল, "বছর দুয়েক আগের কথা, বুঝলেন। লখনউ থেকে বেনারস যাচ্ছি। এসি কোচে। ট্রেন লখনউ ছাড়ার আগেই আমাকে রেলের এক কর্মচারী বলে গেল, 'সাবধানে থাকবেন স্যার, কামরাটা কিন্তু সুবিধের নয়। রাত্তিরে যে টিকিট-চেকারটি আসে, সে কিন্তু বহুকাল আগে ওপারে চলে গিয়েছে। কোনও ডাকাডাকিতে সাড়া দেবেন না, কম্বল মুড়ে পড়ে থাকবেন।' শুনে আমার বেশ পুলকই জাগল। টাটকা একটা ভূতের দেখা পাওয়া তো কম সৌভাগ্যের কথা নয়!"

"তার মানে আপনি ভূতকে ভয়-টয় পান না?"

"ভূত কি একটা ভয় পাওয়ার জিনিস? যার শরীরই নেই, সে করবেটা কী?" শ্যামল মুচকি হাসল, "তারপর কী হল জানেন? ট্রেন তো ফৈজাবাদ ছাড়ল। আমিও খাওয়া সেরে ঘুমের তোড়জোড় করছি...। গোটা কোচে সেদিন বড়জোর সাত-আটটা লোক। তাঁরা আমার আগেই শয্যা নিয়েছেন। হঠাৎই এক বুট পরা পায়ের আওয়াজ। শব্দটা খুটখুট করে এগিয়ে এসে আমারই কুপের মুখে থামল। মুখ বাড়িয়ে দেখি, একটা মোটা গোঁফওয়ালা রাগী-রাগী চেহারার মানুষ কটমটে চোখে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। গায়ে কালো কোট। হাতে রিজার্ভেশন মেলানোর কাগজ। আমি তো একগাল হেসে হিন্দিতে বললাম, 'এত জলদি জলদি এসে গেলেন? ভেবেছিলাম মাঝরাতে আপনার সঙ্গে মোলাকাত হবে।' ব্যস, আমার দুটো ডায়ালগেই ফিউজ। ভাঁটার মতো চোখ দুটো পলকে করুণ হয়ে গেল। ছলছল দৃষ্টিতে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বেমালুম কর্পূরের মতো উবে গেল লোকটা। আই মিন, ভূতটা। পরে রেলের লোকের মুখেই শুনেছি, ওই ভূত আর ওই ট্রেনে দেখা যায় না।"

"আপনার সাহসের তো তারিফ করতে হয়!"

"ওই জিনিসটি আমার একটু আছে বটে! আপনার যেমন অনুমানশক্তি!" শ্যামলের হাসি চওড়া হল, "ছেলেবেলা থেকেই খুব ডানপিটে ছিলাম তো! শ্মশান-টশানে অনেক গিয়েছি। বনেবাদাড়েও কম ঘুরে বেড়াইনি। তাই ভয় বস্তুটি মন থেকে লোপ পেয়ে গিয়েছে।"

"বাঃ, বাঃ!" লোকটার স্বরে আবার প্রশংসা বেজে উঠল, "কিন্তু একটা কথা আমি বলব ভাই। ভূতের ব্যাপারে এতটা

বেপরোয়া হওয়া কিন্তু ঠিক নয়। কখনও-সখনও তারা ক্ষতিও করতে পারে বই কী।''

শ্যামল রগুড়ে গলায় বলল, ''আপনার তেমন কোনও অভিজ্ঞতা আছে বুঝি?''

''না থাকলে কি আর আপনাকে সাবধান করি!''

''বেশ তো! শুনি তা হলে আপনার গপ্পো।''

লোকটা শুরু করার আগেই ট্রেন একটা স্টেশনে থামল। জানলা দিয়ে নামটা পড়ল শ্যামল 'শিমুরালি'। প্রায় ধু ধু করছে প্ল্যাটফর্ম। একটা চা-ওয়ালা এত রাতেও কেটলি হাতে দাঁড়িয়ে। তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছিল শ্যামলদেরই কামরার দিকে, কাছে এসেও হঠাৎ ছিটকে সরে গেল।

ট্রেন ছাড়তে শ্যামল ব্যাজার মুখে বলল, ''দেখলেন চা-ওয়ালাটার কাণ্ড! ভাবলাম একটু গলা ভেজাব...''

''এই কামরায় ও উঠবে না!'' লোকটা নড়ে বসল, ''শুধু ও কেন? কোনও হকারই এই বগিতে ওঠে না।''

''কেন? কামরাটা ছোট বলে?''

''উঁহু। এই কামরার খুব বদনাম আছে, তাই!''

''কী বদনাম?'' শ্যামলের চোখ গোল গোল, ''কীসের বদনাম?''

''সেই গল্পটাই তো আপনাকে শোনাব এখন।'' লোকটা ঝুপ করে গলা নামাল, ''আমার ভূত দর্শনের অভিজ্ঞতা তো এই কামরাতেই!''

''বলেন কী?''

''হ্যাঁ ভাই! বেশিদিন নয়, এই ধরুন মাস চারেক আগের ঘটনা।'' লোকটার স্বর বেশ ভারিক্কি এবার, ''পুজোর আগে ফুলিয়া থেকে শাড়িটাড়ি কিনে এই কামরাতেই উঠেছি। এই ট্রেনেই। আপনি যেখানটায় বসেছেন, ঠিক সেই জায়গাটিতে বসে ছিলাম। হঠাৎ হবিবপুরে দেখি, সামনে এক সিড়িঙ্গে মতো লোক। আমাকে দেখেই সে গরগর করে উঠল, 'কোন সাহসে তুই আমার বগিতে উঠেছিস? জানিস না, মধু হকার এই কামরাটা আমায় দিয়ে গিয়েছে?' মধুর নাম আমি শুনেছিলাম। শান্তিপুর লাইনে গামছা ফিরি করত। বছর খানেক আগে শেষ ট্রেন থেকেই কে যেন মধুকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল। তবে ঘটনাটা যে এই কামরাতেই ঘটেছিল, সেটি

আমার জানা ছিল না। আমি বোকার মতো সিড়িঙ্গেটাকে প্রশ্ন করে ফেলেছিলাম, 'মধু তো মরেই গিয়েছে। সে এই কামরা আপনাকে দিয়ে যায় কী করে?' শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে কী করল জানেন?''

''কী?''

''থাক, সে আপনার শুনে কাজ নেই!''

'আহা, বলুন না!''

''কী দরকার ভাই? মিছিমিছি আপনি বিপদে পড়ে যাবেন!''

''ভণিতা ছেড়ে সাফ-সাফ বলুন তো!'' শ্যামল সামান্য বিরক্ত হল, ''বিপদ-টিপদকে এই শর্মা ডরায় না! এ কথা আর কতবার আওড়াতে হবে?''

''ঠিক আছে। জোরাজুরি যখন করছেন, শুনুন তা হলে। আমারও কিন্তু আর কোনও অপরাধ রইল না।'' লোকটা খিকখিক হাসল, ''করল কী জানেন সিড়িঙ্গেটা?... হঠাৎ হ্যাঁচকা টানে আমাকে উপড়ে ফেলল সিট থেকে। পলকে দেখি, আমি সটান চলে গিয়েছি দরজার সামনে। থমথমে গলায় সিড়িঙ্গে তখন বলল, 'মধু আমাকে এই দরজা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল। তাতে মধুর মুক্তি ঘটেছে বটে, কিন্তু কামরা এসেছে আমার জিম্মায়। এবার কামরাটা আমি তোকে দিয়ে যেতে চাই।'''

''তারপর?''

''তারপর আর কী! সিড়িঙ্গে ধাক্কা মারল আমায়। আমিও ট্রেনের তলায়। এবং তৎক্ষণাৎ অক্কা!''

''অ্যাঁ?''

''অ্যাঁ নয় ভাই, হ্যাঁ। সেই থেকেই তো বেগার খাটছি। রোজ ফুলিয়া থেকে গাঁটরি নিয়ে উঠি, শেয়ালদা অবধি যাই, একা একা। ভূতের আস্তানা বলে ছাপ্পা পড়ে গিয়েছে তো! লাস্ট ট্রেনে কেউ আর এই কামরার ছায়াও মাড়ায় না।''

কে জানে কেন, শ্যামলের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল এবার। ঢোক গিলে বলল, ''অ্যাই... আপনি... কী বলছেন?''

''গুল মারছি না ভাই, বিশ্বাস করুন। সিড়িঙ্গে আমাকেই দিয়ে গিয়েছে কামরাটা। কিন্তু প্রতিদিন এই কাপড়ের গাঁটরি বওয়া যে কী বিরক্তিকর! রোজই আশায় থাকি, এই বুঝি কেউ উঠল, এই বুঝি কেউ উঠল! আজ আপনার মতন এক সাহসী মানুষকে পেয়ে আমার কী আনন্দ যে হচ্ছে!''

শীতের রাতেও দরদর করে ঘামতে শুরু করল শ্যামল। তালু শুকিয়ে খটখটে। জিভ নড়তেই চাইছে না। কোনওক্রমে তোতলাতে তোতলাতে শ্যামল বলল, ''আ-আপনি আ-আ-আজগুবি গপ্পো শোনাচ্ছেন কেন? আমি বোধহয় এবার ভয় পাচ্ছি!''

''ঘাবড়িয়ো না ভাই! মাত্র তো কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার!''

বলার সঙ্গে-সঙ্গে জোর একটা ঝটকা। আতঙ্কে চোখ বুজে ফেলল শ্যামল। স্পষ্ট টের পেল, সে উড়ে গিয়ে পড়ল কামরার দরজায়। এবার ধাক্কা...!

নাঃ, ফুলিয়া থেকে সেই কাপড় ব্যবসায়ী আর ওঠে না ট্রেনটায়। তার বদলে শান্তিপুর থেকে ওঠে এক যুবক। শ্যামল সরখেল। বেচারা এখনও প্রতীক্ষায় আছে, কেউ যদি ভুল করেও চড়ে বসে শেয়ালদামুখো শেষ শান্তিপুর লোকালের চার নম্বর কামরাটায়। যদি ওঠে...!

২ অক্টোবর ২০০৭
অলংকরণ: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

কুয়াশায় অবিনাশ

সৌরভ মুখোপাধ্যায়

চোখ মেলে তাকিয়ে অবিনাশ দেখল চারদিকে গাঢ় অন্ধকার। তীব্র স্বরে ঝিঁঝি ডাকছে। অনেক উপরে মোটা মোটা ডালপালার ফাঁক দিয়ে আকাশের তারা দেখা যাচ্ছে একটা-দুটো। চোখটা একটু সইয়ে নিয়ে চারপাশটা হাতড়ে দেখল সে। হ্যাঁ, সে যা ভেবেছে তাই। নোনাকুণ্ডুর জঙ্গলে তাকে ফেলে রেখে গিয়েছে ওরা। তার বাড়ি থেকে প্রায় তিন-চার কিলোমিটার দূরে।

গাছের গুঁড়িতে ঠোক্কর খেতে খেতে সামনে এগোতে চেষ্টা করল অবিনাশ। মুশকিল হল, আরও গভীরে ঢুকে পড়ছে কি না বোঝার উপায় নেই। দিক ঠিক করতে এই শীতের সন্ধেতেও গলদঘর্ম হওয়ার উপক্রম। এই জঙ্গলে দিনেরবেলাতেও এমন ঘুপচি অন্ধকার থাকে যে, লোকে ঢুকতে ভয় পায়। একবার অবশ্য একটুখানি ঢুকেছিল অবিনাশ। বছর দুই আগে জঙ্গলের সামনে ফাঁকা জমিটায় চড়ুইভাতি করতে এসেছিল কয়েকজন বন্ধু মিলে। তখন সাহস করে একটু ভিতরে গিয়েছিল, কিন্তু কিছু দূরে এগিয়েই গা ছমছম করছিল রীতিমতো। নানারকম বদনাম আছে এই জঙ্গলের। আগে নাকি এখানে নরবলি হত। অনেক লোক নাকি এখানে ঢুকে বেভুল গোলকধাঁধায় হারিয়ে গিয়েছে, তাদের আর হদিশ মেলেনি।

তবে আজ এত অন্ধকারের মধ্যেও তেমন ভয় করছে না অবিনাশের। এর কারণ হয়তো তার ভিতরের চাপা উত্তেজনা। সত্যি বলতে কী, কয়েক সপ্তাহ ধরেই তো ভয়ডর ভুলে একটাই উদ্দেশ্যের পিছনে দৌড়চ্ছে সে। কম ভয় দেখানো আর চোখরাঙানির মুখোমুখি হল সে এই ক'দিন! উড়ো চিঠি, ফোনে হুমকি, রাস্তায় দাঁড় করিয়ে শাসানো, কোনও কিছুই বাদ রাখেনি খোকা সিংহের দল। কিন্তু অবিনাশকে টলাতে পারেনি।

এমনকী আজ বিকেলবেলা, যখন তার রগে পিস্তল ঠেকিয়ে নিরিবিলি বাঁধের রাস্তা থেকে টেনেহিঁচড়ে ওদের গাড়িতে তোলা হল, তখনও এতটুকু বুক কাঁপেনি তার। গাড়ির মধ্যে চারজন নিষ্ঠুর চেহারার লোক ছিল। তাদের মধ্যে একজন খোকা সিংহ নিজে। ওরা বিচ্ছিরি ভাষায় গালাগাল দিচ্ছিল, শাসাচ্ছিল। অবিনাশ সোজা তাকিয়েছিল ওদের চোখের দিকে, বলেছিল, "আমাকে শেষ করে দিলেও তোমরা কিন্তু জিতবে না!" ওর ওরকম শান্ত গলা দেখে খোকা সিংহও বোধহয় অবাকই হয়েছিল একটু।

তারপর ঠিক কী ঘটেছিল, এই মুহূর্তে অবশ্য অবিনাশের মনে পড়ছে না। হুঁশ ফিরতে সে নিজেকে এই জঙ্গলের মধ্যে আবিষ্কার করল। সম্ভবত কিছু শুঁকিয়ে তাকে বেহুঁশ করে দিয়ে থাকবে খোকা সিংহের লোকেরা। জঙ্গলে ফেলে দিয়ে ভেবেছে, আর সে বেরোতে পারবে না। হায়না, শিয়ালে ছিঁড়ে খাবে। কিন্তু অবিনাশকে ওরা চেনে না। তার মনের জোর সাংঘাতিক। কিছুতেই সে পথ হারাবে না, বেঘোরে পড়ে থাকবে না জঙ্গলে। তাকে পৌঁছতেই হবে নিজের পাড়ায়। সরস্বতীমাঠের বটগাছের তলায় আজ সন্ধেতেই সকলে জড়ো হবে। এরকমই কথা

আছে। অবিনাশ নিজে এই জমায়েতের উদ্যোক্তা, সে না পৌঁছলে চলবে কী করে?

প্রায় দু'-তিন সপ্তাহ ধরে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে মাঠটাকে বাঁচানোর জন্যে দৌড়োদৌড়ি করছে অবিনাশ। তাদের পাড়ার ওই একটাই খেলার মাঠ। পাশেই সরস্বতী নদী। নদীর ধারের বুড়ো বটগাছটা কত বছর ধরে যে ছোট্ট ছেলেমেয়েদের খেলা দেখে আসছে, তার ইয়ত্তা নেই। সারাদিন পাড়ার খুদেরা দাপিয়ে বেড়ায় ওই মাঠে। শীতের দুপুরে ক্রিকেট, গ্রীষ্মের বিকেলে ফুটবল। এত বড় মাঠ যে, একই সঙ্গে ফুটবল আর ক্রিকেটও জমে যায় কখনও-কখনও। এক-এক কোণে দিব্যি কুলিয়ে যায় ব্যাডমিন্টন কিংবা পিং পং। কচিকাঁচাদের মধ্যে দেদার চলে ধরাধরি, জলকুমির বা বুড়ি বসন্ত। অবিনাশের ছেলেবেলাতেই কি কম সময় কেটেছে ওই মাঠে, ডাংগুলি আর মার্বেল খেলার ঝোঁকে? ওই মাঠেরই একধারে স্টেজ বেঁধে কত রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা, শখের থিয়েটার অথবা ম্যাজিক-শো উতরে গিয়েছে। বৃদ্ধদের সকাল-সন্ধে একটু হেঁটে বেড়ানো, একটু হাওয়া খাওয়ার আর কোনও জায়গা আছে এ তল্লাটে, ওই নদীর ধারের খোলা জমিটুকু ছাড়া?

সেই মাঠ চলে যাবে প্রমোটারের থাবায়? সবুজ গালিচার মতো ঘাস, সরস্বতীর ঠান্ডা হাওয়ার অবাধ স্বাচ্ছন্দ্য, বৃদ্ধা ঠাকুরমার মতো প্রাচীন বটগাছ, কিচ্ছু থাকবে না। তার বদলে আকাশে খোঁচা দেবে কংক্রিটের খাঁচাবাড়ি! অবিনাশ মেনে নিতে পারে না কিছুতেই।

প্রথম যেদিন সে শুনল, এই মাঠের মালিকানা কিনে নিয়েছে জাঁদরেল প্রমোটার খোকা সিংহ। সেইদিনই অবিনাশ মনে-মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল। এর বিরুদ্ধে লড়তে হবে তাকে। বহুকালের উপকারী পড়শির মতো এই মাঠ, সারা গ্রামের একটা প্রাণকেন্দ্রের মতো। একে বাঁচাতেই হবে। এলাকায় জমির কি অভাব? ঠিক এই মাঠটা না হলে চলছিল না জমি-সওদাগরের? সেইদিন থেকেই কাজে নেমে পড়ল অবিনাশ। সে একা, দুর্ধর্ষ ক্ষমতাশালী ও বিত্তবান খোকা সিংহের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না কোনওভাবেই। কিন্তু সে জানে, লক্ষ বালুকণায় মরুভূমি তৈরি হয়, অযুত জলবিন্দুই সাগর গড়ে তোলে। সংগঠিত প্রতিরোধে অসম্ভবও সম্ভব হয়, সে বিশ্বাস করে।

পাড়ার প্রত্যেকটি বাড়িতে সে নিজে গিয়েছে। প্রত্যেকটি লোকের সঙ্গে নিজে কথা বলেছে। মাঠটার গুরুত্ব কতখানি, কেন মাঠটাকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার, খুব ব্যাকুলভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছে। সব জায়গায় যে সমান সফল হয়েছে, তা নয়। কেউ কেউ তেমন গুরুত্ব দেয়নি। "যার জমি সে বাড়ি তুলবে, আমরা কী করব?" এই বলে এড়িয়ে গিয়েছে। কেউ হয়তো ব্যাপারটা বুঝেছে, কিন্তু খোকা সিংহের ভয়ে পিছিয়ে এসেছে। সময়ের অভাব, এই অজুহাতে গা বাঁচিয়েছে দু'-একজন। আবার অনেকেই সমর্থন জানিয়েছে তাকে। বলেছে, "আপনি দেখুন, কীভাবে এটা রোখা যায়, আমরা আপনার পাশে আছি।"

মাঠ বাঁচানোর জন্যে আবেদনপত্র তৈরি করেছিল অবিনাশ, বাড়ি-বাড়ি ঘুরে সই সংগ্রহ করেছিল। সই অবশ্য দেয়নি সকলে। তার প্রত্যাশার চেয়ে বেশ কমই হয়েছিল সইয়ের সংখ্যা। মনটা একটু খারাপ হয়েছিল, কিন্তু ভেঙে পড়েনি সে। বিশ্বাস হারায়নি। তার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, একদিন সব দ্বিধা-ভয় ভুলে গোটা গ্রাম তার পাশে এসে দাঁড়াবে। অবিনাশ তার কাজ করে চলেছিল। সম্পূর্ণ একার উদ্যোগে সে হ্যান্ডবিল ছাপিয়েছিল, রিকশা চেপে গ্রামের রাস্তায় মাইক হেঁকে প্রচার করে বেড়িয়েছিল। লক্ষ্মণ, অসীম, জগদীশ, আরও কয়েকজন উৎসাহী যুবক তাকে সঙ্গ দিতে এগিয়ে এসেছিল। 'মাঠ বাঁচাও কমিটি' তৈরি হয়েছিল। আরও দু'-চারজন আসছিল আস্তে-আস্তে।

এইরকম সময় একদিন খোকা সিংহ তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। গিয়েছিল অবিনাশ। খোকা সিংহ প্রথম দিকটায় বেশ গলা চড়িয়ে তাকে ভড়কে দিতে চেয়েছিল। বলেছিল, "আমার সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে গেলে কিন্তু আপনার লাইফ রিস্ক হয়ে যাবে! কেন ফালতু ঝামেলা পাকাচ্ছেন?"

অবিনাশ বলেছিল, "ওই মাঠ আমাদের গ্রামের ফুসফুসের মতো। অন্তত ছোটদের মুখ চেয়ে আপনি ফ্ল্যাট তৈরির প্রজেক্টটা অন্য কোনও জমিতে সরিয়ে নিন।"

"ব্যাবসা করতে নেমে ছোট-বড় ভাবলে আমার চলবে?" খেঁকিয়ে উঠেছিল ঘাঘু প্রমোটার, "অনেক ফেসিলিটি আছে ওই প্লটটার, ও প্রজেক্ট কোনওভাবেই ক্যানসেল হবে না।"

দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিল অবিনাশ, "বেশ, তবে আপনি আপনার রাস্তায় চলুন, আমরা আমাদের মতো চেষ্টা চালিয়ে দেখি। আমাদের অ্যাপিল কিন্তু অনেক উপর মহল পর্যন্ত যাবে।"

"সই তো মাত্র ওই কয়েকটা পেয়েছেন আপনি!" ধূর্ত হাসি খেলা করছিল খোকা সিংহের মুখে।

"ভুল করছেন, যে-কোনও আন্দোলন একদিনেই তৈরি হয় না।" অবিনাশও মৃদু হেসেছিল, "চেতনা ছড়িয়ে পড়তে সময় নেয়। তারপর একজোট হয়ে প্রতিবাদ মাথা তোলে। আপনিও দেখতে পাবেন, সেদিন বেশি দূরে নয়।"

কথাগুলো এখন আর-একবার মনে পড়তেই শরীরটা টানটান হয়ে উঠল অবিনাশের। আজ সন্ধেবেলা সরস্বতীমাঠের বুড়ো বটগাছের তলায় গ্রামের সমস্ত উৎসাহী মানুষকে জড়ো হতে বলেছে সে। পরবর্তী কর্মপদ্ধতি ঠিক হবে আজই। খোকা সিংহের দল ভালই জানে যে, ব্যাপারটা তাদের পক্ষে ঘোরালো হয়ে উঠছে ক্রমশ। ওরা ভয় পেয়েছে বলেই অবিনাশকে গুম করার চেষ্টা করেছে আজ। ভেবেছে, এইভাবে বুঝি প্রতিরোধের শেকড়টা উপড়ে ফেলতে পারবে!

চোয়ালটা শক্ত করে অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে দিকনির্ণয় করতে লাগল অবিনাশ। হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল কতবার। কতবার গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগল, কপাল ঠুকে গেল। ব্যথা-বেদনা তেমন টের পেল না সে। বরং বেশ নির্ভার, ঝরঝরে লাগছে শরীরটা। শেষে হাতড়ে-হাতড়ে একটা জায়গায় পৌঁছে সে দেখল, দূরে যেন দু'-একটা গাড়ির আলো দ্রুত পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে। তার মানে পিচরাস্তা।

ওই রাস্তার ধার বরাবর ডানদিকে সোজা গেলেই তাদের গ্রাম।

আনন্দে একটা চিৎকার করে অবিনাশ এবড়োখেবড়ো জমির উপর দিয়ে দৌড় শুরু করল। হালকা একটা কুয়াশার চাদর নেমে আসছে তার মধ্যেই। কত রাত হল কে জানে! সাড়ে সাতটা, না কি আটটা-ন'টা? মাঠের জমায়েতটা ভেস্তে গেল না তো তার অনুপস্থিতির দরুন? অকুস্থলে পৌঁছনোর জন্যে অবিনাশ আঁকুপাঁকু করছিল। যারা অনিচ্ছুক ছিল তাদের মধ্যে কারও মন বদলাল কি? যারা আসবে বলে কথা দিয়েছিল তাদের মধ্যে যদি কেউ আবার পিছিয়ে যায়? খোকা সিংহ লোভ দেখাচ্ছে অনেককে, অবিনাশ খবর পেয়েছে।

তাকেও শেষদিকটায় টোপ দিয়েছিল খোকা সিংহ। একদম সরাসরি মোটা টাকা অফার করেছিল। বলেছিল, ঝুটঝামেলা বন্ধ করলে আরও দেবে। অবিনাশ টাকার বান্ডিলটা মুখের উপর ছুড়ে দিয়ে বলেছিল, ''আমাকে কিনতে পারবেন এত টাকা আপনি সারাজীবনেও রোজগার করতে পারবেন না সিংহজি!"

কুয়াশা চিরে দৌড়তে দৌড়তে গ্রামের রাস্তায় পৌঁছে গেল অবিনাশ। তেমন শীত করছে না, ক্লান্তিও নেই। শুধু উৎকণ্ঠা। খুব কি দেরি হয়ে গেল?

নদীর ধারে একটা উজ্জ্বল আলোর আভা দূর থেকেই দেখতে পাচ্ছিল অবিনাশ। মিটিংয়ের জন্যে হ্যাজাক আনার কথা ছিল। লক্ষ্মণ-জগদীশরা বোধহয় সেসব এনেই ফেলেছে। কিন্তু তাকে না দেখতে পেয়ে সকলেই কী ভাবছে কে জানে!

চৌমাথার মোড়ে এসে গেল সে। আর-একটা বাঁক, তারপরেই মাঠটা চোখে পড়বে। হঠাৎ ফিনফিনে কুয়াশায় সে দেখতে পেল, তার পাশের বাড়ির শেতলকাকা হাতে একটা মোমবাতি নিয়ে একটু দূরের একটা আলপথ ধরে যাচ্ছেন। অবিনাশের মনে পড়ল, কিছুতেই সই দিতে রাজি হননি শেতলকাকা। মাঠের জমায়েতেও তাঁর আসার কথা নয়। বলেছিলেন, ''বুড়ো বয়সে এসব ঝঞ্ঝাটে থাকতে চাই না বাপু!"

কিন্তু এখন তো শেতলকাকা মোমবাতি হাতে মাঠের দিকেই যাচ্ছেন মনে হচ্ছে! তবে কি মত বদলালেন শেষ পর্যন্ত? অবিনাশ গলা তুলে একটা হাঁক দিল। কিন্তু বৃদ্ধ মানুষটি ফিরে তাকালেন না। কানে কম শোনেন, জানে অবিনাশ। যাকগে, পরে দেখা যাবে, এই ভেবে সে সোজা রাস্তা ধরে দৌড়ে এগিয়ে গেল।

মাঠের কাছাকাছি পৌঁছে কিন্তু হতভম্ব হয়ে গেল অবিনাশ।

বিশাল মাঠে এক ইঞ্চি জায়গাও ফাঁকা নেই! সারি দিয়ে বসে আছে গোটা গ্রামের সমস্ত মানুষ। যারা আসতে চায়নি, তারাও বাদ নেই। এত লোক, অথচ এতটুকু আওয়াজ নেই কারও মুখে! সকলেই মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে আছে। হ্যাজাক জ্বালার দরকার পড়েনি। কারণ, প্রত্যেকের হাতে একটা করে জ্বলন্ত মোমবাতি। একদম সামনে শিশুরা, তার পিছনে মহিলারা, তারও পরে পুরুষদের সারি। শত-শত মোমের আলোয় উজ্জ্বল সরস্বতীমাঠ, কিন্তু নিস্তব্ধতায় ডুবে আছে চারপাশ।

নীরবতা পালন?

ব্যাপারটা প্রথমে মাথায় ঢুকছিল না অবিনাশের। তারপর সামনে রাখা দুটো পোস্টারে তার চোখ আটকে গেল। প্রথম পোস্টারটায় লেখা: 'শহিদ অবিনাশ অমর রহে!'

চমকে উঠে দ্বিতীয়টার দিকে তাকাল অবিনাশ। সেখানে একটা ফোটো সাঁটা, নীচে দুটো লাইন। ফোটোটা তারই। আর নীচে লেখা আছে:

'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি,
নৈনং দহতি পাবকঃ।'

গীতার শ্লোক। মানেটা জানে অবিনাশ, তার দাদুর শ্রাদ্ধের সময় শুনেছে। আত্মা... অস্ত্র যাকে ছিন্ন করতে পারে না, আগুন যাকে দগ্ধ করতে পারে না।

সঙ্গে সঙ্গে একটা মুহূর্তের কথা মনে পড়ে গেল অবিনাশের!

গাড়ির মধ্যে বসে খোকা সিংহ পিস্তলটা চেপে ধরেছে তার পাঁজরে। দাঁতে দাঁত পিষে বলছে, ''তোর বিপ্লব এখানেই শেষ করে দিই...।"

গুড়ুম করে একটা শব্দ হয়েছিল না সঙ্গে সঙ্গেই?

অবিনাশ নিজের বুকে হাত দিয়ে দেখল কোনও রক্তচিহ্ন নেই, ক্ষত নেই কোনও।

এত কাছে দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও তাকে যে কেউ দেখতে পাচ্ছে না, সেই ব্যাপারটাও এই প্রথম খেয়াল করল সে।

সব বুঝতে একটু সময় লাগল অবিনাশের, তারপর সে একটু হাসল। শ্লোকটার একটা অন্যরকম মানে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না? তাকে হয়তো মারতে পেরেছে খোকা সিংহ, কিন্তু চেতনার মৃত্যু হয়নি। অবিনাশ স্বপ্ন দেখত, একদিন গোটা গ্রাম জেগে উঠবে। আজ সেই দিন! এখন অবিনাশ আর না থাকলেও চলবে। প্রতিবাদ তার নিজস্ব ভাষা খুঁজে পেয়েছে। কোনও অস্ত্র বা আগুন আর তাকে দমাতে পারবে না।

ধীরে ধীরে মিহি কুয়াশায় মিলিয়ে গেল অবিনাশ। সামনের সারিতে কয়েকটা মোমবাতির শিখা একটু কেঁপে উঠল শুধু!

২ মার্চ ২০০৮
অলংকরণ: দেবাশিস পাল

আঁধারগ্রামের আলো

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

বহু বছর পর আজ বাসের মাথায় চড়েছে প্রবীর। বাধ্য হয়েই। স্কুল-কলেজবেলায় চড়ত। ফাঁকি দেওয়া যেত ভাড়া। যাত্রাটাও হত খোলামেলা, আরামের। তখন তাদের কষ্টের সংসার। ভাড়া বাঁচানো পয়সায় বই-খাতা কিনত। গ্রামের গরিবগুর্বো মানুষ আর জিনিসপত্র সঙ্গে থাকা ব্যাবসাদাররা এভাবেই যাতায়াত করে।

প্রবীর এদের মধ্যে কেউই নয়। গ্রামের ভাষায় সে এখন 'বাবুমানুষ'। বি এ পাশ। সরকারি চাকরি করা ছেলে। তবু বাসের মাথায় উঠতে হয়েছে সঙ্গে বড়সড় প্যাকিংবাক্স থাকার জন্যে। চাকরিটা সদ্য পেয়েছে, এক মাস হল। দু' দিনের ছুটি নিয়ে দেশের বাড়ি ফিরছে আজ। চাকরির সন্ধানে এবং বিশেষ ধরনের পড়ালেখার জন্যে গত চার-পাঁচ বছর শহরেই থাকতে হয়েছে প্রবীরকে। কদাচিৎ এসেছে গ্রামে। জীবনে দাঁড়িয়ে যাওয়া প্রবীরের এবারের দেশের বাড়ি আসাটা অনেক বেশি আনন্দের। বাসের মাথায় হু হু হাওয়ার মধ্যে সে যেন তাদের জগমোহনপুরের গন্ধ পাচ্ছে।

নীচে কন্ডাক্টর চেঁচাচ্ছে, ''কালিয়াশোল... কালিয়াশোল... এরপরই রথতলা।'' প্রবীরদের গ্রামে যাওয়ার স্টপ। প্যাকিংবাক্সটা নিজের পাশে টেনে নিয়ে নামার জন্য তৈরি হল প্রবীর।

খানিক পরেই এসে গেল রথতলা। কন্ডাক্টর বাসের পিছনে এসে বাক্সটা নামাতে সাহায্য করল। অশ্বত্থ গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা তিনটে ভ্যানরিকশার একটা এগিয়ে এল প্রবীরের কাছে। ভানুদা, চেনা রিকশাওলা। প্রবীরদের জগমোহনপুরেই বাড়ি।

বেশ দম লাগিয়ে রিকশায় বাক্সটা তুলল ভানু। বলল, ''অনেকদিন পরে এলে বাড়ি। কী নিয়ে এলে এতে?''

রিকশার পাটাতনে বসে প্রবীর মজার গলায় জানতে চাইল, ''তুমি আন্দাজ করো তো দেখি!''

রিকশার সিটে বসল ভানু। প্যাডেলে চাপ দিয়ে বলল, ''মনে তো হচ্ছে টিভি।''

প্রবীর বলল, ''টিভি চলবে কী করে, আমাদের গ্রামে কারেন্ট কই?''

লাল নুড়ি বিছানো রাস্তায় রিকশা চলছে গড়গড় করে। ভানু বলল, ''ব্যাটারিতে চলবে। নবগ্রামে দুটো বাড়িতে যেমন চলে।''

প্রবীরদের গ্রামে কারও বাড়িতেই টিভি নেই। অতি উৎসাহীরা পাশে নবগ্রামের বাড়ি দুটোয় টিভি দেখতে যায়। সে বাড়ির লোক যথেষ্ট বিরক্ত হয়, প্রবীর তা জানে। তা হলে কি নিজেদের গ্রামের জন্য একটা টিভি কিনে আনলেই ভাল হত?

এখনও পাঁচ কিলোমিটার প্রবীরদের জগমোহনপুর। বাস যায় না। হাঁটা বা রিকশাই ভরসা। এতটা পথ, তাই কথা চালিয়ে গেল প্রবীর, ''বাড়ির জন্য টিভি কিনে কী লাভ বলো ভানুদা? দেখার তো কেউ নেই!''

''তা অবিশ্যি ঠিক। তা হলে আছে কী ওতে?''

''এখন বলব না। পরে জানতে পারবে।'' বলে চুপ করে গেল প্রবীর। ভানুও আর কৌতূহল দেখাল

[illegible] টেনে চলেছে রিকশা। রাস্তার দু'ধারে ধান, সবজির খেত। কখনও বা জলা। রোদ মাথার উপর। শীতের শুরু বলে গরম তত লাগছে না।

প্রবীর বলে দিতেই পারত, বাক্সে কী আছে। কিন্তু সারপ্রাইজ দেওয়ার লোভটা সামলাতে পারল না। পরশু দিন চাকরি জীবনের প্রথম মাইনে পেয়েছে প্রবীর। চাকরিটা পুলিশের। ওরা এখন পুলিশট্রেনিং কলেজে আছে। গতকাল বন্ধুরা মিলে বাড়ির জন্য বেরিয়েছিল বাজার করতে। সকলেই বাবা-মা, ভাই-বোনের জন্য কিছু না-কিছু কিনল। প্রবীরের কাউকে কিনে দেওয়ার নেই। বাবা মারা গিয়েছেন, সে যখন কলেজে পড়ে। মা গেলেন প্রবীর চাকরিতে ঢোকার দু' মাস আগে। একটাই বোন, বিয়ে হয়ে চলে গিয়েছে দূরে, আগ্রায়। বাড়ি ফাঁকা। তবু বন্ধুদের সঙ্গে বাজারে গিয়ে প্রবীর যা কিনল, সবাই থ'।

''কী ঠিক করলে, বাড়ি-জমি রাখবে, না কি বেচে দেবে?'' রিকশা চালাতে চালাতে জিজ্ঞেস করল ভানু।

একটু অবাক হয়ে প্রবীর বলল, ''বিক্রি করব কেন? কোনও অসুবিধে তো হচ্ছে না!''

ভানু বলল, ''না, আসলে গ্রাম থেকে যারা শহরে চাকরি করতে যায়, থেকে যায় পাকাপাকিভাবে। তোমার তো আবার পুলিশের চাকরি। কাঁহা কাঁহা মুলুকে বদলি করে দেবে। তখন কি আর হুট বলতে আসতে পারবে? একটা সময় টানও কমে যাবে বাড়ির উপর। তুমি যদি বিক্রি না করো, বসত, চাষের জমি সব খাঁ খাঁ করবে।''

কথাটা খুব একটা ভুল বলেনি ভানুদা। নিজেদের বাড়ি-জমির জন্য বুকটা টনটন করে উঠল প্রবীরের। তবে একটা ব্যবস্থা সে রেখেছে। সেটাই খেয়াল করিয়ে দিল ভানুকে, ''আমাদের জমি-বাড়ি তো সহদেবদা দেখছে, আমার চিন্তা কীসের?''

''সহদেবের কথা আর বোলো না। ওর মতো বাউন্ডুলের হাতে কেউ সম্পত্তির ভার দেয়? কতক্ষণ থাকে তোমাদের ভিটেয়? সারা দিনমান ঘুরে বেড়াচ্ছে এ-গ্রাম সে-গ্রাম। ও দেখবে তোমাদের চাষাবাদ?''

ভানুদার এই কথাটাও ফেলা যায় না। সত্যিই সহদেবদা গ্রামসেবায় সদাব্যস্ত। স্কুলছুট ছাত্রদের পৌঁছে দিয়ে আসছে স্কুলে। সরকারি সাহায্য নিয়ে আসছে হাসপাতালে। ডাক্তার, শিক্ষকরা লম্বা ছুটি নিলে পৌঁছে যাচ্ছে তাদের বাড়ি। মানুষের বিপদেআপদে সবসময় পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। মা যখন মারা গেলেন, খুব চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল প্রবীর। শ্রাদ্ধের আগে একদিন সমস্যার কথা বলছিল সহদেবকে, ''আমি শহরের দিকে একটা চাকরিবাকরি পেয়েই যাব। তখন এই ভিটে-জমির কী হবে সহদেবদা?''

উত্তরে বেশ জোর দিয়ে সহদেব বলেছিল, ''কেন? আমি থাকব। আমিই দেখাশোনা করব তোদের জমি-বাড়ি। খামোকা বিক্রিটিক্রির কথা ভাবতে যাস না আবার! মনে রাখবি, এই জমির জল-হাওয়ায় তুই বড় হয়ে উঠেছিস। বাবা-মায়ের পায়ের ধুলো লেগে আছে এই মাটিতে। চাকরি যত দূরেই হোক, আসবি মাঝেমধ্যে ছুটি নিয়ে। নিজের গ্রাম, পৈতৃক ভিটেকে একেবারে ভুলে যাস না।''

প্রবীর হয়তো ভুলবে না। তাই তো প্রথম মাসের মাইনে মায়ের হাতে তুলে দিতে পারবে না জেনেও গ্রামে ফিরছে। কিন্তু বাড়ি-জমির দেখভাল সহদেবদা কতটা কী করছে, কে জানে!

ভ্যানরিকশা বোঁয়াইচণ্ডীর মোড়ে চলে এসেছে। বাঁদিকের রাস্তাটা চলে গিয়েছে সিধে প্রবীরদের পাড়ায়। মোড়ের সারের দোকান থেকে ভেসে এল নিমাই লাহার গলা, ''অ্যাই প্রবীর, গাড়িটা দাঁড় করা, কথা আছে।''

ভানু রিকশা থামাল। দোকান থেকে বেরিয়ে নিমাই লাহা হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এল। বলল, ''সহদেব গিয়েছে কালীগঞ্জে। স্বাস্থ্যশিবির না কী যেন হচ্ছে ওখানে। দোকানে বলে গেল, তুই আজ আসবি। দুপুরটা রেঁধেবেড়ে খেয়ে নিতে বলেছে তোকে। সে ফিরবে রাতে।''

''ঠিক আছে।'' মুখে বললেও প্রবীর একটু দমে

গেল। সেই কোন ভোরে পুলিশট্রেনিং কলেজ থেকে বেরিয়েছে। প্রথমে নৌকোয় চেপে নদী পেরিয়ে ট্রেন। বর্ধমানে নেমে বাসের মাথায় দু' ঘণ্টা। ভেবেছিল, বাড়িতে গিয়ে দেখবে, গরম গরম ডাল-ভাত-তরকারি করে রেখেছে সহদেবদা। কিন্তু কোথায় কী! এখন নিজেকে গিয়ে সব করতে হবে।

রিকশা ফের চলতে শুরু করল। ভানু বলল, "কী বলেছিলাম, মিলে গেল তো? সহদেবের এমনই কাণ্ড। তুমি আর লোক পেলে না?"

ভানু কত কী বলে যাচ্ছে! প্রবীরের মন চলে গিয়েছে নিজের বাড়ির মাটির দালানে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার পর ডান পাশের শালখুঁটির টঙে একটা ফোকর। সেইখানেই থাকে বাড়ির চাবি। জানে শুধু প্রবীর আর সহদেব। চাবিটা সহদেবদা যদি জায়গামতো রাখতে ভুলে গিয়ে থাকে, রাত অবধি বাইরেই বসে থাকতে হবে।

আশঙ্কা বাড়ি ঢোকার আগেই দূর হল। মাইতিদের উঠোনে আসতেই দেখা গেল, প্রবীরদের খড়ের চারচালা মাটির বাড়ি।

দেখা যাচ্ছে দরজা খোলাই আছে। তা হলে কি ফিরে এল সহদেবদা?

"নাও, মনে হচ্ছে বাবু আছেন।" বলে উঠোনে এসে দু'বার হর্ন বাজিয়ে রিকশা থামাল ভানু।

ভিতরবাড়ি থেকে কেউ কিন্তু বের হল না। ভানু, প্রবীর মিলে প্যাকিংবাক্সটা দালানে ওঠাল।

ভানু বলল, "এত ভারী কেন? কী এনেছ বললে না তো?"

ভানুকে পয়সা মিটিয়ে প্রবীর বলল, "আর একবেলা পরে সবই জানতে পারবে। এখন বলে দিলে মজাটাই মাটি!"

রিকশা ঘুরিয়ে চলে গেল ভানু। দালানে পা ঝুলিয়ে বসল প্রবীর। আড়মোড়া ভাঙল। হাঁক দিল, "কোথায় গেলে গো সহদেবদা!"

কোনও সাড়া নেই। বাড়ির লাগোয়া গাছপালা থেকে ভেসে এল পাখির কিচিরমিচির। পুকুর বা মাঠে গিয়েছে মনে হচ্ছে। দালান থেকে নেমে পুকুরের দিকে এগোল প্রবীর। পুকুরঘাটে কাউকেই দেখা গেল না। পুকুরের পাশেই প্রবীরদের খেতজমি। মাঠ ভরে আছে ফলন্ত ধানগাছে। চাষের ব্যাপারে নজর রেখেছে সহদেবদা। ভানুদা অযথাই দোষ দিচ্ছিল। মাঠে কোনও চাষের লোক দেখা যাচ্ছে না। দেখার কথাও নয়। ফসল উঠে যাওয়ার পর কাজ তেমন থাকে না। জমির দিকে তাকিয়ে ফের একবার হাঁক পাড়ল প্রবীর, "সহদেবদা! ও সহদেবদা!"

"সহদেবের ফিরতে রাত হবে।"

কানের পাশে কোনও এক মহিলার গলা। চমকে ঘাড় ফেরাল প্রবীর। না, পাশে কেউ নেই, সাদা শাড়ি পরা এক বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে আছেন দূরে, দালানের উপর। উনিই বলেছেন কথাটা। গ্রামের দিকে ফাঁকা জায়গায় এরকমই হয়। দূর থেকে ভেসে আসা কথা কানের কাছে স্পষ্ট হয়ে বাজে। মহিলাকে প্রবীর চিনতে পারল না। সেটাই স্বাভাবিক, ইদানীং দেশের বাড়ি খুব কমই আসা হয়।

উঠোনে ফিরে এল প্রবীর। বৃদ্ধার হাতে গামছা, লুঙ্গি। প্রবীরের দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, "যা, তেতেপুড়ে এয়েছিস। পুকুরে দুটো ডুব দিয়ে আয়। আমি রেঁধে রেখেছি।"

বেশ একটা শান্তি নেমে এল প্রবীরের মনে। সহদেবদা তার মানে শেষ মুহূর্তে সব ব্যবস্থাই করে রেখে গিয়েছে। কেননা, নিমাই লাহা বলছিল প্রবীরকেই দুপুরের রান্নাবাড়া করতে হবে।

বৃদ্ধা মানুষটির হাত থেকে লুঙ্গি, গামছা নেওয়ার পর প্রবীরের দৃষ্টি হোঁচট খেল দালানে, প্যাকিংবাক্সটা কোথায় গেল?

প্রবীরের চিন্তিত মুখ দেখে বৃদ্ধা বললেন, "বাক্সটা আমি ঘরে তুলে রেখেছি।"

অবাক হল প্রবীর। বলল, "সে কী! অত ভারী বাক্স আপনি ঘরে নিয়ে গেলেন কী করে?"

"আমরা গ্রামের মানুষ, এর চেয়েও ভারী জিনিস বওয়ার অভ্যেস আছে আমাদের।" বললেন বৃদ্ধা।

কথা বাড়াল না প্রবীর। ঘরে ঢুকল প্যান্ট-জামা ছাড়তে। বাক্সটা যথেষ্ট ওজনদার। একা বইতে হিমশিম খেতে হয়েছে। দালানে তোলার সময় সাহায্য নিতে হয়েছে ভানুদার। বৃদ্ধা সেটা

একা নিয়ে এলেন ভিতরে? ক্ষমতা আছে বলতে হবে! পুলিশ হিসেবে এ তো বৃদ্ধার কাছে হার হল প্রবীরের। লুঙ্গি পরে গামছা কাঁধে মাথা নিচু করে বৃদ্ধার সামনে দিয়ে দালান থেকে নেমে এল প্রবীর।

চান-টান করে এসে প্রবীর খেতে বসল। অনেক ক'টা পদ রান্না করেছেন মহিলা। রান্নার স্বাদও দারুণ। সামনে বসে থেকে খাওয়াচ্ছেন। ওঁর পরিচয়টা এখনও জানা হয়নি। জিজ্ঞেস করতে সংকোচ হচ্ছে। হয়তো নিকটাত্মীয় কেউ। কথায় কথায় ঠিকই বেরিয়ে পড়বে।

প্রবীর বলল, ''একটা বেলা আমি ভাতে-ভাত করে নিতে পারতাম। সহদেবদা কেন যে আবার আপনাকে কষ্ট দিল। তবে এত সুন্দর রান্না অনেদিন খাইনি!''

বৃদ্ধা মানুষটি বললেন, ''তুই তখন থেকে আমায় 'আপনি, আপনি' করে যাচ্ছিস কেন রে? চিনতে পারছিস না আমাকে?''

প্রবীরের মুখে অপরাধীর হাসি। বৃদ্ধা বললেন, ''আমি হচ্ছি তোর লতুমাসি। মাইলটাক দূরে ক্যানেলপাড়ে বাড়ি। যখন ছোট ছিলি, হামেশাই আসতাম তোদের বাড়িতে। তোর মায়ের সঙ্গে খুব ভাব ছিল আমার। আমার কোলে কত খেলা করেছিস তুই! মনে পড়ছে এবার?''

মোটেই পড়ছে না। তবু হাসিহাসি মুখ করে প্রবীর বলল, ''ও হ্যাঁ হ্যাঁ। মনে পড়েছে। আসলে অনেকদিন আগের কথা তো! বড় হওয়ার পর কিন্তু তোমাকে আমাদের এখানে আর দেখিনি।''

''কী করে দেখবি? উপায় ছিল না আসার।'' বিমর্ষ গলায় বললেন লতুমাসি।

কেন ছিল না, জানতে চাইল না প্রবীর। মনে হচ্ছে কোনও দুঃখের কাহিনি লুকিয়ে আছে।

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। প্রবীর এবার

কথা নিয়ে গেল অন্য প্রসঙ্গে। বলল, "দুপুরের খাওয়াদাওয়া না হয় আরাম করে হল। বিকেলের কাজের ব্যবস্থাটা সহদেবদা কী করে রেখেছে, কে জানে! যার জন্য আমার আসা।"

"সেটাও হয়ে যাবে।"

লতুমাসির কথায় খাওয়া থেকে মুখ তুলল প্রবীর। বলল, "কাজটা কী জানেন? বলে গিয়েছে সহদেবদা?"

"হ্যাঁ, সব ব্যবস্থাই সে করে গিয়েছে। বিকেলবেলা গ্রামের বিধবা বৃদ্ধারা আসবে। তখনই থান কাপড়গুলো দিয়ে দিস!"

মনে মনে আরও একবার সহদেবদাকে কৃতজ্ঞতা জানাল প্রবীর। কাজ গুছিয়ে রেখে গিয়েছে। আজ যদি শাড়িগুলো বিলি করা না যেত, ছুটি বাড়াতে হত একটা। নতুন চাকরির পক্ষে যা মোটেই ভাল কথা নয়। বড়সাহেবরা ব্যাপারটা পছন্দ করেন না।

লতুমাসি বললেন, "তোর মনটা কত বড়! চাকরির প্রথম মাইনে থেকে গ্রামের সমস্ত বিধবাকে একটা করে থান দিবি। অনেক অনেক আশীর্বাদ পাবি তাদের থেকে। তোর আগে এ গ্রামের কত ছেলেই তো ভাল ভাল চাকরি পেয়েছে। শহরে গিয়ে সুখে ঘর-সংসার করছে তারা। ভুলেই গিয়েছে গ্রামের কথা। তোর মা নেই, গ্রামে পরিবারের কেউই নেই। তবু আমাদের ভুলিসনি তুই!"

নিজের প্রশংসা সামনাসামনি শোনা বড় অস্বস্তিকর। লাজুক মুখে হাত-মুখ ধুতে উঠে গেল প্রবীর।

ঘরের চালে বসে দাঁড়কাক ডাকছে। যেন কথা বলছে প্রায়। খাওয়া-দাওয়া সেরে প্রবীর বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছে। মাথার পাশে জানলা। দেখা যাচ্ছে আদিগন্ত মাঠ, গাছ, পুকুর... সবই আছে, শুধু মানুষ নেই। বাড়ির উঠোনে আজ বিড়াল, কুকুরও দেখা গেল না। আগে যখনই এসেছে, রান্নার গন্ধে চলে এসেছে তারা। আজ যেন বড্ড নির্জন লাগছে নিজেদের ভিটেটা। একসময় এ বাড়িতেই কত হাঁকডাক। বসতটুকু বাদ দিয়েই চাষের জমি, বাবা চাষাবাদ নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত। ঘর-সংসার সামলে মা, বোন সাহায্য করতেন বাবাকে। পাড়ার লোকের যাতায়াত লেগেই থাকত। এবার যেন গোটা গ্রামটা একটু ফাঁকা ফাঁকা লাগল। সবাই কি শহরে চলে যাচ্ছে?

লতুমাসি বাড়ি ফিরে গেলেন খানিক আগে। বললেন, বিকেলে বৃদ্ধাদের নিয়ে আসবেন।

প্রবীর জিজ্ঞেস করল, "কতজন হবে মনে হয়?"

মাসি জানতে চাইলেন, "শাড়ি ক'টা এনেছিস?"

প্রবীর বলল, "দেড়শো মতো। সহদেবদা এরকম হিসেবই দিয়েছে।"

লতুমাসি বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, ওতেই হয়ে যাবে। তবে আমাকে তুই বাবা দুটো শাড়ি দিস!"

আবদারটাকে প্রশ্রয় না দিতে চেয়ে প্রবীর বলল, "দুটো শাড়ি কি তুমিই নেবে? আমি যে মাথাপিছু একটা এনেছি।"

"না রে, আমার চেনা একজন আছে, সে আসতে পারবে না।"

"কেন পারবেন না আসতে? শরীর অসুস্থ?"

"না, তার আসলে খুব লজ্জা!"

লজ্জাটা যে আসলে লতুমাসির, বুঝতে অসুবিধে হয়নি প্রবীরের। বেচারির বলতে সংকোচ হচ্ছে, 'শাড়ি দুটো আমিই পরব'। আহা, পরুন! নিজের ঘরের কাজ ছেড়ে এসে প্রবীরের জন্য সকাল থেকে রান্নাবাড়া করছেন। প্রবীরের এখন প্রধান চিন্তা বিকেলের প্রোগ্রাম নিয়ে। দেড়শোজন বৃদ্ধাকে শাড়ি দিতে হবে। লতুমাসির মতো আর কেউ যদি দুটো শাড়ি চান, অথবা দেড়শোর বেশি ক্যান্ডিডেট চলে আসেন, কী করে সামলাবে প্রবীর? সহদেবদা থাকলে এসব নিয়ে ভাবতেই হত না।

মায়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে প্রবীরের। বেঁচে থাকলে খুব খুশি হতেন। নিজের হাতে শাড়ি দিতেন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা প্রিয়জনদের। গর্বে ডগমগ করত মায়ের মুখ।

শাড়ি দেওয়ার প্ল্যানটা মাথায় আসার পরই

সহদেবকে ফোন করেছিল প্রবীর। সহদেব খুবই উৎসাহিত হয়ে বলেছিল, "দারুণ ভেবেছিস। তোর বাড়ির লোক না থাকলে কী হবে, আমাদের গ্রামের দিকে পাড়াপ্রতিবেশীরা তো একটা যৌথ পরিবারের মতোই থাকি! সেখানকার সব বিধবা বয়স্কা আমাদের আত্মীয়, গুরুজন।"

সেই গুরুজনদের মধ্যে একজন লতুমাসি। যাঁকে আজ চিনতেই পারল না প্রবীর। ব্যাপারটার জন্য প্রবীর এখনও মরমে মরে আছে।

বিকেলে লতুমাসি এসে ঘুম ভাঙালেন, "প্রবীর, এবার ওঠ রে। বেলা ফুরিয়ে এল। ওরা সব এসে পড়েছে উঠোনে।"

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল প্রবীর। ওরা কারা? বুঝতে একটু সময় লাগল। খেয়াল হল, গ্রামের বিধবা বৃদ্ধাদের কথা। জানলার বাইরে তাকাল। আলো একেবারেই নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। অনেকক্ষণ ধরে হয়তো অপেক্ষা করছেন বৃদ্ধারা।

বিছানা থেকে নেমে এল প্রবীর। পাকশাল থেকে ভেসে এল লতুমাসির গলা, "চা করছি। খেয়ে নিয়ে বিলি করতে বসিস!"

ঘরের চৌকাঠে গিয়ে দাঁড়াল প্রবীর। উঠোনে বৃদ্ধাদের ভিড় দেখে চমকে উঠল! দেড়শো ছাড়িয়ে যাবে না তো? ওঁরা ইতস্তত দাঁড়িয়ে-বসে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করছেন। অনেকদিন পর একসঙ্গে হতে পেরেছেন সকলে। শাড়ির পেটিটা ফের বারান্দায় রাখা হয়েছে। পাশে জলচৌকি, যেখানে বসবে প্রবীর। বোঝাই যাচ্ছে এসব লতুমাসির কাজ। খুবই পরিপাটি স্বভাবের মহিলা। সহদেবদা উপযুক্ত মানুষই রেখে গিয়েছে। পাঁচ-ছ'জন বৃদ্ধা উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে দেখছেন পেটিটা। দু'জন আবার পেটির গায়ে নাক ঠেকিয়ে গন্ধ শুঁকলেন। নতুন শাড়ির গন্ধ পেতে চাইছেন, ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে ওঁদের। কতদিন পর হয়তো নতুন থানকাপড়ের গন্ধ পাবেন। প্রবীরদের গ্রামটা যে বড়ই গরিব।

"এই নে, চা ধর।"

লতুমাসি এসে দাঁড়ালেন পিছনে। মাসির হাত থেকে চা নিল প্রবীর।

থানকাপড় বিলি করছে প্রবীর। সকলেই সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়িয়ে আছেন লাইনে। অনেকটা করে ঘোমটা টেনে রেখেছেন বৃদ্ধারা। গ্রামের মানুষদের সংকোচ একটু বেশি। দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করছেন প্রবীরকে। লতুমাসির জন্য প্রবীর দুটো শাড়ি আলাদা সরিয়ে রেখেছে। সব শেষে দেবে। প্রবীরকে শাড়ি বিলি করতে সাহায্য করে যাচ্ছেন মাসি। আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন বৃদ্ধাদের সঙ্গে।

একসময় শেষ হল কাপড় বিলি। কম পড়েনি। সকলেই পেয়েছেন। গোটা কাজটা সুষ্ঠুভাবে সমাধা হলেও, কোথায় যেন একটা ফাঁকা রয়ে গেল। বৃদ্ধারা চলে গিয়েছেন। উঠোন এখন ফাঁকা। শুধু একটা কাঠবিড়ালি কেমন যেন ভয় পেয়ে দৌড়োদৌড়ি করছে সেখানে। লতুমাসি আছেন এখনও।

প্রবীর জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা মাসি, আমাদের উঠোনে এরকম একটা ব্যাপার হল, গ্রামের কেউ তো দেখতে এল না?"

লতুমাসি বললেন, "তা আসবে কেন? ওদের যে হিংসে হয়েছে! আমাদের তো সকলেই হেলাফেলা করে। আজ আমাদের সুখের দিন, সহ্য হবে কেন ওদের?"

প্রবীর হেসে ফেলল। তাদের গ্রামের লোকগুলো এখনও ছেলেমানুষই রয়ে গেল। সহদেবদা কোনও উন্নতি করে উঠতে পারেনি।

লতুমাসির হাতে থানকাপড় দুটো দিয়ে প্রবীর বলল, "তোমার সেই লাজুক বৃদ্ধাকে বোলো, শাড়ি নিতে আসতে না পারলেও আশীর্বাদটা যেন দূর থেকে করেন।"

"তার আশীর্বাদ সবসময়ই তোর মাথার উপর আছে!" বলে, শাড়ি দুটো নিয়ে উঠোনে নেমে গেলেন লতুমাসি। সন্ধে হয়েই এসেছে প্রায়। একটু পরেই লতুমাসি মিলিয়ে গেলেন গাছপালা ঘেরা রাস্তার অন্ধকারে।

সন্ধে গাঢ় হতে আরও একা হয়ে গেল প্রবীর। গাছে ফিরে আসা পাখিরা চেঁচামেচি থামিয়েছে।

ভিটে ঘিরে এখন ঝিঁঝির কোরাস। পুকুরধারে, ঝোপঝাড়ে জ্বলে উঠেছে জোনাকি। লম্প জ্বালিয়ে স্কুলবেলার বইখাতা ওলটাচ্ছে প্রবীর। একসময় যখন ভাবছে, রাতের রান্নাটা চাপিয়ে দেবে কি না, তখনই বাইরে সাইকেলের ঘণ্টি। উঠোন থেকেই হাঁক পাড়ল সহদেব, ‘‘কী রে? খুব রেগে গিয়েছিস আমার উপর?’’

উত্তর না দিয়ে সহদেবের জন্য অপেক্ষা করল প্রবীর। সাইকেল দালানে তুলে ঘরে এল সে। ফের বলল, ‘‘কিছু মনে করিস না ভাই! কালীগঞ্জে আমি না গেলে স্বাস্থ্য সচেতনা ক্যাম্পটা করাই যেত না। সরকারি ডাক্তারদের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারে না গ্রামের লোক!’’

প্রবীর বলল, ‘‘না না, আমার কোনও অসুবিধে হয়নি। তুমি তো সব ব্যবস্থাই করে গিয়েছিলে।’’

সহদেব একটু থমকাল। বলল, ‘‘মানে?’’

প্রবীর বলল, ‘‘লতুমাসি থাকায় আমার কোনও সমস্যাই হয়নি।’’

‘‘কে লতুমাসি?’’ কপালে ভাঁজ ফেলে জানতে চাইল সহদেব।

প্রবীর অবাক হয়ে বলল, ‘‘সে কী! নিজে ঠিক করে গিয়েছ তাঁকে, এখন চিনতে পারছ না? দুপুরে রান্নাবান্না করে রাখলেন মাসি। বিকেলে...।’’

‘‘দাঁড়া, দাঁড়া!’’ বলে কথার মাঝে বাধা দিল সহদেব। বিছানায় এসে বসল। উদ্বিগ্ন আগ্রহে জানতে চাইল, ‘‘এবার বল তো, ঘটনাটা কী? কে এসেছিল দুপুরে?’’

বাড়ি ফেরা থেকে সন্ধে অবধি যা-যা ঘটেছে, সবিস্তার সহদেবকে জানাল প্রবীর। কখনও চোখ বড় বড়, কখনও বা চোখ ছোট, ভ্রু কুঁচকে সহদেব শুনে গেল বৃত্তান্ত। তারপর কপালে হাত রেখে বসে রইল।

প্রবীর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘‘কী হল তোমার। অমন করে বসে রইলে কেন?’’

মাথা সোজা করল সহদেব। সন্দেহের গলায় জানতে চাইল, ‘‘এই লতুমাসি কোথায় থাকেন, কিছু বলেছেন?’’

‘‘হ্যাঁ, বললেন তো ক্যানেলপাড়ে। আমার ছেলেবেলায় এ বাড়িতে নাকি আসতেন খুব।’’

নীচের ঠোঁট উলটে দৃষ্টি চালার দিকে তুলে কী যেন ভাবতে বসল সহদেব। একটু পরে আশঙ্কিত গলায় বলল, ‘‘ক্যানেলপাড়ে চার ঘর মণ্ডলদের বাস। বিমল মণ্ডলের মা লতিকা মণ্ডল বহুদিন ধরে ভুগে বছর পাঁচেক হল মারা গিয়েছেন। ঠিকই, তোর মায়ের সঙ্গে খুব ভাব ছিল তাঁর। কিন্তু তিনি কী করে আসবেন?’’

বুকটা ছমছম করে উঠল প্রবীরের। এতক্ষণে বাড়ির চারপাশের নির্জনতা, ছায়া-অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। শুকনো গলায় বলল, ‘‘এই রে, আরও যেসব বৃদ্ধা এসেছিলেন, তাঁরাও কি...?’’

সহদেব বলল, ‘‘তাই তো মনে হচ্ছে। কেননা, কালীগঞ্জের কাজটা হঠাৎ পড়ে যেতে আমি গ্রামের সব বৃদ্ধাকেই বলে রেখেছিলাম, কাল সকালে দেওয়া হবে শাড়ি। এই তো, এখন আসার সময় বেশ কয়েকজন বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করলেন, সত্যিই কাল দেওয়া হবে কি না?’’

‘‘কী হবে তা হলে? আর শাড়ি পাব কোথায়? সব তো শেষ!’’ হতাশ গলায় বলল প্রবীর।

সহদেব ঘাবড়াল না। বলল, ‘‘ও নিয়ে অত ভাবিস না। আমি ওদের বলে দেব, সামনের মাসে দেওয়া হবে। খরচা ডবল হবে তোর, এই যা! তবে আজকের ঘটনাটা পাঁচকান করিস না!’’

‘‘কেন?’’ বিষম কৌতূহল নিয়ে জানতে চাইল প্রবীর।

সহদেব বলল, ‘‘এমনিতে তো গ্রামে লোকজন থাকতে চায় না, আসতেও চায় না। তারপর এই ভূতটুতের ঘটনা কানে গেলে আরও শুনশান হয়ে যাবে জায়গাটা।’’

প্রবীর বলল, ‘‘কিন্তু এঁরা যে এ গ্রামেই আছেন, এসেও ছিলেন আমাদের উঠোনে, এটা তো সত্যি?’’

‘‘হোক সত্যি। সবকিছুর অত হিসেব ধরলে চলে না। তুই সামনের মাসে মাইনে পেলে আবার থানকাপড় নিয়ে চলে আসবি। আমি এখন উঠি, রান্নার জোগাড় করতে হবে।’’

সহদেব চলে গেল। প্রবীর জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকল। আকাশের ঢালে ফালি চাঁদ। ম্লান আলো। বাঁশঝাড়ের ভিতরে টিমটিম করে জ্বলছে জোনাকি। আচমকা আসা হাওয়ায় মাথা দোলাচ্ছে খেতভরা ধানগাছ। প্রবীরের চোখে ভেসে উঠছে দুপুরের দৃশ্য। কখনও তাঁদের অশরীরী মনে হয়নি। ঘোমটাটা একটু বেশি করে টেনে রেখেছিলেন, এই যা! তাঁদের অস্তিত্ব বোধহয় পশুপাখিরা টের পেয়ে থাকবে। দাঁড়কাকটা কি কিছু বলতে চাইছিল? কাঠবিড়ালিটা তো ভয়ে অস্থির। বিড়াল, কুকুর মাড়াল না চত্বর। শাড়িগুলো নিয়ে কোথায় গেলেন তাঁরা? লতুমাসি অত কথা বললেন, এতটুকু খোনা সুর শোনা যায়নি!

এইসব ভাবতে ভাবতেই প্রবীর দেখল, সাদা শাড়ি পরা কারা যেন পুকুর, খেত, মাঠের উপর ভেসে বেড়াচ্ছে! গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল প্রবীরের। তবে ভয়ে কাবু হয়ে পড়ল না। বুঝতে পারল, ফিরে এসেছেন তাঁরা। নতুন শাড়িটা পরে এসে প্রবীরকে দেখাচ্ছেন। সাদা প্রজাপতির ডানা মনে হচ্ছে তাঁদের। লতুমাসিও আছেন নিশ্চয়ই ওখানে। কেন জানি প্রবীরের মন বলছে, ওঁদের মধ্যে আর-একজনও আছেন, লতুমাসির বান্ধবী, প্রবীরের মা। দুপুরে ছেলের সামনে আসতে লজ্জা পেয়েছিলেন।

মায়ের কথা মনে আসতে আর-একটা ব্যাপার খেয়াল হল। প্রবীর যখন স্কুলে পড়ে, মা বলতেন, ‘‘মন দিয়ে লেখাপড়া কর। গ্রাম আলো করতে হবে তোকে!’’

সামনে ভেসে বেড়ানো সাদা শাড়িপরা বৃদ্ধাদের জন্য গ্রামটা বেশ আলোকিত মনে হচ্ছে আজ।

প্রবীর হাঁক দিল, ‘‘সহদেবদা, একটা জিনিস দেখে যাও। ও সহদেবদা!’’

সহদেব এল। জিজ্ঞেস করল, ‘‘কী জিনিস?’’

প্রবীর জানলার বাইরে আঙুল দেখিয়ে থমকে গেল। আর তো ওঁদের দেখা যাচ্ছে না! শুধুই জোনাকির আলো!

সহদেব বলল, ‘‘কী দেখাবি? ডাকলি কেন?’’

প্রবীর বুঝল, তাঁরাও চান না ভূতের ভয়ে গ্রামটা পরিত্যক্ত হয়ে যাক। তাই উধাও হয়েছেন।

ওদিকে সহদেব অধৈর্য হয়ে জানতে চাইল, ‘‘কী হল? কেন ডাকলি, বলবি তো!’’

একটু উদাস গলায় প্রবীর বলল, ‘‘দেখো, একফালি চাঁদের আলোতেও কী সুন্দর দেখাচ্ছে আমাদের গ্রামটা!’’

‘‘আমি তো রোজ দেখি। আজ তুই দেখ!’’ বলে, তড়িঘড়ি পাকশালের দিকে চলে গেল সহদেব।

২ মার্চ ২০০৮

অলংকরণ: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য
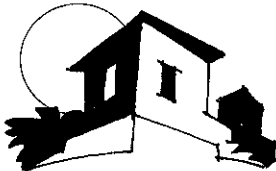
একটি পতাকার গল্প

উল্লাস মল্লিক

বিল্টুর খুব সাহস। ভূত ছাড়া আর কিছুতে ভয় পায় না। তাও রাত্তিরবেলা। তাও আবার একা থাকলে। সকাল হলেই মনে মনে খুব লজ্জা পায়। ভাবে, কাল রাতেই যা ভয় পাওয়ার লাস্ট পেয়ে গিয়েছে। আজ থেকে ঠিক সাহসী হয়ে উঠবে। দূর, ভয় পাওয়ার আছেটা কী, ভূত-টুত সব মনের ভুল।

কিন্তু রাত হলেই বিল্টুর ভিতর থেকে সাহসটা কে যেন চোঁ চোঁ করে টেনে নেয়। রাত মানে তো শুধু ঘুরঘুট্টি অন্ধকার নয়, সঙ্গে তার চেলাচামুণ্ডা, শিয়াল ডাকবে হুয়াহুয়া, নাগাড়ে ডেকে কানে তালা লাগিয়ে দেবে ঝিঁঝিপোকা, কুটুরে পেঁচা ক্যাঁচ-ক্যাঁচ, কচর-কচর শুরু করবে। কাজকর্ম ভুলে জোনাকপোকাগুলো গাছের মাথায় জ্বলবে আর নিভবে। বিল্টুর মনে হয়, চোখ পিটপিট করে কারা যেন দেখছে তাকে। বাপরে বাপ! বিল্টু ভাবে, আজকের মতো ভয় পেয়ে নিই, কাল বরং দেখা যাবে।

পলাশের খুব সাহস। এই জায়গাতেই পলাশ টেক্কা দিয়েছে ওকে। পলাশ নাকি একটা ঘরে একা শোয়, রাতে বাথরুমে গেলে কাউকে দাঁড়াতে হয় না। সেকথা বন্ধুদের কাছে মাঝে-মাঝেই বুক ফুলিয়ে চোখ ঘুরিয়ে বলে পলাশ। ক্লাস সেভেন থেকে এইটে ওঠার সময় বিল্টু ফার্স্ট হয়েছে, পলাশ সেকেন্ড। পলাশ বরাবরের ফার্স্টবয়। ধাক্কাটা ঠিক সইয়ে নিতে পারেনি পলাশ। সেদিন সকলের সামনে কী হেনস্থাই না করল! খেলার শেষে মাঠে গোল হয়ে বসে ছিল সকলেই। সন্ধে হয় হয়, একটা-দুটো তারা ফুটছে আকাশে। বিল্টুর মন ফুরফুরে। আজ প্র্যাকটিসে পলাশের টিমকে পাঁচ গোল দিয়েছে। বিল্টুর হ্যাটট্রিক। হঠাৎ পলাশ বলল, "সেদিন সেলুনে চুল কাটাতে গিয়েছি, লোকটা খুব বিল্টুর কথা বলল।"

সকলেই খুব অবাক হয়ে পলাশের দিকে তাকিয়ে। বিল্টুও।

"বিল্টু চুল কাটাতে গেলে ওকে নাকি একটা কঙ্কালের ছবি দেখায় ক্ষৌরকার। চুলগুলো খাড়া হয়ে ওঠে বিল্টুর, তখন কাটতে ভারী মজা।"

হো হো করে সকলের সে কী হাসি! বিল্টু তেড়ে গেল পলাশের দিকে। বলল, "একদম বাজে কথা! আমি এখন তন্ময়স্যারের কাছ থেকে পড়ে রাতে একা ফিরি।"

"জানি।" পলাশ বলল, "তোর কাকা সেদিন বলছিলেন, ওটুকু মাত্র পথ তুই তিন লাফে টপকে যাস। প্রচুর লংজাম্প প্র্যাকটিস হয়েছে কিন্তু, স্পোর্টসে তোর মেডেল বাঁধা।"

আবার হো হো হাসি সকলের। থমথমে মুখে বসে থাকল বিল্টু।

পলাশ বলল, "ঠিক আছে, তুই এখন একবার বুড়োবটতলা থেকে ঘুরে আয়, তা হলে মেনে নেব।"

গ্রামের শেষে বুড়োবটতলা দিনের বেলাতেই ছমছমে জায়গা। চারপাশে জনমানব নেই, ধু ধু মাঠ শুধু। তার মাঝে কতকালের পুরনো একটা বটগাছ। চারদিকে থামের মতো মোটা মোটা ঝুরি নামিয়ে মাটিতে পুঁতে দিয়েছে। সেখানে গভীর রাতে কাদের

অট্টহাসি শোনা যায়, দপদপ করে আগুন জ্বলে ওঠে মাঝে-মাঝে। হঠাৎ যেন খটাখট খটাখট শব্দ ওঠে। লোকে বলে, ''কঙ্কালের দল হাততালি দিচ্ছে।''

বিল্টুর ভিতরটা চিড়বিড় করে উঠল। এত অপমান! ভাবল, যা থাকে কপালে, যাবে সে বুড়োবটতলায়। চ্যালেঞ্জ প্রায় নিয়েও নিয়েছিল, কিন্তু ঠিক তখনই একদল শিয়াল হুক্কাহুয়া করে উঠল নন্দীদের বাঁশবাগানে। অমনই জোঁকের মুখে নুন পড়ার মতো তার সাহসটা গুটিয়ে এল এতটুকু! বলল, ''আজ একটু তাড়া আছে, তাই! অনেক জ্যামিতি বাকি, বাবা অফিস থেকে ফিরে দেখবেন।''

খিলখিল করে হাসল পলাশ।

এই পর্যন্ত হয়েছিল সেদিন। কাল পলাশ ফের খোঁচা দিল। ১৫ আগস্ট বাড়ির সামনে পতাকা তোলে বিল্টু। পলাশও তোলে তার বাড়ির সামনে। চুনসুরকি আর ফুল দিয়ে শহিদ বেদি সাজায় বিল্টু। সরকারদের বাগানে গন্ধরাজ আর স্থলপদ্ম গাছ। কিন্তু বাগানটা আবার বুড়োবটতলার কাছাকাছি। পলাশ প্রতিবার খুব ভোরে উঠে ফুল তুলে আনে। বিল্টু গিয়ে দেখল, গাছ ফাঁকা।

পলাশ বলল, ''এবার ভাবছি তোর জন্যে দুটো ফুল রেখে আসব। রোদ-টোদ উঠলে গিয়ে তুলিস। গতবার তোর বেদিটা বড্ড ন্যাড়ান্যাড়া লাগছিল।''

ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে শুয়েছিল বিল্টু। রাত সাড়ে তিনটের সময় ঘুম ভেঙে গেল। সারা বাড়ি ঘুমে নিঝুম। অ্যালার্মের শব্দে শুধু ঠাকুরমা জেগে

উঠেছেন। ঠাকুরমা ইদানীং কানে কম শোনেন। চোখ খুলে বললেন, ‘‘কে সাইকেলের ঘণ্টি দিচ্ছে বল তো?’’

বিল্টু বলল, ‘‘ও কিছু নয়, দুধ দিতে এসেছে।’’

ঠাকুরমা বললেন, ‘‘ও বাবা, এক্ষুনি সকাল হয়ে গেল! কিন্তু আজ এত ঘুম পাচ্ছে কেন বল তো?’’

বিল্টু বলল, ‘‘ঘুমোও না তুমি!’’

ঠাকুরমা বললেন, ‘‘সেই ভাল। তোর মাকে নিতে বল দুধটা। বউমাকে আধপোয়াটাক দুধ কাঁচা রেখে দিতে বলিস, নারায়ণ চান করাব।’’

ঠাকুরমা ঘুমিয়ে পড়লেন। বিল্টু চুপিচুপি নামল বিছানা থেকে। সাবধানে খিল খুলল দরজার। বাইরে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। রাতচরা একটা পাখি ডেকে উঠল ‘কোয়াক-কোয়াক’ করে। বুকের মধ্যে কে যেন ডুগডুগি বাজাচ্ছে। বিল্টু ভাবল, দরকার নেই ফুল তুলে! কিছু ফুল কিনে নেবে দোকান থেকে। কিন্তু তারপরেই পলাশের খ্যাঁকখেঁকে দেঁতো হাসিটা মনে পড়ে গেল।

পা টিপেটিপে বাইরে এল বিল্টু। গেটটা টেনে দিল বাইরে থেকে। ফের ডেকে উঠল রাতচরা পাখিটা। সামনের বাতাবি লেবু গাছে ঝুপ করে কী যেন একটা নড়ে উঠল। মাকড়সার চটচটে জাল জড়িয়ে গেল চোখেমুখে।

পেটের ভিতরটা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে। ঠাকুরকে ডাকলে হয়, কিন্তু ভূতের প্রতিষেধক কোন ঠাকুর, কিছুতেই মনে পড়ছে না। চোখ বুজে ভাবতে থাকল বিল্টু। ওমা, কাণ্ড দেখো! চোখের সামনে ভেসে উঠল নেতাজি, গাঁধীজি, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকি, বিনয়-বাদল-দীনেশ, মাতঙ্গিনী হাজরা...। শরীরটা চনমনে হয়ে উঠল বিল্টুর। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগোল সে।

কাল রাতে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। মাটি ভিজে। এখন ঝকঝকে আকাশে আধখানা চাঁদ। চাঁদের আলোয় পথ চলল বিল্টু। সরকারদের বাগানের সামনে এল। চারদিকে বাঁশের বেড়া, একটু দূরেই ঝামড়ি বুড়োবটগাছটা। দ্রুত তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল সে। আবছা আলোয় ছোট টিলার মতো দেখাচ্ছে গাছটা।

বেড়াটা টপকাতে যাবে, অমনিই হি হি হাসি। সঙ্গে চটাচট হাততালি। কালো চাদর মুড়ি দিয়ে একজন বেরিয়ে আসছে বাগান থেকে।

পায়ে একদম জোর নেই বিল্টুর। পড়েই যেত মাটিতে, কোনওরকমে বেড়ার একটা খুঁটি ধরে ফেলল। কালো চাদর দাঁড়িয়ে পড়েছে বিল্টুর সামনে। চোখ বুজে ফেলল বিল্টু।

‘‘আজও তোর লেট। হি হি!’’

ভূতটা কথা বলল। কিন্তু একদম মানুষের মতো গলা। ভূত তো চন্দ্রবিন্দু লাগিয়ে কথা বলে। এ কেমন ভূত রে বাবা! নেতাজি, গাঁধীজি, ক্ষুদিরাম, সকলে মিলেও সাহস জোগাতে পারছেন না বিল্টুকে।

‘‘তুই কি আজকাল ঘোড়ার মতো দাঁড়িয়ে ঘুমনো প্র্যাকটিস করছিস?’’

গলাটা খুব চেনা। চোখ দুটো অর্ধেক খুলল বিল্টু। চাদরটা খুলে ফেলল পলাশ। বলল, ‘‘বড্ড লেট করে ফেললি। একটা স্থলপদ্ম কুঁড়ি আছে, তবে একটু উঁচু ডালে। দেখ, যদি লাফিয়ে পাড়তে পারিস্! লংজাম্পের সঙ্গে হাইজাম্পটাও হয়ে যাবে তোর।’’

হাসতে হাসতে চলে গেল পলাশ।

বাগানে ঢুকল বিল্টু। স্থলপদ্ম গাছের কাছে এল। একটাই কুঁড়ি, একদম উপরের ডালে। বিল্টু দেখেই বুঝল ফোটার জন্যে উসখুস করছে কুঁড়িটা। সকালের আলো পেলেই পাপড়ি ছেড়ে দেবে। পলাশ নাগাল পায়নি বলে রেখে গিয়েছে।

এদিক-ওদিক তাকাল বিল্টু। ছোট একটা কঞ্চি-টঞ্চি পেলেও নামিয়ে আনতে পারত ডালটা। কিন্তু কিচ্ছু নেই কাছাকাছি।

ডাল ধরে টান দিল বিল্টু। একটু নামল কুঁড়িটা। লাফ দিল সে। এই যাঃ, ফসকে গেল! ফের চেষ্টা করল বিল্টু। হচ্ছে না কিছুতেই। আর-একটু লম্বা হলেই পেয়ে যেত কুঁড়িটা!

লাফাতে লাফাতে হাঁপিয়ে পড়ল বিল্টু। ঘাম হচ্ছে। চোখে জল এল তার। পাবে না ফুলটা? বড় করে শ্বাস নিল সে। প্রাণপণে ঝাঁকাতে থাকল

[illegible] এখনও কিছুটা। পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর ভর করে দিয়ে চেষ্টা করল। হল না এবারও?

হঠাৎ অবাক, বিল্টু দেখল, পেয়ে গিয়েছে কুঁড়িটা। কুঁড়িটাই যেন নেমে এল হাতের মধ্যে।

ভারী আশ্চর্য কাণ্ড। এতক্ষণ চেষ্টা করছিল, এবার যেন একটু সহজেই পেয়ে গেল। ছিঁড়তেও হল না।

চারদিক দেখল বিল্টু। কেউ কোথাও নেই। গাছের পাতা থেকে টুপটাপ শুধু জল পড়ার শব্দ। হালকা চাঁদের আলো আরও ছমছমে করে দিয়েছে চারপাশ। একটু বাতাস দিল। যেন জোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলল কেউ। শিরশিরিয়ে উঠল বিল্টুর ভেতরটা। বিল্টু ভাবল, দৌড় দেবে এবার।

ফিসফিস করে কে যেন বলল, ''ভয় পেয়ো না!''

চমকে উঠল বিল্টু। চারপাশ দেখল ভাল করে। নাঃ, কেউ কোথাও নেই। কিন্তু শুনল যেন কথাগুলো!

''ঠিকই শুনেছ!'' সামনের বাতাস যেন ফিসফিস করল, ''ভয় পেয়ো না, আমি তুলে দিয়েছি ফুলটা।''

বিল্টু তোতলাতে শুরু করল, ''তু-তু-আপনি কে?''

''আমি আসলে কেউ নই।''

বিল্টু বলল, ''বু-বু-উঝলাম না তো ঠিক! দে-দে-এখতে পাচ্ছি না কেন আপনাকে?''

''বেশ তো কথা হচ্ছে, দেখার দরকার কী?'' আবার ফিসফিস করল বাতাস।

''কি-কি-ইন্তু আপনি এত আস্তে কথা বলছেন কেন? ভ-ভ-অয় বেড়ে যাচ্ছে আমার।''

''আমি ক্ষতি করব না তোমার। আসলে জোরে কথা বলতে পারি না আমি।''

''কেন?'' বিল্টু জিজ্ঞেস করল।

''গলায় একটা গুলি লেগেছিল তো! মনে হয় ভোকাল কর্ডটা জখম হয়ে গিয়েছে।''

''গু-গু-উলি!'' বিল্টু আঁতকে উঠল।

''হ্যাঁ, বন্দুকের গুলি। প্রথমটা গলায় লাগল, তারপর বুকে।''

''কে গুলি চালাল?''

''পুলিশ, ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ।''

''তারপর?'' বিল্টু জিজ্ঞেস করল।

''তারপর আর কী? থানার ছাদ থেকে নীচে পড়লাম। আমার দেহ নিয়ে বিশাল মিছিল বেরিয়েছিল, সেই মিছিলেও লাঠি চালিয়েছিল পুলিশ।''

''সর্বনাশ!'' বিল্টু বলল, ''যা ভে-ভে-বেছি আপনি তাই তা হলে?''

ফের বাতাসে ফিসফিস, ''ঠিকই ভেবেছ তুমি!''

বিল্টু বলল, ''আমি, মনে হচ্ছে অজ্ঞান হয়ে যাব এবার।''

''দূর, বোকা ছেলে! অজ্ঞান হলে চলবে কেন? এখন অনেক কাজ তোমার, পলাশ কিন্তু দুয়ো দেবে।''

বিল্টু বলল, ''তা ঠিক, তা হলে ভয় পাব না বলছেন?''

''দূর, ভয় কী! তোমার মতো বয়সেই আমি দেশের কাজে নেমে পড়েছিলাম। কত লাঠি খেয়েছি পুলিশের।''

বিল্টু বলল, ''কিন্তু পুলিশ গুলি করল কেন?''

''সেটা ১৯৪২ সাল! এইরকমই আগস্ট মাস। বেশ কয়েকজন মিলে হইহই করে ঢুকে পড়লাম থানায়। থানার ছাদে ইউনিয়ন জ্যাক। জোর করে উঠে পড়লাম ছাদে। নামিয়েও এনেছিলাম ইউনিয়ান জ্যাকটা, কিন্তু আমাদের তেরঙা পতাকাটা আর তুলতে পারিনি! তার আগেই গুলি করে দিল।''

বিল্টু বলল, ''ইস, কী নিষ্ঠুর!''

''হ্যাঁ, নিষ্ঠুর তো বটেই।''

''লাগেনি আপনার?'' বিল্টু জিজ্ঞেস করল।

''না, লাগেনি। লাগবে কেন? আমি তো বন্দেমাতরম বলছিলাম। বন্দেমাতরম বললে লাগে না।''

বিল্টু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। কথা বলতে পারল না।

ফের বাতাস ফিসফিস করল, ''একটুও লাগেনি আমার, শুধু একটাই দুঃখ, পতাকাটা সেদিন

তুলতে পারিনি। আর-একটু সময় পেলেই তুলে দিতাম ঠিক।''

বিল্টুর আর ভয় করছে না একটুও। শরীরটা অদ্ভুত চনমনে লাগছে। বলল, ''আপনাদের খুব কষ্ট করতে হত?''

''কষ্ট করার জন্যেই তো ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। কষ্ট বলে মনেই হত না আমাদের। বরং কষ্ট হয় এখন।''

''কেন?'' বিল্টু একটু অবাক হল।

''এই যে চারদিকে দেশের এত লাঞ্ছনা দেখছি, দেশের কথা কেউ ভাবে না আর।''

বিল্টু বলল, ''সত্যি।''

''এত কষ্ট করে আনা স্বাধীনতা, এর মূল্যই বোঝে না কেউ আজকাল। তুমি কিন্তু খুব ভালবাসো তোমার দেশকে।''

বিল্টু বলল, ''বাসি।''

''জানি। আমি। তাই তোমার সঙ্গে দেখা করলাম। আর ভয় করছে না তো তোমার?''

বিল্টু বলল, ''না, ভীষণ আনন্দ হচ্ছে।''

''একটা কাজ করে দেবে আমার?''

বিল্টু তাড়াতাড়ি বলল, ''নিশ্চয়ই দেব, বলুন না কী কাজ?''

''সেদিন যে পতাকাটা আমি তুলতে পারিনি, সেই পতাকাটা তুলবে তুমি? খুব ভাল লাগবে আমার।''

বিল্টু বলল, ''নিশ্চয়ই তুলব। কিন্তু কোথায় পাব?''

''বাড়ি যাও। তোমার লেখার টেবিলে পেয়ে যাবে পতাকাটা।''

বিল্টু বলল, ''একটা কথা জিজ্ঞেস করব আপনাকে?''

''জানি, কী জিজ্ঞেস করবে তুমি। আমার নাম, তাই তো?''

খুব অবাক হল বিল্টু। বলল, ''কী করে জানলেন?''

''ও কিছু নয়, এমনই জেনে গেলাম। কিন্তু বলি কী, আমার নাম না-ই বা জানলে!''

''ইতিহাসে নিশ্চয়ই লেখা আছে আপনার নাম।''

''কী জানি, আছে হয়তো, আবার না-ও থাকতে পারে। ইতিহাসে তো সব লেখা থাকে না!''

বিল্টু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল।

বাতাস ফের ফিসফিস করল, ''আমরা দেশ স্বাধীন করতে চেয়েছিলাম, ইতিহাসে নাম থাকবে কি না ভাবিনি। আরও কত কত মানুষের ত্যাগ আছে, তাঁরা হয়তো জীবন দেননি, কিন্তু কেউ সন্তানকে দিয়েছেন, কেউ স্বামীকে, কেউ দাদা বা ভাইকে। এঁদের ত্যাগ কিছু কম নয় জেনো।''

বিল্টু মাথা নাড়ল, ''ঠিকই।''

''তা হলে তুলবে তো আমার পতাকাটা?''

''ঠিক তুলব।'' বিল্টু বলল।

''আর দাঁড়িয়ে থেকো না তুমি! একজন আসছে এদিকে। চলে যাও।''

একটু নড়ে উঠল স্থলপদ্ম গাছটা। হিলবিলে একটা বাতাস বয়ে গেল পাতার ভিতর দিয়ে।

সকালের আলো পেতেই ফুটে উঠেছে ফুলটা। হালকা গোলাপি রঙের কী বড় ফুল! এত বড় স্থলপদ্ম বিল্টু আগে দেখেনি কোনওদিন।

বিল্টুর হাতে পতাকাটা দেখে অবাক হয়ে গেল সকলেই। বলল, ''এটা কোথায় পেলি?''

বিল্টু হাসল। বলল, ''পেয়েছি একটা জায়গা থেকে।''

ছোট্টু বলল, ''এই পুরনো পতাকাটা তুলবি নাকি?''

বিল্টু বলল, ''হ্যাঁ।''

রাকেশ বলল, ''পলাশ দেখলাম খুব বড় একটা সিলকের পতাকা তুলছে।''

বিল্টু হাসল শুধু। দড়ির সঙ্গে বাঁধল পতাকাটা। তিন রঙের পতাকা। গেরুয়া, সাদা, সবুজ। মোটা খাদি কাপড়ের পতাকা। একটু মলিন রং। কিন্তু ভারী সুন্দর একটা গন্ধ আসছে পতাকাটি থেকে।

দড়ি ধরে টানল বিল্টু। খুব অবাক হয়ে দেখল, তাকে আর টানতে হচ্ছে না। অদৃশ্য কেউ যেন

টানছে দড়িটা, আর একটু একটু করে উঠে যাচ্ছে পতাকাটি।

বিল্টু বলল, ‘‘বন্দেমাতরম।’’

সকলেই বলল, ‘‘বন্দেমাতরম।’’

কেউ যেন ফিসফিস করে গলা মেলাল সকলের সঙ্গে। বিল্টুই শুধু শুনতে পেল।

উপরে উঠে পতপত করে উড়ছে পতাকাটি। দড়িটা পেঁচিয়ে বাঁশের গায়ে বেঁধে দিল বিল্টু।

একফোঁটা জল পড়ল বিল্টুর হাতে। উপর দিকে তাকাল সে। আকাশ পরিষ্কার, কোথাও মেঘ নেই। আর বৃষ্টির জল গরম হয় নাকি!

রোদ পড়ে মুক্তোদানার মতো চকচক করছে ফোঁটাটা। মাথায় মুছে নিল বিল্টু।

এসব কথা বলা যাবে না কাউকে। বলবেও না বিল্টু। পলাশ শুনলেই বলবে, ‘‘বাজে কথা, গুল দিচ্ছিস!’’

২ মার্চ ২০০৮

অলংকরণ: কুণাল বর্মন

ধূর্জটিবাবুর প্ল্যানচেট

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

পলাশ বলল, ''ধীরে নিলু, পরপর চারটে ট্রেন চলে গেল। অনির্বাণ তো এখনও এল না? এদিকে তোর ধূর্জটিবাবুরও কোনও পাত্তা নেই! তিনি আবার বাঘমুণ্ডি পাহাড়ে পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসতে চলে গেলেন না তো?''

নিলু বলল, ''দেখ পলাশ, সিদ্ধপুরুষদের নিয়ে মজা করবি না। বাঘমুণ্ডি নয়, উনি অমাবস্যা রাতে তারাপীঠের মহাশ্মশানে পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে শবসাধনা করেছিলেন। উনি যখন কথা দিয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই আমাদের নিতে আসবেন। তুই মোবাইলে আর-একবার ট্রাই কর অনির্বাণকে। ও আবার ঘাবড়ে গেল না তো? শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ে বসে প্ল্যানচেট-ভূত-প্রেত নিয়ে মজা করা, আর এখানে এসে সত্যিকারের প্রেতসিদ্ধ জ্যোতিষীর মুখোমুখি প্ল্যানচেটে বসা, এ দুইয়ের মধ্যে অনেক তফাত!''

নিলুর খোঁচাটা বুঝতে অসুবিধে হল না পলাশের। ও বলল, ''ঝড়বৃষ্টির মধ্যে হয়তো কোথাও ও আটকে গিয়েছে। ওর কথার দাম আছে। আর ও যে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী ছেলে, তা তো তুই জানিস।'' এই বলে সে পকেট থেকে মোবাইল বের করে বৃষ্টির ছাঁট থেকে বাঁচার জন্য প্ল্যাটফর্মের শেডের আর একটু ভিতরে এসে দাঁড়াল। অনির্বাণকে রিং করার চেষ্টা করে কানে দিয়ে কয়েক মুহূর্ত পর সেটা আবার কান থেকে নামিয়ে নিল পলাশ।

নিলু প্রশ্ন করল, ''কী হল?''

পলাশ জবাব দিল, ''নেটওয়ার্ক ফেলিয়োর এখনও। যা ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে, কখন নেটওয়ার্ক পাওয়া যাবে কে জানে?''

তার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কড়াৎ-কড়াৎ শব্দে কাছেই কোথাও যেন বাজ পড়ল। সারা প্ল্যাটফর্ম কেঁপে উঠল সেই শব্দে। আর কিছুক্ষণ পরই সন্ধে নামবে। বৃষ্টির বিরামও নেই। ঝাপসা হয়ে যাওয়া বাইরের দিকে তাকিয়ে পলাশ বলল, ''ধূর্জটিবাবুর বাড়ি এখান থেকে কত দূর?''

নিলু জবাব দিল, ''গাড়িতে আধ ঘণ্টার পথ। উনি গাড়ি নিয়ে আসবেন বলেছেন।'' এরপর সে বলল, ''অনির্বাণ না এলে প্রেস্টিজ পাংচার হয়ে যাবে আমার। আসলে উত্তেজনার বশে তোদের কথাটা ওঁকে আমার বলা উচিত হয়নি। ব্যাপারটা উনিও সিরিয়াসলি নিয়েছেন। এখন তো আমাদের ফিরে যাওয়ারও উপায় নেই। ওঁর বাড়িতে রাতে খাবারের ব্যবস্থা করে রেখেছেন উনি। এখানে এসে ফিরে যাওয়া মানে ওঁকে অসম্মান করা। তা ছাড়া উনি বড়মামার বন্ধুমানুষ। বড়মামা শুনলেও রাগ করবেন।''

পলাশ তার কথার জবাবে কিছু বলল না। একটু দূরে প্ল্যাটফর্মের মধ্যে একটা চায়ের দোকান দেখিয়ে বলল, ''চল, ওখানে একটু চা খাই। বেশ ঠান্ডা লাগছে।''

ওরা দু'জন এরপর গিয়ে হাজির হল চায়ের দোকানের সামনে। দোকানদারকে চা দিতে বলে পলাশ বাইরের বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, অনির্বাণ এল না কেন? কলকাতা থেকে বৃষ্টির দিনে

তাদের এই নবাবগঞ্জে আসা বলতে গেলে তো তার জন্যই!

পলাশদের নবাবগঞ্জে আসার কারণটা একটু খুলে বলা যাক, পলাশ, নীলকান্ত অর্থাৎ নিলু, অনির্বাণ এরা সকলেই শ্যামবাজারের বাসিন্দা। এবং কাছেই গণেন্দ্র মিত্র লেনের 'যুগের পথিক' ক্লাবের সদস্য। প্রত্যেকেই ওরা কলেজছাত্র অথবা সদ্য পাশ করে বেরিয়েছে কলেজ থেকে। শরীরচর্চা, খেলাধুলো, লেখাপড়ার পাশাপাশি নিয়মিত তাদের আড্ডার আসর বসে গণেন্দ্র মিত্র লেনের ঘুপচি ক্লাবঘরে। দিন দশেক আগে এমনই এক বর্ষার সন্ধেয় ক্লাবঘরে বসে গল্প করছিল তারা। শুধু তিনজন নয়, ঋজু, অসীম, তপন, ভোলা, আরও অনেকে সেদিন হাজির ছিল সেখানে। এসব আড্ডা যেমন হয়, এক প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হতে হতে অন্য প্রসঙ্গ চলে আসে, ঠিক তেমনই কী একটা কথা আলোচনা করতে করতে হঠাৎ কে যেন তুলে বসল 'আত্মা' নিয়ে কথা। শুরু হল আত্মা-প্রেতাত্মা আছে কি না তাই নিয়ে সনাতনী তর্ক।

নিলুর আত্মা-টাত্মার ব্যাপারে প্রচণ্ড বিশ্বাস। সে হঠাৎ বলল, ''আমার বড়মামার বন্ধু জ্যোতিষী ধূর্জটি চক্রবর্তী, যাঁর কাছে আমি হাত দেখাই, তিনি প্ল্যানচেটে আত্মা নামাতে পারেন। আমার বড়মামা এ ঘটনা নিজের চোখে দেখেছেন।''

অনির্বাণ প্রেসিডেন্সির ফিজিক্সের ছাত্র, ঘোর যুক্তিবাদী। নিলুর কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সে চেপে ধরল তাকে। বলল, ''যখন সুনীতা উইলিয়াম মহাশূন্যে পায়চারি করে এলেন, সে সময়ে দাঁড়িয়ে কেউ আত্মা নামাচ্ছেন, এ কথা বিশ্বাস করতে হবে? আসলে এসব ব্যাপার হল ধান্দাবাজ লোকদের লোক ঠকিয়ে পয়সা কামানোর কৌশল।''

ব্যস, শুরু হয়ে গেল জোর তর্ক। যারা হাজির ছিল, তারা ভাগ হয়ে গেল প্ল্যানচেটের মাধ্যমে আত্মা নামানো যায় কি না এই নিয়ে। পলাশেরও আত্মা-টাত্মায় বিশ্বাস নেই। স্বাভাবিকভাবে সেও সেদিন অনির্বাণের পক্ষ নিয়েছিল। অনেক যুক্তি, পালটা যুক্তির পরও যখন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো গেল না, তখন ভোলা একটা প্রস্তাব দিল। সে বলল, ''নিলু গিয়ে ধূর্জটিবাবুকে রাজি করাক প্ল্যানচেটে আত্মা নামিয়ে দেখানোর জন্য। তিনি যদি সত্যিই তা পারেন, তা হলে সকলেই ব্যাপারটা মেনে নেবে। তবে এর মধ্যে একটা কন্ডিশন আছে। প্ল্যানচেটে 'মিডিয়াম' অর্থাৎ যার মাধ্যমে আত্মা নামানো হয়, সেই মিডিয়াম করতে হবে অনির্বাণকে। তা হলেই প্রমাণ হয়ে যাবে আত্মা নামানোর ব্যাপারটা সাজানো কি না!''

সেদিনের এই আলোচনা অন্যদিনের মতো শুধু আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। অনির্বাণ আর নিলু দু'জনেই সিরিয়াসলি নিয়েছিল বিষয়টা। পরদিনই নিলু তার বড়মামাকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হয়েছিল ধূর্জটিবাবুর বউবাজারের সোনার দোকানের হাত দেখার চেম্বারে। সব কথা শোনার পর প্ল্যানচেটের ব্যাপারে রাজি হয়ে গেলেন ধূর্জটিবাবু। তবে তিনি বললেন, নিলু, অনির্বাণ ও আর-একজন অর্থাৎ মোট তিনজনকে আজ এই আষাঢ় মাসের অমাবস্যার দিন তাঁর নবাবগঞ্জের বাড়িতে আসতে হবে। তাঁর বাড়িতে অন্য কেউ থাকে না। ফলে উভয় পক্ষের কোনও অসুবিধে হবে না। সেখানে রাত্রিবাস করে পরদিন কলকাতা ফিরতে পারবে নিলুরা। তাঁর আমন্ত্রণেই পলাশ আর নিলু বিকেলের ট্রেনে নবাবগঞ্জ প্ল্যাটফর্মে এসে নামল। কিন্তু কলকাতায় একটা কাজ সেরে অন্য ট্রেনে অনির্বাণের এখানে আসার কথা থাকলেও তার দেখা নেই। বৃষ্টির মধ্যে প্ল্যাটফর্মে অনির্বাণের জন্য এক ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছে পলাশরা। ধূর্জটিবাবুও তাদের এখনও নিতে আসেননি।

চা খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর পলাশ একবার তার রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে বলল, ''ছ'টা তো বাজল। আর আধ ঘণ্টার মধ্যে যদি দু'জনের কেউ না আসেন, তা হলে ডাউন ট্রেন ধরে ব্যাক করব। আমরা দু'জন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি। আমাদের কেউ দোষ দিতে পারবে না।''

পলাশের কথা শুনে একটু চিন্তা করে নিলু বলল, ''ঠিক আছে, তা হলে তাই হবে।''

কথাটা বলল বটে, কিন্তু ঠিক সেই সময় একটা কালো রঙের অ্যাম্বাসাডর গাড়ি এসে প্ল্যাটফর্মের বাইরে রেলিঙের ধার ঘেঁষে দাঁড়াল।

গাড়িটা দেখেই নিলু বলে উঠল, "ওই যে, ধূর্জটিবাবু এসে গিয়েছেন। ওটা ওঁর গাড়ি, আমি চিনি।"

গাড়ি থেকে বৃষ্টির মধ্যে বাইরে নেমে ছাতা খুললেন ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা এক লম্বা-চওড়া ভদ্রলোক। তিনি উঠে এলেন প্ল্যাটফর্মে। তাঁকে দেখে প্রথমে নিলু আর তার পিছন পিছন পলাশ এগিয়ে গেল তাঁর দিকে। ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন শেডের নীচে। নিলুরাও এসে দাঁড়াল তাঁর সামনে।

ভদ্রলোকের বয়স মনে হয় ষাটের কাছাকাছি হবে। ফরসা রং, টিকলো নাক, দু' হাতে একটি আংটি। পলাশ আর নিলুকে একবার ভাল করে দেখে নিয়ে তিনি নিলুর উদ্দেশে বললেন, "আমি কলকাতা থেকে ফিরছি, তাই আসতে দেরি হয়ে গেল। তা তোমরা দু'জন কেন? আমি তো তিনজনকে আসতে বলেছিলাম। আর এই কি সেই ছেলে, যে মিডিয়াম হতে চায়?" গম্ভীর স্বরে এই কথাগুলো বলে ধূর্জটিবাবু তাকালেন পলাশের দিকে।

নিলু বলল, "না না, এ সে নয়। এর নাম পলাশ। আমরা দু'জন একসঙ্গে এসেছি। অনির্বাণের অন্য ট্রেনে এসে এই প্ল্যাটফর্মে আমাদের সঙ্গে মিট করার কথা। কিন্তু এক ঘণ্টা ধরে ওর জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। ও এখনও এল না। মোবাইল কানেকশনও কাজ করছে না।"

তার কথা শুনে ভদ্রলোক কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, "তোমরা দু'জনই বরং আমার সঙ্গে চলো। আমি হিউম্যান সাইকোলজি বুঝি। সম্ভবত সে ভয় পেয়েছে। সে আসবে না। মেঘ যত গর্জায় তত বর্ষায় না। সন্ধে নেমে আসছে। জল-কাদায় বেশ কিছুটা পথ যেতে হবে আমাদের। তার উপর আমার গাড়ির একটা হেডলাইট আবার ভেঙে গিয়েছে আজ।" এই বলে তিনি তাকিয়ে রইলেন নিলুদের দিকে।

নিলু বলতে যাচ্ছিল, "কিন্তু অনির্বাণ যদি পরের ট্রেনে এখানে এসে পৌঁছয় তখন কী হবে?" কিন্তু তার আগেই প্ল্যাটফর্মের মাইকে ঘোষণা শোনা গেল, "বিশেষ ঘোষণা! ঝড়বৃষ্টিতে কুতুবপুর স্টেশনে গাছ পড়ে ওভারহেড তার ছিঁড়ে যাওয়ায় আপ লাইনে রাত দশটা পর্যন্ত কোনও ট্রেন চলবে না। যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে এই সংবাদ জানানো হচ্ছে।"

ঘোষণাটা শুনে ধূর্জটিবাবু বললেন, "এরপর তার আসার আর কোনও সম্ভাবনা নেই। আর যদি সে কোনওভাবে এখানে এসে হাজির হয়, আর যদি তার আমার বাড়ি যাওয়ার সত্যি ইচ্ছে হয়, তা হলে যে-কোনও ভ্যানরিকশাকে বললেই সে আমার বাড়ি নিয়ে যাবে।" এ কথাগুলো বলে তিনি পলাশদের উত্তরের অপেক্ষা না করে, "এসো" বলে হাঁটতে শুরু করলেন তাঁর গাড়িতে যাওয়ার জন্য।

পলাশ আর নিলু একবার পরস্পরের দিকে তাকিয়ে অগত্যা ধূর্জটিবাবুকে অনুসরণ করল। গাড়িতে উঠে ধূর্জটিবাবু চালকের আসনে বসলেন। পলাশরা বসল তাঁর পিছনের আসনে। গাড়িতে ওঠার সময় প্রায় ভিজে গেল পলাশরা। গাড়ি স্টার্ট নেওয়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই যেন ঝুপ করে অন্ধকার নামল বাইরে। একটা হেড্‌লাইটের আলোয় খানাখন্দে ভরা মেঠোপথ দিয়ে বর্ষার অন্ধকারে ধূর্জটিবাবুর গাড়ি ছুটল তাঁর বাড়ির দিকে।

মিনিট কুড়ি পর ধূর্জটিবাবুর বাড়ির সামনে এসে পৌঁছল পলাশরা। একটা মাঠের ঠিক মাঝখানে একলা ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে পুরনো ধাঁচের দোতলা বাড়িটা। কোনও আলো আসছে না বাড়ির ভিতর থেকে। গাড়িতে আসার সময় একটিও কথা বলেননি ধূর্জটিবাবু। পলাশের মনে হল, হয় তিনি গভীরভাবে কিছু ভাবছেন, নয় স্বভাবজাত ভাবেই তিনি গম্ভীর মানুষ। গাড়ি থেকে নামার সময় তিনি শুধু বললেন, "এখানে এখনও ইলেকট্রিসিটি নেই। তবে একটা রাত, তোমাদের আশা করি তেমন অসুবিধে হবে না।"

পলাশরা গাড়ি থেকে নামতেই ঘাসজমিতে জমে

থাকা জলে তাদের পায়ের পাতা ডুবে গেল। বৃষ্টি একটু ধরেছে ঠিকই, তবে বাতাস এখনও বইছে। মাঠের চারপাশ থেকে ভেসে আসছে ব্যাঙের ডাক। জলের মধ্যে ছপছপ শব্দে পা ফেলে পলাশরা তাঁর পিছন-পিছন উঠে এল বাড়ির বারান্দায়। পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা ছোট টর্চ বের করে সেটা জ্বালিয়ে চাবি দিয়ে একটা ঘরের দরজা খুললেন তিনি। তারপর ঘরের ভিতর ঢুকে একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে তাদের দু'জনকে সে ঘরে বসতে বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। ঘরটা পুরনো হলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একটা পুরনো আমলের পালঙ্ক রাখা আছে ঘরটায়। বিছানার উপর বসে নিলু বলল, "সম্ভবত এই ঘরেই আমাদের আজ রাত কাটাতে হবে।"

পলাশ কোনও জবাব দিল না। সে ভাবতে লাগল, অনির্বাণ এল না কেন? সত্যি কি সে ভয় পেয়ে গেল?

মিনিট তিনেকের মধ্যেই একটা পাথরের থালায় সাজানো মিষ্টি আর জল নিয়ে ঘরে ঢুকলেন

ধূর্জটিবাবু। থালা আর জলের পাত্র তিনি পালঙ্কের পাশে একটা টেবিলের উপর রেখে পলাশদের উদ্দেশে বললেন, "তোমরা এগুলো খেয়ে নাও। আমি ততক্ষণ সান্ধ্য-আহ্নিক সেরে আসি।" এই বলে তিনি ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে গেলেন।

পাথরের থালায় বেশ বড় বড় অনেক মিষ্টি। সেই দুপুরবেলা খেয়ে বেরিয়েছে পলাশরা। মিষ্টিগুলো দেখে তাদের খিদে পেয়ে গেল। তারা খেতে শুরু করল।

সান্ধ্য-আহ্নিক সেরে এরপর যখন ধূর্জটিবাবু আবার পলাশদের ঘরে এলেন, তখন তাদের খাওয়া শেষ। তিনি পলাশদের উদ্দেশে বললেন, "চলো, এবার অন্য ঘরে গিয়ে বসে কথা বলি।"

তাঁর পিছন পিছন তারা সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে হাজির হল বাড়ির এক প্রান্তে, একটা ঘরে। সেই ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা কাঠের তেপায়া টেবিলের উপর একটা ছোট মোমবাতি জ্বলছে। আর সেই টেবিলের চারদিকে সাজানো আছে চারটে কাঠের চেয়ার। এ ছাড়া অন্য কোনও আসবাব নেই সেই ঘরে। ঘরটায় আরও একটা দরজা আছে। ঘরে ঢুকে সেই দরজাটাও খুলে দিলেন ধূর্জটিবাবু। বাড়ির পিছন দিকের মাঠ থেকে একঝলক ভেজা বাতাস এসে ঢুকল সেই ঘরের ভিতর। দরজা খোলার পর ঘরের মাঝখানে টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে বসলেন ধূর্জটিবাবু। তাঁর কথামতো সেখানে অন্য দুটো চেয়ারে পাশাপাশি বসল পলাশ আর নিলু। চেয়ারে বসার পর একবার তাদের দিকে ভাল করে দেখলেন ধূর্জটিবাবু। পলাশের মনে হল তিনি যেন তাদের জরিপ করে নিলেন। এরপর তিনি ফাঁকা চেয়ারটা দেখিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, "একটা চেয়ার তোমাদের সেই বন্ধুর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু সে তো এলই না। চারজন না হলে প্ল্যানচেটে বসা যাবে না। আমি ভেবেছিলাম তোমাদের কথার দাম আছে। তাই তোমাদের এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। এখন বুঝলাম...।"

তাঁকে কথা শেষ করতে না দিয়ে প্রসঙ্গটা এড়াবার জন্য নিলু বলল, "প্ল্যানচেটে বসা না গেলেও আপনার মতো সিদ্ধপুরুষের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু জানার আছে। আচ্ছা, পঞ্চমুণ্ডির আসনে কীভাবে শবসাধনা করা হয় তা একটু শোনাবেন? আমার খুব জানার ইচ্ছে।"

তার কথা শুনে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর গম্ভীর কণ্ঠে ধূর্জটিবাবু বললেন, "তা হলে এসব কথাই বলি শোনো। তোমরা যে সাধনার কথা শুনতে চাইলে, তা অতি কঠিন সাধনা। লাখে একজন তন্ত্রসাধকের এই সাহস হয়। অনেকের মৃত্যুও হয়েছে এই সাধনা করতে গিয়ে। প্রথমে সংগ্রহ করে আনতে হয় কোনও লাশ। মহাশ্মশানে অমাবস্যার রাতে সেই লাশের উপর পঞ্চমুণ্ডির আসন পেতে বসতে হয়। সঙ্গে রাখতে হয় মাটির ভাঁড়ে চালভাজা আর নরকরোটিতে সুরা। মন্ত্রোচ্চারণে প্রেতাত্মা এসে প্রবেশ করে সেই শরীরে। জীবন্ত হয়ে ওঠে লাশ। বীভৎস চিৎকার করে মাঝে মাঝে সে বলে ওঠে, 'দে, দে, আমার বড় খিদে পেয়েছে।' তখন একমুঠো চালভাজা আর সুরা তার মুখে ঢেলে দিয়ে শান্ত করতে হয় তাকে। এ সময় কেউ ভয় পেয়ে গেলে তার নির্ঘাত মৃত্যু! লাশের উপর পাতা আসনে শক্ত হয়ে বসে চামুণ্ডা মন্ত্র জপ করতে হয়। সে মন্ত্রও অত্যন্ত কঠিন। মন্ত্রের জোরে বশে থাকে প্রেতাত্মা। মন্ত্রে সামান্য ভুলচুক হলে যে বুকের উপর বসে থাকে, তাকে ছিটকে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াবে সেই লাশ। তারপর...।" এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ চুপ করে গেলেন ধূর্জটিবাবু।

পলাশরা ডুবে গিয়েছিল তাঁর গল্পের মধ্যে। তিনি থামতেই নিলু উত্তেজনা চাপতে না পেরে বলে উঠল, "তারপর? তারপর?"

তার কথার কোনও জবাব না দিয়ে পিছন দিকের খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন, "বাইরে থেকে একটা শব্দ আসছে না?"

তাঁর কথা শুনে কান খাড়া করল পলাশরা। হ্যাঁ, একটা শব্দ! দরজা দিয়ে বাইরে অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু মনে হচ্ছে, কে যেন মাঠের জমা জলে ছপছপ শব্দে পা ফেলে বাড়িটার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। বলতে গেলে সে যেন আসছে

পলাশেরা যে ঘরে বসে আছে সেই ঘর লক্ষ করেই। সকলেই তাকিয়ে রইলেন দরজার দিকে। দরজার একদম কাছে এসে থেমে গেল শব্দটা। কয়েক মুহূর্ত কোনও সাড়াশব্দ নেই। তারপরই দরজার বাইরে অন্ধকার থেকে ফুটে উঠল একটা মানুষের অবয়ব। ঘরের ভিতর উঁকি মারল একটা মাথা। তা দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ধূর্জটিবাবু বলে উঠলেন, ''কে! কে তুমি?''

আর তারপরেই আগন্তুককে চিনতে পেরে নিলু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে উল্লাসে ধূর্জটিবাবুর উদ্দেশে বলল, ''ও হল আমাদের সেই বন্ধু, যার আসার কথা ছিল!''

ধূর্জটিবাবু যেন একটু অবাক হয়ে গেলেন। অবশ্য পলাশ আর নিলুও অবাক হয়ে গিয়েছে। সে যে এভাবে এখন হাজির হবে, তারা কেউ আশা করেনি। ধূর্জটিবাবু তার উদ্দেশে বললেন, ''এসো, ভিতরে এসো।''

ঘরের ভিতরে পা রাখল অনির্বাণ। সে একদম কাকভেজা। জল চুঁইয়ে পড়ছে মাথা থেকে। ঘরে ঢুকে একটু হেসে সে বলল, ''আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। অনেক কষ্ট করে আসতে হল তো!''

পলাশ বলল, ''আমরা তো ভেবেছিলাম তুই আর এলিই না। অনেকক্ষণ আমরা প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করেছি তোর জন্য।''

অনির্বাণ পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে মাথা মুছতে মুছতে বলল, ''আমি যখন আসব বলেছি, তখন আসবই। তাই তো এত কষ্ট করেও...।''

ধূর্জটিবাবু এবার তার উদ্দেশে বললেন, ''দাঁড়িয়ে কেন? চেয়ারে বসো!''

মাথা মুছে অনির্বাণ এসে বসল পলাশের পাশের চেয়ারটায়। এত ভিজেছে যে, মোমের আলোয় তার মুখ যেন রক্তশূন্য বলে মনে হচ্ছে। সে বসার পর ধূর্জটিবাবু তার দিকে তাকিয়ে বললেন, ''তুমিই কি মিডিয়াম হতে চেয়েছিলে? তোমার নাম কী?''

অনির্বাণ প্রথমে ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ। তারপর বলল, ''আমার নাম তাতাই।''

[illegible] কেন, তা বুঝতে পারল না পলাশ। তার নাম শোনার পর ধূর্জটিবাবু বললেন, ''তুমি কি জানো, যে মিডিয়াম হয়, অনেক সময় কোনও শয়তান আত্মা মিডিয়ামকে ছেড়ে যাওয়ার সময় তার ক্ষতি করে দিয়ে যায়?''

অনির্বাণ তাঁর কথার উত্তরে বলল, ''ক্ষতি করে মানুষেরা, আত্মা নয়। কোনও আত্মা আমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।''

ধূর্জটিবাবুর দিকে তাকিয়ে একটু যেন রুক্ষ স্বরেই কথাগুলো বলল অনির্বাণ।

তার কথা শুনে ধূর্জটিবাবু কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে গম্ভীর স্বরে বললেন, ''বাঃ, তোমার সাহস আছে দেখছি! তবে বেশি সাহস ভাল নয়!''

অনির্বাণ তাঁর কথার কোনও জবাব দিল না।

ধূর্জটিবাবু এরপর নিলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, ''তোমাদের বন্ধু যখন এসেই পড়েছে, তখন আর পঞ্চমুণ্ডির আসনের গল্প বলে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। তোমাদের অবিশ্বাসী বন্ধু নিশ্চয়ই ভিতরে ভিতরে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে প্ল্যানচেটে বসার জন্য। বৃষ্টির মধ্যে এতটা পথ ভিজে এসেছে মিডিয়াম হবে বলে!'' এই বলে তিনি যেন মৃদু কটাক্ষ করলেন অনির্বাণকে।

অনির্বাণ তাঁর কথা শুনে বলল, ''হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমাকে আবার ফিরে যেতে হবে।''

এ কথা শুনে পলাশ বলল, ''সে কী রে? তুই আবার এই বৃষ্টিতে ফিরে যাবি?''

অনির্বাণ একটু বিষণ্ণভাবে পলাশকে বলল, ''না রে, আমার এখানে রাতে থাকা হবে না! অনেক লোকজন এসেছে বাড়িতে। আমাকে ফিরতেই হবে!''

ধূর্জটিবাবু বললেন, ''ঠিক আছে, তা হলে বরং শুরু করা যাক। দরজা দুটো বন্ধ করে দিতে হবে তা হলে! তবে প্ল্যানচেটে বসার আগে একটা কথা তোমাদের বলে দিই। কারও হার্ট দুর্বল থাকলে কিন্তু প্ল্যানচেটে না বসাই ভাল। দুর্ঘটনা ঘটলে আমাকে কিন্তু কেউ দোষ দিয়ো না।''

তাঁর কথা শেষ হতেই অনিলাভ একটা বাঁকা হাসি হেসে বলল, ''আমাদের সকলেরই হার্ট ঠিক আছে। আপনার হার্ট ঠিক আছে তো? আপনি নিজে ভয় পাচ্ছেন না তো?''

তার কথা শোনামাত্রই হঠাৎ যেন দপ করে জ্বলে উঠল ধূর্জটিবাবুর চোখ দুটো। তিনি কী যেন বলতে গিয়েও নিজেকে সংবরণ করে নিলেন। মৃদু হেসে শুধু তিনি বললেন, ''যে পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে শবসাধনা করে, সে কোনও প্রেতাত্মাকে ভয় পায় না।''

নিলু উঠে গিয়ে দরজা দুটো বন্ধ করে এল। টেবিলের একদম কাছে চেয়ারগুলো আরও এগিয়ে নিয়ে বসল সকলেই। মোমটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তার মৃদু আলোয় চেয়ারে বসে থাকা পলাশদের ছায়াগুলো কাঁপছে। চারপাশে কোনও শব্দ নেই। সকলে ঠিকভাবে বসার পর কয়েক মুহূর্ত অনির্বাণের দিকে তাকিয়ে ধূর্জটিবাবু বললেন, ''তোমরা আমার মতো এইভাবে দু' হাতের আঙুলগুলোকে টেবিলের উপর আলতো করে ছুঁইয়ে রাখো। আমি আলো নেভাবার পর কেউ কোনও কথা বলবে না। শুধু একমনে চিন্তা করবে পরিচিত কোনও মৃত ব্যক্তির কথা।''

পলাশরা তাঁর দেখাদেখি টেবিলের উপর আঙুল রাখল। আঙুল রাখতে গিয়ে পলাশের আঙুল মুহূর্তের জন্য ছুঁয়ে গেল তার পাশে বসা অনির্বাণের হাতের পাতা। পলাশের মনে হল, বৃষ্টিতে ভিজে অনির্বাণের হাত যেন বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে!

ধূর্জটিবাবু সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে এক ফুঁয়ে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিলেন। সারা ঘরে নেমে এল জমাটবাঁধা অন্ধকার। সকলেই এক মনে চিন্তা করতে লাগল পরিচিত কোনও মৃত মানুষের কথা।

নিস্তব্ধ অন্ধকার ঘর। মিনিট পাঁচেক পর পলাশের মনে হল, টেবিলটা যেন থরথর করে একবার কেঁপে উঠল। আর তারপরই শোনা গেল ধূর্জটিবাবুর গম্ভীর অথচ চাপা কণ্ঠস্বর, ''আপনি কি এসেছেন? এসে থাকলে টেবিলে একবার শব্দ করুন।''

টেবিলটা আবার একবার কেঁপে উঠল। তারপর একটা পায়ায় শব্দ শোনা গেল, ''ঠক!''

পলাশের একটু ভয় করল এবার। ধূর্জটিবাবুর গলা শোনা গেল, ''তা হলে আপনি এসেছেন! আপনার নাম কী?''

পলাশের পাশে বসে থাকা অনির্বাণের গলায় প্রথমে একটা ঘড়ঘড় শব্দ শুরু হল, তারপর একটা অস্পষ্ট স্বর শোনা গেল, ''আমার... নাম... 'অ'...।''

নামটা স্পষ্ট শোনা গেল না শেষ পর্যন্ত। ''আপনার ঠিকানা কী?'' এরপর প্রশ্ন করলেন ধূর্জটিবাবু।

আবার সেই ঘড়ঘড় শব্দ শোনা গেল অনির্বাণের গলা থেকে। তারপর একটা ভাঙা-ভাঙা স্বরে সে ধীরে ধীরে বলল, ''সাতাত্তর, গণেন্দ্র মিত্র লেন, শ্যামবাজার, কলকাতা...।''

ঠিকানাটা শুনেই প্রথমে একটু চমকে উঠল পলাশ। আরে, এ তো তাদের দুটো বাড়ি পরেই অনির্বাণের বাড়ির ঠিকানা! 'অ' তা হলে অনির্বাণ? অনির্বাণ তা হলে কায়দা করেই তার ডাকনাম বলেছে ধূর্জটিবাবুকে। আসলে সে প্ল্যানচেটে বসে নাটক করে ঠকাতে চাইছে ধূর্জটিবাবুকে। ব্যাপারটা ভেবে ভয় কেটে গিয়ে হাসি পেয়ে গেল তার। হাসি চেপে রেখে সে ধূর্জটিবাবু আর অনির্বাণের কথাবার্তা শুনতে লাগল।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ''আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?''

''হ্যাঁ, খুব কষ্ট... খুব কষ্ট...! কোমরটা একদম ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছে!'' অনির্বাণের গলার স্বর যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে!

অনির্বাণ পারে বটে অভিনয় করতে! মনে মনে ভাবল পলাশ।

ধূর্জটিবাবু বললেন, ''ও, তার মানে অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে আপনার? কীভাবে?''

''একটা গাড়ি... একটা গাড়ি চাপা দিল আমাকে... সব শেষ...।'' জবাব দিল অনির্বাণ।

''কী গাড়ি ছিল সেটা? বাস না লরি?''

'না, না, আমনার, [illegible] অ্যাম্বাসাডর...। আজ দুপুরে পার্ক সার্কাসের মোড়ে...।''

এরপর সে কী বলল ঠিক বুঝতে পারল না পলাশ।

ধূর্জটিবাবু তার কথা শুনে বলে উঠলেন, ''তার নম্বর কত ছিল?''

পলাশের মনে হল, প্রশ্নটা করার সময় তাঁর গলাটা যেন কেঁপে উঠল। কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। তারপরই অনির্বাণের স্পষ্ট উত্তর শোনা গেল, ''ডব্লু বি কিউ ৫৫৫৫।''

তার কথা শোনার সঙ্গে-সঙ্গেই অন্ধকারের মধ্যে প্রচণ্ড জোরে আর্তনাদ করে উঠলেন ধূর্জটিবাবু। তারপর দুম করে একটা শব্দ হল। পলাশের মনে হল ধূর্জটিবাবু যেন চেয়ার থেকে মাটিতে পড়ে গেলেন। পরক্ষণেই প্রচণ্ড জোরে হাসতে শুরু করল অনির্বাণ।

ব্যাপারটা কী হল ঠিক বুঝতে পারল না পলাশ ও নিলু। হাসতে হাসতে অনির্বাণ বলল, ''দেখ, দেখ, তোদের পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসা সিদ্ধপুরুষ নিজেই কেমন ভয় পেয়ে গেলেন!'' তারপর সে হাসি থামিয়ে বলল, ''কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনে হয় তোর বিশ্বাসই ঠিক নিলু!''

তার কথা শেষ হওয়ার পর আবার ঘরটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ কীভাবে যেন ঘরের একটা দরজা শব্দ করে খুলে গেল। একঝলক ঠান্ডা বাতাস ঢুকল ঘরের ভিতর।

পলাশ বলল, ''ধূর্জটিবাবু, ও ধূর্জটিবাবু! আপনার কী হল? অনির্বাণ, অ্যাই অনির্বাণ?''

কিন্তু কারও কোনও শব্দ পাওয়া গেল না। নিলুও তাদের নাম ধরে ডাকল। তারপর পকেট থেকে একটা লাইটার বের করে জ্বালাল। মৃদু আলোয় তারা দেখতে পেল, মাটিতে পড়ে আছেন ধূর্জটিবাবু। তাঁর মুখ দিয়ে গাঁজলা বেরোচ্ছে।

কিন্তু অনির্বাণ ঘরের মধ্যে নেই। তার চেয়ার খালি। নিলু লাইটার দিয়ে মোমের টুকরোটা জ্বালিয়ে দিল। ধূর্জটিবাবুর পাঞ্জাবির পকেট থেকে টর্চটা ছিটকে পড়েছিল মেঝের উপর।

পলাশ সেটা চট করে কুড়িয়ে নিয়ে নিলুকে বলল, ''তুই ধূর্জটিবাবুকে দেখ। আমি দেখি অনির্বাণ কোথায় গেল? সে এভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কেন?''

পলাশ ঘর ছেড়ে খোলা দরজা দিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল। টর্চ জ্বালিয়ে সে দেখতে পেল, কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে ধূর্জটিবাবুর গাড়িটা। টর্চের আলো মাঠের বেশি দূরে যাচ্ছে না। আর কিছু দেখা যাচ্ছে না মাঠে। বারান্দাতেও সে নেই।

পলাশ বারান্দা থেকে মাঠে নেমে কয়েক পা এগিয়ে টর্চের আলো চারপাশে ঘোরাতে ঘোরাতে চিৎকার করে বলে উঠল, ''অনির্বাণ, অ্যাই অনির্বাণ, তুই কোথায় গেলি?''

ঠিক সেই সময় বেজে উঠল পলাশের পকেটে রাখা মোবাইলটা। সেটা বের করে কানে দিতেই ওপাশ থেকে মোবাইলে ভেসে এল পলাশদের বন্ধু অসীমের গলা, ''কে পলাশ? আমি অসীম বলছি। তোরা যেখানে আছিস সেখান থেকে এখনই কলকাতায় ফিরে আয়। খুব জরুরি। অনেকক্ষণ ট্রাই করার পর তোদের ধরতে পারলাম!''

পলাশ বলল, ''কেন, কী হয়েছে?''

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে অসীম বলল, ''অনির্বাণ আর নেই। আজ দুপুরে পার্ক সার্কাসের মোড়ে একটা অ্যাম্বাসাডর তাকে...!''

আর বলতে পারল না অসীম। কান্নায় ভেঙে পড়ল।

পলাশ তাকে চিৎকার করে বলল, ''কী বলছিস তুই? অনির্বাণ তো এক্ষুনি...।''

কথাটা শেষ করতে পারল না পলাশ। উত্তেজিতভাবে তার টর্চ ধরা হাতটা নাড়াতে গিয়ে টর্চের আলোটা যেন হঠাৎ আটকে গেল কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ধূর্জটিবাবুর অ্যাম্বাসাডরের নম্বর প্লেটের উপর। পলাশ দেখতে পেল, সেখানে জ্বলজ্বল করছে গাড়ির নম্বরটা। 'ডব্লিউ বি কিউ ৫৫৫৫'!

টর্চটা খসে পড়ল তার হাত থেকে।

২ মার্চ ২০০৮

অলংকরণ: কৌশিক মজুমদার

মঙ্গলচণ্ডীর পোড়ো মন্দিরে

শ্যামল দত্তচৌধুরী

সেবার সাগরদ্বীপে দিন দুয়েক কাটিয়ে ওরা তিনবন্ধু ফেরার পথ ধরেছে। অপূর্ব, লালু আর প্রতীক। বহুল প্রচারিত এক সংবাদপত্রের সাংবাদিক অপূর্ব। পৈতৃক চায়ের ব্যাবসার দেখাশোনা করে লালু। আর প্রতীক পড়ছে ম্যানেজমেন্ট। একই কলেজের ছাত্র ওরা। একই ব্যাচের।

সময়টা নভেম্বরের শেষ দিক। কচুবেড়িয়া থেকে ভেসেল ধরতে হবে। জেটিতে পৌঁছে জানা গেল, ইঞ্জিন ব্রেকডাউন। ভেসেল ছাড়তে ঘণ্টা দুয়েক দেরি হবে।

অপূর্ব বলল, ''চল, কাছাকাছি কোথাও ঘুরে আসি।''

লালু বেশ অলস মেজাজের ছেলে। সে এক ঠোঙা জিলিপি কিনে বসে পড়ল একটা গাছের ছায়ায়। বলল, ''তোদের জ্বালায় রাতে ভাল ঘুম হয়নি। মাথা ধরে আছে সকাল থেকেই। যাদের বেড়াবার ইচ্ছে তারা ঘুরে আসুক।''

তা ছাড়া লালুর সবসময় উদ্বিগ্ন হয়ে থাকার স্বভাব। কোনও কারণ ছাড়াই ও টেনশনে থাকতে ভালবাসে। আকাশের কোণে মেঘ দেখলেই ওর উদ্বেগ শুরু হয়ে যায়, ''এই রে, ছাতা নিয়ে বেরোইনি তো। যদি বৃষ্টি আসে?''

লালু আবার বলল, ''বলছে বটে ভেসেল ছাড়তে দু' ঘণ্টা দেরি, কিন্তু আগে রিপেয়ার হয়ে গেলে যদি আগে ছেড়ে দেয়? আমি জেটি ছেড়ে কোথাও নড়ছি না।''

[illegible] অপূর্ব আর প্রতীক মশলামুড়ি চিবোতে চিবোতে জায়গাটা ঘুরে দেখতে বেরোল। বিকেল হয়ে আসছে, রোদের তেজ মরে গিয়েছে। আকাশ মেঘলা। সন্ধে নামছে। বেশ লাগছে হাঁটতে। লঞ্চঘাট থেকে বেরিয়ে ওরা ডানদিকে মোড় নিল।

প্রতীক বলল, ''কাল রাতটা আমার খুব খারাপ কেটেছে। তোরা আর বিষয় পেলি না, একটার পর একটা ভূতের গল্প! তার উপর অন্ধকারের মধ্যে হোটেলের করিডোরে আমাকে একলা পেয়ে তোরা যেমন ভয় দেখিয়েছিস, বর্বর সমাজেও তেমন ব্যবহার আশা করা যায় না। সিঁড়িতে গড়িয়ে পড়ে গেলে কী হত ভাব তো?''

অপূর্ব বলল, ''তোর ভূতের ভয় অস্বাভাবিক বেশি। তোর বয়সে কেউ ভূতকে ভয় পায় এই প্রথম দেখলাম।''

ওরা বাঁদিকের প্রান্তর পেরিয়ে গল্প করতে করতে গাছপালার ভিতরে ঢুকে পড়ল। অপূর্ব বলল, ''তুই ভূতে বিশ্বাস করিস কেন?''

''বিশ্বাস না করার কী আছে? কত বড় বড় মানুষ ভূত দেখেছেন। নামী কোনও সাহেবভূত দেখলে বোধহয় তোর বিশ্বাস করা সহজ হত, না রে অপু?''

''আমি ভূত বিশ্বাস করি না।'' বলল অপূর্ব।

''আমি করি।'' বলল প্রতীক।

অপূর্ব বলল, ''আসলে মানুষের মন খুব বিশ্বাসপ্রবণ। এই তো সেদিন আমাদের হাউসিংয়ের একজন [illegible] চমকে দিয়েছিল। সে নাকি রাত [illegible] আকাশে আলো জ্বলতে দেখেছে।

ইউ এফ ও, ভিনগ্রহের প্রাণীদের ফ্লাইং সসার না হয়ে যায় না। ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা তার ছবি বারবার টিভিতে দেখানো হয়েছিল। একজন বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন, 'ব্যাপারটা সত্যিই রহস্যময়, কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না।' পরদিন রাতে আমাদের হাউসিংয়ের অন্তত শ'দেড়েক লোক সারারাত ছাদে চড়ে বসেছিল ইউ এফ ও দেখবে বলে। এমনই সহজ মানুষের বিশ্বাস। ভোররাতের দিকে সেই রহস্যময় আলো দেখা যেতেই সকলে সমস্বরে চেঁচাতে লেগেছিল, 'ওই যে, ওই যে ইউ এফ ও...।' একসময় একটা ছোট ছেলে বলল, 'ধ্যাত, ওটা তো পোলস্টার।' ব্যস, তক্ষুনি সকলে ফিউজ, যাকে বলে শ্মশানের শান্তি। একজন, দু'জন করে কেটে পড়েছিল নীচে।''

ঝোপঝাড় ভেদ করে পায়েচলা পথ এগিয়ে গিয়েছে। দূরে কিছু বড় ডালপালায় ছাওয়া গাছের আড়ালে একটা ছোট্ট গ্রামের আটচালা চোখে পড়ছে। ওরা চলতে চলতে পৌঁছে গিয়েছিল এক মজে যাওয়া খাঁড়ির পাশে। একসময় নিশ্চয়ই হুগলি নদীর জল ঢুকে পড়ত জোয়ারে। পাড়ে জীর্ণ এক মন্দির। গর্ভগৃহ জঙ্গলে ভরে উঠেছে, কোনও বিগ্রহ চোখে পড়ল না। নাটমন্দিরের মেঝের ফাটল চিরে গাছ ঠেলে উঠেছে। সিঁড়ি নেমে গিয়েছে খালের দিকে। তাড়াতাড়ি নামছে অন্ধকার। প্রতীকের গা ছমছম করে উঠল। অনেক অশরীরী যেন নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

অপূর্ব সহজ গলায় বলল, ''আয়, ঘাটের সিঁড়িতে বসি!''

প্রতীক ইতস্তত করতে করতে বলল, ''কী দরকার? সাপখোপ থাকতে পারে! তা ছাড়া এতক্ষণে ভেসেল নিশ্চয়ই রেডি হয়ে গিয়েছে। ফিরে যাওয়াই ভাল।''

অপূর্ব ওর কথা উড়িয়ে দিয়ে বলল, ''আরে যাঃ, ডরপোক কাঁহিকা। ভেসেল রেডি হয়ে গেলে লালু নিশ্চয়ই মোবাইলে জানাবে। তুই আসলে ভূতের ভয় পাচ্ছিস, তাই না?''

প্রতীক বলল, ''তা কেন? অন্ধকার, সাপটাপ!''

''বোস এখানে, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে, শোন।''

ঘাটের ধাপে চটা উঠে ইট বেরিয়ে পড়েছে। ফাঁকে ফাঁকে বুনো ঝোপ মাথা ফুঁড়ে উঠেছে। তাতে দুলছে বেগনি আর হালকা নীল রঙের জংলি ফুল। পাশের জঙ্গল থেকে হঠাৎ একটা বড় পাখি বিকট ডাকতে ডাকতে পাখা ঝাপটে উড়ে গেল। প্রতীক ঘড়ির দিকে তাকাল। লালুকে যখন জেটিতে ছেড়ে এসেছিল তারপর প্রায় পঞ্চাশ মিনিট কেটে গিয়েছে। এখান থেকে ফিরতেও নিশ্চয়ই ওরকম সময়ই লাগবে। অপূর্বর মাথায় মিথ্যে জেদ চেপেছে। এবার ফেরা উচিত। প্রতীক ভাবল, লালুকে ফোন করে ভেসেলের খবরটা নেবে। ভাবতে-না-ভাবতেই অপূর্বর মোবাইল বেজে উঠল। একটু শুনে নিয়ে অপূর্ব বলল, ''ফাইন, মাঝে-মাঝে লেটেস্ট বুলেটিন জানিয়ে যাবি লালু। আমরা কাছেই আছি।''

তারপর প্রতীককে বলল, ''তুই এবার নিশ্চিন্ত হয়ে বোস। লালু বলছে ভেসেল ছাড়ার সময় পিছিয়ে গিয়েছে। গ্যাসকেট কিনতে ভুটভুটি গিয়েছে লট নাম্বার আটে। রেডিয়েটরে বেশ কয়েকটা গর্ত বেরিয়েছে, সোলডারিং করতে সময় লাগবে। তুই নিশ্চয়ই ফ্রাঙ্ক স্মিথের নাম শুনিসনি?''

''না।''

''তিনি ছিলেন এক সাংবাদিক, সাতের দশকে ভূত নিয়ে অনেক চর্চা করেছিলেন। স্মিথ মনে করতেন, মানুষের সহজাত বিশ্বাসপ্রবণতাই ভূতের সৃষ্টি করেছে। বাস্তবে ভূত বলে কিছু নেই।''

প্রতীক গুম হয়ে বসে ছিল। বলল, ''গোড়াতেই গলদ। ভূত তো আর বস্তু নয় যে তার বাস্তব অস্তিত্ব থাকবে!''

অপূর্ব বলল, ''একটু আগে সাহেবদের ভূত দেখার কথা তুলেছিলি না? ন্যাথানিয়েল হথর্ন দেখেছিলেন। বিরাট লাইব্রেরির প্রান্তে ফায়ারপ্লেসের ধারে আরামকেদারায় বসে সংবাদপত্র পড়তেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। সকলে জানত তিনি বহুকাল মৃত। হথর্নকে দেখে বৃদ্ধ উৎসুক চোখ তুলে তাকিয়েছিলেন, যেন কথা বলতে চান। এতগুলো

অ্যালান পো'র সমসাময়িক লেখক ন্যাথানিয়েল হথর্ন অনেক অতীন্দ্রিয় কাহিনি লিখেছিলেন। তিনি শপথ করে বলেছিলেন, 'লাইব্রেরির ভূতের গল্প কাল্পনিক নয়।' এক সন্ধেবেলা তাঁর চোখের সামনে ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোক ধীরে ধীরে হেঁটে দেওয়ালের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলেন। পরে লাইব্রেরি ভেঙে বাড়ানোর সময় ওই দেওয়ালটার ভিতরে একটা নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল।''

প্রতীক বলল, ''ভূতের গল্পের একটাই ত্রুটি। ভূতেরা পোশাক পরে। সাহেব ভূতদের ওভারকোট, মাথায় টুপি, হাতে লাঠি, সংবাদপত্র। বাঙালি ভূতদের পরনে শাড়ি কিংবা ধুতি, মাথায় মাছের চুবড়ি, লম্বা-লম্বা দাঁত। ওই বস্তুগুলো ভূতেরা পায় কোথায়? লাঠি, টুপি, শাড়িরও কি সূক্ষ্ম শরীর হয়?''

অপূর্ব বলল, ''ফ্রাঙ্ক স্মিথ তাঁর থিয়োরি প্রমাণ করার জন্যে কাগজে এক বানানো ভূতের গল্প এমনভাবে লিখেছিলেন, যেন সেটা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। দু'জন বিশ্বস্ত লোককে আগেভাগে শিখিয়ে-পড়িয়ে ঘটনাস্থলে মজুত রেখেছিলেন তাঁর গল্পের সাক্ষী হিসেবে। অদ্ভুত ব্যাপার! রাশিরাশি চিঠি আর ফোন এসেছিল স্মিথের কাছে। একটাই বক্তব্য, 'ওই ভৌতিক ঘটনার অভিজ্ঞতা তাদের হয়েছে। সাজেশন বা পরোক্ষভাবে ধারণা সঞ্চার করা সম্ভব। অলৌকিক ব্যাপার মানুষ সহজেই বিশ্বাস করে নেয়। তাই ভূত দেখাটাও সোজা', বলতেন স্মিথ।''

পরিত্যক্ত জরাগ্রস্ত মন্দির, জঙ্গলাকীর্ণ শুকনো খাঁড়ির পাশে ভাঙা সিঁড়ির ঘাটে বসে ঝাপসা অন্ধকারে ভূতের গল্প শোনা প্রতীকের মোটেই পছন্দ নয়। মাথার উপর শ্যাওড়া গাছের ঝুরি দুলছে। পায়ের কাছে সরসর শব্দ। পকেট থেকে টর্চ বের করে প্রতীক এদিক-ওদিক আলো ফেলল। ব্যাটারি কমজোরি হয়ে পড়েছে, গত রাতে অনেকক্ষণ জ্বালাতে হয়েছিল।

প্রতীকের বেশ ভয়-ভয় করছিল। পরিবেশটা হালকা করার জন্য বলল, ''তোর মাথায় কী একটা আইডিয়া নাকি এসেছে?''

''আমি ভাবছি স্মিথের মতো এক নাটকীয় ভূত সৃষ্টি করে যাব। এই জায়গাটা ভূতের বাসস্থান হিসেবে বেশ জুতসই, না রে? পোড়ো মন্দির, ভগ্ন ঘাট, মজা খাল, জঙ্গল, একদম আদর্শ ভৌতিক পরিবেশ। এই জায়গায় এক কাল্পনিক ভূতের গল্প বানিয়ে আমার কাগজে ছাপিয়ে দেব, স্মিথ যেমন করেছিলেন। দেখবি, লোকে কেমন বিশ্বাস করে নেবে চটপট।''

হঠাৎ দূর থেকে গানের লাইন ভেসে এল। 'তোমার কর্ম তুমি করো মা লোকে বলে করি আমি, সকলই তোমারই ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি...', সঙ্গে দুলতে দুলতে আসছে হ্যারিকেনের আলো। তান্ত্রিক সাধুর লাল পোশাকে একটা রোগা শরীর, বেশ লম্বা। চুল টেনে মাথার পিছনে পনিটেলের মতো বাঁধা, গালে কালো দাড়ি। হাতে লণ্ঠন নিয়ে জঙ্গল ভেঙে গান গাইতে গাইতে আসছে। দিনের আলোর শেষ বিন্দুটুকু মিলিয়ে গিয়েছে আকাশ থেকে।

প্রতীক তার দিকে টর্চের আলো তাক করে অস্ফুট স্বরে অপূর্বকে বলল, ''এই লোকটা ভূত না হয়ে যায় না।''

অপূর্ব বলল, ''মন্দিরের পুরুত হতে পারে!''

''এই তো মন্দিরের ছিরি। বিগ্রহ নেই, তার আবার পুরুত? নিশ্চয়ই ভূত।''

লোকটি গান থামিয়ে বলল, ''আসুন বাবু, অন্ধকারে ঘাটে বসবেন না। ঠাকুরকে আলো দেখাতে এসেছি। নাটমন্দিরে এসে বসুন।''

প্রতীক গজগজ করতে করতে বলল, ''কী ঠাকুর রে বাবা! কোথায় তিনি আলো দেখাবেন, না তাঁকেই আলো দেখাতে হচ্ছে!''

অপূর্ব গলা তুলে বলল, ''মন্দিরে বিগ্রহ দেখলাম না তো?''

''আসুন বাবু, কাছে আসুন। মঙ্গলচণ্ডীর থান। লতাপাতায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে। তেমন ভক্তজন আর আসে না। দুশো বছরের প্রাচীন মন্দির। আপনারা কলকাতা থেকে এসেছেন, তাই না? এখনও আপনাদের ভেসেল সারাই চলছে। ওই জায়গাটায় বসুন। হ্যারিকেনটা রেখে যাব? পরে এসে নিয়ে যাবখ'ন।''

অপূর্ব বলল, ''না, তার দরকার নেই। আমাদের কাছে টর্চ আছে। আমরা দু'জনে এই জায়গাটা নিয়ে এক জব্বর ভূতের গল্প তৈরি করছি, একটু পরে চলে যাব লঞ্চঘাটে।''

প্রতীক লালুকে ফোন করবে বলে মোবাইল বের করল। ব্যাটারি লো। বলল, ''অপু, তুই একবার লালুকে ধর। ভেসেলের লেটেস্ট খবর জেনে নে।''

অপূর্বর সেলফোনে সিগনাল নেই। তক্ষুনি প্রতীকের যন্ত্রটা বেজে উঠল। ছাড়া-ছাড়া গলার স্বর, অস্পষ্ট। লালুর গলা। শুধু বোঝা গেল, 'আরও দু' ঘণ্টা।' এই নিয়ে দু'বার হল। ওদের কল করতে হচ্ছে না। লালুকে ফোন করার কথা ভাবলেই লালুর কল চলে আসছে। প্রথমবার এসেছিল অপূর্বর মোবাইলে। হয়তো ঘাটের সিঁড়িতে ক্ষণিকের জন্য সিগনাল ধরতে পেরেছিল।

মঙ্গলচণ্ডীর পুরুত ঝাড়ু দিয়ে নাটমন্দিরের মাঝখানে ওদের জন্য একটু বসার জায়গা পরিষ্কার করে দিয়ে গর্ভগৃহের দিকে হ্যারিকেনটা কিছুক্ষণ উঁচু করে ধরল। তারপর যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে চলে গেল।

অপূর্ব বলল, ''পেয়েছি, মাই স্টোরি স্টার্টস হিয়ার। এটা এক তান্ত্রিকের আখড়া। দেড়শো বছর আগে মন্দিরের পূজারি ছিল মাতৃসাধক চণ্ডীদাস। তখন ব্রিটিশের রাজত্ব। প্রান্তিক দক্ষিণবঙ্গে অরাজকতা, ঠগি ডাকাতদের রমরমা। উত্তর ভারতের নানা প্রান্ত থেকে দলে দলে তীর্থযাত্রী আসত সাগরসঙ্গমে মকরস্নান করতে। স্নান সেরে ভক্তিভরে

কপিলমুনির পুজো করত। তারা সুন্দরবনের হিংস্র জঙ্গল পার হয়ে, বাঘ-সাপ-কুমির অগ্রাহ্য করে আসত হাঁটাপথে। তবে অধিকাংশ যাত্রী আসত নদীপথে। বাংলার বিভিন্ন দিক থেকে। মনে আছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা? 'গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে/মৈত্রমহাশয় যাবে সাগরসঙ্গমে'। সেই সময় ওই খাঁড়ি জলে ভরপুর হয়ে থাকত। পলি জমে, আগাছা, জঙ্গলে একেবারে মজে যায়নি। সম্পন্ন তীর্থযাত্রীদের নৌকো এসে ভিড়ত ঘাটে। এই নাটমন্দিরে রান্না করে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নিত তারা। চণ্ডীদাস যথাসম্ভব পরিচর্যা করত তাদের। যারা রাত্রিবাস করত তাদের শোওয়ার ব্যবস্থা করে দিত, কাপড় টাঙিয়ে মেয়েদের, ছোটদের পৃথক আয়োজন। দূরাগত ক্লান্ত যাত্রীরা চণ্ডীদাসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তার আপ্যায়নে মুগ্ধ হয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত। রাত গভীর হলে পূজারি চণ্ডীদাসের আসল রূপ প্রকাশ পেত। বিগ্রহের আড়াল থেকে সে বের করত মোটা শণের দড়ি। ধীরে ধীরে দড়ি দিয়ে বেঁধে তাদের মেরে ফেলত চণ্ডীদাস। পুরুষ, মেয়ে, শিশু কেউ রক্ষা পেত না। তাদের গয়না, টাকাপয়সা লুট করে পূজারি কলসিতে ভরে গর্ভগৃহের মাটিতে পুঁতে রাখত। মৃতদেহগুলো ভাসিয়ে দিত খালে। ভাটার টানে সেগুলো ভেসে যেত হুগলির জলে, কুমির-কামঠের পেটে। তীর্থযাত্রীদের নৌকো ফুটো করে ডুবিয়ে দিত জলে। কেমন হচ্ছে?''

প্রতীক বলল, ''তোর এমন কল্পনাশক্তি আছে আমি জানতাম না অপু। অন্ধকারে খামোকা মশার কামড় খেতে খেতে সত্যি বলছি, তোর বানানো গল্প শোনার একটুও ইচ্ছে নেই আমার। আমি ভীষণ বিরক্তবোধ করছি।''

প্রতীক টর্চের আলো ফেলল ঘড়িতে। আশ্চর্য, সেই একই সময় দেখাচ্ছে! যেন লালুকে ওরা জেটিতে রেখে এসেছে মাত্র পঞ্চাশ মিনিট আগে। তবে কি ঘড়ির ব্যাটারিও ইস্তফা দিয়েছে ওর মোবাইলের মতো! অপূর্বর কবজি ঘুরিয়ে ওর ঘড়িটা দেখল প্রতীক। একই সময়। দুটো ঘড়ির ব্যাটারি একসঙ্গে শেষ হয়েছে এমন ঘটনা বিরল। অজান্তে প্রতীকের গা শিউরে উঠল। কথা বলতে গিয়ে ওর স্বর কেঁপে গেল, ''চল অপু, অনেক হয়েছে, আর নয়! তুই না উঠলে এখানে একলাই বসে থাক, আমি চললাম।''

''আর-একটু সময়, তার পরেই উঠব। এই পরিবেশ থেকে বেরিয়ে গেলে মাথার উর্বরাশক্তি হারিয়ে যাবে। কেমন একটা দুর্দান্ত গল্প ফেঁদেছি বল তো প্রতীক! এমন এক প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিবেদন লিখব যে, হইচই সাড়া পড়ে যাবে। ভূত দেখার জন্য লোকের লাইন লেগে যাবে এই পোড়ো মন্দিরে। কপিলমুনির মন্দিরের মতো এই মঙ্গলচণ্ডীর থানও ফেমাস হয়ে যাবে। অপ্রাকৃত ঘটনা চট করে মেনে নেয় লোকে। ওই পুরুতকে খুব দরকার ছিল এখন। ওকে ম্যানেজ করে না গেলে গল্পটা দাঁড়াবে না। ইস, একটু আগে যদি খেয়াল হত!''

''আমাকে খুঁজছেন বাবু?''

এমন চমকে উঠল প্রতীক যে, ওর বুক ধড়ফড় করতে লাগল। এ লোকটা কখন এল? সেই পুরুত, যে কিছুক্ষণ আগে লণ্ঠন নিয়ে এসেছিল? কখন লোকটি নিঃশব্দে এসেছে টের পায়নি ওরা।

পুরুত আবার বলল, ''আপনাদের কোনও সাহায্য করতে পারি বাবু?''

গর্ভগৃহ থেকে মৃদু আলোর রেখা ছড়িয়ে পড়েছে বাইরে। লোকটি বোধহয় ওখানে বসে কিছু করছিল, লণ্ঠন রেখে এসেছে। তার হাত দুটো শরীরের পিছনে।

অপূর্ব অল্প হেসে বলল, ''হ্যাঁ, সাহায্য করতে পারো। পরিবর্তে তোমার এখনই কিছু অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে।''

অন্ধকারেও লোকটির চোখ লোভে চকচক করে উঠল। বলল, ''বলুন কী করতে হবে আমাকে?''

অপূর্ব বলল, ''একটা গল্প শিখিয়ে যাব তোমাকে। কিছুদিনের মধ্যে এই ভাঙা মন্দিরে লোক সমাগম বেড়ে যাবে। চাই কী, টুরিস্ট স্পটও হয়ে যেতে পারে। তুমি যদি চত্বরে চা-বিস্কুট-টোস্টের দোকান খোলো, ভাল আমদানি হবে ভবিষ্যতে। স্টেডি ইনকাম। শুধু লোকে যখন জিজ্ঞেস করবে, আমার শেখানো

গল্পটা তোমাকে বলতে হবে। বুঝেছ? আঃ, দারুণ জমে যাবে। যাও, তুমি ভিতরে যা করছিলে তাই করো গিয়ে। গল্পের শেষটুকু তৈরি করে তোমাকে ডাকব।''

পুরুত বিনীতভাবে বলল, ''গল্পের শেষটুকু তৈরি করতে আমি কি সাহায্য করতে পারি বাবু?''

অপূর্ব অবাক হয়ে বলল, ''তুমি! আমার গল্পটা তো তুমি শোনোনি?''

''কিছু কিছু শুনতে পেয়েছি বাবু ওখান থেকে। মোটামুটি আপনি ঠিকই বলছিলেন। কিন্তু দেড়শো নয়, একশো সাতষট্টি বছরের পুরনো কথা। গর্ভগৃহের মাটিতে পুঁতে রাখা ধনসম্পদের মোহ সেই পূজারি এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। পাহারা দিচ্ছে সেই গুপ্তধন আজও!''

অপূর্ব বলল, ''বাঃ, তোমার মাথাও তো বেশ উর্বর মনে হচ্ছে? পরিবেশের গুণ! তা তোমার নামটা কী ভাই?''

পূজারির স্বর বিষণ্ণ, ''আজ্ঞে চণ্ডীদাস। অর্থের মায়া কাটানো বড় শক্ত গো বাবু! তা ছাড়া তাঁরা আসেন, আমি না হলে আদর-আপ্যায়ন করবে কে?''

অপূর্ব একটু থমকে গিয়ে চোখ সরু করে তাকাল তার দিকে। ক্ষণিক নীরবতার পর বলল, ''তোমার নাম চণ্ডীদাস? আমার বানানো গল্পটাকে খুব সিরিয়াসলি নিয়েছ দেখছি! কাদের কথা বলছ, কারা আসে এখানে?''

চাঁদের আলোয় ভরে গিয়েছে আকাশ। কোনও রাতচরা পাখি একটানা ডেকে চলেছে গরান গাছের জঙ্গল থেকে। অঘ্রানের মাঝামাঝি বাতাসে হিমেল ছোঁয়া।

পুজারি বলল, ''তীর্থে আসেন যাত্রীরা। ওই যে একদল আসছেন...।''

প্রতীক দেখল, ঘষা জ্যোৎস্নায় মন্দিরের ঘাটে ছলাৎ-ছলাৎ শব্দে জল ভাঙছে। আবছা এক বজরা এসে ভিড়েছে। সাদা সাদা কুয়াশার মতো ছায়ামূর্তিরা উঠে আসছে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে। আতঙ্কে প্রতীকের বুক দ্রুততালে চলতে লাগল। গলার কাছে কী যেন আটকে গেল। পা দুটো অবশ। মুখে জিভ জড়িয়ে গিয়ে কোনও আওয়াজ বেরোচ্ছে না। প্রতীক বোকার মতো তাকাল পুজারির দিকে। চণ্ডীদাসের হাতে মোটা শণের দড়ি, সে মুচড়ে মুচড়ে পাকাচ্ছে।

আর কিছু মনে নেই প্রতীকের। হঠাৎ চলচ্ছক্তি ফিরে পেয়ে সে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়েছিল বনবাদাড় ভেদ করে। কতবার যে গাছে ধাক্কা খেয়েছিল, কতবার শিকড়ে হোঁচট খেয়ে আছড়ে পড়েছিল মাটিতে, তার ইয়ত্তা নেই। মুখে ডালপালার ঝাপটা খেতে খেতে দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রতীক ছুটছিল। শুধু তার মনে হচ্ছিল, কেউ ধাওয়া করে আসছে পিছনে...।

ভেসেল সারানো হওয়ার কিছুক্ষণ আগে থেকেই ঘন ঘন ভোঁ বাজাচ্ছিল সারেং। যাত্রীদের জানান দিচ্ছিল, এবার ছাড়বে ভেসেল। অপূর্ব আর প্রতীকের সেলনম্বরে ক্রমাগত চেষ্টা করেও লালু যোগাযোগ করতে পারেনি। একসময় অধৈর্য যাত্রীদের চাপে ভেসেল রওনা দিয়েছিল ওপারের দিকে। তখন স্থানীয় কিছু লোক সংগ্রহ করে লালু খুঁজতে বেরিয়েছিল বন্ধুদের। প্রতীকের অচৈতন্য শরীর পাওয়া গিয়েছিল মেন রোডের ধারে।

পরদিন সকালে মঙ্গলচণ্ডীর ভাঙা মন্দিরের পাশে মজা খালের কাদায় গায়ে দড়ির দাগ সমেত অপূর্বর লাশ দেখতে পেয়েছিল এক গ্রামবাসী।

প্রতীক নিজের মোবাইলে রিসিভ্‌ড কল্‌স লিস্টে কিন্তু লালুর নম্বর খুঁজে পায়নি!

২ মার্চ ২০০৮

অলংকরণ: নির্মলেন্দু মণ্ডল

ভূতের প্রায়শ্চিত্ত

দুলেন্দ্র ভৌমিক

নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে দেখা গেল, শুধু গেল না, বহুদিন থেকেই দেখা যাচ্ছে, অভিরাম দত্তর ভাগ্যটা ভাল নয়। ভাল ভেবে যা করতে গিয়েছে, তাই তার কাছে বাঁশ হয়ে ফিরে এসেছে। অভির পিসিও দুঃখ করে বলেন, "অভির ভাগ্যটা বক্র হয়ে গিয়েছে। আর হবে না-ই বা কেন? তখনকার দিনে তো আজকের মতো পেট কেটে সন্তানের জন্ম দেওয়ার চল ছিল না। তখনকার দিনে সবই ছিল বিধাতার হাতে। কথায় বলে না, 'জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে।' এখনকার দিনে সেই শাস্ত্রবচন আর খাটে না। বিধাতার হাত থেকে একে-একে সবই কেড়ে নিয়েছে মানুষ। তা ছাড়া ওর তো জন্মলগ্নে গণ্ডগোল আছে।"

অক্ষয় বেরার মা বয়সে অভিরামের পিসির চেয়ে একটু বড়। অক্ষয়ের মা বারান্দায় বসে ডালের বড়ি দিচ্ছিলেন। তিনি মুখ তুলে অভিরামের মায়ের দিকে তাকাতেই পিসি বললেন, "কার্তিক মাসের কৃষ্ণাচতুর্দশী তিথিকে বলা হয় 'ভূতচতুর্দশী'। ওইদিন বাংলার ভূতসম্প্রদায় সকলেই সারারাত জেগে উৎসব করে। ভূতে যারা ভয় পায়, তারা এবং যারা মুখে বলে, পায় না, তারাও সেদিন সন্ধের পর একা-একা ঘরের বাইরে বেরোয় না। বললে বিশ্বাস করবেন না দিদি, আমার শ্বশুরের দেশে ভূত যেন যখন-তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে। কী না করছে! আমার মেজোবউদি মক্কেলের কাছ থেকে পাওয়া গঙ্গার আসল ইলিশ কড়াইতে ভাজছিল। মেজদা তো উকিল ছিল, তাই অনেকরকম মক্কেল অনেককিছু উপহার মেজদাকে দিয়ে যেত। একজোড়া ইলিশও সেইভাবে এসেছিল। ও মা! ইলিশ ভাজার গন্ধ পেয়ে জানলা দিয়ে একটা মাংসশূন্য হাড়-জিরজিরে হাত ঢুকে বলা নেই, কওয়া নেই, জ্বলন্ত উনুনের উপর বসানো কড়াইয়ের মধ্যে থেকে ঝপ করে দু'খানা ইলিশের ভাজা গাদা তুলে নিয়ে দিব্যি খ্যাঁকখ্যাঁক করে হাসতে হাসতে চলে গেল!"

অক্ষয়ের মা অবাক গলায় বললেন, "সে কী গো? গরম তেলের ছ্যাঁকা লাগল না?"

পিসি উত্তর দিলেন, "ওদের আবার ছ্যাঁকা! গায়েগতরে মাংস থাকলে তো ছ্যাঁকা!"

অক্ষয়ের মা বললেন, "হ্যাঁ গো দত্তগিন্নি, মানুষ অপঘাতে মরলে নাকি তার আত্মার মুক্তি হয় না? সে ভূত হয়ে যায়? কিন্তু ওঁর ডিউ-থাকা পিণ্ডি যদি লেট ফাইন দিয়ে কেউ দিয়ে দেয়, তা হলেও কি মুক্তি নেই?"

অভিরামের পিসি বললেন, "অতশত জানি না দিদি। ওদের নিয়মকানুন আলাদা। আমার মনে হচ্ছে, এখন বোধহয় ভূত মরলেও মানুষ হচ্ছে। নইলে এত ভূতের জায়গা হবে কেমন করে? তুমি একটিবার অভিরামকে ডেকে ওর অভিজ্ঞতাটা শুনে নিয়ো। তুমি দিদি দিনে-দিনে যেয়ো, আর দিন থাকতে থাকতে ফিরে এসো।"

অভিরামের পিসির কথা শুনে অক্ষয় বেরার মা চোখ কপালে তুলে বললেন, "সে কী কথা! দিন ফুরোলেই বুঝি ঘাড়ে এসে বসে?"

পিসি বললেন, "না, ঠিক তেমনটা নয়। তবে

তেমনটা হলেই বা আটকাবে কে? এ তো সুন্দরবনের বাঘ গণনা নয়। পায়ের ছাপ দেখে দেখে নাকি বাঘ-বাঘিনির গণনা হয়। কিন্তু ভূত-পেতনির বেলায় সেটি হওয়ার জো নেই। ওরা তো সর্বত্র ভেসে বেড়ায়। কোথাও কোনও পায়ের ছাপ পড়ে না। অভিরামের দাদামশাই ছিলেন ভূতসাধক। ছুটির দিনে ভূতের সঙ্গে বসে দুপুরে দাবা খেলতেন। দাদামশাই যেদিন দেহ রাখলেন, সেদিন বাড়িতে এক দারুণ কাণ্ড! দাদামশাই একটা সরকারি চাকরি করতেন বটে, তবে সেটা তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। তখন দেশগাঁয়ে বিস্তর জমি, পুকুর এসব ছিল। ওই ফসল থেকে দিয়ে থুয়ে দিব্যি চলে যেত। সরকারি চাকরিটা ছিল স্রেফ অলংকার!''

অক্ষয় বেরার মা প্রশ্ন করলেন, ''তা সরকারি চাকরিটা কেমন?''

পিসি উত্তর দিলেন, ''সোজা বাংলায় হল বাঁদরমারা চাকরি। খাকি রঙের হাফপ্যান্ট, আর হাফশার্ট, পায়ে বুট জুতো, মাথায় টুপি আর কাঁধে একখানা বন্দুক। ইংরেজিতে বলত, 'মাঙ্কি-কিলার'। তা সেই মাঙ্কি-কিলার দাদামশাই নিজেই যখন মারা গেলেন, তখন তাঁর মৃত্যুসংবাদ রটতে দেরি হল না। তার একটু পরেই শুরু হল এক সাড়াজাগানো কান্না। ভূতদের তো দেখা যাচ্ছে না। শোকার্ত ভূতেরা নাকিসুরে নামতার মতো কেঁদে চলেছে আর গাছের মাথা ধরে ঝাঁকাচ্ছে, ইট ছুড়ছে, আর গাছের ডালগুলো মড়মড় করে ভেঙে আছড়ে মারছে মাটিতে। অন্যদিকে রাজ্যের যত বাঁদর, তারাও খবর পেয়ে জুটেছে। তাদের যেন আজ বড়ই আনন্দ-উৎসব। কেননা, তাদের হত্যাকারীর মৃত্যুতে বাঁদরের এমন উল্লাস খুবই স্বাভাবিক। তারা হুপহাপ শব্দ করে নৃত্য করছে, বাঁদররা পরস্পরের সঙ্গে কোলাকুলি করে আনন্দ প্রকাশ করছে। রাবণের মৃত্যু এবং সীতা উদ্ধারের পরও বাঁদরকুল যতটা আনন্দ উপভোগ করেছিল আজকের আনন্দ যেন তার চেয়ে বেশি। তবে হ্যাঁ, ত্রেতা এবং কলির মধ্যে যুগলক্ষণ কিছু তো তফাত থাকবেই। অভিরামের কাছ থেকেই তো শুনেছি, ভূতেরা নাকি এখন মোবাইল টেলিফোনও ব্যবহার করতে শিখেছে।''

বাড়িতে এসে পিসি যখন অভিরামকে সব বলছিলেন, তখন অসহিষ্ণু গলায় অভিরাম বলল, ''এত সব কথা দশজনের কাছে গাবিয়ে বেড়াবার কী দরকার? ভূতদের মেজাজ-মর্জি কখন কেমন থাকে কে জানে? ওরা নিজেদের প্রচার চায় না। এই যে এত বড় বড় কাণ্ড হয়, কখনও তার সঙ্গে ভূতেরা জড়িত থাকে? তবে হ্যাঁ, ওদের বেশি ঘাঁটালে ওরা কিন্তু সব ঘোঁট পাকিয়ে দেবে।''

অভিরামের মুখ থেকে যে গল্পটি শোনার জন্য অভিরামের পিসি প্রায় সাধাসাধি করে অক্ষয়ের মাকে নিয়ে এলেন, সেই গল্পটি ঠান্ডার সময় চাদরমুড়ি দিয়ে বসে শুনতে খারাপ লাগবে না।

অভিরাম তাকিয়ে দেখল, ঘর বেশ ভর্তি। অভিরাম গল্প শুরু করার আগে ঘরের মধ্যে থেকে কেউ একজন বলে উঠল, ''বাদছাদ দিয়ে বলবেন না। কেউ ভয় পেলে তাকে অভয় দেওয়ার লোক আছে, বাড়ি ফিরতে ভয় পেলে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।''

অভিরাম ঘরের মধ্যে তাকাল। যেন কাউকে চোখ দিয়ে খুঁজছে। কিন্তু কাকে যে খুঁজছে সেটা সে নিজেও জানে না। অভিরাম বলল, ''কলকাতার পুরনো বাড়িগুলোতে একসময় দেদার ভূত থাকত। পুরনো বাড়িগুলো ভেঙে হালফ্যাশনের ফ্ল্যাটবাড়ি তৈরির সময় ভূতও আস্তে আস্তে বিদায় নিল। হেদুয়ার কাছে, স্কটিশচার্চ কলেজের পিছনদিকে একসময় একটি পুরনো ধাঁচের দোতলা বাড়ি ছিল। আদিতে বাড়িটার কী রং ছিল তা জানি না। আমি যখন দেখি, তখন বাড়িটার রং ছাই-ছাই। ঠিকঠাক বোঝাতে হলে বলতে হয়, কাকের ঘাড়ের কাছে যেমন রং থাকে, তেমনই রং। দোতলা বাড়িটায় উপরে-নীচে মিলিয়ে ক'খানা ঘর তা জানি না। তবে নীচের তলায় একটি ছাপাখানা ছিল। ছাপবার মেশিন ছিল না, শুধু কম্পোজ হত। তখন হ্যান্ড কম্পোজের যুগ।

''প্রেসটি দেখাশোনা করতেন 'হালদারবাবু' নামে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। হালদারবাবুর গালে সাদা-

পাকা দাড়ি, কম কথা বলতেন এবং দিনে অন্তত তাঁর তিনবার জ্বর আসত। বেশ কম্প দিয়ে। আমরা অনেকে গায়ে হাত দিয়ে দেখেছি, গা বেশ গরম। প্রথম-প্রথম আমরা ঘাবড়াতাম। কিন্তু আমাদের কাউকে কিছু করতে হত না। যেমন নিঃশব্দে তিনি হঠাৎ-হঠাৎ জ্বরে আক্রান্ত হতেন, তেমনই নিঃশব্দে আবার জ্বরমুক্তিও ঘটত। যে চেয়ার-টেবিলে বসে হালদারবাবু কাজ করতেন, তার পাশেই ছিল খুব সাধারণ চেহারার একটি তক্তপোশের উপর বিছানা। বিছানার চাদরটি কেনার পর থেকে সম্ভবত তার গায়ে সাবান-সোডার কোনও স্পর্শ লাগেনি। যখন জ্বর আসত, তখন তো বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে কাঁপতে কাঁপতে কী সব যেন বলতেন। আর যখন জ্বর থাকত না, সেইসময় একটি ছুরি দিয়ে একখানা সাবান সরু সরু করে কাটতেন। অসীম ধৈর্য এবং প্রবল নিষ্ঠা না থাকলে একই মাপের সাবানের ফালি এমনভাবে কাটা যায় না। ছুটির পর প্রেসের লোকদের হাতের কালি পরিষ্কার করার জন্য সাবান দিতে হয়। অথচ কেউ যদি বেশি খরচ করে ফেলে, তাই মাপমতো সাবান কেটে রাখাটা হালদারবাবুর কাছে জরুরি ছিল।

''আর-একটি কাণ্ড আমার মতো অনেককেই অবাক করত। বাড়িটার বাঁধানো উঠোনের মধ্যেই একটি পাড়হীন কুয়োতলা। এরকম সমতলমার্কা কুয়ো ও বাঁধানো উঠোনে কেউ রাখে নাকি?

''হালদারবাবুকে আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম। হালদারবাবুর উত্তরটি ছিল ভারী অদ্ভুত। তিনি বলেছিলেন, 'সাধে কি আর রেখেছি অভিবাবু? ওটাকে শুধু কুয়ো বলবেন না। ও জিনিস খুবই পবিত্র। প্রচার পেলে দেশ-বিদেশ থেকে লোক এসে জমা হত কুয়োতলায়।'''

অভিরাম অবাক গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, "এসব কথার মানে কী? কী আছে ওই কুয়োর মধ্যে?"

''হালদারবাবু বলতে শুরু করেই কাঁপতে কাঁপতে থেমে গেলেন। শুধু বললেন, 'আজ হয়তো আর বলা হল না। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতে পারবেন তো? যদি পারেন, একটু সাহায্য করুন।'

''হালদারবাবু নিজের বালিশের তলা থেকে একটা মানিব্যাগ বার করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'অভিরামবাবু, এই ব্যাগ থেকে টাকা নিয়ে এক প্যাকেট ধূপকাঠি, মোম আর একটা দেশলাই নিয়ে আসুন না দয়া করে!'

''মানিব্যাগটা হাতে নিয়ে আমি বুঝলাম, এটা খুব সাধারণ একটা ব্যাগ নয়। মানিব্যাগটা আমার হাতের মুঠোর মধ্যে আসার পরই ভাইব্রেট করতে শুরু করল। এরকম ভাইব্রেশন তো কোনও-কোনও মোবাইল ফোনে হয়। আমি এই প্রথম মনে মনে একটু ভয় পেলাম। আমার মনে হল, শুধু আমার হাত নয়, আমার শরীরও কাঁপছে। এই কম্পটার পিছনে কোনও যান্ত্রিক কৌশল নেই। এর পিছনে কাজ করছে অজানা একটা ভয়।

''আমি একটু দেরি করেই ফিরলাম। এসে দেখি, হালদারবাবু সবে বিছানা ছেড়ে উঠে টেবিল-চেয়ারে বসেছেন। আমাকে দেখে হাসলেন এবং হাত বাড়ালেন। ফেরত পয়সাগুলোও গুনে গুনে নিলেন। তারপর তিনি উঠলেন। বারান্দার এক কোণে গিয়ে একটা মাটির জালা থেকে মগে করে জল তুলে নিজের গায়ে ঢালতে লাগলেন। আমি তো অবাক! উঠোনের অন্য প্রান্তে তখন কুয়াশা ঢাকা অন্ধকার!

''ভেজা কাপড়ে এসে কুয়োতলায় দাঁড়ালেন। ধূপকাঠি জ্বাললেন। মোমবাতি নিয়ে কুয়োতলা প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর প্যাকেটের সব ক'টা মোম জ্বেলে কুয়োতলার চারপাশে গোল করে বসিয়ে দিলেন। যেন কারও সমাধির চারদিকে বৃত্তাকারে কেউ মোমবাতি জ্বেলে দিয়েছে। আমি দেখলাম, কোনও নির্জন আস্তানাও নয়। খাস কলকাতার মধ্যে একটা পুরনো বাড়ি, যা কোনও অর্থেই পরিত্যক্ত নয়। সেই বাড়ির উঠোনের মধ্যে একটা কুয়ো থেকে গলগল করে ধোঁয়া উঠছে। আমি যেন ধীরে ধীরে অন্য জগতে চলে যাচ্ছি। আমার চোখ স্থির। এবার দেখলাম, সর্বাঙ্গ গয়নায় সজ্জিতা এক অপরূপা মহিলা কুয়োর উপর শূন্যে দাঁড়িয়ে।

''হালদারবাবুর গলা শোনা গেল, 'উনি আমাদের ছোটরানি। বিয়ের দিনই আত্মঘাতী হয়েছিলেন ওই কুয়োতলায়।'

''আমি প্রশ্ন করলাম, 'কেন?'

''হালদারবাবু বললেন, 'সেও এক রহস্য। সে রহস্য আমিও জানি না। আত্মহত্যা এবং হত্যা এই দুটো মতই চালু আছে। ছোটরানি নিজের মুখে কিছু বলেননি। এবার আমার একটা অনুরোধ রাখবেন? যদি রাখেন তবে বড়ই উপকৃত হব।'

''এত কাণ্ডের পর 'না' বলার কোনও উপায় থাকে না। যদিও জানি না, হালদারবাবু লোকটিও স্বাভাবিক কি না এবং তাঁর মতো রহস্যময় তথাপি ভাল্লুক জ্বরে আক্রান্ত হওয়া মানুষের কোন উপকারে আমি লাগব? মুখে যা-ই বলি না কেন, মনে মনে খুব শঙ্কিত ছিলাম। তবু বললাম, 'বলুন, কেমন অনুরোধ? আমার সাধ্যে কুলোলে নিশ্চয়ই করব!'

''হালদারবাবু বললেন, 'আপনাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার। আমার তো অভিশপ্ত জীবন। দিনের মধ্যে অন্তত তিনবার আর রাত্রে একবার আমার জ্বর আসে। সেইজন্য আমার দ্বারা হবে না। আপনি গয়ায় গিয়ে খানকয়েক পিণ্ডি দিয়ে আসবেন। একটাই পিণ্ডি, বাকিগুলো দিলেও হয়, না দিলেও হয়। আমি সকলের নাম, ঠিকানা, গোত্র, মৃত্যু কেমনভাবে ঘটল, এগুলো একটা কাগজে লিখে, পথের খরচসহ সব দিয়ে দেব। পিণ্ডিটা এই মাসের মধ্যেই দিতে হবে। একবার আমার ভাগনেকে পাঠিয়েছিলাম। আমার ভাগনে প্লেন ছাড়ার পর বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখে, ফ্লাইট একেবারে ফুল। সে তখন পাইলটকে গিয়ে বলেছিল, 'এই যে, একটু চেপে বসুন। এতটা পথ দাঁড়িয়ে যেতে পারব না।' পাইলট এমন ঘাবড়ে গিয়েছিল, রেডঅ্যালার্ট জারি করে রাঁচিতে প্লেন নামিয়ে দিয়েছিল। তারপর থেকে ভাগনেকে প্রথমে পাগলাগারদে, পরে হাসপাতালে, তারও পরে কলকাতায়,এবং এখন...''

''আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন কোথায়?'

''হালদারবাবু বললেন, 'ঠিক এই মুহূর্তে কোথায় বলতে পারব না। শুনেছি গয়ার প্রেতশিলার মতো

ও নাকি ভু[illegible] [illegible]নোর জন্য সরকারের কাছে জমি চাইছে।'

''একদিন রাত্রিবেলা হাওড়া স্টেশন থেকে দিল্লি-কালকা ধরে গয়া যাওয়ার জন্য ট্রেনের কামরায় উঠে বসলাম। হালদারবাবু টাকাপয়সার ব্যাপারে কার্পণ্য করেননি। ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট। আমার কুপে আমিই যাত্রী। কাপল-বার্থ গোছের বগি। আমি লোয়ার বার্থে গুছিয়ে বসলাম। পকেট থেকে পিণ্ডদানের তালিকাটা বের করে পড়তে গিয়ে প্রথমেই হোঁচট খেলাম। যাঁদের পিণ্ড দিতে হবে তাঁদের নামের তালিকায় প্রথমেই বিরাজ হালদার! তার মানে হালদারবাবু! উনি কি মারা গিয়েছেন নাকি? জ্যান্ত মানুষের আবার পিণ্ড দেওয়া হয় নাকি? মৃত্যুর কারণ, জ্ঞাতিদ্বন্দ্বের চক্রান্তের শিকার। চন্দ্রকলা গুহ, ছোটরানি। আত্মহত্যা অথবা হত্যা। মধুসূদন রায়, গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু।

''হঠাৎ কুপের দরজাটা খুলে গেল। আমি সেইদিকে তাকালাম। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'রাতে এই কামরার আলোটা কি জ্বলবে নাকি?'

''আমি বললাম, 'আমার কোনও দরকার নেই। ইচ্ছে করলে আপনি নিভিয়েও দিতে পারেন।'

''বাইরে তেমন শীত নেই। শীত হলে না হয় বোঝা যেত! এই ভদ্রলোক এমনভাবে কোট-প্যান্ট আর মাফলারে নিজেকে ঢেকেছেন, যেন তিনি মধ্য-পৌষের কোনও শীতপ্রধান দেশে যাচ্ছেন। ঝপ করে আলোটা নিভে যেতেই কামরার অন্ধকারটা বেশি ঘন মনে হল। হঠাৎ দেখলাম, কামরার মধ্যে হু হু করে কোথা থেকে যেন একটা হাওয়া ঢুকছে। কামরার মধ্যে কিস্‌সু দেখা যাচ্ছে না। আমি উঠে দাঁড়িয়ে যেই আমার আপার বার্থের দিকে তাকালাম, হঠাৎ আমার শরীর হিম হয়ে গেল। আপার বার্থে কে বসে?

''আমি এক মুহূর্ত দেরি না করে কামরার বাতি জ্বালালাম। বার্থের উপর থেকে নেমে আসছে কালো রঙের একটা ভালুক। মুখোশটা টেনে খুলতে খুলতেই বলল, 'আমি...'

''নিজেকে পরিচয় দিতে হল না। আমিই বলে ফেললাম, 'হালদারবাবু! আপনি?'

''হালদারবাবু নিজের ছদ্মবেশটা খুলে ফেলে বললেন, 'আমি অনেকের কাছেই ধরা পড়ে গিয়েছি। ভালুকের খোলসটা আমার ছদ্মবেশ হলেও আমি কিন্তু মানুষ নই। আমি ভূতই!'

''আমি বললাম, 'ওই বাড়ির মধ্যে যে ক'টা খুন হয়েছে, আমার অনুমান, সবক'টা খুনই আপনি করেছেন। অস্বীকার করতে পারেন?'

''হালদারবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'আমি অস্বীকার করছি না। এই বাড়ির ছোটরানি থেকে বড়বাবু মহেন্দ্র হালদার, মধুসূদন রায় থেকে বড়মা, সকলকে আমি খুন করে ওই পাতকুয়োয় ফেলে দিয়েছি। বড়বাবুর কাছ থেকেই এইসব কর্মের নির্দেশ এসেছিল। আমরা সকলেই রয়ে গিয়েছি ওই গভীর পাতকুয়োর মধ্যে। আমাদের আত্মার মুক্তির জন্যই আপনাকে পিণ্ডি দিতে পাঠাচ্ছি। কিন্তু আপনাকে রওনা করিয়ে দিয়ে আমার মনে হল, আপনিও বিশ্বাসের ঊর্ধ্বে নন। আমাদের সব কীর্তি আপনার জেনে ফেলা মানে বাড়িটা বিক্রি হওয়ার সব সুযোগ নষ্ট হয়ে যাওয়া। অতএব, আজ আপনারও মৃত্যু।'

''হঠাৎ করে কামরার আলো নিভে যেতেই আমার দুটো পা থরথরিয়ে কাঁপতে লাগল। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, বাইরে একমাথা অন্ধকারে ডুবে আছে একটা মাঠ। কোনও স্টেশন নয়, তবু গাড়িটা থেমে আছে। লাইনের পাশে ঝাঁকড়ামাথা একটা গাছের মাথায় আটকে আছে কিছু জোনাকি। আমি এক পা, এক পা করে দরজার দিকে পিছোব নাকি?

''এরপর আর ভাববার কিছু ছিল না। কেউ একজন পিছন থেকে আমাকে জাপটে ধরে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে দিতেই, কেউ একজন প্রবল আর্ত চিৎকার করে উঠতেই গাড়িটা চলতে শুরু করল। নিজে থেকে কামরার বাতি জ্বলে উঠতেই আমি দেখলাম, হালদারবাবুর বুকে তীক্ষ্ণ একটি ছোরা বেঁধানো। কিন্তু ক্ষতস্থান থেকে রক্ত গড়াচ্ছে না। তাঁর পাশে পড়ে আছে [illegible]

দেহ। আমার মনে হল, তিনিই ওই বাড়ির বড়বাবু মহেন্দ্র হালদার। ভালুকের খোলসের পাশে যিনি পড়ে আছেন, তিনি অর্থাৎ তাঁর নাম বিরাজ হালদার, সম্পর্কে বড়বাবু মহেন্দ্র হালদারের খুড়তুতো ভাই।

''আমি হঠাৎ দেখলাম, চলন্ত গাড়ির জানলার শিক ধরে ভয়ংকর চেহারার একটা লোক আমার ট্রেনেরই জানলার রড ধরে ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছে আর বলছে, 'পাপের বেতন মৃত্যু! আমি সেই বেতন দিচ্ছি। তুই তোর দিদিমাকে বলিস, ওঁর বাক্স বোঝাই গয়নাগুলো আমাদের মন্দিরের বেদিতে লুকনো আছে। যেন বেদি ভেঙে ওটা বের করে নেন।'

''আমি জানতে চাইলাম, 'আপনি কে?'

''ওই ছায়ামূর্তি উত্তর দিলেন, 'তোর দাদামশাই। তোদের ভিটেয় এখনও আমার দিব্যি আনাগোনা। আসছে মাসের দশ তারিখ পূর্ণিমা। ওইদিন তোর দিদিমা আমার কাছে আসবে।'

''আমি বললাম, 'আপনার কাছে আসবেন মানে?'

''দাদামশাই উত্তর দিলেন, 'তোদের ভাষায়, মরব! ভূত, মানুষ, সভ্য-অসভ্য, সকলের জীবনের বৃদ্ধ বয়সটাই খুব খারাপ। এগোতে পারে না তো, তাই পিছনে পড়ে গিয়ে সকলের অবহেলা আর উপেক্ষা নিত্যদিন সইতে সইতে দিনযাপন করতে হয়। আর ঝুলতে পারছি না। মনে রাখিস, ভূতদেরও প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। এবার চলি!'

''জানলার সামনে থেকে একটা ধোঁয়ার পিণ্ড সরে গেল। আমি তখন বিমূঢ়। একদিন এইটুকু সময়ের মধ্যে যত রকমের ভূত আর তাদের কাহিনি শুনলাম এবং দেখলাম যে, তাতে নিজেই বুঝে উঠতে পারছি না, আমি আসলে কী?

২ মার্চ ২০০৮
অলংকরণ: দেবাশিস দেব

ভূতেরা সাঁতার জানে না

সমরেশ মজুমদার

ঝাড়িকাকুর কথা আমার লেখায় অনেকবার এসেছে। খাঁকি হাফপ্যান্ট পরা ছোটখাটো চেহারা, মাথাটা একটা বাতাবি লেবুর মতো কাঁধের উপর বসানো। দুটো গোল চোখ, একটু বোঁচা নাক, গালে দাড়ি কখনও জন্মায়নি। আমার যখন বছর দশেক বয়, তখন ঝাড়িকাকু পঞ্চাশ পেরিয়ে গিয়েছিল নিশ্চয়ই। পিসিমা বলতেন, ঝাড়িকাকু আর আমার বাবা সমবয়সি।

মাত্র আট বছর বয়সে ঝাড়িকাকু আমাদের বাড়িতে ফাইফরমাশ খাটতে আসে। তারপর থেকেই গিয়েছে আমাদের সঙ্গে। তিনকুলে নাকি ওর কেউ নেই। আলাদা সংসার করার কথা ভাবেনি। আমাদের চা বাগানের কোয়ার্টার্সে বিশাল বাগান ছিল। সেই বাগান পরিষ্কার রাখা, গাছের যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব ছিল ওর উপর। এ ছাড়া বাড়ির সব এঁটো বাসন নিয়ে পিছনের না-ঝরনা না-নদীতে গিয়ে মেজে ফেলা ওর নিত্যদিনের নেশা। পিসিমা নিষেধ করলেও ও শুনত না। বাসনগুলো ঝকমকিয়ে না ওঠা পর্যন্ত ওর স্বস্তি হত না।

বাগানের এক প্রান্তে ছিল বাতাবি লেবুর গাছ। প্রচুর বাতাবি লেবু হত। খেয়ে শেষ করা যেত না। আমরা যারা মাঠে ফুটবল খেলতাম, বল খারাপ হয়ে গেলে ঝাড়িকাকুর কাছে বাতাবি লেবু চাইতাম। ডাঁসা বাতাবি লেবু চমৎকার ফুটবলের কাজ করত। কিন্তু ঝাড়িকাকু কিছুতেই দিত না। খাওয়ার ফলকে পা দিয়ে লাথি মারা সে পছন্দ করত না। এমনকী, আমাকেও 'না' বলত। ফলে অন্য ছেলেরা ঝাড়িকাকুর পিছনে লাগত। তাতে খেপে যেত সে। খেপে গেলে ছেলেরা মজা পেত। পিসিমা আমাকে বলতেন ছেলেদের নিষেধ করতে। কিন্তু আমার কথা তারা শুনবে কেন?

একদিন সন্ধের পর শুনলাম, ঝাড়িকাকু একা বসে খুব রাগী গলায় কিছু বলছে। নিজের সঙ্গে কী কথা বলছে শুনতে পা টিপে টিপে পিছনে গেলাম। শুনতে পেলাম, "এতদিন কিছু বলিনি। এবার বুঝিয়ে দেব। আমি পাগল? তোরা এবার পাগল হবি। খোকনকে বলব তোদের ব্যবস্থা করতে। হুঁ!"

"খোকন কে ঝাড়িকাকু?" না জিজ্ঞেস করে পারলাম না।

ঝাড়িকাকু আমাকে দেখে বলল, "কাল তুমি খেলতে যাবে না।"

"ঠিক আছে, যাব না। কিন্তু খোকন কে?"

মুখ ঘুরিয়ে ঝাড়িকাকু বলল, "পাতিবাবুর ছেলে।"

মনে পড়ল। চা গাছের পাতা তোলানোর দায়িত্বে যে কর্মচারী থাকেন, তাঁকে 'পাতিবাবু' বলা হয়। আমাদের পরে তিনটে কোয়ার্টার্স ছেড়ে তাঁর কোয়ার্টার্স। কিন্তু তাঁর ছেলে খোকন তো আম পাড়তে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে মারা গিয়েছে। "তাকে কী করে ব্যবস্থা নিতে বলবে?"

প্রশ্নটা করতেই ঝাড়িকাকু হাসল, "তোকে বলব না। তুই বড় পেটআলগা।"

"বিশ্বাস করো, আমি কাউকে বলব না।"

"তা হলে আমাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর।"

তাই করলাম। তখন ঝাড়িকাকু নিচু গলায় বলল,

"খোকনের সঙ্গে আমার রোজ রাতে দেখা হয়। **ওর** সব ভাল, কিন্তু মাছ খেতে চেয়ে না পেলে রেগে যায়।"

"ও তো মরে গিয়েছে। শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছে ওকে।"

"তা আমি জানি না নাকি? আমিও তো শ্মশানে গিয়েছিলাম।"

"তা হলে?" আমার চোখ বড় হয়ে গিয়েছিল।

"তা হলে আবার কী? ভগবান ওকে স্বর্গে নিয়ে যাননি। তাই ও এখানেই থেকে গিয়েছে। নদীর ধারে যে বিরাট কুলগাছটা, ওখানেই ওর বাসা।"

"কুলগাছে বাসা? ও কি এখন ভূত?"

"চুপ!" চাপা ধমকাল ঝাড়িকাকু। "রাতবিরেতে ওই শব্দটা একদম বলবি না। খোকন আমাকে কিছু না-ও বলতে পারে, কিন্তু অন্যরা ছাড়বে কেন?"

"অন্যেরা মানে?"

"খোকনের মতো যারা গাছে গাছে বাসা করে আছে।"

সেদিন আমি ভয়ে ভয়ে বাড়ির সবক'টা গাছ দেখেছি। কোথাও তাদের বাসা দেখতে পাইনি। পরের দিন বিকেলে দেখলাম, ঝাড়িকাকু নিজেই একটা মাঝারি বাতাবি লেবু নিয়ে আমার বন্ধুদের দিয়ে এল খেলতে। যাওয়ার আগে আমাকে বলেছিল, "তুই আজ খেলবি না। শুধু দেখবি।"

ওরা খেলা শুরু করল খুশি মনে। দিপু বাতাবি লেবুটাকে কিক মারল গোল লক্ষ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে সেটা ঘুরে গিয়ে বিশুর ডান হাঁটুতে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে বিশু বাইরে চলে এল। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই খেলা বন্ধ হয়ে গেল। গোল লক্ষ্য করে কিক মারলেই বাতাবি লেবু ঘুরে গিয়ে কাউকে না-কাউকে আহত করছে। শেষবার তো গোবিন্দের মারা বাতাবি লেবু সোজা উপরে উঠে ওর মাথায় নেমে এসেছিল। কোনও মতে মাথা বাঁচিয়েছিল সে, কাঁধে এসে পড়েছিল ওটা। সকলেই বুঝতে পেরেছিল বাতাবি লেবু নিজের মতো চলছে।

ঝাড়িকাকু হেসে বলল, "এই জন্যে তোদের আমি বাতাবি লেবু দিতে চাই না।"

যদিও কারও হাড় ভাঙেনি, কিন্তু ব্যান্ডেজ বেঁধে খোঁড়াতে হয়েছিল কিছুদিন।

পরে ঝাড়িকাকুকে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "এটা কী করে করলে?"

"আমি কী করে করব?" ঝাড়িকাকু মাথা নেড়েছিল, "যা করার খোকন করেছে।"

"খোকন?"
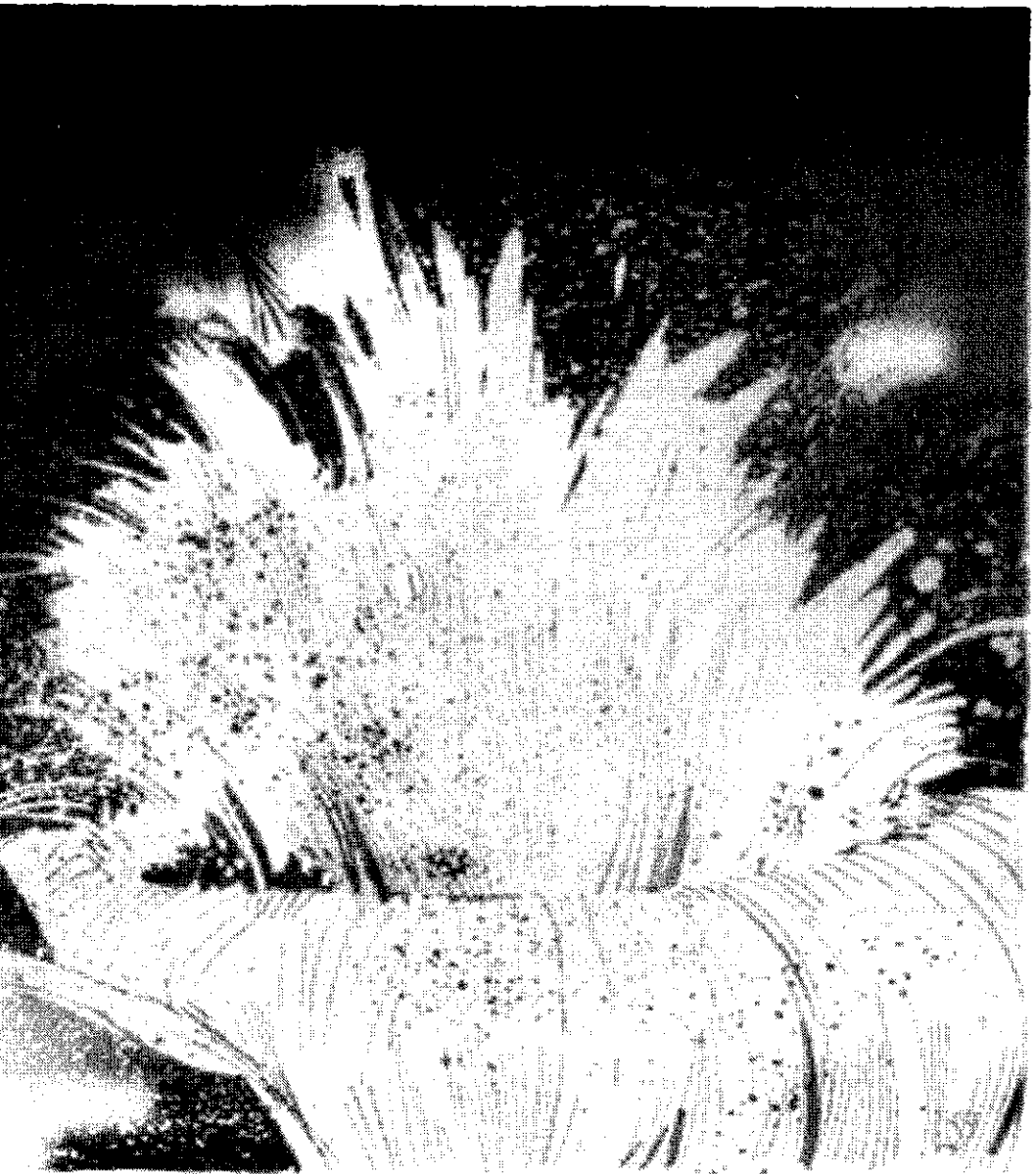
"হ্যাঁ। কাল রাতে ওকে বলেছিলাম সব। তাই আমার পিছনে লাগার শাস্তি দিয়েছে।" ঝাড়িকাকু বলল, "কিন্তু ও বলেছিল কাজটা হয়ে গেলে আমি যেন ওকে মাছভাজা খাওয়াই।"

"মাছভাজা?"

"হ্যাঁ। বড়দিদিকে বলব আজ রাতে ঝোলের মাছ খাব না, মাছভাজা খাব। সেটা দিয়ে দেব।"

ঝাড়িকাকু আর খোকনের মধ্যে কী কী কথা হচ্ছে তা জানতে খুব ইচ্ছে হত। কিন্তু ক'দিন ধরে ওকে একদম একা পাচ্ছিলাম না। আজ দুপুরে অঙ্ক কষতে গিয়ে খেয়াল হল, খোকন তো অনেক কিছু পারে। পরীক্ষায় কী অঙ্ক আসবে তা বলতে পারবে?

আমাদের বাগানে একটা বাতিল চৌবাচ্চা ছিল। ঝাড়িকাকু সেখানে ব্যাঙ ধরে রাখত। মাঝে মাঝে

ডুড়ুয়া নদীতে মাছ ধরতে যেত সে। তখন ওই ব্যাঙগুলোকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করত। একটু পরেই ঝাড়িকাকুকে দেখলাম, চৌবাচ্চায় জল ঢালছে।

একা পেয়ে মনের বাসনা তাকে জানালাম। সব শুনে ঝাড়িকাকু বলল, ''তোর পরীক্ষার অঙ্ক ও কী করে বলবে? ও তো তোর ক্লাস পর্যন্ত পড়েনি?''

''আহা, ও না পড়লেও, যারা পড়েছে তাদের কাছ থেকে যদি জেনে দেয়?''

''দেখি কথা বলে।'' ঝাড়িকাকু দার্শনিকের মতো বলল।

পরের দিন ভোরে বিছানা থেকে উঠেই ছুটে গেলাম ওর ঘরে। ঘুম ভাঙালাম। ঝাড়িকাকু বলল, ''তোর জন্যে বিপদে পড়লাম রে!''

''কেন?''

''সব শুনে ও বলল এ তো খুব সহজ। সতীশমাস্টারকে বললেই জানা যাবে।''

''সতীশমাস্টার তো আমাদের অঙ্কের স্যার ছিলেন। বাস চাপা পড়ে মারা যান।''

''হ্যাঁ। তাঁর সঙ্গে খোকনের নাকি তেমন ভাব নেই। খুব লোভী হয়ে গিয়েছেন এখন। তাই খোকন বলল, একটা খোকা ইলিশ না দিলে সতীশমাস্টার মুখ খুলবেন না। মাছটা দিয়ে দেবে খোকন, অথচ নিজে কিছু পাবে না, তা হয় না। অতএব ওকেও একটা খোকা ইলিশ দিতে হবে। এখন এই জোড়া খোকা ইলিশ কোথায় পাই!''

দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। বললাম, ''একটা দিলে ওঁরা ভাগাভাগি করে নিতে পারবেন না?''

''নাঃ। মানুষের মতো ওঁরা ভাগাভাগিতে নেই।''

আমাদের চা বাগানে তখন সপ্তাহে একদিন হাট বসত। বাবা চালানি মাছের চেয়ে কাছাকাছি নদীর মাছ পছন্দ করতেন। বর্ষার সময় ইলিশ অবশ্যই কিনতেন। কিন্তু তারপরে নয়। সকালে ঝাড়িকাকু হাট থেকে ঘুরে এসে বলল, ''খোকা ইলিশ এসেছে। একটু নরমের দাম সস্তা, না হলে দুটো ছ'টাকা চাইল।''

বললাম, ''নরম মাছের গন্ধ পেলে ওঁরা রেগে যাবেন।''

অনেক দিনের জমানো সিকি-আধুলিতে ছ'টাকা গুনে ঝাড়িকাকুকে দিয়ে দিলাম। ও যখন জোড়া খোকা ইলিশ নিয়ে এল, তখন এক ফাঁকে দেখে এলাম। সঙ্গে অনেকটা বরফ নিয়ে এসেছে। বরফে চাপা দিয়ে রাখলে মাছ পচবে না।

রাত দশটার পর ঝাড়িকাকু বাসন নিয়ে নদীতে যাবে মাজতে। সেই সময় আমার ঘুমিয়ে পড়ার কথা। মা-পিসিমাকে বললে কিছুতেই অনুমতি পাওয়া যাবে না। তাই বাবার কাছে আবদার করতে লাগলাম, ''ঝাড়িকাকু নদীতে মাছ ধরবে রাতে, তাই দেখব!''

বাবা বললেন, ''ঝাড়ি তো ডুড়ুয়ায় মাছ ধরতে যায়। এই ঝরনায় কী মাছ ধরবে?''

বললাম, ''পাথরঠোকা মাছ।''

বাবার খুব প্রিয় এই মাছটি শুধু ঝরনায় পাওয়া যায়। বাজারে বিক্রি হয় না। ঝরনার পাথরে জমা শ্যাওলা খেয়ে বেঁচে থাকে ওরা। মেছোরা ঝরনা থেকে ধরতে পারলে এ বাড়িতে বিক্রি করে যায়।

বাবা বললেন, ''ঠিক আছে, যাও! কিন্তু এগারোটার মধ্যে বাড়ি যেন তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। আর খবরদার, জলে নামবে না।''

পিসিমা এবং মা বাবাকে বকাবকি করলেও আমার যাওয়া আটকাল না।

বাড়ির পিছনে গোয়ালঘরের পাশ দিয়ে সজনের জঙ্গলের মধ্যে বাসন হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঝাড়িকাকু বলল, ''তোকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি বলে রেগে না যায়!''

''খোকন তো আমাকে চিনত। রাগ করবে কেন?''

''এখন তো ওরা অন্য জগতের লোক।''

গা ছমছম নির্জন হাঁটুজলের নদী তরতর করে বয়ে যাচ্ছে। দু'পাশে কুল, আসশেওড়ার গাছ। একটা সিমেন্টের স্ল্যাবের উপর বাসন রেখে ঝাড়িকাকু বলল, ''ও খোকন, তুই যার উপকার করবি, সে নিজের হাতে তোকে মাছ দিতে এসেছে। তুই কোথায়? জোড়া খোকা ইলিশ এনেছি আমরা।''

থালার ঢাকা সরিয়ে মাছ দেখাল সে।

কোথাও ঝিঁঝিপোকার শব্দ ছাড়া কোনও আওয়াজ নেই।

ঝাড়িকাকু জিজ্ঞেস করল, ''শুনতে পেলি?''

মাথা নাড়লাম, ''না তো!''

"জিজ্ঞেস করল, 'পচা নয় তো?''' তারপর মুখ ফিরিয়ে জলের উপর ঝুঁকে থাকা কুলগাছটার দিকে তাকিয়ে বলল, ''পচা কেন হবে? পুরো দাম দিয়ে কেনা।''

''বেশ! নে, ছুড়ে দিচ্ছি। একটা ধর।'' ঝাড়িকাকু একটা মাছ কুলগাছের দিকে ছুড়ে দিতে আমার মনে হল, সেটা গাছের ডালে আটকে গেল। অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছি না ভাল।

ঝাড়িকাকু বলল, ''ছুড়ে দিতে বলল। আগে সতীশমাস্টারকে সন্তুষ্ট করে প্রশ্ন জেনে এসে নিজেরটা পেলে তোকে জানিয়ে দেবে।'' বলতে বলতে মুখ ফেরাল, ''জেনে এসেছিস? বাঃ। নে, তোরটা ধর।''

ঝাড়িকাকু দ্বিতীয় খোকা ইলিশটা ছুড়ল। কুলগাছের ডগায় লেগে সেটা ঝরনার জলে পড়ার সময় মনে হল, কেউ যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়িকাকু চিৎকার করে উঠল, ''এঃ হে! ধরতে পারলি না? জলে পড়ে গেলি যে! ওঠ ওঠ! অ্যাঁ, সাঁতার জানিস না? ওরে খোকন, তুই ভেসে যাচ্ছিস যে!''

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ''ছেলেটার আবার সর্বনাশ হয়ে গেল রে! ক্যাচ ধরতে না পেরে জলে পড়ে ভাসতে ভাসতে ডুবে গেল। তোকে প্রশ্নগুলো আর কোনওদিন জানাতে পারবে না!''

''ও ডুবে গেল? ওইটুকু জলে?'' আমি দেখার চেষ্টা করছিলাম।

''হুঁঃ। এটুখানি তো শরীর! তাই ওরা সাঁতরাতে পারে না!'' করুণ গলায় বলল ঝাড়িকাকু।

২ মার্চ ২০০৮

অলংকরণ: অনুপ রায়
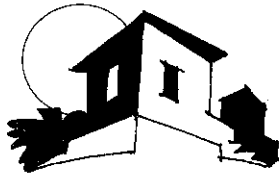
ভূতের মেলায়

শিশির বিশ্বাস

পুজোয় আশ্বিনের ভোর এই শালটিলার দেশে একেবারেই অন্যরকম। শিশিরভেজা নির্জন, নিস্তব্ধ পথের পাশে কেঁদ, পলাশের জঙ্গল। বুনোফুলের বাহার। হঠাৎই দু'-একটা পাখির ডাক। যেন অন্য এক জগৎ। বেলা বাড়ে তারপর। খুব যে একটা বদল হয় এমন নয়। দু'-একজন মানুষের আওয়াজ পাওয়া যায়, এই মাত্র। তবু তিনটে দিন কোথা দিয়ে যে পার হয়ে গেল টেরই পেল না কেউ। বছর কয়েক হল, এই সময় হিমাদ্রিবাবু তাঁর দুই ছেলেমেয়ে সুজাতা আর সন্তুকে নিয়ে বেড়াতে বের হন। পুজোর এই কয়েকটা দিন নিরিবিলিতে কাটিয়ে আসেন কোথাও। অথচ একসময় এমনটা ভাবতেও পারতেন না তিনি। স্ত্রী সুলেখাদেবী তখন বেঁচে। সেই সময় পুজোর এই ক'টা দিন প্রায় আনন্দের হাট বসত বাড়িতে। প্রতিদিনই কোনও আত্মীয় নয়তো বন্ধুবান্ধব আসতেন। দিনভর হইহই। স্ত্রী সুলেখা একাই সামাল দিতেন সব। হিমাদ্রিবাবুকে ভাবতে হয়নি কখনও। কলেজে অধ্যাপনা করেন। বাড়িতে সারাদিনই পড়ে থাকেন বইপত্র নিয়ে। সংসারের সব ব্যাপার স্ত্রী-ই সামাল দিতেন তখন। ছোট দু'টি ছেলেমেয়ে রেখে সেই স্ত্রী হঠাৎ মারা যেতে প্রায় অকূলপাথারে পড়ে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক। এই পুজোর দিনগুলো বড় ভয়ানক মনে হত একসময়। বাবাকে দেখে মেয়ে সুজাতাই শেষে পরামর্শটা দিয়েছিল, ''চলো না বাবা। পুজোর ক'টা দিন বেড়িয়ে আসি কোথাও।''

সুজাতার বয়স তখন মাত্র আট। তবু কথাটা মনে ধরেছিল হিমাদ্রিবাবুর। চিন্তায় পড়েছিলেন দেড় বছরের সন্তুর কথা ভেবে। বলেছিলেন, ''সন্তুকে নিয়ে অসুবিধে হবে না তো মা?''

কিন্তু কানেই নেয়নি মেয়েটা। মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল, "তুমি কিচ্ছু ভেবো না বাবা। ভাইকে ঠিক দেখতে পারব আমি।"

এটা যে শুধু কথার কথা নয়, জানতেন হিমাদ্রিবাবু। কাজের মানুষ বাড়িতে একজন রয়েছে বটে, তবে যতক্ষণ বাড়ি থাকে পড়াশোনার ফাঁকে ছোট ভাইটিকে প্রায় মায়ের মমতায় আগলে রাখে সুজাতা। তাই মেয়ের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত। তো সেসব বেশ কয়েক বছর আগের কথা। সুজাতা ষোলোয় পড়ল এবার। স্ত্রী মারা যেতে একসময় হঠাৎ যে সমস্যায় পড়েছিলেন, তার অনেকটাই এখন সামলে উঠেছেন তিনি। সংসারের খুঁটিনাটি নিয়ে এখন আর ভাবতে হয় না তেমন। পড়াশোনার ফাঁকে সেসব মেয়ে সুজাতাই সামলায়। কতকটা মায়ের স্বভাব পেয়েছে মেয়েটা। তবে পুজোয় বেড়াতে যাওয়ার এই অভ্যেসটা রয়েই গিয়েছে। এবছর ম্যাকলাস্কিগঞ্জে বেড়াতে আসার পরিকল্পনা সুজাতারই। খোঁজখবর নিয়ে কলকাতা থেকে চমৎকার এই গেস্ট হাউসটাও বুক করেছে ও। তারপর বরাবরের মতো গোছগাছ। হিমাদ্রিবাবুকে ভাবতেও হয়নি কিছু।

সপ্তমীর দুপুরে এসে পৌঁছেছেন। স্টেশন থেকে একটু ভিতরে গেস্ট হাউসটা। মাইল দেড়েক পথের অনেকটাই শাল, সেগুন, মহুয়া আর বাঁশগাছে ঘেরা। নাম না জানা হরেক বুনো ফুল। দূরে সবুজ

কালো পাহাড়ের সারি। নির্জন নিরিবিলি পায়েহাঁটা পথে সে এক অভিজ্ঞতা। ঝুপ করে সন্ধে নামার পর আর-এক রোমাঞ্চ। গেস্ট-হাউসের কাজের মানুষ হরিয়া টিমটিমে কেরোসিন ল্যাম্পটা জ্বেলে দিয়ে যায় ঘরে। পিছনে পলাশ আর ঝাঁটি জঙ্গলে শিয়ালের কোরাস, ঝিঁঝির কনসার্ট। রাত একটু গভীর হলে হঠাৎ রাতজাগা পাখির চিৎকার। সব মিলিয়ে মনে হয়, সারা জঙ্গলটাই বুঝি ঢুকে পড়েছে ঘরের ভিতর। তিনটে দিন যে কোথা দিয়ে পার হয়ে গেল বুঝতেই পারেনি কেউ।

আজ দশমী। প্রতিদিনের মতো ভোরে আজও বের হয়ে পড়েছেন তিনজন। ছোট্ট রেলস্টেশনটা প্রায় ছবির মতো। প্রতিদিন ভোরে হাঁটতে হাঁটতে এখানে চলে আসেন সকলে। প্ল্যাটফর্মের ধারে মস্ত এক শালগাছের তলায় ভজনলালের ঠেকে চা খেয়েছিলেন ওঁরা। খোঁজ নিয়েছিলেন গেস্ট-হাউসের। মাঝবয়সি ভজনলালের বাড়ি রাঁচির ওদিকে। বছর কয়েক হল এসেছে ওখানে। আদা, তেজপাতা দিয়ে চমৎকার চা খাইয়েছিল। শুধু তাই নয়, দোকানের কাজের ছেলেটাকেও সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল গেস্ট-হাউসে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। সেই থেকে রোজ ভোরে চা খেতে এখানে চলে আসতেন তিনজন। চা শেষ হওয়ার ফাঁকেই তৈরি হয়ে যায় গরম তেলেভাজা। বড় শালপাতার ঠোঙায় তারপর হাতে হাতে চলে আসে মুড়ি আর তেলেভাজা। সকালের জলখাবারের পাট শেষ করে এরপর বের হয়ে পড়েন সকলে।

কোন দিকে যাওয়া হবে সেই খোঁজ সুজাতা নয়তো সন্তু নিয়ে রাখে আগে থেকেই। হিমাদ্রিবাবু মাথা ঘামান না কখনও। এক সকালে গিয়েছিলেন চাট্টি নদীর দিকে। ছোট্ট এক নদী, গাছপালা ঝোপঝাড়ের ফাঁকে বয়ে চলেছে তিরতির করে। কাচের মতো জলে মুখ দেখা যায়। গত কাল গিয়েছিলেন জঙ্গলের পথে এক ভূতের বাড়ি দেখতে। জঙ্গল পেরিয়ে মাঠের মাঝে এক ভাঙাচোরা বাড়ি। ছাদের অনেকটাই প্রায় ভেঙে পড়েছে। দেওয়ালের কিছুটা টিকে থাকলেও আগাছার ভিড়ে কাছে যাওয়াই মুশকিল। রীতিমতো ভৌতিক পরিবেশ। কেউ বলে, এটাই নাকি ম্যাকলাস্কিসাহেবের বাড়ি ছিল একসময়। স্থানীয় মানুষের কাছে এখন অবশ্য ভূতের বাড়ি।

আগামী কালই ফিরতে হবে কলকাতায়। আজ তাই একটু তাড়াতাড়িই চলে এসেছিলেন ভজনলালের দোকানে। এসেই দেখলেন, আজ আর তেলেভাজা নয়। জিলিপি ভাজার তোড়জোড় চলছে। দেখে অবাক হয়ে সুজাতা বলল, ‘‘ও ভজনদা, হঠাৎ কী ব্যাপার? আজ যে জিলিপি হচ্ছে?’’

রাঁচির মানুষ ভজনলাল বাংলা ভালই জানে। রসিক মানুষ গোঁফের ফাঁকে মুচকি হেসে বলল, ‘‘সে এক্ষুনি দেখতে পাবে দিদিমণি। আজ যে ভূতের মেলা এখানে। তাই একটু মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা!’’

‘‘ভূতের মেলা! সে কী জিনিস ভজনদা?’’ সুজাতা নয়। পাশ থেকে নড়েচড়ে উঠল সন্তু।

‘‘ভূতের মেলা মানে ভূতের মেলা।’’ ফের মুচকি হাসল ভজনলাল। ‘‘বলি একটু সবুর করো ছোটবাবু। নিজের চোখেই দেখতে পাবে।’’

তা বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। হাতের মুড়ি-জিলিপির ঠোঙা তখনও শেষ হয়নি। সকালের ট্রেন গমগম শব্দে এসে থামল। দিনভর ঝিম মেরে থাকা প্ল্যাটফর্ম এই সময়েই চঞ্চল হয়ে ওঠে একটু। তাও মাত্র মিনিট খানেকের জন্য। তারপরেই ফের নিস্তব্ধ। কিন্তু আজ হঠাৎ পালটে গেল সব। ট্রেন থামতেই হইহই করে এক দঙ্গল মেয়েপুরুষ, সঙ্গে ছেলেমেয়ে, লাফিয়ে নামতে শুরু করল ট্রেন থেকে। সঙ্গে বোঁচকা-বুঁচকিও কম নয়। ছোট প্ল্যাটফর্ম, ভরতি হয়ে গেল দেখতে দেখতে। মিশকালো রঙের মানুষগুলোর গায়ে রকমারি সাজ। কারও গায়ে নানারঙের তালি দেওয়া লম্বা ঢোলা পোশাক। গলায় হরেকরকমের রঙিন পুঁতির মালা। কারও মাথায় রঙিন পালকের টুপি। পায়ে ঘুঙুর বাঁধা মিশকালো শরীরে ভুসোকালি মেখে এসেছে। হাড় জিরজিরে বুকের উপর পাঁজরের হাড়গুলো চুনের দাগে খোলতাই হয়েছে আরও। চুনের দাগ সারা

মুখেও। ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমেই তারা দাপাদাপি জুড়ে দিল প্ল্যাটফর্মে।

"কী ছোটবাবু, বলেছিলাম না, এই হল সেই ভূতের দল।" গরম তেলে দ্রুতহাতে জিলিপি ছাড়তে ছাড়তে বলল ভজনলাল, "এই দিনে কাছেই ওদের মেলা বসে একটা।"

সন্তুর সব আবদার দিদির কাছে। চোখ বড় বড় করে বলল, "দিদি রে, চল ভূতের মেলায় যাই আজ।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ দিদিমণি, আজ ভূতের মেলাই ঘুরে আসুন বরং। এ জিনিস কলকাতাতেও পাবেন না।" সন্তুর কথায় সায় দিয়ে ভজনলাল বলল।

ভজনলালের কথায় হেসে ফেললেও জলখাবার শেষ হতে সকলেই বেরিয়ে পড়লেন ভূতের মেলা দেখতে। খানিক এগোতেই দেখলেন, মেঠোপথ ধরে শুধু মানুষ আর মানুষ। এই সকালে পায়ে হেঁটে দূরের গ্রাম থেকেও এসেছে অনেকে। চলেছে ভূতের মেলা দেখতে। কালো দেহাতি মানুষ। কিচকিচ করে ভুতুড়ে ভাষায় কথা বলে চলেছে অনর্গল। খুশিতে গান জুড়েছে কেউ। পথের পাশ থেকে বুনো ফুলের গোছা ভেঙে খোঁপায় গুঁজে নিয়েছে অনেক মেয়ে। তাদের কানভরতি রুপোর একগোছা দুল ভোরের রোদে ঝিলিক দিয়ে উঠছে। খানিক পর ওঁরা যখন মেলার মাঠে এসে পৌঁছলেন, ভূতের মেলা তখন জমে উঠেছে বেশ। পশরা সাজিয়ে এই সকালেই বসে পড়েছে ব্যাপারীর দল। সস্তা রঙিন চুড়ি আর নানারঙের পুঁতির মালা। মাটির হাঁড়িকুঁড়ি আর বাসনপত্র। রংচং মেখে গোটা কয়েক ভূত কষে ঢাক বাজাচ্ছে এক জায়গায়। মেলা থেকে সদ্য এক খেলনা-ঢাক কিনে তাদের সঙ্গে তোড়ে তাল দিয়ে চলেছে ছোট একটা ছেলে। খুশি উপচে পড়ছে চোখেমুখে।

এক পাশে দড়ির খেলা দেখাচ্ছে কয়েকটা ভূত। উঁচুতে দড়ির উপর দিয়ে দিব্যি এক পায়ে লাফাচ্ছে। হাঁটছে অবলীলায়। নীচে গোটা কয়েক ভূত তখন বাজনার তালে তিড়িংবিড়িং করে লাফাচ্ছে। হাততালি পড়ছে ঘন ঘন। পয়সা পড়ছে। সেগুলো। কুড়িয়ে নি[illegible] সুজাতাও ব্যাগ খুলে পয়সা দি[illegible]। তারপর হঠাৎই চোখ পড়ল, খানিক দূরের দুটো ছেলেমেয়ের দিকে। ছেলেটি সন্তুরই সমবয়সি। বছর দশেকের মতো। সারা গায়ে ভুসোকালি মেখে তিড়িংবিড়িং করে ডিগবাজি খেয়ে ভূতের নাচ দেখাচ্ছে। মেয়েটি কিছু বড়। বোধহয় ছেলেটির দিদি। লাঠির মাথায় বাঁধা গোটা কয়েক টিনের চাকতি ঝাঁকিয়ে বাজাতে বাজাতে দেহাতি ভাষায় চিৎকার করে চলেছে। সুজাতা বলল, "চল ভাই, ওদিকে ছোট এক ভূত খেলা দেখাচ্ছে। দেখে আসি।"

দিদির কথায় সন্তু তাকিয়ে নিরাশই হল একটু। ছোট ভূতের খেলা মোটেই আহামরি নয় এমন। দর্শকও নেই কেউ। তার চেয়ে ঢের ভাল এই বড় ভূতের দলের খেলা। তবু দিদির তাড়ায় যেতেই হল। এসব ব্যাপারে হিমাদ্রিবাবুর মতামত নেই কিছু। তিনিও পিছনে চললেন।

ওরা কাছে যেতেই উৎসাহে আরও লাফালাফি জুড়ল ছেলেটি। মেয়েটাও জোরে বাজাতে লাগল। সুজাতা তার মধ্যেই মেয়েটিকে বলল, "ও তোমার ভাই বুঝি?"

সুজাতার হঠাৎ ওই কথায় ফ্যালফ্যাল করে খানিক তাকিয়ে রইল মেয়েটি। সম্ভবত বুঝতে সময় লাগল একটু। তারপর মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ গো, দিদিয়া।"

এর পর ভাইবোনে কী পরামর্শ হল একটু। পাশেই হাত দশেক লম্বা একটা বাঁশ। মেয়েটি সেটা দু'হাতে সোজা করে মাটিতে ধরতেই ছেলেটি তরতরিয়ে উঠে পড়ল একদম ডগায়। তারপর বার কয়েকের চেষ্টায় এক পায়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সেই বাঁশের মাথার উপর। হাত দুটো দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিক। তারপর হঠাৎ দু'হাত মুখে ঢুকিয়ে সিটি দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে লাফ দিল শূন্যে। নীচে তৈরি হয়ে ছিল মেয়েটি। মুহূর্তে বাঁশটা ছেড়ে দু'হাতে লুফে নিল ছেলেটিকে। দেখে দু'হাতে তালি দিয়ে উঠল সন্তু। উৎসাহ পেয়ে ছেলেটি আবার উঠতে যাচ্ছিল বাঁশ বেয়ে। কিন্তু

বাধা দিয়ে সুজাতা বলল, ''না ভাই, থাক। আর দেখাতে হবে না।''

ব্যাগ খুলে পাঁচ টাকার একটা কয়েন বের করে এরপর ও এগিয়ে দিল মেয়েটির দিকে, ''নাও ভাই, বকশিশ।''

বাধা পেয়ে একটু মুষড়ে পড়েছিল দু'জনে। ভেবেছিল, দিদিমণির বোধহয় ভাল লাগেনি খেলা। মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখগুলো। দেহাতি গরিবগুর্বো মানুষের মেলা। খুচরো পয়সা, বড়জোর সিকি-আধুলির বেশি কেউ দেয় না কখনও। একসঙ্গে পাঁচ-পাঁচটা টাকা হাতে পেয়ে কোনও কথাই সরল না মুখে। হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিয়ে তাকিয়ে রইল ফ্যালফ্যাল করে।

মেলায় আরও কিছুক্ষণ ঘোরা হল এরপর। আগ্রহ সন্তুরই বেশি। উৎসাহে ঘুরে বেড়াচ্ছে এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায়। আনন্দে সুজাতাও ঘুরছে ভাইয়ের সঙ্গে। ইতিমধ্যে ভোরের সূর্য চড়ে উঠেছে অনেকটাই। হঠাৎ বাবার মুখের দিকে চোখ পড়তে হুঁশ হল সুজাতার। হাজার হোক, বয়স হয়েছে মানুষটির। পারছেন না আর। কিন্তু সে কথা কখনওই বলবেন না মানুষটি। বাবা যেন শুনতে না পান, গলা নামিয়ে সন্তুকে বলল, ''চল ভাই, ফিরে যাই এবার। বাবার কষ্ট হচ্ছে খুব।''

একটু নিরাশ হলেও সন্তু বলল, ''তাই চল, দিদি। বিকেলে আসবি তো আবার? শুনলি না, সকলে বলছে, বিকেলে নাকি আসল ভূতের নাচ হবে এখানে।''

ভাইয়ের কথায় হেসে ফেলে সুজাতা বলল, ''ঠিক আছে রে পাগলা! বিকেলে আবার আসব।''

সন্তুকে নিরাশ করেনি সুজাতা। বিকেলে ফের বের হয়ে পড়েছিল ওকে নিয়ে। টানা কয়েকটা দিন সকাল-বিকেল ঘুরে হিমাদ্রিবাবু আজ একটু ক্লান্তই বলা চলে। তবু আসতে চেয়েছিলেন সঙ্গে। কিন্তু বাবার অবস্থা অনুমান করে সুজাতাই রাজি হয়নি। তা ছাড়া এই কয়েকদিনে বেশ ভালই চেনা হয়ে গিয়েছে পথঘাট। বলেছে, ''দরকার নেই বাবা। তুমি বিশ্রাম [illegible] পর হরিয়াকে পাঠিয়ে দিয়ো বরং।''

তো তাই হয়েছে। হিমাদ্রিবাবু আর আসেননি সঙ্গে। মেলার মাঠে এসে কিন্তু একটু নিরাশই হয়ে পড়ল সন্তু। দেহাতি গ্রামের মেলা। বিকেল হতেই প্রায় ভাঙা হাট। জিনিসপত্র গুটিয়ে ফেলতে শুরু করেছে কেউ কেউ। দিনভর হইহই করে দূরের গ্রামের পথ ধরেছে অনেকে। তবু সেই ভাঙা মেলাতেই ঘোরা হল কিছুক্ষণ। সূর্য ততক্ষণে ঢলে পড়েছে আরও। বিজয়া দশমীর বিকেলে পশ্চিম আকাশে হঠাৎ মুঠো মুঠো আবির ছড়িয়ে দিয়েছে কেউ। আকাশে অল্প মেঘও জমতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে। সেদিকে চোখ পড়তে সুজাতা প্রমাদ গনল একটু। এদিকে হরিয়ারও দেখা নেই। সন্তুকে নিয়ে ফেরার পথ ধরবে, হঠাৎ চোখ পড়ল একটি দোকানের দিকে। মেলার মাঠে জামাকাপড়ের পশরা সাজিয়ে বসে আছে এক ব্যাপারী। সামনে সকালের সেই ছেলেমেয়ে দুটো। সস্তা একটা চাদর মেলে ধরে খুশিতে পরখ করতে করতে দোকানদারের সঙ্গে কথা বলছিল মেয়েটি। এবার ভয়ে ভয়ে হাতের থলে উপুড় করে দিল দোকানির সামনে। ততক্ষণে সুজাতা কাছে এসে পড়েছে আরও। ও দেখতে পেল, থলে থেকে গড়িয়ে পড়ল সকালে দেওয়া সেই পাঁচটা টাকা আর সামান্য কিছু খুচরো পয়সা। বোঝা যায় সারাদিনে তারপর তেমন কিছুই আর উপায় হয়নি ওদের। থলে থেকে ওই সামান্য ক'টা টাকা বেরোতে দেখে দোকানদার খেপে গেল হঠাৎ। এতক্ষণ দরদামের পর তার বুঝতে তখন বাকি নেই, বাজে খদ্দেরের পাল্লায় পড়ে সময়টাই বরবাদ। ভয়ানক রেগে হাত-পা ছুড়ে চেঁচিয়ে উঠে ভাগিয়ে দিল ওদের। দোকানদারের সেই রুদ্রমূর্তি দেখে পয়সা ক'টা কুড়িয়ে নিয়ে ভয়ে ভয়ে খানিক দূরে গিয়ে দাঁড়াল দু'জন। করুণ চোখে তাকিয়ে রইল দোকানের সেই চাদরটার দিকে।

আকাশে মেঘটা ভারী হয়ে আসছে ক্রমশ। বৃষ্টি আসবে হয়তো। পাশ দিয়ে দ্রুত চলতে গিয়েও হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সুজাতা। এগিয়ে গেল সেই দোকানটার দিকে। ওদের দেখেই ব্যস্ত হয়ে উঠল দোকানের লোকটি। তাড়াতাড়ি হাতের সেই চাদরটা

গুছিয়ে তুলে অন্য জিনিস দেখাতে যাবে, সুজাতা বলল, "ওটার দাম কত ভাই?"

"এ আপনাদের জন্য নেহি দিদিমণি।" ভাঙা হিন্দি-বাংলা মিশিয়ে কাঁচুমাচু মুখে বলল লোকটি, "তব আচ্ছা জিনিস ভি আছে আমার কাছে। দিখাচ্ছি।"

"আমার কিন্তু ওটাই চাই ভাই। দাম কত?" সুজাতা বলল।

"এইটাই লিবেন?" একটু অবাক হয়েই এবার সুজাতার দিকে তাকাল লোকটি। তারপর বলল, "পনেরো রুপিয়া দিদিমণি।"

কথা না বাড়িয়ে পনেরো টাকা দিয়ে সুজাতা কিনে ফেলল চাদরটা। খানিক দূরে দাঁড়িয়ে সেই ছেলেমেয়ে দুটো তখনও তাকিয়ে ছিল দোকানের দিকে। সুজাতা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ওদের কাছে। সামনে গিয়ে মেয়েটিকে বলল, "তোমাদের নাম কী ভাই?"

"জি, কুসুম দিদিয়া।" জড়সড় হয়ে মেয়েটি বলল।

"ভাইয়ের নাম?"

"সুখি দিদিয়া।"

"খুব ভাল রে কুসুম। তা ভাই একটা কথা। এটা তোমাদের জন্যই কিনেছি আমি। রেখে দাও।" হাতের সেই চাদরটা কুসুমের জড়সড় হাতে একরকম গুঁজে দিল সুজাতা। হঠাৎ এই ব্যাপারে কেমন থতমত খেয়ে গেল কুসুম মেয়েটি। কোনও কথাই সরল না মুখে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল শুধু।

সুজাতা সময় নিল না আর। বলল, "আমি কিন্তু আর দেরি করব না ভাই। মেঘ করেছে আকাশে। ফিরতে হবে। আজ যাই তা হলে?"

দিদির এই ব্যাপারটা সন্তু আগেও দেখেছে অনেক। তাই অবাক হয়নি মোটেও। কথাও বলেনি কোনও। দিদির পাশে নিঃশব্দে হাঁটছিল দ্রুত। মেঘটা সত্যিই সুবিধের মনে হচ্ছে না। তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরতে পারলে বাঁচোয়া। কিন্তু সুবিধে হল না কিছুই। তখনও মেলার চৌহদ্দি পার হতে পারেনি। প্রথমে ফোঁটা ফোঁটা, তারপর ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। কাছেই অস্থায়ী এক চালা। অনেকের সঙ্গে ওরাও ঠাঁই নিল সেখানে। বৃষ্টি কিন্তু বেড়েই চলল। প্রমাদ গনে সন্তু বলল, "দিদি রে, এবার যাব কী করে?"

"ভাবিস না ভাই। ভাসানের দিন তো আজ! এই দিনে কৈলাসে ফিরে যাওয়ার আগে মা দুর্গা কাঁদেন যে! দ্যাখ না, থেমে যাবে এক্ষুনি।"

সন্তুর চেয়ে মাত্র বছর ছয়েকের বড় সুজাতা। কিন্তু শাড়িতে ওকে বড় দেখায় আরও। ভরসা পেয়ে ও দিদির কাছ ঘেঁষে এল। হঠাৎ এলেও বৃষ্টি কিন্তু চলল বেশ কিছুক্ষণ। যখন থামল, সন্ধে নামতে তখন দেরি নেই বিশেষ। যথাসম্ভব খুঁজেও হরিয়াকে দেখতে পেল না কোথাও। এদিকে অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে ক্রমশ। দেরি করলে রাত বাড়বে আরও। তার উপর বিদেশবিভুঁই। বরাবরই ধীরস্থির মেয়ে সুজাতা। তবু দুশ্চিন্তায় মাথার ভিতরে ক্রমশ জট পাকিয়ে গেল সব। যা ভুলোমন বাবার! হরিয়াকে পাঠিয়েছেন কি না কে জানে? খানিক ভেবে এরপর ও সন্তুকে নিয়ে একাই হাঁটা দিল গেস্টহাউসের পথে।

কিছুটা পথ যেতেই অন্ধকার ঘন হয়ে এল আরও। নির্জন পথে শুধু ঝিঁঝির কোরাস। এ ছাড়া গাছপালার ফাঁকে জমাট অন্ধকারে রাশিরাশি জোনাকির ঝিকিমিকি। সুজাতা বলল, "দ্যাখ ভাই, কেমন জোনাকি জ্বলছে!"

হাতের টর্চটা জ্বেলে নিঃশব্দে পথ চলছিল সন্তু। বলল, "দিদি, তোর ভয় করছে না তো?"

"না রে পাগলা! তুই তো আছিস। ভালয় ভালয় ঠিক চলে যেতে...।"

সুজাতার কথা তখনও শেষ হয়নি। পিছনে হঠাৎ পায়ের শব্দ। দ্রুত ছুটে আসছে কেউ। সঙ্গে গলার আওয়াজ ভেসে এল, "দিদিয়া, হামে কুসুম।"

চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল দু'জনে। সন্তুর হাতে টর্চ। আলো ফেলার আগেই সামনে এসে দাঁড়াল সেই কুসুম মেয়েটি। হাঁফাচ্ছে হাঁসফাঁস করে। কোনও মতে দম নিয়ে বলল, "দাঁড়া দিদিয়া। হামে আগে যাইছি।"

ওরা কিছু বলার আগেই মেয়েটি ওদের ঠেলে পাশ কাটিয়ে সামনে এগিয়ে যেতেই হঠাৎ একটা

ঘটনা ঘটল। মুহূর্তে দুদ্দাড় করে খুব কাছেই কয়েকটি পায়ের শব্দ হল। অন্ধকার ভেঙে তড়িৎগতিতে ছুটে পালাল কেউ।

"কে, কে ওখানে?" আতঙ্কে ততক্ষণে নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে সুজাতার।

"কোই জানোয়ার হইবে দিদিয়া। ডর না করে। চল, ঘর পৌঁছাইয়ে দেই।"

সারাটা পথ এরপর তেমন আর কথা বলেনি কেউ। ভয়ানক আতঙ্কে সুজাতা কাঠ হয়ে গিয়েছে তখন। এই অন্ধকার পথে এভাবে বের হওয়া ঠিক হয়নি একেবারেই। মেয়েটি সময়মতো না এলে কী যে হত! ভাবতে গিয়ে বুকের ভিতরটা হিম হয়ে আসছিল ওর।

মিনিট কয়েক চলার পরেই অন্ধকারে ওদিক থেকে আলো দেখা গেল একটা। খানিক এগোতেই দেখল, লণ্ঠন হাতে এগিয়ে আসছে হরিয়া। পিছনে হিমাদ্রিবাবু। উৎকণ্ঠায় প্রায় কাঠ হয়ে ছিলেন তিনি। ওদের দেখেই ছুটে এলেন। "তোদের কিছু হয়নি তো মা? বিকেলে হরিয়া ছিল না। গ্রামের দিকে গিয়েছিল। এই খানিক আগে ফিরতেই বেরিয়েছি ওকে নিয়ে।"

ততক্ষণে অনেকটাই সামলে নিয়েছে সুজাতা। বাবার ওই অবস্থা দেখে আর ভাঙল না কিছু। শুধু বলল, "ভেবো না বাবা! কুসুম ছিল, ওই নিয়ে এসেছে আমাদের।" বলতে বলতে পিছন ফিরে তাকাল ও। কিন্তু কুসুমকে দেখতে পেল না কোথাও। ওদের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিয়ে ইতিমধ্যে কখন চলে গিয়েছে মেয়েটি। মনটা খারাপ হয়ে গেল ওর। সন্তুকে মৃদু ধমক দিয়ে বলল, "তুই কী রে ভাই! বাবার সঙ্গে কথা বলছি, তুই ধরে রাখতে পারলি না ওকে?"

সন্তু অপরাধীর মতো মুখ করে বলল, "ভুল হয়ে গিয়েছে রে দিদি! আমাদের পিছনেই তো ছিল। এভাবে যে চলে যাবে ভাবিনি একদম। দাঁড়া, এগিয়ে দেখে আসি একটু।"

শুধু সন্তু নয়। ওঁরা সকলেই এরপর অন্ধকারে এগিয়ে দেখলেন খানিক। নাম ধরেও ডাকলেন বারকয়েক। সাড়া পেলেন না কোনও।

আসল ব্যাপারটা ঘটল পরদিন ভোরে। সকালেই ট্রেন। ভোরেই জিনিসপত্র নিয়ে সকলেই হাজির হয়েছেন স্টেশনে। দেখলেন, কুসুম তার ভাইকে নিয়ে বসে আছে প্ল্যাটফর্মের এক কোণে। কালকের সেই নতুন চাদরটা আলতো করে সুখির গায়ে জড়ানো। সুজাতা কাছে গিয়ে বলল, "তুই কী রে কুসুম! কাল না বলে ওইভাবে চলে এলি?"

আশ্বিনের ভোরের হালকা ঠান্ডায় ভাইয়ের নতুন চাদরে গা ঘেঁষে জড়সড় হয়ে বসে ছিল কুসুম। হঠাৎ ওদের দেখে ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর সুজাতার কথায় হাঁ করে তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

"হাঁ করে দেখছিস কী? কাল আমাদের পৌঁছে দিয়ে ওভাবে হঠাৎ চলে গেলি কেন?"

"নাই, নাই তো দিদিয়া!" অবাক হয়ে বলল কুসুম।

"কী নাই নাই করছিস! কাল রাতে তুই-ই তো আমাদের পৌঁছে দিয়ে গেলি?"

"না রে দিদিয়া। ও হামে নেহি।"

"তুই, তুই নোস! কী বলছিস!" অবাক হয়ে বলল সুজাতা।

হুড়মুড়িয়ে ট্রেন ওই সময় ঢুকে পড়ল স্টেশনে। খুব অল্প সময়ের হল্ট। জিনিসপত্র নিয়ে উঠতে না উঠতেই ছেড়ে দিল ট্রেনটা। কুসুমের কাছে তাই আর শোনা হল না কিছু। ভূতের মেলার সেই সন্ধেটা ভুতুড়েই হয়ে রইল শেষ পর্যন্ত।

২ মার্চ ২০০৮

অলংকরণ: সৌরীশ মিত্র

সেই ছায়ামূর্তি

শক্তিপদ রাজগুরু

বিকেল থেকে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। কালো মেঘের ঘন আবরণ আকাশের মুখ ঢেকেছিল সকাল থেকেই। ঝরঝর শব্দে ফোঁটা পড়েই চলেছে। ওদিকের পাহাড়টা ঢেকে গিয়েছে, বৃষ্টির যবনিকার আড়ালে। রাত নামল। পাহাড়ের নীচে বিস্তীর্ণ বনভূমি। তার একদিকে এই বিরাট বাংলোয় আশ্রয় নিয়েছি বাধ্য হয়েই।

অনেক দিনের পুরনো বাংলোটা। সিঁড়িগুলো ভেঙে গিয়েছে। জানলায় শিকের বালাই নেই। বাংলোটা কোনওমতে টিকে আছে। চারদিকে জঙ্গল। তবে বিজলিবাতি আছে, সেটা নামমাত্রই। ভোল্টেজও কম। দু'-একটা আলো মিটমিট করে জ্বলছে। তবে যে-কোনও মুহূর্তে নিভে যেতে যেতে পারে। ঘুমও আসে না। বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে শোনা যায় বনের মধ্যে হায়েনার ডাক।

আমার সঙ্গী হরেন বলল, ''মরতে এখানে কেন এলি? রাতে এখানে কেউ থাকে না। তুই থাকবি? চৌকিদারও আমাদের ফেলে পালিয়ে গিয়েছে তার গ্রামের বাড়িতে। বলে গিয়েছে, 'হুঁশিয়ার থাকবেন!'''

বৃষ্টি মাঝে মাঝে থামছে। আকাশ যেন দম নিচ্ছে আবার নতুন উদ্যমে তেড়ে আসার জন্য। বৃষ্টি থামতে বের হয়ে এলাম বাইরে। সামনে বেশ খানিকটা চাতালমতো। বাংলোর সামনের দিকে চাতালটা। বাইরে হাওয়া বইছে। সেগুনবনের ভিতর চলছে হাওয়ায়। মিটিমিট করে আলো জ্বলছে।

হঠাৎ বাংলোর সামনের দিকে প্রধান দরজার উপর একটা ছোট্ট ফলকের দিকে চোখ পড়ল। বাংলোর মালিকের নাম লেখা। একটা বিদেশি নাম, 'টি ম্যান'। তিনিই এই বাংলো তৈরি করেছিলেন, ঠিক আজ থেকে একশো বছর আগে। অর্থাৎ বাংলোর ঠিক একশো বছর পূরণ হওয়ার দিনে আমিই এখানকার অতিথি। কে এই মি. ম্যান তা জানি না। তবু সেই আশ্রয়দাতার কথাই মনে পড়ল। বারান্দার ওদিকে একটা করবী গাছে গোছা গোছা লাল ফুল ফুটে আছে। আমি সেই ফুল কিছু সংগ্রহ করে এনে কালচে হয়ে যাওয়া ফলকের নীচে একশো বছর আগের মি. ম্যানের স্মৃতির উদ্দেশে অর্পণ করলাম।

হরেন সব দেখে বলল, ''তোর সবই বিচিত্র। চল, ভিতরে চল। কে জানে, হায়েনা-ভালুক না এসে পড়ে!''

রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ওদিকের ঘরে হরেন নাক ডাকছে। মনে হল, কার যেন পায়ের শব্দ আসছে বাইরের দিকের কাঠের সিঁড়িতে। ভারী জুতোর শব্দ। এত রাতে এই ভাঙা বাংলোয় কে আসবে? টর্চটা নিয়ে সাবধানে উঠে ওদিকের দরজা খুলে সিঁড়ির দিকে এলাম। টর্চের আলোয় অন্ধকার হলঘরের খানিকটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। দেখলাম, ওদিকের সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন এক ভদ্রলোক। পরনে প্যান্ট, গায়ে একটা সাবেকি ধরনের লংকোট। মাথায় পুরনো ধরনের উঁচু হ্যাট। হাতে একটা ছড়ি। বলিষ্ঠ পায়ে ভদ্রলোক উপর দিকে সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন। এত রাতে এখানে এরকম একজনকে দেখে অবাক

হলাম। হঠাৎ আলো পড়তেই ভদ্রলোক আলোর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। চোখে চশমা, গায়ে লংকোট। প্রথম দর্শনেই অবাক হলাম। বিদেশি ওই ভদ্রলোককে এখানে দেখব ভাবিনি। আমিও স্তব্ধ হয়ে দেখছেন তাকিয়ে আছি। ভদ্রলোকও অবাক হয়ে দেখছেন আমাকে। তারপরই আর তাঁকে দেখা গেল না। টর্চের আলোটা জ্বলছে, কিন্তু সিঁড়িটা ফাঁকা। কেউ নেই সেখানে। তবে কি আমি ভুল দেখলাম? কিন্তু তাঁর ভারী জুতোর শব্দ আমি স্পষ্ট শুনেছি। তাঁকে উপরের দিকে উঠতেও দেখেছি। সারা শরীরের রক্ত যেন ঠান্ডা হয়ে গেল। আমি চিৎকার করে হরেনকে ডাকলাম। হরেনও উঠে এল। সব শুনে হরেন বলল, ''তোর যত সব খেয়াল! এই বৃষ্টির রাতে, এই ভাঙা বাংলোয় আসবেন কোন বিদেশি সাহেব? যত সব গুল। চল, শুবি চল।''

এসে বিছানায় শুলাম। তবু মনের মাঝে সেই বিদেশির মুখখানা ফুটে উঠল। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি জানি না। পরদিনই ওখান থেকে ফিরে এলাম আমাদের কাজের জায়গায়। আমি তখন কাজ করি কুলটি আয়রন অ্যান্ড স্টিল কারখানায়।

ব্রিটিশ আমলের তৈরি কারখানা। সুন্দর সবুজ সাজানো টাউনশিপ। উঁচু-নিচু পাহাড়ি গোছের ছোট শহর। ব্রিটিশ চলে গিয়েছে। তবু তাদের সেই পাহাড়ি পরিবেশ, সাজানো শহর, কারখানা, টাউনশিপ, বাংলো, গাছগাছালি ঘেরা ছায়াঘন পরিবেশ, হাসপাতাল, গির্জা আজও রয়ে গিয়েছে। কারখানার চিমনি থেকে কালো ধোঁয়া উঠছে। যন্ত্রদানবের সেই কর্মশালা আজও সরব রয়েছে।

ওদিকে গড়ে উঠেছে নতুন উপনগরী। এখানকার পুরনো কর্মীদের অনেকেই রিটায়ার করার পর এই টাউনশিপের বাইরে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বাড়ি করে রয়ে গিয়েছে। মি. মিত্রও পুরনো দিনের ইঞ্জিনিয়ার। যখন চাকরিতে ঢুকেছেন, তখন বয়স বেশি নয়। তারপর দেখেছেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। তারপর রিটায়ার করে এখন পড়াশোনা নিয়েই রয়েছেন। ভারতের লৌহআকরিক নিয়ে বেশ কিছু গবেষণাও করেছেন। তাঁর দুই ছেলের একজন বার্নপুরের আয়রন অ্যান্ড স্টিল কারখানার ইঞ্জিনিয়ার। অন্যজন কুলটির কারখানার ইঞ্জিনিয়ার।

আমিও প্রায়ই যাই তাঁর কাছে। পুরনো দিনের অনেক কাহিনি শোনা যায় তাঁর কাছ থেকে। সাদাসিধে আড্ডাবাজ ধরনের মানুষ। কাস্টিংয়ের কাজে তাঁর নানা অভিজ্ঞতা। আমিও কাস্টিংয়ের কাজে নানা জটিল সমস্যা সমাধানের উপায় তাঁর কাছ থেকেই জেনে নিই।

সেদিন নাইট ডিউটি চলছে। শীতের রাত। এখানে বেশ হাড়কাঁপানো ঠান্ডা পড়ে। সন্ধের পর টাউনশিপের বাসাগুলোও নিশুতি হয়ে যায়। রাস্তায় লোক চলাচল কমে যায়। তার উপর বৃষ্টি নেমেছে। কনকনে শীত। আমি একাই চলেছি। ওদিকে ডিরেক্টর্স বাংলোয় অন্ধকার নেমেছে। আলোগুলো যেন বৃষ্টির ধারায় আবছা হয়ে এসেছে। হঠাৎ ওই জনহীন পথে একটু এগিয়ে সেই সাহেবকে দেখেই চমকে উঠলাম। বৃষ্টির মধ্যে ছাতা না নিয়েই চলেছেন তিনি। পরনে লংকোট, প্যান্ট, মাথায় সাবেকি ধরনের লংহ্যাট। হাতে ছড়ি। ক্লান্ত লাগছে। জুতোর শব্দ উঠল স্তব্ধতার মাঝে খটখট।

এত রাতে তাঁকে দেখে অবাক হলাম। আবার ভাবলাম, এ আমার দেখার ভুল। শুশুনিয়ার বাংলোয় দেখা সেই সাহেব এখানে আসবেন কী করে? হঠাৎ দেখলাম, একটা লাইটপোস্টের ওদিকে সেই মূর্তিটি দাঁড়িয়ে পিছনে আমার দিকেই তাকিয়ে। বৃষ্টির মধ্যে আবছা আলোয় আমার চিনতে ভুল হল না। সে রাতে দেখা সেই বিদেশির মুখ আমার চেনা। সেই মুখ, সেই স্টিল ফ্রেমের চশমা। সেই বেদনাবিধুর দৃষ্টি। কোনও অনুযোগ নেই, ফুটে উঠেছে হাসির ছোঁয়া। চিনতে ভুল হয়নি, সেই শতবর্ষ পূর্তির রাতে দেখেছিলাম, সেই বাংলোর ধ্বংসস্তূপে। সারা শরীর কী এক অজানা আতঙ্কে হিম হয়ে এল। নির্জন পথ, সামনে ওই বিদেশি।

তবু যেন মনে হল, কোনও বিদেশিই এসেছেন কারখানার ডিরেক্টর্স বাংলোয় অতিথি হয়ে। এবার আমি এগিয়ে গেলাম সেই বিদেশির দিকে। এবার মূর্তিটি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলতে শুরু করল। আমিও
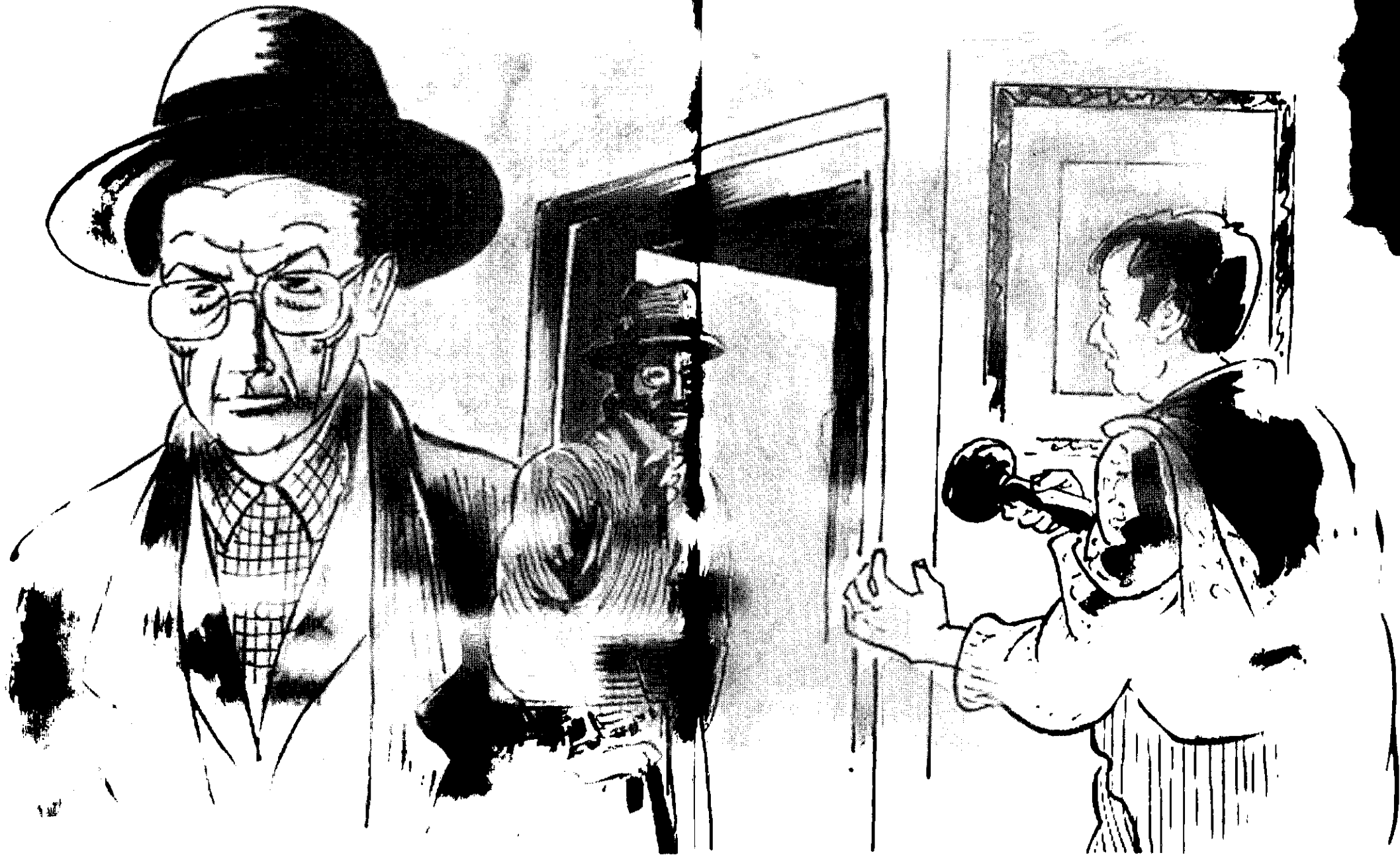
পিছনে চলতে শুরু করলাম। আমিও পায়ে পায়ে ঢালু পথ দিয়ে হাঁটতে থাকলাম কারখানার মেন গেটের দিকে। আমার আগে তখনও চলেছে সেই মূর্তি। ওদিকে হাসপাতাল। ওখানে পথটা বাঁ দিকে বেঁকে গিয়েছে। ডান দিকে চলে গিয়েছে কারখানার মেন গেট। সেই বিদেশিও বাঁ দিকে চলেছেন। আর কিছুটা গিয়ে তাঁকে দেখা গেল না। একটা ছোট টিলার কাছে এসে আবার অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আমি অবাক হয়ে দেখলাম। নির্জন পথ। মূর্তিটি যেন হাওয়ায় উবে গিয়েছে ম্যাজিকের মতো। সব ব্যাপারটাই কেমন বিচিত্র মনে হল। আরও বিচিত্র লাগল ওই মূর্তিটিকে এখানে দেখে। কারখানায় গিয়ে হরেনকেও বললাম কথাটা।

হরেন সব শুনে বলল; ''ব্যাটা ভূত যেন তোর পিছনেই পড়েছে। ছাড় তো, যত্ত সব!''

হরেন ব্যাপারটা হেসেই উড়িয়ে দিল। তবু আমি যেন এটাকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারলাম না।

সেদিন মি. মিত্রের বাড়িতে গিয়েছি। ওঁর সঙ্গে আমার নানা কথাই হয়। কথা প্রসঙ্গে আমিও জানালাম এই বিচিত্র দেখতে বিদেশির কথা।

মি. মিত্র অবাক হয়ে বললেন, ''তুমি তাকে শুশুনিয়ার ভাঙা বাংলোতেও দেখেছ?''

আমি বললাম, ''হ্যাঁ। ওখানেই প্রথম দেখি। আবার দু'-তিনদিন আগে তাঁকে ডিরেক্টর্স বাংলোর ওদিকেও দেখেছি। ওদিকের পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে হাসপাতালের কাছে টিলার ধারে এসে হারিয়ে যেতে দেখেছি। তাঁর দৃষ্টিটা আজও ভুলিনি। কেমন বিষণ্ণ, হতাশ দৃষ্টি। চোখে স্টিল ফ্রেমের চশমা। মাথায় টপহ্যাট, লংকোট, হাতে ছড়ি।''

মি. মিত্র বললন, ''তুমি ঠিকই দেখেছ। একা তুমিই নও, এখানকার অনেকেই দেখেছে মি. ম্যানকে।''

আমিও এবার চমকে উঠলাম। বললাম, ''শুশুনিয়ার সেই ভাঙা বাংলো তৈরির ঠিক একশো বছর পূর্তির দিনই ওখানে ফলকে ওঁর নাম দেখেছি। আর সেবারই প্রথম দেখেছিলাম বাংলোয় ওই মূর্তিকে। কে এই মি. ম্যান? এতদিন পর এইভাবে তাঁকে দেখা গেল কেন?''

এখন সন্ধে নামছে। অন্ধকার হয়ে গিয়েছে বাইরে। মি. মিত্র বললেন, ''সে এক করুণ কাহিনি। ইংরেজদের নিষ্ঠুরতার বলি ওই জার্মান ভদ্রলোক মি. টমসম্যান। ভারতবর্ষ তখন ব্রিটিশদের শাসনে। অনেক দিন আগের কথা। ইতিহাস বলতে পারো। ভারতবর্ষে কোনও লোহা তৈরির বড় কারখানাই ছিল না। আজকের দিনের এইসব লোহা কারখানা তৈরিই হয়নি। লোহা, ইস্পাত আসত ইংল্যান্ড, ইতালি, জার্মানি থেকে। ওটা ছিল ইংরেজদের একচেটিয়া ব্যাবসা। তখনকার দিনে ওই জার্মান ভদ্রলোক মি. ম্যান এখানে লোহা কারখানা তৈরির পরিকল্পনা করেন। তিনি নিজে ছিলেন জার্মান। তাঁর স্ত্রী ছিলেন ব্রিটিশ। মি. ম্যান বনে-পাহাড়ে ঘুরে ছোটনাগপুর অঞ্চলের পাহাড়ে আয়রন-ওর-এর সন্ধান পান। ঘুরতে ঘুরতে এই কুলটি অঞ্চলে এসে দেখেন, এখানে স্থানীয় কারিগররা দিশি পদ্ধতিতে বড় বড় মুছিতে ওই আয়রন-ওর, কয়লা আর চুনাপাথর দিয়ে দিশি হাপরের সাহায্যে হাওয়া দিয়ে প্রচণ্ড তাপ সৃষ্টি করে লোহা গালিয়ে বের করে। সেই লোহা দিয়েই চাষের কাজের জন্য লাঙল-কুঠার-দা-কাস্তে এসব বানাত। এই জিনিসের মান খুব উন্নত না হলেও ওই দিয়েই তারা কাজ চালিয়ে নিত।

''মি. ম্যান এবার ওই কারিগরদের নিয়ে অপেক্ষাকৃত আধুনিক জার্মান পদ্ধতিতে একটা লোহা কারখানা খোলার প্ল্যান করেন কুলটিতে। কারণ, কয়লাখনি অঞ্চল, এখানে কয়লা সহজেই পাওয়া যায়। আয়রন-ওর আসবে ওই অঞ্চল থেকে। ম্যানসাহেব দেখেছিলেন, কিছু দূরে ওই পাহাড়ে রয়েছে প্রচুর লাইমস্টোন। যা লোহা গালাতে পারে। ওখান থেকে চুনাপাথর আনিয়ে কুলটিতেই তিনি প্রথম ভারতের আয়রন ফ্যাক্টরি তৈরি শুরু হল। তার মানও হল উন্নত ধরনের। দামও ইংরেজের আমদানি করা ইংল্যান্ডের লোহার চেয়ে কম। ফলে ম্যানসাহেবের কারখানার জিনিসের চাহিদাও

বাড়ল। এবার টনক নড়ল ইংরেজদের। তারা জার্মান সাহেবকে টেক্কা দেওয়ার জন্য নিজেরা এতদিন পর বাধ্য হয়ে আয়রন ফ্যাক্টরি তৈরির সিদ্ধান্ত নিল।

''তারা পাশেই বার্নপুরে গড়ে তুলল তাদের আয়রন-ওর কারখানা। তার নাম হল 'স্টিল কর্পোরেশন অফ বেঙ্গল'। মি. ম্যানের কারখানায় তৈরি জিনিসের মানও উন্নত, দামেও সস্তা। তাই ব্রিটিশের ব্যাবসা মার খেতে শুরু করল। তাদেরই রাজত্বে বসে ইংরেজকে টেক্কা দেবে ওই জার্মান? এটা ব্রিটিশের সহ্য হল না। তারাও এবার সুযোগ খুঁজতে লাগল কী করে মি. ম্যানকে আঘাত করা যায়?

''ইংরেজরা লোকসান দিয়েও বার্নপুরের লোহা-কারখানা চালাতে বাধ্য হচ্ছে। বন্ধ করে দিলে হার স্বীকার করতেই হবে ম্যানসাহেবের কাছে। শাসক ইংরেজরা তা করতে পারছে না। তাই ম্যানসাহেবের উপর রাগও তাদের বাড়ছে। হঠাৎ একদিন শুরু হয়ে গেল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব। এখানে মি. ম্যান একজন জার্মান। তাই যুদ্ধ ঘোষণার পরই ইংরেজ এবার ম্যানসাহেবকে জার্মান যুদ্ধবন্দি হিসেবে ধরে নিয়ে গেল। তিনি কারখানার ভার দিলেন তাঁর স্ত্রীর উপর। ম্যানসাহেবের স্ত্রী একজন ব্রিটিশ মহিলা। তাই তাঁকে কারখানায় রেখে এবার ইংরেজই ম্যানসাহেবের কারখানা পরিচালনার কাজ করতে লাগল।

''চার বছর ধরে চলেছিল মহাযুদ্ধ। ম্যানসাহেবও ততদিন বন্দি রইলেন। এর মধ্যে কারখানা পরিচালনার কাজে সাহায্য করার অজুহাতে ধূর্ত ইংরেজ ম্যানসাহেবের কারখানার দায়ভার নিজের কাঁধে তুলে নিল। যুদ্ধের সময় প্রচুর লোহা-ইস্পাতের দরকার হয়। তাও তৈরি করছে নিজেরাই। এর মধ্যে ম্যানসাহেবের স্ত্রীকে টাকাপয়সা দিয়ে হোক বা নানা কৌশলে লন্ডনে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে ইংরেজরা।

''মি. ম্যান তখন ইংরেজের জেলখানায়। তখন অনুমান করেছিলেন তাঁর বিপদের আশঙ্কার কথা। কিন্তু তাঁর করার কিছুই ছিল না। ইংরেজরাও তাঁকে এসব খবর জানায়নি। ম্যানসাহেব জেলে বসে স্বপ্ন দেখতেন, যুদ্ধ শেষ হলে মুক্তি পেয়ে আবার তিনি ফিরবেন তাঁর স্ত্রীর কাছে। আবার নতুন করে তাঁর কারখানা খুলবেন।

''যুদ্ধ শেষ হল টানা চার বছর পর। তখন দামোদর-বরাকর নদ দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। তিনি ফিরে এসে দেখলেন, তাঁর স্ত্রীও নেই। তিনি ইংল্যান্ড ফিরে গিয়েছেন। তাঁর নিজের হাতে তৈরি কুলটি কারখানার মালিকানাও আর তাঁর নেই। তাঁর স্ত্রী নাকি ওই কারখানা ইংরেজদের বিক্রি করে দিয়ে গিয়েছেন। ইংরেজরা ওই কারখানা নিয়ে বার্নপুরের কারখানার সেকেন্ড ইউনিট হিসেবে চালু করেছে।

''বঞ্চিত, হতাশ মি. ম্যান তখন অসহায়, নিঃসম্বল। যিনি এতদিন কষ্ট করে এই কারখানা গড়েছিলেন, আজ তিনি নিঃসম্বল, আশ্রয়হীন। তবু তিনি থামেননি। ইংরেজদের এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে ইংরেজ আদালতেই কেস করলেন তাঁর কারখানা ফেরত পাওয়ার জন্য।''

রাত হয়ে গিয়েছে। মি. মিত্র থামলেন। তাঁর কণ্ঠে ফুটে উঠল বিষণ্ণতার সুর। মি. মিত্র সেই ইতিহাসের সাক্ষী।

আমি বললাম, ''আপনি মি. ম্যানকে দেখেছিলেন?''

মি. মিত্র বললেন, ''হ্যাঁ। তখন আমি নতুন ইংরেজ পরিচালিত কুলটি কারখানার কর্মী। দেখেছিলাম মি. ম্যানকে। তুমি যে বর্ণনা দিলে, সেই ম্যানসাহেবকেই দেখেছিলাম। কোম্পানির একটা পরিত্যক্ত ডিরেক্টর্স বাংলোতেই তিনি উঠেছিলেন। শুশুনিয়ার সেই বাংলো তখন ইংরেজদের দখলে। তিনি আশা করেছিলেন যে ইংরেজদের কাছ থেকে সুবিচার পাবেন। কিন্তু পাননি। শেষ জীবনটা কেটেছিল দরিদ্রের মতো। আজ যেখানে হাসপাতাল গড়ে উঠেছে, ওর কাছেই ছিল একটা পরিত্যক্ত কোলিয়ারি। তাতে বড় ইঁদারা খুঁড়েছিলেন, সেই গর্ত দিয়ে লিফটগুলো যাতায়াত করত। সেই পরিত্যক্ত

কোলিয়ারির ইঁদারায় ঝাঁপ দিয়ে তিনি প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন।''

চমকে উঠলাম আমি, ''ওইভাবে অতলে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন মি. ম্যান?''

মি. মিত্র বললেন, ''সেদিন তাই ঘটেছিল।''

স্তব্ধতা নামল। জানলার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল একটু আলোর আভাস। তারাগুলো জ্বলছে। রাতের বাতাস যেন কী এক বেদনায় ভরে উঠেছে।

মি. মিত্র বললেন, ''ভারতের লৌহশিল্পের ইতিহাস নিয়ে যদি কোনও দিন সত্যি গবেষণা হয়, হয়তো সেদিন ম্যানসাহেবের নাম উল্লিখিত হবে। তিনিই ছিলেন ভারতীয় লৌহশিল্পের আদি পুরুষ।''

বাসায় ফিরছি। রাতের স্তব্ধতা নেমেছে। নির্জন রাতে কার জুতোর শব্দ উঠল খটখট। দূরে চলেছে সেই ছায়ামূর্তি, লংকোট, টপহ্যাট পরা। প্রতি পদক্ষেপে যেন প্রতিবাদের শব্দ উঠছে তারই নিজের হাতে তৈরি লৌহনগরীর বুকে। ছায়ামূর্তিটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

২ মার্চ ২০০৮

অলংকরণ: সুদীপ্ত মণ্ডল

স্কুলের টানে

জয়দীপ চক্রবর্তী

রামগোপালপুর জায়গাটা সম্পর্কে মনে মনে বেশ একটু দুশ্চিন্তাই ছিল সোমনাথের। এক, বাড়ি থেকে যাতায়াত করার মতো দূরত্বে জায়গাটা নয়। তার উপর এদিকে আগে কখনও আসাও হয়নি তার। জায়গাটা গ্রাম না শহর, রাস্তাঘাট, জল, বিদ্যুৎ আদৌ চলনসই কি না, কিছুই জানা ছিল না। আসলে কাউন্সেলিং-এর সময় খানিকটা ঝোঁকের মাথাতেই রামগোপালপুর হাইস্কুলের নামটা বেছে নিয়েছিল সোমনাথ। এ ছাড়া তার হাতে খুব একটা ভাল বিকল্প অবশ্য ছিলও না আর। প্যানেলে শেষের দিকে নাম থাকায় ভাল ভাল স্কুলগুলো আগেই হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। এই স্কুলটা বাদ দিলে বাকি যে ক'টা স্কুল পড়ে ছিল, তার সবক'টাই একেবারে সেই সুন্দরবনে। সোমনাথের বাবা অবশ্য বলেছিলেন, ঘরবাড়ি ছেড়ে ওই অত দূরে একলাটি পড়ে থাকার কোনও দরকার নেই। খেটেখুটে সামনের বছর আবার পরীক্ষায় বসে বরং কাছাকাছি কোনও স্কুলে চাকরি পাওয়া যদি সম্ভব হয়, সোমনাথকে সেই চেষ্টাই করতে বলেছিলেন তিনি। সোমনাথ কথা শোনেনি। আসলে এই বাজারে পাওয়া চাকরি ছেড়ে দেওয়ার সাহস তার হয়নি।

রামগোপালপুরে এসে অবশ্য সোমনাথের অস্বস্তি কেটে গেল। জায়গাটা শহর থেকে দূরে বটে, তবে অজ পাড়া-গাঁ মোটেই নয়। রাস্তাঘাট এখানে যথেষ্ট ভাল। হাট-বাজার, দোকানপাটেরও কোনও অভাব নেই। এমনকী, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন লাইনও এ গ্রামে এসে গিয়েছে বেশ কয়েক বছর আগেই। সোমনাথের সবচেয়ে ভাল লেগে গেল স্কুলটা। প্রায় শতাব্দী-প্রাচীন স্কুলটার এলাকায় বেশ নামডাক আছে। স্কুলে বিল্ডিং-টিল্ডিংগুলোও বেশ বড়সড়। স্কুল কম্পাউন্ডের মধ্যে ভারী সুন্দর একটা ফুলের বাগান রয়েছে। আর স্কুলের পিছনে রয়েছে একটা মস্ত পুকুর। স্কুলের উত্তর দিকে খেলার মাঠ আর মাঠের ওপাশে আম-কাঁঠালের বিশাল বাগান।

এখানে চাকরি করার সমস্যা বলতে একটাই। তা হল সোমনাথের থাকার জায়গা। রামগোপালপুর বর্ধিষ্ণু হলেও আদপে তো গ্রামই। কাজেই ভাড়ায় বাড়ি পাওয়াটা এখানে বেশ মুশকিল। তবে যেদিন চাকরিতে যোগ দিতে এল সোমনাথ, তার এ সমস্যাটাও সহজেই মিটে গেল। স্কুলের প্রধানশিক্ষক বিনয়বাবু মানুষটা বেশ অমায়িক। সোমনাথের সমস্যার কথা শুনে তিনিই প্রস্তাব দিলেন যে, স্কুলেরই একটা ঘর গুছিয়ে-টুছিয়ে নিয়ে দিব্যি থেকে যেতে পারে সোমনাথ।

সোমনাথ প্রথমটা একটু দনোমোনো করেছিল। কিন্তু বিনয়বাবু তার সংকোচ কাটিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "আমাদের স্কুলে এ একটা রীতিই বলতে পারো সোমনাথ। এর আগে ও ঘরে প্রায় চল্লিশ বছর কাটিয়েছেন সদানন্দবাবু। বছর তিনেক আগে রিটায়ার করে নিজের দেশ বর্ধমানে ফিরে গিয়েছেন তিনি। তারপর থেকে ফাঁকাই পড়ে আছে ঘরটা। স্বচ্ছন্দে তুমি এখন সেটার দখল নিতে পারো।"

এরপর আর কথা চলে না। অতএব স্কুলেরই একটা

পুরনো ঘরে সদানন্দবাবুর পরিত্যক্ত তক্তপোশে নতুন করে বিছানা পেতে ফেলল সোমনাথ।

২

রামগোপালপুরে ক্রমশই থিতু হচ্ছিল সোমনাথ। গ্রামেরই একজন বয়স্কা মহিলা সকালবেলা এসে তার ঘরদোর পরিষ্কার, রান্নাবান্না করে দিয়ে যায়। সোমনাথ তাকে অনেকবার বলেছিল, সন্ধের পর আর-একবার এসে রাতের রান্নাটাও করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু মহিলা কিছুতেই রাজি নয়। তার স্থির বিশ্বাস, এই স্কুলবাড়িতে নাকি একাধিক অশরীরীর স্থায়ী বসবাস। কাজেই সন্ধের পর এখানে আসার মতো বোকামি করতে তার একটুও ইচ্ছে নেই।

এই লোকগুলোকে দেখলে খুব মজা পায় সোমনাথ। এই একবিংশ শতাব্দীতেও কী অদ্ভুত অন্ধ সংস্কারের জালে জড়িয়ে রয়েছে এরা। সোমনাথ নিজে বরাবরই ডাকাবুকো ছেলে। ভূতপ্রেত, দত্যিদানোয় কোনও দিনই বিশ্বাস নেই তার। কাজেই স্কুলবাড়িতে প্রেতের অস্তিত্বের গল্প তার মনে রেখাপাত করেনি বিন্দুমাত্রও। তবে একটা কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই তার। এই এত বড় স্কুলচত্বরের এক কোণে একলাটি এই ঘরে থাকতে মাঝে মাঝে একটা অদ্ভুত অস্বস্তি হয় তার মনের মধ্যে। সে অবশ্য জানে যে, এই অস্বস্তি আসলে একাকীত্বজনিত এবং আপাতত এর হাত থেকে তার মুক্তিও সম্ভব নয়। সুতরাং এ তাকে মানিয়ে নিতেই হবে। তবে রাত্রিবেলা মাঝে মাঝে কিছু অদ্ভুত শব্দ কানে আসে তার। কখনও কখনও মনে হয়, কারা যেন তার আশপাশ দিয়েই চলাফেরা করে বেড়াচ্ছে ধীর পায়ে। মাঝেমধ্যে তারা যেন ফিসফাস কথাও বলে নিজেদের মধ্যে। একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যেতে স্পষ্ট মনে হয়েছিল সোমনাথের, জ্যোৎস্না রাতে চাঁদের আলোর সঙ্গে মিশে গিয়ে কারা যেন খোলা জানলা দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ধড়মড় করে বিছানার উপর বসে পড়ল সে। কাউকেই অবশ্য চোখে পড়েনি তার। কিন্তু একটা অদ্ভুত বিপন্নতাবোধ যেন আজকাল তার মনটাকে চেপে ধরে মাঝেমধ্যে। সেও কি তা হলে এই গ্রামের লোকগুলোর মতো ভূতপ্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে উঠছে নিজের অজান্তেই? একলা থাকতে তার সাহসী মনটাও কি দুর্বল হয়ে পড়ছে ক্রমাগত? নিজের অস্বস্তি কাটানোর জন্যই একদিন অফ পিরিয়ডে বিনয়বাবুর ঘরে বসে তাঁকে সরাসরি জিজ্ঞেস করল সোমনাথ, "স্যার, আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন?"

"হঠাৎ?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন বিনয়বাবু।

"না মানে এমনিই। আসলে ছেলেবেলা থেকে ভূতের গল্প এত শুনে এসেছি...।" বিষয়টাকে একটু হালকা করার চেষ্টা করল সোমনাথ।

"তোমার কি স্কুলের ওই ঘরটায় থাকতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে সোমনাথ?" অত্যন্ত সিরিয়াস গলায় তাকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন বিনয়বাবু।

"কেন বলুন তো?" সোমনাথ কৌতূহলী হল। তার কেন যেন মনে হল, বিনয়বাবুর এই প্রশ্নটার আড়ালে কী একটা রহস্য যেন লুকিয়ে আছে।

"আসলে এত বড় স্কুলচত্বর, একেবারে একলাটি থাকো তুমি!"

"আমার মনে হচ্ছে আপনি আমার কাছে কিছু একটা লুকনোর চেষ্টা করছেন স্যার।" সোমনাথ গম্ভীর স্বরে বলল।

"ঠিক তা নয়।"

"তবে?"

"আসলে এই স্কুল সম্পর্কে নানাজনে নানা কথা বলে।"

"আমি শুনেছি।"

"শুনেছ?"

"হুঁ।"

বিনয়বাবু চুপ করে গেলেন। সোমনাথের কথার পরে আর কথা বললেন না।

সোমনাথই কথা বলল আবার, "আপনি এসব কথায় কোনও গুরুত্ব দেন নাকি?"

''তা কিছুটা দিই বই কী।'' সোমনাথকে অবাক করে দিয়ে বললেন বিনয়বাবু।

সোমনাথ হেসে বলল, ''আপনি নিশ্চয়ই মজা করছেন আমার সঙ্গে স্যার।''

''উঁহু।'' বলে মাথা নাড়লেন বিনয়বাবু।

''আপনি সত্যি ভূতে বিশ্বাস করেন! এত পড়াশোনা করার পরেও, এই দু'হাজার আট সালে?'' হাসতে হাসতে বলল সোমনাথ।

''করি হে, বিশ্বাস না করে উপায় নেই বলেই করি।''

''কেন উপায় নেই?'' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল সোমনাথ।

''যাগগে ওসব কথা।'' সোমনাথের প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে উঠে দাঁড়ালেন বিনয়বাবু, ''ক্লাসগুলোর সামনে থেকে একবার চক্কর দিয়ে আসি। হাজার হোক, ক্লাসগুলো ঠিকঠাক চলছে কি না মাঝে মাঝে দেখে আসাটা আমার কর্তব্য। আর এ স্কুলে কর্তব্যে গাফিলতি করার হ্যাপা অনেক। কয়েক জোড়া চোখ সব সময় আমাদের উপর লক্ষ রেখে চলেছে হে! ফাঁকি দিলে রক্ষে নেই।'' বলতে বলতে ঘর থেকে বারান্দায় পা রাখলেন বিনয়বাবু।

কিছুক্ষণ বোকার মতো সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সোমনাথ। বিনয়বাবুর মতো মানুষরাও যে কেন এমন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন, তার কোনও ব্যাখ্যাই খুঁজে পেল না সে। ক্লাস শেষের

ঘণ্টা পড়তে সোমনাথ তাই স্টাফরুমের দিকে এগোল পরের ক্লাসটা কোথায় তা দেখে নেওয়ার জন্য।

৩

সন্ধের পর ঘরের মধ্যে একলা চুপ করে বসে ছিল সোমনাথ। এই সময়টায় বড্ড খারাপ লাগে তার। কথা বলার একটাও লোকজন নেই। স্কুল ছুটি হয়ে যাওয়ার পর থেকেই এলাকাটা কেমন যেন নিঝুম হয়ে যায়। থমথমে করতে থাকে চারদিক।

মাত্র দিন কুড়ি হয়েছে এখানে এসেছে সে। স্থানীয় লোকজনের সঙ্গেও তেমন আলাপ-পরিচয় জমে ওঠেনি এখনও। সময় কাটানোর জন্যে সন্ধের পর মাঝে মাঝে একলা হাঁটতে হাঁটতে সে রামগোপালপুর বাসস্ট্যান্ডের দিকে চলে যায়। ওদিকটা বেশ জমজমাট। রাতের খাবারটা মাঝেমধ্যে ওখান থেকেই কিনে নিয়ে চলে আসে। দু'-চারজন লোক ইতিমধ্যেই চিনে গিয়েছে তাকে। রাস্তায় দেখা হলে 'মাস্টারমশাই' বলে বেশ খাতির-টাতিরও করে। আজও একবার বাইরের দিকে বেরোবে ভেবেছিল সে। কিন্তু তারপর ঠিক যেন ইচ্ছে করল না। আসলে বিনয়বাবুর সঙ্গে কথা হওয়ার পর থেকেই মনটা কেমন যেন এক অস্বস্তিতে ভরে আছে। চেষ্টা করেও সেই অস্বস্তিটাকে মন থেকে তাড়াতে পারল না সে। রাতের নানান শব্দ আর ফিসফাস আজ যেন তার মনে অন্যরকম একটা সম্ভাবনার মালা গাঁথতে শুরু করল সন্তর্পণে। বারবার মনে হতে লাগল এই অঞ্চল, এই স্কুলবাড়ি, এমনকী তার নিজের এই ছোট্ট ঘরখানা, সমস্ত কিছু ঘিরেই একটা অদ্ভুত রহস্য আছে। স্বাভাবিক জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে যার কিনারা করা যায় না। আজ এইসব কথা ভাবতে ভাবতে জীবনে প্রথমবার সম্পূর্ণ অন্যরকম একটা ভয়ে সোমনাথের গা-টা ছমছম করে উঠল। আর ঠিক তখনই একটা খ্যানখেনে কণ্ঠস্বরে চমকে দরজার দিকে ফিরে তাকাল সোমনাথ।

"তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এলুম হে ছোকরা।" বলতে বলতে বৃদ্ধ লোকটি একেবারে সোমনাথের ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন।

লোকটির গায়ের রং কালো। একদম শুকনো দড়ির মতো চেহারা। মাথায় খোঁচা খোঁচা চুল, পরনে হাঁটু পর্যন্ত ধুতি আর চাদর। লোকটিকে একটুও চেনা মনে হল না সোমনাথের। যদিও ওঁকে কোথায় যেন দেখেছে বলে মনে হল বারবার। সোমনাথকে অমন করে তাকিয়ে থাকতে দেখে লোকটি হি হি করে হাসলেন খানিক। তারপর ভারী ব্যঙ্গের সুরে বললেন, "চিনলে না তো?"

"আজ্ঞে না।" আমতা আমতা করে জবাব দিল সোমনাথ।

"ভাল ভাল। না চেনাই ভাল!" বলে আবার হাসতে লাগলেন লোকটি।

লোকটির কথাবার্তার ধরন একটুও ভাল লাগছিল না সোমনাথের। বিশেষ করে লোকটির চোখের দৃষ্টিটার সঙ্গে একদম মানিয়ে নিতে পারছিল না সে। লোকটির চোখে এমন এক স্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা যে, সেদিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। মনে হয়, শরীর ভেদ করে যেন সেই দৃষ্টি কোন অতলে সেঁধিয়ে যাচ্ছে সবকিছু তছনছ করে দিয়ে। "তুমি তো বিজ্ঞান পড়াও?" লোকটিই কথা বললেন আবার।

"হ্যাঁ, ভৌতবিজ্ঞান।" লোকটির দিকে না তাকিয়েই জবাব দিল সোমনাথ।

"তা হলই বা? তার মানেই কি বিশ্বসংসারের সর্বস্ব জানা হয়ে গিয়েছে তোমার?" লোকটির গলায় হালকা ধমক উঠে এল এবার।

"আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।" ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া গলায় বলল সোমনাথ।

"তোমরা যারা বিজ্ঞান দু' পাতা পড়েছ, তারা তো সকলেই নিজেদের দিগগজ ভাবো। যেটুকু জানা গেল তো গেল, আর যা কিছু নিজেরা জানো না, তার সবকিছুকে ধাপ্পা আর কুসংস্কার বলে চালিয়ে দেওয়ার মতলব করছ সর্বক্ষণ।"

"আপনি কী বলতে চাইছেন?"

"তুমি তো খুব বিজ্ঞানমনস্ক ভাবো নিজেকে?

ভূত-প্রেত কিছু মানো না।''

''**আজ্ঞে** না, মানি না।''

''**ক্লাসে ক্লাসে** ছেলেদেরও তাই বলে বেড়াচ্ছ?''

''শিক্ষক হিসেবে ছেলেদের কুসংস্কার থেকে মুক্ত করা আমার কর্তব্য।''

''কোনটা কুসংস্কার?''

''এই যে ভূত-প্রেত বিশ্বাস করা।''

''বিশ্বাস করলে ক্ষতিটা কী?''

''ওসব মিথ্যে। ওসব বিশ্বাস করলে মন দুর্বল হয়ে যায়।''

''মন দুর্বল হওয়ার ব্যাপারটা না হয় মানা গেল। কিন্তু ভূত-প্রেত মিথ্যে, এ কথা কে বলল তোমায়?''

''আমি জানি।''

''জানি বললেই তো হল না।''

''আপনি কী বলতে চান? ভূত আছে?''

''আলবাত আছে।''

''আমি বিশ্বাস করি না।'' উত্তেজিত গলায় বলল সোমনাথ।

''বোকার মতো কথা বলছ।'' বলতে থাকলেন লোকটি, ''ভূত শব্দের অর্থ কী তা তো জানো?''

''আজ্ঞে হ্যাঁ।'' অসহিষ্ণু গলায় বলল সোমনাথ।

''জানো যখন, তা হলে অত সংশয় কেন?'' হঠাৎ যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন বৃদ্ধ লোকটি, ''অতীতকে স্বীকার করে নিতে তোমাদের এত সংকোচ কেন বুঝি না। অতীতকে ভিত্তি করে বর্তমান মাথা তুলবে এটাই তো কাম্য হওয়া উচিত। অতীত মানেই কি সব ফালতু, সব বর্জনীয়? তা হলে আমি, পণ্ডিতমশাই, বিভূতিবাবু আমাদের হেডমাস্টারমশাই মহিম মুখুজ্জে, আমরা সকলেই কবে মরে ভূত হয়ে গিয়েছি, তবু এই স্কুলের মায়া কাটিয়ে, এর ভাল-মন্দ উপেক্ষা করে কেন স্বার্থপরের মতো চলে যেতে পারলাম না ঊর্ধ্বলোকে?'' বলতে বলতে ধকধক করে জ্বলতে লাগল তাঁর চোখ দুটো। আর ধুতি-চাদর-চশমা সমেত তাঁর পুরো শরীরটা গুঁড়ো গুঁড়ো **হয়ে ঘরের জানলা দিয়ে, দরজা দিয়ে উড়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে লাগল দমকা হাওয়ায়।**

ঘটনার আকস্মিকতায় একেবারে বোবা হয়ে গেল সোমনাথ। সারা শরীর অবশ হয়ে এল তার। ঘরের মধ্যে বিজলিবাতি জ্বলছে, তবু ক্রমশ চোখের সামনে অন্ধকারের একটা ভারী পরদা নেমে এল। আর চেতনা হারানোর আগের মুহূর্তে বৃদ্ধটিকেও শনাক্ত করে ফেলল সে। বিনয়বাবুর ঘরে তাঁর চেয়ারের পিছনে যে দেওয়াল, সেই দেওয়ালে ছবি টাঙানো রয়েছে থার্ড মাস্টারমশাই হারানচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে তৎকালীন প্রধানশিক্ষক মহিমানন্দ মুখোপাধ্যায়। যাঁদের দু'জনেরই পার্থিব শরীর লয় হয়েছে আজ থেকে অন্তত চল্লিশ বছর আগে।

৪

চেতনা ফিরে আসার পরেও বেশ কিছুক্ষণ শরীরে কোনও শক্তি পেল না সোমনাথ। হাত-পা-মাথা সবই যেন একসঙ্গে অসহযোগিতা করতে শুরু করেছে। তার কথায় একচুলও বোধহয় নড়াচড়া করবে না তারা আর। সোমনাথ অসহায়ের মতো কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে চুপ করে শুয়ে রইল অনেকক্ষণ। তার এত দিনের বিশ্বাস-অবিশ্বাস সব, সমস্ত কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে আজ। নিজেকে নিজেরই যেন অচেনা মনে হচ্ছে এখন। অনেকটা সময় নিয়ে, ধীরে ধীরে নিজেকে থিতু হতে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সোমনাথ। মাথার পিছন দিকটা আর ডান হাতের কনুইটা চিনচিন করে উঠল ব্যথায়। বোতল থেকে ঢকঢক করে খানিকটা জল খেয়ে নিয়ে ঘড়ির দিকে তাকাল সে।

রাত দুটো বেজে গিয়েছে। বড় করে নিশ্বাস ফেলল সোমনাথ। ভোর হতে মাত্র দু'-আড়াই ঘণ্টা বাকি আর। তারপর আবার আলো ফুটবে চরাচরে। সম্পূর্ণ নতুন একটা দিন শুরু হবে আবার। ঘরটাকে খুব ভাল করে একবার দেখে নিল সোমনাথ। জানলা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, চাঁদের আলোয় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা স্কুল **বিল্ডিংগুলোকে। তারপর ধীর পায়ে টেবিলটার**

দিকে এগিয়ে গেল সোমনাথ। রেজিগনেশন লেটারটা লেখার পরেও অনেক কাজ। সবকিছু গোছগাছ করে ফেলতে হবে এক্ষুনি। সম্ভব হলে বিনয়বাবুর বাড়ি ঘুরে রামগোপালপুর থেকে প্রথম বাসটাই ধরতে হবে কলকাতাগামী ট্রেন ধরার জন্যে।

দ্রুত চিঠিটা শেষ করে উঠে দাঁড়াল সোমনাথ। একটা হালকা জুতোর শব্দ খটাস খটাস করে এগিয়ে এসে থেমে গেল তার ঘরের সামনে। চমকে তাকিয়ে সে দেখল, মহিমবাবু দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছেন তার দিকে চোখ মেলে। পরনে বিনয়বাবুর ঘরের ছবিতে দেখা সেই আটহাতি ধুতি আর গলাবন্ধ কালো কোট। পায়ে কালো রঙের পাম্প শু। ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল সোমনাথ। শিরদাঁড়া বেয়ে বরফের মতো ঠান্ডা স্রোত বইতে শুরু করল তড়িৎগতিতে। সোমনাথের মনে হল, তার হৃৎপিণ্ডে এবার বোধ হয় স্তব্ধ হয়ে যাবে চিরকালের মতো।

হঠাৎ ভারী স্নেহের সুরে কথা বলে উঠলেন মহিমবাবু, ''ভয় পেয়ো না সোমনাথ! আমি তোমার কাছে দুঃখপ্রকাশ করতে এসেছি।''

অবাক হয়ে চোখ মেলল সোমনাথ। মহিমবাবু আবার বললেন, ''হারানবাবু রেগে গিয়েছিলেন বলে ওঁর ওই রূপ দেখেছ তুমি সোমনাথ। আসলে উনি ওই রকমই। বদমেজাজি একটু। আমি ওঁকে বুঝিয়ে বলব। বিশ্বাস করো, আমরা কেউ তোমার মন্দ চাই না। আমরা তোমার মঙ্গল চাই, তোমাদের মঙ্গল চাই।''

নিজের হাতে ধরা চিঠিটার দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করল সোমনাথ, ''কিন্তু স্যার...''

''কোনও কিন্তু নয় বাবা! ও চিঠিটা ছিঁড়ে ফ্যালো তুমি। তুমি আমাদের চেয়ে অনেক অনেক ছোট সোমনাথ। তবু তোমার কাছে অনুরোধ করছি আমি যে, আমাদের উপর রাগ করে এ স্কুল ছেড়ে চলে যেয়ো না তুমি। আমার ছেলেদের তাতে ক্ষতি হবে। আমি তোমার পড়ানো শুনেছি, তুমি ভাল পড়াও।''

মহিমবাবুর কথা শুনতে শুনতে বুকের মধ্যেকার জমাট বাঁধা পাথরটা ক্রমশ গলে যেতে লাগল সোমনাথের। চোখে জল এসে গেল তার। মৃত্যুর এত বছর পরেও এই স্কুল, স্কুলের এই সব ছাত্রের জন্যে এত ভালবাসা এঁদের! শ্রদ্ধায় আপনাআপনি হাত দুটো জড়ো হয়ে বুকের কাছে উঠে এল সোমনাথের। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রাণভরে প্রণাম করল সে মহিমবাবুকে। এক অদ্ভুত আনন্দে মনটা ভরে উঠল তার।

সোমনাথ যখন মাথা তুলল, তখন লাল হয়ে উঠেছে পুব আকাশ। মহিমবাবু মিলিয়ে গিয়েছেন ঘর থেকে। বাইরে একটা পাখি ডাকছে টি-টি করে। হালকা একটা হাওয়া বইছে দক্ষিণ দিক থেকে। ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে খোলা আকাশের নীচে একটুক্ষণ দাঁড়াল সোমনাথ। তারপর হাতে ধরা চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে নিশ্চিন্তে উড়িয়ে দিল সেই হাওয়ায়।

২ মার্চ ২০০৮
অলংকরণ: বিজন কর্মকার
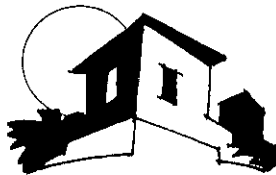
অদৃশ্যের মন্ত্রণা

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

অবশেষে পবন সিদ্ধান্তটা নিয়েই ফেলল, এ জীবন সে আর রাখবে না। বিকেল ফুরিয়ে যখন মাছ ধরার জালের মতো সন্ধে নামে চারপাশে, পথঘাটের মানুষ ক্ষণিকের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে যায়, তখনই চুপিসারে সরকারবাজার পিছনে ফেলে পবন উঠে এল রেললাইনের ধারে। এখানে ঝোপজঙ্গল, পরপারে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য উদয়পুরের দুঃখী মানুষরা এই আড়ালটাকে ব্যবহার করে।

বিকেলের ডাউন লোকালটা রোজ আধঘণ্টার মতো লেট হয়। আজও তার অন্যথা হয়নি। দূরে রেললাইনের বাঁকে ব্যাটারি ফুরিয়ে যাওয়া টর্চের মতো আলো দেখা দিয়েছে। এগিয়ে আসছে হেডলাইট।

জ্ঞান হওয়ার পর থেকে পবন আজ পর্যন্ত কোনও কাজই ঠিকভাবে করে উঠতে পারেনি। লেখাপড়া, খেলাধুলো, ব্যাবসা, কোনওটাই নয়। আজকের কাজটায় কিছুতেই ভুল করা চলবে না।

রেসদৌড়ের স্টার্টিংয়ের মতো ভঙ্গি করে রেলের পাথরের উপর বসতে গেল পবন। প্যান্টের পকেটে কী যেন রয়ে গিয়েছে। কোনও পিছুটান? পকেট থেকে বেরোল দুটো কয়েন, দু'টাকার আর এক টাকার। পবনের কাছে এর আর কোনও মূল্য নেই। ছুড়ে দিল বাজারের দিকে। কাল সকালে যে পাবে, খুশি হবে।

এই ধরনের আনন্দের ঘটনা পবনের জীবনে কখনও ঘটেনি। হঠাৎ প্রাপ্তি হয়নি কিছুই। স্কুলে ক্লাস সিক্সের গণ্ডি টপকাতে পারল না। বাবা মারা গিয়েছিলেন তার আগেই। বাজারে সবজি নিয়ে বাবার জায়গায় মা বসতেন। পবন মাকে সাহায্য করত। দুপুরের পর ছুটি। বাড়িতে খেয়েদেয়ে ঘাটে-মাঠে ঘুরে সময় কাটাত পবন। প্লেয়ার নিতান্ত কম পড়লে খেলায় ডাকা হত তাকে। এভাবেই কবে যেন বড় হয়ে গেল। মায়ের বয়স হচ্ছে, ঘরবার একসঙ্গে সামলাতে পারছিলেন না। ঘরের কাজে একজন সাহায্যকারী চাই। বিয়ে দিলেন ছেলের। পবন প্রবল আপত্তি জানিয়েছিল, "কেন বিয়ে দিচ্ছ মা? কোনও রোজগারপাতি নেই আমার। এখনও আমরা ভাড়াবাড়িতে থাকি।"

"তোকে ভাবতে হবে না। দায়িত্ব আমার।" বলে মা লাগিয়ে দিলেন বিয়ে। ওই গরিব ঘরে যেমন হয় আর কী! তোবড়ানো টিনের চালে জ্বলল টুনিলাইট। আড়াই বছরের মাথায় সব দায়িত্ব ছেড়ে মা চলে গেলেন দু'দিনের জ্বরে। পবনের ছেলে তখন হামা টানছে।

কাছা গায়ে মুখ ভার করে পবন বাজারে মায়ের জায়গায় গিয়ে বসল। শ্রাদ্ধশান্তি করল যথানিয়মে। কিছুদিনের মধ্যেই পবন বুঝতে পারল, ব্যাবসায় তার ক্ষতি হচ্ছে। যার কাছ থেকে সবজি কিনছে, সে ঠকাচ্ছে। পোকালাগা সবজি, ওজনে কম। যারা কিনছে, ফেলছে ধারবাকি। মাস ছয়েক যেতে না যেতেই পবনের পুঁজি ফুরিয়ে এল। মহাজনের কাছে প্রচুর দেনা, ঘর ভাড়া দিতে পারছে না সময়মতো। গুটিকয়েক সবজি নিয়ে বাজারে বসে আর ভাবে, এর পর কী করে চলবে?

শাক বেচে লক্ষ্মীমাসি, মায়ের বন্ধু। পবনের **অবস্থা** দেখে **বলল, ‘‘তুই একটা কাজ** কর, আমি যতটা শাক নিয়ে বসি, অর্ধেক তুই নিয়ে গিয়ে বেচ। লাভের অংশ রেখে বাকি টাকা ফেরত দিবি। ধার-টার আর কাউকে দিস না।’’

সতর্ক একটু হল বটে পবন। খদ্দের হাসিমুখে কথা বললে গলে গিয়ে ওজনের বেশি জিনিস দিত না, দামাদামিতে হেরে গিয়ে লোকসানে দিয়ে ফেলত না জিনিস। তবুও শুধু শাক বেচে কি অত টাকা ধার শোধ আর সংসার চালানো সম্ভব? ঘরে হাঁড়ি চড়তে লাগল একবেলা। বউ রেগেমেগে ছেলেকে নিয়ে চলে গেল বাপের বাড়ি। সেখানে দু’বেলা দু’মুঠো ভাত তো পাবে।

এই ঘটনায় পবনের মনটা একেবারেই ভেঙে গেল। বাজারে বসতে ইচ্ছে করত না। টিকতে পারত না ঘরেও। ছেলেটার কথা মনে পড়ত সারাক্ষণ। **শিশু** গরিব-বড়লোক বোঝে না। সে তার বাবাকে চিনত খুব। দেখলেই ঝাঁপিয়ে আসতে চাইত কোলে। বেড়াতে যাবে।

থাকতে না পেরে পবন একদিন ছেলে-বউকে আনতে গেল। সেখানে গিয়ে বলবে, ‘‘ব্যাবসাটাকে দাঁড় করানোর শেষ চেষ্টা করে দেখি। মহাজনের কাছ থেকে না হয় আরও কিছু ধার নেব।’’

বউ সীমা সে বাড়ির চৌকাঠই ডিঙোতে দিল না। বলল, ‘‘গরিবগুর্বো জামাইও এক বাক্স মিষ্টি অন্তত নিয়ে আসে, তুমি তো দাড়িটাই কেটে আসোনি।’’

দড়াম করে সদর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল সীমা। পবনের মনে হয়েছিল, দুনিয়ার সব দরজাই তার জন্য বন্ধ হয়ে গেল। ভীষণ একা লাগল নিজেকে। ঘটনাটা বেশি দিনের পুরনো নয়, দু’সপ্তাহ কাটেনি। এই ক’টা দিন পবনের মনে একটা কথাই ঘুরেফিরে এসেছে, এ জীবন রেখে আর কী লাভ! সিদ্ধান্তটা পাকাপোক্তভাবে মাথায় বসে যেতে, সন্ধের মুখে **উঠে এল রেললাইনের ধারে।** ট্রেনের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, **পবন ঘাড় হেলিয়ে গাড়িটা কতটা দূরে আছে দেখতে গেল, এমন সময় কোনও এক পুরুষকণ্ঠ বলে উঠল, ‘‘কাণ্ডটা কি আজ না করলেই** নয়?’’ [illegible] নাকি নাকি **সুরে বলা কথা, এরকম** চূড়ান্ত সময়ে শোনার দরুন **বুকটা** ধড়াস করে **উঠল** পবনের। তাড়াতাড়ি নিজের চারপাশটা দেখল, কেউ কোথাও নেই। ঝোপটা এমন কিছু ঘনও নয়। ভিতর দিয়ে সদ্য আলো জ্বলে ওঠা উদয়পুর স্টেশন দেখা যাচ্ছে।

সবে যখন ভাবছে হয়তো শোনার ভুল, তখনই আবার সেই গলা, ‘‘আর ক’টা দিন দেখলে হয় না? যদি উপায় কিছু একটা বের হয়!’’

এবার বেশ ঘাবড়ে গেল পবন। চিঁ চিঁ সুরে জানতে চাইল, ‘‘কে আপনি? আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?’’

‘‘যে কাণ্ডটা তুমি ঘটাতে যাচ্ছিলে, তারপরই আমাকে দেখতে পেতে। মানে ভূত!’’

অন্য সময় হলে কথাটা শুনে গায়ে কাঁটা দিত পবনের। এখন মনে হচ্ছে, কোনও আত্মীয় বুঝি স্টেশন থেকে নিতে এসেছে। সত্যিই একটু পরে সে-ও তো ভূত হয়ে যাবে। আওয়াজের দিকে তাকিয়ে পবন বলল, ‘‘তা হঠাৎ এখানে কী মনে করে? একেবারে মোক্ষম সময়ে এসে হাজির?’’

‘‘কিছুই না। যাচ্ছিলাম কানলায় যাত্রা দেখতে। জ্যান্ত থাকতে এই লাইন দিয়েই তো ট্রেনে করে যেতাম। এটাই আমার চেনা রাস্তা। তা দেখি, তুমি এখানে ওঁত পেতে বসে আছ। বুঝলাম, মাথায় কোনও কু-মতলব আছে। তাই দাঁড়িয়ে গেলাম। এখন বলো তো, কীসের এত দুঃখ তোমার?’’

ট্রেনটা এসে পড়ল। ঝোপঝাড়ে কাঁপন ধরিয়ে ঝমঝম করে চলে গেল স্টেশনের দিকে। বিষম বিরক্ত হয়ে পবন বলল, ‘‘দিলেন তো চান্সটা মিস করিয়ে। আমার মেলা দুঃখ! শুনতে শুনতে আপনার ঘুম পেয়ে যাবে।’’

‘‘আমাদের ঘুম বলে কিছু নেই, তুমি বলো। চান্স আরও পাবে, এটাই লাস্ট ট্রেন নয়।’’

রেলের পাথরের উপর বসে পড়ল পবন। তাদের লাইনে ট্রেন কম। পরের লোকাল অনেক দেরিতে। **সামনে কেউ বসে আছে ধরে নিয়ে পবন বলে যেতে থাকল তার দুঃখ।** প্রতিটি বাক্যের শেষে শূন্য থেকে

উচ্চারিত হয়, 'আচ্ছা,' 'হুম,' 'তাই তো!' মনের কথা বলতে বলতে একটা প্রশ্ন মাথায় এল পবনের। জিজ্ঞেস করল, ''আচ্ছা, আপনি তো নাকি সুরে কথা বলছেন না?''

সন্ধের অন্ধকার বলে উঠল, ''সব ভূত বলে না। যারা বেঁচে থাকতে লেখা বা বলার সময় চন্দ্রবিন্দু প্রয়োজন মতো ব্যবহার করেনি অথবা ভুল জায়গায় করেছে, সেই চন্দ্রবিন্দুগুলো মৃত্যুর পর তাদের নাকে এসে জমা হয়।''

খবরটা জেনে খানিক আশ্বস্ত হল পবন। পড়ালেখার পাট যেহেতু তার কম, চন্দ্রবিন্দুর ভুল বেশি হয়নি। আর কথা সে অল্পই বলে। মরার পর তাকে বিচ্ছিরিভাবে খোনা সুরে কথা বলতে হবে না।

দুঃখের বৃত্তান্ত শেষ করে লম্বা শ্বাস ফেলল পবন। বলল, ''আপনিই বলুন! এরপর কি আর কারও বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে?''

অশরীরী সহানুভূতির গলায় বলল, ''সে অবিশ্যি ঠিক। তবে আমাকে সব বলতে পেরে একটু হালকা বোধ করছ তো?''

''তা করছি।'' বলে আকাশের দিকে তাকাল পবন। একটা-দুটো করে তারা ফুটছে। সরু ফালির মতো চাঁদ, কৃষ্ণপক্ষ চলছে।

''নিশ্চয়ই একটু খিদে-খিদে পাচ্ছে? যাও, কিছু খাও আগে।'' অশরীরীর গলায় বড় ভাইয়ের আন্তরিকতা।

পবন বলল, ''পয়সা কই? দুটো কয়েন মিলিয়ে তিন টাকা পকেটে ছিল। একটু আগে ছুড়ে ফেলে দিয়েছি।''

''কোনও ব্যাপার না। উঠে দাঁড়াও। যেভাবে

কয়েন দুটো ছুড়ে দিলে, একটা পাথর নিয়ে সেভাবেই ছোড়ো।''

উঠে দাঁড়াল পবন, বুদ্ধিটা খারাপ নয়। অশরীরীর কথামতো কাজ করল সে। তারপর ঢাল বেয়ে নেমে এল পাথরের কাছে। ও মা, একটু দূরেই শুয়ে আছে দুটো কয়েন। কেমন যেন অভিমানী লাগল ওদের।

কানের কাছে ফের ওর গলা, ''কী খেতে ইচ্ছে করছে?''

একটু ভেবে পবন বলল, ''ভক্তি পালের জিলিপি। কিন্তু তিন টাকায় তো দুটোর বেশি হবে না।''

''এক কাজ করো, স্টেশনের টিকিট কাউন্টারের কাছে যাও। ওখানে টাকাকড়ির লেনদেন হয়। লোকের হাত ফসকে মাটিতে কিছু পড়ে থাকলেও থাকতে পারে।''

ভূত যখন বলছে, একটা মানে আছে নিশ্চয়ই। পবন দেরি না করে পা চালাল টিকিটঘরের উদ্দেশে।

২

যত সহজে পাওয়া যাবে ভেবেছিল, তা হয়নি। বিস্তর খুঁজে একটা ঠোঙার নীচে পাঁচ টাকার কয়েন পেয়েছে পবন। ভাগ্যিস টিকিট কাটার ভিড় তেমন ছিল না। থাকলেও সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরির জন্য প্রশ্নের মুখে পড়তে হত। পবন এখন মিষ্টির দোকানের বাইরের বেঞ্চে। শেষ কবে এদের জিলিপি খেয়েছে মনে পড়ে না। ভাতের জোগাড় করতেই হিমশিম খেতে হয়।

দোকানের সামনে ভক্তি পাল নিজের হাতে জিলিপি ভাজছে। আঁকশি দিয়ে তুলে চুবিয়ে দিচ্ছে রসে। এই জিলিপি যে একবার খাবে, জীবনভর ভুলতে পারবে না। আট টাকারই অর্ডার দেবে কি না ভাবছে পবন, দেখা গেল, উনি সঙ্গ ছাড়েননি। নির্দেশ দিলেন, ''দু'টাকা পকেটে রেখে অর্ডার দাও।''

ঘাড় হেলিয়ে পবন তাই করল। হাতে শালপাতা ভর্তি জিলিপি। দুটো খাওয়া হয়ে গিয়েছে। রস গড়াচ্ছে ঠোঁটের কষ বেয়ে। চেটোর উলটো পিঠ দিয়ে মুছতে গেল পবন।

''কেমন লাগছে?'' আবার তাঁর গলা।

''ডারুন, ডারুন!'' মুখে খাবার থাকার দরুন উচ্চারণ জড়িয়ে গেল পবনের।

উনি বললেন, ''বেঁচে আছ বলেই এর স্বাদ পাচ্ছ। আমাদের তো এসবের আয়োজন দেখেই সান্ত্বনা পেতে হয়।''

ভূতের দুঃখে দুঃখিত হয়ে দু'বার সমর্থনসূচক ঘাড় নাড়ল পবন। ইচ্ছে থাকলেও জিলিপির ভাগ দেওয়ার উপায় নেই। খাওয়া শেষ। শালপাতাটা ফেলতে মায়া হচ্ছে। উনি জানতে চাইলেন, ''কার কথা এখন মনে পড়ছে বেশি?''

পবন বলল, ''ছেলে-বউয়ের। অনেকবার ভেবেছি, ওদের একবার ভক্তি পালের জিলিপি খাওয়াব। হয়ে ওঠেনি।''

''হবে, সবই হবে। এবার তুমি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে চলে যাও। পল্টুর দোকান থেকে লটারির টিকিট কেনো একটা।''

''নম্বর কী হবে?'' ভূতদাদার কাছ থেকে টিপস চাইল পবন। বেঞ্চে আর-একটা লোক বসে ছিল। পবনকে নিজের মনে বকতে দেখে সরে গেল ভয় পেয়ে। পবনের এসবে এখন কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। ভাগ্যের দরজা খুলতে যাচ্ছে। অশরীরী বললেন, ''নম্বরের প্রথম সংখ্যা দুই, শেষে আট দেখে টিকিট কিনবে।''

''থ্যাঙ্ক ইউ।'' বলে পবন দৌড় লাগাল উদয়পুর স্টেশনের দিকে।

৩

মধ্যে সাতদিন কেটে গেল। পবন নিয়মিত লক্ষ্মীমাসির থেকে শাক নিয়ে বাজারে বসেছে। অপেক্ষা করেছে এই দিনটার জন্য। লটারির রেজাল্ট বেরোবে আজ। দুপুরের দিকে প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা থাকে। পবন টিকিটটা দোকানে দিয়ে অন্যমনস্কতার ভান করছে। আড়চোখে দেখে নিয়েছে, রেজাল্ট-ছাপা

কাগজ বের করেছে পল্টু। পবন শিওর, পল্টু এক্ষুনি চেঁচিয়ে উঠবে, "আরে পবন, তুই তো ফার্স্ট প্রাইজ় মেরে দিয়েছিস!"

ভূতের কথামতো টিকিট কেটেছে পবন, প্রাইজ় না এসে যাবে কোথায়!

কিন্তু কী হল, পল্টু কোনও সাড়াশব্দ করছে না কেন? দোকানের দিকে তাকিয়ে পবন দেখল, টিকিটে পেনের ট্যাঁড়া মারছে পল্টু। এগিয়ে দিল টিকিট। ঠান্ডা গলায় বলল, "লাগেনি।"

নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছে না পবনের। টিকিটটা ফেরত নিয়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিল। ভূতদাদা খামোকা ফলস মেরে দিল! গরিব-দুঃখীকে নিয়ে তামাশা?

"কী, মন ভেঙে গেল?" সেই গলা আবার। দোকান ছেড়ে খানিকটা এগিয়ে এসেছিল পবন। দাঁড়িয়ে পড়ে শূন্যের উদ্দেশে বলল, "ভাঙবে না মন? আপনি তো একেবারেই মামুলি ভূত মশাই! পরামর্শ কাজেই লাগল না।"

"কোন টিকিট প্রাইজ় পাবে, ভূতের ঠাকুরদাও বলতে পারবে না। আমি তোমায় টিকিট কিনতে বলেছিলাম অন্য উদ্দেশ্যে।"

"শুনি উদ্দেশ্যটা।" পবন বলল।

ফটফটে রোদের মধ্যেই ভেসে উঠল কথা, "এই ক'টা দিন নিশ্চয়ই তোমার খুব ভাল কেটেছে। ভেবেছ, প্রাইজ় লাগবেই। টাকাগুলো নিয়ে কী করবে, মোটামুটি একটা পরিকল্পনা করে ফেলেছ। ছেলে-বউকে এটাসেটা কিনে দেবে...'

কথার মাঝে পবন বলে উঠল, "তাতে লাভ হল কী? সেই তো আগের অবস্থায় ফিরে এলাম।"

"না, আসোনি। এই সপ্তাহটায় তুমি একবারও ভাবোনি, জীবনটা রাখবে না। প্রাইজ় নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছ। মরে গেলে স্বপ্নগুলো দেখা হত না। ভূত কখনও স্বপ্ন দেখে না। ভবিষ্যৎকে আড়াল করে থাকে বর্তমান।"

শেষ কথাটা পবনের পক্ষে খুব ভারী হয়ে গেল। তবে যুক্তিটা মোটামুটি সে ধরে নিয়েছে। অশরীরী এবার বললেন, "যাক, ওসব ছাড়ো। লটারির প্রাইজ় কোটিতে একজন পায়। এখন ওই যে দেখো, আপ প্ল্যাটফর্মে এইমাত্র যে গাড়িটা গেল, মালপত্তর সমেত এক বৃদ্ধ নেমেছেন। কুলি খুঁজছেন উনি। তোমাদের ঝিমমারা উদয়পুর স্টেশনে কুলি পাওয়া দুষ্কর। তুমি যাও, মালপত্তর বয়ে রিকশায় তুলে দিয়ে এসো। কিছু রোজগার হয়ে যেতে পারে।"

ভূতদাদার কথামতো সবই করল পবন। উদয়পুর স্টেশনে ওভারব্রিজ নেই। মাল কাঁধে নিয়ে বৃদ্ধ মানুষটিকে ধরে ধরে রেললাইন পার করাল। রিকশায় উঠে বৃদ্ধ, "বাবা, দীর্ঘজীবী হও।" বলে চলে গেলেন।

হতাশ হয়ে রিকশার চলে যাওয়া দেখছে পবন। আবার উনি পাশে, "মন খারাপ কোরো না। বয়স্ক মানুষের আশীর্বাদ পাওয়াটাও কম কথা নয়!"

বিরক্তির চোটে রাস্তায় ডান পা ঠুকল পবন। ধুলো উড়ল। বলল, "আশীর্বাদ দিয়ে কি আমার পেট ভরবে? এর চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল ছিল।"

"আগেই পেটের কথা ভাবো কেন? কাজ খোঁজো, কাজ। হাঁটতে থাকো, কিছু না-কিছু পেয়েই যাবে।"

হাঁটা ছাড়া এখন আর কী-ই বা করার আছে? মাইল দুয়েক হেঁটে ফেলল পবন। হঠাৎ পেল কাজের গন্ধ। রাস্তার ধারে দোতলা বাড়িতে আলমারি তোলা হচ্ছে। দরকারের তুলনায় লোক কম। সুবিধে করতে পারছে না ওরা। পবন এগিয়ে গেল।

পঞ্চাশ টাকা হাতে এল। খুশি হয়ে দিল বাড়ির মালিক। পবন ভাবল, টাকাটা থাক। কাল লক্ষ্মীমাসির শাক ছাড়াও কিছু সবজি নিয়ে বসবে।

৪

পবনের অবস্থা এখন ফিরে গিয়েছে। সেই পঞ্চাশ টাকার সবজি বিক্রি করে লাভ হয়েছিল তিরিশ টাকা। পরের দিন আশি টাকার সবজি নিয়ে বসেছিল। লাভ হল আরও। এভাবে কবে থেকে যেন তার ব্যাবসাটা দিব্যি চলতে শুরু করেছে। দুপুরে বাজার উঠে যাওয়ার পর অযথা বসে থাকে না। কাজ খুঁজতে বেরোয়। একটা না একটা জুটেই যায়। কারও গাড়ি

রাস্তায় খারাপ হয়ে গিয়েছে, ঠেলে দিয়ে পেয়ে যায় দশ-বিশ টাকা। কখনও হয়তো ঢুকে পড়ে কোনও কেটারিংয়ের দলে। ভাল খাওয়া, টাকা, দুই-ই পায়। কখনও বা পুকুরে ডুবে খুঁজে দিল গৃহস্থের ঘটি, বাটি, গয়না। এরই মধ্যে একদিন দাড়ি কেটে, হাতে একবাক্স সন্দেশ নিয়ে পৌঁছে গিয়েছিল শ্বশুরবাড়ি। ফেরত নিয়ে এসেছে ছেলেবউকে। এখন আর কোনও অভাব নেই তার।

আজ ঘটনাচক্রে সারা বিকেল ঘুরে কোনও কাজ পায়নি পবন। তাতে পরোয়া নেই। হাতে টাকা আছে যথেষ্ট। কাজ করার জন্য মনটা সব সময় উসখুস করছে, এই যা! সন্ধে নেমে গিয়েছে। সরকার বাজারের পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরছে পবন। ভুতদাদার কথা বড্ড মনে পড়ছে আজ। সেই যে হাঁটতে পাঠালেন, আর দেখা করেননি। এখন তাঁকে প্রয়োজন নেই পবনের। তবু গলাটা ফের শুনতে ইচ্ছে করছে।

ভুতদাদার কথা ভাবতে গিয়েই চোখ গেল রেললাইনের ধারের কোণটায়। কী ব্যাপার, গাছগুলো দুলছে কেন? হাওয়া নেই, ট্রেনও যায়নি!

সন্দেহ দূর করতে ঢাল বেয়ে ঝোপটার কাছে উঠে এল পবন। এ কী! একটা লোক হাঁটু মুড়ে লাইনের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। দূরের বাঁকে ট্রেনের আবছা হেডলাইট। লোকটির দিকে তাকিয়ে পবন বলল, ‘‘কাণ্ডটা কি আজ না করলেই নয়?’’

চমকে উঠে দাঁড়াল লোকটা। পবন এগিয়ে দুঃখী মানুষটার কাঁধে হাত রাখল।

৫ মার্চ ২০০৯

অলংকরণ: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য
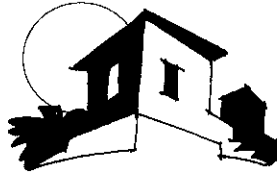
ভূত ও ভগবান

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

গাঁয়ে বড় হয়েছি বলে বলা যায় নানারকমের বিস্ময়ের মধ্যেও বড় হয়েছি। আমাদের বাড়ির চারপাশে ছিল নানাবিধ গাছপালা। গাছপালা না বলে বৃক্ষই বলা ভাল। এবং এই বৃক্ষসকল রোপণ করে গিয়েছেন আমার প্রপিতামহ। এইসব বৃক্ষ এত বিশাল এবং ডালপালা মেলে এমন ঘন হয়ে থাকে যে, সাঁঝ নামলেই একা আর ঘরের বাইরে বের হতে সাহস পেতাম না।

যেমন আমাদের দিঘিরপাড়ের জামগাছটা, শিকড়বাকড় গজিয়ে বিস্তারিত হয়ে ছিল আকাশের প্রান্তে। গাছের প্রাণ আছে, তা ছাড়া বংশানুক্রমিক গাছের বয়সও ঠিক হয়ে আছে। পুকুরপাড়ের তেঁতুলগাছটার কথাই ধরা যাক। তার ডালপালা বিস্তারের শেষ ছিল না, গাছে ওঠাও কঠিন ছিল না। উপরে উঠে গেলে, আকাশ প্রায় হাতের মুঠোয় এসে যেত। এরা তো ছিলই, আর ছিল মস্ত সুপারির বাগান। আম-জাম-কাঁঠাল গাছেরও শেষ ছিল না। আমরা বৈঠকখানায় হারিকেন জ্বেলে পড়াশোনা করতাম। তবে বাইরে যেতে হলে শুধু গৃহশিক্ষকের অনুমতিরই দরকার হত না, একজন সঙ্গীরও প্রয়োজন হয়। কারণ, ভূতের উপদ্রবের শেষ ছিল না। বৈঠকখানার উঠোন, ভিতরের উঠোন পার হয়ে কামরাঙা গাছের নীচে, ছোট বাইরের কাজ সারতে হত। বাবা-কাকা-জ্যাঠারা প্রবাসেই থাকতেন। একমাত্র ছোটকাকা এবং চাষবাসের দায়িত্বে থাকা মনোহরদা ছিলেন আমাদের মুরুব্বি। অবশ্য প্রধান মুরুব্বি আমাদের গৃহশিক্ষক। তিনি আমাদের বলতেন, ''ভূতপ্রেত মনের সংস্কার। তোমরা সংস্কারমুক্ত হতে চেষ্টা করো। সংস্কারমুক্ত না হলে বড় হওয়া যায় না।''

মনোহরদা তখন হাসতেন কিংবা 'হুম' বলে অতিশয় বক্রোক্তি করার চেষ্টা থাকত তাঁর।

''তুমি 'হুম' করলে কেন মনোহর?''

''না, এমনি।''

এমনি যে নয়, পরের কথাতেই বোঝা যেত, ''আমার তো মনে হয় ভূতের ভয় থাকা ভাল।''

''ভূতের ভয় থাকা ভাল কেন মনোহর?''

''ঠাকুর-দেবতা বলেন, ভূত-প্রেত-যক্ষ-রক্ষ বলেন, তাঁরা সবাই একই গাছের শাখাপ্রশাখা।''

''তুমিও যেমন মনোহর! ঠাকুর-দেবতা আর ভূত এক হয়?''

''হয় স্যার! ঠাকুর-দেবতার সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন। ভূতেরাও ঠাকুর-দেবতার মতো মানুষের অন্তরালে থাকেন।''

অবশ্য পড়ার মনোযোগে আমাদের বিঘ্ন ঘটেছে টের পেলেই, ''ঠিক আছে মনোহর। তোমার সঙ্গে পরে বোঝাপড়া হবে। এই দেখি তোর খাতা! কবিতা মুখস্থ হল? 'আকবর দি গ্রেট' কতটা এগোলি দেখি!''

মনোহরদা অন্ধকার বৈঠকখানার এক কোণে গামছায় শরীর ঢেকে মশার উপদ্রব থেকে তখন আত্মরক্ষা করছেন। একটাই কথা অথবা উত্তরও বলা যায়, ''কী মশা!''

ঠাকুর-দেবতা সম্পর্কে এতটা অবজ্ঞা আমাদের

গৃহশিক্ষকের সহ্য না হওয়ারই কথা। ঠাকুর-দেবতা আর মশা কি এক হয় কখনও? তা ছাড়া গৃহভৃত্যের এতটা আস্পর্ধা সহ্য করেন কী করে? তিনি আই এ পাশ, কলাগাছিয়া মাইনর স্কুলের প্রধানশিক্ষক। তাঁকে যদি ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার মতো একজন আকাট মুখ্যু, 'কী মশা' বলে গালাগাল দেন, তবে তাঁর চারপাশে বসে থাকা আমাদের মতো ছাত্রদের সামনে সম্মান রক্ষা হয় কী করে!

সোজা তিনি বলে দিলেন, "রাতে টেবিলের পাশটায় ঘাপটি মেরে পড়ে না থাকলে কি চলে না মনোহর?"

"কোথায় যাব বলে দিন!"

কারণ, আমাদের বাড়িতে সবই টিনকাঠের ঘর। জেঠি-কাকিদের আলাদা-আলাদা ঘর। ঘর অবশ্য খালিই আছে। তাই বলে মনোহরদাকে তো সেসব ঘরে একলা ছেড়ে দেওয়া যায় না। বৈঠকখানা আর গোয়ালঘর ছাড়া তাঁর আর কোনও ঘরে ঢোকার ছাড়পত্র নেই। আমার মাকে নিয়ে, জেঠি-কাকিদের নিয়ে প্রায় তাঁরা পাঁচ-সাতজন, পিসিরা থাকলে সাত, না থাকলে পাঁচ, সবাই পাকশালে ব্যস্ত। রাতের আহার দশটার আগে শুরুই হয় না। রাত নামলে এই বাড়িতে সহজেই তেনারা উপদ্রব শুরু করে দিতে পারেন। কারণ আমার প্রপিতামহ শুনেছি, গাছ বড় করার সঙ্গে কিছু ভূতের কথাও বিস্তারিতভাবে বলে গিয়েছেন। তাঁরা যে এ বাড়ির মঙ্গল চান, তার কথাও লিখে গিয়েছেন। ওই যে দিঘিরপাড়ে বিশাল জামগাছটা, যার পাশে বাড়ির নিজস্ব শ্মশান, শ্মশানে একটি শিবমন্দির আমার ঠাকুরদাই প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। এই মন্দিরে একটি রক্ষাকালীর প্রস্তরমূর্তিও প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। ঠিক এগারোটা বাজলে পঞ্চতীর্থকাকা চলে আসেন, শিবভোগের বন্দোবস্ত হয়। দুটো সাদা রঙের শিয়াল মালসার সেই অন্নব্যঞ্জন ভক্ষণ করলেই গৃহকর্তা অর্থাৎ আমার ছোটকাকা অন্নদাচরণ পুকুরে ডুব দিয়ে রাত বারোটায় শিবভোগের বাকিটা আহার করেন। এই সব মিলেই গা ছমছম করা রাতে আমাদের একঘর থেকে অন্যঘরে, কিংবা পাকশালায় দৌড়ে যেতে হয়। দেবীর ক্রোধে কে কখন পড়ে যাবেন তারও ঠিক নেই। বাঞ্ছাদাও এ বাড়ির আশ্রিতজন। তিনি ঠাকুরমার ফুটফরমাশ খাটেন, আমাদের বাড়িতে গন্ডাদুই আরও ভাইবোন আছে। তাদেরও দেখাশোনা করেন।

অবশ্য দেবীর সেবাইত পঞ্চতীর্থকাকা মন্দির ছেড়ে কোথাও যান না। তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা তাঁকে ঘিরে রাখে, দেবোত্তর সম্পত্তি থেকে তাদের খরচ নির্বাহ হয়। মায়ের আরাধনায় নেশাভাঙের ব্যবস্থাও পঞ্চতীর্থকাকার হেপাজতে। সন্ধের পরই তাঁর তুরীয় অবস্থা হয়। পঞ্চতীর্থকাকা শীত-গ্রীষ্ম অর্থাৎ সারা বছরই গৈরিক রঙের ধুতি পরেন। আর গায়ে তাঁর নামাবলি জড়ানো থাকে। তবে সবই দিঘির ওপাড়ে একটি পীঠস্থান বানিয়ে দেবীর পূজাআর্চায় মগ্ন থাকেন তিনি। মানে শনি-মঙ্গলবার পাঁঠা পড়বেই, না পড়লে যারা থানে ছাগ ছেড়ে দিয়ে যায় অথবা মানত করে যায়, পালা করে ছেড়ে দেওয়া পাঁঠা বলি হয়। বাঞ্ছাদা সারাদিনই থানের সঙ্গে আমাদের বাড়ির সংযোগ রক্ষা করে থাকেন। ওদিকটায় আমাদের যাওয়া নিষেধ। কেন নিষেধ তাও বুঝি না! তবে ওই অঞ্চলটা ভূতপ্রেতের যে বিচরণক্ষেত্র, তাও বুঝি। কে কখন কী দেখতে পাবে, কার ঘাড় মটকে দেবে আর আতঙ্কে ভিরমি খাবে! একমাত্র ঠাকুরমা আর বড়জেঠি শনি-মঙ্গলবার অথবা অমাবস্যায় দিঘির সেই মহাশ্মশানের পীঠস্থানে যান। মন্দিরের গর্ভগৃহে হাত জোড় করে বাড়িঘর এবং মানুষজনের মঙ্গল কামনায় বসে থাকেন।

পীঠস্থানে চৈত্রসংক্রান্তিতে মেলাও বসে। সে সময় দূরের গোপাট ধরে বহু লোকজনেরও সমাগম হয়ে থাকে।

দিঘিতে স্নান করে পুণ্যসঞ্চয়েরও শেষ থাকে না। অসুখবিসুখ এবং শোকতাপে এই পীঠস্থান। তবে বাবা-জ্যাঠা-কাকারা বাড়ি এলে দিঘিতে স্নান-আহ্নিক সেরে মন্দিরেই বেশিটা সময় কাটান। আর স্বচক্ষে দেখেছেন, বাড়ির সরকারমশাই বাঞ্ছাকে দিয়ে উৎসর্গীকৃত পাঁঠার ছালচামড়া ছাড়িয়ে মহাপ্রসাদের আয়োজনে ব্যস্ত থাকেন।

এইরকম অনেক পীঠস্থানের মধ্যে বড় হওয়ায়, ঠাকুর-দেবতার নিন্দামন্দে আমরা ভয় পাই। **পীঠস্থানের দেবী আমাদের বংশকে রক্ষা করছেন।** এমনকী, মেলার সময় দেখেছি, পুণ্যার্থীরা বড় তেঁতুলগাছটার গোড়ায় ফুলজল দিচ্ছে, জামগাছটার গোড়ায়ও ফুলজল দিচ্ছে। গাছ দেবতা হতেই পারে। এত জাগ্রত গাছ দুটো যে, কেউ ডালপালা ভাঙতে সাহস পায় না, গাছে উঠতে সাহস পায় না। দুটো গাছেই অসংখ্য কাঠপিঁপড়ে। ডালপালায় কাঠপিঁপড়ের বাসা। সব তুচ্ছ করে একবার গাছের ডাল কেটে দিয়ে কেউ ভেঙে দিতে গেলে তার মরণ উপস্থিত হয়। কারণ, ডালের ভিতর থেকে এক বিষধর সর্প ছোবল দেয়।

কেউ একবার চুরি করে জামগাছের ছাল তুলে নিয়ে গেলেও, টের পেয়েছে। গাছের শুধু প্রাণই নেই, ইচ্ছে করলে জামগাছটা মানুষের রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। নিশুতি রাতে হাঁটাহাঁটিও করে। পঞ্চতীর্থকাকা নাকি স্বচক্ষে দেখেছেন। পীঠস্থানের দেবী এবং গাছ দুটোর কল্যাণে আমাদের বংশে অকালমৃত্যু নেই, অপমৃত্যু নেই, এমনকী কলেরা-বসন্তে যখন গাঁয়ের পর গাঁ মানুষ মরে সাফ হয়ে যায়, তখনও সেই মহামারী শীতলা ঠাকরুন, বসন্তরোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী গাধার পিঠে চড়ে ঝাঁটা-কলসি কাঁখে গোপাট পর্যন্ত উঠে আসতে সাহস পান। তারপর তাঁর আর পাত্তা থাকে না। জামগাছটা দেবীকে গিলে খায় এবং পরে হজম করে ফেললে দেখা যায়, গাছের শিকড়বাকড়ে একটি অদ্ভুত রকমের পাথর পড়ে আছে।

সবই পঞ্চতীর্থকাকার মুখ থেকে শোনা।

এই পীঠস্থান নির্মাণে, কিংবা বৃক্ষ দু'টির মহিমা কীর্তনে বংশপরম্পরায় পঞ্চতীর্থকাকার পিতা এবং তস্যপিতামহের প্রচেষ্টা এখন সার্থক। বাড়ির সব শুভকাজেই পঞ্চতীর্থকাকার পরামর্শের প্রয়োজন হয়। ঠাকুর-দেবতা সম্পর্কে শেষ কথা বলার অধিকারী তিনিই।

আমাদের নতুন গৃহশিক্ষকের তা অবশ্য জানার কথা নয়। তিনি আমাদের ভূতমার্গ থেকে উদ্ধারের জন্যই নানা উপদেশ দিতেন। গৃহশিক্ষকের উপদেশ শুরু হলেই মনোহরদা খেপে যেতেন।

''একদিন যাবেন আমার সঙ্গে?''

''কোথায় যাব মনোহর?''

''এই নিশুতি রাতে দিঘিরপাড়ে, তেঁতুলগাছ, জামগাছটির সীমানা পার হয়ে। বলা যায় না, দেখা হয়েও যেতে পারে।''

''নিশুতি রাতে যাওয়া হয়নি মনোহর। তবে বিকেলবেলায় তো প্রায়ই গাছ দুটো পার হয়ে বিল্বমঙ্গলার মন্দিরে দেবীদর্শনে যাই। কিছুই তো বুঝতে পারি না। এখন বিশাল গাছ দুটোর ডালপালায় এত টোকা ঝুলছে, এত ফুলের মানত যে, মাঝে-মাঝে মনে হয়, পুণ্যার্থীরা গাছ দুটোকে নোংরা করে রেখেছে। জামগাছটার ডালপালা কত দূরে চলে গিয়েছে। ডালপালা সব মাটিতে নেমে এসেছে। ইচ্ছে করলেই যে কেউ ডালপালা পার হয়ে গাছের ডগায় উঠে যেতে পারে।''

''গেলে রক্ষা থাকবে না স্যার! পড়ে মরবে স্যার! তারপর ভূত হয়ে যাবে।''

মাস্টারমশাই হাসেন।

থেমে গিয়ে মনোহরদা বলবেন, ''বিশ্বাসে মিলায় বস্তু... আপনি জ্ঞানী মানুষ স্যার, আপনারই দেখছি বোধোদয়ের অভাব আছে। মতিভ্রমে ভুগছেন।''

এসব তর্ক রাতের বেলাতেই বেশি হত। আমরা দুলে দুলে স্কুলপাঠ্য বই পড়তাম, আর মনোহরদা দুলে দুলে পীঠস্থান এবং গাছগুলোর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলতেন, ''এরা যোগলব্ধ অষ্ট ঐশ্বর্যের অন্যতম!'' সবই পঞ্চতীর্থকাকার উক্তি, শুনে শুনে মনোহরদারও মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। শেষ করতেন, ''মনে রাখবেন, গাছ দু'টি শিবের বিভূতিবিশেষ। ফল লাভ না হলে পুণ্যার্থীদের কখনও এত ভিড় হয়? এত মানতের টোকা ডালে ঝুলিয়ে দেয়? প্রসূতির বাচ্চা বড় হয়, মানত থাকে, চুল পীঠস্থানে গিয়ে ফেলতে হবে। ঠাকুরের এত বড় আশীর্বাদ আপনি স্যার তুচ্ছ করেন, ভাল না। যারা গাছে গাছে ঘুরে বেড়ায়, নিশুতি রাতে তারা নেমে আসে। তারা সবাই শিবঠাকুরের দোসর। শিবের বিভূতিবিশেষ।''
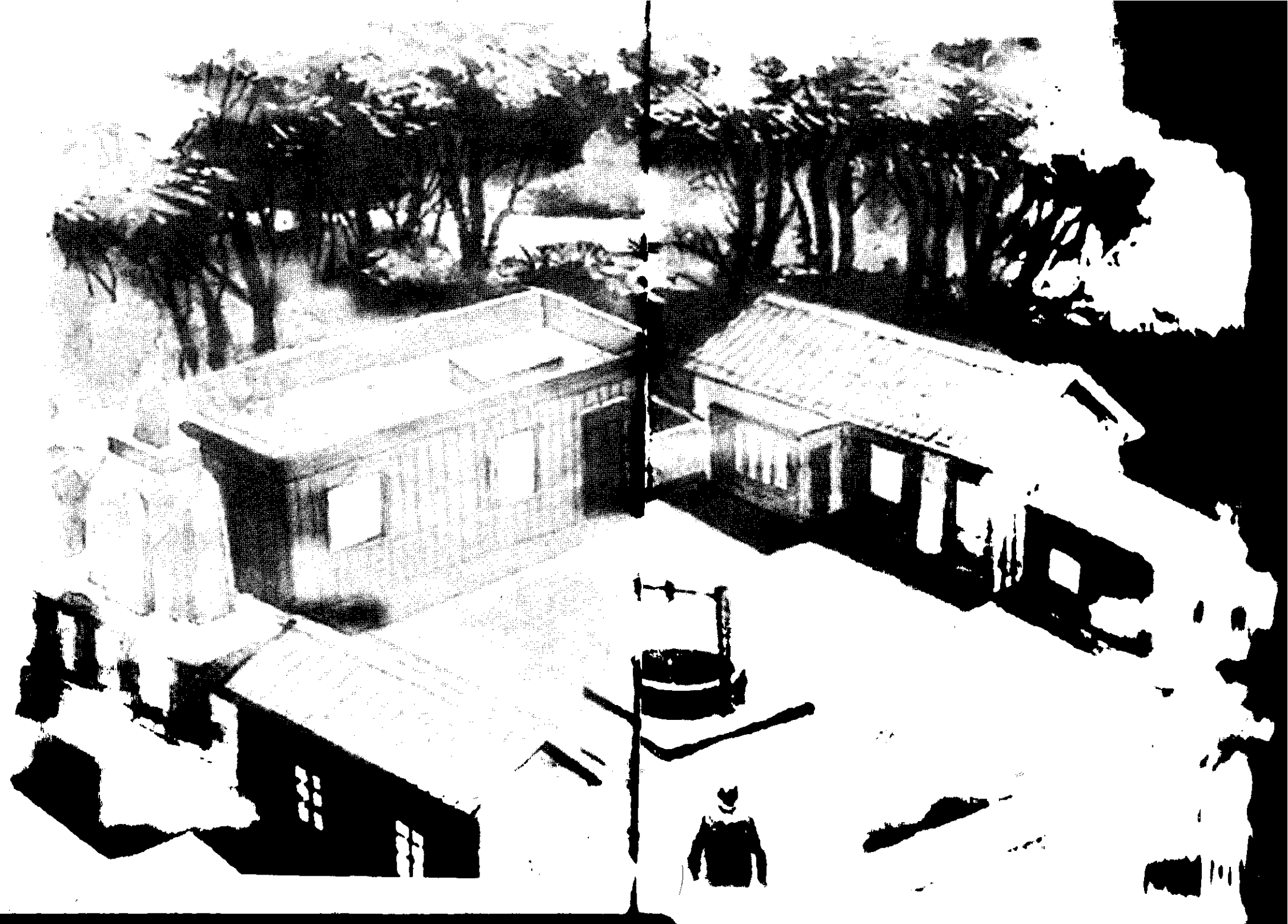
সে যাই হোক, এবারে আমার কাকা-জ্যাঠারা খুবই ফ্যাসাদে পড়ে গিয়েছেন। দুর্বিপাকও বলা যায়। আমার বাবা গঞ্জের মহালে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। শয্যাশায়ী। আমার মায়ের মুখ খুবই ব্যাজার। সেই গঞ্জ এলাকা বিশ ক্রোশেরও অধিক রাস্তা। হাঁটাপথে যেতে হয়। কোনও যানবাহনও নেই। তবে নৌকো নিয়ে খাল-বিল-নদী-নালা ঘুরেও জায়গাটির অনেকটা কাছাকাছি যাওয়া যায়। তবু পড়ে থাকে দু'ক্রোশের মতো হাঁটাপথ। শেষে ঠিক হয়, মেঘনা নদীর পাড়ে এসে নৌকো ভিড়বে এবং সেখান থেকে ইজিচেয়ারে শুইয়ে মাথায় তুলে নিয়ে আসা হবে বাবাকে। এভাবেই স্থির হয়, বড়জ্যাঠা যাবেন, পঞ্চতীর্থকাকা যাবেন, পীঠস্থানের ফুলবেলপাতাও সঙ্গে যাবে। পঞ্চতীর্থকাকার স্থির বিশ্বাস, আমার রুগ্ণ পিতার শিয়রে পীঠস্থানের ফুল-বেলপাতা রাখতে পারলে তিনি নিশ্চিত আরোগ্যলাভ করবেন।

তখন দেশে হকসাহেবের সরকার। আমার জ্যাঠা হকসাহেবের সঙ্গে একই ক্লাসে পড়তেন বলে তিনি তাঁর খুবই প্রিয় মানুষ ছিলেন। অঞ্চলের মানুষরা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তাঁকে এ জন্য খুবই সমীহ করত।

শুধু আমাদের নতুন গৃহশিক্ষক আনন্দমোহন বললেন, ''সঙ্গে একজন চিকিৎসক থাকলে ভাল হত! অসুখটা কী সেটাই তো জানা গেল না। আমি যদি সঙ্গে যাই, কিছু কি অসুবিধে হবে?''

''আপনি!'' মনোহরদা হা হা করে হেসে উঠলেন।

নতুনস্যার বললেন, ''চিকিৎসাশাস্ত্রের শেষ পরীক্ষাটা দিতে পারিনি। বসন্তরোগে আক্রান্ত হই। তারপর দেশে ফিরে আসতে হয়। দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী ছিলাম। সে যাই হোক, আমি সঙ্গে থাকলে আপনাদের কিছুটা সুবিধে হতে পারে।''

আমাদের দেশটার বিশ-পঁচিশ মাইল জুড়ে কোনও পাশকরা ডাক্তার তখনকার দিনে খুঁজে পাওয়া যেত না। যিনি গৃহচিকিৎসক, তিনি একজন যে হাতুড়ে ডাক্তার, আমাদের নতুন স্যারের কাছেই প্রথম জানতে পারি। বাবা জ্যাঠাদের [illegible] একটাই অবলম্বন, শরীরের মধ্যেই আছে সঞ্জীবনী সুধা। এই সুধার গুণেই রুগ্ণ ব্যক্তি আরোগ্যলাভ করে। ওষুধ নিমিত্তমাত্র।

বাবা ফিরে এলে তাঁকে রাখা হল পুবের ঘরে। বিখ্যাত কবিরাজের চিকিৎসায় আছেন তিনি। আনন্দমোহনও নাড়ি দেখে বুঝতে পারেন। নাড়ি ধরে শুধু বলতেন, ''ভাল বুঝছি না!'' তিনি জানালেন বাবা সান্নিপাতিক জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন। এর কোনও সঠিক ওষুধ নেই, তাও জানালেন। প্রবল জ্বর। আরও নানা উপসর্গ আছে এই জ্বরের। ডাবের জল এবং বার্লি একমাত্র পথ্য। দিন-দিন বাবার অবস্থা অবনতির দিকে যাচ্ছে। পঞ্চতীর্থকাকা মাকে ডেকে বললেন, ''বউঠান, আপনি সূর্যব্রতের অঙ্গীকার করুন। এই গ্রহের তিনিই চালিকাশক্তি। তাঁকে সন্তুষ্ট করার দরকার আছে।'' এর সঙ্গে দু'বেলা পীঠস্থানের চরণামৃতের ব্যবস্থা করতে গেলেই আনন্দমোহন বিরূপ হয়ে ওঠেন, ''না, কখনও না! জল ফুটিয়ে খেতে হবে। অসুখটি জলবাহিত, মনে রাখবেন।''

বাবার অবস্থা দিন-দিন অবনতির দিকে যাচ্ছে। চোখ কোটরাগত। অস্থিচর্মসার হয়ে গিয়েছেন। আমার এমন রূপবান বাবার এই দশায় কান্না পেত। বাবা তাঁর শীর্ণ হাত মাথায় রেখে বলতেন, ''আমি ঠিক ভাল হয়ে যাব!'' মা-ও যে আড়ালে কান্নাকাটি শুরু করেছেন, বুঝতে পারছি। কিন্তু বাড়িতে যে আর-একটা লড়ালড়ি শুরু হয়ে গিয়েছে, টের পেলাম পঞ্চতীর্থকাকার চেঁচামেচিতে।

''কী হচ্ছে! শেষে একটা ম্লেচ্ছকে বাড়িতে এনে তুললেন আপনারা! পীঠস্থানের চরণামৃত নিষেধ হয়ে গেল! আর কী বাকি থাকল?''

জ্যাঠামশাই তাঁর ঘর থেকে বের হয়ে বললেন, ''যদি জলবাহিত রোগ হয়, দিঘির জলে দেবীর স্নান হয়, সেই জল না খাওয়াই বাঞ্ছনীয়।''

এই নিয়ে বাড়িতে দুটো পক্ষ হয়ে গেল। নিরাময়ের শেষ আশাটুকু আর থাকল না। আমার মা আরও বিষণ্ণ হয়ে গেলেন। দিনরাত অস্থিচর্মসার বাবার শিয়রে তিনি বসে থাকেন।

আত্মীয়রাও দূর-দূর স্থান থেকে বাবাকে শেষ দেখার জন্য আসছেন। গাঁয়ের মানুষজন আসছেন দেখতে। এই বাড়িতে অকালমৃত্যু নেই, এই বাড়িতে অপমৃত্যু নেই, এই বাড়িতে মহামারি ঢুকতে পারে না। বাড়ির অন্দরে একটা বড় ইঁদারা আছে। মাঘ-ফাল্গুনে নদী-নালা-পুকুর সব শুকিয়ে যায় আর মশার উপদ্রব বাড়ে, ইঁদারার জল যে যতটুকু পারে নিয়ে যায়। বাঙ্গাদা ইঁদারার পাশে পাহারায় থাকে। খাবার জল এক কলসি। প্রতিবেশীরা তার বেশি জল তুলতে পারে না। বসন্তকাল ঋতুটি ক্রমে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠছে, দাবদাহে রুখনও জ্বলছে গ্রামের পর গ্রাম, আর ঠিক সেই সময় আমাকে পঞ্চতীর্থকাকা এক সকালে গোপনে ডেকে বললেন, ''তোকে একটা কাজ করতে হবে নিলু। তুই গভীর রাতে একা পীঠস্থানে যাবি। অন্ধকারে। কেউ সঙ্গে থাকবে না। না গেলে তোর বাবাকে আর বাঁচাতে পারবিনে। পারবি যেতে?''

পিতার সঙ্কটকালে পুত্র কী না পারে! সব ভূতের উপদ্রব অগ্রাহ্য করে বললাম, ''পারব কাকা!''

''তোর ঠাকুরদা তো বলে গিয়েছেন, ভূতেরা সবসময় মানুষের উপকারই চায়। তোর গলায় উপবীত আছে। তোর তো ভয় থাকার কথা নয়!''

ফের বললাম, ''পারব কাকা!''

এবং গভীর রাতে টের পেলাম পাতায় খসখস শব্দ। সব শুনশান, কেমন অতীব এক ভয়ংকর রাত্রি। উপবীতে হাত রেখে রামনাম জপ করছি। অন্ধকারে ঝোপে-জঙ্গলে জোনাকি জ্বলছে। মাথার উপর আকাশ, দিঘির জলে বিশাল একটা মাছ বোধ হয় ভেসে উঠল। ঝপাস করে শব্দ হল! সে যাই হোক, ভয় পাব না! আর তখনই সেই সঙ্কটময় অন্ধকারে কেউ দাঁড়িয়ে! একটা ছায়ামতো কিছু! জামগাছের বিশাল গুঁড়ি থেকে উঠে এসেছেন।

''নে, ধর!''

হাত পেতে নিলাম।

একটা মোটা শিকড়!

''সাদা পাথরের রেকাবিতে ইঁদারার জলে ধুয়ে ছেঁচে ডুবিয়ে রাখবি। তিনবেলা আহ্নিক করে তুই নিজে চামচে করে মুখে জল দিবি তোর বাবার। মনে করে দিবি! ভুলে যাস না! এটা ভূতের দেওয়া স্বপ্নাদ্য ওষুধ, মনে রাখবি!'' তারপরই গাছের কাণ্ডের মধ্যে যেন মিলিয়ে গেলেন তিনি।

মাকে এসে গোপনে দেখালাম। কেউ যেন জানতে না পারে! গভীর রাতে একটা ভুত আমার হাতে এই স্বপ্নাদ্য ওষুধ দিয়ে গিয়েছে।

আমাদের দেশটায় ভূতের মতো মশার উপদ্রবেরও শেষ ছিল না। ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া। জ্বরে কম-বেশি আমরা সব ভাইবোনই ভুগেছি। জ্বর আসার সময় খুব মজা! শীত, হু হু শীত। কাঁথা-লেপে শীত মানে না। শীতে এত কাঁপতাম যে, খাট পর্যন্ত নড়তে শুরু করত। ভাইবোনরা তখন উল্লাসে ফেটে পড়ত। দাদার ম্যালেরিয়া হয়েছে। ওরা কেউ কেউ শীত নিবারণের জন্য আমাকে জড়িয়ে ওম দেওয়ার চেষ্টা করত। তারপরই ঘাম হত। তারপরই জলতেষ্টা পেত। জল খেতাম, ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যেত। ম্যালেরিয়া জ্বর তখনকার দিনে অসুখ বলেই গণ্য হত না। জ্বর নিয়ে হাডুডুও খেলেছি। কুইনিন খেতে হত। এই ছিল ওষুধ।

কিন্তু বাবার জ্বর ওঠে একশো চার আর নীচে একশো দুই। জ্বর রেমিশন হয় না। মাস দুয়েক হয়ে গেল। গোপনে মা আজ দু'দিন হল স্বপ্নাদ্য ওষুধের জল খাওয়াচ্ছেন। আমাদের স্যার এক সকালে ঘর থেকে বের হয়ে বললেন, ''তোমার বাবার নাড়ির উন্নতি হয়েছে। কবিরাজমশাইয়ের ওষুধ ধরেছে মনে হয়।'' আর সেই সকালেই মা আর্ত চিৎকারে বের হয়ে, ''আপনারা আসুন, তিনি কেমন করছেন!''

স্যার ঢুকে বললেন, ''আপনার কি খুব শীত করছে ভুঁইয়ামশাই?''

''লেপ দাও, কাঁথা দাও। খুব শীত করছে মাস্টার!''

তিনিই বললেন, ''মনে হচ্ছে ম্যালেরিয়া! দেখা যাক।'' কুইনিনও প্রেসক্রিপশনে এসে গেল। একটি জলবাহিত, আর-একটি মশাবাহিত। কী যে হবে!

এবং পরদিন সকালে আশ্চর্য ঘাম দিয়ে বাবারও জ্বর সেরে গেল। সেরে যেতেই স্যার বললেন, ''বিষে বিষক্ষয়। আর চিন্তা নেই।''

সাতদিনের মাথায় বাবা বললেন, "আমি খাব। আমার খুব খিদে পেয়েছে। না, বার্লি না, সাগু না। ভাত। ভাত খাব। বাসমতী চাল, মাগুরমাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাব।"

বাবা খেতে খেতে বললেন, "খুবই সুস্বাদু খাবার!" সপ্তাহখানেকের মধ্যে আমার বাবা নিরাময় হয়ে গেলেন।

জ্যাঠামশাই ঘর থেকে বের হয়ে এলে মনোহরদা বললেন, "সেই মশা! কী বুঝলেন, কর্তা! সেই মশা! মশার ওস্তাদিটা দ্যাখলেন?"

আমি মুচকি হাসছি।

"থাম তুই!" জ্যাঠামশাইয়ের এক ধমক, "তুই একটা গাধা! সঞ্জীবনী সুধা বুঝিস মনোহর? শরীরেই থাকে। এই সুধার জোরে প্রাণের আরোগ্যলাভ হয়। এই সুধার জোরে মানুষ বেঁচে থাকতে ভালবাসে। মশা, ভূত, এমনকী পীঠস্থান, সবই তার জের। মশা! মশা দেখাচ্ছে আমাকে! মূর্খ কোথাকার!"

তবু আমি মুচকি হাসছি। আসলে কেউ জানেই না, বাবা আমার ভূতের দেওয়া স্বপ্নাদ্য ওষুধে ভাল হয়ে গিয়েছেন!

৫ মার্চ ২০০৯
অলংকরণ: অনুপ রায়
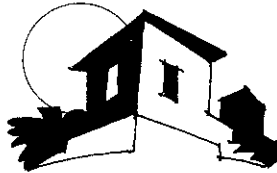
সুন্দরবনের ভূত

শক্তিপদ রাজগুরু

কিছুদিন আগেকার কথা। তবে ঘটনাটা আজও আমার মনে পড়ে। এ ঘটনার সাক্ষী-ভুক্তভোগী আমি নিজে। তাই এই ঘটনাটাকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারিনি। এর কারণও আমার কাছে এক বিচিত্র রহস্যে ভরা। তখন সুন্দরবনের নোনা পরিবেশে হয় গরান, কেওড়া, বহন, সুন্দরী ইত্যাদি গাছ। বহন গাছ থেকে তৈরি হত চায়ের বাক্স। মোহনদার ছিল এসব বাক্স তৈরির কারখানা। তার নিজের নৌবহর ছিল, কাঠ কাটার লোকজনও সরকারি পারমিট নিয়ে লোকজন, তাদের খাবারদাবার, এমনকী পানীয়জল নিয়ে নৌকোয় করে বনের গভীরে গিয়ে দশ-পনেরো দিন ধরে কাঠ কাটা চলত। তারপর নৌবহরে করে সেই কাঠ আনা হত। লোকজন নিয়ে গহিন বনে বাঘ-কুমির-কামটের রাজত্বে যেতে হত। পদে-পদে সেখানে বিপদ। কখনও বাঘের হানা, কখনও সাপের ফণা। আর জলে কুমির-কামটের ভয়। তারপর আছে গহন দুস্তর গাঙে ডাকাতের ভয়। ওই অরণ্যের মধ্যে মানুষের বেঁচে থাকাই আশ্চর্যের ব্যাপার। অনেক লোকেরই মৃত্যু হয় এখানে। আর কেউ মারা গেলে বাকিরা তাদের মৃত সঙ্গীর স্মরণে সেই বনেরই কোনও গাছের ডালে একটা ছেঁড়া লুঙ্গি, কিছু চাল, একটা ছেঁড়া চাটাই বেঁধে রেখে যায়। অন্যরাও সেসব দেখে বোঝে, এখানে কেউ অপঘাতে মারা গিয়েছে। এ সেই মৃত্যুর নিশানা। আদিম আরণ্যক পরিবেশে এমন মৃত্যুর নিশানা ছড়িয়ে আছে। ওসব দেখলে সারেংরা খোদার নাম করে জোরে জোরে দাঁড় চালিয়ে চলে যেতে চায় সেই গাঙের বুক থেকে।

সেবার আমি গিয়েছি মোহনদার সঙ্গে সুন্দরবনে বেড়াতে। মোহনদা কলকাতার অভিজাত অঞ্চলের বাসিন্দা।

অনেককেই বললেন, ''চলো, অরণ্য প্রকৃতিকে দেখে আসবে। দেখবে নতুন জগৎ।''

কিন্তু কেউই গেল না ভয়ে। শেষে আমিই সঙ্গী হলাম।

সুন্দরবন নামটা যত সুন্দর, এর রূপ ততই আদিম। লোকালয় শেষ হয়, তারপরই নদী আর ঘন বন। ক্রমশ নদীর বিস্তার বাড়ল। জনবসতি শেষ হয়ে গেল। শুরু হল গভীর গাং আর গহিন বন। দুস্তর নদী। চারদিকে শুধু জল আর জল। জলে দেখা যায় হিংস্র কামটের দলকে। জলে নামলে পায়ের মাংস কামড়ে ছিঁড়ে নেয়। জীবন্ত খেয়ে ফেলে শরীরের সব মাংস। আর আছে কুমির। ডাঙায় আছে রয়াল বেঙ্গল টাইগার।

নৌকোগুলো ভেসে চলেছে। দাঁড় টানছে মাঝি, যাতে তাড়াতাড়ি বনের মধ্যে পৌঁছতে পারে, যেখানে কাঠ কাটার কাজ চলছে। সেখানে কিছু কাঠুরিয়া আগে থেকে কাঠ কাটছে। সেখানে কিছু অস্থায়ী ঘর করা আছে। পথে জলদস্যুদের দলও হানা দিয়ে সঙ্গের খাবার, জল, সব লুটে নিয়ে গাঙে ফেলে শেষ করেও দিতে পারে। এ যেন মৃত্যুর জগৎ। চারদিকে জল আর জল। তবে এ জলে তেষ্টা মেটে না। বিস্বাদ, নোনা, বিষাক্ত জল। নৌকো থেকে

দেখা যায় নদীর ধারে কোনও গাছে ছেঁড়া লুঙ্গিতে বাঁধা বিবর্ণ পুঁটলি। মাঝি বলল, ''হয়তো বাঘের হানায়, না হয় নৌকোডুবিতে মারা গিয়েছে।''

কে বলে, যুধিষ্ঠির এখানে পড়েছিলেন!

সুন্দরবনের গহনে এমন অনেক যুধিষ্ঠির-দুর্যোধনদের আত্মা ঘুরে বেড়ায়।

আমাদের নৌকো চলছে। বিকেলের সোনারোদ নির্মল পরিবেশে গাঢ় হলুদ রং ধরেছে। গরান, কেওড়া, হেঁতাল, বহন গাছের ঘন জটলা। দুর্ভেদ্য এই বন। হলুদ-সবুজ রঙে মাখামাখি। নদীর জলেও হলুদ-লাল আভা। আস্তে আস্তে সূর্য গাছগাছালির আড়ালে বিদায় নিল। নেমে এল আদিম আরণ্যক অন্ধকার। এই বন তখন আদিম অন্ধকারে যেন হারিয়ে গিয়েছে। বাতাসে উঠল জোয়ারের তুমুল গর্জন। তারাজ্বলা আকাশ, অন্ধকার বনভূমি কেঁপে উঠল বাঘের গর্জনে। সে গর্জন জলে-জঙ্গলে প্রতিধ্বনি তুলল। নৌকোয় রাখা বাসনপত্রও যেন ঝনঝন করে কেঁপে উঠল।

ক'দিন এই পরিবেশে কাটালাম। বিশাল এই আরণ্যক পরিবেশ, সীমাহীন গাং দেখে মনে হয়, মানুষ নানা কারণে সভ্যজগতে যতই আন্দোলন করুক, এখানে তারা নিতান্ত অসহায়।

খালটা চলেছে ঘন একটা দ্বীপের বুক চিরে বড় নদীতে। আমরা খালেই নৌকোবহর নিয়ে রয়েছি। এখানকার এলাকাতেই গাছ কেটে নৌকো বোঝাই করা হবে। তারপর আমরা আবার ফিরে যাব। নৌকোতেই থাকা-খাওয়া। বড় নৌকোর সঙ্গে রয়েছে কয়েকটা ছোট নৌকো। দড়ি দিয়ে বালতি করে নদীর জল তুলে তাতেই স্নান। নদীতে নামা যাবে না। কুমির-কামটের রাজ্য। দেখা যায় গাছের গুঁড়ির মতো কুমিরকে ভেসে যেতে। এদিক-ওদিক ভাসছে, আবার ডুবে যাচ্ছে।

দিনভর কাঠ কেটে বিকেলে কাঠুরিয়ারা নৌকোয় ফিরে আসে। এখানকার মাটিতে চলা দুষ্কর। এসব গাছের শিকড় সরু ছুরির ফলার মতো মাথা তুলে আছে। পড়ে গেলেই ভীষ্মের শরশয্যা হয়ে যাবে।

ক'দিন ধরেই একটা বাঘও টের পেয়ে গিয়েছে এখানে মানুষ এসেছে। তাই মাঝে-মাঝে রাতের অন্ধকারে সেও আসে। আমাদের নৌকোগুলো সারাক্ষণ নোঙর করা ওর নাগালের বাইরে। নৌকোর লোকজন জেগে আছে। আমিও দেখি, তীরে দাঁড়িয়ে হলুদ-কালো ডোরাকাটা দাগ। ডাঙায় দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছে, আর মাঝে-মাঝে গর্জাচ্ছে।

ক'দিন এই আতঙ্কের পরিবেশে বনের মধ্যে এই খালে নৌকোর মধ্যে যেন হাঁপিয়ে উঠেছি। যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতে পারলে বাঁচি। মনে পড়ছে কর্মব্যস্ত আলো ঝলমলে কলকাতার কথা। মনটা ঘরে ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল।

বেশ ক'দিন আটকে থাকার পর আমাদের নৌকো নোঙর তুলে বের হল বড় গাঙে। এবার আমাদের যেতে হবে জোয়ারের সঙ্গে। একদিনের পথ পেরোলে তবেই পৌঁছব লোকালয়ের গাঙে। জোয়ারে একটানা ঘণ্টাপাঁচেক নৌকো বেরিয়েছে। তারপর শুরু হবে ভাটার টান। তখন স্রোত বইবে সাগরের দিকে। আমাদের তখন তীরে নোঙর করে অপেক্ষা করতে হবে পরের জোয়ারের জন্য। ছ'ঘণ্টা পর আবার জোয়ার আসবে। সেই জোয়ারে আবার ঘণ্টাপাঁচেক নৌকো চললে তবে আমরা প্রথম লোকালয়ের চেকপোস্টে পৌঁছব। শুরু হবে আদিম অরণ্যের পর মানুষের জগৎ।

নৌকোর সর্দার বলল, ''রহিম, ভাটার টান শুরু হইসে। নৌকো এহানেই নোঙর কর।'' নদীর ধারে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। দু'-একটা কেওড়া গাছ রয়েছে। তারপরই শুরু হয়েছে শিকড়ের শরশয্যা। নৌকো নদীতে নোঙর করা হল। এখানেই রান্নার ব্যবস্থা করা হবে। নৌকোর পিছনেই উনুনে চাল-ডাল যা হোক ফুটিয়ে নেওয়া হবে। মাছের অভাব নেই। বড় নৌকোর সঙ্গে বাঁধা ছোট নৌকো থেকে বারকয়েক জলে ফেললেই পারশে, ছোট ভেটকি না হয় অন্য সব মাছ ওঠে।

রহিম নৌকো নোঙর করার জন্য নামল। ওদিকে কয়েকটা কেওড়া গাছ মাথা তুলে আছে। রহিম মাটিতে নোঙর ফেলে ওদিকে গাছের দিকে

তাকিয়েই অস্ফুটে আর্তনাদ করে উঠল, ''চাচা, ইখানে কারা আটকেছেন গ।''

সর্দারমাঝি এতক্ষণে নৌকোটা ঠিকঠাক রাখার জন্য ব্যস্ত ছিল। সেও এবার গাছের ডালের দিকে তাকাল। চমকে উঠল সেও, ''এ কোথায় এলাম রে! খোদার মেহেরবান!''

নৌকোর আর-একজন বলল, ''রহিম, নোঙর তোল। ওদিকে চল। এখানে থাকা ঠিক হবে না।''

রহিমও নোঙর তুলে বলল, ''সেই ভাল!''

ওদের কথাবার্তা শুনছি। দেখি, ওদিকের গাছের ডালে ঝুলছে বিরাট লুঙ্গির দু'-তিনটে পুঁটলি। ছেঁড়া চটের খানিকটা অংশ যা ওদের মনে এমনই একটা আতঙ্ক এনেছে। দেখি, সত্যি ওরা নৌকোর নোঙর তুলে ভাটার টানে আরও খানিকটা নীচের দিকে গিয়ে চরভূমির পাশে নোঙর করল। তবু ওদের চোখ-মুখে সেই ভয়ের চিহ্নটা রয়েছে।

তখন সন্ধে নেমেছে। নদীর বুকে সূর্যের রং বদলে যাচ্ছে। রক্তলাল, বেগুনি, তারপর পরিণত হল গাঢ় অন্ধকারে। আকাশের বুকে কালো মেঘ একখানা কখন উঠেছিল দেখা যায়নি। এবার বোঝা গেল, মেঘটা ক্রমশ আকাশের তারাগুলোকেও ঢেকে দিল। নামল গাঢ় অন্ধকার। দূর বনভূমিতে চাপা গর্জন উঠল। একটা বাঘ যেন গোঙাচ্ছে। ডাকটা আকাশে-বাতাসে, নিস্তব্ধ বনভূমিতে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলল। কখনও কাছে, কখনও দূর থেকে ভেসে আসছে ডাকটা।

আজ রাত আমাদের এই বনভূমিতে শেষ রাত। এর পর ফিরে যাব লোকালয়ে দীর্ঘ কুড়ি দিন পর। এখানে কাকও নেই, কুকুরের ডাকও শোনা যায় না। এখানে বাতাসের গর্জন, নদীর গর্জন আর মাঝে-মাঝে বাঘের গর্জন। টেমির আলোয় খিচুড়িপর্ব সেরে আমরা আলো নিভিয়ে দিয়ে আদিম অন্ধকারে বসে আছি। আলো জ্বাললে বিপদ। জলদস্যুর দল আলো দেখে হানা দিতে পারে। ওদিকে বাঘটা গোঙাচ্ছে। এই রাতের যেন শেষ নেই। ভাটা শেষ হয়ে জোয়ার যেন আর আসে না। প্রতীক্ষাই করছি আমরা। কখন এই মৃত্যুর জগৎ ছেড়ে বেরোব।

হঠাৎ কার ডাক শুনে তাকালাম। দেখি, অন্ধকারে কে যেন ডাকছে। চমকে উঠলাম এই স্তব্ধ অন্ধকারে অরণ্যে মানুষের ডাক শুনে।

''আমায় নে যাবে?''

টেমির আলো জ্বেলে দেখি, ওদিকে দাঁড়িয়ে একটা লোক। পরনে একটা লুঙ্গি আর একটা গেঞ্জি। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। মুখখানা শীর্ণ। দুটো চোখ যেন আতঙ্কে চকচক করছে। হাঁটুভর্তি পলিকাদায় দাঁড়িয়ে সে ব্যাকুলভাবে আর্তনাদ করছে, ''আমারে বাঁচাও! নৌকোডুবি হয়ে গিয়েছে দু'দিন আগে। সকলেই ডুবেছে। আমি গাছের ডালে বসে ছিলাম। আমারে নে চলো!''

লোকটার কথা শুনে চমকে উঠলাম। দু'দিন আগে নৌকোডুবির পরও সে বেঁচে আছে এই বিপদসঙ্কুল জঙ্গলে! জল নেই, খাদ্য নেই, তবু বেঁচে আছে। রহিম-ফকিররা নীরব। সর্দারমাঝি বলল, ''উঠে এসো।''

লোকটা তক্ষুনি হাঁটুজলে নেমে নৌকোর দিকে এগিয়ে এল।

রহিম বলল, ''সর্দার, কারে নায়ে তুলছ!''

অচেনা-অজানা লোকটা ততক্ষণে কাছি ধরে নৌকোর উপর উঠে এসেছে। কাতর স্বরে বলল, ''আমি পুইডাঙার বিভূতি গো! বিভূতি লস্কর। ঘরে মা-বোন একটা ছেলে রেখে মৌচাক কাটতে এসেছিলাম। সব ডুবে গিয়েছে। একটু জল। দু'দিন জল পাইনি।''

এখানে শুধু জল আর জল। তবু একবিন্দু জল খাওয়া যায় না। ফকির একঘটি জল এগিয়ে দিতে লোকটা গলায় ঢালতে থাকল। ঢকঢক আওয়াজ করে নিমেষের মধ্যে লোকটা জলটা শেষ করল। ঘটিটা নামিয়ে তৃপ্তির আওয়াজ বের করল, ''আজ জেবনটা ফিরে পেলাম গ!''

ওদিকে সময় বয়ে যাচ্ছে। সর্দারমাঝি বলল, ''আমি খুব সুবিধে বুঝছি না। খেয়েদেয়ে নে। জোয়ারের আর দেরি নেই। জোয়ার এলেই নোঙর তুলতে হবে।''

খাবার পাতে খিচুড়ি আর পাঁচমিশেলি মাছের

ঝোল। খিদে নেই। আমি প্রহর গুনছি কখন রাত শেষ হবে, আমরা লোকালয়ে পৌঁছব। শেষ হবে এই বিভীষিকাময় দুঃসহ রাতের।

মাঝিদের খাওয়া শেষ হল। বিভূতি তখনও খিচুড়ি খাচ্ছে রাক্ষসের মতো। দেখে মনে হল দু'দিন নয়, জীবনে কোনওদিন যেন সে খায়নি। লোকটাকে দেখলে কেমন গা শিরশির করল। এককোণে বসে আছে। আমরাও বসে আছি স্তব্ধ নদীর বুকে। হঠাৎ নৌকোটা দুলে উঠল। তারপর নৌকোর মুখ ঘুরে গেল। মাঝিদের মধ্যে সাড়া পড়ল। সর্দার বলল, ''রহিম, নোঙর তোল! জোয়ার আইসে।''

এবার ওরাও নোঙর তুলল। রাত তখন ক'টা বাজে কে জানে! আকাশে তারাও দেখা গেল না। নদীতে ঢেউয়ের গর্জন উঠছে। সর্দার হাল ধরেছে।

''জয়, পাঁচ পিরের জয়।''

পাঁচ পিরের জয়ধ্বনি দিয়ে নৌকো ছাড়ল অন্ধকার নদীতে। জোয়ারের স্রোতে নৌকো চলেছে ঢেউয়ের মাথায় দুলতে দুলতে। বিভূতি দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে জড়সড় হয়ে বসে আছে। আর মাঝে-মাঝে তাকাচ্ছে। ওর চাউনিটা কেমন তীক্ষ্ণ!

হঠাৎ উঠল প্রচণ্ড ঝড়। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। একটা দমকা হাওয়ায় নৌকো একবার এদিক কাত হল, আবার পরক্ষণেই ঢেউয়ের প্রচণ্ড ঠেলায় ওদিকে কাত হল। নৌকো কেঁপে উঠল। বাসনকোসনগুলো ঝনঝন করে ছিটকে পড়ল। সর্দারমাঝি হালটাকে শক্ত করে ধরে চিৎকার করল, ''হুঁশিয়ার!''

সেইসঙ্গে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠল মেঘের গর্জনে, আর তার সঙ্গে বিদ্যুতের ঝলক। সেই বিদ্যুতের আলোয় দেখা গেল সীমাহীন জলরাশির বুকে ঢেউয়ের তাণ্ডব। মাঝিরা আমাদের টালমাটাল নৌকোটাকে বাঁচানোর জন্য প্রাণপণে দাঁড় টানছে। নৌকোটাকে নিয়ে মত্ত গাং যেন লোফালুফি করতে চাইছে। তাই দাঁড়গুলো সব সময় জলেও পড়ে না। নৌকোটা যেন বারবার আছড়ে পড়ছে জলে। ছিটকে পড়ছে নোনা জল। সারা শরীর ভিজে যাচ্ছে। কথাও শোনা যাচ্ছে না। জলোচ্ছ্বাস, মেঘের গর্জন, আর ক'টা অসহায় মানুষের আর্তনাদ। নৌকাটা এদিক-ওদিক কাত হচ্ছে, যেন অতলে তলিয়ে যাবে।

মাঝিরা সকলেই লড়ছে প্রকৃতির এই মহাশক্তির সঙ্গে। আর বিভূতিকে দেখলাম, স্থির হয়ে বসে আছে। ওর মুখ-চোখ যেন জ্বলছে। নৌকো কাত হয়ে গিয়েছে। লোকটা গড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ খ্যাঁক-খ্যাঁক শব্দে হাসল। হাসি নয়, যেন নিষ্ঠুর পরিহাস। ও যেন মাঝিদের নৌকোকে বাঁচানোর এই দুর্বার প্রচেষ্টাকে পরিহাসের চোখেই দেখছে। মাঝি কোনও মতে নৌকো সামলাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু নদী যেন আমাদের গ্রাস করার জন্য মেতে উঠেছে। আবার একটা প্রচণ্ড ঢেউ আছড়ে পড়ল। নৌকো কেঁপে উঠল। আমি চিৎকার করলাম, ''অ্যাই, হাসছ যে! মরতে চলেছি আমরা, তুমি হাসছ!''

লোকটা তাকাল আমার দিকে। দুটো চোখ যেন জ্বলছে। হাসি থামিয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলছে। সবটা শোনা গেল না।

এক ঝাপটায় আবার নৌকোয় জল উঠে এল। একজন নৌকোর ভিতর থেকে সমানে জল বের করছে। এভাবে নৌকোর খোলে জল বাড়তে থাকলে নৌকো ডুবে যাবে।

প্রাণের ভয় বড় ভয়। ওদের সঙ্গে আমিও হাত লাগাচ্ছি। রহিম বিভূতিকে দেখিয়ে বলল, ''ও তিনথালা খিচুড়ি খেয়েছে। ওকেও হাত লাগাতে বল।''

নৌকোটা তখন বিপজ্জনকভাবে দুলছে। আমরা বাঁচার জন্য প্রাণপণে লড়াই করছি। হঠাৎ সর্দার চিৎকার করে উঠল, ''হাল ভেঙে গিয়েছে!''

হালের বাঁটটা প্রচণ্ড জলের ধাক্কায় ভেঙে গেল। এবার মদন চিৎকার করে উঠল, ''রহিম, ও কোথায় গেল রে? ও তো নেই!''

চমকে উঠলাম। ভিজে হাতে টর্চের আলো জ্বেলে দেখলাম, যেখানে বিভূতি বসে ছিল সেই জায়গাটা ফাঁকা। কেউ নেই। বাতাসের গর্জন শোনা যাচ্ছে। কোথায় গেল সে? পড়ে যায়নি তো জলে? জলে পড়ার পথও নেই। সে ছইয়ের মধ্যে বসে ছিল। লোকটা কর্পূরের মতো কোথায় উবে গেল।

আমরা ভিজে কাঁপছি। ঝড় আস্তে আস্তে শান্ত হয়েছে। সর্দার বলল, ''কুনমতে কিনারে নে চল! যদি বাঁচা যায়! লোকটা কোথায় যে গেল!''

ফরিক বলল, ''চুলোয় যাক! আপনি বাঁচলে বাপের নাম!''

কতক্ষণ এই তাণ্ডব চলেছিল জানি না। অনেক কষ্টে তীরে এসে অন্ধকারেই নোঙর ফেলেছে হাল-ভাঙা নৌকো। বাঘের সেই চাপা গোঙানির শব্দ যেন ছাড়তে চায় না আমাদের। আমরা ক'টা অসহায় মানুষ পড়ে আছি আদিম অরণ্যে। যেন মৃত্যুর অপেক্ষায়।

দুঃখের রাত শেষ হল। তবু আমাদের দুঃখ শেষ হল না। খাদ্যপানীয় কিছুই নেই। হালভাঙা নৌকোয় পড়ে আছি। সাহায্য না এলে খিদে-তেষ্টায় আমাদেরও মরতে হবে। গাঙের দিকে চেয়ে আছি। দূরে দেখা যায় দুটো কালো বিন্দু ভেসে যাচ্ছে। কাছে আসতে দেখলাম, আমাদেরই মহাজনের নৌকো জিনিসপত্র নিয়ে ফিরছে। রহিম চিৎকার করল, ''সুলেমান, ইদিকে আমরা!''

ওরা আমাদের দেখে কাছে এল, ''তোমরা এখানে?''

আমরাও খেয়াল করিনি। আমাদের নৌকো যেখানে নোঙর করা, সেখানেই গাছের উপর বাঁধা কয়েকটা লুঙ্গির পুঁটুলি। রাতে ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে কে যেন আমাদের টেনে এনেছে এখানে, মৃত্যুর জগতে।

রহিম বলল, ''চাচা, এ নির্ঘাত ওই ভূতের কাণ্ড! জোর বেঁচে গিয়েছি কাল।''

আমি বললাম, ''এখনও অনেক পথ বাকি! আগে পৌঁছই, তারপর বাঁচার কথা ভাবা যাবে।''

তখন বেলা দশটা হবে। মেঘের চিহ্নই নেই। আমরা নিরাপদেই বাকি পথ পাড়ি দিয়ে পুইডাঙার হাটে এসে উঠলাম। তখন বিকেল হয়ে গিয়েছে। হাটতলার দোকানে এসে জল খেয়ে তেষ্টা মিটিয়ে আর কিছু না পেয়ে চিঁড়ে-মুড়ি ও গুড় কিনে তাই গোগ্রাসে গিলছি। মনে পড়ে গেল বিভূতির গোগ্রাসে খিচুড়ি খাওয়ার কথা। তারপরই মনে

পড়ল, সে বলেছিল ওর বাড়ি পুইডাঙাতেই। হাটতলায় দোকানে অনেক লোক আছে। তাদেরই জিজ্ঞেস করলাম, ''এখানে বিভূতি নস্করের বাড়ি কোথায়? কাল আমাদের নৌকোয় উঠেছিল। তারপর কোথায় যে গেল!''

একজন চমকে উঠে বলল, ''বিভূতি! কাল! সে তো পাঁচদিন আগে গাঁয়ের আরও তিনজনের সঙ্গে মধু পাড়তে গিয়ে মারা গিয়েছে। তাদের নৌকো ফাঁকাই পড়ে ছিল। একজন বেঁচে ফিরেছে, বাকি লাশ কোথায় ভেসে গিয়েছে! উ কী করে লায়ে উঠবে গ!''

চমকে উঠলাম। তখনও ওর মুখখানা মনে পড়ছে। খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। আর সেই খিকখিক হাসি। আজও সেই হাসি আমার কানে বাজে।

৫ মার্চ ২০০৯
অলংকরণ: নির্মলেন্দু মণ্ডল

সুকুমার সেন: ১৬ জানুয়ারি ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় জন্ম। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে এম এ পাশ করেন প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে। ১৯২৪-এ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ। ১৯৩৭-এ পিএইচ ডি। ১৯৩০ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের উপাধ্যক্ষ। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। ১৯৬৬ এবং ১৯৮৪-তে পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার। এছাড়া পেয়েছেন রবীন্দ্র পুরস্কার, বিদ্যাসাগর পুরস্কার ও দেশিকোত্তম।
মৃত্যু: ৩ মার্চ ১৯৯২

মনোজ বসু: ২৫ জুলাই ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে যশোহর জেলার ডোঙাঘণ্টা গ্রামে জন্ম। উপন্যাস, ছোটগল্প ও কিশোর রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন এই কথাসাহিত্যিক। ভুলি নাই, আগস্ট ১৯৪২, রাখিবন্ধন, জলজঙ্গল ইত্যাদি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। ১৯৬৬ সালে 'নিশিকুটুম্ব' গ্রন্থের জন্য পেয়েছেন অকাদেমি পুরস্কার।
মৃত্যু: ২৬ ডিসেম্বর ১৯৮৭

প্রেমেন্দ্র মিত্র: সেপ্টেম্বর ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে বারাণসীতে জন্ম। কলকাতা ও ঢাকায় পড়াশুনা করেছেন। বিচিত্র জীবিকা, শেষ পর্যন্ত লেখক। প্রায় শ' দেড়েক বই লিখেছেন। বাংলা সাহিত্যে ঘনাদা চরিত্র তাঁর অমর সৃষ্টি। তেল দেবেন ঘনাদা, ঘনাদার চিংড়ি বৃত্তান্ত, মান্ধাতার টোপ ও ঘনাদা বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। বহু সম্মানে ভূষিত বরেণ্য এই লেখক 'সাগর থেকে ফেরা' কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে পেয়েছেন অকাদেমি ও রবীন্দ্র পুরস্কার। আর ১৯৮৪-তে পেয়েছেন বিদ্যাসাগর পুরস্কার।
মৃত্যু: ৩ মে ১৯৮৮

লীলা মজুমদার: ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় জন্ম। ১৯৩৬ সালে বদ্যিনাথের ষাঁড় লিখে ছোটদের হৃদয় জয় করেন। সারাজীবন তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন শিশুসাহিত্য রচনায়। পদিপিসির বর্মি বাক্স, খেরোর খাতা, কল্পবিজ্ঞানের গল্প, গুপিপানুর কীর্তিকলাপ ইত্যাদি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। লীলা পুরস্কার (১৯৫৯), শিশুসাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার (১৯৮০) ইত্যাদি বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।
মৃত্যু: ৫ এপ্রিল ২০০৭

বিমল মিত্র: ১৮ মার্চ ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে জন্ম। ১৯৫৩ থেকে সাহিত্যকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে পুরো সময়ের জন্য সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। সাহেব বিবি গোলাম, বেগম মেরী বিশ্বাস, কড়ি দিয়ে কিনলাম ইত্যাদি গ্রন্থের এই লেখক ছোটদের জন্য লিখেছেন— কে?, রাজা হওয়ার ঝকমারি, কিশোর অমনিবাস ইত্যাদি বহু গ্রন্থ। ১৯৬৪-তে রবীন্দ্র পুরস্কার ও ১৯৮৪-তে পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার।
মৃত্যু: ৭ মে ১৯৯৩

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়: ২৩ মার্চ ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় জন্ম। শৈশব ও কৈশোর কেটেছে বর্মায়। ১৯৪০-এ ফিরে আসেন কলকাতায়। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ইরাবতী' দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যের এই জনপ্রিয় কথাশিল্পী শিশু ও কিশোর সাহিত্যের এক নিজস্ব জগৎ তৈরি করেছিলেন। তিনি ভয়ঙ্কর ভূতের গল্প, ভয়ের মুখোশ, ভৌতিক অমনিবাস, বিচিত্র শিকারের গল্প ইত্যাদি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন।
মৃত্যু: ২০ জানুয়ারি ১৯৮১

সন্তোষকুমার ঘোষ: ৯ সেপ্টেম্বর ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুরে জন্ম। দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক 'কিনু গোয়ালার গলি' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাংলা সাহিত্যের এক স্বাতন্ত্র্যধর্মী লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। ছোটগল্পকার হিসেবেও তিনি খ্যাতিমান। এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাংবাদিক-সাহিত্যিক 'শেষ নমস্কার: শ্রীচরণেষু মাকে' গ্রন্থের জন্য ১৯৭২ সালে অকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।
মৃত্যু: ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫

সত্যজিৎ রায়: ২ মে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় জন্ম। বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা ও বহুমুখী শিল্পপ্রতিভার অধিকারী। ১৯৯২-এ পেয়েছেন অস্কার। পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও পিতা সুকুমার রায়ের মতোই এই লেখক বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক। গোয়েন্দা ও কল্পবিজ্ঞানের কাহিনির অন্যতম সার্থক ও জনপ্রিয় লেখক। তাঁর ফেলুদা ও প্রোফেসর শঙ্কু চরিত্র দু'টি বাংলা সাহিত্যে এক অমর সৃষ্টি। সন্দেশ পত্রিকাকে তিনি পুনরুজ্জীবিত করেন। ১৯৭৮-এ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি লিট দিয়ে সম্মানিত করেছে। এ ছাড়া তিনি পদ্মশ্রী (১৯৫৯), পদ্মবিভূষণ (১৯৭৬), ভারতরত্ন (১৯৯২) উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৭১-এ আনন্দ পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়।
মৃত্যু: ২৩ এপ্রিল ১৯৯২

বিমল কর: ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে চব্বিশ পরগনা জেলার টাকির কাছে এক গ্রামে জন্ম। শৈশব ও কৈশোর কেটেছে নানা জায়গায়। বিচিত্র কর্মজীবন। শেষ পর্যন্ত সাংবাদিক। বহু ছোটগল্প ও উপন্যাসের জনক এই লেখকের শিশু ও কিশোর সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ অবদান কিকিরা। তাঁর গজপতি ভেজিটেবল শু কোম্পানি, মন্দারগড়ের রহস্যময় জ্যোৎস্না, রাবণের মুখোশ, কিকিরা সমগ্র ইত্যাদি গ্রন্থ জনপ্রিয় হয়েছে। ১৯৬৭ এবং ১৯৯২-এ পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার, ১৯৭৫-এ অকাদেমি, ১৯৮১ এবং ১৯৮২-তে পেয়েছেন যথাক্রমে শরৎ ও নরসিংহ দাস পুরস্কার।
মৃত্যু: ২৬ আগস্ট ২০০৩

শক্তিপদ রাজগুরু: ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড়ে। বাণিজ্যের স্নাতক। সরকারি চাকরি করতেন। বহু গল্প-উপন্যাসের প্রণেতা। ছোটদের মহলেও সমান জনপ্রিয়। বিভূতিভূষণ পুরস্কার, লায়ন্স অ্যাওয়ার্ড, দিল্লি-সহ একাধিক সম্মানে ভূষিত।

হিমানীশ গোস্বামী: ১৯২৬ সালের ১৮ মার্চ ফরিদপুরে জন্ম। বিদ্যাসাগর কলেজের কলা বিভাগের স্নাতক। জীবিকাসূত্রে অনেক সংস্থায় যুক্ত থেকেছেন। সাহিত্যসৃষ্টির পাশাপাশি ফোটোগ্রাফি এবং কার্টুন আঁকায় বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন। ছোটদের মহলে জনপ্রিয়। সর্বভারতীয় শিশু সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ: ১৪ অক্টোবর ১৯৩০-এ মুর্শিদাবাদ জেলার খোশবাসপুর গ্রামে জন্ম। আশৈশব সাহিত্যচর্চার পরিবেশে মানুষ। ১৯৫০-৫৬ পর্যন্ত রাঢ় বাংলায় আলকাপের দলের সঙ্গে ঘুরেছেন। ষাটের দশকের গোড়ায় সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ। অসংখ্য ছোটগল্প ও উপন্যাসের রচয়িতা। ছোটদের মহলেও জনপ্রিয়। সাহিত্য অকাদেমি-সহ নানা গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার পেয়েছেন।